কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

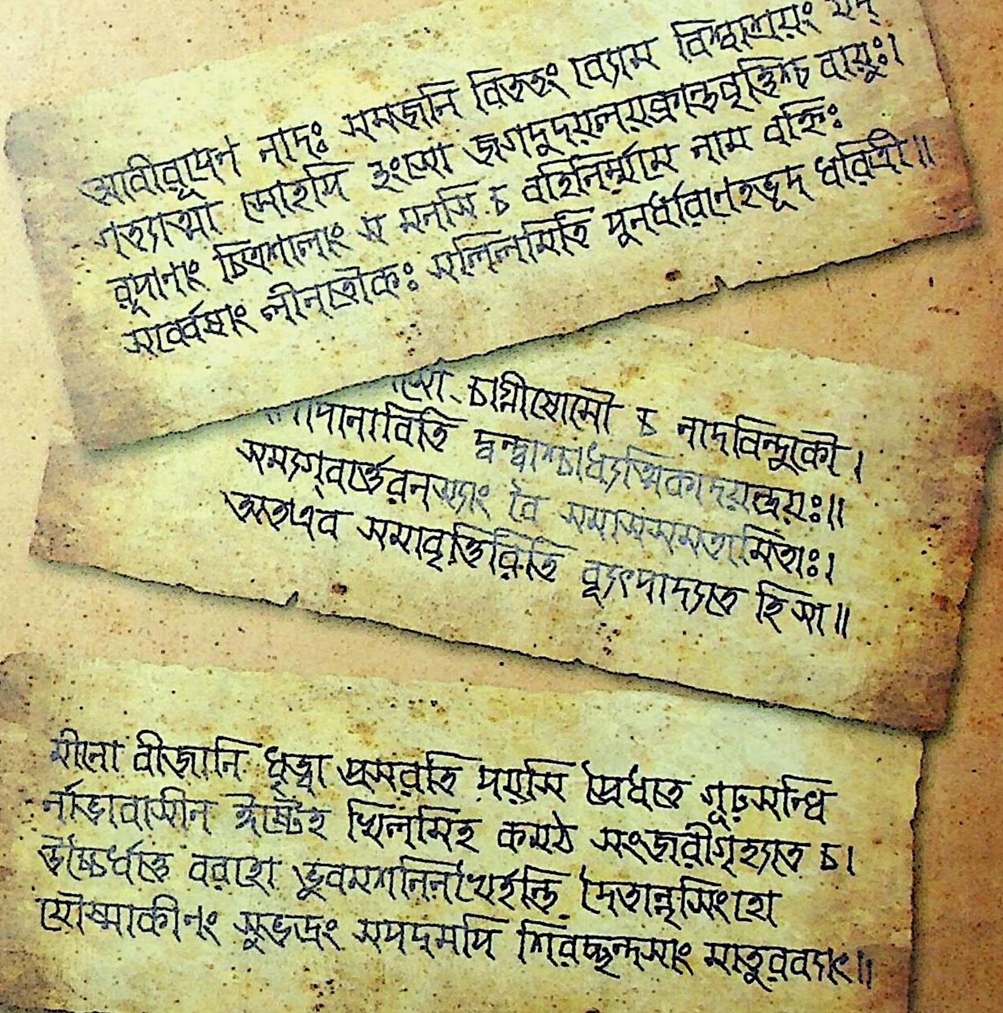

আবির্ভূয়েন নাদঃ সমজনি বিততং ব্যোম বিশ্বাশ্রয়ং যদ্
গত্যাখ্যা সোঽহমি হংসো জগদুদয়লয়ক্রান্তমূর্ত্তিশ্চ বায়ুঃ।
রূপানাং চিত্রশালাং স মনসি চ বহির্নির্ম্মমে নাম বহ্নিঃ
সর্ব্বেষাং লীনচৈতকঃ সলিলমিতি পুনর্ধারিণেহভূদ্ ধরিত্রী॥

শো চাগ্নীষোমৌ চ নাদবিন্দুকৌ।
পানাবিতি দ্বন্দ্বাশ্চাধঃস্থিকাদয়স্ত্রয়ঃ॥
সমগ্রবর্ত্তনত্বং বৈ সমাসমমতামিতাঃ।
অতএব সমাবৃত্তিরিতি বৃহৎপাদয়স্ত হি সা॥

মীনো বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রধত্তে গূঢ়সন্ধি
নাড়াবাসীন ঈশ্চেষ্টঽহ খিলমিহ কমঠে সঞ্জীবীগৃহ্যত্তে চ।
উচ্চৈর্ধত্তে বরাহো ভুবমসানিলখেহস্তি দৈত্যান্নৃসিংহো
যৌষ্মাকীনং সুভদ্রং সপদমপি শিরশ্ছন্দসাং মাতুরবতাৎ॥

জপসূত্রম্ ভারতীয় প্রাচীন মনীষার জ্ঞান-বোধ-উপলব্ধির এক সুগভীর এবং বিস্তীর্ণ আকর। গ্রন্থটির নির্মাণকাহিনিও সমধিক কৌতূহলপ্রদ। এই বিপুল গ্রন্থটির প্রথম ভাগ পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশিত হল। তৃতীয় ভাগটি প্রকাশের মাধ্যমে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে। নিখিল জগৎকে দেখবার জানবার বোঝবার যে প্রক্রিয়া এদেশের মনীষার, বিশ্বনিখিলের অনুভব ও উপলব্ধি, কণিকায় এবং মহানে 'অস্তি'র যে প্রকাশ আমাদের প্রাচীন মনীষার— জপসূত্রম্ প্রসঙ্গে অনবদ্য আলোচনা-বিশ্লেষণে স্বামীজি আমাদের অবহিত করেছেন। ষড়দর্শন, বেদ, বেদান্ত, গীতা থেকে প্রয়োজনীয় কারিকাসমূহে ব্যাখ্যা করে বিশ্বনিখিলের রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস নিয়েছেন তিনি। দেবদেবী মূর্তি যে প্রকৃত এই নিখিলবিশ্বেরই প্রতিরূপ তা তাঁর অসাধারণ ভাষাবিন্যাস ও শৈলীতে আমাদের কাছে মূর্ত হয়েছে। তাঁর সমকালীন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ক্রমশই অধ্যাত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসরমান। তাঁর উপলব্ধি-অনুভব-জ্ঞানের অতল গভীরতা, বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তি, ভাষার মাধুর্য এবং সাবলীলতায়, এই গ্রন্থপাঠান্তে আমাদের মানসজগৎ উত্তরিত হয়ে এক অন্যলোকে বিচরণ করে।

ISBN 978-81-7955-203-2 (Vol.-II)
ISBN 978-81-7955-198-1 (Set)

₹ 450.00

5.2

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেনসহ)

দ্বিতীয় ভাগ

সাহিত্য সংসদ

JAPASUTRAM
PART THREE & FOUR
by Srimat Swami Pratyagatmananda Saraswati

© শেখর মৈত্র এবং মনোজ মৈত্র

ISBN 978-81-7955-203-2 (Vol.-1I)
ISBN 978-81-7955-198-1 (Set)

প্রথম সংসদ সংস্করণ
মে ২০১২
বৈশাখ ১৪১৯

প্রচ্ছদ : চন্দন বসু

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
নটরাজ অফসেট
১ নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুলতলা
কলকাতা-৭০০ ১৩৬

₹ 450.00

সূচীপত্রম্

তৃতীয় খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

১। প্রকাশকের নিবেদন ... ... নয়
২। প্রসঙ্গাকথা ... ... এগারো
৩। নিবেদন ... ... পনেরো
৪। ভূমিকা ... ... উনিশ
৫। জপোল্লাসবিলাসবল্লী ১
৬। তারচক্র সমাচরণম্ ৩
৭। আপ্যায়ন রহস্যম্ ১৬
৮। ন্যাসভূতশুদ্ধি রহস্য সঙ্কেত : ২০
৯। দ্বিদল বন্দনাত্রয়ী ৪৬
১০। কৃপালববৈভবপঞ্চকম্ ৫৯
১১। নিত্যস্নান পঞ্চকম্ ৬০
১২। জপে বিনিয়োগঃ ৬৪
১৩। মহামায়া সূত্রম্ ৬৭
১৪। মায়াসূত্রাণি ১০৪
১৫। সৃষ্টিমূলসূত্রাণি (আবিঃ, রাত্রি ইত্যাদি) ১১০
১৬। শুদ্ধি সাম্যাদি সূত্রাণি ১৩২
১৭। শুদ্ধি সূত্রম্ ১৪৫
১৮। প্রকৃতি প্রত্যয়াদি সূত্রাণি ১৫১
১৯। বিকৃতি সূত্রাণি ১৬২
২০। গ্রন্থি সূত্রাণি ১৭৩
২১। হৃল্লেখা সূত্রাণি ১৮০

বিষয় পৃষ্ঠা

২২। বৃত্তি সূত্র পঞ্চকম্ ১৯১
২৩। শূন্যসূত্রম্ ২০৩
২৪। পূর্ণ সূত্রম্ ২০৫
২৫। বিন্দু সূত্রাণি ২১০
২৬। দ্বন্দ্বাদি সূত্রাণি ২১৪
২৭। ভূমত্ব সূত্রম্ ২২০
২৮। প্রমাণাদি সূত্রাণি ২২৩
২৯। উদাসীনত্ব সূত্রম্ ২২৬
৩০। বস্তু ধর্মাদি সূত্রাণি ২৩০
৩১। আদিত্যাগ্নীষোমাদি সূত্রাণি ২৩৮
৩২। সর্ব্বমোঙ্কার ইতি সূত্রম্ ২৪২
৩৩। আনন্দ-সূত্রাণি ২৪৫
৩৪। পাদমাত্রাদি সূত্রাণি ২৫১
৩৫। অর্দ্ধমাত্রাদি সূত্রাণি ২৬১
৩৬। লীলাসূত্রাণি ২৬৭
৩৭। যোগমায়া সূত্রম্ ২৬৯
৩৮। জড়ত্ব সূত্রাণি ২৭০
৩৯। যোগ্যত্ব সূত্রাণি ২৭৪
৪০। ব্যবহার সূত্রাণি ২৭৬
৪১। প্রাণস্য প্রাণ ইতি সূত্রম্ ২৮০
৪২। রসতম ইতি সূত্রম্ ২৮২
৪৩। স্থিতিক্রম কারিকাবলী ২৮৬
৪৪। ভানজ্ঞানাদি সূত্রাণি ২৯৪
৪৫। সামান্য বিশেষাদি সূত্রাণি ৩০৫
৪৬। অণুত্বধারাত্ব সূত্রম্ ৩০৮

বিষয় পৃষ্ঠা
৪৭। পরায়ণ অনাহত সূত্রাণি ৩১৭
৪৮। হংসাদি সূত্রচতুষ্টয়ম্ ৩২৪
৪৯। রেতোবৃষাগ্নীষোম সূত্রাণি ৩৩৭
৫০। মিত্রাবরুণ সূর্যসূত্রে ৩৫৩
৫১। পরিশিষ্টম্—১ (অর্দ্ধোদয়) ৩৭৩
৫২। পরিশিষ্টম্—২ (ওঙ্কারহবনাদিদশকম্) ৩৮০

চতুর্থ খণ্ড

৫৩। নিবেদন ৩৮৫
৫৪। বিশ্বকল্প অক্ষমালার মেরু—সূর্যতত্ত্ব ৩৯১
৫৫। বিধান ও আধান ৩৯৩
৫৬। একপঞ্চাশৎ ৩৯৫
৫৭। বাক্‌চতুষ্টয় ৪০২
৫৮। অভ্যারোহসোপানচতুষ্টয় ৪০৫
৫৯। রাকা ও অমাবস্যা ৪১০
৬০। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ৪১২
৬১। গ্রহণে গঙ্গাস্নান ইত্যাদির মর্ম ৪১৬
৬২। জপের অধ্যাত্মরূপ ভাবনা ৪১৮
৬৩। সাধ্য বাধ্যের চরম সংঘর্ষের স্থল ৪১৯
৬৪। বিন্দু ও সিন্ধু ৪২৩
৬৫। জপে মাত্রা ৪২৫
৬৬। অহং এবং অহঃ ৪৩৩
৬৭। হ্রীমাদি বীজচতুষ্টয়ের উপযোগ ৪৩৫
৬৮। পুরশ্চরণ ৪৩৫
৬৯। চন্দ্রমা সূত্র ৪৩৭
৭০। অনুস্বার ও বিসর্গ ৪৩৮

বিষয় পৃষ্ঠা

৭১। জপে দক্ষিণাচার ইত্যাদি ৪৩৯
৭২। একমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা ৪৩৯
৭৩। বিশ্বাঙ্কন ও বিশ্বনিরঞ্জন ৪৪৬
৭৪। মনঃ ও চন্দ্র ৪৪৮
৭৫। প্রাকৃত কামাদি ও জপ ৪৫৪
৭৬। ওঁকারাদি জপ ৪৫৭
৭৭। অজপা ৪৬০
৭৮। বরুণ-সোম-বিবিধরূপ ৪৬৭
৭৯। চর্যা বা সাধনক্রম ৪৯৭
৮০। বর্ণরসায়ন ও রূপরসায়ন ৫১৪
(নানা মন্ত্র ও যন্ত্রে)
৮১। চন্দ্রমাঃ চন্দ্রমা ও আদিত্য ৫৩০
৮২। দিব্ ও দ্যৌঃ ৫৪৩
৮৩। পৃথিবী ৫৪৯
৮৪। পৃথিবী বীজ লং ৫৫৫
৮৫। ‘ত’ বর্গ ৫৫৬
৮৬। বেণ ও পৃথু ৫৫৭
৮৭। ভূভার ৫৬৬
৮৮। স্বস্তি ও শান্তি ৫৬৯
৮৯। পৃথিবীর ‘গুণ’ ৫৭০
৯০। ধূপধূনা ৫৭৩
৯১। গন্ধাদির সূক্ষ্ম চেতনা ৫৭৭
৯২। ব্যাহৃতি হবন ৫৭৯
৯৩। পৃথিবীর লক্ষণ ৫৮০
৯৪। বাধা প্রতিষেধক্রম ৫৮৩
৯৫। ভূঃ এবং ভূ ৫৮৩

বিষয় পৃষ্ঠা

৯৬। বাধাচতুষ্টয় পরিহারের আন্তর উপায় ৫৮৫
৯৭। অন্তরীক্ষ সূত্র ৬০০
৯৮। ব্যবস্থিতি সূত্র ৬০৭
৯৯। অবস্থিতি, ব্যবস্থিতি, পরিস্থিতি ৬০৯
১০০। সংখ্যা ৬০৯
১০১। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ৬১৩
১০২। প্রমাণ কতদূর অবধি? ৬১৫
১০৩। প্রশাসন সূত্র ৬২২
১০৪। অধ্যক্ষতা ৬২৫
১০৫। যন্ত্র ও যন্ত্রম্ ৬২৬
১০৬। ত্রিপুটী ৬২৬
১০৭। পরম ও উত্তম ৬২৯
১০৮। সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ ৬৩১
১০৯। নাদ ও সূত্রাত্মা ৬৩২
১১০। আজ্ঞা চক্র ৬৩৪
১১১। অধিষ্ঠান সূত্র ৬৩৫
১১২। পরিশিষ্ট:
    (ক) জপযজ্ঞ ৬৪৫
    (খ) অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্ ৬৫১
    (গ) সিন্ধৌ বিন্দুদশকম্ ৬৬০
    (ঘ) করুণাম্বুধিসন্নিধৌ ৬৬৭
    (ঙ) Yantram ৬৬৯
    (চ) নামের কৃপা ৬৭৭

প্রকাশকের কথা

‘প্রসঙ্গকথা’য় উল্লেখিত জপসূত্রম্-এর বৈদ্যুতিন গ্রন্থরূপ প্রকাশের উদ্যোগে আমরা ছিলাম। সেখানে পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন এবং গ্রন্থটির অসামান্য গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদে বলা আছে। পুনরুক্তি বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থটির সংস্পর্শে এসে আমাদের মনে হয়েছে বৈদ্যুতিন গ্রন্থরূপের সঙ্গে সঙ্গে জপসূত্রম্-এর একটি মুদ্রিত গ্রন্থরূপ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেজন্যই এই সুকঠিন কাজ হাতে নেওয়া। প্রথম ভাগটি প্রকাশের পর এই দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশিত হল। এরপর আরও একটি ভাগ প্রকাশিত হবে। জপসূত্রম্‌কে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সবকটি ভাগের পাঠই অবশ্যপ্রয়োজন, তবেই জপসূত্রম্-পাঠ সম্পূর্ণ হবে। বিশ্বাসী ও সংশয়ী উভয় পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি আদরণীয় হবে, আশা করি। বিশ্বাসীদের সাধনপথে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠুক এই গ্রন্থ। স্বামীজির বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সাবলীল চলন—প্রাচীন শাস্ত্র থেকে শুরু করে তাঁর সমকালীন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখার তুলনামূলক মেধাদীপ্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সংশয়ীর কৌতূহল নিরসন করুক। আমাদের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধক হোক জপসূত্রম্।

জানুয়ারি ২০১২ দেবজ্যোতি দত্ত
কলকাতা ৭০০০০৯

পুনশ্চ: গ্রন্থটির মুদ্রিত পূর্ব সংস্করণের বানান যথাযথ রাখা হয়েছে। কেবল মুদ্রণপ্রমাদগুলির সংশোধন করা হয়েছে এবং ‘রেফ’-এ দ্বিত্ব বর্জিত (সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত) হয়েছে।

‘প্রকাশকের কথা’, ‘প্রসঙ্গকথা’, ‘জপসূত্রমের সূচনা’ এবং ‘স্বামীজির কথা’ তে কেবল আধুনিক বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গকথা

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী (পূর্বাশ্রমে অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়) রচিত 'জপসূত্রম্' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপরে প্রায় দশ বছর ধরে গ্রন্থটির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খণ্ড ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ (ষষ্ঠ) খণ্ডটি প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩৬৬-তে। 'জপসূত্রম্'-এর সব কটি খণ্ডের প্রকাশক ছিলেন স্বামীজির শিষ্য আমার পিতৃদেব ঁকালীপদ মৈত্র। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী লোকান্তরিত হন ২০শে অক্টোবর ১৯৭৩ সনে। স্বামীজি লোকান্তরিত হওয়ার পর কিছুদিন গ্রন্থটি প্রকাশিত থাকলেও ধীরে ধীরে এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। স্বামীজির ভক্ত এবং শিষ্যদের প্রচেষ্টায় প্রথম দুটি খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ হলেও অন্য খণ্ডগুলি যথার্থই অপ্রাপ্য হয়ে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে।

তিন-চার বছর আগে আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু এবং স্বামীজির গুণগ্রাহী শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীর মতো অনন্যসাধারণ এবং বিরলপ্রতিভা মনীষীর স্মৃতিরক্ষার্থে বিশেষ কিছুই করা হয়নি। আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব কিনা। অরবিন্দবাবুর চিঠি পড়ার পরে মনে হয়েছিল যে স্বামীজির স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হতে পারে 'জপসূত্রম্'-এর পুনর্মুদ্রণ। আবার এই কাজের জটিলতা এবং বিপুল ব্যয়ভারের কথা চিন্তা করে মনে হয়েছিল যে এটা সম্ভবপর নয়। মুদ্রণ ব্যয়ভার ছাড়া এই রকম কাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই গ্রন্থের অক্ষরবিন্যাস করা এবং নির্ভুল প্রুফ-রিডিং। কারণ সামান্যতম ভুল (বানান এবং অন্যবিধ) থাকলে এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। মুদ্রণপ্রমাদযুক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা স্বামীজির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশেরই নামান্তর হবে। এই পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল যে যথার্থ পরামর্শ দিতে পারেন দু-জন। প্রথম জন হলেন স্বামীজির শিষ্যা শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় (বুলুদি) এবং দ্বিতীয় জন হলেন প্রীতিভাজন ও বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় (সাহিত্য সংসদ প্রকাশনার কর্ণধার)। শ্রীমতী প্রীতি

চট্টোপাধ্যায় সবকিছু শুনে আশ্বাস দেন যে এইরকম কাজ আরম্ভ করলে প্রুফ দেখার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিতে রাজি আছেন। শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় গ্রন্থের অক্ষরবিন্যাসের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয় যে, নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কম্পিউটার-এ পাঠযোগ্য বৈদ্যুতিন বই (e-book) আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দু-টি সুবিধা এতে পাওয়া যাবে। প্রথমত, মুদ্রণ ব্যয় অনেক কম হবে এবং দ্বিতীয়ত, চিরাচরিত গ্রন্থ হিসাবে মুদ্রণ করার প্রয়োজন হলে অতি সহজেই অল্প সময়ে সেটা করা যাবে। কারণ নতুন করে অক্ষরবিন্যাস অথবা প্রুফ-রিডিং-এর প্রয়োজন তখন থাকবে না। আর একটি সুবিধাও এই সঙ্গে পাওয়া যাবে, বানান অথবা অন্যবিধ ভুল পরে যদি চিহ্নিত হয় তবে সহজে সেটি ঠিক করা যাবে। চিরাচরিত গ্রন্থের থেকে e-book-এর মূল্য অনেক কম হবে। এইরকম চিন্তাভাবনা করে আমরা যোগাযোগ করি অধুনাপ্রয়াত সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে। কারণ প্রথমাবধি তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন (মূল গ্রন্থে পাঠক বিস্তারিত তথ্য পাবেন)। সবকিছু শুনে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাশীঘ্র কাজ শুরু করার পরামর্শ প্রদান করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই কাজের পরিসমাপ্তি আমরা তাঁকে দেখাতে পারলাম না। এইভাবে কাজ শুরু হয়। যখন পঞ্চম খণ্ডের কাজ চলছে সেই সময়ে শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন যে e-book-এর সঙ্গে চিরাচরিত গ্রন্থ হিসাবেও 'জপসূত্রম্'-কে তিনি মুদ্রিত করে দেবেন এ-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর কথায় আমরা যথার্থই অবাক হয়ে যাই, কারণ এরকম পরিকল্পনা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। কোন মহাশক্তি কার মধ্য দিয়ে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন সেটা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আমরা এখানে করলাম না—সেকাজের যোগ্যতাও আমাদের নেই, মূল গ্রন্থে পাঠক বিস্তারিত তথ্য পাবেন। নবপর্যায় 'জপসূত্রম্' প্রকাশের কাজ কীভাবে শুরু হয়েছিল সে-ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু তথ্য এখানে আমরা উল্লেখ করলাম। আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। স্বামীজি বর্তমান থাকাকালীন ইংরেজি ভাষায় Japasutram শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটিকে অনেকে বাংলা জপসূত্রম্-এর অনুবাদ বলে মনে

করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই গ্রন্থে স্বামীজির লেখা আছে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে। গ্রন্থটি স্বামীজির নামেই প্রকাশিত। আজকের কম্পিউটার-এর যুগে ইন্টারনেট-এ Japasutram এই নামে সন্ধান করলে ইংরেজিতে লেখা বইটির সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল গ্রন্থের (সংস্কৃতে রচনা বাংলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ) সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থের কোনো তুলনা করা সম্ভব নয়। মূল গ্রন্থটি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কালক্রমে ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থটিকে যাতে সকলে মূল 'জপসূত্রম্' বলে মনে না করেন আমাদের এই প্রচেষ্টার পিছনে সেটাও একটা বড়ো কারণ।

শেষে একটিমাত্র জিনিস-এর উল্লেখ করে আমাদের কথা শেষ করব। শাস্ত্রে 'অপৌরুষেয়' গ্রন্থের কথা আমরা শুনেছি। 'জপসূত্রম্' রচনা হবার সময়ে অনেকে এটা প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রদ্ধাবান পাঠক সেটা এখন প্রত্যক্ষ না করলেও অন্তরে উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

'জপসূত্রম্' গ্রন্থের নব পর্যায় প্রকাশনার কাজে যুক্ত সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। স্বামীজির আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা তাঁর কাছে করি।

৭৭ যতীন দাস রোড
কলকাতা ৭০০০২৯
পৌষ সংক্রান্তি ১৪১৮

শেখর মৈত্র
মনোজ মৈত্র

নিবেদন

'জপসূত্রম্' তৃতীয় খণ্ড এত শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে বলিয়া আশা করা যায় নাই। ইহার কৃতিত্ব আমাদের প্রাপ্য নয়। ইহা সম্ভব হইয়াছে শুধু সেই মহাশক্তির অনুগ্রহে যিনি পূজ্যপাদ স্বামিজীর মধ্য দিয়া ভারতীয় আর্যবিজ্ঞানকে যেন পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া আজিকার নানামতবিভ্রান্ত আর্ত মানবের জন্য প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।[১] ইহার পাবনী ধারায় অবগাহন করিতে আসিয়া অনেককেই অনুযোগ করিতে শুনি: 'জল বড় গভীর—প্রবেশ করিয়া তল পাই না, একটুতেই হাঁপাইয়া উঠি, তাই আর নামিতে ভরসা হয় না'। অথচ যাঁহারা একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া ধৈর্যে বুক বাঁধিয়া এই অক্ষয় সরোবরে নামিয়াছেন তাঁহারা এক আশ্চর্য ও অভিনব অমৃতের আস্বাদনে আপ্যায়িত হইয়াছেন, ইহাও তাঁহাদেরই উচ্ছ্বসিত উক্তিতে শুনিতে পাই। অনেকের সাধনায় নীরস যান্ত্রিক চক্রগতির স্থানে ইহা এক সরস ও সোল্লাস অগ্রগতি আনিয়া দিয়াছে, তাহাও জানি। ইহাতেই গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা। তবু দুঃখ যে গভীরের পিয়াসী সর্বত্রই স্বল্প; সরল ও সহজের বায়না দিয়া আমরা সেই ছলে তরল ও লঘুরসেরই কাঙাল হইয়া ফিরি। উচ্ছ্বাসের মাদকতায় কিছুক্ষণ মন ভুলিলেও অভয়ের আশ্বাস সেখানে মিলে না। তাই আপন সত্তার গহনে গভীরের রস আস্বাদনেরও যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়, সেজন্যও প্রাথমিক প্রয়াস নিজের দিক্ দিয়া আসা প্রয়োজন। ইহাকেই গুরুশাস্ত্রমহাজনেরা 'আত্মকৃপা' বলিয়াছেন, পূজ্যপাদ স্বামিজীও

---

[১] এই গ্রন্থ বিরচন সম্বন্ধে স্বামীজির নিজের শ্লোক কথা—

চতস্রো হি গিরো গাবো দোগ্ধা গোপাল-গীঃপতিঃ।
প্রত্যগ্‌বৎসঃ প্রধীশ্রেষ্ঠং দুগ্ধং জপরসায়নম্॥
বৈখরী প্রভৃতি কামদুঘা, চারিবাক্ চারি পয়স্বিনী।
সাক্ষাদ্ গোপাল গীষ্পতি তুমি, বাঁধি ছন্দে দুহিলে আপনি॥
ছন্দে বাঁধি মাতার চরণে, প্রত্যক্ পিয়াসী বৎসটিরে।
প্রধী জনে দিলে প্রিয়াৎপ্রিয়, জপরসায়ন (কবোষ্ণ) দুগ্ধধারে॥

নানাস্থলে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন : ‘আগে প্রয়াস, পরে প্রসাদ, আগে race, পরে grace’ ইত্যাদি। অমৃত কোথাও সুলভ নয়, আপন অন্তর-সমুদ্র মন্থনেই তা’কে উদ্ধার করিতে হয়। মন্থনের প্রয়াসে ও ক্লেশে প্রথমটা মনে হয় সবই ‘বিষমিব’, বড় তিক্ত ও বিরস, শেষে রসনির্ঝরের উৎসমুখ উন্মুক্ত হইলে অমৃতের অভিষিঞ্চনে সব জুড়াইয়া যায়। মহাজনের গ্রন্থকেও এইভাবেই একান্ত অভিনিবেশ ও অপার ধৈর্য ধরিয়া মন্থন করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে শেষে তা’র মর্মবাণীটি যেন নিজেকে স্বয়ং উদ্‌ঘাটিত করে, কানে কানে নিভৃতে শুনাইয়া যায়। উপনিষদের রহস্য-ভাষায়, বাক্ তা’র আপন অমৃতটি তা’র জন্য দোহন করিয়া আনিয়া তা’কে পান করান। তাই এ গ্রন্থের আপাত দুরূহতায় আতঙ্ক বোধ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দূরে পিছাইয়া না গিয়া ইহার নিকটে আসিয়া ইহার গভীর ভাবতরঙ্গের মহাকল্লোলধ্বনি কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই।

আর কি বিচিত্র সে কল্লোল! মহা ওঁকারের মতই আশ্চর্য ও মধুর ইহার ধ্বনি। কত না বিচিত্র রাগের আলাপন, কত না সুরের অপরূপ অনুরণন ইহাতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে! যদিও একটিই মূল সুর সমগ্র গ্রন্থ জুড়িয়া বাজিয়া চলিয়াছে, তবু কোথাও এতটুকু পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমি মনকে পীড়া দেয় না—ইহাই বিচিত্র। কোথাও কোমল পর্দায় স্নিগ্ধ সুমিষ্ট রসের উল্লাসময় রূপায়ন, আবার কোথাও রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ নব্যবিজ্ঞান বা নব্যন্যায়ের অবচ্ছেদাদি দুর্ধর্ষ পরিভাষার কঠোর শৃঙ্খল-ঝঙ্কার! উভয়েতেই তাঁর সমান অধিকার, সহজ সাবলীল বিহার। যদি পুরাপুরি এ মহাসঙ্গীতের সব সুরগুলির পর্দা নাও চিনি বা কানে ধরিতে না পারি তবু এই পরমগুণীর আশ্চর্য আলাপন বিমুগ্ধ হইয়া শুনিয়া গেলেও হৃদয় ও মনের অনেক কালিমা ধুইয়া যায়, কানও জুড়াইয়া যায়, প্রাণও শীতল স্নিগ্ধ হয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এবার গ্রন্থের প্রারম্ভে ভারতীয় সাধন-বিজ্ঞানের বাণীমূর্তি পূজনীয় আচার্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের একটি অমূল্য নিবন্ধ ভূমিকারূপে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছি। পূর্বখণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছিলাম যে তিনি ‘জপসূত্রম্’ হাতে পাইয়া পুলকিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন এবং নিজে হইতেই ইহার একটি বিস্তৃত আলোচনা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যদিও এবার মূল গ্রন্থের সূত্র ধরিয়া তিনি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিবার সময় ও সুযোগ পা’ন

নাই, তবু সংক্ষেপে মূল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টির তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে সমর্থন ও পরিপোষণ করিয়া দিয়া সাধারণ পাঠকের ইহাতে প্রবেশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।[২] এজন্য তাঁহার কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

পূর্বখণ্ডের মত এবারও পরিশিষ্টে আত্মপ্রচারবিমুখ পরম জ্ঞানসাধক আমার আচার্যদেব পূজনীয় শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'অর্দ্ধোদয়' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ সংযোজন করা হইয়াছে। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের বিস্তৃত পরিচয় সকলে একদিন পাইবেন আশা করি।

গ্রন্থের কলেবর এবার কিছু দীর্ঘ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের সব ক'টি পাদই এই খণ্ডে শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদও সমাপ্তপ্রায় হইয়াছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত সূচীপত্রও প্রথমে দেওয়া হইল। এবারও অনিবার্য হইল, নানা কারণে, গ্রন্থে-কলেবরে সামান্য কিছু ভ্রম-প্রমাদ, তবে অর্থের বোধক না হইয়া বাধক হইবে না, আশা করি।

পরিশেষে পূজ্যপাদ স্বামিজীর মানস-মুকুরে যে চৈতন্য-চন্দ্রিকার অপরূপ উদ্ভাসনে এই নিত্য নব জ্ঞানের বিকিরণ হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে তাঁরই রচিত একটি বন্দনা-গীতির সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বরণ করি :

আগমাক্ষরনক্ষত্রলাজমঙ্গালরোচিষম্।
চিন্নভঃ কৌমুদী-চেতঃ-সরঃ-কুমুদিনীমুদম্।
বৃণ্বে সৎস্মিতসারং মে বল্লভাস্যসুধাকরম্॥
তারকাবীথীর ছলে, আগমের মন্ত্রবর্ণরাজি।
যার রুচিরোচিষেরে, ডালে লাজ মঙ্গাল অঞ্জলি॥

---

[২] যথা. একটিমাত্র দৃষ্টান্তরূপে, শাস্ত্ররসিক সুধী পাঠক, বৈখরী প্রভৃতি সম্বন্ধে (মূলগ্রন্থে নানাস্থলে যেগুলি আলোচিত ও ব্যাখ্যাত), এই কয়েকটি শ্লোক ভাবনা করিবেন—

ত্রয়ী বাক্প্রাণচিত্তানাং নির্ব্বাহয়তি যাঽধ্বরম্।
বাঙ্মুখ্যা বৈখরী তত্র প্রাণমুখ্যা চ মধ্যমা॥
সত্ত্ববিশালধীমুখ্যা পশ্যন্তী চ পরা পরা।
ক্রিয়াদিভ্যঃ স্বতন্ত্রা যা জপ্তুর্ষিশ্চ পরো যতঃ।
কল্পেক্ষণতপঃ কামা ঋষিচ্ছন্দাঽধ্বদেবতাঃ॥ ‡

চিদাকাশে বিকিরণ, চির যার কনককৌমুদী।
চিত-সরসীতে মোর, কুমুদিনী-আনন্দ-দীপালী॥
চিদানন্দে সম্প্রসাদ, সত্যস্মিত অমৃতের সার।
বরি মম বল্লভের, (সেই) মুখশশিরুচি বারংবার॥

মহালয়া
১৩৬০

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
(অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ)

---

‡ (২) এর ভাবানুবাদ—অধ্বর (জপযাগের) নির্বাহয়িত্রী ত্রয়ী—বাক্, প্রাণ এবং চিত্ত। এ ত্রয়ীর সম্পূর্ণ সহযোগ চাই। তন্মধ্যে (ব্যক্ত) বাকের মুখ্যতায় বৈখরী (বাচিক, উপাংশু মানস); (মুখ্য) প্রাণের প্রধানতায় মধ্যমা; আর সত্ত্ববিশাল বুদ্ধির প্রধানতায় পশ্যন্তী। এ তিন ক্রিয়া-কারক-ফল নিষ্পাদ্যা। স্থূল, সূক্ষ্ম, অপর কারণভূমির প্রান্ত পর্যন্ত এ তিনের গতি। কিন্তু অব্যক্ত সমতা সমগ্রতার কারণভূমি এ তিনেরও পারে। সে ভূমিতে পরা। ইহা পরকারণতার স্থল। এ স্থলে, পরাবাক্ সম্বন্ধে (বিমর্শে) পরতত্ত্ব স্বয়ংই জপকর্তা এবং ঋষি, যথা প্রণবের। এবং পরতত্ত্বের অনির্বাচ্য ঈক্ষণ এখানে ঋষি, কাম দেবতা, সঙ্কল্প ছন্দঃ, আর তপঃবিনিয়োগ। সুতরাং এ দৃষ্টিতে পরাবাক্ পরতত্ত্বের সাক্ষাদ্ বিমর্শরূপা বাক্—বাঙ্ময়ী পরকারণভূমি। অপর, পর এবং পরমে ভেদ আছে। একভাবে পশ্যন্তীর গতি এ তিনই ব্যাপিয়া সম্ভাবিত হয়।

ভূমিকা

(১)

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 'জপসূত্রম্' নামে একখানা উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া জিজ্ঞাসু সাধক ও বিদ্বৎসমাজের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মূল সূত্রাকারে রচিত, সূত্রের উপর সূত্রব্যাখ্যারূপ বার্তিক আছে—উহা কারিকাকারে নিবন্ধ। সূত্র ও বার্তিক উভয়ই প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষাতে রচিত। আলোচিত বিষয়ের তাৎপর্যবিবরণ চিন্তাশীল তত্ত্বান্বেষী পাঠকবর্গের বোধসৌকর্যের জন্য বিশদরূপে ও বিস্তারিত ভাবে বাঙ্গলা ভাষাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাকে জপসূত্রের ভাষ্য মনে করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মসূত্র, শিবসূত্র, শক্তিসূত্র, স্বরসূত্র, কৌলসূত্র, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতির ন্যায় জপসূত্র একটি সূত্র গ্রন্থ। গ্রন্থখানা চারি অধ্যায়ে এবং প্রতি অধ্যায় চারি পাদে বিভক্ত। সূত্র সংখ্যা পাঁচশত (৫০০) হইতে অধিক এবং কারিকা সংখ্যা উহার প্রায় চতুর্গুণ। এই মহাগ্রন্থের দুইখণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। এই তিন খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদে ১২০টি সূত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম বাইশটি সূত্র মাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদি এই প্রকার বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ আলোচিত হওয়া সম্ভবপর হয় তাহা হইলে বর্তমান আয়তনের অনুরূপ আরও নয় খণ্ড পুস্তকের প্রকাশন আবশ্যক হইবে। অধ্যাত্ম সাধন বিষয়ে একটিমাত্র তত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ বিশাল ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যে আছে বলিয়া জানা যায় না।

গ্রন্থকার গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক, বৈদিক ও তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও সাধন পদ্ধতির মর্মজ্ঞ, আধুনিক বিবিধ বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের তত্ত্ববিৎ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও নবীন উভয় প্রকার ভাবধারার সহিত সম্যক্ পরিচিত, তীক্ষ্ণদর্শী, বিশ্লেষণপটু এবং লিপিকুশল সুলেখক;—সর্বোপরি তিনি স্বয়ং সাধন পথের বিচিত্র অনুভবসম্পন্ন চলনশীল পথিক। তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা শাস্ত্রমূলক এবং

মহাজনগণের অনুভব ও সদ্‌যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের একটি অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব আছে।

জপসাধনা অধ্যাত্ম সাধনবিজ্ঞানের মধ্যে একটি সুপরিচিত সাধনা হইলেও ইহার নিগূঢ় রহস্য সাধারণের পক্ষে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা মাত্র। বৈদিক, পৌরাণিক, স্মার্ত, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সাধনাতেই জপের মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। সুফী সাধক ও ফকীরদের মধ্যে এবং খৃষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে জপের প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। যোগিগণ জপের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—তাঁহারা বলেন ইহা ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত স্বাধ্যায়েরই প্রকার বিশেষ মাত্র। সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি অনুষ্ঠান হইলে ইহার ফলে পরমাত্মার প্রকাশ ও ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে এবং অন্যান্য বহু আনুষঙ্গিক ফলের উদয় হয়। যে নাদানুসন্ধানের মহিমা হঠযোগী, রাজযোগী, মন্ত্রযোগী ও লয়যোগী সমভাবে ঘোষণা করিয়া থাকেন তাহাকে জপেরই একটি বিশিষ্ট অবস্থার নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করা চলে। প্রাচীন শাব্দিকগণ ইহাকে 'বাগ্‌যোগ' বলিয়া বর্ণনা করিতেন এবং "ইয়ং হি মোক্ষমাণানামজিহ্‌মা রাজপদ্ধতিঃ" অর্থাৎ মুমুক্ষু মনের পক্ষে ইহাই সরল রাজমার্গ বলিয়া ইহার সর্বোপযোগিতা স্বীকার করিতেন। মধ্যযুগের সন্তগণ 'সুরতশব্দযোগ' নামক যে যোগপন্থার অনুসরণ করিতেন তাহা বাগ্‌যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। যোগের কঠিন প্রক্রিয়া, যজ্ঞের জটিল বিধান, জ্ঞানমার্গের বিচারবহুল গভীর ভাবনা এবং ভাবভক্তির রসময় উল্লাস, সকল, সাধকের পক্ষে সুলভ নহে। কিন্তু জপ সকলের পক্ষেই অল্পায়াসসাধ্য। অথচ ঠিকভাবে করিতে পারিলে উহা হইতে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সকল সাধনারই ফল লাভ সহজ হয়। শুধু তাহাই নহে, সবিশেষ ভাবের পূর্ণতা এবং যাবতীয় বিশেষের উপশম অর্থাৎ ব্রহ্মের মহান্‌ ও পরম রূপ নাদাশ্রয়বশতঃ জাপকের পক্ষে যতটা সুগম হয় অন্য সাধকের পক্ষে ততটা হয় না।

গ্রন্থকারকে গ্রন্থমধ্যে প্রস্তুত বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য আনুষঙ্গিকভাবে বহু তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছে। মন্ত্র, যন্ত্র এবং তন্ত্র কাহাকে বলে, মন্ত্রজপরূপা ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কি ভাবে হওয়া উচিত, উহার চরম লক্ষ্য কি, ধ্বনি (নাদ), সংখ্যা ও ভাব বা অর্থের, অর্থাৎ বাক্‌, প্রাণ ও মনের বা অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রের স্বরূপ ও প্রকারভেদ কি, জপের অন্তরায় কি এবং অন্তরায় নিবৃত্তির উপায় কি—এই জাতীয়

বহু প্রশ্নের সমাধান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সপ্তব্যাহৃতি রহস্য ও মহামায়াতত্ত্ব প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের সহিত সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এ আলোচনার তুলনা নাই। চিৎশক্তি শুধু চিন্মাত্র বা প্রকাশ মাত্র নহে—উহা চিতের নিজেকে বিশেষ বিশেষভাবে ঈক্ষণের সামর্থ্য। উভয়ই স্বরূপতঃ এক হইলেও উভয়ে বৈলক্ষণ্য আছে। এই বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়াই উভয়ের অদ্বয়তা স্বীকার্য। বিমর্শহীন প্রকাশ প্রকাশমান হয় না বলিয়া অপ্রকাশ বা অসৎকল্প। কিন্তু প্রকাশ ত বিমর্শহীন হয় না। তাই প্রকাশের স্বপ্রকাশতা ও সদ্‌ভাব অক্ষুণ্ণই থাকে। সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধভাব বিকল্প মাত্র—নির্বিকল্প বা অদ্বয়ই তত্ত্বাতীত পরম তত্ত্ব। গ্রন্থকার আগম ও উপনিষদের সারাংশ স্বকীয় অপূর্ব যুক্তি ও বিবেচন-সরণি দ্বারা এমন মনোজ্ঞভাবে সুকৌশলে স্থাপন করিয়াছেন যে উহা মন্দবুদ্ধি পাঠকেরও বোধগম্য না হইয়া পারে না। তবে আন্তরিকতা ও মনোনিবেশ আবশ্যক।

আর একটি বিষয়ে দুই একটি কথা বলা উচিত মনে হইতেছে। বর্ণমাতৃকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে প্রাণের স্পন্দনের তত্ত্বনির্ণয় করা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্রে এই জন্য মাতৃকার বিবেচন করা হইয়াছে। প্রাচীনকালের কোন কোন মূল আগম গ্রন্থে বর্ণমালার বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব গুপ্ত, স্বতন্ত্রানন্দনাথ প্রভৃতিও এ বিষয়ে আপন আপন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান সময়েও কোন কোন মহাত্মা অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে জপসূত্রকার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সমন্বয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনার অবসরে কোন মনীষী তুলনামূলক রীতিতে প্রাচীন ভারতের বর্ণবিজ্ঞান রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিবেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন আগমে সর্বত্রই এই বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

(২)

শাস্ত্রে আছে—শব্দ ব্রহ্মে নিষ্ণাত হইলে পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। শব্দাতীত পরম পদের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে শব্দ আশ্রয় করিয়াই শব্দরাজ্য ভেদ করিতে হয়। সমগ্র বিশ্ব শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং শব্দেই বিধৃত। "শব্দেষ্বেবাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী", "বাগেব বিশ্বা ভুবনানি যজ্ঞে বাচ ইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যম্" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে শব্দই জগৎ সৃষ্টির মূল। সৃষ্টির বাহিরে যাইতে হইলেও

বাইশ

শব্দই একমাত্র আলম্বন। সেইজন্য জপসাধনাতে শব্দকে ধরিয়াই শব্দাতীত পরব্রহ্ম পদে যাওয়ার উপদেশ আছে।

বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা ভেদে চারি প্রকার বাকের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৈখরী বাক্ শব্দের নিম্নতম স্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকে ধরিয়া ক্রমশঃ পরাবাক্ পর্যন্ত উঠিবার এবং পরে উহাকেও অতিক্রম করিবার প্রয়োজন আছে। বৈখরী ইন্দ্রিয়গোচর সমগ্র স্থূল বিশ্বে ও স্থূল দেহে অনন্ত প্রকারে তৎ তৎ স্থান অনুসারে কার্য করিতেছে। 'বৈখরী বিশ্ববিগ্রহা'। ইহাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে মনুষ্য স্থায়ীভাবে বহির্মুখ বৃত্তি পরিহার করিয়া আন্তরবৃত্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারে না।

আত্মা স্বরূপতঃ পূর্ণপ্রকাশাত্মক পরমেশ্বররূপ, স্বতন্ত্র ও ভোক্তা হইলেও স্বেচ্ছাপূর্বক জীবভাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ভোক্তৃভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। আত্মাতে অখিল শক্তির অভেদে সমন্বয় আছে বলিয়া আত্মার পূর্ণাহম্ভাব স্বভাবসিদ্ধ। 'অ' হইতে 'হ্' পর্যন্ত যাবতীয় বর্ণ বা কলা পরস্পর ও আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অখণ্ডভাবে স্ফুরিত হওয়াই আত্মার পূর্ণাহন্তা। ইহারই নামান্তর চৈতন্য, বিমর্শ, স্বাতন্ত্র্য বা ঐশ্বর্য। এই সকল অকারাদি বর্ণের বাচ্য অনুত্তরাদিবিমর্শ আত্মার নিজবিমর্শেরই স্বরূপভূত। অখণ্ডস্থিতিতে এ সব এক ও অভিন্ন রূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আত্মা স্বেচ্ছাপূর্বক সৃষ্ট্যুন্মুখ হইলে তাঁহার স্বরূপাশ্রিত নিজামর্শের লেশরূপে অনুত্তরাদি বাচক পূর্বোক্ত অকারাদি বর্ণ উদ্ভাবিত হয়। অদ্বৈত স্থিতিতে যে সকল কলা অভিন্নভাবে আন্তর শব্দ বা স্বভাবরূপে বিদ্যমান থাকে তাহারা তৎস্বরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও সৃষ্টির উন্মেষ দশাতে যেন অংশতঃ বিভক্তরূপে ক্রমশঃ ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট বর্গশক্তি ও অ আ প্রভৃতি পঞ্চাশৎ রুদ্রশক্তিরূপে অবতীর্ণা হয়। পরে ঐ সকল শক্তি হইতে পদ বাক্যসমূহরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রশক্তি সকল আবির্ভূত হয়। অকারাদি, আত্মার নিজ বিমর্শস্বরূপ ও স্বাভিন্ন হইলেও, অজ্ঞানাবস্থাতে নিজাত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় বলিয়া কলা বা অংশ নামে আখ্যাত হয়। ইহারাই মাতৃকাশক্তি। ইহাদের দ্বারা আত্মার স্বীয় ঐশ্বর্য বা বিভব (আচার্য শঙ্কর দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে **মহাবিভূতি** বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছেন) বিলুপ্তপ্রায় হয়। কলা আত্মস্বরূপ হইতে উদ্ভূত হইয়া আত্মার ঐক্যভাবকে ঢাকিয়া রাখে। তখন শিবরূপী আত্মা জীব বা পশুরূপে আবির্ভূত হন। ইহাই তাঁহার স্বরূপসঙ্কোচ বা অণুভাবপ্রাপ্তি। এই অণুরূপী প্রমাতা তখন পূর্ববর্ণিত অষ্টবর্গীয় ব্রাহ্মী-আদি শক্তি, অকারাদি রুদ্রশক্তি ও তদুত্থ পদবাক্যাদিময়

অসংখ্য ক্ষুদ্র শক্তির ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। মাতৃকাসকল অণুজীবের প্রতি সংবেদনেই অন্তঃপরামর্শন দ্বারা স্থূলসূক্ষ্ম শব্দানুবেধ করে ও বর্গ বর্গী প্রভৃতি দেবতানিচয়ের অধিষ্ঠানের দ্বারা চিত্তে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ, দ্বেষাদি ভাব বা বৃত্তি সমূহ উদ্ভাবিত করে। এই প্রকারে আত্মার অসঙ্কুচিত স্বাতন্ত্র্যময় চিদ্‌ঘনরূপ আচ্ছন্ন হয় ও দেহাত্মভাব পারতন্ত্র্য ও পাশবন্ধনের সূত্রপাত হয়।

মাতৃকার এই লয়বিক্ষেপকারক প্রভাব বৈখরী বাকে অত্যন্ত প্রস্ফুট। চিদুন্মেষের অভাববশতঃ সাধারণ মনুষ্য বৈখরীভূমিতে আবন্ধ থাকে—ইহাকে লঙ্ঘন করিয়া মধ্যমাতে প্রবেশ করিতে পারে না। বৈখরী বাকের কার্যক্ষেত্র স্থূল হইলেও উহার প্রভাব অশুদ্ধ মনোময় স্তর, সূক্ষ্মভূত ও লিঙ্গ শরীরেও লক্ষিত হয়। কালের আবর্তনে পর্যায়ক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। একবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে গতি হয়, পুনর্বার সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রত্যাগমন হয়, তদনন্তর স্থূল হইতে পুনরায় সূক্ষ্মের দিকে ধারা বহিতে থাকে। এইভাবে নিরন্তর স্থূল ও সূক্ষ্মের আবর্তন ঘটিয়া থাকে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আবর্তন এই মহা আবর্তনেরই একদেশ মাত্র। গতির এই আবর্তনভাব বৈখরী ভূমির বৈশিষ্ট্য। মলিন বাসনা বশতঃ গতির বক্রতা সম্পন্ন হয় বলিয়া নিম্নভূমিতে আবর্তন স্বাভাবিক। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার একমাত্র উপায় গুপ্তমার্গ অবলম্বনে সরল গতির সাহায্যে ঊর্ধ্বদিকে ক্রমিক আরোহণ। মধ্যমা ক্ষেত্র হইতেই ইহার প্রারম্ভ হয়।

মধ্যমা ভূমিকে মন্ত্রময়ী ভূমি বলা হয়, কারণ মন্ত্ররূপেই মধ্যমা বাক্ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মনের শোধন ও তাহার ফলে বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের সামর্থ্যলাভ ক্রমশঃ এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে। মনুষ্যকণ্ঠ হইতে বৈখরী বাক্ উত্থিত হয়—উহার মূলে মানসিক চিন্তা (চেতন ও অবচেতন উভয়ক্ষেত্রে) ও মনোগত ভাব বা অর্থ জড়িত থাকে। যোগিগণ যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সাঙ্কর্যের কথা বলিয়া থাকেন তাহা এই বৈখরী ভূমির শব্দকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে হইবে। স্মৃতিপরিশুদ্ধি দ্বারা সাঙ্কর্য্য পরিহার বৈখরীভূমি হইতে মধ্যমা ভূমিতে প্রবেশের আনুষঙ্গিক রূপ মাত্র। বাকের সঙ্গে প্রাণশক্তি এবং মনঃশক্তি অবিনাভূতভাবে বিদ্যমান আছে এবং প্রাণসূত্র ধরিয়া পৃথিব্যাদি পাঁচটি মহাভূতেরও সম্বন্ধ আছে। তা ছাড়া, চিতের সম্বন্ধ ত আছেই। তবে বৈখরী স্তরে এই চিদংশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে। ইহার আভাস সাধারণতঃ পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা তখন থাকিয়াও না থাকার সমান। এই জন্য

এই ভূমিতে মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় এই নিম্নবর্তী তিন কোষের দিকে আকর্ষণ থাকে। মন ও প্রাণের ক্রিয়াসমন্বিত স্থূল দেহের প্রতি আকর্ষণ ইহারই নামান্তর। এইজন্যই এই ভূমিতে দেহাত্মবোধ প্রবল থাকে। বিষয়ের প্রতি আসক্তির তীব্রতাবশতঃ বৈরাগ্য বিবেক প্রভৃতি সুকুমারভাব অভিভূত থাকে। মধ্যমা ক্ষেত্রে নাদময় চিদ্‌রশ্মি নিত্য বিরাজমান। এই সকল রশ্মি স্বরূপতঃ বৈখরী ভূমিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈখরীতে এই সকল অবতীর্ণ হইলে নানাপ্রকার বর্ণও ইন্দ্রিয়গোচর উজ্জ্বল আলোকরূপে প্রতিভাসমান হয়। উহার সঙ্গে চিদনুসন্ধান থাকে না। সেইজন্য সূক্ষ্মতম চৈতন্যের মিশ্র অনুভব বৈখরী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যমাতে না যাওয়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

তাই যে কোন উপায়েই হউক্ বৈখরী হইতে মধ্যমা ভূমিতে উত্থান একান্তই আবশ্যক। এই উত্থান ব্যাপারে একদিকে গুরুশক্তি ও অপরদিকে স্বকীয় প্রযত্ন অপরিহার্য। এই ক্রমিক বিকাশের কার্যে জপসাধন অত্যন্ত সহায়ক। ঈশ্বর প্রণিধান বা ভজন, নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভৌতিক দেহ ও চিত্তের সংস্কারমূলক আত্মশোধন এই উত্থান কার্যে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকে। সাধকের দৃষ্টি এই ভূমিতেই প্রত্যাবর্তিত হইয়া অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ হয়। বৈখরী ভূমিতে লক্ষ্য থাকে বাহিরের দিকে ও নীচের দিকে—অর্থাৎ মূলাধারের দিকে, কিন্তু মধ্যমা ভূমিতে ঐ লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়—তখন লক্ষ্য বাহিরে বা নীচে না যাইয়া অন্তরের বা উপরের দিকে আকৃষ্ট হয়। মূলাধারের পরিবর্তে সহস্রারের বা গুরুধামের দিকে অথবা অখণ্ড নিত্য সত্তার দিকে লক্ষ্য স্থাপিত হয়। বিষয়াসক্তিবর্জিত চিত্ত তখন শুদ্ধ হয়। ভাবনাদি অন্যান্য উপায়েও মধ্যমা ভূমিতে উত্থান হইতে পারে, তবে জপসাধনার সৌকর্য অন্যান্য সাধনা হইতে অধিক। 'মধ্যমা' শব্দের অর্থ যাহা দুইটি প্রান্তের মধ্যবর্তী—এক প্রান্তে দিব্য পশ্যন্তী বাক্ এবং অপর প্রান্তে পাশব বৈখরী বাক্, এই উভয়ের মধ্যে সংযোজক সেতু-স্বরূপ মধ্যমা বাক্ ক্রিয়াশীল। সেইজন্য পশুভাব হইতে দিব্যভাবে আসিতে হইলে এই মধ্যপথরূপী সেতু অবলম্বন করা আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৈখরী বাক্ বা লৌকিক শব্দে চৈতন্যের রশ্মি প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মধ্যমা বাকে উহা প্রচ্ছন্ন নহে, কিন্তু প্রস্ফুট। এই সকল রশ্মি নাদরূপী সূত্র অবলম্বন করিয়া অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই মূলতঃ সবই বীজাত্মক এবং বীজ বিন্দুরূপী কেন্দ্রে নিত্য অবস্থিত। বৈখরী বাক্ যেমন ব্যক্ত,

মধ্যমাকে সেরূপ ব্যক্ত বলা চলে না। কিন্তু ব্যক্ততা মধ্যমাতে আছে—সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ততাও আছে। সেই জন্য অর্থাৎ মধ্যবর্তী বলিয়া মধ্যমাকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়াত্মক বলা হয়।

মন্ত্র চিদ্‌রশ্মিময়। বৈখরীভূমিতে চিদ্‌ভাব গুপ্ত বলিয়া এবং বাক্ অসংস্কৃত বলিয়া বৈখরীবর্ণের মন্ত্রময়তা স্বীকার করা যায় না। তবে স্বরূপতঃ উহার মন্ত্রাত্মতা না থাকিলেও মন্ত্রময় চিদ্‌রশ্মির বাচক বলিয়া বৈখরীবর্ণ হইতে উদ্‌ভূত যাবতীয় স্থূল বিদ্যাকেও 'মন্ত্র' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মীমাংসকগণের মন্ত্রাত্মক দেবতাবাদ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "মন্ত্রাশ্চিন্মরীচয়ঃ। তদ্‌বাচকত্বাদ্ বৈখরীবর্ণ-বিলাসভূতানাং বিদ্যানাং মননাৎ ত্রাণতা।"

মধ্যমার ওপারে পশ্যন্তী বা দিব্যবাক্। ইহা একপ্রকার অব্যক্ত। এই বাক্ হইতে নিখিল দেবতানিচয় প্রকাশিত হন—এই সকল দেবতা সর্বজ্ঞ এবং সমগ্র বিশ্বের কার্যে আপন আপন অধিকার অনুসারে ব্যাপৃত। শুধু দেবতার প্রকাশ পশ্যন্তীবাকের কার্য নহে—বিষ্ণুর পরমপদ পর্যন্ত পশ্যন্তীভূমি হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। সূরিগণ যে পরমপদ নিরন্তর দর্শন করেন তাহা এই ভূমি হইতেই জানিতে হইবে। বস্তুতঃ পশ্যন্তীবাকেই কারণস্থ চৈতন্যের স্ফূর্তি হয়—ইহাই দেবতার স্বরূপ। প্রাচীনকালে মন্ত্রসাক্ষাৎকারের ফলে যে ঋষিত্বলাভ হইত তাহা এই পশ্যন্তীভূমি লাভের ফল। ইহাই আত্মার 'অমৃত কলা'—"বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্"। পশ্যন্তীর স্বরূপ দর্শন হইলে অধিকার নিবৃত্তি হয়— "তস্যাং দৃষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ত্ততে।" এক হিসাবে দেখিতে গেলে পশ্যন্তীর পরে বাকের আর কোন উচ্চতর অবস্থা কল্পনীয় হয় না। এই জন্যই প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে অনেকে বাক্‌কে ত্রিবিধ (ত্রয়ী বাক্) বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি পশ্যন্তীরও একটী পরাবস্থা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাই কেহ কেহ নামতঃ পরা বাক্ স্বীকার না করিলেও কার্যতঃ 'ত্রয্যা বাচঃ পরং পদম্' বলিয়া প্রকারান্তরে উহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই পরাবাক্ চিন্ময় ও পরম অব্যক্ত। এই ভূমিতে ব্যষ্টিদেবতার প্রকাশ নাই,—সমষ্টি দেবতা বা ঈশ্বর চৈতন্যে সমস্ত বাক্ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই বাক্ সৃষ্টির ঊর্দ্ধতম শিখর হইতে নিম্নতম ভূমি পর্যন্ত সমরূপে ব্যাপ্ত। ইহা ঊর্দ্ধ সহস্রারের সর্বোচ্চ অগ্রভূমি হইতে উত্থিত হইয়া মূলাধার পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ইহা যেমন বলা চলে,

তেমনি ইহা মূলাধারের নিম্নস্থিত মহাকরণ সমুদ্রে প্রকাশমান অধঃ সহস্রার হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধ সহস্রারের দ্বাদশদলে বাগ্‌ভব কূট পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ইহাও বলা চলে। কেহ কেহ এরূপ বলিয়াও থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে ঊর্দ্ধ সহস্রারেরই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এই তিনটি বাকের উদ্‌ভব— তন্মধ্যে একটির (মধ্যমার) বিস্তার নীচের দিকে হৃদয় পর্যন্ত, দ্বিতীয়টির (পশ্যন্তীর) নাভি বা উহার কিঞ্চিৎ নিম্নদেশ পর্যন্ত এবং তৃতীয়টির (পরার) মূলাধার পর্যন্ত। অধ-ঊর্দ্ধ সর্বদেশব্যাপী সৎ রূপ চৈতন্যই পরা বাকের তাৎপর্য। ইহারই নাম নিত্য অক্ষর।

এই অবস্থার পরে আর শব্দের গতি নাই। মধ্যমা বাক্ হইতে এই অক্ষর ব্রহ্ম পর্যন্ত যোগীর গতি শব্দব্রহ্মের অন্তর্গত। অক্ষরব্রহ্ম ভেদ হইলেই পরব্রহ্মের দ্বার খুলিয়া যায়। পরব্রহ্ম শব্দাতীত। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।"

যতদূর পর্যন্ত শব্দের বিকাশ আছে ততদূর পর্যন্তই আকাশ কল্পিত হয়। যেটি নিত্য অক্ষর অথবা সৎ তাহারই নাম পরমাকাশ, যাহাকে বিভিন্ন প্রস্থানে এবং বৈদিক মন্ত্রাদিতেও পরম ব্যোম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। যেটি শব্দাতীত অবস্থা সেখানে আকাশ নাই—সেখানে শক্তি ও শিব দুইটি তত্ত্ব অবিভাজ্য যুগ্মরূপে বিরাজ করিতেছে। যুগলভাব, যামলভাব অথবা যুগনদ্ধভাব শিব-শক্তির এই অবিনাভাবেরই সূচনা করে। সমনা ও উন্মনা শক্তি উভয়ই ব্রহ্মশক্তি—সমনা শক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি বিস্তার করে এবং উন্মনা শিবতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মের বিমর্শহীন বিশ্বাতীত দিকে উন্মুখ হইয়া আছে। শিব-শক্তি অভিন্ন বলিয়া কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ অবস্থান করিতে পারে না। ইহার পর আর তত্ত্ব নাই। সেখানেই তত্ত্বাতীত অদ্বৈত স্থিতি।

কিন্তু এই অদ্বৈতের মধ্যেও দুইটি দিকের সন্ধান পাওয়া যায়—একটি অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দিক্, যাহা বিশ্বাতীত হইলেও সূক্ষ্মতম ধ্যানগম্য বলিয়া আরোপদৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ বর্ণনীয় এবং অপরটি সর্বপ্রকারে নির্বিকল্প ও ধ্যানসমাধির অগোচর। প্রথমাবস্থাতে স্বশক্তি পরিস্ফুট, দ্বিতীয়াবস্থাতে উহা অস্ফুট বা অব্যক্ত, কিন্তু উহা নাই বলা চলে না। বস্তুতঃ এই দুইটি দিক্‌ও অভিন্ন। সেখানে নিষ্কল ও সকলেও ভেদকল্পনার অবকাশ থাকে না। ইহাই পরমাদ্বৈত রহস্য। একই অখণ্ড স্বরূপে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত, "অমাত্র" ও "অনন্ত মাত্র" (মাণ্ডূক্যকারিকা ১.২৯), নিষ্কল ও সকল,

নিষ্ক্রিয় ও অনন্তক্রিয়, অক্ষর ও ক্ষর স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয়রূপে বিরাজ করিতেছে। কাল সেখানে কালাতীতের সঙ্গে এক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

(৩)

পরম পদে প্রবিষ্ট হইয়া স্বভাবের ধারা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে জপ অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। জপের নানা প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই দুইটি প্রধান। যাহাকে শাস্ত্রে বৈখরী জপ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই বাহ্য জপ, ইহা প্রারম্ভিক ক্রিয়া। আন্তর জপ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম। বাহ্য পূজা হইতে যেমন আন্তর পূজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বাহ্য জপ হইতে আন্তর জপ শ্রেষ্ঠ। বিধিপূর্বক নানা প্রকার বর্ণের উচ্চারণই বাহ্য জপের লক্ষণ—ইহাকে আচার্যগণ বিকল্পাত্মক সংজল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি পরম পথের ও পরম পদের অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে ক্রমশঃ বাহ্য জপে বিমুখ হইয়া আন্তর জপে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রথম আরম্ভ অবশ্য বৈখরী হইতেই হইয়া থাকে। কর্তৃত্বাভিমান নিয়াই সঙ্কল্প পূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কণ্ঠ জপই বৈখরী জপের স্থূল লক্ষণ। বাচিক, উপাংশু ও মানসিক—এই তিন প্রকার জপই বৈখরীর অবান্তর ভেদ। এই তিনটি ভেদেই 'জপ করা' ভাবটি থাকে। মানস কর্মও যেমন কর্ম, সেই প্রকার মানস জপও বস্তুতঃ বৈখরী জপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মানস জপ করার মূলে ও কর্তারূপে অহং ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ 'আমি জপ করিতেছি' এই ভাবটি স্ফুট অথবা অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহার পর ধীরে ধীরে অবস্থান্তরের উদয় হয়। তখন কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়— প্রযত্ন দ্বারা জপ করা আর চলে না। কর্মকারিণী নাড়ী সকল কিয়দংশে স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন জপ আপনা আপনি ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ইহার নাম 'জপ হওয়া'। ইহা স্বভাবের জপ। ইহার তিনটি ভেদ আছে। প্রথমে হৃদয়ে জপ হয়, তাহার পর দ্বিতীয়াবস্থায় নাভিতে হয় এবং অন্তে মূলাধারে হইয়া থাকে। হৃদয়-জপকেই মধ্যমামার্গে প্রবেশ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই অবস্থায় নাদ আপনা-আপনি চলিতে থাকে। মধ্যমাতে প্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত শুধু বাহ্য জপে নাদ-শ্রুতি হয় না। বাহ্য জপে মন্ত্রাক্ষরের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ থাকে বলিয়া উহা বিকল্পময়, তাই উহা প্রকৃত মন্ত্র নহে। মধ্যমা ভূমিতে যখন নাদের সহিত মন্ত্র স্বভাবতঃ ধ্বনিত হইয়া উঠে তখনই উহা আন্তর জপ বলিয়া

জানিতে হইবে। আপন-আপন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের সঞ্চার নিরুদ্ধ করিয়া আভ্যন্তর নাদের উচ্চারণ করিতে হয়।

সংযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রোচ্চরেন্নাদমান্তরম্।
এষ এব জপঃ প্রোক্তো ন তু বাহ্যজপো জপঃ।।

পরম ভাবের দিকে যে পুনঃপুনঃ ভাবনা তাহাই আন্তর জপ—নাদের প্রকটাবস্থা।

হৃদয়-কমল মধ্যে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে উপনিষদে হৃদয়াকাশ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ সেই অনাহত প্রদেশে সর্বদাই ভগবতীর আনন্দময় স্বরূপ নাদরূপে পরিণত হইয়া চারিদিকে সংসর্পিত হইতে থাকে। আমাদের মন সাধারণতঃ বহির্মুখ থাকে বলিয়া এই নাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন গুরুকৃপায় মন অন্তর্মুখ হয়, তখন পরিস্ফুটভাবে ইহার পরিচয় উপলব্ধি করা যায়। তাহার প্রভাবে নেত্রে অশ্রুর উদ্গম হয়, সমস্ত শরীরে পুলক বা রোমাঞ্চের সঞ্চার হয় এবং অন্যান্য সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হয়।

শুদ্ধ-বিদ্যা-ভূমিতে স্থিত বিদ্যেশ্বররূপী শ্রীগুরুর মুখ-নিঃসৃত বাণী মধ্যমা-বাক্-রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সহস্রদল কমলের দল হইতে হৃদয় পর্যন্ত এই বাণীর বিস্তার অনুভূত হইয়া থাকে। এই বাণীর প্রভাবে মায়ার আবরণ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে ও সাধকের নিজ স্বরূপ সদ্বিদ্যাযুক্ত হইয়া পুরুষ ও প্রকৃতিকে এক অভিন্ন জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া বোধ করিতে থাকে। নবনাদের ইহা প্রথম নাদ জানিতে হইবে।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। মহর্ষি পতঞ্জলির নির্দেশানুসারে মন্ত্রজপের সহিত মন্ত্রার্থের ভাবনার আবশ্যকতা আছে, ভাবনা ও জপ পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। আগমের রহস্যবিদ্গণ বলেন যে জপের সঙ্গে মন্ত্রের অবয়ব-সমূহে ছয়টি শূন্য, পাঁচটি অবস্থা ও সাতটি বিষুব ভাবনা করিতে হয়। ছয়টি শূন্যের মধ্যে পাঁচটির বর্ণবৈচিত্র্যময় আপন আপন পৃথক্ মণ্ডলাকার রূপ আছে। কিন্তু ষষ্ঠটি অনুত্তর বা মহাশূন্য। প্রথম পাঁচটি শূন্যকে ঠিক নিরাকার বলা চলে না, কারণ মনের স্পন্দন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন না কোন প্রকার অতি সূক্ষ্ম আকারের সংস্রব থাকিয়াই যায়। কিন্তু ষষ্ঠ শূন্যটি মনের অতীত বলিয়া বাস্তবিক পক্ষেই নিরাকার, মহাশূন্য। প্রণব অথবা বীজমন্ত্রের প্রথম

তিনটি অবয়ব জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির দ্যোতক, তাহার পর যে সকল সূক্ষ্মতর অবয়ব আছে, তাহাদের সবগুলি বস্তুতঃ তুরীয় ও তুরীয়াতীত অবস্থারই অন্তর্গত। ওই সকল অবয়বের নাম এই প্রকার—বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, রোধিনী, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। প্রথম তিনটি অবয়বের সহিত এই নয়টি অবয়ব সম্মিলিত হইয়া দ্বাদশটি অবয়ব হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রতি দ্বিতীয় অবয়বকেই শূন্যরূপে ভাবনা করিতে হয়। ইহার অতি গভীর রহস্য আছে, কিন্তু এই স্থানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। এই ভাবে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ—এই ছয়টি অবয়ব শূন্যপদবাচ্য; তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি অবান্তরশূন্য এবং ষষ্ঠটি মহাশূন্য। পাঁচটি নিম্নবর্তী শূন্যের মধ্যে একটি ক্রমবিকাশ ও ক্রমলয়ের ভাব অনুভব করা যায়, যাহা সাধনমার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই গুরুকৃপায় অল্পাধিক ধারণা করিতে পারেন।

যে অবস্থায় দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহাকে জাগ্রত অবস্থা বলে। বস্তুতঃ প্রকাশ ইহার করণ বলিয়া প্রকাশকেই জাগ্রৎরূপে ভাবনা করার বিধান আছে। যে অবস্থায় আন্তর চতুর্বিধ করণ দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নে বিদ্যমান অন্তঃকরণ-বৃত্তির লয় হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের উপরমরূপ যে অবস্থার উদয় হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি। সুষুপ্তি ভাবনার স্থান ভ্রূমধ্যস্থিত বিন্দুতে। এই বিন্দু হৃল্লেখার উর্দ্ধ-বিন্দু জানিতে হইবে। স্বাত্ম-চৈতন্যের অভিব্যক্তির হেতু নাদের আবির্ভাবই তুরীয়ের স্বরূপ। অর্দ্ধচন্দ্র, রোধিনী ও নাদ এই তিন মন্ত্রাবয়বে ইহার ভাবনা করা উচিত। তুরীয়াতীত অবস্থা পরমানন্দ-স্বরূপ। ইহা মন ও বাকের অতীত হইলেও মন ও বাকের আভাস দেহাবস্থান কালে অধিকারানুসারে কাহারও কাহারও থাকিয়াই যায়। নাদান্ত হইতে শক্তি, ব্যাপিনী ও সমনার পর উন্মনা পর্যন্ত তুরীয়াতীত অবস্থা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। উন্মনার পরে আর কোন প্রকার অবস্থা নাই।

মাত্রাহীন বা অমাত্র শিব-স্বরূপ আত্মা হইতে চিৎকলার আভাস বিন্দু বা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপ দর্পণে পতিত হইয়া উহাতে অবস্থিত স্থিরীকৃত মাত্রাকে আঘাত করে। মাত্রা ঐ আভাস ধারণ করিতে পারিলে উহা সাধকের বা যোগীর যোগানুভূতির ভূমি রূপে পরিগণিত হয়—এক মাত্রা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধ মাত্রাতে পরিণত হয়। এক মাত্রা ও অর্দ্ধ মাত্রার সন্ধি স্থানটি অত্যন্ত গুহ্য। স্থূল বিশ্বের অনুভূতি মনের যে মাত্রাতে হয় উহাকে এক মাত্রা বলিয়া স্বীকার করা হয়। স্থূল লৌকিক অনুভূতির আরম্ভ ঐ এক

মাত্রাতে—মাত্রার আধিক্য জাড্যবৃদ্ধির কারণ। মনের ক্ষেত্র সমস্তটা চেতন বা বোধময় নহে, উহার মধ্যে অবচেতন অংশও আছে। আমাদের স্মৃতিতে যে নাম বা শব্দরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের অনুভবেরই পরিণাম। এই অনুভব স্থলবিশেষে মনের একাগ্রতার (অন্ততঃ আংশিক) ফলে উদিত হয়। সেই জন্য ঐ শব্দকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থ বা রূপ চিত্তক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে। বাচকের স্মরণ হইতে বাচ্যের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। সাধকের কর্তব্য—সাধনার উদ্দেশ্য—নিজের মনকে একাগ্র করা বা কেন্দ্রে স্থাপিত করা অর্থাৎ এক মাত্রাতে অবস্থিত রাখা। সমাধি প্রভৃতির অভ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্যও ইহাই। সাধারণতঃ মন এক মাত্রাতে থাকে না। বিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্তাবস্থায় চঞ্চলতার ফলে মাত্রার বাহুল্য ঘটিয়া থাকে। মূঢ়াবস্থার কথা এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। মন উত্থিত হইয়া এক মাত্রাতে স্থিত হইলে উপর হইতে উহাতে গুরুকৃপারূপী চিদ্রশ্মির সম্পাত হয়। তাহার ফলে এক মাত্রা স্বস্থানে এক মাত্রারূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও 'অতীতে' অর্দ্ধমাত্রা প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়।

এইখান হইতে সীমাহীন অনন্তের দিকে গতির সূচনা হয়—দিব্য অনুভূতির আরম্ভ হয়। চিৎকিরণ সম্পাতের বৃদ্ধি অনুসারে মাত্রার ভগ্নাংশ বাড়িতে থাকে, অর্থাৎ মাত্রাংশ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে এবং প্রতিফলিত চৈতন্য ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হইতে থাকে।

যে স্থানে চিদ্‌রশ্মির সম্পাত হয় তাহাকে এক মাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রার সন্ধি মনে করা যায়—উর্দ্ধ হইতে এক মাত্রাতে ঐ রশ্মি আসাতে উপর দিকে এক মাত্রা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, অথচ নীচের দিকে এক মাত্রা অক্ষুণ্ণই থাকে।

এই এক মাত্রাই সমগ্র স্থূল বিশ্বের মধ্যবিন্দু। লৌকিক বিশাল জগৎ এই এক মাত্রাতে উপসংহৃত হয় এবং এইখান হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া দশ দিকে স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই মাত্রাকে এক দৃষ্টিতে সুষুপ্তির সমধর্মা বলা চলে। ঐ দৃষ্টিতেই অর্দ্ধমাত্রাদি তুরীয় ও অতিতুর্য অবস্থার আভাসের জ্ঞাপক মনে করা যায়।

মনের মাত্রা যতই প্রসারিত হয় ততই মনের অংশ ক্ষুদ্রতর হয়, ততই চিদালোক উজ্জ্বলতর হয়। অর্দ্ধমাত্রাদিতে যে প্রতিফলিত চৈতন্য আছে তাহাই মন্ত্র। যে চিত্ত তাহার আধার তাহাকেও মন্ত্র বলে।

পূর্বে যে বিন্দুর কথা বলিয়াছি তাহাই মাত্রা হইতে মাত্রাহীনে যাইবার দ্বার। এখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয় ও নিরালম্বভাব আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে

মাত্রাভঙ্গের ফলে অর্দ্ধমাত্রার উদয় হয়। এই ভূমি হইতেই ঈশ্বর ভাবের পূর্বসূচনা হয় বলা যাইতে পারে। এই জ্যোতির্ময় একাকারতাই শূন্য। এখানে ভেদবোধ একেবারে যায় না, ক্রমশঃ অপগত হয়। ইহা বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় শূন্য হইলেও জাগতিক অবস্থার ঊর্দ্ধে ইহাই প্রথম শূন্য। বিন্দু হইতে সহস্রারে উঠার পথে কপাল প্রদেশে যে সোমরস দৃষ্ট হয় তাহাই অর্দ্ধচন্দ্র, যাহার ভিতরে ত্রিবিধ বর্ণমালা (সৌম্য, সৌর ও আগ্নেয়) চিদ্‌বীজরূপে সহস্রারের দলে দলে প্রকাশ পাইতেছে। কপালের ঊর্দ্ধে, অথচ ব্রহ্মরন্ধ্রের নীচে, ত্রিকোণ মধ্যে রোধিনীর অবস্থিতি। ব্রহ্মাদি কারণ পঞ্চককে, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব নামক পাঁচটি জগৎপতিকে, ঊর্দ্ধগতি হইতে নিবৃত্ত করে বলিয়া ইহার নাম রোধিনী। কেহ কেহ ইহাকে নিরোধিকাও বলেন। রোধিনী পর্যন্তই বিন্দুর আবরণ। ইহাকেও শূন্যরূপে চিন্তা করিতে হয়। এখানে দিক্ ও কালের পার্থক্য মনে থাকে না। তা ছাড়া নিম্নবর্তী মনঃ ও প্রাণকণার অনুভবও এখানে থাকে না। ইহার পর ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখে নাদস্থান। মন্ত্র মহেশ্বররূপী মহাপুরুষগণ দ্বারা ইহা পরিবৃত। নাদের অন্তর্গত ভুবনপঞ্চকের মধ্যবর্তী শক্তি ঊর্দ্ধগা নামে প্রসিদ্ধা। এইখান হইতেই শুদ্ধ চিদ্ বোধের সূত্রপাত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রে নাদান্ত। ইহাও শূন্যরূপে ভাবনীয়। নাদ বা চিৎ এখানে সদ্‌ভাবে প্ররূঢ় বলা চলে। ব্রহ্মরন্ধ্রটি সুষুম্নার উপরে। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে শক্তি স্থান। ইনিই ঊর্দ্ধকুণ্ডলী প্রসুপ্ত ভুজাগাকার ও ঊর্ণাচণ্ড সমপ্রভ। অনুন্মিষিত সমগ্র বিশ্ব ইহারই গর্ভে অবস্থিত—তাই ইনি বিশ্বাধার। যাবতীয় তত্ত্ব ও ভুবন ইহাকেই আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। এইস্থানে একটি অব্যক্ত আনন্দের অনুভব হয়।

ইহার পর ব্যাপিনীর অধিকার। বস্তুতঃ শক্তির কেন্দ্রস্থিতা কলাই ব্যাপিনী নামে পরিচিত। কিন্তু শক্তি হইতে ব্যাপিনী পৃথক। পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত শক্তি-তত্ত্বেরই প্রপঞ্চ। শক্তিতত্ত্বই এক হিসাবে দেখিতে গেলে অনাশ্রিত ভুবন, যাহাতে ব্যাপিনীর মধ্যে শিবতত্ত্ব অবস্থিত। অনাশ্রিত ভুবনের চারিদিকে ব্যাপিনী, ব্যোমাত্মিকা, অনন্তা ও অনাথা নামক শক্তির অবস্থান—মধ্যে অনাশ্রিতা শক্তি বিরাজমান। ব্যাপিনীও যে শূন্যরূপে কল্পনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কেহ কেহ ব্যাপিনীকেই মহাশূন্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা মহাশূন্য নহে, ইহার পরেও শূন্য আছে। এখানে সাকার ও নিরাকারের ভেদ তিরোহিত। এখানকার অনুভূতি এক অদ্বয় আত্মানুভূতির অঙ্গীভূত। ব্যাপিনীর পরে ব্যাপিনীপদাবস্থিত অনাশ্রিত ভুবনের উপরে সমনা। ইহা ব্রহ্মবিলের

বাহিরে ও অতীত মনের স্থান। এখানে মনঃ নাই, অথচ মনঃ আছে। নাদান্ত হইতেই এই অতীত মনের সূচনা পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম সমষ্টি মন নাদেই পরিসমাপ্ত হয়—তাহার পরই অতিমানস। সমনাই সকল কারণের কর্তৃভূতা মহেশ্বরের পরা শক্তি। পূর্ণ ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তি অবতরণমুখে সমনারূপে নামিয়া, সমষ্টি মনে সঞ্চারিত হয়। পরমেশ্বর সৃষ্ট্যাদি পাঁচ প্রকার কৃত্য সমনাতে আরূঢ় হইয়াই সম্পাদন করেন। সমনার অপর দিক্‌টি উন্মনা—ইহা অতীত মনেরও অতীত। আত্মার বিকল্পরহিত কেবল স্বরূপে অবস্থানের বোধ এইখানে হয়। ইহা অমেয় ও অনির্দেশ্য। নবনাদের মধ্যে ইহাই নবম নাদ। বিন্দুতে যে নাদ সমূহের সূচনা, উন্মনাতে তাহাদের শেষ। ইহাই প্রকৃত মহাশূন্য। শ্রীমাতার মহাকরুণা ব্যতিরেকে ইহা ভেদ করা যায় না। ইহার পর আর শব্দব্রহ্ম নাই—অথবা শব্দব্রহ্মই পরব্রহ্ম বা অদ্বৈত আত্মস্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ।

জপের আনুষঙ্গিক ভাবনার সহিত সংসৃষ্ট ছয় শূন্য ও পাঁচ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। এখন সাতটি বিষুবের কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। বিষুব সপ্তকের প্রচলিত নাম এই প্রকার—প্রাণবিষুব, মন্ত্রবিষুব, নাড়ীবিষুব, প্রশান্তবিষুব, শক্তিবিষুব, কালবিষুব ও তত্ত্ববিষুব। প্রাণ, আত্মা ও মনের পরস্পর যোগকে প্রাণবিষুব বলে। অবিভাজ্যমান নাদকে জাপকের নিজ আত্মা বলিয়া ভাবনা করা মন্ত্রবিষুবের তাৎপর্য। মূলমন্ত্রের দ্বারা ছয় চক্র ও দ্বাদশ গ্রন্থির ক্রমশঃ ভেদ হইলে মধ্যনাড়ীতে নাদস্পর্শ হয়। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বীজশিখরবর্তী নাদ উচ্চারিত হইলে নাড়ীবিষুবরূপ স্পর্শ উদ্‌ভূত হয়। নাদান্ত পর্যন্ত মন্ত্রাবয়বের শক্তিতে লয় ভাবনা প্রশান্তবিষুব নামে অভিহিত। শক্তিমধ্যগত নাদের সমনা পর্যন্ত চিন্তনকে শক্তিবিষুব বলা হয়। এ পর্যন্ত কালের খেলা আছে। কারণ, সমনা পর্যন্তই কালের গণ্ডী। বস্তুতঃ নাদ কালের সীমার পরেও আছে। কালাতীত উন্মনা পর্যন্ত নাদের চিন্তনকে কালবিষুব বলে। উন্মনাতে কাল নাই, কিন্তু উহাও পরমতত্ত্ব নহে। কাল বিষুবের পর তত্ত্ববিষুব অঙ্গীকৃত হয়। নাদই তত্ত্বের অভিব্যঞ্জক, তবে যতক্ষণ নাদের প্রকৃত অন্ত না হয় ততক্ষণ তত্ত্ববোধ হয় না। নাদান্ত ত দূরের কথা, শক্তিতে বা সমনাতেও নাদের অন্ত হয় না। শাক্ত যোগিগণ উন্মনাকেও নাদের অন্ত স্বীকার করেন না। উন্মনার ঊর্দ্ধে—উন্মনা ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে—নাদ লীন হয়। তখন তত্ত্ববোধ বা স্বাত্মসাক্ষাৎকার স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। সেই জন্য তত্ত্ববিষুবকেই চৈতন্যের অভিব্যক্তিস্থান বলা সঙ্গত।

ইহার পরই পরম পদ। ইহা ছয় শূন্য, পাঁচ অবস্থা ও সাত বিষুবের কোলাহলের অতীত, বিশ্বের পরম বিশ্রান্তি ভূমি ও পরমানন্দস্বরূপ। ইহাই পরম শিবের অবস্থা। তান্ত্রিক যোগে নিষ্ণাত পরম যোগিগণ বলেন যে উন্মনা পর্যন্ত মন্ত্রাবয়ব সকল ১০৮১৭ বার উচ্চারিত হইলে নাদের অন্ত ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া পরম পদের প্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রজপের সঙ্গে মন্ত্রার্থভাবনা আবশ্যক, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অর্থজ্ঞান ব্যতীত অর্থভাবনা হইতে পারে না। শাস্ত্রে বহুপ্রকার মন্ত্রার্থের বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভাবার্থ, সম্প্রদায়ার্থ, নিগর্ভার্থ, কৌলিকার্থ, রহস্যার্থ ও মহাতত্ত্বার্থ, এই কয়েকটি প্রধান। কোন কোন মতে ১৬ প্রকার অর্থের বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের অবয়বভূত অক্ষরের অর্থই ভাবার্থ। সর্বকারণকারণ পূর্ণ পরমেশ্বরই সকল মন্ত্রের মূল গুরু। তন্মুখ হইতে স্বীয় মন্ত্রের উদ্‌ভব ও উহার অবতরণক্রম বা পরম্পরার জ্ঞানই মন্ত্রের সম্প্রদায়ার্থ জ্ঞান। পরমেশ্বর, গুরু ও নিজ আত্মার ঐক্যানুসন্ধান নিগর্ভার্থ। পরমেশ্বর নিষ্কল, নিরবয়ব—গুরুও তাই। নিষ্কল পরমেশ্বরকে যিনি নিজ স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন তিনিই গুরু। তাই গুরু ও পরমেশ্বর অভিন্ন। চক্র, দেবতা, বিদ্যা, গুরু ও সাধকের ঐক্যানুসন্ধানই কৌলিকার্থ। মূলাধারস্থ কুণ্ডলীরূপা বিদ্যাই সাধকের স্বাত্মা, এরূপ ভাবনার নাম রহস্যার্থ। নিষ্কল, অণু হইতে অণুতর ও মহান্ হইতে মহত্তর, নির্লক্ষ্য, ভাবাতীত, ব্যোমাতীত, পরম তত্ত্বের সহিত প্রকাশানন্দরূপে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় নিজগুরু-প্রবোধিত নির্মলস্বভাব স্বকীয় আত্মার ঐক্যানুপ্রবেশ মহাতত্ত্বার্থ। এই সব অর্থের বিজ্ঞানের ফলে পাশাত্মক বিকল্পজাল সম্যক্‌প্রকারে নিবৃত্ত হয়।

এই দেহরূপ বিশ্বে অধঃ-ঊর্ধ্বভাবে তিনটি স্তর আছে। প্রথমটি স্থূল বা সকল, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বা সকল-নিষ্কল এবং তৃতীয়টি কারণ বা নিষ্কল। প্রথম স্তরটি অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষুম্না নাড়ীর মূলস্থ ঊর্ধ্বমুক্ত রক্তবর্ণ সহস্রদলকমলই অকুলপদবাচ্য। সুষুম্নার শিখরস্থ অধোমুখ শ্বেতবর্ণ সহস্রদলও একপ্রকার তাহাই।

উভয়ের অন্তরালে সুষুম্নামধ্যে বিভিন্ন প্রকার আধারকমল গ্রথিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয়টির বিস্তার আজ্ঞার ঊর্ধ্বে বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত।

তৃতীয়টি মহাবিন্দু, যাহা উন্মনার অতীত ও দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এই ত্রিভূমিক দেহরূপ বিশ্বে যিনি অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপী

আত্মা। তিনি বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক। জপসাধনার পরম সিদ্ধি এই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ ব্যতীত অপর কিছু নহে।

(৪)

ভূমিকা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িল। জপ সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশের মর্ম কি তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য—মূল গ্রন্থের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ভূমিকার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে উহা সুসাধ্যও নহে। বিদ্বান্ ও বহুদর্শী গ্রন্থকার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা অনুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজের কর্তব্য সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত পরিশ্রম, গভীর চিন্তা, উদার সমন্বয়দৃষ্টি এবং সর্বোপরি আত্মানুভবের উল্লাসের নিদর্শন এই মহান্ গ্রন্থের প্রতি পংক্তিতে দেদীপ্যমান। তাই ইহার প্রশংসা না করিয়া আমি বিরত থাকিতে পারিলাম না। গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি লিপিকর মাত্র। তাঁহার পূত লেখনীকে নিমিত্তরূপে গ্রহণ করিয়া বিশ্বগুরুই কালোপযোগী আকারে ইহাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা পরম পথে প্রবিষ্ট অথবা হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্বমালার মনন করিতে পারিলে উপকৃত হইবেন, এরূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি গ্রন্থোক্ত কোন পদার্থের আলোচনা করিতে চেষ্টা করি নাই। কারণ আলোচনা করিলে সকল বিষয়েই আলোচনা আবশ্যক। গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনা পৃথক্‌ভাবে কোন কৃতী লেখক অদূর ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়া আশা করি। স্বানুভূতি, সদ্‌যুক্তি ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের এমন অপূর্ব সমন্বয় চেষ্টা আর কোথাও দেখি নাই। শ্রীভগবানের কৃপায় পরমশ্রদ্ধেয় স্বামীজী সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া এই আরব্ধ মহান্ কর্মের সুষ্ঠুভাবে পরিসমাপ্তি করিয়া অধ্যাত্মসাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন ও জিজ্ঞাসু ভক্তগণের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

জপসূত্রম্

জপোল্লাসবিলাসবল্লী

অকারং তথা চ মকারমন্তরা
বিশত্যুকার ঋতং বৃহচ্চিকীর্ষুঃ।
অগ্নাবকারে সুনুতে স সোমং
মকার মস্যাদময়োরমৃতত্বম্॥ ১

আদিস্বরাদয় মিত্যেব কঌপ্তং
মাত্রা-স্পৃগন্তস্য পারং নিনীষুঃ।
মূর্দ্ধন্যকারস্য তলং হ্যুকারো
নায়ং নাসাবুদমৃতং চ দোগ্ধি॥ ২

অচঞ্চলানি স্বতশ্চঞ্চলানি
চত্বারি বায়ুক্ষিবচো মনাংসি।
অচঞ্চলা অপি কুলনাদভারসা
শ্চঞ্চলা ইব জাগ্রতি জাপযাগে॥ ৩

মূকা মুখরা বাগপি বিখরা
দৃষ্টিশ্চপলা নিতরামচলা।
বায়ু র্ভ্রাম্যতি নাসাবিবরে
চেতঃ শাম্যতি চান্তঃ কুহরে॥ ৪

কুলরসিকাধো নূপুর-নটনা
চান্তর্বীণা সুললিত-রণনা।

রাকা-হিমকর-কনক-কৌমুদী
কিরতি হৃদি রস মহোমহোৎসবে॥ ৫

অলসিত-রসজাড্যং শৈলগাত্রে তুষারং
বিগলয়তু রসোৎসো গন্তুমুল্লাসলাস্যম্।
বিলসিত-তটশোভাং বিভ্রতী রাসধারা
স্খলসিত-রসসিন্ধুং যাতু ধাম্নৈব তস্য॥ ৬

অলসিত শিশুকণ্ঠে কাকলি র্যোল্লসন্তী
সুললিত সুরশিল্পে ছন্দসা তদ্ বিলাসঃ।
পরম-নিবিড়তাস্তে নাদসান্দ্রে সমাধৌ
বিরমতি সুরকেলিঃ স্বাত্মশান্তে রসাব্ধৌ॥ ৭

ওঙ্কারস্যাদ্যং যদলসিতরসং রূপমুল্লাসমেতি
মধ্যে যোঽর্ণ স্তদুদয়বলান্ নাদবিন্দু কলা চ।
তারোল্লাসে বিদধতি রসজ্যোতিযো র্বা-বিলাসং
তীর্ত্বা দ্বন্দ্বং সকলকলনং কো লসন স্বে মহিম্নি॥ ৮

যাবন্ নাম হ্যলসিতরসং তাবদুদ্গান মস্যো-
ল্লাসপ্রৌঢ়ি স্তরুণ লসিতে ভাবতো গুঞ্জিতেন।
পারং যাতে ত্বতনুধনুষঃ কীর্ত্তনেঽন্তর্বিলাসে
মাধ্বীমগ্নং হৃদি বিলসনং স্বাত্মরত্যৈকসারম্॥ ৯

বিশ্বে স্বাত্মন্যনলসনকৃৎ সন্তু ধর্ম্মা ময়ীত্যা-
প্যায়ন্ত্বিত্যুল্লসনবচনাৎ প্রেষ্ঠ-পীযূষ-পানম্।
অঙ্গোল্লাসেঽঙ্গি-পরিলসনং মেঽনিরাকার্য্যসূক্তেঃ
সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদমিতি প্রান্তমগ্নৌ তদাজ্যম্॥ ১০

মন্ত্রন্যাসৈঃ কুরুত লসিতং স্বীয় যন্ত্রস্য জাড্য-
মুল্লাসং বো নয়তু মহসা চোর্দ্ধ্বগা ভূতশুদ্ধিঃ।
প্রেম্না ধ্যানাচ্ছিরসি কমলে শ্রীগুরোস্তদ্ বিলাসো
ভাসা ভুঙ্‌গ্ধ্বং স্বরসমমৃতং সাঙ্গাযাগে জপে বঃ॥ ১১

নাম্নানাম্নি স্তিমিত মলসং ভাবমাদৌ জহীহি
নাম্নানাম্নি স্বরস-সুষমোল্লাসকুণ্ঠাং জহাহি।
নাম্নানাম্নি প্রিয়পরিচয়ে চারুচিত্রে বিলাসে
নাম্নানাম্নীমমপি জহিহি প্রোজ্জ্বলে সামরস্যে॥ ১২

জাগর্ত্তি প্রথমালস্যাদুল্লসন্তী চ মধ্যমা।
বিলসন্তী চ পশ্যন্তী স্বলসন্তী পরা মতা॥ ১৩

তারচক্র সমাচরণম্

বিন্দোর্নাদোঽপি নাদাচ্চ বিন্দুরিতি রহস্য বাক্।
আদাবন্তে চ সাবিত্র্যাং প্রণবস্যোচ্চারণাৎ স্ফুটা॥ ১

বিন্দৌ সমুদিতস্তারো ব্যাহৃতিত্র্যর্ণ-ভাস্করঃ।
বরেণ্যং মধ্যগো ভর্গশ্চান্তং বিন্দাবিয়াৎ পুনঃ॥ ২

ওঁকারস্য মহাচক্রং হ্যেবমাবর্ত্ততে যদা।
তদৈব বারাহী শক্ত্যা দংষ্ট্রোদ্ধৃতা বসুন্ধরা॥ ৩

বিষম-চক্রজালচ্ছিৎ সুষম-চক্রবৃদ্ধিকৃৎ।
নাভিভিদ্ বিশ্বচক্রস্য তারচক্রং সমাচর॥ ৪

প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নাবৃত্তিমান্ সবিতা স্বরঃ।
নক্তং শেতে বিন্দুলীনঃ স্ববীজ ইব পাদপঃ॥ ৫

তারজপে তথা নক্তং শয়ীথাঃ সম্পুটেঽপি বা।
অন্যথা লঙ্ঘনং মেরোঃ প্রাণাঃ শ্রাম্যন্তি বৈ যতঃ॥৬

নাদ এব দিবা পুংসাং শৃণ্বতাং তেঽত্র জাগ্রতি।
অশৃণ্বতাং দিবা নক্তং জাগ্রতি বিলয়েঽপি তে॥৭

সংখ্যামূলং হি যৎকিঞ্চিৎ স্পন্দঃ সংখ্যানমূলকঃ।
সংখ্যাবৈরং যতো বন্ধঃ সংখ্যামৈত্রঞ্চ মুক্তয়ে॥৮

সংখ্যাসংখ্যানসাংখ্যৈশ্চ প্রসংখ্যানেন তুর্য্যগম্।
বৈখর্য্যাদৌ মন্ত্রবজ্রং সংখ্যা-শঙ্কাদ্রিপাটনম্॥৯

অপাম সোমং হি বাঙ্ মন্থযাগেঽ-
গমাম জ্যোতির্ভামতোঽবিদাম।
কিং সোমরাতানকৃন্তদরাতি
রন্ধা বিভাতো মর্ত্তস্য ধূর্ত্তিঃ॥১০

রাত্যরাতী স্থিতে দ্বন্দ্বে সোমং বৈ জাতবেদসে।
রাত্যৈনো দুরিতাদ্ দুর্গাৎ সুনবামান্তরস্রুবা॥১১
(অরাতের্দুরিতাদ্রাত্যৈ সুনবাম সুষুম্নয়া॥)

জপোল্লাসবিলাসবল্লী

(বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যান)

প্রণবের অকার ও মকার এই দুই বর্ণের মাঝে (অন্তরা) উ বর্ণ প্রবিষ্ট হইলেন (বিশতি)। কি উদ্দেশ্যে? বেদে প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋকে যে "ঋতং বৃহৎ" সমুদীরিত

হইয়াছেন, যে "ঋতং বৃহৎ"কে পূর্বে আমরা কতক ধরিতে ও চিনিতে যত্ন করিয়াছি, সেই "ঋতং বৃহৎ"কে সাক্ষাৎ প্রকট করিবার উদ্দেশ্যে 'উ' বর্ণ এইভাবে প্রবিষ্ট হইলেন, বুঝিতে হইবে। ফলে, অম্+ঋত=অমৃত মন্ত্রাক্ষরের মধ্য হইতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। উ বর্ণের এই প্রকার অমৃতমন্থন কর্মটিকে যজ্ঞরূপে ভাবনা কর। প্রথম বর্ণ 'অকার' অগ্নিস্থানীয়; 'মকার' সোমস্থানীয়। মধ্যে 'উ'কার হোতৃরূপে অ-কাররূপ অগ্নিতে ম-কাররূপ সোম সবন করিতে থাকেন (সুনুতে)। এইরূপ সোমের দ্বারা অভিষবের ফলে অ-কার ও ম-কার, এই দুই বর্ণে নিগূঢ় যে অমৃত সেটি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে এবং সেটি মন্ত্রযাগের যেটি পরম ফল সেই অমৃতত্বরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই সবন কর্মটি সুষ্ঠভাবে না চলিলে প্রণবে অ-কার ও ম-কার এই বর্ণদ্বয় যেন একটা স্তব্ধ জড়িমার মধ্যেই পড়িয়া থাকে; মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে নিহিত ঋতং বৃহতের কোনই পরিচয় আনিয়া দেয় না। সুতরাং ঐ বর্ণদ্বয় অর্দ্ধমাত্রারূপ ঊর্দ্ধলোকের সেতুটি ধরাইয়া দিতে অপারগ হয়; কাজেই অমৃতের কোন সন্ধান অথবা আভাস বহন করিয়া আনে না।

অম যথাযথ ব্যহরণের পথে অগ্রসর হইতে না পারিলে যে রূপ সচরাচর গ্রহণ করে সেটি হইল অম=ব্যাধি, রোগ, unhealthy morbid complex; এইরূপ complex বা আন্তর ব্যাজরূপ গ্রহণ করিলে অম যে আকৃতি গ্রহণ করে সেটিকে বলে আময়। এই আময় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যে পদ বা পদবী জীবনে অধিগত হয় সেটিকে উদ্দেশ করিয়া গীতা বলিয়াছেন "পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্"। প্রণবে অ-কার ও ম-কারের মধ্যে থাকিয়া 'উ' বর্ণ মন্থন ও সবনের কর্মটি করিতে থাকিলে "বিষমপি অমৃতায়তে"। আর সে মন্থন ও সবন কর্মটি যদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তা হইলে 'অমৃতমপি বিষায়তে'। জীবনে অন্তর্বহিঃ অমৃতের এবম্বিধ যে বিষায়ণ সেটি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ অভ্যারোহ মন্ত্রঃ "অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতম্ গময়।" আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সর্ববিধ রোগমুক্তির নিমিত্ত একবার নয় দুই দুইবার সত্য করিয়া ভগবানের যে তিনটি নাম কীর্তন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, সেই তিনটি নাম, অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ। পরীক্ষা করিলেই উ বর্ণের উক্ত মন্থন ও সবন কর্মটি পরিলক্ষিত হইবে। প্রথম দুইটি নামে অবর্ণ ও মবর্ণকে উকারের দ্বারা মন্থন করা হইয়াছে লক্ষ্য করিবে; আর গোবিন্দ এই নামে ওঙ্কার সর্বেন্দ্রিয়ে

এবং সমগ্র সত্তায় পরম রসায়ন অমৃতরূপে স্বয়ং সমুত্থিত হইয়াছে লক্ষ্য করিবে। এতৎ প্রসঙ্গে অমা, উমা এবং মা অমৃতায়নের রূপও লক্ষ্য করিও। এগুলি 'আ'স্বরপ্রধান মন্ত্র।

এইবার অ-কার, উ-কার, ম-কার এই বর্ণত্রয়কে যথাক্রমে ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়রূপে ভাবনা কর। স্বরের আদি বর্ণ যে অকার, সেটি কি সূচিত করে? "অয়ং" বা "এই" রূপে ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু প্রতীত হইতেছে, তাহারই সূচনা করে 'অ' বর্ণ। সুতরাং এই বর্ণ হইতেছে "ভূঃ" স্থানীয়। কিন্তু দেখিতেছি "এই" রূপে যাহা কিছু আমাদের গোচরে আসিতেছে, সে সবই মাত্রাস্পর্শের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ; অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়, রূপাদি যেসব বিষয় অন্তঃকরণের কাছে আনিয়া দিতেছে, অন্তঃকরণ সেই সমস্ত বিষয় লইয়াই ভাবনা চিন্তা, কল্পনা জল্পনায় ব্যাপৃত। আমাদের সাধারণ অনুভূতির (ordinary experience) এই কারণেই দীনতা ও কার্পণ্য। এই নিমিত্তই নাদ, বিন্দু, জ্যোতি, রস—এই সকল ঊর্দ্ধধামের পরিচয় সচরাচর আমাদের অনুভূতিতে মেলে না। উদাহরণ স্বরূপ—কোন ধ্বনি যদি আমাদের শুনিতে হয়, তাহা হইলে বাহিরে বায়ুমণ্ডলে উপযুক্তভাবে কম্পন হওয়া আবশ্যক। সে কম্পন আবার আমাদের শ্রবণযন্ত্র ও স্নায়ুগুলিকে উপযুক্তভাবে সক্রিয় ও সচেতন করা আবশ্যক। তা'ছাড়া সংস্কার সহকৃত মনেরও উপযুক্ত ভাবে সহযোগিতা করা আবশ্যক। এতগুলি কারণের সমবায় ঘটিলে কোনও ধ্বনি আমরা শুনিতে পাই; অন্যথা পাই না।

কিন্তু, যাহাকে নাদ-ধ্বনি বলে সেটি তো এই সমস্ত কারণের সমবায়ে উৎপন্নও হয় না অথবা এদের অভাবে বিনষ্টও হয় না। সে শব্দ অনাহত এবং নিত্য। এরূপ শব্দ অনুভূতিতে আসিবে কি প্রকারে? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে মাত্রাস্পর্শের যে গণ্ডী তার পারে আমাদের চেতনা উন্নীত না হইলে নাদানুসন্ধান সম্ভাবিত হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের মাত্রা অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাম অনুভূতিকে এক একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ প্রণালীতেই প্রবাহিত হইতে দেয় (restrict এবং canalise করে)। বোধের যেটি উন্মুক্ত অনাবিল, অকুণ্ঠিত প্রকাশ—সেটি মাত্রাস্পর্শের ঊর্দ্ধে যাইতে পারিলেই আয়ত্ত হয়, অন্যথা হয় না। নাদ সম্বন্ধে যে কথা, জ্যোতি এবং রস সম্বন্ধেও সেই কথা। এই নিমিত্ত এইগুলিকে জড়ীয় না বলিয়া অনেক সময় চিন্ময়

বলা হইয়া থাকে। এক কথায় যে অনুভূতি মাত্রাস্পর্শের দ্বারা সীমাবন্ধ ও কুণ্ঠিত সেইটি জড়ীয় এবং সকুণ্ঠ। আর মাত্রাস্পর্শের পারে যে অনুভূতি তাহাই হইল চিন্ময় এবং বিকুণ্ঠ। এখন স্পর্শ বর্ণের যে ম-কার সেটি সূচনা করে মাত্রাস্পর্শের যেটি শেষ সম্বেগ— (momentum) তাহাই। অম্ এই বর্ণদ্বয় উচ্চারিত হইলে আমাদের অনুভূতি মাত্রাস্পর্শের শেষ সম্বেগের মাঝেই পড়িয়া থাকে। সেটিকে কাটাইয়া তার পারে যে চিন্ময় বৈকুণ্ঠ পদবী তাতে উপনীত হইতে পারিল না। কিন্তু পার তো কোনও রকমে মেলানো চাই-ই। কেননা মাত্রাস্পর্শের গণ্ডীর ভিতরে নিত্য পড়িয়া থাকিলে গীতার সেই উপদেশ "তিতিক্ষস্ব ভারত!"

এ'ছাড়া আর যে কোনও ভরসার কথা জীবের কর্ণে পৌঁছায় না। যে স্বভাবতঃ রসলিপ্সু তাকে শুধুই কি নীরস বিষয়ের আবর্তে পড়িয়া কোনও মতে সহিয়া দিন গুজরান করিতে হইবে? এই জন্য পারের একটা উপায় মেলানো চাই। (মাত্রাস্পৃগন্তস্য পারং নিনীষুঃ) এখন এই পারটি মিলাইবার জন্যই শ্রীভগবান গুরুশক্তি 'উ'কার রূপে অ-কার ও ম-কার এই দুই বর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কি উদ্দেশ্যে? তাঁর নিজ ঊর্দ্ধধামে তাঁর স্বরূপের পূর্ণপ্রকাশরূপ 'ঋ' বর্ণ রহিয়াছে, সেই ঋ বর্ণের তলে কিনা স্বীয়ধামে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত। সেই ধামটিকে যদি বলা যায় 'স্বঃ' তবে উকার 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতিরূপে এই পরম শ্রেয়স্কর উদ্ধার কর্মটি নির্বাহ করিয়া থাকে। এই 'উ' বর্ণকে এইও বলা যায় না ঐ-ও বলা যায় না, কেননা এ-টি মধ্যে থাকিয়া 'এই'কে 'সেই'এর নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, এবং 'সেই'কে 'এই' এর কাছে আনিয়া হাজির করিয়া দেয়। আরও দেখ মূর্দ্ধন্যধামের যে ঋকার সে-টি তল এই শব্দের ত-কারের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেন ঋত। সুতরাং 'উ'কারের এই এই মাধ্যমিকতার ফলে অমের ভাগ্যে মিলিল ঋত, অর্থাৎ অম্ হইল অমৃত। অতএব মধ্যস্থলে এই উ বর্ণ মাত্রাস্পর্শের বিষে জরজর যে অম্—তার নিমিত্ত অমৃতকে দোহন করিলেন।

অতঃপর 'উ' বর্ণ হোতৃরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাপকের জপযজ্ঞটি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে থাকিলে যে অপরূপ অঘটনটি ঘটিয়া থাকে, সেটি দ্বারা বলা হইতেছে। স্বভাবতঃ দুরন্ত চঞ্চল সাধকের যে বাক্, বায়ু, দৃষ্টি এবং মন—এ চারিটিই তাদের স্বভাব চঞ্চলতা পরিহার করতঃ অচঞ্চল ও স্থির হইতে থাকে। অর্থাৎ সাধকের বাক্

অনর্থক প্রলাপে ব্যাপৃত না রহিয়া স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ইষ্টমন্ত্রের জপকর্মেই সুস্থির সংলগ্ন হইয়া যায়। সাধকের প্রাণবায়ু ইতঃস্থতঃ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ধাবিত না হইয়া ব্যাহরণের যে ঋতচ্ছন্দঃ সেই ছন্দের শাসনে আসিয়া স্থির ও স্বচ্ছন্দ হইয়া যায়; অর্থাৎ বাকের বেলা যেমন বাক্‌সংযম জপের প্রসাদে সহজসাধ্য হইয়া থাকে—তেমনি আবার জপের কল্যাণে সাধকের সহজ প্রাণায়ামটিও সংঘটিত হইয়া থাকে। আবার বাহ্য চিত্রে ও রূপে নিরন্তর চঞ্চল সাধকের যে দৃষ্টি সেটি জপের মধুচ্ছন্দে আকৃষ্ট হইয়া কোন এক শান্তরূপ রসে যেন বিভোর হইয়া স্থির হইয়া যায়। এই জন্যই না যোগীরা বলিয়া থাকেন,

"রোগীকা, ভোগীকা, যোগীকা জান,
আঁখ্‌সে নিশান ঔর আঁখ্‌সে পছান্।"

এইভাবে জপের দ্বারাই সাধকের ত্র্যটক যোগসিদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। শেষকালে আবার সকল চঞ্চলতার মূলে রহিয়াছে মন, যার সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন,

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

কিন্তু সৌষ্ঠবের সহিত জপ্ চলিতে থাকিলে সকল চঞ্চলের সেরা ও গোড়া যে মন সেটিও তার চঞ্চলতা পরিহার করিয়া শান্ত হইয়া যায়। সুতরাং জপের প্রসাদে সাধকের প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান এ সকলই আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সাধকের ভিতরে স্বভাবতঃ নিভৃত, নিগূঢ় অচঞ্চল চারিটি বস্তু সাধকের নৈষ্ঠিক জপের আকুতিভরা আহ্বানে যেন চঞ্চল হইয়া তার কাছে প্রকট হইবার জন্য আগাইয়া আসে। যে চারিটি হইতেছে, প্রসুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, অনাহত শাশ্বত নাদ, তমসার পারে যে আদিত্য বর্ণ জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ এবং শ্রুতি-প্রসিদ্ধ রসতম মধুমত্তম যে রস সেইটি। কাজেই সাধকের জপযাগটি উপযুক্ত ও তার মাধ্যমিকতায় অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে সচরাচর নিদ্রিত সাড়াবিহীন উক্ত পরম দৈবী

সম্পদ-চতুষ্টয় যেন জাগিয়া উঠিয়া জাপককে সাড়া দিয়া বলেন, "এই দেখ, তোমার যজ্ঞ-ফল অমৃতভাণ্ড হাতে করিয়া আমরা তোমার কাছে আসিয়াছি,—তুমি বরণ করিয়া লও, এবং অমৃতের পুত্র তুমি অমৃতই হও"।

অতঃপর এই শ্লোকে আগের কথাগুলি আরও বিস্পষ্ট ভাবে বলা হইতেছে। সাধারণতঃ মুখরা ও বিখরা বাক্ জপের কল্যাণে মূকা কিনা মৌন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এখানে মুখরা ও বিখরা এই দুইটি বিশেষণের দ্বারা মুখে এবং মুখের বাহিরে যে আকাশ (বিয়দি) এই উভয়ত্র খর-স্বভাবা যে বাক্ সেইটিকে বুঝিতে হইবে। খর বলিতে বিশেষভাবে যেটি অভিঘাতজন্য (due to frictional impact) সেইটি বুঝায়। জপের সুষম স্পন্দনের ফলে এই খর ভাবের হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং তখন জপরূপে বাকের যে প্রবৃত্তি চলিতে থাকে, সেটি ক্রমে অনাহতধর্মী ও স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকে (self-creating and self-sustaining)। তারপর নিরন্তর চপল যে দৃষ্টি সেটিও নিতরাম্ অচলা হইয়া থাকে। এ বলিতে বুঝিতে হইবে যে দৃষ্টি তার পরাঞ্চি ভাব পরিহার করতঃ ক্রমশঃ প্রত্যগ্ ভাবটি পরিগ্রহ করিতে থাকে। কাজেই বাহ্যদৃষ্টি আপনাকে গুটাইয়া লইয়া এক শান্ত অনাকুল অর্ন্তদৃষ্টিতে বিবর্তিত (transform) করিয়া লয়। তারপরে আমাদের এই উচ্ছৃঙ্খল ও অস্থির শ্বাসবায়ু শনৈঃ-শনৈঃ তার বাহ্যবৃত্তি ত্যাগ করতঃ নাসাবিবরের অভ্যন্তরেই বৃত্তিমান হয়। তার ফলে সাধকের জপ স্বভাবতঃ অজপা জপে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তখন শ্বাসের ছন্দঃ ও জপের ছন্দঃ পরস্পরের বিষম (discordant) না হইয়া সুষম (concordant) হইয়া যায় এবং পরিণামে দুয়ের ছন্দ মিলিয়া (congruent) অভিন্ন হইয়া যায়। পরিশেষে চিত্ত তার এই সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গকে শান্ত ও ধীর হইতে দেখিয়া নিজেও কোনও এক অপরূপ অন্তঃকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শান্ত হইয়া যায় এবং তার সকল শ্রান্তি ও ক্লান্তির সংস্কারগুলি হইতেও নিজেকে যেন মুক্ত মনে করে।

যারা স্বভাবতঃই চঞ্চল সেই বায়ু প্রভৃতির কথা বলা হইল। এইবার যারা স্বভাবতঃ অচঞ্চল তারা সাধকের আকুতিতে যেন চঞ্চল হইলেন। অপ্রকট ভাব হইতে প্রকট ভূমিতে নামে বলিয়া, সাধকের সমগ্র সত্তার মাঝারে যে কি অপরূপ এক মহোৎসবের আয়োজন করিয়া দেয়, সেইটি এখন বলা হইতেছে। সাধকের মূলাধারে (অধঃ) অর্থাৎ তার সত্তার গভীর গভীরতর স্তরে যে কুণ্ডলিনী শক্তি সচরাচর প্রসুপ্তা

ভুজগীর মত লুটাইয়া থাকে, সে শক্তি যেন কোন দেবলোকের নটীর মত আপন চরণ দুটিতে মঞ্জীর বাঁধিয়া নৃত্যপরা হইতেছে, সাধকের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। সেই কুণ্ডলিনী শক্তি স্বভাবতঃই কুল-রসিকা অর্থাৎ শিবশক্তির একান্ত অভেদ উপলব্ধিতে যে অপূর্ব্ব সমরস ব্রহ্ম আস্বাদনের বস্তু হইয়া থাকেন। সেই 'কুল' কিনা ব্রহ্মরসেরই রসিকা হইল কুণ্ডলিনী। এই জন্যই না কুণ্ডলিনীকে বলে কুলকুণ্ডলিনী। এই তো গেল সাধকের অধঃ-প্রকোষ্ঠের উৎসবের আয়োজন। তারপর সাধকের মধ্যে সুষুম্নারূপ বীণা যন্ত্রটিকে আশ্রয় করিয়া যে অপরূপ ও বিচিত্র নাদের রণন সাধকের সমগ্র চেতনাকে মধুচ্ছন্দে স্পন্দিত ও নন্দিত করিয়া তোলে, সেটি হইল সাধকের মধ্য-প্রকোষ্ঠের উৎসবের সাড়া। এদিকে আবার সাধকের ঊর্দ্ধতন চেতনার যে ভূমি সেখান হইতে এক দিব্য অথচ পরম শান্ত সুনির্মল ভাস্বরতা পূর্ণিমার হিমাংশু কনক কৌমুদীর মত সব কিছু প্লাবিয়া, শুভ্র ও শুচি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে—এইটি হইল সাধকের ঊর্দ্ধ-প্রকোষ্ঠের অপরূপ আলোকোৎসব। আর এই দিব্য চেতনার শুচি শুভ্র যে জ্যোতি সেটি আবার নিজেকে বিচিত্র বিলসিত ও শান্ত স্বলসিত রসরূপে ঘনীভূত করিয়া সাধকের 'হৃৎ', কিনা অন্তরতম সত্তাকে ভরপুর করিয়া দেয়। অহো! সাধকের এই আন্তর মহোৎসবে "কুল নাদ ভা রসাঃ" এই চারটি যে কিভাবে পরস্পর মিলিয়া দিব্য অনুভূতির বিচিত্রতা উজ্জ্বলতা ও মধুরতাকে পরমতার কাছে লইয়া যায় সেটি ভাবিলে আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না!

ঐ চারিটি মিলিয়া সাধকের অধঃ, মধ্য এবং ঊর্দ্ধ সমগ্র সত্তা ভরিয়া এক অপূর্ব মহোৎসবের আয়োজন তো করিবে। কিন্তু, গোড়ায় সাধকের জীবনে জ্যোতি ও রসের কোনও সাড়াই তো মিলে না দেখি! সাধকের আপন সত্তাটিকে মনে হয় যেন অশ্ম বা পাষাণের স্তূপ। শৈলগাত্রে জমাট তুষাররাশির মত রস বা আনন্দ সেখানে যেন এক অলসিত জড়িমায় অবশ হইয়া পড়িয়া আছে। এই অলসিত ভাবটিকে বলে "অলসিত রসজাড্যম্"। তখন সাধকের অন্তরে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে: "ওগো আমার অজানা রসনির্ঝর! তুমি এই গুরু পাষাণস্তূপের তলে কোথায় নিভৃতে লুকাইয়া আছো! তুমি কি জাগিয়া এই বিশাল দুর্ভেদ্য তুষারকারা গলাইয়া দিবে না? আর আমার এই গুরুভার তুষারজড়িমাকে স্বচ্ছন্দে গলিয়া নিয়ত উল্লাস চঞ্চল নৃত্যে স্নিগ্ধ মধুর কলতানে আমার জীবনের রসবহা নাড়ী প্লাবিয়া প্রবাহিত হইতে দিবে না-(বিগলয়তু

রসোৎসো গন্তুমুল্লাস লাস্যম্)। তারপর তুষাররাশি বিগলিত করিয়া যখন তুমি আমার জীবনের সর্বাবয়বে ও সর্বক্ষেত্রে স্নিগ্ধ স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মত শান্তি, পুষ্টি, শ্রী বহন করিয়া তোমার চির আকাঙ্ক্ষিত রসসিন্ধুর পানে বহিয়া যাইবে, তখন গিরিকান্তার কেদারবাহিনী তোমার রসধারা অপূর্ব বিলসিত শোভা কি আমাকে মুগ্ধ ও ধন্য করিবে না! (বিলসিত তটশোভাং বিভ্রতী রাসধারা)। কিন্তু তোমার এই অপরূপ সুষমাময় পুণ্য অভিসারে শেষ গন্তব্যটি কোথায়? সেইটি তো সেই স্বলসিত রসসিন্ধু! যেখানে রসের সকল কুণ্ঠা ও কার্পণ্য একান্তভাবে নিঃশেষ হইয়া এক পরম শান্ত "স্বে মহিম্নি" পরিপূর্ণ সমাপ্ত হইয়া যায়। অতএব যিনি তোমার যাত্রার মূলে সকল প্রেরণা দিতেছেন এবং তার পথটিকে সকল বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া আপন সন্ধানেই টানিয়া লইতেছেন, সেই তাঁরই আপন করুণা মহিমাতেই তোমার যাত্রার এই পরম অবসানটি সিদ্ধ হউক্ (যাতু ধাম্নৈব তস্য)!

অলসিত রসের যে জড়িমা তাহা হইতে সত্য জাগরণের যে উল্লাস-মুখরতা সেটির পরিচয় পাই শিশু অথবা বিহগ কণ্ঠের কাকলীতে। তারপরে এই কাকলীর যেটি কুণ্ঠাহীন অথচ ছন্দের শাসনে না আসা মধুরিমা। সেটির বিচিত্র ছন্দে বিলাস হইয়া থাকে যখন সেটি আপনাকে সুললিত সুরশিল্পে লীলায়িত ও রূপায়িত করিতে পারে। কিন্তু সুরশিল্পের এইরূপ ছন্দসা যে বিলাস সেটির পরিপূর্তি ও অবসান হইয়া থাকে—কোথায়, কি ভাবে? ছন্দঃকুশল সুরশিল্প এক অপরূপ বিচিত্র বিলাসের মাঝখানে যখন অনির্বচনীয় নাদ-ধারায় বহমানতা আবিষ্কার করে তখন তার হয় এক পরম নিবিড় নাদসান্দ্র সমাধির অবস্থা। এ অবস্থাটি সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় হইলেও কোনওরূপ বাণী অথবা সুরের দ্বারা নির্বচনের যোগ্য নয়। এখানে আসিয়া ছন্দঃ যেন তার সকল ধরা বাঁধার বাঁধন এলাইয়া দিয়া আপন লীলা কৈবল্য স্বরূপের অতল গভীরতায় ডুব দিয়া পরিপূর্ণ অথচ শান্ত হইতে চায়। সুরকেলি এবং ছন্দঃশাসনের এই যে বিরামের ভূমি সেটা কিন্তু স্তব্ধতার অথবা শূন্যতার মৌন মাত্র নয়। এটা হইল এক সীমাহীন অতলস্পর্শ রস সংবিদ্ রূপ, সিন্ধুর মাঝে আত্মার সকল আকুতি ও আবেগের চরিতার্থতার ঠাঁই। এখানে আসিয়া আর খোঁজাখুঁজি, ছুটাছুটি নাই। এখানে পৌঁছিয়া তার শেষ আকুতির লেশটুকু সন্ধ্যার অন্তিম রক্তরেখার মত যেন এক অনির্বচনীয় অতল কালো অথবা অতল ধলো স্নেহের কোলে নিজেকে ডুবাইয়া

স্বয়ং প্রপূর্ণ ও শান্ত হইয়া যায়। অলসিত মগ্নতার ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া এই শেষ স্বলসিত মগ্নতার ভূমি পর্যন্ত না পৌঁছিতে পারিলে, জীবনের রস সংবেদনের যেটি প্রপূর্তি ও চরিতার্থতা সেটি ঘটে না—ইহা জানিতে হইবে।

এইবার ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া রসের অলসিত রূপ হইতে স্বলসিত ভাব পর্যন্ত উন্মেষ ও বিকাশ যে কি ভাবে হইয়া থাকে সে'টির ভাবনা কর। ওঙ্কার অথবা অপর কোনও বীজ যখন সাধকের কণ্ঠে আদৌ উচ্চারিত হয় তখন সচরাচর বোধ হয় যেন তার সকল নিগূঢ় রস ও জ্যোতি এক অলস জড়িমার তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ওঙ্কারের মধ্যে উবর্ণ (মধ্যে যোঽর্ণঃ) যখন সমুদিত হইয়া আপন উন্মেষ ও উন্নয়ন শক্তিতে সক্রিয় হইয়া ওঠে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে প্রণবের অলস মূর্চ্ছা যেন এইবার ভাঙ্গিতেছে এবং তার ফলে উল্লাসের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। এই উল্লাসের শুদ্ধি ও পুষ্টি হইতে থাকিলে অ-কার উ-কার ম-কার এই ত্রিমাত্রার পারে যে অর্দ্ধমাত্রা রহিয়াছেন যোগনিদ্রা-রূপিনী সেই অর্দ্ধমাত্রার জাগরণটি তখন ঘটিয়া থাকে। এই জাগরণের প্রসাদে ওঙ্কারের মধ্য হইতে নাদ, বিন্দু ও কলা শক্তির সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়। রসনা-মল, শ্রবণ-মল এবং চিত্ত-মল এই ত্রিবিধ মলের শোধন না ঘটা পর্যন্ত এই ত্রিতয়ের অভিব্যক্তি সংঘটিত হয় না। এই ত্রিবিধ মলের অপসারণের ফলে নাদ, বিন্দু এবং কলাশক্তিকে আশ্রয় করতঃ রস ও জ্যোতির এক অতি অপরূপ বিলাস, সাধকের অনুভূতিতে উন্মোচিত হইতে থাকে, তৎ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তারোল্লাস কিনা প্রণবের উল্লাসের শুদ্ধ ভূমিগুলিতে এবম্প্রকার বিলাসের সম্ভাবনাটি হইয়া থাকে। অর্থাৎ গোড়ায় যেটি তরুণ ও মলিন উল্লাস সেটিকে ক্রমে প্রৌঢ় ও বিমল উল্লাসে না আনা পর্যন্ত, রসজ্যোতির এই অপরূপ বিলাসটি সত্যসত্যই দেখা দেয় না। এই জন্য প্রণব অথবা অন্য কোনও নাম লইয়া সাধন করিতে বসিয়া যেই একটুখানি উল্লাসের পরশ ও শিহরণ অনুভবে আসিল তখনই ইহা মনে করিলে চলিবে না যে আমার অনুভব এইবার অকুণ্ঠ রসোজ্জল দিব্য অনুভূতিতে উপনীত হইয়াছে। গোড়ায় যে উল্লাসের সাড়াটি মেলে সেটিকে পাইয়া ভরসা করারও যেমন আছে তেমনই আবার ভয় করারও অনেক কিছু আছে বা থাকিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভবিতার যন্ত্রে মলের লেশটুকু রহিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে "সত্য" কখনই সমগ্র ও নির্দোষভাবে আপন ছবিটি উঠিতে দিবে না। সুতরাং যদি বা রস একটু মেলে

তো তার সঙ্গে রসাভাসও যে কতটা মিশিয়া আছে সেপক্ষে সাধককে সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপ আবার আলোকের সঙ্গে আলেয়াও অনেকদূর অবধি বেমালুম মিলিয়া মিশিয়া চলে—ইহাও মনে রাখিতে হইবে। তারপরে ধরা যাক, সাধকের চিত্তাদির মলের ক্ষালনের ফলে তার মধ্যে রস জ্যোতির যথার্থ বিলাসটি হইতেছে। অর্থাৎ এইবার তিনি সত্য-সত্যই ঋষি বা দ্রষ্টা।

কিন্তু, তবু প্রশ্ন জাগে এইখানেই কি শেষ? যে তিনপ্রকার মলের কথা আগে বলা হইল সে তিনেরই মূলে আরও একটি মল রহিয়াছে যেটিকে বলা যায় আণব মল। এইটি যতক্ষণ অপগত না হয়, ততক্ষণ দ্বন্দ্বের পারে সুতরাং সকল কলনের পারে যে দ্বন্দ্বাতীত কলাতীত তত্ত্ব সেখানে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। উত্তীর্ণ হইলে দেখা যায় অলসাদি বিবিধ ভাবের আশ্রয়রূপে আপন মহিমায় চিরলসিত পরম শান্ত একটি ভাব রহিয়াছে, যেটিকে ব্যক্ত করিতে গেলে কোনও উপসর্গেই আর কুলায় না। কাজেই দ্বন্দ্বাতীত কলাতীত পরম ভাবের প্রান্ত-ভূমিতে যাইয়া শুধু এই প্রশ্নটিই করিতে পারা যায়— "কো লসন্ স্বে মহিম্নি?" স্বে মহিম্নি বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে সেখানে তা'ছাড়া আর অপর কিছুরই অপেক্ষা নাই (absolute)।

যে নাম গ্রহণ করিতেছি সে নাম যতক্ষণ পর্যন্ত অলসিত রস বোধ হয় ততক্ষণ বিধিমত ছন্দ সহকারে সেটির উদ্‌গান করিতে হয়। এইরূপ উদ্‌গানের ফলে আমার যন্ত্রে সুষমস্পন্দ জাত ও সঞ্চিত হইয়া নামের যেটি অলসিত ভাব সেটি কাটাইয়া দেয়। তখন যন্ত্র যেন মন্ত্রের আহ্বানে সাড়া দিতে আপনাকে প্রস্তুত দেখিতে পায়। এর ফলে প্রথমে রসের যে পরশটুকু মিলে, সেটি হইল উল্লাসের তরুণ ভাব। এই ভাব উদিত হইলে গোড়াকার উদ্‌গান নিজেকে এক মধুর ভাবের গুঞ্জনে পরিণত হইতে দেখে। এই ভাবের গুঞ্জনটি চলিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লাসের প্রৌঢ়ি কিনা প্রৌঢ়ভাব দেখা না দেয়। এই উল্লাসে প্রৌঢ়ি দেখা দিলে পরিণামটি দুই ভাবে চলিতে থাকে। প্রথম, বাহ্য রূপ-শব্দাদিতে যে লিপ্সা বা কাম সেটি বিগলিত হইয়া যায়; দ্বিতীয়, বাকের যে স্থূল অবস্থা থেকে নামের ধ্বনি উচ্চারিত ও শ্রুত হইতেছিল, নাম সেই স্থূল অবস্থার পারে চলিয়া গিয়া এক অতীন্দ্রিয় দিব্য উজ্জ্বল রসাস্বাদময় অনুভূতিতে উপনীত হয়। তখন, কিন্তু, নামের কীর্তন স্তব্ধ হইয়া যায় না; পরন্তু সে কীর্তন এক অপরূপ আন্তর বিলাসরূপে নিজেকে প্রকট করিতে থাকে। কারিকায় যে

"অতনুধনুযঃ" পদটি রহিয়াছে তার ব্যঞ্জনা ঐ দুই ভাবেই বুঝিতে হইবে। অতনু শব্দের অর্থ অনঙ্গ বা কাম, অর্থাৎ বহির্বিষয়ে রতি। আবার অতনু=যেটি তনু বা সূক্ষ্ম নয় অর্থাৎ স্থূল। এই দ্বিবিধ অতনুর যেটি ধনু কিনা সন্ধানের সীমা তার পারে নাম উপনীত হইলে তবে সত্যই সে নাম দিব্য আন্তর বিলাস রূপটি গ্রহণ করিয়া থাকে। এ অবস্থাতেও কিন্তু নাম কীর্তনের বিরাম হয় না। তখনও সাধকের সারা জীবনপুঞ্জ ভরিয়া কোন এক অপরূপ বীণা আপনাকে বিচিত্র রাগে ও ছন্দে লীলায়িত করিতে থাকে। এই আন্তর বিলাসটি গাঢ়ভাবে চলিতে থাকিলে অন্তে যে পরম নিবিড় মাধুরীর আস্বাদ মিলিয়া যায় সেটিকে কারিকায় "মাধ্বীমগ্নং হৃদি বিলসনং"—এইভাবে আভাসে বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ এটি বলার বিষয় নয়। বলিতে গেলে শুধু একটা কথাই বলিতে হয়—"আত্মরসৈক সারম্"। আত্মা নিজেকে শুধুই এক অনির্বচনীয় অপরিসীম রস ও জ্যোতিরূপে উপলব্ধি করিয়া সেই পরম উপলব্ধির গভীরতায় শান্ত সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই তখন কে-ই বা কিসেরই বা কীর্তন করিবে বল? এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর যে নামকে সম্বল করিয়া এইভাবে চলার পথে তিনটি সন্ধি পার হইয়া যাইতে হয়। প্রথমটি উপস্থিত হয় যখন আমার তরুণ উল্লাস উল্লাসপ্রৌঢ়িরূপে নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবে। কেন না উল্লাসের তরুণভাবে অনেক কিছু আবিলতা ও চপলতা বেমালুম থাকিয়া যায়। এগুলির শোধন না হওয়া পর্যন্ত বিমল প্রগাঢ় যে উল্লাস তার উদ্দেশ মেলে না। এই সন্ধিটিকে অবার সন্ধিও বলা যায়। গুরুশক্তিকে পুরোভাগে রাখিয়া মুখ্যতঃ আত্ম-কৃপা দ্বারাই এ সন্ধিটি উত্তীর্ণ হইতে হয়। তারপর যাত্রা সুরু হয় কীর্তনের যে দিব্য আন্তর বিলাস সেই রসোজ্জ্বল ভূমির অভিমুখে। এখানেও অপর একটি সন্ধি পার হইতে না পারিলে সেই অতনুধনুর সন্ধানে সীমার পারে উপনীত হওয়া যায় না। এখানে উল্লাস শুধু বিমল ও গাঢ় হইলেই হইল না; সেটিকে আবার আন্তর জ্যোতিরূপে বিকশিত হইতেও হয়। এটি হইল বর সন্ধি। ভগবানের কৃপা পুরোভাগে রাখিয়া শ্রীগুরুকৃপা সহায়েই এই সন্ধিটি পার হইতে হয়। কাজেই এ স্থলে শরণাগতি ছাড়া উপায় নাই। শেষকালে "আত্মরত্যৈকসারম্" রূপ যে পরম উপলব্ধি তাতে উপনীত হবার জন্য শেষের সন্ধিটিও পার হইতে হয়। এটি হইল চরম বা বরিষ্ঠ সন্ধি। এখানে আত্মকৃপা এবং গুরুকৃপা এই দুই কৃপার ধারাই একমাত্র

ভগবৎ কৃপাতেই আসিয়া মিলিত হয় এবং নিজেদের সেই একই কৃপার বিভূতি ও বিলাসরূপে জানিয়া চরিতার্থ হয়। এই সন্ধিগুলি পর পর অতিক্রম করিয়া যাত্রাটি চলিতে না পারিলে যাত্রার অসম্পূর্ণতা অনেক সময় নিজেকে অবাঞ্ছনীয় ও অশোভনরূপেও দেখাইয়া থাকে।

একপ্রকার অবাঞ্ছনীয় পরিণাম হইল মত্ততা, স্তব্ধতা, সম্মূঢ়তা। আর অন্য প্রকারের হইল ছন্দোহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, 'ভদ্রহীনতা'। "অতনু" শব্দটিকে আমরা আগে দুই রকমে দেখিয়াছি। কিন্তু এই শব্দটির অন্যবিধ ব্যঞ্জনাও আছে—ইহা বুঝিতে হইবে। যেমন অতনু মানে যোগবাশিষ্ঠাদির তনুমানসা ভূমির পারে যে শুদ্ধ সত্ত্বাপত্তি প্রভৃতি ভূমি রহিয়াছে সেগুলি বুঝিতে হইবে। আবার অতনু=অ এই বর্ণ হইয়াছে তনু যাহার। সাধারণতঃ 'অ' এই বর্ণ দ্বারা তলবৃত্তি সূচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন ক্রিয়া বা ভাব যে তলে বা ভূমিতে চলিতেছে, 'অ' বর্ণ সেটিকে সেই তলেই রাখিয়া দেয়। কিন্তু সেটি সে তলে রহিয়া গেলে কোন ঊর্দ্ধতর বা গভীরতর তলের সন্ধান মিলিবে কি করিয়া? কাজেই আ, ই, উ, ঋ প্রভৃতি স্বর আশ্রয় করতঃ স্থানিক তলবৃত্তিটি (static planar action) কাটাইয়া বেধ বৃত্তি, লম্বগা বৃত্তি ইত্যাদির প্রবর্তনের যত্ন করিতে হয়। সেটি না করিতে পারিলে নামের শক্তি বর্দ্ধিষ্ণু (dynamic) হইতে অপারগ হয়। যেমন ধর অউম এর উচ্চারণে শেষের অকারটি মকারকে যেন একই তলে (বৈখরী) চাপিয়া রাখিতে চায়। এই চাপ (constrained factor) সরাইতে না পারিলে ম-কারের পারে যে অর্দ্ধমাত্রা তাঁর জাগরণটি সম্ভাবিত হয় না। এই নিমিত্ত সাধককে প্রণবের আদি এবং অন্তে এই দুই স্থলেই অ-কারের তলবৃত্তিটি কাটাইয়া ওঠার যত্ন করিতে হয়; আদিতে উকারের সাহায্যে ধ্বনির বিস্তার করিয়া লইতে হয়। অন্তে সেই বিস্তারিত ধ্বনিটি আবার সঙ্কুচিত করিয়া যথাসাধ্য সূক্ষ্মে লইয়া আসিতে হয়; যেমন বীজ হইতে পাদপ এবং পাদপ হইতে বীজ। সুতরাং দেখিতেছি যে আমার নামটিকে কোন উপায়ে অকারের তলবৃত্তি কাটাইয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে ঊর্দ্ধ, অধঃ সকল দিকে অকুণ্ঠ প্রসার লাভ করিতে দিতে হইবে। অন্যথা নামের যথার্থ শাপমুক্তি বা পাশমুক্তি ঘটে না।

লক্ষ্য কর যে অতনু এই রহস্য শব্দেই পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার নির্দ্দেশটি দেওয়া রহিয়াছে। যথা অতনু = অ+তন্+উ। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। সুতরাং অ-কারকে

উ-কারের সাহায্যে বিস্তার করার নির্দেশ এই শব্দে পাইতেছি। বিস্তার বলিতে কোন সীমার অভিমুখে প্রসার বুঝাইয়া থাকে। প্রণবের স্থলে বিন্দু হইতে নাদ, আবার নাদ হইতে বিন্দু—এইভাবে দুই সীমার অভিমুখে দুই রকমের বিস্তার সূচিত হইতেছে। প্রথম বিস্তারকে উদয় আর শেষের বিস্তারকে বিলয় বা সঙ্কোচ বলাও যায়। এইভাবে প্রণবের ব্যাহরণ হইলে তবে সেটি যথার্থ এক "মহাচক্র" রূপে আবর্তন করিতে থাকে—যে মহাচক্র বারাহী শক্তি বসুন্ধরার অতলস্তব্ধতার ও তমিস্রার ঘোর কাটাইয়া সেটিকে ঊর্ধ্বচেতনার আলোকে ও আনন্দে উত্তোলন করার নিমিত্ত ব্যবহার করিতেছেন। পুনশ্চ অতনু শব্দে আমরা কাম বুঝিয়াছি। বর্তমান কারিকায় এই কামকে উত্তোলন বা উদ্বর্তনের (sublimation) তিনটি ভূমি দেখানো হইয়াছে। প্রথমটি কাম-কাম। যার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন "স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী"। তরুণ উল্লাস থেকে উল্লাসপ্রৌঢ়িতে আরূঢ় হইতে গেলে এই কাম-কামী ভাবটি কাটাইয়া উঠিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় নাম-কাম। এটির উদয় হইলে ইন্দ্রিয় বা বিষয় কাম বিগলিত হইতে থাকে এবং নামেই একনিষ্ঠ কাম উৎপন্ন হইতে চলে। শেষকালে আত্মকাম—এই আত্মা, কিন্তু, দেহাত্মা, চিত্তাত্মা, জীবাত্মা এমনকি প্রাণাত্মাও নয়। এ সকলেরই "গতি র্ভত্তা প্রভুঃ সাক্ষী" ইত্যাদি রূপে যিনি রহিয়াছেন একমাত্র তাঁতেই কাম এইটি বুঝিতে হইবে। এইখানেই কামের পরম চরিতার্থতা ও বিশ্রান্তি। মাঝখানে যে কামের কথা বলা হইল সেটি এই পরম চরিতার্থতায় উত্তরণের সেতু। কাজেই সেতু-স্বরূপ নামকে নিষ্ঠাসহকারে ভজনা কর।

অতঃপর সামবেদের প্রসিদ্ধ শান্তি পাঠ মন্ত্র যে কিভাবে জপধ্যানে প্রয়োগ করিয়া আমাদের এই সাধারণ অলসিত ভাব থেকে ক্রমশঃ উল্লসিত, বিলসিত এবং স্বলসিত ভাবে যাইতে হইবে তাহার সঙ্কেতটি দেখানো হইতেছে। নিজের আত্মা আর আত্মার বাইরে এই যে বিচিত্র বিশ্ব এদের "হৃৎ", কিনা মর্মবস্তু হইল আনন্দ। কিন্তু আমাদের সাধারণ অনুভবে বিশ্বের ও আমার এই মর্মবস্তুটি যেন কুণ্ঠিত ও লুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এইটি হইল বিশ্বের ও আমার অলসিত ভাব। এই অলসিত ভাবটি কাটাইব কিরূপে? কে বা কি এদের "অনলসনকৃৎ" হইবে? এইটির নিমিত্ত শান্তিপাঠ মন্ত্রের শেষে যে সাধনটি দেওয়া রহিয়াছে, যে আকুতিটি ধ্বনিত হইতেছে আমার জপধ্যানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয়টি হওয়া চাই। অর্থাৎ আমাকে সেই আকুতি

বা আস্পৃহা অন্তরে জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে এবং সে অগ্নিতে সেই সাধনরূপ হোমটি করিয়া যাইতে হইবে, যেটি আত্মনিরত পুরুষ স্বভাবতঃই করিয়া থাকেন বলিয়া উপনিষদ কীর্তন করিতেছেন— "তদাত্মনি নিরতে যঃ উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।" এই আন্তর হোমটি চলিতে থাকিলে বিশ্বে ও আমাতে যে অলসিত ভাব সেটি কাটিয়া যাইতে থাকে। এই হোম আরব্ধ না হইলে যথার্থ আপ্যায়নের সম্ভাবনাই দেখা দেয় না। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইতেছে যে পূর্বোক্ত আকুতি এবং সাধন যখনই জীবনে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই—তার পূর্বে নয়। 'আপ্যায়ন্তু'—এই মন্ত্রের দ্বারা আপন আন্তর হোমাগ্নিকে উদ্দীপ্ত ও উল্লসিত করিয়া লও। তখনই সকল প্রিয় হইতে প্রিয় যে অমৃতধারা সেটি পানের সুযোগ ও সময় দেখা দিয়া থাকে (প্রেষ্ঠ পীযূষপানম্)।

এ পীযূষধারা তো সনাতনী। কিন্তু, এর নিমিত্ত আমার অন্তর বেদীতে সত্যকার পিপাসার অগ্নিটিকে জ্বালাইতে পারিলাম কই? কাজেই এই প্রেষ্ঠ পীযূষধারায় আমার আপ্যায়ন বাস্তব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার অন্তরে উপযুক্তভাবে আস্পৃহা ও সাধনটি চলিতে থাকে। সত্যকার আপ্যায়নের এইটিই হইল necessary pre-condition. কিন্তু প্রথমে আপ্যায়নটি হয় কিসের? গোড়ায় আমি, আমার বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র অঙ্গাগুলির কথাই বেশী করিয়া ভাবি। নিজেকে বলি বটে আমি আত্মনিরত; কিন্তু, বাস্তবে তখনও যে অঙ্গানিরত হইয়া রহিয়াছি। এইজন্য প্রথম আপ্যায়নে আমার অঙ্গাসমূহে উল্লাস দেখা দিলেও সে উল্লাস যেন সত্যকার আপন উল্লাস বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় কে যেন এই বিবিধ অঙ্গাসমূহকে আপ্যায়নের নিমন্ত্রণে পাঠাইয়া নিজে কোথায় সঙ্গোপনে এখনও উপবাসী রহিয়াছে। এইজন্য কারিকায় বলা হইতেছে যে অঙ্গোল্লাসটি ঘটিলেও যিনি অঙ্গী বা আত্মা তাঁর পরিলসনটি বাকী রহিয়াছে। সে পরিলসনটি ঘটাইবে কিরূপে? যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গী বা আত্মাকে ব্রহ্ম বা ভাগবতী সত্তা হইতে এতটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিলসন কিনা সর্বতোভাবে লসন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হয় না। তোমার দিক হইতে অজ্ঞান এবং তাঁকে অস্বীকার—এটিকে যেমন পরিহার করিতে হইবে, তাঁর দিক্ থেকেও তাঁর অচিন্ত্য মায়াশক্তি সম্বরণ করিয়া তোমাকে তাঁর ভিতরে আত্মসাৎ করিয়া লইবার নিমিত্ত আগাইয়া আসিতে হইবে। এ যেমন নদী আর নদী-নাথের সম্পর্ক। নদীর দিক্ থেকে

চাই অকুণ্ঠ অকৃপণ আবেগ ও আহ্বান, আর নদীনাথের দিক্ থেকে চাই অহেতুক মহান্ দরদী উচ্ছ্বাস ও সাড়া। শান্তিপাঠ মন্ত্র এই কথাটি অতি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন— "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ্"। দুইদিক্ থেকেই এই মায়িক নিরাকরণের নিরাকরণ হওয়া চাই। নিরাকরণ শব্দটিও রাহস্যিক। ঐ শব্দের মধ্যে যে আকার রহিয়াছে সেটির দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা, ব্যাপ্তি ও সীমা। কাজেই অনিরাকরণ হইতে গেলে সকল গণ্ডী কাটাইয়াই যাইতে হইবে; আর শেষ পরিসীমা পর্যন্তও যাইতে হইবে। ভাল, তোমার আন্তর বেদীতে হোমানল তো অপরূপভাবে উল্লাসে ও বিলাসে আপনাকে ধন্য করিয়াছে দেখিতেছি। কিন্তু, এ হোমেরই বা পূর্ণাহুতি কোথায় এবং কিসে? একটা ক্ষুদ্র ধূলিরেণু থেকে মহান্ আত্মা পর্যন্ত সব কিছুই সেই ব্রহ্ম, তা'ছাড়া আর কিছুই নয়— "সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিযদম্" এই পরম উপলব্ধিতে। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদমিতি প্রাস্তমগ্নৌ তদাজ্যম্।। অঙ্গ, অঙ্গী বা অঙ্গ-স্বামী এবং অঙ্গি-স্বামী—এই তিনটি সবনে বা আপ্যায়নে এই বিশ্বপাবন হবনটি সমাপনীয়।

ভাবনা কর তোমার জীবন বেদি। সেখানে যে সর্ব-আপ্যায়ন হবনটি অনুষ্ঠান করিবে তার নিমিত্ত কি উপযুক্ত সমিধ্ আহরণ করিয়াছ? সেই সমিধ্ কি উপনিষদ্ আত্মনিরত পুরুষের যে শম দমাদি ধর্মের কথা বলিয়াছেন, সেইগুলিই? আচ্ছা, আগে সমিধ্ আহরণ না অগ্নিচয়ন? বহির্যাগে আগে সমিধ্ আহরণ করিয়া পরে অগ্নিচয়ন অথবা মন্থন করিতে হয়। কিন্তু তুমি যে আন্তর যাগটি অনুষ্ঠান করিতেছ, তাতে অগ্নির উদ্দীপনটি গোড়ায় আবশ্যক হয়, অর্থাৎ গোড়ায় চাই আকুতি বা আস্পৃহা (aspiration)। এটিই থাকিলে এবং উপযুক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে শমদমাদি ধর্মের সাধন স্বচ্ছন্দেই হইবে। এই আকুতির কথাই বেদমন্ত্র বলিতেছেন— "তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।" অতঃপর আপ্যায়নরূপ হবনটি আরম্ভ হইয়া থাকে। এই হবনটি তিনটি পর্যায়ে সমাপন করিতে হয়। প্রথমে বাক্ প্রাণাদি অঙ্গসমূহের আপ্যায়ন; দ্বিতীয়, যেটি অঙ্গী বা অঙ্গস্বামী তার আপ্যায়ন— "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং" ইত্যাদি মন্ত্রে। শেষে যিনি সকল অঙ্গ-স্বামীরও স্বামী সেই ঔপনিষদ ব্রহ্মের চরম আপ্যায়নটিও সমাপন করিতে হয়।

আবার স্বরের দিক দিয়া লক্ষ্য কর যে এই আপ্যায়ন মন্ত্রে একবিংশতি বার আকরণ হইয়াছে। আকরণ বিশেষভাবে হইলেই হয় ব্যাকরণ। আর আমরা দেখিয়াছি প্রাণের

ব্যাকরণই হইল ছন্দঃ। আকরণটি ঠিক ঋতচ্ছন্দে না হইলে কোনও সমর্থ আকৃতি বা Pattern উৎপন্ন হয় না। যাহা কিছু জমাট আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাকে ভাঙ্গিয়া যদি কোনও সমর্থ শোভন আকৃতিতে আনিতে হয় তবে প্রয়োজন হয় এই আকরণের। শেষের তিনটি শান্তি বচনের আকার গণনা করিয়া এই একবিংশতি সংখ্যার পূরণ হইয়াছে—দেখিও। এ সংখ্যাটি আকস্মিক নয়। যেমন 'জাতবেদসে' এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রে 'আ' স্বরটিকে আমরা আটবার পাইয়া থাকি। এই একবিংশতি সংখ্যার ব্যঞ্জনায় বিশেষভাবে ধ্যান লাগাইও। 'স্বাহা' এই শেষের আকারটিকে প্লুতভাবে উচ্চারণ করিয়া যদি আকারের তিনটি মাত্রা পাওয়া যায় তাহা হইলে ওঁ, ভূঃ, স্বাহা ইত্যাদি সপ্তব্যাহৃতি হোমে আকরণটি একবিংশতি বার হইল দেখিতেছি। আবার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, জীবাত্মা এবং মহানাত্মা এই একবিংশতি তত্ত্বের আপ্যায়নটি আমার সাধিতে হইবে ঐ বেদোক্ত আপ্যায়ন মন্ত্র দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আপ্যায়ন মন্ত্রের যন্ত্ররূপ আকৃতিটিও ভাবনা করিও। প্রথমে অঙ্গসমূহের আপ্যায়ন হইতেছে। কিন্তু, লক্ষ্য করিয়া দেখ এই অঙ্গসমূহকে কত সংখ্যায় লওয়া হইতেছে। বাক্ প্রাণ থেকে আরম্ভ করিয়া "ইন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি" পর্য্যন্ত ষোলটি সংখ্যা। এখানে বাক্, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র বাদে চতুরঙ্গ অন্তঃকরণকে ধরিয়া ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ লইতে হইবে। এই ষোড়শ অঙ্গ একটি যেন ষোড়শদল পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হইল—ইহাই অগ্রে ভাবনা কর। এইটি হইল অঙ্গের আপ্যায়ন। এই ষোড়শদল পদ্মের কর্ণিকায় একটি ভাস্বর মণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে, সেটি হইল যিনি অঙ্গী বা অঙ্গ-স্বামী জীবাত্মা তাঁর পীঠস্থান। এই কর্ণিকাভ্যন্তরে যে অঙ্গ-স্বামী বিরাজমান তাঁর আপ্যায়নটি অতঃপর তোমায় করিতে হইবে। এই আন্তর আপ্যায়নের নিমিত্ত কর্ণিকার জ্যোতির অভ্যন্তরে অপর একটি নিভৃত কমল তোমাকে ধ্যানে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। মর্মের এই কমলটি পঞ্চবর্ণময়। কাজেই পঞ্চদল ভাবনা করিও। আপ্যায়ন মন্ত্রের আত্মার সূচক বা লিঙ্গ যে কয়টি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—যথা মম, অহং, মে, ময়ি, মা—সে সকল হইতে অ, ই, এ, আ এই কয়টি বর্ণ আহরণ কর। আর 'অস্তু' এবং 'সন্তু' এই দুইটি পদে শ্রীগুরুর কৃপা সঞ্চাররূপ যে উ বর্ণ রহিয়াছে সেটিকেও আগেকার চারিটির সঙ্গে গ্রহণ কর। তাহা হইলে সর্বসমেত অ ই উ আ এ এই পাঁচটি বর্ণ তোমার ধ্যানের বস্তু যে কমল তার পাঁচটি দলরূপে তুমি পাইবে।

এই মমাদি পাঁচটিকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে যে বর্ণ সেটি হইল ম কার। সর্বশুদ্ধ এই ছয়টি বর্ণকে লইয়া উপযুক্তভাবে বিন্যাস পূর্ব্বক "ওঁ ঐঁ ওঁ" এই মন্ত্রটি উদ্ধার কর। ধ্যান কর যে আত্মার সাক্ষাৎ আপ্যায়নরূপ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রটি ষোড়শদল কমলের কর্ণিকার অভ্যন্তরে যে পঞ্চদল কমল—সেটির কেন্দ্রস্থলে একটি ত্রিকোণ যন্ত্ররূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ ত্রিকোণের শিরোভাগে ঐঁ এবং অপর দুই বিন্দুতে দুটি ওঙ্কার। শেষকালে তোমার এই সমগ্র ধ্যানটিকে এক পরম অখণ্ড জ্যোতির আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শান্ত হও। এইখানেই আপ্যায়নের শেষ। প্রশ্ন জাগে—এইরূপ ধ্যান কি তোমার কল্পনা মাত্র? ইহাকে কল্পনা বলি কিরূপে? জপধ্যানসহকারে তোমার আপ্যায়ন কর্মটি যদি ঠিক ভাবে চলিতে থাকে, তবে এটা নিশ্চিত যে তোমার আপ্যায়ন মন্ত্রের সূক্ষ্ম এবং সমর্থ ধ্বনিস্পন্দগুলি আপনাদিগকে এইরূপ এক আকৃতিতে তোমার আন্তর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিবেই। সাধকবিশেষের ধ্যানে যে আকৃতি ফুটিল তার সঙ্গে অপর সাধকের আকৃতির কথঞ্চিৎ বিলক্ষণতা থাকাও স্বাভাবিক বটে। কিন্তু, ক্রিয়াটি স্বচ্ছন্দে চলিলে আকৃতিগত মৌলিক সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইবারই কথা। এটিও লক্ষ্য করিও যে কমল-কর্ণিকার নাভি বা কেন্দ্রে প্রণব-পুটিত যে বীজটি রহিয়াছেন তিনি (ঐঁ) হইলেন বাগ্‌ভব গুরুবীজ। সুতরাং গুরুশক্তি একেবারে কেন্দ্রস্থলে রহিয়া অঙ্গ, অঙ্গী এবং অঙ্গস্বামী এই ত্রিবিধ আপ্যায়নে যজ্ঞটি সমাপন করিয়া লইবেন। সেই শক্তিকে সহায় ও সুহৃৎরূপে না পাইলে কেবল মাত্র অহং মে মা ময়ি এই সকল আমিত্বসূচক পদ ও ভাবদ্বারা আন্তর আপ্যায়নটি কোন ক্রমেই সমাপন হইবার নয়। এই নিমিত্ত অস্তু এবং সন্তু এই দুইটি পদ হইতে শ্রীগুরুনামের যে উকার সেটিকে বিশেষভাবে আহরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। আর সেটি সম্ভাবিত হয় সর্বতোভাবে তাঁতেই আত্মসমর্পণের প্রসাদে।

অতঃপর জপধ্যানের আনুষঙ্গিক অঙ্গ-ন্যাসাদির অনুষ্ঠানের কথা বলা হইতেছে। তোমাদের আপন যন্ত্রের যেটি জাড্য বা অলসিত ভাব সেটি কাটাইবার নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষর দ্বারা উপযুক্ত ন্যাস-কর্মটি করিয়া লইবে। এখানে আপন যন্ত্র বলিতে দেহ, প্রাণ এবং চিত্ত এ তিনেরই সংঘাত বুঝিতে হইবে। এর মধ্যে যে দেহ তাহা কতকগুলি স্থূল ভৌতিক উপাদানে নির্মিত, এইরূপ দৃঢ় সংস্কার হইয়া রহিয়াছে। কাজেই মনে হয় যেন এই স্থূলদেহটা প্রাণ এবং চিত্তের সম্পর্কে একটা বিসদৃশ

বিজাতীয় বস্তু। কিন্তু বিসদৃশে বিসদৃশে কিম্বা বিজাতীয়ে বিজাতীয়ে সত্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্ভাবিত হয় না। কারবার সমানে সমানেই ঠিক ভাবে চলে। এই জন্য প্রথম প্রয়োজন হইল এই স্থূল শরীর যন্ত্রটাকে কোন উপায়ে প্রাণ ও মনের সমপর্যায়ে তুলিয়া লওয়া। অঙ্গন্যাস দ্বারা বিসদৃশের সদৃশীকরণ প্রথমে ভাবনায়, পরে অনুভূতিতে সাধিয়া লইতে হয়। সাধিয়া লইতে পারিলে এই অভিনব সংস্কার উদিত হইয়া থাকে, যে স্থূল শরীরটাও আসলে ভৌতিক উপাদানে নির্মিত নয়, পরন্তু ইহা প্রাণ ও অন্তঃকরণের স-গোত্র। এই সংস্কারটির উদয় ও স্থিতি হয় শরীরটাকে মন্ত্রাক্ষরময় ভাবনার দ্বারা। অর্থাৎ শরীরের এক একটি অঙ্গ বা অবয়ব হইতেছে এক একটি মন্ত্রাক্ষরেরই প্রকট মূর্ত অভিব্যক্তি। যেমনধারা একটা বীজের ভিতর যে শক্তি ঘনীভূতভাবে রহিয়াছে; সে বীজ হইতে অঙ্কুরাদির প্রতিটি অবয়ব হইতেছে সে শক্তিরই এক একটি মূর্ত বিকাশ। আর মন্ত্রাক্ষর যে আসলে কি বস্তু সে পক্ষে আমাদের আর সংশয় নাই। সুতরাং মন্ত্রাক্ষররূপ সেতু আশ্রয় করিয়াই আমাদের এই স্থূল যন্ত্রটা প্রাণ মন এবং ঊর্দ্ধ চেতনার সম-পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। স্থূল যন্ত্রটাকে যদি বলি ভূঃ এবং অধ্যাত্মভূমিকে যদি বলি স্বঃ, তবে মন্ত্রাক্ষর এতদুভয়ের সংযোজক ভুবঃ। গোড়ায় সাধকের স্থূলের এই প্রকার উন্নয়ন বা উদ্বর্তন করিতে হয় ভাবনার-"আরোপ"-(auto-suggestion) সাহায্যে। কিন্তু ঋত ও মিত্রচ্ছন্দে জপধ্যান কর্মটি যতই চলিতে থাকে ততই স্থূল স্পন্দগুলির বিসদৃশ ও বিজাতীয় ভাব (disharmony and antipathy) দূরীভূত হইয়া তাদের ঊর্দ্ধতন সত্তার স্পন্দের সাথে সাদৃশ্য ও সাজাত্য (harmony and sympathy) প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। বীণা বা অপর কোন যন্ত্র বাজাইতে গেলেও সচরাচর এইরূপটি ঘটে। সুরে বাঁধা হইলেও বীণার অঙ্গসমূহ আলাপিত রাগের ছন্দে ঠিক সাড়া দিতে যেন প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু গুণীর অঙ্গুলিস্পর্শে আলাপনটি যতই চলিতে থাকে ততই যেন বীণার গোড়াকার কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ কাটিয়া যায় এবং সে তখন আপন রণন ও অনুরণনের নৈপুণ্যের মাধুর্যে যেন আপনি চমৎকৃত হইয়া যায়। সে তখন যেন অবাক হইয়া ভাবে, আমার এই কাঠের আর তারের দানাগুলোর আড়ালে কোন ছন্দোকুহকী এতক্ষণ যেন অসাড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; এইবার তার জাগরণ হইল। সাধকের আপন স্থূল যন্ত্রটার সম্বন্ধেও এইকথা। এটার সাথে গোড়ায় যে রকমের পরিচয় আর কারবার সেটা

সাধনের কল্যাণে অভিনব ও অপরূপভাবে বদলাইয়া চলিতে থাকে। ন্যাস অনুষ্ঠানের এইটি হইল তাৎপর্য ও সত্যকার প্রয়োজন।

তারপর ন্যাসের পর ভূত-শুদ্ধি। ভূত-শুদ্ধি আসলে হইল আমাদের এই কারবারী স্থূল হইতে সুরু করিয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর এবং পরম সূক্ষ্ম পর্যন্ত এক ঊর্দ্ধগামিনী ধারা। যে বিশেষ আকারে সাধককে এই ধারা আশ্রয় করিতে হয় সে সম্বন্ধে গুরু-শক্তি তাকে নির্দেশ দিয়া থাকেন। সকল সাধকের পক্ষে ঠিক একই ক্রমে বা প্রণালীতে এই ঊর্দ্ধ-প্রবাহের অনুসরণটি ঘটে না। জপের বেলা এই অভ্যারোহ প্রক্রিয়াটিকে এক বিশেষ ক্রমে ক্রমশঃ শোধন ও সমর্থ করিয়া তুলিতে হয়। প্রথমে জপটি ক্ষিতি তত্ত্বে চলিতে থাকে। তখন সে জপে ক্ষিতিতত্ত্বের কতিপয় ধর্মের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই জপকে ক্রমশঃ অপ্ তেজঃ বায়ু এবং আকাশ এই সকল ঊর্দ্ধতর তত্ত্বে উঠাইয়া লইতে হয়। লইতে পারিলে পূর্ব পূর্ব তত্ত্বের রোধক ও বাধক লক্ষণগুলি কাটিয়া যাইয়া ক্রমশঃ জপের অভ্যুদয় ও মহোদয়টি ঘটিয়া থাকে। যেমন অপ্‌তত্ত্বে যাইলে জপ হয় সাবলীল ও স্বচ্ছন্দে গতিশীল। রুক্ষতা ও শুষ্কতা কাটিয়া যাইয়া তাহাদের স্থলে একটা স্নিগ্ধ সরস ভাবও দেখা দিয়া থাকে। তারপর তেজস্তত্ত্বে যাইলে অন্তর্নিহিত শক্তির বা তেজের রুদ্ধ উৎসগুলি যেন খুলিয়া যায় এবং জপ আপনাকে বীর্যবান্ অমোঘ ভাবিতে আরম্ভ করে। বায়ুতত্ত্বে পৌঁছিলে জপের যেটি ব্যক্তিগত ভাব এবং গণ্ডী সেটি দূর হইয়া যায় এবং ব্যক্তির জপ তখন এক বিপুল বিরাট জপের মধ্যে গিয়া স্থান পায়। শেষে আকাশ তত্ত্বে যাইলে জপের গণ্ডী-মুক্ত মহাসাগর যেন তার লীলায়িত নিখিল বীচিমালা সম্বরণ করিয়া এক পরম প্রশান্তি ও মৌনের মাঝারে ডুবিয়া যাইতে থাকে।

পূর্বে ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্যন্ত জপের অভ্যারোহের যে ক্রমটি বলা হইল, সে অভ্যারোহ ক্রমটি সাধককে যে কি ভাবে আপন সাধনে মিলাইতে হইবে তার কথা বলা হইতেছে।

অকারাদি বর্ণমালার যেটি শক্তি সেটি আসলে অচিন্ত্য ও অমেয়। এই শক্তির জঠরে অন্য সর্ববিধ শক্তি জাত হয় বলিয়া একে বলে মাতৃকা। আমরা সচরাচর যে বর্ণমালা লইয়া ব্যবহার করিতেছি তাতে এই অমেয় মাতৃকা-শক্তির অতি সামান্য একরত্তি মাত্র কাজে খাটিতেছে। বাকী সবটাই যেন প্রসুপ্তবৎ রহিয়াছে। আমাদের

ব্যবহারের অন্তরালে এই প্রসুপ্ত শক্তিরাশিকে কুণ্ডলিনী বলে। জপাদি সকল সাধনই হইল এই কুণ্ডলী শক্তির জাগৃতি সাধন। যে নাম বা বীজ জপ করিতেছি সেটি উপযুক্ত ভাব ও ছন্দঃ সহকারে চলিতে থাকিলে তার মধ্য হইতে কোন একটি ধ্বনি যেন অক্ষ (axis) এর মত বাহির হইয়া পড়ে। এই অক্ষটি কোনও স্থলে আ, কোথাও বা ই, আবার কোথাও বা উ ইত্যাদি। স্বরের জড়তা আর ছন্দের সঙ্কোচ কাটাইয়া তাদের অকুণ্ঠ প্রসার সাধিত করিতে 'আ' এই বর্ণের বিশেষ উপযোগ আছে। ই বর্ণের লম্বগা বৃত্তি আর উ বর্ণের বিশেষভাবে বেধবৃত্তি। এই লম্বগা এবং বেধবৃত্তি যুগপৎ উদিত হইলে আবর্তন এবং উদ্বর্তন এই দুইটি একসঙ্গেই চলিতে থাকে। অর্থাৎ তখন হয় upward spiral movement, সকল বর্ণেরই আবার আকর্ষণী ও বিকর্ষণী—এই দ্বিবিধ সহগ-বৃত্তি দেখা যায়। বিকর্ষণীর বেগ কাটাইয়া আকর্ষণী বৃত্তিটিকে চালু করিয়া দিতে এবং সেটিকে উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধতন গ্রামে তুলিয়া লইতে ঋ এই বর্ণের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় মৃড়ানী কৃষ্ণ, নৃসিংহ, হৃষীকেশ ইত্যাদি নামে।

এখন ধর আমার জপটি ক্ষিতিতত্ত্বে বৈখরী ভাবেই চলিতেছে। অন্তরের ভাব আর ব্যহরণের ছন্দঃ—এই দুটিই যাতে মিত্র হয় সেদিকে আমাকে সজাগ থাকিতে হইবে। জপটি মিত্রচ্ছন্দে চলিলে নাতিবিলম্বেই দেখিব যে জপের ভিতর হইতে মাতৃকাশক্তি কোনও এক বিশেষ স্বর বা ধ্বনিরূপে আমায় কৃপা করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। এইটি হইল কুণ্ডলী শক্তির জাগৃতির প্রথম সূচনা। ঐ অভিব্যক্ত স্বর বা ধ্বনিটিকে অক্ষরূপে আশ্রয় করতঃ জপের দ্বারা তখন মাতৃকাশক্তির যেন মন্থন চলিতে থাকে। তার ফলে যে ক্ষিতি-তত্ত্বে জপটি তখনও চলিতেছে সেই তত্ত্বের একটি শব্দময়ী ও বর্ণময়ী আকৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তখন মনে হয় যে বর্ণমালাময়ী মাতৃকার জঠর হইতে কয়েকটি বিশেষ বর্ণ আমার উপলব্ধিতে অভিব্যক্ত হইয়া আমার জপের আধার ক্ষিতি-তত্ত্বকে ঠিক তার নিজস্ব প্রকৃতি ও ছন্দে প্রতিষ্ঠা দান করিবে। এইবার ঠিকভাবে জানিলাম ক্ষিতি-তত্ত্ব শুদ্ধ স্বভাবে কি আর তার নিজস্ব ছন্দঃই বা কি। এই জানা না হওয়া পর্যন্ত ক্ষিতিতত্ত্ব আমার জপকে কখনই তার আপন বাঁধন হইতে মুক্তি দিবে না।

কেন না, কোন কিছুর বাঁধন হইতে মুক্তি পাইতে গেলে সেটিকে তার যথার্থ প্রকৃতি এবং ছন্দে জানিতে হয়। মূলাধার চক্রে যে চারিটি বর্ণ পদ্মের চারিটি দলরূপে

বিন্যস্ত রহিয়াছে, সে চারিটি বর্ণকে এই ভাবেই পাইতে এবং বুঝিতে হইবে। কোনও কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া যাবৎ কোনও ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাবৎ সে ক্রিয়াটিকে দুটি বিপরীতমুখী বৃত্তির একটা নির্দিষ্ট অনুপাতের মধ্যে থাকিতে হয়। এই দুইটি বৃত্তিকে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ক্রিয়াটিকে যদি উক্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধের কোনও কেন্দ্রকে আশ্রয় করিতে হয়, তবে আগেকার ঐ অনুপাতটি এমনভাবে বদলাইয়া যাওয়া আবশ্যক, যাতে প্রথম কেন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি পরাভূত হইয়া উপরকার কেন্দ্রের প্রভাবকে আপনার উপরে প্রসারিত হইতে দেয়। এটি স্বচ্ছন্দে হইতে গেলে প্রথম কেন্দ্রের সামর্থ্যের সীমায় ক্রিয়াটিকে লইয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ এমন এক সন্ধি-রেখা যেখানে যাইলে প্রথম কেন্দ্রটিকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, এইবার তুমি আমার নাগালের বাইরে চলিয়া গেলে। নাগালের বাইরে কিন্তু সহজে সে তার অন্তর্গত কোনও কিছুকেই যাইতে দেয় না। এই নিমিত্ত তার পাশ কাটাইবার জন্য তাকে ভালমতে চিনিয়া লইতে হয়, আর তার সামর্থ্যের দৌড় যে কতদূর অবধি সেটিও বুঝিয়া লইতে হয়। এইভাবে প্রথম চক্র বা কেন্দ্র হইতে দ্বিতীয় চক্র বা কেন্দ্রে অধিরোহণ করিতে হয়। সহসা বলপূর্বক এ অধিরোহণটি সম্ভাবিত হয় না। প্রথম কেন্দ্রে যে কয়টি বর্ণ আবির্ভূত হইয়া সেটিকে স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে বাহাল রাখিয়াছে, সেই বর্ণ কয়টির যেটি ব্যূহ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তবে আমাকে উপরকার কেন্দ্রের অধিকারে ও শাসনে আসিতে হইবে। এই উপরকার কেন্দ্রে আসিলে অপর কতকগুলি বর্ণ (ছয়টি) আবির্ভূত হয়। এই ছয়টি বর্ণ সেখানকার তত্ত্বটিকে (অপ্) স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। বিজ্ঞানে Atomic number অথবা Chromosome number এর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে পার। এর পর তেজস্তত্ত্বে (নাভি চক্র) আসিয়া দশটি বর্ণ। অনাহতে (হৃদয়) বারটি। বিশুদ্ধে (কণ্ঠে) ষোলটি এবং ভ্রূমধ্যে (আজ্ঞা) দু'টি।

মূলে বা গোড়ায় যে অব্যক্ত মাতৃকা শক্তি রহিয়াছেন, উপযুক্ত ধ্বনি এবং ছন্দের সাহায্যে সে শক্তি মন্থনের ফলেই উত্তরোত্তর এই সমস্ত চক্র বা কেন্দ্র এবং তাদের প্রকৃতি এবং ছন্দো-নিয়ামক বিশেষ বিশেষ বর্ণ সমষ্টির অভিব্যক্তি হইতে থাকে। এই ভাবে চক্র তার আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ামক বর্ণমালা এবং তার দ্বারা নিরূপিত যে বিশেষ তত্ত্ব এবং চেতনার ভূমি—এইটি স্থূল বৈখরী জপের ভূমি হইতে সুরু করিয়া

একেবারে পরম পরিসীমা পর্যন্ত আপন অনুভবে মিলাইবার চেষ্টাই হইল সত্যকার ভুতশুদ্ধি। অতএব ভূতশুদ্ধি হইল সাধকের জীবনে পরপর কতকগুলি কেন্দ্র উন্মেষিত করিয়া তাদের সক্রিয় করিয়া তোলা। এইরূপ উন্মেষের ফলে অধ্যাত্মজীবনে সত্তার উর্দ্ধতন স্তরগুলির যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

কেন্দ্রগুলিকে আবার চক্রও বলা হয় এই নিমিত্ত যে এদের আকৃতিগত এক মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্র একটা নাভি, কতিপয় অর, একটা নেমি বা পরিমণ্ডল আকৃতিতে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। আসলে এটি হইল শক্তির এক বিশেষ প্রকারের বিন্যাস। আর এই বিন্যাসের নিয়ামক (determinant) হইয়া থাকে কতিপয় বিশেষ বর্ণ-শক্তি। এই নিয়ামক বর্ণ-শক্তিকে কেবলমাত্র অথবা মুখ্যতঃ বাহিরের কোনও প্রকারের স্পন্দনগুচ্ছ (wave pattern) মনে করিলে ভুল হইবে। মূলে যে চিৎশক্তি কোনও এক অনির্বচনীয় স্পন্দরূপে আপনাকে প্রাণরূপে অভিব্যক্ত করিতেছেন, বর্ণসমূহ হইল সেই মুখ্য প্রাণেরই এক বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি। কাজেই বর্ণশক্তির পুরা প্রকৃতি ও আকৃতি বিজ্ঞানের যন্ত্রাগারে খুঁজিলে আমাদের মিলিবে না। প্রধানতঃ চেতনার এবং প্রাণের উর্দ্ধস্তরগুলিতে যে স্পন্দগুলি সঞ্জাত হইতেছে, আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত বর্ণ সেই মূল স্পন্দের এক বাইরের রূপমাত্র। সুতরাং এটা যেন মনে না ভাবি—কোনও চক্রবিশেষ যে বর্ণ-সমূহের দ্বারা পরিকল্পিত ও বিধৃত সে বর্ণ-সমূহ আমরা কণ্ঠে সচরাচর যে ভাবে উচ্চারণ করি তাহাই। চক্রের নিয়ামক বর্ণগুলিকে ঠিক ধরিতে ও বুঝিতে হইলে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে যথার্থ সমর্থ গ্রামে বা ভূমিতে আমাদের যাইতে হইবে। যথা নাভিতে যে মণিপুর চক্র রহিয়াছে তার নিয়ামক দশটি বর্ণ। এ দশটি বর্ণ আমাদের সাধারণ উচ্চারিত বা শ্রুত বর্ণ নয়। আমরা দেখিয়াছি যে শব্দ সূক্ষ্ম পর্যায়ের কোনও এক কাষ্ঠায় না যাইলে ঠিক সমর্থ শব্দ হয় না। বিজ্ঞানের Supersonics এই কাষ্ঠার সন্ধান করিতেছে এবং বোধ হয় কিছু কিছু সন্ধান মিলিতেছেও। এরূপ সমর্থ শব্দ না মিলিলে তার দ্বারা কোনও শক্তির আকৃতি (power pattern) গঠিত হইতে পারে না। আর আমরা যে সকল উপর্যুপরি বিন্যস্ত কেন্দ্র বা চক্রের কথা বলিতেছি সেগুলি তো শক্তি গৌরবে এবং ছন্দোমহিমায় অসাধারণ। কোন নিম্নতর কেন্দ্র বা চক্রের সঙ্গে তার উপরকার সম্পর্কটি প্রধানতঃ ব্যাবৃত্তির সম্পর্ক নয়। অর্থাৎ উন্নয়ন এবং উদ্বর্তন হইতে গেলে

নীচের কেন্দ্রের সব কিছু যে ছাড়িয়া আসিতে হইবে এমন নয়। এইজন্য মন্থনের উপমা দেওয়া হইয়াছে। নীচের কেন্দ্রে উর্দ্ধতন সমগ্র সত্তার সম্ভাবনাটি অভিভূত ভাবে দেওয়া থাকে। এটাকে বলা যায় latent dormant condition. এখানে মন্থন উপযুক্ত অক্ষ শক্তি এবং ছন্দঃ আশ্রয়ে চলিতে থাকিলে তার ভিতরে একটা আন্তর বিশ্লেষণ যেন আরম্ভ হয়। উর্দ্ধগতির পথে যেগুলি রোধক এবং বাধক সেগুলি তফাৎ হইয়া সরিয়া যাইতে থাকে। আর যেগুলি সাধক এবং পোষক সেগুলি সমাহৃত হইয়া অগ্রগতিটিকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ করিয়া দিতে থাকে। রোধক ও বাধকগুলিকে বলে বিষ, আর সাধক ও পোষকগুলিকে বলে অমৃত। সাধককে বিষ পরিহার করতঃ অমৃতের আহরণ করিয়া চলিতে হইবে। সকল কেন্দ্রেই এই পরিহার ও আহরণ কর্মটি চলিতে থাকে (elimination and assimilation)।

পূর্বে যে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে সেই বৃত্তিদ্বয়েরই—গোচর ফল হইল এই আহরণ এবং বর্জন। জপের মন্ত্রের মধ্যে এই আকর্ষণী শক্তি আমার এবং বিশ্বের সমগ্র সত্তার ভিতর হইতে অমৃতের ভাগ আকর্ষণ করিয়া চলিবে, আর বিকর্ষণী শক্তি তাদের যেটি বিষভাগ সেটিকে বর্জন বা পরিহার করিয়া চলিবে। মন্ত্রে অধিষ্ঠিত যে গুরুশক্তি তাঁকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিলেই এই আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক মন্থন ক্রিয়াটি সাধকের অধ্যাত্ম জীবনে সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। সাধকের উর্দ্ধগতির নিমিত্ত সক্রিয় এই আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির দুইটি পরম কাষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহা অবশ্য ঠিক। পরম পরিসীমাদ্বয়—কৃষ্ণ বা রাম এবং নৃসিংহ দুই পক্ষে, ক্লীঁ ও ক্ষ্রৌঁ। সর্ববিধ আসুরী শক্তি বা দৈত্যমহাবল বিদারণে ও নিরসনে 'নৃসিংহ' নাম পরম সমর্থ; নীলকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ নাম স্পন্দনকে উদাসীন (neutralize) করিতে বিশেষ সমর্থ। বীজমন্ত্রেও দ্বিবিধ বৃত্তি। গুরুশক্তি-সহায় মিত্রচ্ছন্দঃ দ্বারা বৃত্তিদ্বয়ের অনুপাত অনুকূল ভাবে পাইতে হয়। অনুপাতগত বিষমতা ও গ্রন্থি কাটাইতে 'তারা', 'দুর্গা', 'মা', 'রাধা-স্বামী' 'আল্লা' নাম বর্ণ ব্যাহরণেই মহাশক্তিধর। অরির momentum (সম্বেগ) কাটাইতে 'মধুসূদন' আর সুহৃদের পরম শরণটিও সুহৃৎটি মিলাইতে 'গোবিন্দ' ও 'মুকুন্দ' নাম ইত্যাদি। 'নারায়ণ' নামে আপ্যায়নী শক্তি, 'বাসুদেব' নামে অনিরাকরণ শক্তি প্রাণময়ী। গুরুশক্তি সাধকের উপর প্রসন্ন হইয়া তার সাধন এবং সাধনজন্য উপলব্ধিকে কেন্দ্রের পর কেন্দ্রে উন্নয়ন ও

উদ্বর্তন করিয়া লইয়া চলে। এই উদ্বর্তনের পথে সাধারণতঃ ছয়টি স্তর এবং তাদের নিজ নিজ কেন্দ্র (centre of dynamism) পার হইয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এই স্তরগুলির সাধারণ সংজ্ঞা ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদি দেওয়া হয় বটে কিন্তু এরা বাইরের ভূত পদার্থ নয়। এগুলি মুখ্যতঃ প্রাণ এবং চেতনারই এক এক বিশেষ ধর্ম ও লক্ষণাক্রান্ত। গণিত শাস্ত্রে যেমন দেশের তিনটি এবং কাল co-ordinate সাহায্যে সব কিছু ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হয়, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সেইরূপ আমাদের সত্তার সকল কিছু গতি, স্থিতি এই ছয়টি co-ordinate সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। স্বয়ং ষষ্ঠ ভূমিতে রহিয়া যেটি এই সকলগুলিরই অধ্যক্ষতা করে সেইটি হইল আজ্ঞা চক্র। এই আজ্ঞা চক্র হইল বিশেষভাবে গুরুধাম।

এই গুরুধামের আজ্ঞা পাইয়াই তবে নীচেকার সকল চক্রের মন্থন এবং উদ্বর্তন কর্মটি ঠিক ভাবে চলিতে পারে, অন্যথা নয়। এখানে আমরা যে শক্তিকেন্দ্র বা চক্রের প্রসঙ্গা করিতেছি সে শক্তিকেন্দ্র আমাদের মামুলী জীবন ব্যাপারের কেন্দ্র মনে করিলে ভুল হইবে। এই শেষের কেন্দ্রগুলি আমাদের স্থূলদেহের মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড প্রভৃতির স্থানে রহিয়াছে; এদের কথা শারীর-বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া শুনাইয়াছে। সাধকের প্রাণ এবং চেতনার অসাধারণ উন্মেষ ও বিকাশের কেন্দ্র হইতেছে এই চক্রগুলি। সুতরাং সাধকের চিচ্ছক্তি এবং প্রাণ-শক্তি একটা নির্দিষ্ট মানে না আসা পর্যন্ত এই রহস্য চক্রগুলির সচরাচর সাড়া কোনও ক্রমে মেলে না আর গুরু-শক্তিকে পুরোভাগে রাখিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-শক্তির অবতরণ না ঘটিলে সাধকের আপন শক্তির সেই নির্দিষ্ট মানে বা কাষ্ঠায় পৌঁছিবার সম্ভাবনাটি দেখা দেয় না। এটা বার বার বলা হইয়াছে যে সাধকের আগ্রহ-শক্তি ও উপরকার অনুগ্রহ-শক্তি এ-দুয়ের সুসঙ্গাত পরিণয়েই আধ্যাত্মিক রহস্যরাজ্যের সীমানায় ঢুকিবার ছাড়পত্রটি মিলিয়া থাকে।

তারপর চক্রগুলিকে ঊর্দ্ধ এবং অধঃ ভাবে সাজাইবার এ মানে নয় যে অধস্তন চক্রে প্রাণ ও চেতনার শুধু অধস্তন অভিব্যক্তিগুলির সাথেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়া থাকে। মূলে বা গোড়ায় যে চক্রটি রহিয়াছে সেটিকে যেন কোনক্রমে পাশব সংস্কার (রিরংসা ইত্যাদি) এবং আসুর ভাবের কেন্দ্র না মনে করি। মূলাধারে মাতৃকা-শক্তি পূর্ণভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু কিসের যেন অপেক্ষায় নিজেকে সংবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা মহাশক্তির spring যেন কোন এক রহস্যময় চাপে আপনাকে

সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। চক্র হইতে চক্রান্তরে অভ্যারোহের ফলে এই রহস্যময় চাপটি কোনও আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ বিদূরিত হইতে থাকে। ফলে মূলের অপিহিত শক্তিরাশি ধীরে ধীরে যেন অপাবৃত ("অপাবৃণু") হইতে থাকে। সুতরাং অভ্যারোহের রেখাটি সোজাসুজি একটা ঋজুরেখা না হইয়া এক ক্রমোর্দ্ধক spiral -এর আকার গ্রহণ করে। মূলে যেটি অপিহিত ও সঙ্কুচিত সেইটেই আপনাকে অপাবৃত ও প্রসারিত করিয়া যাইতেছে। চক্রগুলি প্রত্যেকেই অধ্যাত্ম-সাধনের অপেক্ষাকৃত সমুন্নত ভূমিতে ফুটিয়া উঠিলেও, এটা মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক স্থলেই সাধক আর বাধক, অমৃত আর বিষ, দৈবী সম্পদ্ ও আসুরী সম্পদের দ্বন্দ্বটি বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্ত পূর্ব চক্র হইতে উত্তর চক্রে আসিবার সময় সাবধানে পরিহার ও আহরণ ক্রিয়াটিকে চালাইতে হয়। পূর্বের কেন্দ্রের দ্বারা উত্তর কেন্দ্রের যথাযোগ্য আপূরণ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ উত্তর কেন্দ্রটিকে যেন কাজ করার সময় আগের সব মুছিয়া ফেলিয়া শুধু শূন্য লইয়াই কাজ করিতে না হয়। শুধু শূন্য কেন, ঋণের বোঝা লইয়া কাজ করিতে হইলেও কাজটি চলিবে না। এই নিমিত্ত আগের কেন্দ্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণ দৈবী সম্পদ একটা নিশ্চিত মূলধনরূপে উত্তরের অধিকারে আসা আবশ্যক হয়। এই ব্যাপারটিকে বলা হইল আপূরণ। যেমন, পূর্বের চক্রের আপন আকৃতি নিরূপিত আবর্তনের বেগ কাটাইয়া যখন কোন সম্পদ্ উত্তরের গ্রাহ্য-গ্রহণ এলাকায় আসিল, তখন সে সম্পদটিকে এমন আকারে এবং ভাবে আসিতে হইবে যাতে উত্তর কেন্দ্র সেটিকে স্বচ্ছন্দে আপন করিয়া লইতে পারে।

ধর, নীচের কেন্দ্রে কোন ক্রিয়া কথঞ্চিৎ গুরু হইয়া আয়াসসাধ্য ভাবে চলিতেছে। এইটি হইল ক্রিয়ার জড়ত্ব বা জাড্য। শক্তিকেন্দ্রে বা চক্রে এটি অবশ্য সাধারণ মন্থনোদ্ভূত 'জড়ীয়' 'জাড্য নয়। এটি কৌর্মশক্তি বা স্থৈর্যে মুখ্যতঃ প্রাকট্য। Preponderance of static or 'rest' Energy-এর ফলে stability. অণুতে এই nuclear stability ভাঙ্গিতে বৈজ্ঞানিকের কত না আয়াস! উপরের কেন্দ্রে আত্মসাৎ হওয়ার মত হইতে গেলে এই জড়ত্ব অনেক পরিমাণে বিগলিত (resolved) হওয়া আবশ্যক। তা না হইলে গুরুভার আয়াসবহুলের স্থলে ঠিক স্বচ্ছন্দ সাবলীল কিছু মিলিবে না। গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে প্রাথমিক field বা sphere-এর Massটি যে আকারে ও প্রকারে ছিল উপরকার field বা sphere-এ সে আকার বা প্রকার

অনেকটা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। স্থূলের ব্যাপারেও এর উদাহরণ আমরা পাইয়া থাকি। যে ভাত-ডাল আমরা খাই তাদের mass এক আকারের ও প্রকারের। কিন্তু পরিপাকের ফলে যখন তারা প্রাণশক্তির উপাদানরূপে পরিবর্তিত হয় তখন তারা আর সাধারণ ডাল-ভাত থাকে না। তাদের অনেকটাই তাপ প্রভৃতিরূপে আপনাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া লয়। অন্নের অণিষ্ঠ অংশ মন আর পানীয়ের অণিষ্ঠ অংশ প্রাণ গ্রহণ করে—শ্রুতি বলেন। এই 'গ্রহণ' অন্নের কি প্রকারের transformation? 'অণিষ্ঠ' অন্নের জড়ীয় স্থূলবপু ছাড়িয়া শক্তিবপু বুঝিলে চলিবে? আর, সে শক্তিটি মন-প্রাণের 'সজাতীয়' না হইলেই বা কি চলিবে? জড়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। চারিটি Hydrogen atom সংহত হইয়া যখন Helium atom সৃষ্টি হইল, তখন Mass-এর একটি ভগ্নাংশ আপনাকে সাক্ষাৎ শক্তি-রূপে (as kinetic energy) বিবর্তিত করিয়া লইল। অধ্যাত্মসাধনের রাজ্যে কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে অভ্যারোহের যে ক্রমটি এখানে বলা হইতেছে সেখানেও এই জাগতিক সাধারণ ঋতের ব্যতিক্রম হয় না। আগে যে কেন্দ্রে ব্যাপার চলিতেছিল সে কেন্দ্র হইতে উপরের কেন্দ্রে ব্যাপারটিকে তুলিয়া লইতে গেলে momentum (কিনা mass velocity -র) দুইটিকেই উপরকার কেন্দ্রের গ্রহণ যোগ্য ('অন্ন') ভাবে বদলাইতে হয়। জপের বেলা বৈখরী থেকে মধ্যমায় এবং মধ্যমা থেকে পশ্যন্তীতে আসিতে গেলেও এই আপূরণ এবং প্রতিপূরণ এই দুইটিই সাধিয়া লইতে হয়। আগেকার কেন্দ্র করে আপূরণ আর উপরকার কেন্দ্র যেটি করে তাকে বলে প্রতিপূরণ।

এই দুইটি সহগ সহযোগী বৃত্তি সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকিলে যাহা হয়, তাকে বলে পরিপূরণ। পরিপূরণটি যখন নিজেকে সৌষ্ঠব ও সামর্থ্যের কাষ্ঠায় লইয়া যায় তখন হইল সম্পূরণ। অতএব দেখিতেছি প্রতিটি চক্রকেই স্বচ্ছন্দে তার আপন সহযোগিতাটি করিতে দিতে হইবে। কোনটিকেই অবম বা অধস্তন ভাবিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে দিলে চলিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে চক্রগুলির ঊর্ধ্বাধঃ-ভাবে বিন্যাস প্রয়োগের সৌকর্যের নিমিত্তই আসলে তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, উন্নত-অবনত ভেদ নাই। ভগবানের বারাহীশক্তি যে মহাচক্র ধারণ করতঃ বসুন্ধরাকে উত্তোলন করিতেছেন সেই একই মহাচক্রের এ সবই হইল পরস্পর অচ্ছেদ্য এবং পরস্পর পরিপূরক অঙ্গ বা অবয়ব। তত্ত্বতঃ এক হইলেও এক একটি চক্রে মূলা-শক্তির এক বিশেষ প্রকার আকৃতি ও

প্রকৃতি নিরূপিত রহিয়াছে এবং দেখিয়াছি যে এই নিরূপণটি মূখ্যতঃ কতিপয় বর্ণমালার সূক্ষ্ম শক্তিদ্বারাই ঘটিয়াছে। এক একটা চক্রের সঙ্গে ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি তত্ত্বের এবং সাধকের অধ্যাত্ম উন্মেষ বিকাশের এক একটা ভূমির সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই একটার পর একটা ভূমিকা আশ্রয় করিয়াই সাধককে তাঁর এই মহা রহস্যযাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তত্ত্বতঃ মূলাধারে যাহা আছে তাহাই অন্যত্র আছে, আর মূলাধারে যাহা নাই তাহা কোথাও নাই। কাজেই, কেন্দ্রগুলি পর পর সাধকের উপলব্ধি ও অঙ্গীকারে (owning এবং avowing) পর পর ভূমি; বিভিন্ন ভূমি এবং তদুপযোগী বিভিন্ন ভূমিকা। এ'দুয়ের নিয়ামক আকৃতি ও ছন্দঃ অবশ্য আছে; উর্দ্ধগতির পথে সে সব তো বাদ দেবার নয়।

ক্ষিতি অপ্ যে সাধারণ মাটি জল নয় তা বারবার বলা হইয়াছে। ভিতরে বা বাহিরে যে কোনও অনুভব হইতেছে সেটিকে উপযুক্তভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া লইবার স্বাভাবিক কাঠামো (natural basic frame of reference) হইল ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি। আন্তর বা বাহ্য যে কোনও অনুভব-এর নিমিত্ত আমাদের এই পাঁচটি মূলসূত্র চিন্তা করিয়া লইতে হয়। যে অনুভবটি হইল তার আধাররূপে অখণ্ড সত্তা (continuum) নাই কি? এর পিছনে কোন সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, আবার মহান্ মহত্তর স্পন্দ রূপটি (প্রাণব্রহ্ম) বিদ্যমান নাই কি? সেই সূক্ষ্ম অথচ বিপুল প্রাণস্পন্দ কোথাও কোথাও আপনাকে 'মহসা ও ছন্দসা' সংহত ও ঘনীভূত করিয়া এক একটা বিশেষ আকৃতি বা রূপ পরিগ্রহ করিতেছে না কি? এই উদ্ভূত রূপ বা আকৃতির মধ্যে কোনও কোনওটিকে আবার ধারা, স্রোতঃ বা প্রবাহরূপে পাইতেছি না কি? শেষকালে আবার সকল কিছু অবিরাম গতি পরিণতির মাঝেও একটা 'স্থির' হবার প্রবণতাও (ভূমিও) আমরা পাইতেছি না কি? এই পাঁচটিই হইল যথাক্রমে ব্যোম হইতে ক্ষিতি তত্ত্ব পর্যন্ত।

পূর্বখণ্ডে চাতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডের সূচনায় ভূতশুদ্ধি প্রসঙ্গে এই 'পাঞ্চভৌতিক' বিশ্লেষণ আভাসে লক্ষিত হইল। এর বিস্তার যথাস্থানে দিবার আশা রহিল। শ্রুতি ব্রহ্মের সৃষ্টির কথা বলিতে গিয়া "এতস্মাদাকাশোঽজায়ত" এইভাবে যে আকাশের কথা বলিয়াছেন, সে আকাশ যে কোন্ আকাশ এবং তাহার পর বায়ু প্রভৃতি যে কোন্ বায়ু সেটি ধ্যান করিয়া না বুঝিলে সৃষ্টির কোন বোধগম্য আলেখ্য বা প্রতিকৃতি আমাদের মেলে না।

সৃষ্টিরহস্যটা আদতে বোধাতীত (a-logical) হইলেও সেটা বোধগম্য (logical) হয় বা হইতে পারে—আকাশাদি এই পাঁচটি তত্ত্ব বা categories আশ্রয় করিয়াই। ধর, ওম্ এই ধ্বনি উচ্চারণ বা 'শ্রবণ করিলাম। স্থূলের ক্ষেত্রে এই ধ্বনি যে ভাবে উচ্চারিত বা শ্রুত হয় তাতে মনে হয় যেন এর একটা জড়ত্ব আছে অর্থাৎ এটা একটা নির্দিষ্ট আকার প্রকারের ধ্বনি এবং সেই নির্দিষ্ট আকার প্রকারের মধ্যেই যেন এটা আবদ্ধ হইয়া আছে। এই যে তার অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন গণ্ডীবদ্ধ রূপ সেইটাকে বলি এর জড়ত্ব। এটা কিন্তু তার থাকা চাই, নইলে আর শত শত ধ্বনির সাথে এটা মিলিয়া মিশিয়া তাল পাকাইয়া যাইবে; তখন আর এটাকে 'এই' বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে পারিব না। কিন্তু, এটা দরকার হইলেও এটা তার সমগ্র এমন কি যথার্থ রূপটি নয়। স্থূলের ক্ষেত্রে সকল মূর্ত পদার্থই নিজেদিগকে বিচ্ছিন্ন এবং গণ্ডীবদ্ধ করিয়া দেখাইতেছে, যেমন একটি শিশিরকণা থেকে আকাশের সূর্য তারকা প্রভৃতি। কিন্তু আসলে শিশিরকণাটি যেমন দেখিতেছি তেমন একটা স্থির ছোট জিনিষ নয়। ধ্বনির বেলাও এইরূপ। প্রণব উচ্চারিত হইল, তারপর সেটি যেন থামিয়া গেল। কিন্তু, সত্য সত্যই থামিয়া সে যায় না। সে স্থূল স্পন্দনের দেশ থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর স্পন্দনের দিকে গড়াইয়া চলিতেছে। এরূপভাবে গড়াইয়া সে অর্দ্ধমাত্রার সেতুটি পার হইতে চায়। তার সেতুপথে এই যাত্রার সাথে সাথে যদি আমি আমার অনুভূতিটিকে সহযাত্রী করিয়া লইতে পারি তবে দেখিব যে কিছুক্ষণ বাদে আমি এক অপূর্ব শাশ্বত ধ্বনির ধারায় আসিয়া পড়িলাম। এটি হইল সেই সনাতন অনাহত ধ্বনি প্রণব, সাধকের সাক্ষাৎ অনুভূতি যার কথা আমাদিগকে বলে। এখানে আসিয়া যেন আমার উচ্চারিত প্রণবের যথার্থ অবিকৃত শুদ্ধ আকৃতিটি আমি পাইলাম। এই শুদ্ধ আকৃতিতে আবার গাঢ় অভিনিবেশ লাগাইলে দেখি যেন সেটি তার ঘনীভূত ধারারূপটি পরিহার করিয়া আপনাকে এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দবিপুলতায় বিলাইয়া দিতেছে এবং সে স্পন্দবিপুলতা আবার এক অখণ্ড অসীম অথচ স্বয়ং শান্ত আধারে অভিব্যক্ত হইতেছে।

প্রণবের স্থূল উচ্চারণ থেকে সুরু করিয়া রহস্য অনুভূতির এই যাত্রাপথে চলিতে চলিতে আমরা পূর্বোক্ত পাঁচটি তত্ত্বেরই সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলাম। গোড়ায় যেখানে আরম্ভ করিয়াছিলাম সেটা অবশ্য হইল ক্ষিতিতত্ত্ব। তারপরে সে যখন মধ্যমার

সেতু পারে গড়াইয়া চলিতে থাকে তখন পাই অপ্‌তত্ত্ব। তারপর যখন সেটি আপনাকে এক অবিকৃত ও শুদ্ধ ধ্বনি ও ছন্দঃ আকৃতিতে প্রকট করে তখন পাই তেজস্তত্ত্ব—যেটির দ্বারা সমস্ত কিছুর যথার্থ রূপায়ণটি হইয়াছে ও হইতেছে। তারপর যখন এই তৈজস আকৃতিটি নিজেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দবিপুলতায় ঢালিয়া দেয় তখন পাই বায়ুতত্ত্ব। আর এই সকলেরই অখণ্ড অসীম আধার পটরূপে রহিয়াছে আকাশ। এই আকাশ অবশ্যই সাধারণ ভূতাকাশ নয়। যে কোনও বস্তু বা ব্যাপারের বিশ্লেষণে আমরা এই মৌলিক পাঞ্চভৌতিক কাঠামোটি দেখিতে পাইব সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এ পাঁচটি কি নিজেরাই জোট করিয়া বিশ্বের রচয়িতা হইয়াছে আর আমার অধ্যাত্মজীবনেরও পরিকল্পয়িতা ও রচয়িতা হইবে? কোনও ছন্দঃকুশল সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অধ্যক্ষতা না থাকিলে কেবলমাত্র প্রকৃতি অথবা এই পাঞ্চভৌতিক কাঠামো দ্বারা এমনধারা অপরূপ বিশ্বের রচনার উপপত্তি হয় না। আর আমার যেটি অধ্যাত্মজীবন—সেটির সুষম পরিকল্পনা আর সুনিপুণ রচনার নিমিত্ত সেই অধ্যক্ষ পরম পুরুষটির বা পুরুষোত্তমের এক বিশেষভাবে অধ্যক্ষতা, অনুপ্রেরণা এবং পরিচালনা মেলা চাই-ই। আর এই বিশেষভাবে অধ্যক্ষতার মূর্তিই হইল গুরু-শক্তি। বিশ্বে এবং তার সঙ্গো আমার এই সাধারণ জীবনে ওতপ্রোত ঐ যে পাঞ্চভৌতিক কাঠামো তাতে দুই প্রকারের বৃত্তিই লক্ষিত হয়—পরাঞ্চি ও প্রত্যঞ্চি। এ-দুয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আবার মুখ্যস্থানে পুরোভাগে দেখি। পরেরটির সন্ধান বা পরিচয় ক্বচিৎ কদাচিৎ মেলে। আমার অধ্যাত্মজীবনের প্রধান সমস্যাই হইল—যে পরাঞ্চি বৃত্তি মুখ্য স্থানে পুরোভাগে রহিয়াছে সেটিকে সরাইয়া তার স্থলে প্রত্যঞ্চি বৃত্তিকে সমর্থভাবে চালু করি কি করিয়া? আগেকারটাকে যদি বলি ঋণাত্মক বেগ বা negative momentum তবে তার স্থলে positive momentum—যেটি আমাকে কেন্দ্রের পর কেন্দ্রভেদ করিয়া পূর্ব প্রদর্শিত spiral এর পথে পরম অভ্যুদয়ে লইয়া যাইবে—সেটি আসিবে কি প্রকারে? এইটির জন্য ঐ সর্বত্রগ এই পাঞ্চভৌতিক কাঠামোর ওপর অধ্যক্ষতা করে এমন এক ভাগবতী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ আমার মেলা চাই। সেই গুরু-শক্তির আজ্ঞাতেই এবং তার দেওয়া ছন্দেই এই সর্বত্রগ পাঞ্চভৌতিক কাঠামোটিই চলিবে। সে আজ্ঞার লঙ্ঘন এটি কোনমতেই করিবে না। এবম্বিধ এক ঋতায়ন আমার জীবনে প্রবর্তিত হওয়া চাই।

এইজন্য বলা হইতেছে ভূতশুদ্ধি অনুষ্ঠানটি পাঁচটি ভূতের নিজেদের ঘরোয়া শলাপরামর্শের ব্যাপার নয়। এ পাঁচেরই ঊর্দ্ধে রহিয়াছে আজ্ঞা-চক্র যেটি হইল গুরুধাম, যেখানে 'হ' এবং 'ক্ষ' এই দুইটি মহাশক্তিধর বর্ণকে দুটি (রুক্ম) হিরণ্ময় পক্ষের মত বিস্তার করতঃ গুরু-শক্তি সাধকের যোগক্ষেম পোষণ করিতেছেন। আমরা পরে দেখিব যে এই বর্ণদ্বয়ের ব্যঞ্জনা কি এবং কতখানি গভীর। তবে এখানে সূত্রাকারে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে এই দ্বিদল কমলে না আসা পর্যন্ত সাধকের জীবনে দ্বন্দ্ব সত্য সত্যই অপনীত হয় না। যে স্থলে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ এবং অসহযোগের প্রাধান্য, সেইখানে বিশেষভাবে দ্বন্দ্ব এই শব্দটি প্রযোজ্য। দু'য়ের মধ্যে যখন বিরোধের স্থলে মৈত্রী এবং সহযোগ আসিয়া থাকে তখন সেটির আর ঠিক দ্বন্দ্ব থাকে না। তখন সেটিকে যুগ্ম বা যুগল বলাই উচিত। এই নিমিত্ত গীতা বলিতেছেন "দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ" অর্থাৎ 'মৎসর ভাব' কিনা পরস্পরের প্রতি দ্রোহ কাটাইয়া তবে দ্বন্দ্বের অতীত হও। যে আকর্ষণী, বিকর্ষণী, দৈবী, আসুরী, পরাঞ্চি, প্রত্যঞ্চি প্রভৃতি দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সেগুলিকে 'বিমৎসর' করিয়া দ্বন্দ্বের পারে লইয়া যাইতে একমাত্র গুরু-শক্তিই সমর্থ। 'হ' এই বর্ণটিকে আশ্রয় করতঃ সকল কিছুর মাঝ হইতে অমৃতের চরম আহরণটি হইয়া থাকে। আর 'ক্ষ' এই বর্ণকে আশ্রয় করতঃ সব কিছুর বিষভাগটির চরম মোক্ষণ (transformation) হইয়া থাকে। আর এই চরমে আসিয়া 'বিষমপি অমৃতায়তে', কাজেই বিষ এবং অমৃতের দ্বন্দ্বটি অপনীত করিয়া তা'দিগকে অন্যোন্যের পরিপোষক এক যুগলে পরিণত করে—স্বচ্ছন্দ সুষম প্রপূরয়িতা, সংবর্দ্ধয়িতা। এ যুগলে দ্বন্দ্বের পরস্পর বিবদমান ও বিরুদ্ধান পক্ষ দুটি সম্পর্কে দুটি পরম বিলক্ষণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটা হইল পক্ষপাতবিনির্মুক্ত উদাসীনভাব—বিষ বা অমৃত, দৈবী বা আসুরী কেহই একে আপন কোঠে একান্তভাবে টানিয়া আপনার সামিল করিয়া লইতে পারে না; এইটি হইল এর দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরভাব। মৎসরভাব এখানে অপনীত। শুধু আবার তাই নয়। এই aspect of transcendence ছাড়াও একটা aspect of immanence আছে। আছে বলিয়া দ্বন্দ্বের integration, synthesis ও sublimation সম্ভব হয়। বিষ অমৃত প্রভৃতি সকল পরস্পর বিষম ও বিরুদ্ধান পক্ষ বা প্রতিযোগীর নিজ নিজ মৎসরভাবে ক্রিয়া করার যেমন স্বতন্ত্র শক্তিকেন্দ্র (সত্ত্বা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি নিয়ামক) থাকে, তেমনি

আবার পরস্পরকে মিলাইবার মিত্র ও সহযোগীভাবে ক্রিয়াশীল হইতে দেবারও গভীর গভীরতর, সমর্থ সমর্থতর কেন্দ্র থাকে। সে সকল গভীর ও সমর্থস্তরের কেন্দ্রগুলির সাধারণ নাম বুদ্ধিসত্ত্ব বা সত্ত্ব। যেমন কতকগুলি curve (circle, parabola প্রভৃতি)। এদের প্রত্যেকের নিয়ামক equation আলাদা। একটা অপরকে বলে— 'আমি যা তা তুমি নও, তুমি তফাতে থাক।' কিন্তু তাদের সকলের নিয়ামক কোনও সূত্র (যেমন General Equation of the Second Degree) মিলিলে তারা পরস্পর ব্যাবর্তক ভাবটি পরিহার করতঃ 'সগোত্র' ও বান্ধবরূপে নিজেদিগকে দেখায়। কামকামী প্রভৃতি স্থলেও কামের নিত্যসত্ত্ব কেন্দ্রটি মিলিলে আর ভয় নেই। মূলে কাম কি এবং কিসে আর কেন, এই নিত্য বোধ সত্ত্বে যাও। বিচক্ষণ ভিষক এইরূপ কোন কেন্দ্র আশ্রয় করিয়াই বিষকেও আময় নিরাকরণে অমৃতরূপে পাইয়া থাকেন। এরূপ কেন্দ্রের পরম্পরা আছে, সুতরাং সকল দ্বন্দ্বের এক মূলকেন্দ্রও আছে। সেইটি হইল— 'নিধানং বীজমব্যয়ম্।' এখানে যে পরমশক্তি বিদ্যমান তিনি— 'বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ'। এটি 'নিত্য সত্ত্ব' ভূমি। বিশ্বে অনুস্যূত ও অভিব্যক্ত 'মহদবুদ্ধি' (Cosmic Reason) এই নিত্য সত্ত্বের ভূমি থেকেই কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর—এই transcendence নয়, 'নির্দ্বন্দ্ব নিত্য সত্ত্বস্থ' ভাব ও ভূমিটিও আবশ্যক, অন্যথা বিষম বেয়াড়া দ্বন্দ্বটি সুষম সুন্দর যুগলরূপটি ধরিবে না। দ্বন্দ্বাতীত ও নির্দ্বন্দ্ব, এ দুয়ের সংযোজক সেতুটি হইল কৃপা, আজ্ঞাচক্র (গুরুধাম) পরম কৃপাঘন শক্তির স্থান—যেটি একাধারে দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর এবং নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ।

কৃপা এই শব্দের দুইটি অবয়ব— 'কৃ' এবং 'পা'। 'কৃ' এই অবয়বের দ্বারা এটি সূচিত হইতেছে যে সাধকের অধ্যাত্ম জীবনের মূলে নিধানং বীজমব্যয়ম্ রূপে সকল কিছু অঘটন ঘটাইবার এবং সকল অসাধ্য সাধন করিবার প্রতিশ্রুতিটি দিতেছেন।

আর 'পা' এই অবয়বের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে সাধকের সর্ববিধ আন্তরিক আকুতি এবং শুভ প্রয়াসকে সন্তানের মত পালন করার ভারটি তিনি স্বয়ং লইয়াছেন। এই দুইটি যেখানে হইতেছে সেটি স্বয়ং অব্যয়। প্রথম স্থলে তিনি বীজ বা বিন্দুশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল, আর অপরস্থলে সেটি নাদ বা প্রকটশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ তাঁর সকল অঘটন ঘটাইবার প্রতিশ্রুতিটি যেন সাধকের কাছ হইতে গোপন

করিয়া রাখিয়া তিনি বলেন, তোমাকেই সব করিতে হইবে—"যুধ্যস্ব বিগতজ্বর"। একটা বীজ বা বিন্দুর মধ্যে অঘটনঘটন পটীয়সী মহাশক্তিকে এইভাবেই না আমরা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে দেখি! সে যেন ডাকিয়া বলে, তুমি তোমার মাটি তৈয়ারী কর, তাতে সার দাও, প্রচুর জল আলো বাতাস লাগাও, তা হলেই অঙ্কুর পাদপাদি যাহা চাও তাহাই হইবে। (ক'রে পা)। সাধকের একটা বলিষ্ঠ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত ভাব আনার নিমিত্তই এইরূপ গোপন বন্দোবস্ত। এর ফলে সাধকের আত্মকৃপার স্ফুরণটি আগে হয়। কিন্তু সারাটি অন্তর মথিত করিয়া তাঁর পানে তার আকুতি যখন উত্থিত হইতে থাকে, আর সে যখন আপন প্রয়াসের সকল কার্পণ্য ও কুণ্ঠা পরিহার করিয়া ফেলিতে চায়, তখন সে স্পষ্টই পদে পদে অনুভব করিতে থাকে যে, মায়ের মত কোন এক পরম কল্যাণশক্তি তার সব কিছুই পোষণ করিয়া যাইতেছেন ('ক'রিয়ে পা')। কাজেই 'কৃপা' এই শব্দের দুটি অক্ষরকে এইভাবে ধ্যান করিয়া সাধক আশ্বস্ত হও।

জপের বেলা—'কৃপা' মূর্তিটিকে বিশেষ একভাবে ধ্যান করিও। প্রণব অথবা প্রণবপুটিত বীজ বা গায়ত্রী ইত্যাদি ব্যাহরণের সময় আদিতে নাদের উদয়ে (বিস্তার) তোমার মূলাধারে যে স্পন্দ অনুভব কর, সেটি 'কৃ' এবং সেটি (আত্মকৃপা) অগ্নি বা তেজস্বরূপ। আর অন্তে প্রণবের বিলয়ে (বিন্দুরূপে) তোমার ভ্রূমধ্যে (দ্বিদলে) যে স্পন্দ অনুভব কর সেটি হইল— 'পা' পালনী, পোষণী শক্তি (সোম)। মূলের স্পন্দে একটা পুলক আর দ্বিদলের স্পন্দে একটা আলোক ফুটিয়া উঠে। দুয়ের মিলনে—জ্যোতীরস স্ফুরণ। পোষণী সোমকে জ্যোতির্মুখীন আর দীপনী অগ্নিকে রসমুখীন করে মন্ত্রশক্তির মন্থন। এ যেন দু'য়ের পিঠ উল্টাইয়া লওয়া।

অনুভবের প্রথম স্তরে মূলাধারের স্পন্দন আর দ্বিদলের স্পন্দন (পুলকের শিহরণ আর আলোকের স্ফুরণ) দেশ কাল সম্বন্ধে যেন আলাদা করিয়া মনে হয়, অর্থাৎ এটি যেখানে যখন হইতেছে অপরটি সেখানে তখন হইতেছে না।

অনুভবের দ্বিতীয় স্তরে দুইটিই এক মূল অভিন্ন স্পন্দের দুইটা পোল (pole) রূপে নিজেদিগকে প্রকাশ করে। এখানে অগ্নিদ্বারা সোমের আপূরণ আর সোমের দ্বারা অগ্নির প্রতিপূরণ হইয়া থাকে।

তৃতীয় স্তরে পোল দুইটি আর ব্যবহিত ভাবে না রহিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া

এক হইয়া যায়। এটাকে বলে সম্পূরণ। তখন পাই অভিন্ন জ্যোতীরস। এই প্রকার স্পন্দ অনুভূতির সূচনা হইলে আর তার সঙ্গে একটুখানি পুলকের শিহরণ আর ঊর্ধ্বজ্যোতির বিকিরণ দেখা দিলে সেটিকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে না আনা পর্যন্ত থামিতে নাই। কেননা যে পুলকের শিহরণ বা রসানুভূতি গোড়ায় মিলিতে থাকে সেটি চপল এবং অল্পবিস্তর আবিলতাময়। সে পুলকের অনুভব হইলে জপধ্যানে আবেগটা বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চপলতা আর আবিলতা কাটাইবার নিমিত্ত তাকে ঊর্ধ্বজ্যোতির মুক্ত উদার বিমল প্রভাবের শাসনে অবশ্যই আসিতে হয়। না আসিতে পারিলে তার আবিলতা বাড়িতে থাকে, আর সে একটা জমাট নেশার মত অধ্যাত্মজীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশকে যেন বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করিয়া রাখে। এই নিমিত্ত নীচের দিকে থেকে যেমন আপূরণটি হওয়া চাই, উপরের দিকে থেকেও সেই রকম প্রতিপূরণটিও হওয়া চাই। আলোকের শুভ্রপ্রসন্ন দৃষ্টিতে পুলকের আবিলতা ও মত্ততা কাটাইয়া লইতে হইবে। আর সেই বিমল ও বিমলতর পুলকের মাঝ হইতেই সাধককে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের সত্য আবেগ ও প্রয়াসটিকে পূরণ করিয়া যাইতে হইবে। এই আপূরণ ও প্রতিপূরণ ক্রিয়া দুটি পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া চলে বলিয়া মূলাধারে এবং দ্বিদলে ঐ স্পন্দদ্বয়কে দুইটা পোলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। এই আপূরণ প্রতিপূরণ ক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে চলার নাম পরিপূরণ। আর যখন অভিন্ন বিশুদ্ধ জ্যোতীরসরূপে সেটি পরিনিষ্ঠিত হইল তখন হয় সম্পূরণ।

সঙ্গীত আলাপনের উদাহরণ লও। সা ঋ প্রভৃতি সপ্তস্বরের মধ্যে ঋ হইল বিশেষভাবে এক গম্ভীর স্বর। আর পা হইল বিশেষভাবে মধুর স্বর। কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতে কোন রাগের আলাপনে এই গুরু গম্ভীর ঋষভ স্বরটিকে এমন ভাবে আদায় করিয়া লইতে হয় যে, সে খাদ সুরের মধ্য হইতে এক অপূর্ব মাধুর্য ফুটিয়া তার বহিরঙ্গের সকল কর্কশতা ও রুক্ষতা দূর করিয়া দিতেছে। আবার পা বা পঞ্চম বাহ্যতঃ মোলায়েম বা মিষ্টস্বর সন্দেহ নাই; কিন্তু, সেটা শুধু তাই থাকিলে তার হাল্কা ও চটুল হওয়ার ভয় থাকে। পা বা পঞ্চমকে অবিকৃত স্বর বলা হয় বটে। কিন্তু, গানে বা বাজনায় তার ভিতর গুরুগম্ভীর একটা সুর না দেওয়া থাকিলে, সে মধুরেও যেন বিরক্তি ও অবসাদ আনিয়া দেয়। এই নিমিত্ত গুণী সঙ্গীত-সাধক ঋষভের স্বভাবগাম্ভীর্যের ভিতরে নিভৃত যে রসমাধুর্য রহিয়াছে সেটিকে ফুটাইয়া তুলিবেন।

এইটাই হইল তার পিঠ বদলে যাওয়া। আবার পঞ্চমের বেলা তার স্বভাবমাধুর্যের অন্তরালে যে গুরু গম্ভীর নাদব্রহ্ম যেন সমাহিতভাবে রহিয়াছেন, তাঁর জাগরণটি নিপুণ ছন্দে করিয়া লইবেন। যথার্থপক্ষে গম্ভীর-মধুর শান্ত-লীলায়িত এসকল দ্বন্দ্বকে সুষম যুগ্মকে পরিণত না করিতে পারিলে গুণীর কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগ আলাপন হৃৎকর্ণ-রসায়ন হয় না। সাধকের মূলাধারে অগ্নি এবং ভ্রূ মধ্যে সোম, এ দুটিকেও সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে ঋষভ এবং পঞ্চমের মত পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে গাঁথিয়া লইতে হইবে। যেমন অগ্নি দীপনী হইয়াও জপাদি সাধনে রসানুভূতিকে ফুটাইয়া তুলিবে, তেমন সোম রসস্বরূপ হইয়াও জ্যোতির্মুখীন হইয়া সাধকের রসানুভূতিকে পূর্বোক্ত ক্রমে ও প্রণালীতে শোধন, উদ্বোধন, পরিপূরণ ও সম্পূরণ করিয়া লইবে।

সঙ্গীতের যে দৃষ্টান্ত লইয়াছিলাম, তাতেও কোনও রাগ্‌বিশেষের আকৃতি (pattern) কয়েকটি মাত্র স্বরের দ্বারা নিরূপিত হইলেও সে রাগের যেটা চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব, সেটাকে আলাপনে ফুটাইয়া তোলার নিমিত্ত রাগের আকৃতি নিরূপক ঐ কতিপয় স্বরকে লইয়া তাদের উপযুক্ত ভাবে আপূরণ, প্রতিপূরণ, পরিপূরণ এবং সম্পূরণটি সাধিয়া লইতে হয়; এরূপ না করিতে পারিলে কতিপয় স্বর উদ্‌গান করিয়া রাগের শুষ্ক কঙ্কাল বা কাঠামোটাই দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু তাকে পূর্ণাবয়ব ও প্রাণবন্ত করিয়া ফুটাইয়া তোলা যায় না।

বর্তমান কারিকাটিতে যে ভূতশুদ্ধি প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, সেই প্রসঙ্গের বিস্তারকল্পে আমাদের সূক্ষ্ম শক্তিকলেবরে পরপর যে সকল কেন্দ্র ও চক্র উন্মেষিত হইয়া থাকে এবং পরস্পরকে আপূরণাদি করিয়া গুরুশক্তির কৃপায় পরিপূরণ এবং সম্পূরণে গিয়া উপনীত হয়—তাদেরও একটা মোটামুটি আলেখ্য আমরা এখানে উপস্থিত করিলাম। এই আলেখ্যটাকে আরও বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। চক্রগুলির নিজ নিজ বর্ণ, তাদের সংখ্যা, আকৃতি এবং ছন্দ সম্বন্ধে যথাসম্ভব একটা বিস্পষ্ট ধারণা পাওয়া আবশ্যক। বর্তমান কারিকায় জপরূপ যাগটিকে সাঙ্গ করার নিমিত্ত মুখ্যতঃ তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম হইল ন্যাস যার ফলে জপযাগের অনুষ্ঠানে অলসিত ভাবটি কাটিয়া যায়। তারপর হইল ভূতশুদ্ধি যার ফলে উল্লাসের সাড়াটি মিলে এবং সে উল্লাস ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হইয়া গুরুশক্তির প্রসাদে বিমল উল্লাসপ্রৌঢ়ি এবং পরমোল্লাসের ভূমিতে গিয়া পৌঁছে। তারপর জপযাগের তৃতীয় অঙ্গ হইল

প্রেমভক্তি সহকারে সাক্ষাৎভাবে এ সকল ঊর্দ্ধগামী প্রবাহের মূলে যে গুরুশক্তি বিদ্যমান, সেই গুরুশক্তিরই কৃপাঘন মূর্তির ধ্যান। কোথায় সে ধ্যান করিবে? কারিকায় বলা হইতেছে "শিরসি কমলে," শাস্ত্রও বলেন "সহস্রারে কর্ণিকারে।" দ্বিদল পদ্ম গুরুধাম বটে, অর্থাৎ সেই উর্দ্ধতন key position এ রহিয়াই গুরুশক্তি অধ্যাত্মজীবনের সকল কেন্দ্রগুলির অভ্যুদয়ের নিয়ন্ত্রণ করেন বটে, তাঁর ধ্যানটি করিবে ওখানে নয়, কিন্তু "শিরসি কমলে" অথবা যদি বিশেষ নির্দেশ বা প্রেরণা পাও তো হৃৎকমলে। কেননা দ্বিদল তাঁর নিজ operative centre বটে কিন্তু ভক্তের প্রেমভক্তি লইয়া তিনি বিলাস করিতে ভালবাসেন, শিরসি সহস্রদলে অথবা হৃদয়ে দ্বাদশ দলে। ক্রিয়ার ভূমি আর বিলাসের ভূমি শুদ্ধে আসিয়া তত্ত্বতঃ আলাদা থাকে না বটে। তবু, যেন লীলাবৈভব লীলা আস্বাদনের জন্য সাধকের অভিরুচি হয় যে, এ দুটি ঠাঁই সে সদর অন্দরের মত যেন আলাদা করিয়াই পায়! বাড়ীতে যেমন বসার জন্য আর কাজ কর্ম করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর আবশ্যক হয়, এখানে আসিয়াও যেন সে আবশ্যকতাটিকে একেবারে ছাড়িতে পারিবে না. প্রেমভক্তির স্বরূপ এই যে সে ঐশ্বর্য আর তার প্রকাশকে মাধুর্য আর তার আস্বাদের কাছ থেকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়। এই নিমিত্ত সাধক গুরুশক্তির আপন ঐশ্বর্যপ্রকাশের ভূমি যে দ্বিদল, সেখানে তাকে প্রেম ভক্তি ভাব, ধ্যান সেবা পূজা এসব ঢালিয়া দিয়া যেন তৃপ্ত হইতে পারে না। সহস্রদলে অথবা হৃৎকমলে অতীব শান্ত রমণীয় এক পরিবেশের মাঝখানেই সে তার প্রাণের নিগূঢ় ভাবগুলি ঢালিয়া দিতে ব্যাকুল হয়। এই ভাবে 'শিরসি কমলে' প্রেমভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর ধ্যানে ন্যাস এবং ভূতশুদ্ধির যে মহোল্লাস সেটি অপরূপভাবে বিবর্তিত (transformed) হইয়া যায়। তখন সেটি হয় বিলাস। এইজন্য কারিকায় বলা হইতেছে "প্রেম্না ধ্যানাচ্ছিরসি কমলে শ্রীগুরোস্তদ্ বিলাসো।" এই বিলাসেই কি পর্যবসান?

"হক্ষৌ যত্র দ্বারগোপৌ"—

সেই দ্বিদল আজ্ঞাচক্র ঐশ্বর্য, আজ্ঞা, প্রশাসনের কেন্দ্র, সব কিছু উল্টার উল্টাইয়া সোজা হবার চক্র। 'এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি' ইত্যাদি বলিয়া শ্রুতি যে অক্ষরের প্রশাসনের কথা বলিয়াছেন, সে অক্ষর দ্বিদলের 'হক্ষ'—বর্ণমালার শেষ দুটি অক্ষরও জানিবে। বর্ণমালা এবং বর্ণমালাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল প্রপঞ্চ আর

'অধস্তন' কেন্দ্রসমূহের ক্রিয়াদি এই শেষের অক্ষর দুটি দ্বারা প্রশাসিতও হইতেছে। এখানে অধিষ্ঠিত শ্রীগুরুশক্তি একদিকে যেমন পরম ভদ্র, তেমনি অন্যদিকে আবার মহাভীষণ। উগ্র, বীর, রুদ্র— 'ভীষণং ভীষণানাং' মূর্তিটি এখানে পটান্তরালে নয়, সাক্ষাৎ প্রকটরূপেই বিদ্যমান। এখানে শ্রীগুরু তাঁর দ্বিভুজং দ্বিনেত্রং প্রসন্নবদনং মূর্তিটি যেন 'আড়াল' করিয়াছেন। এখানে তিনি 'ত্রিনেত্র' 'চতুর্ভুজ'—শিব শঙ্কর মূর্তি। প্রয়োজন হইলে তৃতীয় নয়নটির জ্বালাকরাল বহ্নিতেজে প্রমাথী মদনকে ভস্ম করার জন্য প্রস্তুত। দুটি করে বরাভয়মুদ্রা বটে, কিন্তু অপর দুটি করে দুটি বজ্রসত্ত্ব উদ্যত আয়ুধ! একাধারে পরম ভরসা ও চরম ভয়! 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি'—দ্বিতীয় বা দ্বৈতের পারে নেবার নিমিত্ত সেটিকে স্থূল-সূক্ষ্মের পারে কারণের ভূমিতেও দেখাইতেছেন! কারণে না দেখিলে দেখাই হইল না, কাজেই 'তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'—এটির প্রতিষ্ঠা ঘটিল না, শেষ গ্রন্থি-ভেদটিও হইল না।

শুম্ভাসুর বধকালে—'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' এই দেবী উক্তিতে ধ্যান লাগাও। কাজেই দ্বিদলটি হইল— 'সহজে' পৌঁছিবার চরম 'কঠিন ঠাঁই'। এখানে শ্রীগুরুধ্যান মানসপূজা স্তবস্তুতি আত্মনিবেদন করার পাত্র কে, কি ভাবে? এই নিমিত্ত চাই এমন এক নিভৃত মণিসরোরুহ যেটি পরম উল্লাসের সহস্র দল মেলিয়া—'প্রশমিতাধঃ কোলাহলম্'...কাজেই আপন পরিপূর্ণতার মহাব্যোমে নিত্যশান্ত; শিবশাসনতঃ দ্বিদলের পারে সকল অধঃকোলাহল প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। এই পরমোল্লাস সহস্রদলের কর্ণিকায় শ্রীগুরুদেবের করুণাঘন মূর্তির অপরূপ মাধুরী বিলাস। এইখানে তোমার অন্তরের সকল সাধ মিটাইয়া বিমলমঙ্গল যে শ্রীগুরুধ্যানরস সেটি পান করিতে হইবে। দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, প্রসন্নদৃষ্টি, স্মিতানন, বামে বিরাজিত-নিজ-শক্তি শ্রীগুরুরপাদাম্ভোজপ্রান্তে আপন সর্বস্ব অকুণ্ঠ লুটাইবার এই তো একান্ত সর্বাপ্যায়ন স্থান! দ্বিদলে আজ্ঞা, এখানে আপ্যায়ন। দ্বিদলের শাসনবশ্য এখানে প্রসাদ নির্মাল্য। পাদাম্ভোজপ্রান্তে মন মধুপের গুঞ্জনটিও আর চলে না! মধুমৎ থেকে মধুমত্তরে, তা থেকে মধুমত্তমে ডুবিয়া যাও। এখানে শ্রীগুরু স্বয়ং গায়ত্রী ঋকের 'বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য' আর তাঁর স্বশক্তি হইলেন মধুমতী। এইরূপ নানাভাবে ধ্যান লাগাইও। দু'য়ে অবিনাভাব সামভাস্য এবং সামরস্যে গ্রথিত।

দ্বিদল এক চরম সন্ধিস্থল। এখানে আরুরুক্ষু সাধক আরূঢ়, যুঞ্জান, যুক্ত

হইয়াছেন। কিন্তু এখানে যে শেষ দুটি পন্থা মিশিয়াছে—যেন বদ্রী আর কেদার। নির্বিকল্প নিরঞ্জন নির্বিশেষ? এই দ্বিদল গুরুধামেই তার পাকদণ্ডী—সহজ অথচ পরম দুর্গম পন্থাটি খোলা পাইতে হইবে (পরমহংসদেব আর তোতাপুরীর বৃত্তান্তটি মনে কর)। অধিকারী হইলে এ দ্বিদল ভেদ করতঃ সোজাসুজি নির্বিকল্পে প্রপঞ্চোপশমে চলিয়া যাও। গুরুমুখে মহাবাক্য শ্রবণেই যাঁর পরম সাক্ষাৎকার, তাঁর এই দ্বিদলের পাকদণ্ডী খোলা বুঝিও। হয়তো ছেলেবেলায় ইনি ভ্রূস্থানে শুদ্ধ শুভ্র অরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। পাকদণ্ডী ধরিয়া ইনি নিষ্কলে বিন্দুনাদ কলাতীতে প্রবিষ্ট হন। সকল হয় একান্ত মিলাইয়া যায়, নয়তো একটা কল্পিত ছায়ার মত উপরে ভাসিতে থাকে। ইনি নিষ্কলারূঢ়। কিন্তু পাকদণ্ডী কি সহজে খোলে? 'কবয়ঃ কিং বদন্তি?' এই নিমিত্ত গুরুশক্তি প্রথমে বিন্দু নাদ-সাধনলভ্য সকলের সবিকল্পের পন্থাটিই ধরাইয়া দেন। এর সাধক জপ ধ্যানাদির সাধনে 'অনাহত'-এর আভাস অথবা পরিচয় পাইয়াছেন, হয়তো দিব্য গন্ধ, স্পর্শ রূপ রসেরও। এঁকে শ্রীগুরু ধ্বনি ইত্যাদির সাহায্যে সকল ভাব ও শক্তির পরিসীমা যে শিরসি সহস্রদল, সেখানে আগাইয়া দেন—রসোল্লাসকে পাঠান রসের পরম বিলাস যে রাসমণ্ডল সেখানে। সহস্রসারে কর্ণিকারে স্বয়ং করুণামাধুরীঘন মূর্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তোমার পরম বিলাসের পটভূমি তিনি ফুটাইয়া লন। কাজেই, প্রথম মানসধ্যানে পরে তৎপ্রসাদে অতিমানস অনুভবে এই সহস্রদলেই তুমি গুরুধ্যান গুরুপাদুকা পূজা কর। তৎপ্রসাদে 'সকলারূঢ়' হও। আচ্ছা যিনি সকলারূঢ় তাঁর কাছে কি নিষ্কলের পথ একান্ত রুদ্ধ? না তা হবে কেন? 'শিরসি ব্যোম্নি' যে সহস্রদলটি ফুটিয়া অপরূপ বিলাসরসে তোমার মধু আপ্যায়নটি সাধিল, সে তো পরমজ্যোতির 'বাহিরে' কোন্ এক অজানার 'নিরালায়' ফোটে নাই! লীলার রসোজ্জ্বল সত্তা সেখানে সবই 'উজল মধুর' করিয়া দিয়াছে। কাজেই যেটি সারের সার সেটি ঠিকই আছে।

নির্বিকল্প, নিষ্কলের সাক্ষাৎ অনুভূতির 'সাধ' থাকিলে শিরসি ব্যোমপঙ্কজটি প্রথমে শিরের ঊর্দ্ধে মহাব্যোমে তুলিয়া লও। মনে হইবে যেন—রসের নিবিড়তা রসের বিপুলতায় আপনাকে বিলাইতেছে। সহস্রদলের অপরূপ রূপ বিলাসটি এক 'অরূপ সাগরে' ডুব দিয়া মাণিকটির মতন সংখ্যা ও মানের অতল দেশে আত্মগোপন করিতেছে! তারপর? তারপর সবিকল্পের শেষ দুটি—সানন্দ ও সাস্মিতে আরূঢ় হইয়া

মহাব্যোমকে পরমব্যোমে পরমসূক্ষ্ম কারণ স্পন্দে লইয়া যাও। তারপর? 'ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্'। নিষ্কলারূঢ় হইলে। সকলারূঢ় এবং নিষ্কলারূঢ় দু'য়ে মিলিয়া 'পূর্ণারূঢ়'—যেখানে 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' এর ঠিক ঠিক মর্মটি তোমার খুলিয়া গেল। 'শিরসি কমলে' কেন যে শ্রীগুরুধ্যান পূজাদি করিবে, আর তার পর্যবসানই বা কোথায় তাহা আভাসে এইভাবে বুঝিয়া লও। কিন্তু প্রয়োজন বুঝিলে অথবা নির্দেশ পাইলে অন্য চক্রে (বিশেষতঃ হৃদয়ে) গুরুধ্যানাদি করিবে। যেমন বিশেষ করিয়া দ্বন্দ্ব এবং সন্ধি সঙ্কটে আজ্ঞায়; বিশুদ্ধ সমর্থ মাত্র বর্ণিনী শক্তি ও শুদ্ধ স্বরোদয় নিমিত্ত কণ্ঠে; 'ভাবের দুয়ার খুলিতে' হৃদয়ে; তেজের কেন্দ্রীন বীর্য লাভের নিমিত্ত মণিপুরে (নাভি); অধোগ স্রোতের মুখ ফিরাইয়া (orientation) মাইনাসকে প্লাস করিতে স্বাধিষ্ঠানে; আর মাতৃকাশক্তির, বিশেষতঃ অর্দ্ধমাত্রার জাগৃতি নিমিত্ত মূলাধারে। অথবা ক্ষিতি প্রভৃতি যে কোনও তত্ত্বের ভূমিতে কোনও সঙ্কটজনক অথবা সংশয়াত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে, সেখানেই সমূর্দ্ধধাম থেকে গুরুশক্তির আবাহন কর; আর 'অবতরণ' ঘটাও। যেমন, অপ্ তত্ত্বে আসিয়া জপ স্নিগ্ধ, সরস, সাবলীল হইল বটে, কিন্তু গাঢ়তা (concentration) আর কেন্দ্রীণতা (focussing) —এ দুটি আবশ্যক সহগ (component) দুর্বল বলিয়া সে তেজস্তত্ত্বে উন্নীত হইতে পারিতেছে না। এমতস্থলে শ্রীগুরুর অযাচিত করুণাঘন অথচ পরমতৈজস মূর্তির এবং বীজের ধ্যান সাক্ষাৎ সঙ্কটমোচন জানিবে। অর্থাৎ, যে ঘনীভাব এবং তেজীয়স্ত্ব শ্রীগুরুতত্ত্বে স্বাভাবিক, সেই তত্ত্বেরই উপাসনা কর। আর তেজস্তত্ত্বে সবকিছু এক এক বিশিষ্ট রূপ বা আকৃতিতে যেন দানা বাঁধে। বায়ুতত্ত্বে যেতে গেলে এই দানাবাঁধা মূর্ত ভাবটি—আপন মন্ত্র যন্ত্র তন্ত্রটি—বিপুলের মহোৎসবে বিলাইয়া দিতে হইবে। ভগবানের অনুগ্রহশক্তিরূপা গুরুশক্তিতে পরম বিপুলতাও সাংসিদ্ধিক। কেন না, অনুগ্রহশক্তি সর্বদা, সর্বথা, সর্বত্রগা। এইরূপ বায়ু থেকে আকাশতত্ত্বে যাবার সময় নিস্তরঙ্গ অথচ নিঃস্পন্দ নয়, শান্ত অথচ প্রপঞ্চোপশম নয়, শান্ত নিস্তরঙ্গ অথচ সূক্ষ্মতম মূল কারণ স্পন্দভাব। এটিও গুরুতত্ত্বাশ্রয়েই আহরণীয়। ফলতঃ তত্ত্বসঙ্কট, ভাবসঙ্কট, বর্ণ বা শক্তিসঙ্কট, ছন্দঃসঙ্কট, সেতু বা সন্ধিসঙ্কট, এই সঙ্কট-পঞ্চকেই শ্রীগুরু পাদাব্জদলপঞ্চক সমাশ্রয়ণীয়। যেমন—'তিস্রোমাত্রা' ইত্যাদি দ্বারা সেতুসঙ্কট, 'গন্ধেন' ইত্যাদি দ্বারা তত্ত্বসঙ্কট, 'বাক্‌বুদ্ধি' ইত্যাদি দ্বারা বর্ণসঙ্কট,

'প্রত্যঙ্‌নিষ্ঠঃ' ইত্যাদি দ্বারা ছন্দঃসঙ্কট আর 'ভারং' ইত্যাদি দ্বারা ভাবসঙ্কট কাটাইবে।

আবার শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ গায়ত্রীমূর্তি ধ্যান করিয়া 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—এ পাদদ্বারা মূলাধার প্রণবের এবং স্বাধিষ্ঠান (বিসর্গ ত্যাগ করতঃ স্ব=স্বাধিষ্ঠানে 'স্ব') কেন্দ্রদ্বয়ের উদ্দীপন কর, 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং' দ্বারা মণিপুর; 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি' দ্বারা অনাহত; এবং 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' দ্বারা বিশুদ্ধ (বাক্ + প্রাণ + বুদ্ধি = ধী; এই ধী-কে দ্বিদলের আজ্ঞায়—'প্রচোদয়াৎ'= বিশুদ্ধিতে আনয়নের কেন্দ্র), এবং অন্তে বিন্দুরূপী প্রণব দ্বারা দ্বিদলকেও প্রসন্ন কর।

পুনশ্চ, দ্বিদলস্থিত গুরুশক্তিকে হংসবতী ঋক্ এবং ত্র্যম্বকং যজামহের সন্ধি-বিধায়িকা শক্তি ধ্যান করতঃ প্রথমটি থেকে 'হ' বর্ণ এবং দ্বিতীয়টি থেকে ('মুক্ষীয়') 'ক্ষ' বর্ণ আহরণ কর এবং দ্বিদলে স্থাপন কর। দুটি ঋকের সমর্থ মিলনে 'হংস' হন 'হৌংসঃ'। ত্র্যম্বকং মন্ত্র মান্ত্রবর্ণিক দৃষ্টিতে ওঁকার এবং ওঁকারের যজন। যেমন, ত্র্যম্বক = অ, উ, ম; অথবা ত্রিমাত্রা অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্র; ইত্যাদি। 'সুগন্ধিং' ইত্যাদি পদের রহস্য ব্যঞ্জনা আছে। সুগন্ধি = সু + গং + ধি।

আবার, গায়ত্রী ও মধুমতী ঋকদ্বয় মিলাইয়া লও—এই দ্বিদলে। গায়ত্রীর মধ্য হইতে সেতুরূপা 'ধীমহি' থেকে লও 'হ' বর্ণ; আর মধুমতীর যেটি মুখ্যক্রিয়া ('ক্ষরন্তি'), তা থেকে লও 'ক্ষ'। দ্বিদলের মহিমার তো অন্ত নেই, তবে ঐ ঐ ভাবে ধ্যানের 'অঙ্গ' ও 'সন্ধি' সন্নিবেশ করিয়া লইও।

মাতৃকা ন্যাসাদিতে বর্ণমালাকে নাদবিন্দুযুক্ত করিলে এক এক বর্ণ শব্দ-ব্রহ্মরূপটি পরিগ্রহ করে। এখন, ধর কং খং গং ইত্যাদি। শ্রুতি নিজেই 'কং' ব্রহ্ম 'খং' ব্রহ্ম বলিয়াছেন। 'খং' আকাশ ব্রহ্ম মনে করিলে 'গং' কি? এটি হইল আকাশের মূল ব্যক্ত—(গতি) রূপ। এটি নাদ। নাদসাধক অনাহত শব্দকে যে আকৃতিতে অনুভবে পান, সে আকৃতির শাব্দিক প্রতিকৃতি (equivalent) ঐ 'গং'। 'গঙ্গা' = 'গং' এই অনাহত ধ্বনি বা নাদে যিনি গমন করেন—যে বাক্, যে মন্ত্রশক্তি। এই গঙ্গাস্নান 'সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী,' 'সদ্যোদুঃখবিনাশিনী'। 'গং' ধারায় পড়িলে এতে সংশয় থাকে না। এইবার সু + গং + ধি কি দাঁড়াইতেছে? সু = সুষম; গং = নাদব্রহ্মের নিত্যপ্রবাহ; ধি = আগন্তুকভাবে নয়, স্বভাবতঃ (যেমন

সুগন্ধ পবন সুগন্ধি পুষ্প); 'ত্র্যম্বক' ঠাকুর তাঁর শিরে এই গং + গা স্বভাবতঃই ধারণ করেন, তাই তিনি সুগন্ধি।

'উর্ব্বারুক' শব্দটিও সঙ্কেতগর্ভ। উ + রু + আ + রুক—এই আকৃতি বিশ্লেষণে বুঝা যাইবে। ধর প্রণব। মধ্যে 'উ' বর্ণকে আশ্রয় করতঃ ব্যাহরণ করিতেছে (রু—উচ্চারণ) কিন্তু নাদের সন্ধানটি হইতেছে না। কি করিবে? ব্যাহরণকে (তোমার প্রণবধনুর জ্যাটিকে আরও আকর্ষণ কর, 'আতত' কর) যথাশক্তি সীমা পর্যন্ত লও। এইটি হইল 'আ'। 'উ'কে ছেড়ে 'আ' ধরিলে না; 'উ'কেই সীমা পর্যন্ত আতত করিলে। 'আ'-এর দুইপাশে দুইটি রু দ্বারা এইটি বুঝিবে, উচ্চারণে 'উত্ব' ঠিকই আছে শুধু spanটি বাড়াইয়া যাইতেছি। 'উরু' যে বেধবৃত্তি, তার সাথে 'আরু' এর আতত বৃত্তি compounded হইয়া যাহা অর বা শয়ের মতো শুধু piercing momentum, সেটিকে এক মহা চক্রবৃত্তিতে উপনীত করে। ফলে সাধারণ বর্ণের গণ্ডী বিদূরিত হয়—'উর্ব্বারুক মিব বন্ধনাৎ'। চরমফল নাদবিন্দুর সহায়ে ব্রহ্মের মূল কলনশক্তি বা কলায় পৌঁছান। এ কলা ব্রহ্মের পূর্ণ আনন্দকলা। কলা মানে এখানে অঙ্গা নয়। এরূপ বিশ্লেষণকে বলে স্বাক্ষরিক। স্বাক্ষরিকটি এভাবে হওয়া আবশ্যক যাতে সেটি স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক স্বারসিক স্বারূপিকে লইয়া যায়। সেটি হইলে আর কল্পিতার্থ হন না। বুদ্ধি বহুশাখা বহুধা পল্লবিতা হয় না।

কং ব্রহ্মের সুখ বা আনন্দ জাগৃতিরূপ প্রথম অভিব্যক্তি (ব্যঞ্জনমুখতা) যদি হয়, তবে 'খং' যেটির আকাশরূপতা—যে আনন্দাকাশে বিশ্ব-প্রাণন চলিতেছে। 'গং' এই আধার আনন্দের মূল স্পন্দরূপতা—পরাবাক, পরম নাদ। এই অভিব্যক্তি মুখেই ঋত ছন্দের—Cosmic Harmonyর মূল যেটি তার জন্ম। ইহাই মহা নটরাজের আদিম মহাশ্চর্য নটন। গতি অর্থে যে 'গম্' ধাতু সেটি এতেই ভূমিষ্ঠ হইল। এতেই শান্ত মৌন আনন্দাকাশ হইল পরমব্যোম, (বি বা বিয়ৎরূপে ওম্); তখন শান্তে আসিল লীলা-কৈবল্যং—আদিম চঞ্চলতা, মৌনের মিলিল বাণী। ব্যাহৃতি সপ্তকাদি এই মূলবাণী থেকেই। কাজেই 'গং' রূপী এই তত্ত্ব ধরিয়া সব কিছুর যেটি গোড়া—অব্যয় নিধান—তাতে যাইতে হইবে। আমাদের বাগযন্ত্রে উচ্চারিত ক কার প্রভৃতি অক্ষর, বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়া যষ্ঠী সহস্র হইয়াছে (৩.২×১০^{৪}) বটে, কিন্তু সে সকলই পতিত, 'মৃত' ভস্মত্বপ্রাপ্ত। 'গং + গা' আবাহন ব্যতিরেকে তাদের উদ্ধারের উপায় কি?

অপরা পরা আর পরমা—ভগবানের এই ত্রিবিধা প্রকৃতির মধ্যে পরা প্রকৃতি—জীবভূতা সনাতনী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ—দ্বিদলের অনুগ্রহ-প্রসাদেই নিজেকে অপরার কবলমুক্ত এবং পরমা-মুখীনরূপে অর্থাৎ 'শুদ্ধ' জীবরূপে জানিতে পারে।

দ্বিদলই হইল জীবের আমিত্ব—চিদচিদ্ গ্রন্থি (রুদ্রগ্রন্থি) ভেদের স্থান। সদসদ্-গ্রন্থি (ব্রহ্মগ্রন্থি) এবং মুদ-মুদ্ গ্রন্থি (বিষ্ণুগ্রন্থি) আগে শিথিল হইলেও, এখানে আসিয়া চিন্ময়স্বরূপানুভবেই নিজেদের শেষ 'গাঁঠ'ও খুলিয়া দেয়। তখন, গুরুকৃপায় জীব আপনাকে অমায়িক, অপ্রাকৃত, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ, সত্তাশক্তি রূপেই জানে। পরমা প্রকৃতির সাথে 'বৈজাত্য' এবং 'বৈমুখ্য' চলিয়া যায়। জড় বা ভূতের সামিল রহিয়া পরমামুখীন হয় কি করিয়া? পরমের সাথে অন্তরঙ্গ ভাবটি পাতায় কি করিয়া? তাই, দ্বিদল থেকে শ্রীগুরু করেন তার ভূতশুদ্ধি। এরপর, পরমের সাথে তার তাদাত্ম্যটি যে কোনও ভাবে স্থাপিত হৌক্। পরম সকলা, শুদ্ধ নিষ্কলা, আর পূর্ণসকল-নিষ্কলা—পরমা প্রকৃতির এই পরম রহস্যময়ী যুক্ত ত্রিবেণীতে যেখানেই 'নিষ্ণাত' হইবে হও। নিষ্ণাত হও—শুধু পরস্পর-খণ্ডন-কলরবী মনন বিচারের ঢেউগুলির সাথে ক্রমাগত লড়িয়া হয়রান হইও না। ব্রহ্মের অমূর্ত-মূর্ত, নিষ্কল-সকল 'দ্বে রূপে' যদি মননে 'বিদ্যাবিদ্যা বিষয়ে' মনে হয়, তা হৌক্। নিষ্কলের সাক্ষাৎ অনুভবে যাও—সেখানে কি-ই বা 'বিদ্যা' আর কি-ই বা 'অবিদ্যা', কেবল শিবাদ্বৈত তুষ্ণীম্! 'আবার পরম সকলে যাও, তা হইলে শুদ্ধ নিষ্কলকে আর অসম্যগ্ দর্শন, শুধুই 'তনুভাঃ' ইত্যাদি ভাবে বলিবে না। সেখানে যাও দেখিবে তথায় সম্যক্ অসম্যকের মাপকাঠিতে আর কুলাইতেছে না, আর, 'তনু' এবং ভাঃ যেন পরস্পরকে বলিবে—যেমন ভানু আর তার তেজোদীপ্তি পরস্পরকে বলে— "আমি তোমার রসরূপে পরম ঘনীভাব আর আমি তোমার আধাররূপে পরম বিস্তার!" এ ঘনীভাব আর বিস্তারও পরস্পরকে আলাদা করে ভাবনার ও বলা কওয়ার ক্ষেত্রে। নইলে জ্যোতীরসের তাদাত্ম্য অনির্বাচ্য। ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ কোনও কিছুতেই সেটি ব্যক্ত হইবার নয়। পূর্ণে সব কিছু সমাপ্ত হইয়া চুপ। তবে কি মনন ও কথনের গলা টিপিয়া ধরিবে? তা কেন? তুমি রসিক, তুমি স্বচ্ছন্দে রসানুভূতির মতন করিয়া মনন কথনকে সঙ্গে লও। তারা পরম অচিন্ত্যের দুয়ারটিতে আসিয়াই ছুটি নেবে। আর, তুমি প্রপঞ্চোপশমের পান্থ—তোমার সবকিছু বিচারকে সেই জ্যোতিষাং জ্যোতির

বহির্দিশারী করিয়া লইয়া চল, তারা পরম সাক্ষাৎকারের বহির্ভাগেই ক্ষান্ত হইবে। জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ রসানাং রসতমঃ-এর দুয়ারের ত্রিসীমানায় যাইবে কে? এ অচিন্ত্য দেশের হেঁয়ালি শুনিয়া আর কি হবে? তবে দ্বিদল থেকেই এ অচিন্ত্যচিন্তামণির 'নাচদুয়ারে' (লীলারসে) অথবা তার পরম ভাস্বর শান্তচ্ছটায় বা পরম চিদ্‌গগনচন্দ্রিকায় (লীলালোক) পথটি মিশাইতে হয়। শ্রীগুরুই সাধকের রসভাসের দুটি 'দল' পরখ করিয়া তাকে রসের অথবা ভাসের পথে চালিত করেন। অন্তে আবার দুটিকে মিলাইবার জন্যই। না মিলিলে যে পরম সোয়াস্তি নাই। পূর্ণের পর্যাপ্তি নাই।

এ তো গেল উপরের হেঁয়ালি। এ হেঁয়ালির বাস্তব সমাধানের চাবিকাঠি ঐ দ্বিদল গুরুধামে। নীচের যত হেঁয়ালি তাদেরও যথার্থ সমাধানটাও এখানে হয়। অর্থাৎ 'প্রাকৃতের' আর 'পাঞ্চভৌতিকের' সমাধান। কেবল স্থূলে নয়, সূক্ষ্মে, কারণে পর্যন্ত প্রাকৃতের আর ভৌতিকের 'জটলা' গুলো পর পর দেখা দিতে থাকে। এক কথায় এগুলো 'মর্ত্তস্য ধূর্ত্তিঃ'। এর ধূর্ত্তিতে অমৃতও ভয়ভীত। মর্ত্তস্য ধূর্ত্তির ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে দুইটা সম্বেগ (momenta) —একটা যোগবাহী, অপরটি অযোগবাহী। একটা এর কুক্ষিতে সব কিছুকেই এরই জড়ত্ব (Law of Inertia) পাশে যুড়িয়া রাখিবেই—কর্ম বল, ভাব বল, জ্ঞান বল, সব কিছুকেই। সব কিছুকেই বলিবে—তুমি আমার action-reaction আর অনুপাতের পাশ কাটাইয়া যাইবে কোথায়? এর ভেতরেই পাক খাইতে থাক। অপর সম্বেগটি এর উর্দ্ধতন লোকের আকর্ষণী—'অমৃতস্য ধারাং' থেকে সব কিছুকে অযুক্ত, 'পরাঞ্চি', পরাঙ্মুখ করিয়া রাখিবেই। দ্বিদলে আসিলে এই সম্বেগ দুটি উল্টাইয়া যায়। —যোগটি বিয়োগ, বিয়োগটি হয় যোগ। ভূতের ধূর্ত্তির পাশবন্ধ হয় পাশমুক্ত, আর পরাঞ্চি হয় প্রত্যঞ্চি। এর ফলে অসামান্য পরিবর্তন দেখা যায় অধ্যাত্মজীবনে। স্থূলদেহে বামভাগ আর দক্ষিণভাগের nerves গুচ্ছ মস্তিষ্কের পথে Pons Viroliতে আসিয়া 'মুখ' বদলাইয়া লয় দেখি; বাম যায় দক্ষিণে, দক্ষিণ যায় বামে। অধ্যাত্মজীবনে এর মূল ছাঁচটি আছে। দ্বিদলে আসিয়া উলট্ যাও। অধিভূত যোগ হয় অধ্যাত্মযোগ, আর অধ্যক্ষর বিয়োগ হয় অধিযজ্ঞযোগ। শ্রীগুরু পরমদৈবতরূপে দুয়েরই অধ্যক্ষতা করেন। গাধিভূতাদিকে ভালমতে চিনিয়া লও। অধিযজ্ঞ মানে 'অধিক যজ্ঞ' নয়। বিশ্বভুবনে স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে যে 'যজ্ঞ' অবিরাম চলিতেছে, উর্দ্ধগ সাধকেরাও জপাদিরূপে যে যজ্ঞ করেন,

সে যজ্ঞের বিভর্তা অনুমন্তাদিরূপে যে অব্যয় সর্বেশ্বর পুরুষ রহিয়াছেন, আর এ যজ্ঞের অধীশ্বর হইয়াও যিনি আমার 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ'—সেই পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম যোগই এখানে (দ্বিদলের ভূমিতে ও তদুর্দ্ধে) বুঝিবে। 'অক্ষরং পরমং এবং নাদ-বিন্দু-কলারূপে অভিব্যক্ত, এ দুই-ই লইবে। শেষের তত্ত্বগুলো দুই দুইভাবে লওয়ার ও মিলাইবার ঠাঁই দ্বিদল। আমাদের এই আজব যন্ত্রে Commutator and Transformer এক আধারে।

ভূতশুদ্ধির প্রসঙ্গে দ্বিদল সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বিশেষ করিয়া বলা হইল সে কথাগুলির সারাংশ সমাহার করতঃ দ্বিদলের উদ্দেশে নিম্নের শ্লোকত্রয়ে প্রণাম করা হইতেছে:—

দ্বিদলবন্দনত্রয়ী

হক্ষৌ যত্র দ্বিদললসিতে পঙ্কজে সন্ধিগোপা-
-বাজ্ঞা প্রত্যক্ প্রথয়তি পরমং যৎ পরাক্ তৎ প্রশান্তি।
কারুণ্যৌকো নয়তি সকলং নিষ্কলং যচ্চ পূর্ণং
শুদ্ধং ভূতাচ্ছিব সদৃশতাং নৌমি মন্নাথধাম॥ ২০॥
(ভূতাচ্ছুদ্ধং)
যোগাযোগী নিরতি-বিরতি-স্রোতসোর্বৈপরীত্যং
যাতো যত্র প্রকৃতিপরতাং যাতি জীবোঽপরোর্দ্ধম্।
পন্থানৌ দ্বৌ দ্বিমুখ-বিততৌ যত্র ভাসো রসস্য
নিত্যং দ্বন্দ্বাদুদিত-পরমং নৌমি সত্ত্বস্থধাম॥ ২১॥
মূর্ত্তামূর্ত্তে দ্বিদললসনে যত্র রূপে পরে দ্বে
সারং যত্রামৃতগরলয়ো রাসভাসো রসোঽপি।
গন্ধঃ সন্ধিঃ পৃথুতনুপরে হ্বর্দ্বমাত্রা চ শব্দঃ
স্পর্শো গ্রন্থেঃ সুসুখবিলয়ো নৌম্যশব্দাদিধাম॥ ২২॥

যে দ্বিদললসিত কমলে 'হক্ষ' এই দুই বর্ণ সন্ধিগোপ (রক্ষী) রূপে রহিয়াছে; যেথায় আজ্ঞা (জ্ঞ = জ্ঞাতা; দুইপাশে দুটি 'আ' সীমা এবং ব্যাপ্তি, সুতরাং জ্ঞানাদি

শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নিরতিশয়তা সূচনা করিতেছে; অথবা, জ্ঞ = পরমাত্মা, যিনি আদ্য 'আ' বর্ণ দ্বারা অসত্য, তমসা ও মৃত্যুকে আবরণ, আচ্ছাদন করেন; আর পরের 'আ' দ্বারা সত্য, জ্যোতিঃ, অমৃত, অভয়ের অপাবরণ বা অনিরাকরণ করেন। অথবা, যিনি সাধককে সকলা ও নিষ্কলা এই কাষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ণারূঢ় করেন। অথবা, বিশেষভাবে, জ্ঞ—মান্ত্রবর্ণিকী-শক্তির পূর্ণজ্ঞান; আদি আ=পাদমাত্রা, পরের আ=কলাকাষ্ঠা।) যেটি প্রত্যক্‌প্রবণ সেটিকে পরমতার পানে প্রসারিত করিয়া দেন, আর যেটি পরাক্ সেটিকে প্রশাসন করে; কেবল জ্ঞান আর ক্রিয়াশক্তির কাষ্ঠা কেন্দ্র নয়, পরন্তু ভাবশক্তিরও পরিপূর্ণতা ঐ দ্বিদল শ্রীগুরুধামে। তাই ইহা—কারুণ্যৌকঃ—অসীম যে পরম করুণা সেটির নিলয়। সেই পরমকরুণাপ্রসাদেই সম্ভব ও চরিতার্থ হয় সাধকের সকল, নিষ্কল ও পূর্ণের পানে 'অভিযান'। আর, এই পরমকরুণাই পাশবন্ধ জীবের 'ভূতের বোঝা' নামাইয়া তাকে পাশমুক্ত 'শিবসাদৃশ্য' দিয়া থাকেন। (এই 'সাদৃশ্য' সামীপ্য থেকে 'সামরস্য' পর্যন্ত ব্যাপ্ত বুঝিবে। দ্বিদলে পৌঁছিলে সামীপ্য, তার পর সুরু হয় সামরস্য যোগ—শ্রীগুরুকৃপাপ্রসাদেই।)—এমন যে আমার 'মন্নাথধাম' তাঁকে আমি প্রণাম করি।

ভূতভৌতিকের প্রপঞ্চে নিরতি (প্রবৃত্তি), আর যেটি শুদ্ধমুক্ত (অপ্রাকৃত, অমায়িক), তাতে বিরতি (নিবৃত্তি)—এই দুটি 'প্রাকৃত' স্রোতঃ বা ধারা বহমানা; জীব এই ধারায় পতিত। তার ফলে, জীবের প্রাকৃতার্থে যোগ আর পরমার্থে অযোগ বা বিয়োগ ঘটিতেছে। পরন্তু এই দ্বিদলের কৃপায়, এই প্রাকৃত যোগাযোগটি বিপরীত হইয়া যায় (বৈপরীত্যং যাতঃ), অর্থাৎ অপরামার্থে হয় বিয়োগ, আর পরমার্থে হয় যোগ। সঙ্করধারায় বিয়োগ, শঙ্করধারায় যোগ। এই বিপ্রতীপ যোগাযোগের ফলে, অষ্টধা অপরার উর্দ্ধে জীব আপন শুদ্ধা সনাতনী পরাপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরায় আসিয়া দুই মুখে প্রসারিত দুটি পন্থাঃ (দ্বিদল যাদেরও সঙ্কেত) সামনে দেখিতে পায়। একটি রসের (রসিকের) পথ, অপরটি 'ভাস্' (জ্যোতিঃ বা জ্ঞানের) এর পথ। পথ দুটি যেন আলাদা এবং ভিন্নমুখী। পথ-সন্ধি যেন মার্গ বা অধ্ব দ্বন্দ্ব মনে হয়। কিন্তু এই আপাততঃ দ্বন্দ্ব ও পক্ষপাত হইতে অবশেষে যাঁর কৃপা 'উদিত পরমে' পৌঁছাইয়া দেন, সেই দ্বন্দ্বাতীত, নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ আমার দ্বিদল শ্রীগুরুধামকে আমি প্রণাম করি॥

ব্রহ্মের মূর্তামূর্ত এই দুই রূপই পরমরহস্য দ্বিদলের লক্ষণ বা রূপ। বিষ এবং অমৃত, রাস এবং ভাসের যেটি 'সার' সেইটি হইল এই দ্বিদলকমলের রস বা 'মধু'। পৃথু (স্থূল), তনু (সূক্ষ্ম), পর (কারণ ও তদতীত) এদের পরস্পর যে সন্ধি, সেই 'সন্ধি'ই ইহার গন্ধ। আর ব্যক্ত (ত্রিমাত্রা) আর অমাত্র এর মধ্যে 'সেতু'-রূপা যে অর্দ্ধমাত্রা তাহাই হইল ইহার শব্দ বা বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। আর, শ্রীগুরুর অমোঘ করুণাবলে যখন শেষ চিদচিদ্ গ্রন্থিটিরও 'সুসুখ বিলয়'টি সাধিত হয়, তখন গ্রন্থিভেদের ফলে যে আত্যন্তিক সুখরূপ 'ব্রহ্মসংস্পর্শ'—সেইটি হইল ইহার স্পর্শ। এবম্বিধ অপূর্ব রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় দ্বিদলধাম কিন্তু স্বরূপে, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মাভিন্ন শ্রীগুরুতত্ত্বেরই ধাম। এমন ধামকে আমি প্রণাম করিতেছি॥

দ্বিদলে যে তোমার 'মন্নাথধাম' সেখানে তোমার সকল অন্তর লুটাইয়া প্রণাম করিলে, ফলে সেখানে যে প্রশাসনমূর্তি, সেটি হইলেন প্রসাদমূর্তি। তাঁর প্রসাদেই তুমি 'সহস্রারে কর্ণিকারে' শ্রীগুরুর পূজা ধ্যানাদি করিতে চলিলে। সেখানে যাইয়া সেই কর্ণিকার মধ্যে এক দিব্য, রক্তকমলে সমাসীন দ্বিনেত্র দ্বিভুজ, বামে, বিরাজিতা স্বরূপৈশ্বর্যমাধুর্য পরিসীমা স্বীয়সামরস্যাভিন্নবিগ্রহা স্বশক্তি-শ্রীগুরুমূর্তি, দর্শন করিয়া ধন্য হইলে। এইটি হইল তোমার অন্তরাত্মার রসবিলাস এবং জ্যোতির্বিলাসের স্থান। এই বিলাসের যে কোথায় পর্যবসান তাহাও আভাসে পূর্বে দেখানো হইয়াছে। তবে শেষ পর্যবসানটি যেখানে যেভাবেই হোক্, এই ধামে তোমার জপধ্যান আপনাকে যে চরিতার্থ মনে করিল, সে পক্ষে সংশয় নাই। এই চরিতার্থতাটি হয় জপধ্যানের, যেটি স্বরস অমৃত সেটির নিবিড়তম আস্বাদনে। আর সে আস্বাদনটি হয় কিসের দ্বারা? সেটি "ভাসা" কিনা পরমোজ্জ্বল যে রস সংবিদ্ তাতেই। অর্থাৎ এ আস্বাদনে মোহ বা মূঢ়তার লেশরত্তিও রহিলে চলিবে না। এখানে অনুভূতির উজ্জ্বলতা আর রসের নিবিড়তা অভিন্ন হইয়া মিলিয়া গিয়াছে। "রসো বৈ সঃ" যে পরম পুরুষ তাঁর এই প্রকার আপন আস্বাদনরূপা যে পরমোজ্জ্বল রসসংবিদ্ সেইটিই হ্লাদিনীর সার শ্রীরাধাতত্ত্ব কিনা তাও ভক্ত রসিকেরা ভাবিয়া দেখিবেন। অবশ্য এখানে যেটি পরিসীমা তার কথাই বলিতেছি। সহস্রার কমলে জপধ্যানে বসিয়া এই পরম রসোজ্জ্বল পরিসীমার একটা আভাস মিলে। তখন শ্রীগুরুপ্রসাদে আপন প্রেমটিকে সম্বল করিয়া এই পরিসীমার পানে আগাইয়া চলিতে হয়। শেষ পর্যন্ত আগাইয়া চলিলে দেখিবে যে

সকল নিষ্কলের ভেদ ও ব্যবধানটি সেখানে মিটিয়া গিয়াছে। সে একটা পরম অব্যক্ত পরিপূর্ণতার ভূমি। সেখানে উপনীত হবার সাধন স্বরূপে কারিকাটিতে বলা হইয়াছে—"ভাসা ভুঙ্‌গ্ধং স্বরসমমৃতং সাঙ্গা যাগে জাপে বঃ।" উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আন্তর জ্যোতিকে দিশারী করিয়াই তোমার নিবিড় হইতে নিবিড়তর জপধ্যানের স্বরস অমৃতের আস্বাদনে আগাইয়া যাও।

ন্যাস ভূতশুদ্ধি এবং গুরুধ্যান—প্রধানতঃ এই তিনটি অঙ্গা সহকৃত (সাঙ্গা) তোমার যে জপযাগ, তার সম্বন্ধে সবিস্তারে বলা হইল। কিন্তু, তুমি যদি এইরূপ সাঙ্গা বা অঙ্গা সহকৃত জপযাগের উপদেশ বা শিক্ষাটি না পাইয়া থাক তবে কি করিবে? ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতির শিক্ষা না থাকিলেও অশেষ করুণাঘন মূর্তি শ্রীগুরুতে আর তাঁর দেওয়া নামটিতে তোমার পুরো নিষ্ঠা রহিয়াছে তো? যদি তা থাকে, তবে শ্রীগুরুকৃপাকে একমাত্র সম্বল করিয়া তুমি নামজপে লাগিয়া যাও। শ্রীগুরু ঐ নামের ভিতর দিয়াই সব কিছুই তোমাকে শিখাইবেন। তবে অবশ্য নামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা তোমার থাকা চাই। এইরূপ নিষ্ঠাসহকারে সমাশ্রিত যে নাম তার দ্বারাই নামে গোড়ায় যে স্তিমিত অলস ভাবটি দেখা যায় সেটির পরিহার হয়। এই অলস ভাবটি কাটিয়া গেলে নাম তখন বেশ রোখের সঙ্গেই চলিবে। তখন হয়তো দুইচারি সহস্র জপের কথাতেও তুমি ভয় পাইবে না। কিন্তু তখনও নামের ভিতর যে রস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তার পরশটুকু তোমার মিলে নাই। শ্রীগুরু কৃপায় ভরসা রাখিয়া শুধু ধৃতি সহকারেই তোমার কৃতি চালাইতেছ। এমত অবস্থাতে নামে নিগূঢ় যে স্বরস সুষমা বা মাধুরী সে মাধুরীর কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ তুমি ভাঙ্গিবে কিরূপে? উপায় ঐ নামই। নামরসমাধুরীর কুণ্ঠা অপগত হইলে তোমার উল্লাস মিলে এবং তার ফলে হয় নামে রুচি ও রতি। রুচি বা রতি হইলে শুধু ধৃতি সহকারে কৃতিটি চালাইতে হয় না। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল "নাম্না নাম্নি স্বরসসুষমোল্লাস-কুণ্ঠাং জহাহি।" স্বরসমাধুরীর কুণ্ঠাটি কাটিয়া গেলে তখন তোমার নাম ও নামীর সাথে প্রিয় পরিচয়টি ঘটিল। এই প্রিয় পরিচয়টি আবার নিজেকে বিচিত্র চারু বিলাসে রূপায়িত ও লীলায়িত করিয়া দেখাইবে, সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তখন নাম-মাধুরীকে সঙ্গো করিয়া এক দিব্য অনুভূতির দেশে তুমি যাইয়া প্রবিষ্ট হইবে। কিন্তু এবম্বিধ দিব্য অনুভূতিতেও তোমার নামযাত্রাটি সাঙ্গা হইবে না জানিও। যতক্ষণ পর্যন্ত না এক পরমোজ্জ্বল পরম মধুর

শান্ত সামরস্যে তোমার সব কিছু উল্লাস ও বিলাস মিলাইতে পার, ততক্ষণ তোমার দাঁড়াইবার যো নাই। এই নিমিত্ত নামের সঙ্গো প্রিয় পরিচয়ের পরে যে চারুচিত্র বিলাসের পটভূমিটি উন্মোচিত হইয়া যায়, সেটির মায়া কাটাইয়াও তোমাকে আরও গভীর, আরও বিপুল, আরও সমুজ্জ্বলের পানে চলিতে হইবে। কারিকার শেষ চরণে তাই বলা হইতেছে "নাম্না নাম্নীতমপি জহিহি প্রোজ্জ্বলে সামরস্যে।।" শেষের যাত্রায়ও তুমি নামকেই ধরিয়া আছ।

অতএব দেখিলে যে রসের অলসিত ভাব কাটাইবার উপায় নাম। উল্লসিত ভাব ফুটাইবার উপায় নাম। বিলসিত ভাব বিকাশের উপায় নাম এবং স্বলসিতভাবে শান্ত সমাহিত হইবার উপায়ও নাম। যদি বল, শ্রীগুরু তো নামরূপে আমায় কৃপা আজও করেন নাই, তথাপি ভাবনিষ্ঠা সহকারে কোনও ভগবন্নাম অথবা 'গুরু' এই নাম লইয়া যদি ভজনা কর, তবে সেই নাম যথাসময়ে গুরুরূপে তোমায় কৃপা করিবেন—গুরু মিলাইবেন। কিরূপে? তোমার আগ্রহশক্তি সমর্থভাবে জাগাইয়া সর্বদা সর্বতোব্যাপিনী যে অনুগ্রহশক্তি তাঁকে 'মূর্ত্ত' ও প্রসন্ন করিয়া নিষ্ঠা সহকারে জপ চলিতে থাকিলে। প্রথমা কিনা বৈখরী—আলস্য হইতে জাগরিত হয়। তারপর মধ্যমায় যাইলে সেটিকে পাই উল্লসন্তী-রূপে। আর পশ্যন্তী হইল বিলসন্তী রূপ এবং স্বয়ং পরা হইল স্বলসন্তী।

তারচক্র সমাচরণের অনুবাদ

তন্ত্রাদিতে যে রহস্যবাণী শোনা যায়—বিন্দু হইতে নাদ, আবার নাদ হইতে বিন্দু—সে রহস্যবাণীর ঠিক মর্মটি যে কি তা বোঝা যায় যখন গায়ত্রী প্রভৃতি প্রণবপুটিত মন্ত্রে আদিতে এবং অন্তে প্রণবকে উদয় ও বিলয় এই দুইভাবে ব্যাহরণ করা যায়। অর্থাৎ উদয়ের সময় বিন্দুর মত একটা সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে নাদে বিস্তার করিয়া লইতে হয় আদিতে, এবং অন্তে সেই নাদকে আবার বিন্দুর মত একটা সূক্ষ্মতায় লইয়া আসিতে হয়। যেমন বীজ হইতে পাদপ আবার পাদপ হইতে বীজ। পূর্বোক্ত প্রণবের উদয়-বিলয়টিকে সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গো তুলনা করিয়া বলা হইতেছে—বিন্দুতে তার বা প্রণবরূপ যে বালারুণ উদিত হন তিনি অ উ ম এবং ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই তিন অর্ণ বা বর্ণরূপে প্রকট হইয়া যেন ভাস্কররূপটি ধারণ করেন। উষার অরুণ যেন প্রভাতের ভাস্কররূপে প্রকট হইল, তারপরে "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি"—এই

ভাবে সে তার—সূর্য যেন মধ্যগগনে আসিয়া বিরাজিত হইলেন। শেষকালে “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ”—এই শেষের ওঁঙ্কারে আসিয়া তিনি যেন আবার বিন্দুতেই অস্তমিত হইলেন।

বারাহীশক্তি যে মহাচক্র দংষ্ট্রায় ধারণপূর্বক সলিলমগ্না বসুন্ধরাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করেন, সে মহাচক্রটিকে প্রণবের এবম্বিধ বিন্দু হইতে নাদ, আবার নাদ হইতে বিন্দু এইরূপ উদয়-বিলয় আবর্তনের চক্র বলিয়াই বুঝিবে। উদয়বিলয়ের ছন্দঃটি ঠিক রাখিয়া এই তারচক্র চলিতে থাকিলে মূলাধারে নিদ্রিতা মাতৃকা-শক্তিরূপিণী যে বসুন্ধরা তাঁর প্রথমে স্পন্দ, পরে জাগরণ হইয়া থাকে। এইটি বিশেষ করিয়া উদয়-প্রণবের ক্রিয়া, আর নাদ হইতে বিন্দুতে গমনরূপ যে বিলয়-প্রণব তার ফলে ষড়চক্রের সকলের ঊর্দ্ধে যে দ্বিদল চক্র তাতেও প্রথমে স্পন্দ পরে জ্যোতির বিকিরণ হইতে থাকে। কাজেই এভাবে প্রণব ব্যাহরণের ফলে মূলাধার থেকে দ্বিদল পর্যন্ত ছয়টি চক্রকেই বেড়িয়া এক মহান্ উদ্বোধন চলিতে আরম্ভ করে। অধঃ এবং ঊর্দ্ধ উভয় স্থলে এই উদ্বোধনের ফলে মধ্যের চক্রগুলিও আর উদ্বুদ্ধ না হইয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। এইটিই হইল বারাহী শক্তি দ্বারা নিমজ্জিতা বা বসুন্ধরার সমুদ্ধার।

যত কিছু বিষম চক্রজালে তুমি পতিত হইতেছ ও জড়াইয়া পড়িতেছ, সে অশেষ জটিল চক্রজাল ছেদন করিতে এই তার—চক্র সমর্থ। আবার যে সুষম চক্র আশ্রয় করতঃ তুমি সাধন ভজনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চাহিতেছ সে সুষম চক্রটির মহাশ্চর্যরূপে শক্তিবৃদ্ধিকারী এই তারচক্র, আর এই নিখিল ভুবনচক্রের যেটি নাভি—যে নাভি ভেদ করিতে না পারিলে কোন মতেই এই প্রাকৃতের পারে অপ্রাকৃতে যাওয়া যায় না—সে নাভিকে অনায়াসে ভেদ করিতে সমর্থ এই তারচক্র। কাজেই এই তার বা নিস্তার চক্রটিকে তোমার অন্তরের সকল নিষ্ঠা দিয়া সমাচরণ করিতে ছাড়িও না।

জীব যে বিষম চক্রজালে পতিত, সে চক্রজাল ছেদনকারী; জপাদি সাধনের যে সুষম চক্র সমাশ্রয়ে জীবের নিষ্কৃতি, সে সুষমচক্রের শক্তিবর্দ্ধনকারী; যে ভুবনচক্রের নাভিভেদ করিতে না পারিলে গতাগতির পারে যে ‘অনপায়’ ধাম, সেখানে গতি ও স্থিতি হয় না, সেই ভুবনচক্রেরও নাভিভেদনকারী যে ‘তারচক্র’ সে চক্রের সমাচরণ কর।

প্রত্যক্ষ সবিতা যেমন প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে আবৃত্তিমান্ হইয়া রাত্রিকালে (নক্তং) অপ্রকট হইয়া যান, সেইরূপ নিখিল বাক্ এবং ছন্দের প্রসবিতা যে স্বর (প্রণব), তিনিও বিন্দু হইতে উত্থিত হইয়া (প্রাতঃ), নাদরূপে পূর্ণ প্রকট হইয়া (মধ্যাহ্ন), পুনশ্চ বিন্দুতে অস্তমিত হন (সায়াহ্ন)। অস্তমিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হন না—অপ্রকট হন। একটি প্রণবের (ব্যাহরণে) রাত্রি (নক্তং)। এখানে প্রণব 'বিন্দুলীন' হইয়া যেন শয়ন করেন (শেতে)। কিরূপ? 'স্ববীজ ইব পাদপঃ'—বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে বিকাশের ধারা অবিচ্ছেদে ফলবান্ পাদপ পর্যন্ত যায়। ফলের মধ্যে যে বীজ, সে বীজে আসিয়া ধারার যেন বিরাম হয়—কিছু কালের জন্য; পাদপ যেন স্ববীজে নিদ্রিত হয়। সে নিদ্রা ভঙ্গ হয়, যখন বীজ হইতে আবার অঙ্কুরোদ্গম হয়। এইরূপ অন্তে যে প্রণব বিন্দুতে সূক্ষ্মভাবে লীন হইতেছেন, তাঁকে সেই বীজরূপ বিন্দুতে ক্ষণমাত্র শয়ন ও বিশ্রাম করিতে দিতে হয়। ঐ বিন্দুতে ফিরিয়া আসার স্থলটি হইল তারচক্রের 'মেরু'। এই মেরুতে আসিয়া 'ক্ষণমাত্র' শয়ন বা বিশ্রাম করিবে।

তার (প্রণব) মন্ত্র অথবা প্রণবপুটিত (যথা, ওঁ ঐঁ ওঁ) জপের শেষে ঐ মেরুতে আসিলে ব্যাহরণের বিরাম দিয়া ক্ষণমাত্র শয়ন বা বিশ্রাম করিবে (শয়ীথাঃ)। কোথায় শয়ন? নাদের সেই সূক্ষ্ম অবসান বা বিলয় ভূমিতে। যেমন কোন ঘণ্টাধ্বনি—ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে চলে। সেই সূক্ষ্মধ্বনি যে সীমা পর্যন্ত লইয়া যায়, সেখানে একটুখানি স্থির হইবে, আপন আয়াস বিরত হইতে দিবে। এ বিরামের ভূমিতে (সুষুপ্তির মত) এক অব্যক্ত 'আরাম' মেলে। প্রাণ ও চিত্ত—দুই-ই অবিরাম স্পন্দ থেকে যেন কিছুটা জিরেন পায়। এই আনন্দ থেকে সব কিছু 'জীবন্তি'। অতএব নাদের বিলয়ের এই ভূমিতে আসিয়া ঐ সূক্ষ্ম বীজরূপ ধ্বনিতে এক ক্ষণ শয়ন করা চাই।—অন্যথা, মেরুর লঙ্ঘন হইবে, এবং তার ফলে প্রাণ (ও চিত্ত) শ্রান্ত হইয়া পড়িবে (প্রাণাঃ শ্রাম্যন্তি বৈ যতঃ)। কাজেই, 'একদমে' তারচক্র চালাইতে গেলে ঐ শ্রান্তি একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে এবং 'শয়নের' ঐ সঞ্জীবন আরাম ও শান্তি সহজ স্বচ্ছন্দ হয় না। 'প্রচোদয়াৎ ওঁ'—শেষের এই ওঁকার সূক্ষ্ম ঘনীভূত করিয়া আনিয়া তাতেই একটি ক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইবে। ঐ সময় দ্বিদলে স্পন্দন অনুভব হয়। ঐ স্পন্দনটি যেন এক শান্ত আধারে মিলাইয়া গেল—সব স্পন্দ তার স্পন্দরহিত আধারের সাক্ষাৎ স্পর্শ

পাইল—এইটি বোধে পাইতে হয়, যেমন সুষুপ্তিতে পাইয়া থাকি। শ্বাস বায়ুর দিক থেকে এটা হবে—সহজ কুম্ভকের অবস্থা, অর্থাৎ আয়াসকৃত পূরক, রেচক, কুম্ভক নয়।

অতঃপর 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি যে প্রসিদ্ধ গীতার শ্লোক, তার এক রহস্য এখানে বলা হইতেছে। গীতায় 'পশ্যতো মুনেঃ' আছে, এখানে বহুবচন 'শৃণ্বতাং' ('শৃণ্বন্তু বিশ্বে' ইত্যাদি স্মরণ কর)। যাঁরা নাদানুসন্ধান পূর্বক নাদ বা কোনও অনাহত ধ্বনি শুনিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত নাদই হইল দিবা, এবং তাঁরা এই নাদেই (অত্র) জাগিয়া রহেন (জাগ্রতি)। পক্ষান্তরে, যাঁরা এটি শোনেন না (অশৃণ্বতাং), তাঁদের পক্ষে এই দিবা (নাদশ্রুতিরূপ) হইল রাত্রি (নক্তং)। আবার, যে স্থূলশব্দপ্রপঞ্চ সম্পর্কে নাদশ্রুতিমানেরা 'নিদ্রিত', তাঁদের সম্পর্কে অশ্রুতিমানেরা (অসংযমীরা) জাগ্রত। এমন কি, যে অবস্থায় (মূর্চ্ছা, সুষুপ্তি ইত্যাদিতে, অথবা, বাহিরে নিস্তরঙ্গা বারিধিবক্ষে কিংবা বিজন গিরিকন্দরে) স্থূল শব্দরাজি স্তব্ধ, সেখানেও উক্ত অনাহত-ধ্বনি সম্পর্কে অ-শ্রুতিমানেরা নিদ্রিত; অথচ আপন শারীরযন্ত্রে কিংবা বহির্দেশে বায়ুসঞ্চলনজন্য যে মৃদু স্পন্দমান দোলায়মান শব্দ, সে শব্দ সম্পর্কে তাঁরা জাগ্রত। পূর্ব শ্লোকে নাদের বিন্দুতে বিলয়রূপ যে (তারচক্রের) মেরু, সেখানে জপকারীকে 'শয়ন' করিতে বলা হইয়াছে (শয়ীথাঃ); এ শয়ন কিন্তু নাদবিস্মৃতি বা বিচ্যুতি নয়। উত্থিত নাদ সূক্ষ্ম হইয়া বিন্দু অথবা 'বিন্দুধারা'য় (অণুঃ পন্থাঃ') চলিতে থাকে; আপন আয়াস পরিহার-পূর্বক তাতেই বিশ্রান্তি (অণুর অণুবৃত্তি) হইল শয়ন। জড়নিদ্রা নয়, জপনিদ্রা। এক ক্ষণ বাদেই আবার উত্থান। এই এক মুহূর্তই এক অপূর্ব আনন্দসঞ্জীবন মুহূর্ত। অশ্রুতিমান জাপক এই মুহূর্তটিতেও শয়নে অপারগ হন, কেননা, তখন জপের স্থূল আবৃত্তির অন্তে ঐ 'অণু অণুবৃত্তি' (অনুব্যাহরণ) তাঁর নিকট ব্যক্ত হয় না; তিনি যদি ঐ মেরুতে আসিয়া থাকেন, তবে (সেই বিলয়েও) তিনি জপের ভঙ্গাই হইল বোধ করেন, এবং অবান্তর বাহ্যধ্বনিই শোনেন। কাজেই, ঐ বিলয়-ভূমিতেও অবান্তর বাহ্য এবং স্থূল শব্দ সম্বন্ধে তাঁর জাগরণই চলে (জাগ্রতি বিলয়েঽপি তে)। অ-শ্রুতিমান্ অথচ শুশ্রূষু জাপক অবান্তর বাহ্য শব্দে বিক্ষিপ্ত হন না বটে, কিন্তু আপন আয়াসকৃত স্থূল জপের যেটা স্থূল (gross) সম্বেগ (momentum) তাতেই 'গড়াইয়া যান'—স্ফুটজপধ্বনির (এমন কি

মানসেও) যেন 'প্রতিধ্বনি' (echoing) শোনেন। এটা মধ্যম কল্প। এটা কিন্তু same level continuity. এই echoes গুলি সমাহৃত এবং সংহত হইয়া requisite resonance effect তৈয়ারি করে (যদি অবশ্য 'যন্ত্রে' damping and scattering moments গুলো ঠিকমত control এবং reduce করিতে পারা যায়)। উক্ত requisite resonance effectটির integration-এর অবশ্য 'অবম' এবং 'চরম' এই দুই সীমা আছে। 'অবম' সীমায় ('অউম') requisite resonance effect কি করে? মূলাধারে এবং দ্বিদলে একটা 'চকিত' স্পন্দন সৃষ্টি করে (mental reactionsও থাকে)। 'চরমে' (critical effect রূপে) কি করে? সুষুম্না এবং পূর্বোক্ত 'অণুঃ পন্থাঃ'র উদ্বোধন। সাধককে আঁকের খাতায় নয়, প্রাণের অবস্থিতি-পরিস্থিতিতে ঐ integrationটি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যেমনটি করিতে হইতেছে। ভুলচুকের 'ক্ষমা' অবশ্য নাই; কিন্তু ভুলচুক না হইবার, এবং হইলে সারিয়া লইবার, এক পরম উপায়ও রহিয়াছে জানিও—যিনি সব কিছুরই মূলে, তাঁতে প্রপত্তি এবং তাঁর সর্বসমস্যা-সমাধান-সাধিষ্ঠা কৃপা। গুরুগহন গণনার ঘটা দেখিয়া ভড়কাইও না। তোমার নিষ্ঠা আর তাঁর কৃপায় সব 'জল' হইয়া যাইবে ঠিক সময়ে।

জপ, পুরশ্চরণাদি সংখ্যা রাখিয়া করার বিধি। এই সংখ্যা পূর্বোক্ত requisite resonance effect (অবম, মধ্যম, চরম) নির্মাণের দ্বারা জপের 'সামর্থ্য-মান' (efficiency index) যে কিভাবে বর্দ্ধিত করে, এবং অবস্থাবিশেষে খর্ব এবং ব্যাহতও করে, সেটি বিশেষভাবে আলোচনীয়। বর্তমান কারিকায় চুম্বকে কথাটা বলা হইতেছে। সজীব, নির্জীব, অণু কি মহান্—যা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই মূলে সংখ্যা—number. যেমন এটম, প্রাণীর জীবাণু (germ-cell), সৌরজগৎ ইত্যাদি। সংখ্যা অবলম্বনেই সবকিছুর স্থিতি ও গতি ও পরিণতি। বিশ্বধারায় বস্তু (mass), শক্তি (energy), ইত্যাদি সব কিছুই চেহারা বদলাইতেছে, এটা সেটা হইতেছে, একেবারে নূতন 'পয়দা' অথবা একেবারে 'লোপাট' হইতেছে কিনা খাঁটি করিয়া বলা যায় না। কিন্তু, সংখ্যা-সংখ্যান-সাংখ্য ঠিক আছে। এটি অন্ততঃ 'ধ্রুব' না ধরিলে—বিশ্ব এবং বুদ্ধির পক্ষে 'মহারাত্রি'। দার্শনিক ক্যাণ্ট থেকে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত বিশ্বের এবং বোধের এই ধ্রুব 'গাণিতিক আধার'-টাকে না মানিয়া পারেন নাই।

সংখ্যাকে শুধু 'বর্ত্ততে' (static) ভাবে না লইয়া 'পরিণমতে' (as function, dynamic) রূপে লইলে, সংখ্যাসমূহের পরস্পর জন্য-জনকাদি সম্বন্ধ (multilateral evolution relationship, যেমনধারা প্রাণিসমূহের) সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। এর ফলে বিচিত্র রকমের সমীকরণাদি, নানা রকমের রেখাদির উদ্ভব হয়। এর নাম দাও 'সংখ্যান'। এ সংখ্যান—বৈচিত্র্যের মূলে যে মৌলিকতত্ত্বের 'কাঠামো' (Theory), তাকে বলে 'সাংখ্য'। পরিশেষে যদি একই অভিন্ন মূল (Basic Principle—'ঋতং বৃহৎ') থেকে এই অশেষ বৈচিত্র্যময়, অথচ মহা-সমঞ্জস (the Grand Synthesizer বা Unifier) সংখ্যা-বিজ্ঞান বা সংখ্যাটির অভিব্যক্তি দেখিতে পাও—যে মূলটিকে জানিলে এ মহামহীরুহের সবই জানা গেল—তবে হইল প্রসংখ্যান। সত্যই সংখ্যাবিজ্ঞানের মত, যেটি 'ব্যস্ত' (differentiated) তার সমস্তীকরণে (reconciliation and unificationএ) পটীয়ান্ আর কিছুই নাই। অতএব 'ব্যস্ত' তুমি যদি হইতে চাও 'সমস্ত', তবে সংখ্যাকে আশ্রয় কর। কারিকায় বলা হইল— 'সংখ্যামূলং হি যৎকিঞ্চিৎ'। আবার স্পন্দ (যথা wave pattern)-কে বলা হইল 'সংখ্যানমূলকঃ"। যেমন মৌলিক ঊর্মির মূলে ডিব্রগলি, শ্রডিন্‌জার ইকোয়েশন ইত্যাদি। কি ধ্বনি শুনিব, কি বর্ণ দেখিব—নির্ভর করে কতকগুলি মূল সংখ্যানের উপর—নিজের যন্ত্রগত এবং বহিরাগত। সাংখ্য হয় প্রসংখ্যান—সব কিছু 'সমঞ্জস' করিয়া দেয় বটে, কিন্তু প্রথম দুটিতে যেমন আমার মিত্রও আছে, তেমনি আবার আমার বৈরীও আছে। কোনও ধ্বনিবিশেষ, গন্ধবিশেষ, বর্ণবিশেষ, অথবা কোনও মনোভাববিশেষ লইয়া এটি পরীক্ষা কর। এক কথায়, যে সংখ্যায় থাকিলে অথবা চলিলে 'বন্ধন' চালু থাকে, তাকে বলে সংখ্যাবৈর, আর সংখ্যামৈত্র হইল বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ। সংখ্যাবৈর কাটাইতে হইবে—অর্থাৎ, যে সংখ্যা ও সংখ্যান লইয়া তোমার নিজ 'যন্ত্রে' আর তার পরিবেশে (environment-এ) বর্তমান বন্ধন সংস্কারগুলি নিজেদিগকে বাহাল রাখিয়াছে, সেই সংখ্যা-সংখ্যান বদলাইতে হইবে। সংখ্যামৈত্রটি পাইতে হইবে—সেই নিমিত্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া জপ।

কিন্তু জাপক! সাবধান! 'খুসি খেয়াল মত' সংখ্যার কর্ম নয়। তাতে মিত্রেরও বৈরী হইবার আশঙ্কা আছে। কেননা, পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠা—এই চারিটির প্রসাদ

লাভ করতঃ তবে তোমার সংখ্যাটিকে তোমার মিত্র করিতে হইবে। এ চারের সমাচার আগে লইয়াছি। তবে সংক্ষেপে চারিটি প্রশ্ন :—(১) জপ কি বৈখরী বাচিক হইতেছে না, অন্য কোনও ভাবে? (২) কি মাত্রায়—মৃদু, বিলম্বিত, না, 'উগ্র', দ্রুত, না, অন্য কোনও মাত্রায়? (নাড়ীর গতি পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা কর)। (৩) কোন্ 'মুখে' (phaseএ) জপ হইতেছে—অন্তর্মুখ না বহির্মুখ, ইত্যাদি? (৪) কতদূর অবধি জপ আপন আকৃতি ও গতি ঠিক একরকম রাখিয়া চলিতেছে? যেমন, গোড়াতে হয়ত বা জড় বা চপল ভাব, তারপর, সাবলীল, প্রাণারাম ভাব, আবার চঞ্চলতা ইত্যাদি। এই চারিটির ঠিক 'সৌষ্ঠব' (co-ordination) হইলে, তবে না সংখ্যামৈত্রম্! বহু সাধনায় এ সংখ্যামৈত্রম্‌টিকে মিলাইতে হয়। সঙ্গীতসাধককে কি করিতে হয়? হোমিওপ্যাথি ওষুধে তো এক ফোঁটাতেই 'মিরাকেল' দেখায়—কিন্তু ঠিক সংখ্যাটি মেলান চাই—রোগের পিছনে যে নিরাময়ী সংখ্যাটি রোগের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, তার সঙ্গে ভেষজের সংখ্যার ঠিক মৈত্রীটি (alliance) কার্যতঃ স্থাপিত না হইলে, ঐ অঘটনটি ঘটিবে না। এও অবশ্য Wave Mechanics আরও গভীরে (deeper levelএ) লইয়া যাওয়া। Correct wave-length and frequency বাছিয়া মিলাইতে হইবে। একটা এটম বা জৈবকোষের মত প্রতিটি পদার্থের (কাজেই জীবেরও) আপন আপন (বীজ এবং ক্ষেত্র) বৈশিষ্ট্য নিয়ামক একটা 'সংখ্যা' (ফরমূলা) আছে। পূর্ব পূর্ব জন্মলব্ধ 'প্রারব্ধ' (resultant momentum), বর্তমান জন্মে বীজ এবং ক্ষেত্র এবং রাশিচক্রাদি প্রাকৃতিক সংস্থা (Configuration of the Enveloping Order) এই চারিটির সন্নিপাতে উক্ত সংখ্যাটি নিরূপিত হয়। এই চারিটি ব্যতীত 'দৈব' বলিয়া আরও এক বিশেষ নিয়ামক আছে। এ সবের আলোচনা যথাস্থানে হইবে। দীক্ষার সময় শিষ্যের ঐ নিজস্ব সংখ্যাটি ধরিতে হয়। এবং সেটি ধরিয়াই অরিমিত্রাদি মন্ত্র জপসংখ্যাদির বিচার। নিষ্ঠাবান্ জাপক নিজেও বুঝিতে পারেন—কোথায় বৈর, কোথায় মৈত্র।

অতএব, পরের কারিকাটিতে বলা হইতেছে যে, জপকে সৌষ্ঠবের এবং কৌশলের সহিত সংখ্যা, সংখ্যান—এই দুই সম্ভাব্য বৈরস্থান (possible danger zones) পার করাইয়া নেও। গুরুনির্দিষ্ট প্রণালীতেই এই ফাঁড়া কাটাইতে হইবে। মিত্র সংখ্যা জপের দ্বারাই। তারপর, সাংখ্য জপ। এখানেও ভয় কাটে নাই,

মুক্ত নও, তবে মুমুচান। শেষে, মন্ত্র চতুর্থভূমিতে আরূঢ় হইলে (অর্থাৎ তুর্যগ হইলে) হয় বজ্র। সেই বজ্র সংখ্যাশঙ্কাদ্রিপাটনম্। যতক্ষণ সংখ্যা—গণাগাথা —ততক্ষণ শঙ্কা। জপ্য মন্ত্র তুর্যগ হইলে এ শঙ্কা আর থাকে না। সংখ্যার যেটি সংখ্যান তার অভাবনীয় সামর্থ্য (efficiency) নির্ভর করে এই তিনটির উপর:—(১) সেটি সৌষ্ঠবের সহিত (harmonically) চলিবে; (২) সেটির পূরণ-প্রতিপূরণাদি হইতে থাকিবে (compound acceleration); (৩) সেটি কোনও নির্দিষ্ট কাষ্ঠা (limit) পর্যন্ত যাইবে—সেখানে সেটি হইবে তার আপন 'চরম মান' (critical efficiency)। জপের একটি মৃদু স্পন্দনও এইভাবে চরমমান লাভ করতঃ বজ্রশক্তি হইয়া থাকে, তখন সে পর্বতপাটনেও সমর্থ। অতএব মন্ত্রশক্তির উদ্ধারে সৌষ্ঠব, সমুচ্চয় এবং কাষ্ঠাক্রান্তি (reaching the point of critical efficiency)—এই তিন সর্ত তোমায় মানিয়া চলিতেই হইবে। তুমি আপন ভাবের ঘরে চুরি করিও না, আর আপন চেষ্টায় কার্পণ্য করিও না; বাকিটা তোমার উপর বা পেছন থেকে পূরণ হইয়া যাইবে। চরমমান বা কাষ্ঠাক্রান্তি না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধিসফলতার 'মুখং অপিহিতম্'; কিছুই হয়ত বোঝা যাইতেছে না। বহিঃপ্রকৃতিতেও দেখি তাই। একটা লোহার তারে ভার ঝুলাইতেছ। ভার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে না আসা পর্যন্ত তারটা ছিঁড়িয়া পড়ে না। জল বরফ হওয়া ইত্যাদি দৃষ্টান্তও স্মরণ কর।

বৈখরীতে সংখ্যাজপ, মধ্যমার সংখ্যান, পশ্যন্তীতে সাংখ্য, আর পরায় প্রসংখ্যান। প্রণবজপে যতক্ষণ 'অউম' এর আবৃত্তি, ততক্ষণ সংখ্যা; নাদের স্ফুরণে সংখ্যান; নাদ বিন্দু কলা এই ত্রিপাদবিতানে সাংখ্য, এবং এই বিতান বা বিস্তারের প্রান্তভূমিতে প্রসংখ্যান। কলাতীতে সংখ্যা আর নাই—সংখ্যাতীত।

এইবার, 'অপাম সোমমমৃতা অভূম' ইত্যাদি বেদমন্ত্রটিতে যেটি 'সোম' সেটিকে এইভাবে ভাবনা কর। নিখিল বাকের যেটি 'মন্থ', কিনা মন্থনোদ্ভূত সার, অথবা নিখিল বাক্ মন্থনকারী যে মূলাবাক্ (অর্থাৎ নাদ), সেই মন্থের (ওঙ্কারের) যাগ আমরা করিয়াছি। যাগে 'সোম' ('স ওম্'—এই অনাহত নাদ) আমরা পান করিয়াছি (অপাম)। নাদাভ্যন্তরে যে দিব্য জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিতেও আমরা গমন করিয়াছি (অগমাম)। সেই দিব্য জ্যোতিতে যাঁরা ভাস্বান্ (ভামতঃ) তাঁহাদিগকেও (শ্রীগুরু,

ইষ্টদেবতা ইত্যাদি দৈবী শক্তিকেও) আমরা জানিয়াছি (অবিদাম)। সুতরাং, সোমকর্তৃক রক্ষিত (সোমরাতান্) আমাদিগকে অরাতি কোথায়, কিরূপে ছেদন করিয়াছে বল (অকৃন্তৎ)? আর জ্যোতিষ্মন্ত (বিভাতঃ) আমাদের 'অন্ধা মর্ত্ত্যস্য ধূর্ত্তিঃ'ই বা কি করিতে পারিয়াছে বল? সোম 'রাতি' (রক্ষা) কে অরাতির কবল হইতে মুক্ত করিয়াছে, আর জ্যোতিঃ সেই 'তমসঃ পরস্তাৎ' আমাদের লইয়া গিয়াছে, যে তমসার কুক্ষিতেই মর্ত্ত্যের ধূর্ত্তির যত কিছু জারিজুরি। মন্থনে 'ওম্' হইলেন 'সোম'। এই অপূর্ব মন্থনে প্রণবের অকার হইলেন আধার (কূর্ম); মকার মন্থনদণ্ড; উকার মন্থনরজ্জু; এবং নাদবিন্দু (নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে নাদ) হইলেন মন্থনকারী দুটি বাহু। স্বয়ং কলাশক্তি হইলেন সকার। ফল—অমৃত—সোম। গায়ত্রী, ত্র্যম্বক, মধুমতী—এই তিনটি ঋক্ দোহনে 'অউম', হংসবতী দোহনে 'স', আর 'জাতবেদসে', দোহনে সম্পূর্ণ 'সোম'।

এই 'জাতবেদসে' সোমসবনের কথা শেষের কারিকাটিতে বলা হইতেছে। 'রাতি' এবং 'অরাতি'র দ্বন্দ্ব তো রহিয়াছেই। যেমন, অগ্নি অরাতি (লোকক্ষয়কৃৎ) রূপে বিশ্বভুবন নিরন্তর পচন ও দহন করিতেছেন; আর সোম 'রাতি'রূপে ক্ষয় পোষণ করিয়া যাইতেছেন (যথা, আমাদের শরীরে metabolism)। কিন্তু এ বিশ্বদ্বন্দ্বে অরাতিকেই প্রবল দেখিতেছি। অরাতি প্রবল হয় 'এনস্' (ভাঙ্গানের স্পন্দনের আকৃতি) আকারে। এই এনসের ফলে হয় 'দুরিত' (mal-movement) এবং দুর্গ (mal-alignment)। এ দ্বিবিধ 'এনঃ' থেকে ('নাবেব সিন্ধুং') উত্তরণের নিমিত্ত কি করিব? 'জাতবেদসে সুনবাম সোমম্'। যেটি জাত (যথা, ঐ রাতি অরাতির দ্বন্দ্ব) তাকে যিনি জানেন 'বেদ' (জানেন কাজেই সেটি পার করার উপায় করেন), সেই 'জাতবেদসে' সবন করি (সুনবাম)। কিসের সবন? পূর্বোক্ত মন্থনোদ্ভূত 'স ওম্'। অর্থাৎ, 'স-ওম' এই পরমাশ্চর্য সাক্ষাৎ অমৃতধ্বনি। এনস্ থেকে পরিত্রাণ 'বেদস্' ব্যতীত হইবে না জানিও। সবন করিবে কিসের দ্বারা? 'আন্তরস্রুবা'—আমার আন্তর স্রুবের দ্বারা, পক্ষান্তরে বলা হইল—'সুষুম্নয়া'—সুষুম্নায়। 'সুষুম্না' ছাড়া 'সোম' সবন করিতে কে সমর্থ? আন্তর কথাটা ভাবভক্তির দিক্ দিয়া লইও।

কৃপালববৈভবপঞ্চকম্

(বঙ্গাপদ্যানুবাদ সহ)

সর্ব্বরূপাৎ পরা সা চিৎ কৃপয়া কমলায়তে।
সর্ব্বগন্ধাৎ পরং তৎসৎ কৃপয়া সৌরভায়তে॥ ১
কৃপয়ৈকরসো ভূমা মকরন্দরসায়তে।
(অখণ্ডৈকরসো ভূমা কৃপয়াব্জরসায়তে)
কামকৃমিকুলাগারং হৃদচ্ছোদবরায়তে॥ ২
(হৃদয়ং পঙ্কিলং পঙ্কজায় সরোবরায়তে)
হেয়ং হিত্বা কষায়ঞ্চ মনোঽপি মধুপায়তে।
(কীটঃ ক্লেদকষায়েষু মনো মে মধুপায়তে)
যোঽব্জেশয়স্য ভৃঙ্গাস্য স মৃত্যুরমৃতায়তে॥ ৩
অতীবাসম্ভবস্যাপি সুসম্ভবঃ কৃপালবাৎ॥ ৪
নমোঽদ্ভুতকৃপাসিন্ধু-মন্থপাদনখেন্দবে।
তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যায় স্বকৃপাম্ভোজভানবে॥ ৫
সর্বরূপাতীত শুদ্ধ চিদেক স্বরূপ।
কৃপায় ফুটিল ধরি কমলের রূপ॥
সর্বগন্ধাতীত শুদ্ধ সৎ নির্বিশেষ।
কৃপায় হইল তায় সৌরভ অশেষ॥
ভূমা একরস শুদ্ধ অখণ্ড আনন্দ।
কৃপায় নিবিড় হ'ল পদ্ম-মকরন্দ॥
কামকৃমি-কুলাগার হৃদয় আমার।
কৃপায় অচ্ছোদসরঃ পদ্ম ফুটিবার॥
কলুষ-কষায়-রসে মত্ত নিরন্তর।
কৃপায় হইল চিত্ত পদ্ম-মধুকর॥
নিশায় মুদিত অব্জে ভৃঙ্গের মরণ।
সে মরণ মোর হ'লো অমৃত পরম॥
একান্তই অসম্ভব করে সুসম্ভব।
মহাশ্চর্য অহেতুক কৃপালেশ তব॥

এহেন অদ্ভুত কৃপার সায়রে, সে নিধি আপন মথনে।
উদিল নয়নে রাকা-শশীসম, জুড়াতে অমিয় সিনানে॥
নিষ্কলঙ্ক নব চির পূর্ণকলা, পদ নখ দশ ইন্দু।
কণায় কণায় ক্ষরিবার ছলে, মিলাল সুধার সিন্ধু॥
এহেন কৃপা-অমৃত-ঘন, মূরতিরে নমি বারম্বার।
আপনার দেয়া ধেয়ান কমল, চির ভানু যেবা ফুটিবার॥
"তুমি সেই" আদি শুদ্ধবাক্য অবাঙ্‌মনসগোচর যারে।
দিল সর্বদ্বন্দ্ব নামরূপগুণ, ভাবের ভাবনা পারে॥
নিজবোধরূপ যে পরতত্ত্ব, নিজকৃপা পরা শকতি।
নিজকৃপামল-কমল-রাজিত, মন্নাথ, লহ প্রণতি॥
মোর পরাণ-লুটানো প্রণতি॥

নিত্যস্নানতীর্থপঞ্চকম্

ব্যোমস্নানং ভবতু ভুবনে মূলবাণীবিতানে
বাতস্নানং বহুলবিপুলানন্দহিল্লোলদোলে।
তেজঃস্নানং কনককিরণাধারবর্ণালিচিত্রে
ক্ষিত্যাং গন্ধেঽমৃতমুচি মৃতের্ভেষজে চামৃতেঽপ্সু॥ ১
ভুবনবীণার মূলতারেতে শাশ্বত।
যে আদিম প্রাণবাণী[১] হয় বিস্ফারিত॥
সুরে ছন্দে লয়ে বিশ্বে অপূর্ব বিতান।
স্বচ্ছন্দস্থিতির তরে তায় ব্যোমস্নান॥
নিজ বীণাটিরে বাঁধ সে মহাঝঙ্কারে।
সুর ছন্দ নিত্য বাঁধা রবে তার তারে॥
(সুর ছন্দ সাধা হবে, সহজ সে তারে॥)

---

[১] নাদস্বর, প্রণব

‘মধু দ্যৌরস্তুনঃ পিতা’ অন্তরীক্ষ স্রুবে।
অন্তহীন যাগরত ‘সোম’[2] অভিষবে॥
শুয়ে বিশ্ব চিতানলে নিখিল দহনে।
রক্ষা পাও তাহা হ’তে স্নানে সোমস্বনে[3]॥
যদ্যপি ‘জাতবেদসে সুনবাম সোম’।
যাগেরসমিধ্ হবে অমৃত পরম॥

— o —

‘এষ আকাশ আনন্দ’ শ্রুতি অনুভবে।
সে আনন্দ সমাধির জাগরণ যবে॥
সমাহিত মৌনভঙ্গো প্রশান্ত কল্লোল।
শান্ত আনন্দের মাঝে আনন্দ হিল্লোল॥
অস্পর্শ অমেয় হ’লো মাত্রাস্পর্শরূপ।
‘মধুবাতা ঋতায়তে’ মন্ত্রের স্বরূপ॥
‘মধুবাতা’ পরশের মধু শিহরণ।
অণুমহানেতে মধু দোল বিকিরণ॥
প্রতিটি রেণুতে ‘মধুদোল’ মধুছন্দ।
সে ‘মধুচ্ছন্দা’ স্নানে কেন গো বিরত?॥
অনৃতের, ‘অরাতির’ ফেলি আবরণ।
মধুদোল মাধুরীতে কর বাতস্নান॥

— o —

বিশ্ববর্ণালির ছবি আপন আধারে।
যে কুহকী ফুটাইল টুটিয়া আঁধারে॥

২। ‘সোম’ = ‘স্ওম্’

৩। নাদে

যে হিরণ্যরেতসেরে কয় বেদবাণী।
মূর্ততেজ সবিতার স্বরূপ লাবণী[৪]॥
ঊষা সন্ধ্যা 'অপাবৃত' হিরণ্যকিরণে।
স্নিগ্ধ হও রজতপ্ত! সদ্য ভর্গস্নানে॥
'মধু মাঁ অস্তু নঃ সূর্য্যঃ' 'ভর্গো বরেণ্যম্'।
মধুমতী গায়ত্রীর সম্পুট পরম॥
এ মিলনে মনপ্রাণ দেহটি মিলাও।
ঝরা শুষ্কতায় নব মঞ্জরী ফুটাও॥
'আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং'[৫] মন্ত্র শিরোমণি।
'জ্যোতিষি পরমাত্মনি' আপেরে 'জুহোমি'॥
'ঈশানা বার্য্যাণাং আপো' বেদমন্ত্রে শুনি।
নিখিল ভেষজগর্ভা অমৃতবাহিনী॥
বরেণ্যের ঈশানী[৬] মা 'রসশিবতম'।
স্তন্যরসে দিতে যাঁর আকুতি পরম[৭]॥
তাঁরি স্নেহঢালা সর্বদেবী[৮] শুচিতায়।
বহিরন্তঃ শুচিতরে সঁপো আপনায়॥
'মাতর্গঙ্গে' আবাহনে তাঁয় আপস্নান।
'মহেরণায় চক্ষসে' ধ্রুব কর জ্ঞান॥
'আততম্ চক্ষুঃ', হেরে যে পদ পরম[৯]।
'আত্মবিদ্যাশিব' তত্ত্বে[১০] যেথা আচমন॥

৪। Basic Radiation as Colour Pattern—

৫। গায়ত্রী শিরঃ

৬। কর্ত্রী

৭। 'উষতীরিব মাতরঃ'

৮। 'সর্ব্বদেবময়ী'

৯। বৈদিক আচমন— 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং'

১০। তান্ত্রিক আচমন

'মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' মধুমতী ঋকে।
বিন্দু মধুরিমসিন্ধু মিলয়ে স্নাতকে॥
বিশ্ব তর্পণের তৃপ্তি যাঁর তুষ্টিরূপে[১১]।
বিরজা বিশোক স্নান যাঁহার স্বরূপে॥
ভুক্তি-মুক্তি পুষ্টি-তুষ্টি গলিত করুণা।
করুণাবরুনালয়া[১২] মায়ের ভজনা॥

— o —

[যেটি বিভিন্ন media, বিভিন্ন 'visual camera' ইত্যাদিতে বিভিন্নবর্ণে প্রতিভাত হয়। জগৎসবিতার 'আদিত্য'রূপ যে প্রকাশ, তাঁর যেমন 'স্বাভাবিক শব্দ' আকৃতি (Basic sound pattern) আছে, তেমনি তাঁর 'স্বাভাবিক বর্ণ' আকৃতিও আছে; সেইটি আদিত্যের Colour Prototype—Platoর ভাষায় Colour 'Idea'. এইটিকে শ্রুতি এবং অনুভব দুইই 'হিরণ্য' 'হিরণ্ময়' 'রুক্ম' ইত্যাদি রহস্যভাষায় বলিয়াছেন। উষা এবং সন্ধ্যা—এই দুই সন্ধিতে ঐ হিরণ্যরেতসের আভাস পাওয়া যায়। বর্ণালির (spectrum) অধঃ (infra) এবং ঊর্দ্ধ (ultra) গ্রামসমূহ কি বৃত্তাকারে ঘুরিয়া এই হিরণ্যে মিলিয়াছে?]

উর্বারুক ফল যথা ছাড়ে নিজ ত্বক্।
তেমনি অমৃত ছাড়ে মৃত্যুর নির্মোক॥
যার বরে, সে 'সুগন্ধি', সে 'পুষ্টি বর্দ্ধন'।
সেই 'রাতি' ভদ্রগঙ্গো কর ক্ষিতি স্নান॥
'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ' পৃথ্বী ভদ্রগঙ্গা।
তৃণে, পুষ্পে, মৃত্তিকায় গন্ধ মধুমন্দা॥
গন্ধে উষা উল্লাসিত নক্ত বিলসিত।
গো, ওষধি, বনস্পতি গন্ধে সুবাসিত॥

---

[১১] 'অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ, আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে।'

[১২] মহাসিন্ধু

চিতাগন্ধা[১৩] নাসাপুটে মৃত্যু অবিরাম।
সে নাসারে দেও চিরভদ্রার আঘ্রাণ॥
যে পৃথ্বী অদিতিরূপা—‘হংসঃ শুচিষৎ’[১৪]।
ভূমিষ্ঠ যাঁহার গর্ভে[১৫] হন ‘ঋতং বৃহৎ’[১৬]॥
সে যে ‘মা-টি’ মাটি নয়, পরম কল্যাণী।
সে মৃণ্ময়ী মাতৃতীর্থ, সর্বার্থের খনি।
ধন্য ধরি বুকে তীর্থ-রজ-স্পর্শমণি॥

জপে বিনিয়োগঃ

আসনাদ্যৈর্জ্জপে সাঙ্গোঽভ্যাসাদ্যৈঃ কেবলে জপে।
বৈখর্য্যাদ্যৈর্জ্জপে খ্যাত্যৈ লসিতাদ্যৈর্জ্জপে রসে॥
বাচিকাদ্যৈঃ ক্রিয়াক্রান্ত্যৈ কৌর্ম্মাদিভিশ্চ সাহসে।
মূলাদ্যৈরধ্বনঃ ক্রান্ত্যৈ ক্ষিত্যাদি-স্নানপঞ্চকম্॥

পাঁচটি (মধুমতী, গায়ত্রী, হংসবতী, ত্র্যম্বক এবং ‘জাতবেদসে’) পরমা ঋকের, বিশেষভাবে মধুমতীর সারসন্দোহরূপ যে ব্যোমাদি পাঁচ স্নানের প্রসঙ্গ হইল, সেগুলি জপানুষ্ঠানে এইভাবে বুঝিয়া লইও:—সাঙ্গ কিনা অঙ্গ সহিত জপে আসন ও ন্যাস—এই দুই-এর দ্বারা ক্ষিতিস্নান করিবে; অর্থাৎ এ দুইটি ক্ষিতিস্নানের অনুকল্প। আচমন, আবাহন, আপ্যায়নাদি মন্ত্রব্যাহরণ ও ভাবনা দ্বারা অপ্‌স্নান করিবে। গুরুধ্যান ও ভূতশুদ্ধি—এ দুয়ের দ্বারা বিশেষভাবে তেজঃস্নান করিবে। প্রাণায়ামে সুষুম্না ও কুণ্ডলীর উদ্বোধনপূর্বক বাতস্নান। নাদবিন্দুসমাশ্রয়ে সমাহিত জপধ্যানে ব্যোমস্নান

---

[১৩] ‘Cosmic combustion,’ Entropy

[১৪] আদিত্য বা প্রাণ as pure Idea or Archetype (undifferentiated)।

[১৫] পৃথ্বীতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণের বিচিত্র বহুধা অভিব্যক্তি (বিশেষতঃ মনুষ্যসৃষ্টিতে) আপনাকে যেন পরিতৃপ্ত করিতেছে।

[১৬] প্রাণ বা আদিত্য as Basic Cosmic Energy, infinitely differentiating to a Cosmic Basic ছন্দঃ and Pattern।

করিবে, অর্থাৎ তখন তোমার জপ ও ধ্যান নাদে এবং নাদের সূক্ষ্মরূপ বিন্দুর ধ্যানেই একান্তভাবে মিলাইয়া গিয়াছে। যেমন, প্রণবজপে অর্দ্ধমাত্রার সেতু পার হইলে হয়। পরম অব্যক্তের ঠিক পূর্বভাব। বিবিধ ফলন রহিত কলাশক্তি সামান্যে স্থিতি। তারপর কলাতীত।

কেবল জপে ক্রমটি এইরূপঃ—প্রথম, আয়াস সহকৃত অভ্যাস বা আবৃত্তি (ক্ষিতিস্নান); দ্বিতীয়, অনায়াস, 'সুগম' জপ (অপ্‌স্নান), তৃতীয়, মন্ত্রাক্ষর শক্তির স্ফুরণে বীর্য বা তৈজস জপ (তেজঃস্নান); চতুর্থ, জপশক্তির ব্যষ্টিরূপতা পরিহার পূর্বক সূক্ষ্ম অথচ মহতী ব্যাপ্তিরূপতার আবির্ভাবে (বাতস্নান)—ব্যাপ্তিজপ; আর পরিশেষে আধার আনন্দ ও জ্যোতীরূপ যে আকাশ, সে আকাশে প্রথম স্পন্দরূপ যে মূলজপ, সেই মূলজপে (কলাশক্তিতে— yet undifferentiated—though "eager to become"—Power Continuum—অনন্ত শক্তিমাতৃকা) স্থিতিরূপ জপ (ব্যোমস্নান)। এ শেষ তিনটি স্নানে বীততমাঃ, ধূতরজাঃ, এবং বীতরজাঃ হইবে। তারপর বৈখরী, মধ্যমা, পূর্বপশ্যন্তী, পরপশ্যন্তী এবং পরা—এই পঞ্চভূমিক জপদ্বারা জপখ্যাতি (জপমহিমার প্রকাশ) হইয়া থাকে। এগুলিতে যথাক্রমে ক্ষিত্যাদিস্নান জানিও। আর লসিত, উল্লসিত, সমুল্লসিত, বিলসিত ও স্বলসিত—জপ—রসানুভূতির এই ভূমিপঞ্চকে ক্ষিত্যাদিস্নানপঞ্চক ভাবনা করিও।

এইরূপ বাচিক, উপাংশু, মানস, তনুমানস, অণুমানস বা মহামানস এবং অতিমানস—এই পাঁচটি ক্রান্তি (ক্রিয়া) জপে পূর্বোক্ত স্নানপঞ্চক ভাবনা করিও। জপসাহসে বা জপশক্তির প্রকাশে, কূর্ম, মীন, বরাহ, নৃসিংহ এবং উরুক্রম—এই পঞ্চশক্তিকে যথাক্রমে ধ্যান করিও। ক্ষিতি হইতে ব্যোম পর্যন্ত পাঁচটিস্নানে ঐ পঞ্চব্যূহশক্তির অনুগ্রহ জানিও।

শেষকালে, মূলাধার থেকে বিশুদ্ধ পর্যন্ত পাঁচটি চক্রের উন্মেষে যে শঙ্খাবৃত্ত 'অধ্বক্রান্তি' (Objective Mystic Ascent), এবং ঐ অধ্বক্রান্তির সহগ যে জপ, তার দ্বারাও পরপর উক্ত পঞ্চস্নান নির্বাহ হইয়া থাকে বুঝিও। অর্থাৎ যখন যে 'কেন্দ্রে' যে ভাবে জপ চলিতেছে, তখন সেই কেন্দ্রক্রিয় তত্ত্বে স্নান হইতেছে বুঝিও। 'মূল' বলিতে মূলমন্ত্র ধরিলে—সেটির (নাদবিন্দুসমাশ্রিত) ব্যাহরণ হইল

ব্যোমস্নান; অন্তর্ভাবনা (মন্ত্রশক্তি এবং মন্ত্রচৈতন্যকে সর্বব্যাপী প্রাণরূপ ভাবনা) হইল বাতস্নান; ইষ্টগায়ত্রী জপ হইল তেজঃস্নান; স্তব এবং ফল সমর্পণ হইল অপ্‌স্নান; আর জপরক্ষা, কবচাদি ক্ষিতিস্নান। এস্থলে ক্রমটি বিলোম ইহা লক্ষ্য করিও।

জপসূত্রম্

(প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ)

মহামায়া (সর্ব্বসূত্রযোনিঃ)

১। সতি তত্ত্বসত্ত্বে সর্ব্বাদিশক্তিমত্তা মহামায়া।।
সা ভগবত্তা পরব্রহ্মণি।।

পূর্বপাদে লক্ষিত ‘তত্ত্ব এবং সত্ত্ব’ স্বরূপে রহিয়া সর্বরূপা, সর্বেশী ইত্যাদি হইবার যে শক্তিমত্তা, সেটি মহামায়া॥ এটি পরব্রহ্মে ভগবত্তা॥

সূত্রে ঐ ‘আদি’ শব্দটি কারিকায় যথাসম্ভব বিস্পষ্ট হইবে। ‘আদি’= প্রভৃতি বটে, আবার আদি = আদ্যা অর্থাৎ সর্বের যাহা আদ্যাশক্তি, তাও বটে। ‘সর্ব্ব’ এর বিশ্লেষণ নানাভাবে পূর্বগ্রন্থে হইয়াছে, এবং উত্তর গ্রন্থে হইবে। সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি; পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠা; বাক্, অর্থ, প্রত্যয়; ক্রিয়া, কারক, ফল; ইত্যাদি। প্রথমপাদের চরমসূত্রের কারিকায় ‘ওঁ তৎসৎ’—এই ব্রহ্মবাচক মন্ত্রের ‘ব্রাহ্মীতনু’ এবং ‘শাক্তীতনু’র কথা বলা হইয়াছে। মহামায়াতে এই দুই ‘তনু’ই সম্মিলিত। তন্মধ্যে ‘মহা’ এই ভাগের দ্বারা বিশেষতঃ ব্রাহ্মীতনু, এবং ‘অমায়া’ (যার থেকে—যে স্বরূপতঃ অমেয়ের অনির্বাচ্য স্বরূপমেয়তা নিবন্ধন— ‘মায়া’) এই ভাগ দ্বারা বিশেষতঃ শাক্তীতনু উদ্দিষ্ট হইতেছে। প্রকারান্তরে ব্রহ্মে ভগবত্তা মহামায়া। বেদে দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত ইত্যাদিতে উপনিষদে, তন্ত্রে, স্মৃতিপুরাণাদিতে বহুধা কীর্তিতা, মন্দ্রিতা, এবং বন্দিতা এই মহামায়াকে কেবল ‘মহতী মায়া’ ভাবেই বুঝিও না। ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী ‘মা’। মহা=মহামহিমময়ী, মা+য়া=‘মায়া’ যিনি। ইহার মহিমার পারে কেহই যাইতে পারেন নাই (‘শক্রাদয়ঃ’ দেবগণের স্তুতি দেখ; দেবীসূক্ত বিশেষভাবে)। ‘মা’ নামটি যে একাক্ষর মহামন্ত্র (চলতি বাংলা মাতৃসম্বোধনমাত্র নয়), তা কারিকায় বলা হইয়াছে। অ, উ, ম, নাদবিন্দুকলা এবং কলাতীত—এ সাতটি সপ্তসিন্ধুর মত ঐ একে (‘মা’) মিলিয়াছে বুঝিবে।

এ মহামায়া সূত্রটিকে সর্বসূত্রযোনি বলা হইল। কেন, তা বুঝা যাইবে। বিকল্পসূত্রে মহামায়ার ভগবত্তা ('জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি) স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মহামায়া ব্রহ্মের বা ভগবানের আদ্যাশক্তি, কিন্তু স্বয়ং ভগবত্তা নহেন, এই শঙ্কা পরিহার করা হইয়াছে। কেবল শক্তিরূপে মহামায়াকে লইয়া শক্তিমানের সঙ্গে ভেদ অথবা ভেদাভেদ ইত্যাদি তর্কে অপ্রতিষ্ঠানভাক্ না হও, এই নিমিত্ত 'শক্তিমত্তা'ই সূত্রে বলা হইল। অতঃপর কারিকাবলীর অর্থানুধাবনে যত্ন কর।

ব্রহ্মণো ভিদ্যতে নৈব মূর্ত্তামূর্ত্তাৎ কথঞ্চন।
অবিশিষ্টাদ্ বিশিষ্টাদ্ বা নিষ্কলাৎ সকলাদপি।
নাপ্যধ্যস্তাদধিষ্ঠানাদাভাসাদ্ ভাসকান্ন চ॥ ১

নির্ব্যূঢ় সমগ্রত্ব (Absolute Wholeness) ইহাতে আছে বলিয়া, ইনি অমূর্ত ব্রহ্ম হইতে কোনও মতে ভিন্ন নহেন, মূর্ত ব্রহ্ম হইতেও ভিন্ন নহেন। নির্বিশেষ (অবিশিষ্টাদ্) হইতে ভিন্ন নহেন, সবিশেষ (বিশিষ্টাৎ) হইতেও নয়। 'নিষ্কল' হইতেও নয়, 'সকল' হইতেও নয়। যেটি 'অধ্যস্ত'রূপে বিচার কর সেটি হইতেও নয়, আবার যেটি 'অধিষ্ঠান' তাহা হইতেও নয়। পুনশ্চ, যাকে আভাস ভাবিতেছ, তাহা হইতে নয়, যেটি 'ভাসক' তাহা হইতেও নয়। এ এক পরমাশ্চর্য সর্বত্ব বা সমগ্রত্ব। 'কথঞ্চন' বলা হইতেছে এই নিমিত্ত যে, ভেদ, ভেদাভেদ কোনও প্রকার মননের ছাঁচেই (ফর্মূলাতেই) ইহাকে ফেলিতে পারিবে না। Alogical Absolute Whole Fact. 'যাঁতে সব এবং যিনিই সব।' 'যচ্চকিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাঽখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বম্' ইত্যাদি। শুধুই কি শক্তিকলা? (Aspect as Power?) তা তো নয়। তাই শক্তিমত্তা বলা হইল।

'মূর্ত্ত' বলিতে বিশেষ করিয়া আকৃতি (Form, Pattern); 'বিশিষ্ট' বলিতে গুণ; 'সকল' বলিতে শক্তি, লীলা, ছন্দঃ; 'অধ্যস্ত' বলিতে মূল সত্তার বিবর্ত, অথবা লক্ষণান্তরে পরিণাম; 'আভাস' বলিতে মূল প্রকাশের ভান ভাসাদিরূপ প্রকাশ-মানতা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম সম্পর্কে মহামায়াকে এইভাবে দেখাইয়া জীব এবং জগৎ সম্পর্কে সেটিকে দেখান হইতেছেঃ—

ন জীবাদ্ ভিদ্যতে কুত্র ব্যষ্টিতো বা সমষ্টিতঃ।
মুক্তাদ্‌বন্ধান্মুমুক্ষোর্ব্বা বিভুতশ্চাণুতোঽপিবা॥ ২
অব্যক্তাদপি চ ব্যক্তাজ্জগতো নৈব ভিদ্যতে।
ন রেণোর্ব্বা বিরাজো বা হেতোর্ব্বা হৈতুকাদপি॥ ৩
অন্যোন্যাভাবমাত্রস্যাভাবস্য ভাবরূপতা।
অবিনাভাবরূপেণ যত্রৈব পরিনিষ্ঠিতা॥ ৪

সর্ব্বরূপা মহামায়া জীব হইতেও কোনওরূপে ভিন্ন নহেন। ব্যষ্টি (বিশ্ব-তৈজসাদি) হইতেও না, সমষ্টি (বিরাট্, হিরণ্যগর্ভাদি) হইতেও না। বন্ধ এবং মুমুক্ষু জীব হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন, নয় কি? না। তিনিই বন্ধ মুমুক্ষ্বাদি জীবরূপে নিজেকে নিজে ভুলিয়াছেন ('ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা') আবার, নিজেই নিজেকে চিনিতেছেন (চেতনা—'চিতি')। জীবাত্মাকে বিভু (সর্ববব্যাপক) বস্তু বলিলে তোমার বিচারে গোল হয় না, কিন্তু যদি বলা যায় অণু (যেমন অনেক ভক্তিসিন্ধান্তে বলা হইয়াছে) তা হইলে? তাতেও গোল নাই। তিনিই আপনাতে বিভুত্ব, অণুত্ব 'ব্যপদেশ' করিয়াছেন। তিনিই অণু হইয়াছেন। এ হওয়াটাকে 'মিথ্যা' বলিয়া যদি তুমি খুসি হও তো হও। তোমার 'মিথ্যা' ও তাঁর (সর্বের) বাহিরে নয়তো! যদি জীবের এই অণুত্ব সাংসিদ্ধিক বা নিত্য ভাবিতে তোমার ভাল লাগে তো বেশ, তাঁর পরমতায় জীবের ঐ অণুত্বটিও নিত্য রহিয়াছে। তাহা হইলে আমার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শোধনে বোধনে কি লাভ হইল?—তুমি বিচারী বলিবে। লাভ এই যে—ত্বং পদার্থকে 'ত্বং' রাখিয়া তো ঐ পরম সমীকরণটি হয় না; তুমি শোধনে উর্বারুক ফলের মত—'ত্বং' এর খোলসটি ফেলিয়া দিলে—নিজ বোধরূপ পরম অব্যক্ত একটা কিছু মিলিল। 'খোলস'টি যদি তোমার 'ভাগত্যাগে' ওভাবে 'ত্যক্ত' হইয়াও বিশ্বব্যবহারে 'বাতিল' না হইয়া বিদ্যমানই থাকে (যথা, প্রপঞ্চোপশমে স্থিতের পক্ষে না হইলেও, অন্যথা এই বিশ্ব), তাতে আপত্তি কি? তমঃ আর প্রকাশের মত অবিদ্যা আর বিদ্যার বিরোধ, কাজেই

বিদ্যা হইলে জীবত্ব (অণু অথবা বিভু) থাকিতেই পারে না—এ যদি বল তো ঠিক। যে বিদ্যায় নিখিল প্রপঞ্চোপশম ঘটে, তথায় জীবত্বের প্রসঙ্গ কোথায়? কিন্তু প্রপঞ্চ তো অন্যের সম্পর্কে অথবা স্বতঃই লোপ পায় না। দৃষ্টি-সৃষ্টি করিয়াই কি সব একান্ত লোপ করিবে? সৃষ্টিকুহককুশলিনী সে দৃষ্টি কি এবং কার? আসলে সে দৃষ্টি তো মহামায়ারই দৃষ্টি। মূলে জীব যদি একই হয়, তবে মহামায়াই সেই 'এক জীব' হইয়াছেন। সেই একজীব হইল মহামায়ার 'একবিন্দু' বা 'মহাবিন্দু' রূপ লীলায়ন। ইনি বিন্দুমায়া। মহাবিন্দুরূপেও মহাসিন্ধু। যাদের ভিন্ন ভিন্ন জীব ভাবি, তারা প্রত্যেকে ঐ মহাবিন্দুরই ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুরূপতা। মহাবিন্দু এবং তার 'বিতান' এই বিভিন্ন বিন্দুসমূহের বিনাশ নাই; কেননা, ঐ বিন্দুরূপেই পরব্রহ্ম বা মহামায়া নিখিল সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন—অবশ্যই আত্মঘাতী হইবার নিমিত্ত নয়! মহামায়া প্রসাদে প্রপঞ্চোপশম মুক্তি ঘটিলে, তৎসম্পর্কে (in regard to that position) এতাবৎপ্রসজ্যমান (practically relevant) জীবত্ব এবং জগৎ এই দুইই তিরোহিত হয়। কিন্তু জীব ও জগতের আধার এবং হেতুরূপ যে কলাশক্তি, বিন্দু এবং নাদ—এই ত্রয়ী রহিয়াছে, সে ত্রয়ী উক্ত প্রপঞ্চোপশম মুক্তের সম্পর্কে অপ্রসজ্যমান হওয়া সত্ত্বেও রহিয়া যায়। সঙ্কল্পরহিত হইলে উক্ত ত্রয়ী জীবত্বের (পঞ্চকোষ অথবা সপ্তকোষাদি) যে বিশেষ বিশেষ 'সংঘাত', সে 'সংঘাত' আর সৃষ্টি করে না; কাজেই বিদেহ মুক্তি। কিন্তু সংঘাতের (দেহের) বিনাশে বিন্দুর বিনাশ প্রসক্ত হয় না। যদি বল—ঐ বিন্দুই তো বীজ বা কারণ; কাজেই পাদপের বিনাশেও যদি বীজের সদ্ভাব হয় তো পাদপের সম্ভাবনাই তো থাকিয়া গেল! এর উত্তর—বিন্দু স্বয়ং (as such) বীজ নয়, অবিদ্যাসংস্কারকে উপাদান পাইলে (যথা, প্রকৃতি সহযোগে পুরুষ) তবে বিন্দু হয় বীজ। এ সকল পরে বিন্দুর লক্ষণস্থলে বিবেচিত হইবে।

তখন দেখিব যে, অণু কি বিরাট, কোন সঙ্ঘাতের আপন নাভি বা কেন্দ্ররূপে ('প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্') বিন্দুকে (বিন্দুমায়ারূপ ব্রহ্মকে) পাওয়া চাই-ই। অন্যথা কোন সংঘাতেরই প্রভবাদি হইবে না। যেমন, কেন্দ্র, ফোকাস্ ইত্যাদি পাইয়াই বৃত্ত, বৃত্তাভাস ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্ঘাতের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বয়ং বিন্দু নিরপেক্ষ (neutral)। উক্ত আকৃতি-প্রকৃতি অনাদি কর্মসংস্কারজন্য 'বন্ধ' বাসনা, অথবা (বিশেষ ক্ষেত্রে) জীবজগদ্ধিতায় শুভ-সঙ্কল্পরূপ 'মোক্ষ'

বাসনা—এতদুভয়ের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এইভাবে কেহ যখন প্রপঞ্চ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে বহিঃপ্রজ্ঞ-অন্তঃপ্রজ্ঞ-ঘনপ্রজ্ঞরূপ সঙ্ঘাতত্রয়ী থেকে মুক্ত হয়; নাভিস্থ বিন্দু বিন্দুমায়ারূপেই বিশ্রান্ত হন। যদি কোন মুক্ত জীবও জগতের হিতের নিমিত্ত সঙ্কল্প রক্ষাপূর্বক মুক্ত হন, তবে ঐ বিন্দুমায়াকে নাভি করিয়াই তাঁকে আপন আবশ্যক সঙ্কল্প কলেবরটি পাইতে হয়। ভাগবতে সেই 'আত্মারাম' শ্লোকে 'নির্গ্রন্থ' মুনিগণ শ্রীহরিতে অহৈতুকী—ভক্তিরস আস্বাদের নিমিত্তও সেরূপ করিতে পারেন। পরে বিন্দুসূত্রে বলা হইবে যে—শূন্যতা এবং পূর্ণতা যেখানে মিলিয়াছে, তাহাই বিন্দু। 'বিন্দুবাসিনী' মহামায়া একাধারে 'সর্ব্বনাশী' ও 'সর্ব্বা'। নিখিল বিচিত্র অভিব্যক্তিরেখা সেখানে 'শূন্য' হইয়াছে, অথচ সেখানে নিখিলকলনশক্তির গাঢ়তার পরাকাষ্ঠা ('পূর্ণ') রহিয়াছে। এইরূপ শূন্য—পূর্ণের যুগ্মকটি কেন্দ্রে না পাইলে কোনও কলনই হয় না। মুক্তিতে জাগ্রদাদি নিখিল কলনের শূন্যতা ঘটে, কিন্তু শূন্য শূন্যই থাকে। শূন্য ছাড়া আর কে বলিবে আশ্বাস দিয়া—প্রপঞ্চের লেশটুকুও আর নাই, 'শান্তম্, শিবম্'! আবার পূর্ণের 'গ্যারান্টি' ও ঐ থেকে।

এইবার জগতের সম্পর্কে জগন্মাতাকে ধ্যান কর। প্রলয়াদিতে জগতের যে অব্যক্ত (unmanifest) ('অসৎ') ভাব, তা থেকে মহামায়া ভিন্ন নন, আবার, জগতের যে ব্যক্ত (manifest) ভাব, তা থেকেও ভিন্ন নন। ক্ষুদ্র রেণুটি থেকেও অভিন্না, আবার বিরাট্ থেকেও অভিন্না। যাকে তুমি ক্ষুদ্র রেণুটি দেখিতেছ, সে তো আসলে ক্ষুদ্র নয়, ঐ 'রেণুমাত্রটি' নয়। অধুনা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তোমার ঐ কারবারী ক্ষুদ্রত্ব ও রেণুত্ব একটা মোটা 'বাজার চলতি' হিসাব (crude pragmatic convention or fiction) রূপেই সাব্যস্ত হইয়াছে। আরও আগাইলে দেখিব—ঐ রেণুটি অতীত-অনাগত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক বিশিষ্ট দহর সংস্করণ (micro-cosmic resume)। কেননা, 'বিন্দুবাসিনী' ঐ রেণুটিতে বাস করিতেছেন যে! যে ঐ বিন্দুবাসিনীকে দেখিল, সে রেণুটিকে অশেষ বিশেষ 'সর্ব্ব' বা 'সর্ব্বা'কেই দেখিল। তোমার আমার সাধারণ কারবারের গরজে ঐ রেণুর নাভিতে যিনি রহিয়াছেন, তিনি তাঁর সংখ্যাতীত 'অর' আর সীমাহীন 'নেমি' গুটাইয়া, হ্রস্ব করিয়া আনিয়া তাকে 'এতটুকু' করিয়া দেখাইতেছেন। এইটি মহামায়ার মায়া। এর কথা পরের সূত্রে বলা হইবে। অসীম, অপরিমেয় কলন শক্তি ('কলা' বা 'কালী') বিন্দুরূপে পরম ঘনীভাব

পাইয়া যেন বলেন—অতীত-অনাগত নিখিল বিশ্ব (অর্থাৎ দেশ-কাল-কার্য-কারণ সঙ্ঘাত) ব্যক্তভাবে (as manifested) এই দেখ মুছিয়া ফেলিয়া (the circumference and all the radii reduced to zero) আত্মসাৎ করিয়াছি, 'শূন্য' করিয়াছি ('যথোর্ণনাভঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ'); কিন্তু সব কিছু শূন্যে আনিয়াও কলনশক্তি বা কালীরূপে আমি যে পূর্ণ সে পূর্ণই রহিয়াছি। 'পূর্ণমদঃ' মন্ত্রের এই এক পরম রহস্য।

নাদরূপে যে অশেষ বিস্তার বা বিতান, সেটি পূর্ণ (পূর্ণমদঃ); আবার বিন্দুরূপে (অশেষ বিতানরূপ নাদকে অব্যক্তে আনিয়া) যে পরম ঘনীভাব, সেটিও পূর্ণ ('পূর্ণমিদং'); দেখ—বিন্দুরূপ পূর্ণ কেমন ধারা নাদরূপ পূর্ণে অভিব্যক্ত হইতেছে ('পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে') (উৎ+অঞ্চ্—গত্যর্থে)। এখন, বিন্দুরূপে কিংবা নাদরূপে যেটি পূর্ণ, তার ঐ পূর্ণকে লইয়া ('পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়'), তিনি পূর্ণই রহিয়া যান (পূর্ণমেবাবশিষ্যতে')। ঐ 'আদায়' এবং 'অবশিষ্যতে' পদ দুটিতে বিশেষভাবে ধ্যান দিও। আৎ+আয় (গতি) = আদায়, এই রকমে এটি 'সাধা' যায়। 'আৎ' = আবর্ণ, যেটি সূচনা করে ব্যাপ্তি এবং কাষ্ঠা। মাঝখানে বিন্দুমায়াকে রাখিয়া বিশ্বভুবনে এক সার্বভৌম 'মহাসমাস' (cosmic integration) চলিয়াছে। বুদ্ধির হিসাবে, এই সমষ্টীকরণের দুটি কাষ্ঠা—অবম (শূন্য) ও চরম (অশেষ= ∞)। এক বিন্দু, অপর নাদ। ধর, শূন্যের 'সান্নিধ্য' (approximation) থেকে অশেষের দিকে (অর্থাৎ পজেটিভ্—'অনুলোম') কোন নৈকটিক (approximate) সমষ্টীকরণ ঘটিল. ফলটিকে বলা হোক $+\infty$, আবার, বিপরীতক্রমে বা 'বিলোমে' সমষ্টীকরণে হইল $-\infty$. এখন সাধারণভাবে এ দুইটি ফল যোগ করিলে হয় শূন্য, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে সেটি অশেষ। ধর, e = এক অশেষ সিরিজ, তা হইলে $-$ e হইল ঐ সিরিজের, অর্থাৎ তদন্তর্গত ব্যষ্টিরাশি (terms) গুলির ঋণাত্মক অবস্থান। এই e + ($-$ e) হইলে কি হইবে? প্রথম এক একটি ধনরাশি দ্বিতীয়টির অনুরূপ ঋণরাশির কাটাকাটি করিয়া চলিবে। কিন্তু এ কাটাকাটিও অশেষ! এ অশেষের বিচার যে জপের প্রসঙ্গে একান্ত বাহ্য নয়, তা পরে দেখা যাইবে। আবার দেখ, $+\infty$ থেকে $-\infty$ যদি বিয়োগ কর, তা হইলেও সেই অশেষ! সাধারণ হিসাবে ফলটি হয়, 2∞, দ্বিগুণ অশেষ! কাজেই, 'আদায়' এই প্রক্রিয়াটিকে অনুলোম বিলোম যে ভাবেই সমষ্টীকরণে নাও, 'অশেষ'কে 'শেষ' করার যো নাই।

এখানে উদাহরণরূপে 'পূর্ণমদঃ'কে দেখান হইল। পরে এসব প্রসঙ্গ বিশেষ বিশেষ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। উপরে, 'সান্নিধ্য', 'নৈকটিক' শব্দ দুটি লইয়াও এখানে বিচার তুলিয়া কাজ নাই। একটা 'ক্ষুদ্র' রেণু লইয়া আরম্ভ। এর পরিসমাপ্তি কোথায়? রেণু বাজায় যে 'বেণু', তাতে যে বিশ্বভুবনভরা 'কানুর গীত'ই বাজিতেছে! —The unbroken, unabridged theme of Song Divine! একটুও বাদ যায় নাই, ক্ষুণ্ণ হয় নাই! মিরাক্‌ল্ যদি কিছু থাকে তো ইহাই। মহামায়ার আধারে ঐ রেণু দেখাইতেছে মহাশক্তি চতুর্ব্যূহ। মহাকলনশক্তিরূপা মহাকালী, মহাবিন্দুশক্তিরূপা বিন্দুবাসিনী মহেশ্বরী, মহানাদশক্তিরূপা মহালক্ষ্মী (রেণুটির মধ্যে যে অনবদ্যা শ্রী—Perfect Harmony), এবং মহাসরস্বতী (অকুণ্ঠিতা খ্যাতি—Perfect Manifestation)। এ চতুর্ব্যূহ আমাদের চিনিতে হইবে।

চতুর্ব্যূহা মহামায়া ঐ চারিভাবেই নিত্যপূর্ণা। কালাদি নিখিল কলনের 'আদ্যা' (Prime Elan) রূপে তিনি নিত্যপূর্ণা; নিখিলের বিন্দুতে অধিষ্ঠিতারূপে তিনি নিত্য পূর্ণৈশ্বর্যময়ী; নিখিলের বিতানে আকৃতি-কৃতি-ছন্দঃ এই ত্রিতয়ের যে অনবদ্য সৌষ্ঠব ও সুষমা, যে অপরূপ মাধুরী, সেইরূপে তিনি পরিপূর্ণা শ্রী; এবং নিখিলের প্রকাশে ও বোধে পরিসীমারূপে তিনি নিত্যপূর্ণা খ্যাতি। ঐ চারিটির কোনটাতেই 'মহা-অমেয়া', 'মেয়া', সুতরাং 'মায়োপহিতা' হন না। এ যেন মহামায়া নিজেকে চারিটি প্রশ্ন করিয়া নিজেই উত্তর দিতেছেন; এ সমস্তের পরম 'আদ্যা' মূলরূপা কে? আমি মহাকালী। এ সকলের পরম অধীশ্বরী হই কিভাবে? মহাবিন্দু অধিষ্ঠিতা মহেশ্বরীরূপে। এ সকলের আকৃতি-ক্রিয়া-ছন্দে এত সৌষ্ঠব, এত 'মধু', এত 'রস' কে দিল? —আমি মহালক্ষ্মী। আর, এ সকলেরই পরিপূর্ণ সত্যবোধ এবং খ্যাতি, নিবেদন ও আস্বাদন কোথায়? আমার মহাসরস্বতীরূপে। এই নিত্যপূর্ণা চতুর্ব্যূহা মহামায়াকে ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ—এই মহাবীজচতুষ্টয়ীরূপে ধ্যান করিও। পরে সবিশেষ বলা হইতেছে।

এখন, একটা রেণু থেকে মহামায়া যদি অভিন্না হন, তবে উক্ত চতুর্ব্যূহারূপেও তিনি রেণুটিতে অবশ্যই আছেন। আসলে ও তো 'রেণু' নয়—ও যে সেই 'চিরবেণুকরের করে চিরবেণু'! ও বেণুতে নিখিলের সকল সুর, সকল ছন্দই যে নিত্যই বাজে! শুধু একঘেয়ে নয়, অপূর্ব লীলায়নে বাজে! শানাই-এর 'পোঁ' আর করতব দুইই বাজে! তুমি আমি সেটি শোনার কানটি খোয়াইয়াছি। এটি মহামায়ার

মায়া। 'আমার' ভান সামগ্রী (Experience as a Whole) তাই পূর্ণাভাস বা পূর্ণাখ্যাতি নয়। পূর্বখণ্ডে আলোচিত মর্শপঞ্চক এবং ভাসপঞ্চকের 'পাল্লায় পড়িয়া' যেটি আসলে অখণ্ড-অমেয় সেটি যেন খণ্ডিত হইয়া 'এতটুকু' (ধূলিরেণু) হইয়াছে। এককথায় এটা 'আভাসিক'—অর্থাৎ, গ্রহীতৃ-বিশেষের আপন ভান (Experience as Fact) কে কোনপ্রকার 'ভাস' ভাবে 'গ্রহণ' (accept, own) করার যে সংস্কার বা 'বাতিক', সেই বাতিক বশতঃ ছাঁটাই করা, প্যাক করা, লেবেল মারা একটা সামগ্রী! সামগ্রীর সমগ্রত্বাদি হারানো তোমাতে-আমাতে-বৈজ্ঞানিকে-যোগীতে আলাদা আলাদা সামগ্রী।

আচ্ছা, এই 'আভাসিক' সামগ্রীটিও যেমনধারা হোক্ 'স্বাধিকারে'ই আছে, নয় কি? এটি তো 'সর্ব্বের' বাহ্য নয়! মহামায়ার মায়ায় যাহা আভাসিক ভাবেও ভাসিতেছে, সেটি তো তাঁহা হইতে ভিন্ন? না, তা নয়, মহামায়াই স্বয়ং অস্মদাদিরূপে, অস্মদাদির ভান-ভাসাদিরূপে ভাসিতেছেন। বস্তুতঃ, মহামায়ার পূর্ণত্ব কোন স্থলেই বাধিত নয়। তিনি শুদ্ধ 'অস্তিভাতি প্রিয়ম্' রূপে সর্বতঃ সর্বথা পূর্ণ তো আছেন (সূত্রের প্রথম কারিকায় সেটি দেখান হইয়াছে); তিনি বিন্দু ('যত্রৈকত্র শূন্যত্বপূর্ণত্বে') রূপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট রহিয়া রেণুটিকেও 'দহর বিশ্ব' করিয়াছেন। (আগে Liebnitz বর্তমানে Whitehead এর 'আলেখ্য' এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধান কর) সুতরাং সে ভাবেও পূর্ণই আছেন; ঐ রেণুর মধ্যেও শুধু যে একটা 'পরম আকৃতি' (Perfectly realized Universe Pattern) ভাবে তিনি আছেন এমন নয়; দেশ-কাল-নিমিত্ত—এই তিনের আধারে (frameএ), ঐ রেণুটিতে তার আপন খ্যাতিটির পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য ধারারূপটি— Evolutionary Pattern ও ধরিয়াছেন; এবং ঐ ধারার অন্তর্গত প্রতিটি 'জাতককে' (Evolvent) তিনি পূর্ণ যথার্থ মান এবং আংশিক আভাসিক মান—এই দুইভাবেই 'চালিত' করিতেছেন। এই শেষোক্ত ধারারূপেও পূর্ণতাহানি হয় নাই। পূর্ণ বিন্দু থেকে পূর্ণ নাদ (বিস্তার) পানে এই 'রেণুকা ধারাটি' নিজেও পূর্ণা। আমার কারবারী রেণুকাটি স্বল্প হয়, তুচ্ছ আভাসিক হয়, ঐ পূর্ণ স্থিতিরূপ আর পূর্ণ ধারারূপ এ দুয়ের আবরণে ভ্রান্তিতে। সে ভ্রান্তিও তিনি, যার ফলে একটা unbounded cosmic event হয় an event 'here' & 'now' ইত্যাদি। যেটা Fact সেটা হয় Fact-section. এইরূপ section রূপে সেটি

দেখায় মৃত, আড়ষ্ট, স্থাণু এক ভগ্নাংশ। স্থিতিরূপে (in a static configuration or co-existence) ঐ স্থাণুটিকে সত্যই যেন সমগ্রের মধ্যে রহিয়াও সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। কিন্তু ধারাবাহিকতায় (যথা কোন এক ঊর্মিকে) সমগ্রের সঙ্গো গ্রথিত, অন্বিত, অঙ্গীকৃতই বোধ হয়। 'ঐ' আসিয়া 'এই' হইতেছে, আবার কেমন 'ঐ' হইয়া চলিয়াছে; এই দৃষ্টিতে এই রেণুটি, ঐ শিশির কণাটি, ঐ 'নাম-না-জানা তৃণকুসুমটি' এক বিশ্ব ঐক্যতানের এক একটি যেন 'তান'!

এইজন্য বলি মহামায়া বিশ্বের প্রতিটি রেণুকে ধারারূপটি ভাবে 'ছবি'র মত আভাসিক করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেটিকে আবার এক মহাসঙ্গীতের (Cosmic Harmonyর) মাঝে অপূর্ব এক রসনিবিড় তানের মত গাঁথিয়াও দিয়াছেন! তাকে 'বলি' দিয়া, টুকরা করার ব্যপদেশে তাকে এক নিজ-নিবিড় অথচ সর্বসংবাদিনী চমৎকারিতায় ভরিয়া দিয়াছেন। এই বলিতেই সে পূর্ণ হইয়াছে। এমনটি নহিলে পূর্ণরূপা মায়ের আমার আপনাকে পূর্ণরূপে দেখাইবার 'আশ'টি যেন অপূর্ণ রহিয়া যায়। ভগবান্ নিত্যপূর্ণ, কিন্তু জীবকে ভক্ত হইয়া, ভালবাসিয়া তাঁর 'দোসরটি' হইতে হইবে; কেননা রসবস্তুর পূর্ণতা দুটি মিলিয়া হয়— নিত্য নিবিড়তা এবং নিত্য নবায়মানতা। এই যুগলের গরজে জীবকে হইতে হয় 'অংশ', 'কণ', 'তটস্থ' ইত্যাদি। নতুবা, ভগবানও পূর্ণ, ভক্তও পূর্ণ। ভগবান্‌কে 'চুপ করিয়া' থাকিতে দাও—হাঁ, মধুর তিনি, কিন্তু এত অশেষ বৈভব, অনন্ত ঐশ্বর্য! তাঁর কাছে আমি এতটুকু—ঐ রেণুর রেণুটি—হইয়া গিয়াছি। কিন্তু মধুরকে রসের ঝরী হ'য়ে অঝোরে ঝরতে দাও—হাতে দাও রেণু, হোক সে মোহনিয়া কিশোর নটবর! অমন যে ঐশ্বর্য চুপ্‌সে এতটুকু হ'য়ে গেল! আর এদিকে রেণুর মাঝেও বেণু বেজে উঠল! সে কি আর রেণু আছে? মোহনিয়ার বেণুটির ডাক যত বাড়ে, রেণুর সাড়াও তত বাড়ে; এ বাড়ার 'বাড়তি' কবে, কোথায়? এই অশেষের, অফুরাণ নব নবের 'নিরালাকুঞ্জটি', যে রেণু কেবল আপনাতে নয়, সারা 'বিশ্বব্রজে' বিতত দেখে, সে রেণু যদি পূর্ণ না হয়, তবে তোমার ঐ বিশ্বমোহনিয়া বেণুকরটিও নয়। এ পূর্ণতা নিবিড় অথচ অশেষ নবায়মানতায় যে পূর্ণতা তাই। 'তাই না ভক্ত আপন রসলিঙ্গাটিকে এক শূন্য ঘাঘরীর মত নিত্য 'সকাল সাঁঝ' ভরিতে যান রস-কালিন্দীতে। ভরা ঘাঘরী শূন্য করিয়া আবারও ভরিতে যান। দুয়ে দুয়ের কাছে স্বরূপ পূর্ণতাটি ঢাকিয়া এ খেলাটি খেলেন।

ভক্ত বলেন আমি তোমার 'কণ', ভগবান্ বলেন ঐ 'কণ' বলেই আমি চিদ্‌ঘন-নিরঞ্জন। রসাশ্রিত যে লীলা তাতে যেমন একদিকে ভগবত্তার পূর্ণৈশ্বর্যের 'আবরণ', তেমনি অন্যদিকে ভক্তেরও রসাস্বাদনে ঐ অশেষ নবায়মানতারূপ পূর্ণতারও আবরণ। মহামায়া অথবা ভগবত্তার আপন পূর্ণত্বের 'লীলায়ন' এইরূপ নানাভাবে। এতে ভক্তরসিকের মন উঠিবে কি? বিন্দু আর সিন্ধু বলিতেছ? কিন্তু 'জনম জনম', 'লাখ লাখ যুগ' 'হিয়াপর' রাখিয়া অথবা নয়নে 'হেরিয়া' যে বিন্দু একটিবারও বলিল না—এই তো ভরে গেছি, ভরপুর হয়েছি—'তিরপিত ভেল'—সে বিন্দুকে কেমনধারা বিন্দু বলিবে? সিন্ধুকে আপন হিয়ার মাঝারে টানিয়া লইয়াও যে সে বলে—আমি যে শূন্য, মোর নাথ! 'মাহ ভাদর, ঘোর বাদর, শূন্য মন্দির মোর!' বিন্দুরূপা মহামায়া একাধারে শূন্যা ও পূর্ণা—এ হেন অঘটনটিও ঘটান দেখিতেছি। মহামায়া যে 'মায়ামাত্র' নন এ পরে বলা হইবে। যে 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' শ্রীভগবান্ তাঁর রসবিলাসের পরমোৎকর্ষ যে রাস, সেটির বিস্তার নিমিত্ত 'রন্তুং মনশ্চক্রে', সে যোগমায়া, মহামায়া বা ভগবত্তারই এক বিশেষ প্রকাশ।

প্রপঞ্চোপশম পক্ষ 'মায়া'কে লইয়া, 'তত্ত্বাতত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়া' যে মিথ্যাত্ব, তাহা লইয়া কিছু বিব্রত হইয়াছেন, কিন্তু মহামায়াকে লইয়া তেমনধারা বিব্রত হবেন না। সে বিচার বর্তমানে নিরস্ত থাকুক্। জীব ও জগতের সঙ্গে মহামায়ার অভেদ দেখাইতে যাইয়া রেণুর প্রসঙ্গ আসিয়াছিল। সেই রেণুই আমাদের 'কানুর গীত' শোনাইয়া গেল। বেদান্তের মহাভেরী 'তুর্য্যনাদ' এখন শুনিতে গেলে কর্ণটি বধির হইবে, আর কিছুই তো শোনা হবে না! ঐ রেণু কারিকাটিতে শেষকালে আছে—'হেতোর্বা হৈতুকাদপি'! মহামায়া হেতু থেকে ভিন্না নন, আবার হৈতুক থেকেও ভিন্না নন। হেতু-হৈতুককে কারণ-কার্য ভাবে দেখ। বিচারে সৎকার্যবাদ, অসৎকার্যবাদ প্রভৃতি আছে। কিন্তু সকল 'বাদ' বাদ দিয়াও যেটিকে কোন ক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না, সেটি কি? সমগ্র অখণ্ড পূর্ণ ভান (সেই Absolute Fact)। এর মধ্যে তোমার আমার কারবারের গরজে 'হেতু' টুক্‌রাটি 'হৈতুক' টুক্‌রা থেকে আলাদা হোক্, তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু আসলে? ঐ সমগ্র অখণ্ড ভানটিকে একভাবে (senseএ) লইলে হয় 'হেতু', অন্যভাবে লইলে হয় 'হৈতুক'। উক্ত ভাব বা senseটি কারবারী (pragmatic, conventional)। যেমনধারা ঐ 'রেণুরটন'

(existence as Particle or Point) মহামায়াকে বিন্দুরূপা বিন্দুবাসিনী করিয়া দেখাইয়াছে, 'রেণুরণন' (অণুস্পন্দ = action as Point Event) তেমনি আবার মহামায়াকে অখণ্ড সমগ্র ধারারূপেই (as Complete Cosmic Event) দেখাইতেছে। তুমি 'রটন' ও 'রণন' দুটোকেই বেড়-ঘের দিয়া (limitation of date করিয়া) কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া (cross-section, side-section ইত্যাদি রূপে) তোমার ভবের ও ভাবের (theoryর) কারবার স্বচ্ছন্দে চালাও, তাতে মানা কি? কিন্তু ঠিক স্বচ্ছন্দে চলে না দেখিতেছি—Dynamics of a Particle যাইয়া Wave Mechanicsএ ডুব মারিয়া হাবুডুবু খাইতেছে যে; সেই শীলমোহরাঙ্কিত বিশ্ব কার্যকারণবাদ Probabilityর Theoryতে গলিয়া যাইতেছে যে! কাজেই, হেতু-হৈতুক লইয়া অন্ধ গোঁড়ামিটা অচল। 'রেণু-রটন' আর 'রেণু-রণন' (Point Existence and Point Event) —এ দুয়ের মাঝে মহামায়া এক নিগূঢ়রূপে লুকাইয়া বসিয়াছেন যে— 'রেণুরমণ'! তিনি রেণুর বিন্দুতে রহিয়া তাকে বলিতেছেন—'তুমি যে প্রাণ, তুমি যে রস, তুমি যে আনন্দ, তুমি যে লীলা'! কাজেই, যত বড় জাঁদরেল, জবরদস্ত ইকোয়েশনের 'গাঁঠ' বাঁধ না কেন, সবই এক নিমেষে 'বজ্র আটুনীর ফস্কা গেরো' হইয়া যায়! কোন Lagrangeএর Analytical Mechanics কি একটা রেণুর অটন-রটনের হেতু হৈতুকের যেটি পুরা অথবা আসল হিসাব, সেটি দাখিল করিয়াছে? কোন Laplance এর Celestial Mechanics কি আজও স্পর্দ্ধা করিবে—আমার এই সংখ্যা-সংখ্যানই ব্রহ্মাণ্ডাববোধ-পটীয়ান্, একেশ্বর যাদুকর, ভগবান্ নামক অন্য অজ্ঞাতকুলশীল যাদুকরে কি কর্ম? সাবেকি (unconditional invariable antecedent, 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা' ইত্যাদি), অথবা হালি (বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল, হোয়াইটহেড ইত্যাদির দেওয়া, অথবা নব্য ন্যায় বেদান্তাদির) যে কোন লক্ষণ (ফরমূলা) লইয়া পরীক্ষা কর না কেন, টেনেটুনেও শেষ পর্যন্ত কুলায় না দেখিবে। না দেখারই তো কথা!

যাকে 'হেতু' বলি সেটি ঐ সমগ্র অখণ্ড ব্রহ্মরূপারই এক 'কৃ কটাক্ষ—', 'হৈতুক' হইল এক 'কৄ কটাক্ষ'। 'কৃ' বলে, কর বা করি—; 'কৄ' বলে দেখ, করিয়া চলিয়াছি। নিজে হন্ হেতু=শক্তিপিণ্ডকে জড়ো কর, সমর্থ কর। এইটি 'কৃ'। যথা মেঘ। আর হৈতুক=উহাকে ছড়াইয়া দাও, বিকীর্ণ কর। এইটি 'কৄ'। যথা বর্ষণ। এই

'কৃ-কৃ' বিন্দুরূপা মহামায়ার 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' আকৃতি। মৌলিতে নাদবিন্দু স্পষ্টতঃ ধারণ করতঃ ইনি হন 'ক্রীঁ' এই মহাবীজ (কালিকার)! দীর্ঘ ঋকার হইয়াছে দীর্ঘ ঈকার। একেতে ধর, নিখিলেরই লয় হইয়া গেল, অপরটিতে আবার নিখিলের সৃষ্টি হইল। পরম চিদানন্দরূপা তিনি, আপন আধারে দেশ-কাল-নিমিত্ত—এই মিলিত ত্রিপটী বিস্তার করিয়াছেন; ত্রিপটী হয় ভাবান্তরে ত্রিপুটী; এ পটভূমিতে এক ফোঁটা শিশির পড়িতেছে, একটা ফুল ফুটিতেছে, একটা Island Universe 'লোপাট' হইয়া যাইতেছে, আলাদা আলাদা, অন্যের 'কুছ পরওয়া' না রাখিয়া, অবশ্যই নয়। একটি ফুল ফুটিল—আর সমগ্র সৃষ্টিটাই নূতন করিয়া তাতে ফুটিল; একটা বুদ্‌বুদ ভাঙ্গিল—সমগ্র সৃষ্টিই তাতে পূর্বভূমিকায় ভাঙ্গিল এবং উত্তর ভূমিকায় জন্মিল। কাজেই ঐ ফুল ফোটা আর বুদ্‌বুদের ভাঙ্গানটিকে সমগ্র থেকে, অখণ্ড থেকে, পূর্ণ থেকে খারিজ কর কিসের জোরে? পূর্ণের এই পটভূমিকা সব কিছুর রটন রণনের (বা অটনের) পশ্চাতে রহিয়াছে বলিয়াই না দীক্ষা-জপ-পুরশ্চরণাদিতে রাশিচক্রাদি, তিথিনক্ষত্রাদির বিচার! যে সমগ্র, অখণ্ড, পূর্ণ শক্তি বা ইচ্ছার আধারে সাগরের বুকে জোয়ার ভাটা খেলে, রবি-তারা-নীহারিকাদির বিজয়-বিপ্লব ঘটে সেই একই অখণ্ড, সমগ্র, পূর্ণ আধারেই তুমি আমি তরঙ্গা-ফেন-বুদবুদাদির মত উদিত, স্থিত ও বিলীন হইতেছি, তার এক চুলও বাদ পড়ে না, বাদ দেবার যোও নেই।

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ—এ তিনের সম্পর্কে মহামায়ার অভেদ প্রদর্শক কয়েকটি কারিকার পর, এইবার অভেদটি কিরূপ তা বলা হইতেছে। ঘট পট নয়, পট ঘট নয়—এই রকম পরস্পরের অভাবকে যদি বলি উভয়ের ভেদ, তবে এই ভেদ একেবারেই থাকে না কোথায়? ('অন্যোন্যাভাবমাত্রস্যাভাবস্য')। এই দুই স্থলে থাকে না বলা যাইতে পারেঃ—এক, ঐকান্তিক শূন্যে; দুই, ঐকান্তিক নির্বিশেষে। কিন্তু 'নাস্তি অস্তি' এই উভয়ে অন্বিত যে শুদ্ধ অস্তিতা, সেটিকে তো কিছুতেই বাদ দেবার উপায় নেই। ঘট আর পট লইয়া 'নেতি'করণ (elimimation of determinants) করিয়া দেখ, ঘট পটের বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি বাদ দিলে, কিন্তু কতকগুলি এমন ধর্ম রহিল সেগুলি ঘটেও আছে পটেও আছে। এই প্রকারে বাদ দিতে দিতে 'দ্রব্য' ('Thing' এই category) পর্যন্ত গেলে। আরও চল—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সম্বন্ধ—এ সবই তো 'আছে'; 'অভাব'টাও 'নাই' এই পদার্থরূপে তো আছে। শেষ

সত্তা বা থাকা। এখন এই সত্তা বা থাকা যদি একান্ত নির্বিশেষ হয় তো সেখানে অবশ্য স্বগতাদি কোন ভেদই নাই। ঐকান্তিক শূন্যতা—যেটি কল্পনাদিযোগ্যও নয়—পরিহার করার নিমিত্ত কারিকায় বলা হইতেছে— 'ভাবরূপতা'। ফলে, মহামায়া তাঁর শুদ্ধ নির্বিশেষ নিরঞ্জন সদ্রূপে, চিদ্রূপে, আনন্দরূপে সর্বভেদাতীতা, ভেদভাবা-ভাবরূপা রহিয়াছেন। ঘটপটাদি কেহই বলিতে পারে না যে—আমি 'তুমি' নই, 'তুমি ছাড়া'।

কিন্তু শুধু কি এই? মহামায়া প্রতিটি ব্যষ্টি সমষ্টি, অণু মহান্ পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন— 'কলা, বিন্দু, নাদ' এই ত্রয়ীরূপে, অথবা মহাকালী, মহেশ্বরী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী এই চতুর্ব্যূহা ভগবত্তারূপে। এর ফলে কি হইয়াছে? প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য (individuality, differentium) পরস্পরের বোধে অথবা ব্যবহারে অথবা উভয়তঃ অভিব্যক্ত (reactive manifestation) হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে, (যথা ঐ রেণু) বস্তু-শক্তি-ছন্দঃ আকৃতি—এই চারিটি নিরূপকেই পূর্ণভানে (in Perfect Experience or Supreme Synthesis) পূর্ণ। কাজেই পূর্ণরূপা, সৃষ্টির অশেষ বিশেষের মাঝে কোথাও আপন শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব এবং সমগ্রত্ব 'খোয়াইয়া' বসেন নাই। উক্ত বিন্দু প্রভৃতি, মহাকালী প্রভৃতি, প্রণবাদি বীজশক্তি, মীনকূর্মাদি ক্রম, ক্রান্তি, শক্তি ইত্যাদি এবং অখণ্ড সমগ্র পূর্ণত্বরূপ ব্রহ্মত্ব, এইগুলি নিখিল পরিচ্ছেদ এবং বিশেষের উদ্ভবেও নিয়ত বিদ্যমান। এগুলির কুত্রাপি বিনাভাব (negation) হয় না। এই হইল অভেদের অপর ব্যঞ্জনা—অবিনাভাব। সকল ভেদও যেমন তাঁতে অস্তমিত, তেমনি আবার অভেদরূপা তাঁকে 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং' রূপে না পাইলে, কোন ভেদই (এটা ওটা সেটা) 'বর্ত্তায়' না। আর সেভাবে 'বর্ত্তিয়া'ও সেটা মূলতঃ এবং তত্ত্বতঃ অভেদকে বিতাড়িত করে না, অভেদেই সংগৃহীত, সংরক্ষিত থাকে। এইজন্য কারিকায় বলা হইল যে ভেদমাত্রের অভাবের যেটা ভাবরূপতা (as Fundamental Affirmation), সেটা আবার অবিনাভাবরূপে (as negation of Fundamental Negation) মহামায়াতেই পরিনিষ্ঠিতা।

সুতরাং অভেদকে এই পঞ্চপ্রকারে ভাবনা করতঃ মহামায়ার তত্ত্বটি ধ্যান কর। প্রথম—শুদ্ধ, নির্বিশেষ, নিরঞ্জনে সর্বভেদের অভাব। দ্বিতীয়—পরম ও মহান সমন্বয় (Synthesis and Harmony) রূপে—পরমসুষম সর্বরূপে যে অভেদ। তৃতীয়—সমষ্টি

ব্যষ্টির প্রত্যেকের 'নাভিতে' বিন্দুব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠানে যে অভেদ। চতুর্থ—কেবল প্রত্যেকের স্বভাব সংস্থায় 'পূর্ণং বীজমব্যয়ং' রূপে নয়, পরন্তু প্রত্যেকের (সমষ্টি-ব্যষ্টির) পরিণতির যে ধারারূপ (evolutionary process), তাতেও শক্তি-সম্ভাব্য-পরিপূর্ণতারূপেও অভেদ। অর্থাৎ প্রতিটিতেই বস্তু-শক্তি-ছন্দঃ-আকৃতিগত এবং পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠাগত কোন নির্ব্যূঢ় নিষেধ ('thus far and no farther') নেই; প্রতিটি স্বভাব-পূর্ণ এবং সম্ভাব্য-পূর্ণ এই অভেদ। পঞ্চম—বস্তু, আকৃতি প্রভৃতিতে এবং পাদ-মাত্রাদিতে, একটা এবং আর একটার যে বিশেষ অথবা ভেদ (আভাসিক), সেটা পূর্ণপ্রজ্ঞায় নেই, অপূর্ণবোধে (incomplete, partial appreciationএ) সেটা ভাসিতেছে। পরিবর্তিতও হইতেছে, কিন্তু এতেও অভেদ। কেননা, এটি মহামায়ার সেই নবধা ভ্রান্তিরূপের একরূপ; এ আভাস বা ভ্রান্তি থেকে তাঁর পূর্ণতায় ফিরিবার অধিরোহণী সোপানাবলীও তিনি—দশবিদ্যারূপা—ভ্রান্তি, ছায়া, শক্তি, জাতি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ব্যাপ্তি, বিষ্ণুমায়া এবং চিতি। ভ্রান্তি যে আসলে ভ্রান্তি, ইহাই হইল ভ্রান্তির বিদ্যারূপ। অন্যগুলিও এইরূপ এই দশ-বিদ্যারূপিণী মহামায়া।

এইবার পরের কারিকাগুলি সংক্ষেপে বলিলেও চলিবে—

অমাত্রমানমেয়ত্বে ব্রহ্মণো ভূমমানতা।
অণীয়স্ত্বং মহীয়স্ত্বং গূঢ়ত্বং দহরতা যয়া॥
নিদিধ্যাস্যাদিদৃশ্যত্বং বাচ্যত্বং প্রণবাক্ষরৈঃ।
অমেয়াপি হ্যমেয়স্য ব্রহ্মণো মানদা যতঃ॥
অযোনির্যা মহদ্‌ব্রহ্মালিঙ্গা বীজপ্রদঃ পিতা।
ভেদাক্লৃপ্তা মহামায়া মায়া যা ভেদকল্পনা॥ ৫-৭

'অমাত্র' কিনা, মাত্রারহিত যে পরমমান, সেই পরমমানে অমেয় ব্রহ্মকে শ্রুতি ও অনুভব বলেন—তুমি যে পরমমান, ভূমমান, ভূমা। আবার এইভাবে, 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'টিও মহামায়া দেন। ব্রহ্মরূপা নিজেই নিজের এইসব মান দেন। 'গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু'—এই গূঢ়, গহ্বরেষ্ঠ মান—তাও তিনি, দহরাকাশাদিরূপে দহরমানও তিনি। গূঢ় এবং 'দহর' ভাল করিয়া বুঝিও। প্রথমটি 'সংবৃত মান' (enfolded), দ্বিতীয়টি 'বিবৃতমান' (unfolded)—যদিও সূক্ষ্মমানে (in the 'sense' of the infinitesimal)। 'আত্মা অরে দ্রষ্টব্য'—সাক্ষাৎ শ্রবণ, অথবা শ্রবণের পর যথাযোগ্য মনন-নিদিধ্যাসনে আত্মা বা ব্রহ্ম 'দ্রষ্টব্য' বা দর্শনযোগ্য মান পাইয়া থাকেন—এ দ্রষ্টব্যমানও তিনি; 'ওমেকাক্ষরং ব্রহ্ম' এইভাবে ওঙ্কারাক্ষর দ্বারা অবাঙ্মনসগোচরেরও যে বাচ্যমান, তাও তিনি। এ ভাবে একান্ত অমেয় (হ্যমেয়স্য) ব্রহ্মের তিনি মানদা। পূর্বোক্ত ভূমমান, অণিষ্ঠমান, মংহিষ্ঠমান, নিগূঢ়তমমান, দহরমান, দ্রষ্টব্যমান, বাচ্যমান,—এ সবের মানদা ব্রহ্মরূপা তিনি স্বয়ং। স্বয়ং অযোনি হইয়াও 'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম'রূপে যোনিরূপা তিনি হন; আবার অলিঙ্গা হইয়াও সেই আপন যোনিতে 'বীজপ্রদ পিতা'ও তিনি হন। এই যোনিলিঙ্গের কথা পূর্ব খণ্ডে কিছু বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ 'মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে'—এটিও মনন কর। 'সমুদ্র', 'অন্তঃ' এবং 'অপ্‌সু' এ তিনের ব্যঞ্জনা—কলাশক্তি, বিন্দু এবং নাদ, এভাবেও অবশ্য আছে। সুতরাং বিন্দুশক্তি=যোনি। কোন ভেদকল্পনা না থাকিলে (ভেদাক্লৃপ্তা) তিনি মহামায়া; ভেদকল্পনারূপে তিনিই মায়া।

ব্রহ্মৈবেতি মহামায়া ন মায়া মহতী মৃষা॥ ইনি মহামায়া ব্রহ্মৈব—ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মাভিন্না। 'মহতী মায়া' = 'মহামায়া'—এই ভাবে লইলে ঠিক হইবে না, কেন না, মায়া = অভেদে ভেদকল্পনা, সুতরাং মিথ্যা (মৃষা), এইরূপ ভাবিয়াছ যে! তোমার ঐ সমীকরণটি চালাইতে গেলে মহামায়া = মহামৃষা, এইরূপ দাঁড়ায় যে! 'ব্রহ্মৈবেতি' = ব্রহ্ম + এব + ইতি; এ তিনে ভূমত্ব, পূর্ণত্ব এবং শুদ্ধত্ব, এ তিনই সূচিত হইয়াছে বুঝিও। অর্থাৎ পর-ব্রহ্মের যেটি ভগবত্তা তাতে তিনের সঙ্কোচ-পরিচ্ছেদাদি হয় না। 'মায়োপহিত ব্রহ্ম' আর ব্রহ্মরূপা মহামায়া এক পর্যায়ে নয়, জানিও।

এইবার কয়টি শ্রুতি এবং অনুভবের বিশেষ উল্লেখ হইতেছে।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
একমেবাদ্বিতীয়ঞ্চ বহুধৈকঞ্চ বেদ সৎ॥
অন্তর্য্যামী পুমানেষ সাক্ষী চেতাপি নির্গুণঃ।
ঈশানো ভূতভব্যানাং জ্ঞানাদি-শক্তিরূপকঃ॥
ভূমৈকরসশ্চাত্মা প্রিয়ঃ পুত্রাৎ প্রিয়োঽখিলাৎ।
সঙ্গচ্ছেরন্ হি বাক্যানি পূর্ণমদ ইতি শ্রুতৌ॥৮–১০

কয়েকটি প্রসিদ্ধ (আপাতবিরুদ্ধ) শ্রুতি এবং অনুভব যে কি ভাবে 'পূর্ণমদঃ'—এই মন্ত্রের সাক্ষাৎস্বরূপা মহামায়াস্বরূপে বিরোধ পরিহার পূর্বক সুসঙ্গত হয় (সঙ্গাচ্ছেরন্), সেটি উপরের ঐ তিনটি কারিকায় বলা হইল। এ সবই (ইদং সর্ব্বং) অবশ্যই ব্রহ্ম; ব্রহ্মে (ইহ) নানা—বহুধা বিশেষ—কিছুই (কিঞ্চন) নাই। ব্রহ্ম দ্বিতীয়রহিত একই। তাঁতে দ্বৈতলেশটিও নাই; এক সদ্‌বস্তুকে বিপ্রেরা "বহুধা" বলেন (এখানে দ্বৈত বা বহু কোন না কোন ভাবে আসিতেছে)। এই পুরুষ নিখিলের অন্তর্যামী; তিনি সাক্ষী, চেতা, এবং নির্গুণ (সুতরাং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি তাঁতে নাই)। ইনি ভূত এবং ভব্যের ঈশান (প্রভু, শক্তিমান্, ঈশ্বর); জ্ঞানক্রিয়াদি যত প্রকারের শক্তি তাও তিনি (অর্থাৎ শক্তিমান্‌ও তিনি, শক্তিও তিনি)। অখণ্ড, একরস, ভূমা এও বটে, আবার 'প্রিয়ঃ পুত্রাৎ প্রিয়ো বিত্তাৎ প্রিয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ'—এও বটে।

প্রথমটিতে তরতমতা, আপূর্যমাণতা নেই, পরম পর্যাপ্তি। দ্বিতীয়ে প্রিয়, প্রেয়ান, প্রেষ্ঠ রহিয়াছে। এমন এক আপূর্যমাণতা, মনে হয় যেন সেটির আর পর্যাপ্তি নেই। ভক্তরসিক তাই না তাঁর প্রিয়তমেও প্রিয়তার, মধুমত্তমতার শেষ পর্যাপ্তি কখনই পান না। তাই তাঁর প্রিয়তম নওল কিশোর। মাতৃভক্তেরও অনুরূপ। স্বলসিতের যেটা উল্লসিত-বিলসিত ধারারূপ, সেটি চিরনব অথচ চিরপূর্ণ (এক অপূর্ব হেঁয়ালি!) পরম লসিতের পানে চিরপূর্ণ চিরনবাভিলাষা হইলে হন 'রাধা'।

উপরে নমুনারূপে কতিপয় শ্রুতি এবং অনুভবের কথা বলা হইল। বেদে তন্ত্রে পুরাণে এবম্বিধ আপাতদ্বন্দ্ব, কোথাও স্পষ্টতঃ এবং পাশাপাশি, কোথাও বা আভাসে ইঙ্গিতে ও বিক্ষিপ্তভাবে অজস্র রহিয়াছে। এ সকলের সঙ্গতি সমন্বয়ের নিমিত্ত বহু বিভিন্ন মতবাদ এবং সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন, অদ্বৈত বেদান্তে বিবর্তবাদ, এবং তদঙ্গীভূত আভাসবাদাদি। কোথাও অচিন্ত্যশক্তিবাদ এবং তন্নিমিত্ত অচিন্ত্য পরিণামবাদ ইত্যাদি। এ সবের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা বর্তমান প্রয়োজনের আধারে অপ্রাসঙ্গিক। ইংরাজি Mahamaya প্রভৃতি গ্রন্থে সে চেষ্টা কথঞ্চিৎ যে না করা হইয়াছে এমন নয়। এখানে কেবল এইটুকুই বলা পর্যাপ্ত যে বর্তমান সূত্রে এবং কারিকাবলীতে মহামায়া যে ভাবে ভাবিত হইলেন, তাতে তাঁহাতেই ('ওঁ পূর্ণমদঃ' মন্ত্রের সাক্ষাৎ-স্বরূপ যিনি) সকল দ্বন্দ্বের সম্মিলন এবং সুসঙ্গতি। যেহেতু তত্ত্বতঃ মহামায়া 'অযোনি অলিঙ্গ', কাজেই, মহামায়া পরব্রহ্মরূপা ভগবতী এবং পরব্রহ্মরূপ

ভগবান্। এই পরব্রহ্মরূপা ভগবত্তাকে শুদ্ধমাধুর্য, ঐশ্বর্য এবং মিলিত ঐশ্বর্যমাধুর্য সকল ভাবেই পুরাপুরি ফুটিতে দাও। মহামায়া তুমিই দাও—তোমার মায়ার পরিমাপে যেন তোমার অপরিমেয় পরম-পূর্ণতার অপলাপ ঘটিতে দিও না!

অতঃপর, 'মহামায়া' এই মহানামটি নীচের কয়েকটি কারিকায় ধ্যান কর।

বিহায় মা তু মা মাসীঃ সঙ্গাচ্ছথা মদন্বিতম্।
মায়েতি বাপ্যমায়েতি মহাপূর্ব্বং দ্বিধান্বয়ম্॥
তন্মায়োপহিতং ব্রহ্ম স্বতঃ শুদ্ধং নিরঞ্জনম্।
নোপাধেয়া মহামায়া স্বকলাব্যাপ্যসম্ভবাৎ॥
স্পর্শানাং স্পৃশমন্ত্যাঞ্চ প্রাণানাং শেষশক্যতাম্।
স্বরাণাং যান্তিমব্যাপ্তিং মাতি কাষ্ঠাকলাদিভিঃ॥ ১১-১৩

উক্ত শ্রুতি অনুভবের প্রতিটিকে ডাকিয়া মহামায়া বলিতেছেন:—আমায় ছাড়িয়া কোন পরিমাপাদি করিও না (মা মাসীঃ); আমাতে অন্বিত হইয়া—আমিই সব বাক্য এবং অর্থে এবং প্রত্যয়ে আছি—এই নিশ্চয় বোধে সঙ্গাতি লাভ কর (সঙ্গাচ্ছথাঃ)। জানিও যে—আমার এই 'মহামায়া' নামটি মহাপূর্বক 'মায়া' ইতি এবং 'অ-মায়া' ইতি এই দুই রূপেই অন্বয় হইয়াছে। যেটি অমেয় তার মানদাকে যদি বলা যায় 'মায়া' (এর পরেই 'মায়া' সূত্র আছে), তবে আপন পরব্রহ্মভাবের ভূমাদিমান আমা হইতে, ভগবত্তারূপ পরমমানও আমা হইতে। কিন্তু, নিখিল মানদা আমার নিজের মান কে দিবে? এইজন্য বলা হইতেছে—স্বতঃ শুদ্ধ নিরঞ্জন যে ব্রহ্মবস্তু তিনিও মায়োপহিত হন, কিন্তু মহামায়া কদাপি উপহিতা বা উপাধিযোগ্যা হন না। ('নোপাধেয়া') কেন? উপাধিরূপা মায়া যে তাঁরি আপন কলা; যেটি পূর্ণ ও সর্ব, সেটি আপন কলাদ্বারা ব্যাপ্ত হয় কি প্রকারে? (স্বকলাব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ)। 'মহামায়া' নামটির অক্ষরসমূহকে এইভাবে বিশ্লেষণপূর্বক প্রণিধান কর। স্পর্শবর্ণগুলির যে অন্তিম বা শেষ স্পর্শ (স্পৃশং অন্ত্যাং) সেটির, (মকারের) যিনি মানদা (যা মাতি), প্রাণসমূহের শেষশক্যতা, অর্থাৎ মহাপ্রাণবর যে 'হ' কার তারও তিনি মানদা; স্বরবর্ণ সমূহের মধ্যে যেটি ব্যাপ্তির শেষ বা পরিসীমা দেখায়, সেই 'আ' স্বর, সেটিরও তিনি মানদা।

CC0. In Public Domain, Digitizaqtion by eGangotri

এইভাবে, ম+হ+আ+মা+য়া=মহামায়া। কেবল বর্ণের দিক্ দিয়া নয়, পরন্তু 'স্পর্শ', 'স্পৃক্', 'প্রাণ', 'স্বর'—এগুলি আরও সূক্ষ্মভাবে লইয়াও 'মহামায়া' নামটিতে ধ্যান দিও। যেমন—যৎকিঞ্চিৎ মাত্রা, কিনা বহিঃকরণ এবং অন্তঃকরণকে স্পর্শ করতঃ সাড়া দেয়, তাদের সীমা কতদূর অবধি, অস্পর্শ বা স্পর্শাতীতটি কি এবং কোথায়?—এইটি হইল সূক্ষ্ম স্পর্শমানতা; তুরীয়ে কোন স্পর্শ নাই, কিন্তু সুষুপ্তিতে? শুদ্ধ নিরঞ্জনে স্পর্শ নাই, কিন্তু ভগবত্তায়? এ সবের নিরূপিকা নিয়ামিকা মহামায়া।

পুনশ্চ—

মাতি যা মিমীতে চ মায়তে বাপ্যমানগা।
পরস্মৈ চাত্মনে বাপ্যভ্যাসেন সকৃৎ স্বয়ম্॥
অস্পৃগ্ব্যাপ্তিঞ্চ মর্য্যাদাং স্পৃশাং চ স্বে মহিম্নি যা।
বিনাঽবিনেতি ভাবৌ চ সমাপয়তি সর্ব্বথা।
মেত্যমেতি চ পূর্ণে কা নেতিতা বাপ্যনেতিতা॥
যৎসাম্নাং শান্তিপাঠেঽস্তি 'মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'।
'মা মা ব্রহ্মেতি' তত্রৈব মহামায়েতি মন্ত্রিতম॥
মায়াভির্মা তু মা মাসীর্মাতু মাতুর্মহাদয়া।
'মা মা' ইতি মহামায়া মাময়তে মনুস্বরাৎ॥ ১৪-১৭

'মা' এই ধাতুর ত্রিবিধরূপেও মহামায়া রহিয়াছেন। প্রথম অদাদি পরস্মৈপদে—মাতি। এতে কি সূচিত হয়? মহামায়া স্বয়ং যদিও অমানগা (মানগম্যা নহেন), তথাপি অপর কিছুর নিমিত্ত (যথা, জীবাদি সৃষ্ট পদার্থ) তিনি ব্যবহারিক মান দেন (পরস্মৈ মাতি)। হ্বাদি আত্মনেপদে মিমীতে। এখানে বিধিমত ধাতুর অভ্যাস হইয়াছে। এতে কি বুঝায়? মহামায়া স্বয়ং অমানগা রহিয়াও আপনাকেও বিবিধ মান দেন, এবং মানেরও মান (যথা পালয়িতা বিষ্ণু, তাঁর শক্তি বৈষ্ণবী, তাঁর আয়ুধ শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ; ইত্যাদি) দেন (অভ্যাসাৎ)। শেষ, দিবাদি আত্মনেপদে—মায়তে। এতে বুঝায় যে, বিশ্ব ব্যবহারে মান বহুধা 'অভ্যস্ত' হইলেও এক মৌলিকমান (সেই তাঁর একটি কটাক্ষেই) নিখিল মান বিতানে চলিতেছে। যথা, 'ওম্' বা 'মা'—এতে

নিখিল সমর্থমান দেওয়া রহিয়াছে বটে, তথাপি সাধন ভজন ব্যবহারে 'ওম্ ওম্ ওম্'—বা 'মা মা মা—'এইভাবে সেটির অভ্যাস বা আবৃত্তি হইয়া থাকে। 'মা' ধাতুর ঐ তিনরূপে সমগ্র মানতত্ত্ব (Principle of measure and definition) রূপ পাইয়াছে জানিও। অথচ গোড়ায় মান, মেয়, মাতা তিনিই মিলাইয়া ঐ এক 'মা'।

আচ্ছা 'মা মা' এই অভ্যাসরূপটি ভাবনা কর। 'ম' স্পর্শবর্ণবর্গের অন্তিম বর্ণ। এর দ্বারা মাত্রাস্পর্শাদি সকল স্পর্শের শেষের উদ্দেশ হয় (যথা প্রণবে—অউম)। উদ্দেশ হয় বটে, কিন্তু কতদূরে সে শেষটি এবং কি সে শেষটি? সে খোঁজ তো রহিয়া যায়। তাই অর্দ্ধমাত্রা 'মা' উদ্বুদ্ধা হইয়া 'ম' কে তার 'মর্যাদা' দান করেন—নাদ-বিন্দু-কলায় বিস্তার করেন। 'আ' এই স্বর 'ম' তে যুক্ত হইয়া এই মর্যাদাটি দান করিল। কিন্তু নিখিল স্পর্শের পারে যে অস্পৃক্ ('অম') তার সর্বতোব্যাপ্তি (Total Immanence and Absolute Transcendence), এ দুইই না মেলান পর্যন্ত নিরতিশয় পর্যাপ্তি নেই। তাই, অপর 'আ' স্বরে আসিল এই পরমা ব্যাপ্তি। তা হইলে মন্ত্রটি হইল এইরূপঃ— 'মাঽমা'! সুতরাং প্রণবের সাতটি পাদই মহামায়ার 'মা' অথবা 'মাঽমা' এই পরম রহস্য নামে মিলিত হইয়াছে। 'ম' কে এইরূপ মর্যাদা এবং ব্যাপ্তি দুই মানই দান করিয়া মহামায়া 'স্বে মহিম্নি' বিরাজিতা আছেন। এই 'মহিম্নি' থেকে 'মহা'টিকে দোহন কর; মাঝখানে পাইয়াছ স্বয়ং 'মা'। শেষে দাও—'যা', যিনি।

যদি বল, 'মা' নিষেধাত্মক অব্যয় যদি হয়, তবে? তাতেই বা কি হানি? সেরূপ হইলে, মা=নিষেধ, নেতি। অমা=অনিষেধ, অনেতি। একটি বিনাভাব, অপরটি অবিনাভাব। এ দুটিকে মহামায়া তাঁর পরম পূর্ণতায় সর্বথা সমাপ্ত করিয়াছেন (সমাপয়তি সর্ব্বথা)। নিষেধ এবং নির্দেশ (negation and affirmation)—দুইই সে পরমপূর্ণতায় যেন বলে—এই আমার শেষ, আমার সীমা, আমার চরমতা ও পরমতা। যথা—প্রপঞ্চোপশমরূপ তুরীয়ে যাইয়া বহিঃপ্রজ্ঞাদি সব প্রপঞ্চই বলে—আর না, একবারেই না। এইটি নেতিধারার বা ক্রমের চরমতা। আবার প্রপঞ্চোপশম তুরীয়ও যেন বলে—বহিঃপ্রজ্ঞাদি সব প্রপঞ্চেই আমি আছি, আমি অধিষ্ঠানভূত না থাকিলে তোমরা কেহই নাই। (এমন কি আকাশকুসুমাদি কল্পনাতেও নাই)। অবিনাভাবেরও চূড়ান্ত। সুতরাং পূর্ণ নিষেধ এবং পূর্ণনির্দেশ একত্র। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ, এইরূপ

'নিত্যযুগল' লইয়াও সত্তা, প্রকাশ এবং রস এই তিনভাবেই নিষেধ-নিদেশের ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি ভাবনা করিও।

এ স্থলে প্রসঙ্গের অনুসরণ করিব না। কেবল, জপের দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিব। বৈখরী জপ নাদবিন্দুতে লীন হইয়া নেতি। বৈখরী জপেও দেখি (ক্বচিৎ অনুভবেও পাই)—যে নাদ অস্তি। (বিন্দুর সূক্ষ্মতায় সহসা অবগাহনটি ঘটে না)। নাদ হয় জ্যোতির্লীন, জ্যোতি হয় রসসরণিতে রসলীন, রস হয় যুগললীন; তদুত্তরে অব্যক্তাদ্বৈতলীন এবং পরমলীন। এ সকল পর পর ভূমিতে-নেতি অনেতিতার (negation and assertion-এর) অন্যোন্যতা (mutual implication) এবং আপূর্যমাণতা (increasing fulfilment) সন্ধান করিও। এ দুয়ের পরস্পর অপেক্ষা যেমনধারা চলিতেছে, তেমনি আবার দেখি—দুইই (নেতি ও অনেতি) আপনাদিগকে শুদ্ধ করিতে করিতে অন্তে এক পূর্ণ 'নিরপেক্ষ' (Absolute) এ যাইয়া সমাপ্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল—'মেত্যমেতি (মা+ইতি+অমা+ইতি) চ পূর্ণৈকা নেতিতা বাপ্যনেতিতা।' এ জপ দৃষ্টান্তের বিস্তারও এস্থলে হইল না।

যদি বল একটি 'মা' নিষেধাত্মক অব্যয়, অপরটি অস্মদ্‌শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের পদ, তাহা হইলে সামবেদীয় প্রসিদ্ধ শান্তিপাঠটি ভাবনা কর। 'ওঁ আপ্যায়ন্তু' ইত্যাদি। উহাতে আছে—'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।' এ মন্ত্রে যে দুইবার মা মা সহকারে, 'মা মা ব্রহ্ম' ব্যাহৃত হইলেন, তিনি মহামায়ার মান্ত্রবর্ণিক রূপ—তত্রৈব মহামায়েতি মন্ত্রিতম্। ঐ 'মা মা' মহাবীজদ্বয় বহুধা ভাবিত হইয়াছে। যদি এ স্থলে বল—একটি হোক্ 'না', অপরটি হোক্ 'আমার', তবে এইভাবে ভাবনা কর:—তোমার অশেষ কুহক কুশলিনী মায়াদ্বারা (মায়াভিঃ) আমায় যেন মৃষা মান দিও না (মা তু মা মাসীঃ)। তোমার যে পরমাশ্চর্য দয়া (মহাদয়া এ শব্দটি হইতে 'মহা' এবং 'য়া' আহরণ কর), সেই দয়া দিয়াই আমায় মাতৃমান দাও। (মাতু মাতুর্মহাদয়া)। মাতুর্মান মিলিলে যে অঘটনটি ঘটিবে তা এই—'মা মা' এই মহামন্ত্রের ডাকে (মনুস্বরাৎ) মহামায়া আমাতে আসিবেন (মাময়তে)। গীতার সেই—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' ভাবনা কর। কঠশ্রুতির 'যমেবৈষবৃণুতে' ইত্যাদি। 'আমাতে আসেন' মানে? 'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্'—সবই ঔপনিষদ ব্রহ্ম এই পরম অনুভূতি দান করিয়া। সবই 'মা,' সবই তিনি—এই পরম উপলব্ধিতে লইবার দুইটি 'সরণি' তিনি

ধরাইয়া দেন—জ্যোতি এবং রস, শেষে মিলিয়া এক। পরম সরণির শরণাগতের যে মান, সেটি মাতুর্মান। এই মাতুর্মান মিলিলে যাতুধান পালায়। অতঃপর, প্রণবে 'মা' এই মহামনুটিকে এইভাবে উদ্ধার কর।

প্রণবস্যাক্ষরে আদ্যে মকারং বিশতঃ পরম্।
নাদবিন্দুকলাব্যাপ্তি 'র্মা' ইতি চাকলাতিগম্॥
তারবীজস্য বীজত্বমেকাক্ষরং মহামনুম্।
সতারং কেবলং চাপি 'অউও' পূর্ব্বকং শ্রয়েৎ॥
হেতি মেতি বিশেদাদ্যং মায়েতি পরমং বিশেৎ।
ন জহাতি মামায়াতি তচ্চ তৎ পরমে স্থিতম্।
একং দ্বে ত্রীণি বা মেতি সংখ্যাযোগবিয়োগদম্॥ ১৮-২০

'অউম'—প্রণবের এই তিন অক্ষরের আদ্য দুইটি (অউ) পরের যে মকার তাতেই প্রবেশ করিতেছে, (ব্যাহরণ করিয়া দেখ)। কিন্তু প্রায়শঃ যে ব্যাহরণ এই 'ম'তেই যেন শেষ হইয়া যায়। কিন্তু অর্দ্ধমাত্রা প্রসন্না হইয়া কি করেন? ঐ 'ম'কে নাদবিন্দুকলায় বিস্তার করেন। সে বিস্তারের সীমা (মর্যাদা) কতদূর অবধি? আকলাতিগ—কলাতীত অবধি। এই বিস্তার এবং পরিসীমা সম্ভাবিত হয় 'ম'তে আ স্বর যুক্ত হইয়া, অর্থাৎ 'মা' এইরূপে। সুতরাং এক 'মা' এই নামে প্রণবের সপ্তপাদ সম্পুটিত। সভক্তি ব্যাহরণে, ধ্যানরসে এবং ভাবালোকে সেটিকে ফুটিতে দাও।

তারবীজের ও বীজত্ব যাহাতে নিহিত, সে একাক্ষর মহামন্ত্র ('মা') তারসহ ('ওঁ মা'), অথবা কেবল, অথবা 'অউও' এই তিনটি স্বর আদিতে লইয়া আশ্রয় কর। 'অ-মা', 'উমা', 'ওমা'—এই তিনটি মিলিল। প্রণবের হেলায় অথবা ত্যাগে এই একাক্ষরবীজ বিহিত হয় নাই। বাগ্‌দোহ যে প্রণব, সেটি পুনশ্চ দোহনে এই একাক্ষরী। সুতরাং প্রণবজাপক প্রণবের পূর্বোক্ত দোহনেই এই একাক্ষরীকে মিলাইবেন। পক্ষান্তরে, ভাবভক্তিসহ 'মা' নামটি গ্রহণে প্রণবও যেন সসম্ভ্রমে বলেন—এই তো আমি ব্রহ্মের বাচকরূপে আছি, তুমি আমার দোহনে যেটি সার (নাদ-বিন্দু-কলা) এবং সারাৎসার (কলাতীত), সেটি স্বচ্ছন্দে লাভ কর। অপরাপর

বীজের বা নামের সঙ্গে প্রণবের সম্বন্ধটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। দেখিব যে—'তারা' এবং 'রাধা' এই নাম দুটির, ওঙ্কারকে শক্তিখ্যাতি এবং রসখ্যাতির পরিসীমায় লইতে অসামান্য উপযোগিতা। ইহাও দেখিব যে—প্রত্যেক অক্ষর, নাম, বীজ, ইত্যাদির যেমন এক সাধারণী অশেষ অর্থ-প্রত্যয়শক্যতা আছে, তেমনি আবার অসাধারণী শক্যতাও আছে। এই শেষোক্তটি আবার, উদ্ভাবনী (What is patent or actually manifesting), সম্ভাবনী (What is latent) এবং পরিভাবনী (completely manifest) রূপে ত্রিবিধ।

তারপর 'মহামায়া' নামটিও যে কিভাবে 'মা' নামে সম্পুটিত হইতেছে, তাও দেখ। ঐ নামে যেটি 'হা' সেটি আদিতে যে 'ম' তাতে প্রবেশ করুক্ (হেতি মেতি বিশেদাদ্যং)। আর পরবর্তী যে 'মায়া' বা 'মা+যা' সেটি পরের 'ম'তে (পরমং) প্রবেশ করুক্। 'মা+যা' এর মাঝে এক লুপ্ত 'আ' অপিহিত আছে, সেটি অপাবৃত হউক। পাইলাম 'মা'। এখন 'হা' ধাতু=ত্যাগ; 'যা'=গমন চলিয়া যাওয়া। 'আ' পূর্বক হইলে হয় আসা, কাজেই মহামায়া নামের পূর্বরূপ সঙ্কোচ-প্রসারের (গুপ্ত আ বর্ণের প্রসার) প্রসাদে ভাব দাঁড়াইল এইরূপ:—তৎ—সেটি (ঐ নাম) আমায় (মাম্) ত্যাগ করে না (ন জহাতি); আমাতেই—আমার পূর্ণ স্বরূপখ্যাতিতেই—আসিয়া থাকে (মামায়াতি); এবং আসিয়া সেটি পরমেই স্থিতি লাভ করে। একবার দুইবার তিনবার 'মা' নাম গ্রহণে কি হয়? সংখ্যামৈত্রের যোগ, সংখ্যাবৈরের বিয়োগ এবং (অন্তে) সংখ্যাশঙ্কাপনয়নরূপ পরম অভয়টি মিলিয়া থাকে। অর্থাৎ একবারে সংখ্যামৈত্র যোগ, দুইবারে সংখ্যাবৈর বিয়োগ, তিনবারে সংখ্যাশঙ্কা বিয়োগ।

অতঃপর, দেবীসূক্ত, পুরুষসূক্ত এবং রাত্রিসূক্ত—এই সূক্তত্রয়ী যে কিভাবে পরব্রহ্মের ভগবত্তারূপ মহামায়াতত্ত্বে নিবিষ্ট, সেটি নিম্নের এই তিনটি কারিকায় বলা হইতেছে:—

এতাবতঃ স্ত্রিয়াং পুংসি মহিনা মহিমেতি চ।
পরং স্ত্রী চ পুমান্ ব্রহ্ম দেবীসূক্তে চ পৌরুষে॥
যা 'ব্যখ্যদায়তী' রাত্রি 'র্জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।'
'মা মে' তি স্তোমমস্যৈ মা 'উপ মা পেপিশৎ তমঃ।'

'র' ইতি যচ্চ তার্ত্তীয়ং মত্রীতি যৎ তুরীয়কম্।
রাতি তার্ত্তীয়শেষাদ্ বাহ্ 'মর্ত্ত্যা' দুহিতা দিবঃ॥
ত্বংস্বাহেতি তথা দেব্যা যয়েতি চণ্ডিকাস্তবে।
নমো দেব্যৈ তথা মাতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরে দ্বয়ম্।
সূক্তানি যানি চত্বারি তান্যত্রৈবাসতৈকতঃ॥ ২১-২৪

দেবীসূক্তে আছে—'এতাবতী মহিনা সম্বভূব', আর পুরুষসূক্তে—'এতাবানস্য মহিমা'. 'এতাবৎ' শব্দটিকে প্রথম সূক্তে স্ত্রী, দ্বিতীয় সূক্তে পুংরূপে লওয়া হইল। পরব্রহ্ম স্বয়ং যেন একবার স্ত্রী, একবার পুমান্ হইতেছেন। পরমপুরুষ, পরমা প্রকৃতি—এ দুয়ের তত্ত্বতঃ অভেদভাবনা করতঃ এই মূল স্ত্রী-পুমান্ যুগলকে ধ্যান করিও। তা হইলে, যিনি ভগবান্ তিনিই আবার ভগবতী, অথবা যিনি ভগবতী তিনিই ভগবান্ এই পরম-সমীকরণে কোনরূপ 'সমীহ' হইবে না। আমাদের ব্যবহারে এবং ব্যবহারিক ভাবনায় যে 'স্ত্রী-পুমান্ আকৃতি' (sex pattern), সেটার এক মূল এবং শুদ্ধ আকৃতি অবশ্যই আছে। আর সেটা, অস্মদাদির এই জড়ীয় শোধনের ফলে লব্ধ একটা কল্পিত ভাব বা আদর্শ মাত্র নয়। মূলে মহামায়া অথবা পরব্রহ্মের ভগবত্তা স্বয়ংই এই মূল শুদ্ধ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছেন ('স্ত্রী চ পুমাংশ্চ বভূব'—অতীতের প্রয়োগে এটিকে কালের সম্বন্ধে ফেলিও না)। মূলে তত্ত্ব যে শুধু সৎস্বরূপ এবং প্রকাশস্বরূপ এমন নয়, সেটি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ; রস বা আনন্দই 'অস্তি' ও 'ভাতি'। কিন্তু রস বা আনন্দের স্বরূপেই যেমন একটা অব্যক্ত অথচ পরম স্বলসিতভাব আছে, তেমনি তার 'স্বভাবে' অশেষ উল্লাস-বিলাসে লীলায়িত হইবারও একটা ধ্রুব এবং ধারা—এই দ্বিবিধ অশেষ অসীম মধুমত্তা আছে। রসে বা আনন্দে এই শুদ্ধ পরমতা এবং অশেষ অসীমতা একত্র হইয়াছে। রসের এবম্বিধ অভাবনীয় পূর্ণতার প্রকটন, পরিশীলন, এবং পরিপূরণ সম্পূরণ মূল যুগলতত্ত্বে। তাই না—'উমাশঙ্কর,' 'সীতারাম,' 'রাধেশ্যাম'! আনন্দের শুদ্ধ স্বলসিত পরমতাটি অব্যক্ত—অবাঙ্মনসগোচর। পরম তুরীয়। মুখ কেহ চাপিয়া না ধরিলেও আপনা থেকেই বন্ধ হইয়া যায়! মন বলে—ওথা মোর মানা। আনন্দ নিজ সত্যেও অনন্ত, জ্ঞানেও অনন্ত। সে আনন্ত্যের আর প্রকটন পরিশীলনাদির অপেক্ষা নাই। মহাসিন্ধু

মেঘমালা রচনা করিয়া আর তাকে বলে না—ওগো! তুমি রিমি ঝিমি বরিষণে আমার এই 'অতৃপ্ত' বুকে নব নব পুলকের শিহরণ জাগাও তুমি কোন চিরবিরহী যক্ষ বঁধুয়ার দূতীয়ালি করিয়া ছুটিয়া যাও ঐ অভ্রভেদী গিরিবরের নিরালা সানুনিকুঞ্জে, বিরহবিধুরা তন্বী প্রিয়ার নিভৃত মরমী সম্ভাষে! আর সেথা হতে শত নির্ঝর-সরিদ্‌ধারায় চিরমিলনবিরহের দরদী বারতা বয়ে আবার ছুটে এস—ভরে দাও, নিতি নব স্বাদু রসে ভরে দাও আমার এই চির আপুর্যমাণতায় অধীর উদ্বেল অগাধ অসীম অশ্রুনিবিড় লবণাম্বুরাশি! বিশ্বে যত না মধু, যত না সঙ্গীত, যত না কাব্য—তারা কিন্তু শুদ্ধ স্বলসিত পরম অব্যক্ত আনন্দের মৌন সমাধি ভঙ্গো ওই বাণীটি শোনার জন্য চির-উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে। তাই, 'রসো বৈ সঃ' পরম মৌনের মাঝ থেকেও বাণী ফোটে—'ন স বৈ রেমে'! এই রস আর রম এ দুয়ে মিলিয়া মূল যুগল—'স্ত্রী চ পুমাংশ্চ।' রস আর রম এ দুটিকে শুদ্ধি এবং পূর্ণতার পরিসীমায় পাইলে হয়—পরম যুগলতত্ত্ব। 'আ' বর্ণ যদি ব্যাপ্তি এবং পরিসীমা দুইই নির্বহণ করে, তবে পাই—'রাস' ও 'রাম'।

এ সব দ্বৈতের কথা, সুতরাং 'মিথ্যা' এ বলিয়া অহেতুক ভক্তরসিককে—যুগলরসের কাঙ্ক্ষিত-ভিখারীকে, তোমার সত্যের খাসমহল থেকে তাড়াইতে ব্যস্ত হইও না। তুমিও এটা জানিয়া রাখিও যে—পরম যে তুষ্ণীম্ সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত যত কিছু বোঝাপড়া, বলাকওয়া, তাতেই দ্বৈত বা দ্বৈতলেশ! এমন কি, 'এক' 'অদ্বিতীয়' 'তুরীয়' ইত্যাদি বলাতেও তাই। আর বোঝায় এবং বলায় যদি দ্বৈতলেশটুকু রাখিতেই হয়, তবে শুকনো নীরস রস না রাখিয়া সেটাকে স্বরূপরসের 'মধু দিয়া' বেশ করিয়া 'মাড়িয়া' রাখ না কেন! তোমার ঐ 'ননুর' অন্তহীন শ্রান্ত বিচারের 'ইতিশেষঃ' করিয়া একটিবার বল না কেন—কৈ, 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্' তো তর্কে বহুদূরই থেকে গেল। বিজ্ঞেয় যে আত্মা, তাকে তো নেতিকরণে দূরীকরণই হইল! নিদিধ্যাসনে বসি—অরূপ বোধের আলোক অপরূপ আস্বাদের পুলকে মিলিয়া হোক্—ধ্যানরস। রসের মণিকোঠায় বিচারের ঐ 'ননুর' বদলে প্রাণের তন্ত্রীতে নববোল বাজুক্—'তুঁহুঁ বিনু'। তুঁহুঁ—ভগবান্, শ্যাম-শ্যামা, শিব-রাম। 'ননু চেৎ, ন' হোক্ 'বিনু চিত, ন'। শুধু কথার ভেল্কি খেলা নয়। জ্যোতি আর রসের দুটো ধারা পাশাপাশি চলিতেছে—কখনও বা লুকোচুরিও করিতেছে। পরিশেষে, অখণ্ডৈকরস ভূমা—পরমাব্যক্ত অভিন্ন জ্যোতীরস। আর ভক্তরসিক!

তোমার যুগলটি যাতে ঐ অখণ্ডৈকরস ভূমায় 'গলিয়া' না যায়, তার নিমিত্ত, ভেদ, ভেদাভেদ, ইত্যাদি বাদে বিব্রত হইয়া মূলে (রসে) 'বাদ' যাইও না। মনন বিচারের, খণ্ডনমণ্ডনের, সিদ্ধান্তস্থাপনের যথাযোগ্য উপযোগ, বুদ্ধির আপন শুদ্ধি আর সেটি রক্ষার 'চাহিদা মিটাইতে' অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু আপন সীমানার প্রান্তে তাকে ক্ষান্ত হইতে দিতে হইবেই। অন্যথা—পরমে গতিটি নাই।

সূক্তদ্বয়ের 'এতাবতী' এবং 'এতাবান্' এই পদ দুটি লইয়া পরব্রহ্মের ভগবত্তায় যুগলতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিল। ভজনের ও জপধ্যানাদি সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক যে আন্তর 'আবহাওয়া' সেটি সৃষ্টি করা এবং বজায় রাখা হইল উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়-সম্মত ক্রমে অথবা অন্যপ্রকারে সূক্ষ্ম যৌক্তিক-বিচার এখানে অভিপ্রেত নয়। তারপর রাত্রিসূক্ত। পূর্ব দুই সূক্তে ('মহিনা' ও 'মহিমা') মহামায়ার অসীম মহিমার রূপ. 'ন হা মা' এই শব্দে মধ্যে যে 'আ' সেটি, আপনাকে স্বপ্রকাশ ও স্বলসিত অব্যক্ত পরমতা থেকে অভিব্যক্ত বা বিকাশের পরমতায় নিবার নিমিত্ত 'ই' (গতি) হইতেছে। 'য ঈং শৃণোত্যুক্তম্'। রাত্রিসূক্তে রাত্রিকে 'দুহিতুর্দিবঃ—দ্যৌঃ এর দুহিতা বলিয়া ডাকা হইল। দুহিতা মানে মেয়ে? যিনি দোহন করেন। দ্যৌঃ যদি গাভীরূপে কল্পিতা হন, তবে রাত্রি দুহিতা তাঁর দুটি বৃন্তে দোহন করেন দুটি বিপরীত বস্তু—তমঃ এবং জ্যোতিঃ—অন্ধকার ও আলোক।

প্রাণ ও জড়তা, বিদ্যা ও অবিদ্যা। তমঃ আকারে যেটি 'দুগ্ধ' সেটি আবার 'পেপিশৎ তমঃ'। 'পেপিশৎ' মানে (ভাষ্যকৃতের মতে)—ভৃশং পিশৎ, সর্ব্ববস্তুষু আশ্লিষ্টম্। নিখিল বস্তুতে আশ্লিষ্ট এই যে তমঃ (জড়তা, অজ্ঞান), তাকে রাত্রি 'জ্যোতিষা বাধতে'—জ্যোতির দ্বারা তার জড়তা-অন্ধতা অপনোদিত করেন। শুধু নৈশ অন্ধকারে সব যেন ডুবিয়া আছে; চাঁদিনী রাতি সে অন্ধকার সরাইয়া নিতেছেন—এই মানে করিয়াও 'বাস্' করিও না যেন। যিনি রাত্রি তিনিই 'মুখ ফিরাইয়া' আবিঃ। দ্যৌঃ—এটি সব বিপরীত দোহনের সামগ্রী—অগ্নি ও সোম দুটি তত্ত্বেরই আকর বস্তু, The Grand Matrix of all manifested polarities। রাত্রিই আদি দুহিতা (সৃষ্টিসূক্ত ভাবনা কর); ঊষা তাঁর আবার দুহিতা। সুতরাং এ আদিমা রাত্রি স্বয়ং একান্ত-অখ্যাতিরূপা নন (খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই ইনি দোহন করেন)। সূক্তের গোড়াতে 'ব্যখ্যৎ' পদটি বুঝিয়া লইও। অতএব, রাত্রিসূক্তের রাত্রি মহামায়া

থেকে অভিন্না। মহারাত্রি, মোহরাত্রি, কালরাত্রি—এ সব তাঁর রূপ-নামান্তর। রাত্রির যে স্তোম বা স্তব উদ্‌গীত হইতেছে, তাতে মহামায়ার ঐ রাহস্যিক নাম 'মা মা' রহিয়াছে, 'তমসঃ পরস্তাৎ' উত্তরণের তরে সেই নাম যথাযথভাবে আহরণ করিয়া লও। যথা—'উপমা পেপিশৎ তমঃ'—আমার 'সমীপে' অথবা 'উপাধি'রূপে যে 'পেপিশৎ তমঃ', সেটিকে তুমি পরম প্রকাশরূপে 'মা'—নিষেধ-বাধিত কর। জপে প্রণবাদির যে বিন্দুলীনতা (স্ববীজ ইব পাদপঃ), সেটিকে রাত্রি বলা হইয়াছে। সেখানে আসিয়া 'শয়ীথাঃ'—শয়ন করিও, কিন্তু তমসায় নয়, রসোজ্জ্বল আন্তর চেতনায়। রাত্রি তোমার নিমিত্ত জ্যোতির্দোহন করুন।

তারপর, রাত্রি=র+অত্রি। এটি আগে একভাবে বিবেচিত হইয়াছে। এখানে এইভাবে লও। আকাশ, বায়ু, অগ্নি (রং), আবার, বিলোমে ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি। অগ্নি বা 'র' হইল তৃতীয়। লক্ষণায় র=তার্ত্তীয় বা যৎকিঞ্চিৎ তৃতীয়তা সম্পর্ক বিশিষ্ট। যেমন, অ, উ, ম—এই তিনমাত্রার যেটি শেষমাত্রা। বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞের যেটি তৃতীয়, ইত্যাদি। অত্রি=তিনের অতীত, তুরীয়, যথা, অমাত্র। সুতরাং, প্রণব ত্রি-মাত্রা+অমাত্র=রাত্রি। পূর্ণ ওঁঙ্কার। অথবা, হ্রীঁ আদি বীজ। শেষেরটায়, হর্‌ঈম্ প্রকট; কিন্তু অর্দ্ধমাত্রা, যিনি নাদবিন্দুকলাক্রমে কলাতীতে লইবেন, তিনি রাত্রি-রূপা হইয়া ঐ, তৃতীয় মাত্রার যেখানে শেষ, সেখান থেকে পরে আর সবই তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁকে প্রসন্ন করিতে হইবে, কেন না, ঐ অর্দ্ধমাত্রা বা ভগবানের যোগনিদ্রারূপা রাত্রিই 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।' তাই কারিকায় বলা হইতেছে—রাত্রি (উদ্ধার করেন) তার্ত্তীয়শেষাদ্ বা। তার্ত্তীয় (ঈম্) যেখানে শেষ হইল, সেখান থেকেই তাঁর উদ্ধরণ। 'রাত্+র্+ই' এইরূপ আকৃতি ধারণ করেন। রাত্রি তাঁর 'রাতি' ক্রিয়ার কুক্ষিতে ঐ তার্ত্তীয় শেষটিকে (র্) গ্রহণ করেন। ফলে, 'ঈম্'তে আসিয়া যে অগ্নি 'ম' তে নিবিয়া গেল মনে হইল, সেটিকে অর্দ্ধমাত্রারূপা রাত্রি 'অগ্নিগর্ভা শমীব' আপন গর্ভে ধারণ করিলেন—নাদাদিরূপে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির নিমিত্ত। জপপক্ষে এই তার্ত্তীয়শেষ বুঝিলে, অপর স্থলেও যথাযথ বুঝিও।

শেষে, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে চারিটি মহাস্তবরূপ চারিসূক্ত রহিয়াছে সে চারিটিও মহামায়া-তত্ত্বেই পর্যবসিত তা বলা হইতেছে। 'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা' ইত্যাদি

যোগনিদ্রাস্তব—রাত্রিসূক্ত। 'দেব্যা যয়া ততমিদমাত্মশক্ত্যা' ইত্যাদি কাত্যায়নী সূক্ত। 'নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ' ইত্যাদি দেবীসূক্ত। 'প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য' ইত্যাদি নারায়ণী সূক্ত। এক মহামায়াতে এ চারি সূক্তই 'একত্রাসতে'। উক্ত রাত্রিসূক্ত হইতে 'হা' (স্বাহা)। কাত্যায়নী থেকে 'য়া' (যয়া)। দেবীসূক্ত থেকে ম (নমো)। এবং নারায়ণী থেকে 'মা' (মাতঃ)। এই চারিটি পরমাক্ষর সন্দোহফলে পাইলাম— 'মহামায়া'। অর্থ ভাবনার দিক্ দিয়া তো কথাই নেই!

উপরের কারিকাগুলিতে পূর্ণ-পরম মহামায়াতত্ত্বের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়া হইল। অগাধ রহস্যবারিধির বেলাভূমিতেই তো আমাদের 'বেলা' ও 'বলা' ফুরাইল! বেদ, তন্ত্র, পুরাণাদি প্রতিটি অক্ষরে সেই ক্ষররহিতা অক্ষরমাত্রে পরিপূর্ণশক্তি ভাবরসবৈভবা মহামায়াই ভগবত্তারূপে যে সমুদীরিত হইয়াছেন, তাতে সংশয়াবকাশ তো নেই! অক্ষর ও বর্ণ তো যিনি বিশ্বভুবনের 'প্রাণের প্রাণ,' তাঁরই প্রাণন, তাঁরই 'নিঃশ্বসিতম্'। সব কিছুই আপনাতে স্বীকার, অঙ্গীকার ('own') করাই হইল প্রাণের স্বভাব। ব্যবহারে সে অঙ্গীকার উপাদেয় অথবা হেয় আকার ধরিলেও আসলে সেটি অঙ্গীকার। প্রাণ পরার্দ্ধ যোজন ব্যবধানে নীহাররেণুটিকে বলিবে না—তুমি আমার আপন নও, পর, বাহ্যবহিরঙ্গ! এই সামগ্রিক অন্তরঙ্গাভাবই প্রাণের স্বভাব। সুতরাং অক্ষর ও বর্ণেরও তাই স্বভাব। এক একটি অক্ষরে, বর্ণে নিখিল (universe) তার সমগ্র সত্তা, শক্তি, আকৃতি ও ছন্দঃ 'দহরমানে', (as a 'monad', microcosm) নিপুটিত (enfolded) করিয়া রাখিয়াছে। তার যেটি ব্যক্ত বিশিষ্ট রূপ গুণাদি (manifested specificity), সেটা তো দেশ, কাল, পাত্রের সম্পর্কে কেবলি বদলাইতেছে। সেটা 'ছবি', ছায়ারূপ। একটা অন্তহীন বিশ্বরীলে তার সমগ্র বিবর্তনটি জড়ান আছে। আর সে অন্তহীন রীল মহামায়ারই দেশ-কাল-নিমিত্তরূপ বলিয়া তাতে ভূত-ভব্য, দূরান্তিক, হেতু-হৈতুক সমস্ত ক্রিয়াকারকফলসমষ্টি পূর্ণভাবেই জড়ান আছে। এখানে এই পার্থিব রেণুতে যেটি ভূত, ওখানে ঐ নীহাররেণুতে সেটি ভব্য, এখানে যেটি দূর, ওখানে সেটি অন্তিক; এখানে যেটা হৈতুক, ওখানে সেটা হেতু।

আমি ছবি দেখিতেছি। আমার এই দেখারূপ কর্মের পিছনে 'অদৃষ্ট' (veiling vital) যেমন বর্তমান, যে দেখাইতেছে, তার পিছনেও সেটি বর্তমান; আমারটিকে

বলা হোক—V, আর ওরটিকে বলা হোক্—V, আমাতে যেটা বর্তমান দেশ-কালসম্বন্ধে 'সম্ভাব্য', আর ওতে যেটা 'সম্ভাব্য'—তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষায়—Potential. এই পোটেন্শিয়ালদ্বয়ের বিভিন্নতা এবং অনুপাতের উপর নির্ভর করে—ওতে আমাতে লেন-দেন ('give and take') কারবারটা কিভাবে কতটুকু হইবে, না হইবে, এবং ফলে ওর কতটুকু আমি কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লইব, আর ওই বা কার্যতঃ আমার কতটা স্বীকার করিয়া লইবে। মহামায়ার Cosmic Bank এ সবারই unlimited deposit; তবে Cosmic Currency আর Exchange-এ কেউ নগণ্য অধমাধম অধমর্ণ, কেউ বা মহামহিম মহিমার্ণব উত্তমর্ণ। এই কারবারি মাপটি আসিতেছে মহামায়ার মায়া থেকে, যে মায়ার কথা পরের সূত্রে বলা হইবে। একটা জড়রেণুকেও তার নিরেট অণুত্বের মাঝে বন্দী করিয়া রাখার বাতিক বিজ্ঞানও ছাড়িয়া দিয়াছে। আর, অক্ষর বা বর্ণ, যেটি প্রাণের সাক্ষাৎ ক্রিয়ারূপ, তাকে এক একটা আড়ষ্ট আকৃতিতে (rigid, inflexible pattern-এ) পুরিয়া রাখিবে কে?

প্রাচীন নিরুক্তি নিঘণ্টুকারেরা (বৈদিক ও তান্ত্রিক) তাই বর্ণসমূহকে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা কোনদিক্ দিয়াই অকারণ কুণ্ঠিত করেন নাই। যথা, 'সমুদ্র' শব্দে আকাশ, পরমাত্মা আরও কত না মানে আসিয়াছে ও আসিতে পারে। এই বর্ণমূল ও বর্ণরসায়নের কথা আমরা আগে কিছু বলিয়াছি; পরেও বলার আশা রাখি। মূলে প্রাণ ব্রহ্ম-স্পন্দ। এর বিপুলতা ও সূক্ষ্মতার অন্ত নেই। 'অ' বা 'ক' বর্ণ উচ্চারিত হইলে এই ব্রহ্মস্পন্দকে বিশেষ কোন আকৃতিতে মাপিয়া 'এতটুকু' করিয়া লইবার এক অদৃষ্ট-সংস্কার আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। এটি মায়া। মায়া 'মিমীতে'। মায়া বলিয়াই এটা সমগ্র, শুদ্ধ, ধ্রুব খ্যাতি নয়, তা না হইলেও, এ মায়ার মূলে আছেন মহামায়া। কাজেই, যে বিশেষ পরিচ্ছিন্ন আকৃতিটি মিলিতেছে, সে আকৃতির 'নাভিতে' সেই বিন্দুবাসিনী বিন্দুরূপা হইয়া রহিয়াছেন। কাজেই, 'ক' এই বর্ণের হরণ বা শূন্যতা যেমন দেখিতেছি, তেমনি আবার ইহাতে অপর সব কিছুর পূরণ ও পূর্ণতাও (আমার বর্তমান অদৃষ্ট-সংস্কারে অব্যক্তভাবে) বিদ্যমান, ইহা ভাবিতেও উৎসাহ পাইতেছি। মধ্যমায় অভিব্যক্ত যে 'স্ফোট', তার কথা, এখানে তুলিলাম না। এই দৃষ্টিতে 'মহামায়া', 'রাত্রি' ইত্যাদি শব্দের খনিগুলি হইতে কেবলমাত্র প্রচলিত অর্থ ছাড়া যদি অন্য অর্থও তুলিয়া থাকি, তাতে তত্ত্ব, তথ্য,

ঐতিহ্য কোনও দিক্ দিয়াই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইল না। তবে, কোনও অর্থ আবিষ্কারে পূর্বোক্ত নৈর্লক্ষ্য, বৈলক্ষ্য, অপলক্ষ্য বর্জন করতঃ সংলক্ষ্য বৃত্তিতায় স্থিত হইতে হইবে।

পরমবিদ্যা, মহাবিদ্যা, শ্রীবিদ্যা ইত্যাদি-রূপিণী মহামায়াতত্ত্ব অতঃপর কতিপয় মহাবীজরূপেও ভাবনা কর। সমগ্রতা, পরমতা এবং সকল-নিষ্কলতা—মুখ্যতঃ এই তিনভাবে মহামায়ার ব্রহ্মত্ব ভাবিত হইয়াছে। এই ত্রিবেণী সম্মিলনে তাঁর পূর্ণতা, এটিকে এক ত্রিকোণ চিন্তা কর। সামগ্র্য (as seamless whole) হইল ঐ ত্রিকোণের ভূমি (base), সাকল্য (perfect Immanence) হইল একটি ভুজ; নৈষ্কল্য (perfect Transcendence) অপর ভুজ; আর, এই দুই ভুজের শীর্ষে যে মিলন বিন্দু (vertex) সেইটি হইল পারম্য (as Supreme Absolute)। ত্রিকোণটিকে ধ্যানে 'সঙ্কুচিত' করিয়া পারম্যে সমর্পণ কর। পাইলে, পরমবিন্দু। সামগ্র্যরূপ ভূমিটিকে (এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুজদ্বয়কে) অনন্তবৎভাবে প্রসারিত কর। পাইলে, পরম নাদ। আর যে অচিন্ত্যা কলনশক্তিতে ব্রহ্মত্বের এই মূল ত্রিকোণাকৃতি হইয়াছে এবং পরমবিন্দু ও পরমনাদ এই পরাকাষ্ঠায় যেটি 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' হইতেছে, সেটিকে বল—পরমকলা। 'ন বৈ রেমে। সোহকাময়ত।'—পরমাকলার এই মূল কামরূপা আকৃতি (কামাখ্যা) হইল—কামকলা। সব সৃষ্টির মূলাধারে (Primal Base-এ) এই আকৃতিটি হইল 'মূলশৃঙ্গাট' বা 'মূলশৃঙ্গাটক'। যে কোনও বীজমন্ত্র বা যন্ত্র (যথা শ্রীযন্ত্র) এই নাদবিন্দুকলারূপা মূল আকৃতিরই এক মূল সাঙ্কলিক রূপ। যথা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি এটমের দৃষ্টান্ত সর্বত্র। গণিতেও Base, Index, Coefficient, সর্ববিধ বিকাশ পরিণতিতে Presentation, Movement, Veiling (PMV), তল, লম্ব, বেধ, ইত্যাদি। ঐ ত্রিতয়কে আড়ষ্টভাবে না লইয়া ঋধ্যমানতা (as continued function) রূপে লও। পাইলে, অর্দ্ধমাত্রা। অর্দ্ধমাত্রার 'মা' মন্ত্ররূপা, 'ত্রা' যন্ত্ররূপা, কেন, তা পরে দেখিব। প্রণবে 'অ' ভূমি, 'উম' দুইটি ভুজ, অর্দ্ধমাত্রা শীর্ষবিন্দু।

হ্রীমিতি বীজমাদ্যস্য ক্লীঞ্চ পরমতা মনুঃ।
শ্রীঁ ঐঁ সাকল্য-নৈষ্কল্যে ব্রহ্মণ্যে প্রণবঃ স্বয়ম্॥ ২৫

সমগ্রতার বীজ হ্রীঁ। এই বীজটিকে সহগ করিয়া অন্য সব কিছুর যেটা আপন কার্যকরীশক্তি (kinetic energy), সেটা আদিশক্তি ভাণ্ডার (Primary Power Plenum) থেকে অপরিসীম শক্তি আহরণ করতঃ আপন ক্রিয়ায় এবং সামর্থ্যে সম্যক্ ও সমন্তাৎ 'অগ্রগা' হইতে পারে। মহাপ্রাণবর হ হইল ভূমি (base)। র-কার দ্বারা এই মহাশক্তি-সামান্যে (Equilibrated Power Continuum-এ) এক শঙ্খাবৃত্ত আবর্তন (spiral rotation) সম্ভাবিত হইতেছে। 'ঈ'কার উক্ত আবর্তনের অক্ষ। এই অক্ষের নিম্নের সীমা হইল 'হ' কারের অন্তঃস্থ (তলবৃত্তিতামাত্র সূচক) 'অ'; আর ঊর্দ্ধসীমা হইল অর্দ্ধমাত্রা (নাদ-বিন্দু-কলা)। আবর্তনে যে 'ঘন কোণ' ('cone') এর উদ্ভব হইয়াছে, সেটিকে 'ধন' এবং 'ঋণ' উভয়থা উদ্ভূত হইল মনে করিলে পাই সেই মূল শৃঙ্গাটকাকৃতি (Bi-Conic-Pattern)। উপরে এবং নিম্নে, এই ঘনকোণদ্বয়কে সপ্ত সপ্ত অবচ্ছেদে (সামতলিক) লইলে পাই ৭+৭ এই চতুর্দশ 'লোক' এবং মূল চতুর্দশ 'প্রত্যয়'। অবচ্ছেদে কৌণিকতা (eccentricity) থাকিলে উক্ত 'লোক' এবং 'প্রত্যয়' সমূহের বিবিধ 'ব্যাজ'। অবচ্ছেদে যদি একটা ত্রিভুজ পাও তো তবে তার ভূমি হইল 'হ'; 'র' ও 'ঈ' দুটি ভুজ; এবং নাদবিন্দু শীর্ষ। 'র' শ্রীঁ এই বীজে বিশেষভাবে, এবং 'ঈ' ঐঁ বীজে বিশেষভাবে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, দেখিও। বিশ্লেষণ আপাততঃ এইখানেই শেষ।

'ক্লীঁ' এই বীজটি পরমতার, বিশ্লেষণ আগে একভাবে হইয়াছে। অন্য ভাবেও হইতে পারে এবং হইবে। পরমতা বা Supreme Absolute এর ভূমিতে (পরম শ্রেষ্ঠতা এবং পরম নিঃশ্রেয়স বা কৈবল্য দুইভাবেই) আরুরুক্ষুর পক্ষে এই বীজ পরম কামদ। পরম রসবস্তুকে নিত্যরাসরূপে বিলসিত করিতে, এবং সেটিকে আবার আপন অস্তিতা-ভাতিতায় কেবল স্বলসিত করিতে—এই উভয় লক্ষ্যেই 'ক্লীঁ' এই বীজের শক্যতাপর্যাপ্তি জানিও।

'শ্রীঁ' এবং 'ঐঁ' বীজদ্বয়ের সাকল্য এবং নৈষ্কল্যে সবিশেষ উপযোগ। বীজদ্বয় ব্যাহরণপূর্বক প্রাণনাকৃতিটি লক্ষ্য কর। স্বরের মধ্যে সে স্বগত-উদ্‌বর্তন বৃত্তিটি (Basic self-evolving function) নিহিত, সেটি বিশেষভাবে 'ঐঁ' এই বাগ্‌ভবে পরিস্ফুট। আদি বাক্ বা স্বর 'অ' থেকে এই বাগভবের উদ্ভবরেখা (generating curve) লক্ষ্য কর। প্রথম অ+ই মিলিয়া 'এ' স্বর, সেই স্বর আপনাকে দীর্ঘ

(অভীপ্স) করিয়া লইল। যেন কোনও নির্দ্দিষ্ট তলজ্ঞাপক এক সরলরেখা আপন তল হইতে আপনাকে মুক্ত করার গতিটি (ই) মিলাইল। বলিল—যে তলে আছি, সে তলে আর থাকিব না। আমাকে এই লক্ষ্যবিন্দুর দিকে চলিতে দাও। ফলে, তলস্থিত রেখাটির ঘটিল—উচ্ছূনভাব—Swell. শিষ্যে এইটি দেখা যায় আগ্রহরূপে। কিন্তু তলের 'পাশ' (gravitational moment) তো সঙ্গে-সঙ্গে কাটে না। কাজেই মিলে এমন এক বক্ররেখা (curve), যেটা উঠিতে যাইয়া বার বার তলের টানে তলের পানেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এটি হইল 'এ' স্বর। কিন্তু তলবৃত্তিতার 'ঝোঁক'টি কাটাইবার নিমিত্ত ঐ 'এ' কারের দীর্ঘত্বের প্রয়োজন হয়। 'এ' ও 'ঐ'—এ দুটি স্বর উচ্চারণ করতঃ পরীক্ষা কর। 'এ' তো উচ্ছূনতা অর্বাঙ্‌মুখী = যেমন Earth হইতে যে কোন projectile এর। সেটি Parabola ভঙ্গিমায় আবার ভূপতিত হয়। কিন্তু projectile এর সম্বেগ একটা 'মেরু' পার হইলে, সেটি আর ভূপতিত না হইতে পারে। 'ঐ' স্বর উক্ত বাধক মেরুটি কাটাইবার পথটি মিলায়। এই দীর্ঘতা শিষ্যের বা সাধকের দিক থেকে আপন আগ্রহের তীব্রতা ('দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য-সৎকারাসেবন'), আর গুরুর দিক থেকে সাধিষ্ঠ অনুগ্রহশক্তির অবতরণ। এর প্রসাদে 'ই' কারের তলবৃত্তিতার পাশমুক্তি সম্ভাবিত হয়। এইজন্য বাগ্‌ভব বিশেষতঃ গুরুবীজ। প্রণবে 'ই' স্থলে 'উ'। 'ই' বিশেষতঃ লম্ববৃত্তি, আর 'উ' বিশেষতঃ বেধবৃত্তির সূচনা করে (পরে ইহা বিশেষ করিয়া দেখিব)। যে কোন বীজকে প্রণব সহিত করিলে, এই বেধবৃত্তির সাধিষ্ঠতা অর্জিত হয়; নাদবিন্দুরূপা যে অর্দ্ধমাত্রা তাঁরও সাক্ষাৎ উপযোগটি (direct intimate appropriation) ও সহজ হয়। এ প্রসঙ্গেরও অনুসরণ এখানে আর নয়।

'শ্রীঁ' বীজ সকল কলায় এবং সকল সুষমায় ফোটাইয়া তোলায় সাধিষ্ঠ। 'অ' স্বরটি 'যে কোনও' তল নির্দেশ করে; 'ত' বর্ণটি কোনও নির্দিষ্ট তল; 'শ' (তালব্য) মহাপ্রাণতার উর্দ্ধতল (higher plane of Pranik Function)। 'র' এবং 'ঈ'কে পূর্ববৎ ভাবনা কর। যেমন গণিতে Sin A একটা Function. এটি শূন্য ডিগ্রী থেকে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ অথবা বামাবর্ত্তে ৩৬০° ডিগ্রী অথবা যে কোনও অভীষ্ট ডিগ্রী পর্যন্ত আবর্তনে যে 'মান'গুলি ধনে ঋণে পাই, এবং বেশ এক সুষম আকৃতিতেই পাই,—এই 'শ্রীঁ' বীজেরই সংখ্যান সম্বন্ধীয় উদাহরণে।

এইরূপ জপকে যদি একটা function বল, আর ব্যক্তভাবে জপকে (কেবল বাচিক নয়) যদি বল 'ধন', অব্যক্তকে 'ঋণ', তবে ঐ 'শ্রীঁ' বীজই সে জপকে, বৈখরীর বাচিক উপাংশু, মানস; মধ্যমার অবর-বর দুই সন্ধিসহ সেতু এই তিন স্থলে; পশ্যন্তীর বিভিন্ন 'লোকে' এবং 'পরায়',—তৎতৎ তল বা ভূমির উপযোগী আকৃতিতে ও ছন্দে, 'ধনে' ও 'ঋণে' কলায় কলায় ফুটাইয়া লইতেছে। 'শ্রীঁ' ছাড়া বিশ্বে কোথাও বা কিছুতে শ্রী নেই। সৌষ্ঠব সুষমা নেই, ছন্দঃ নেই। সুদূরবর্তী কোন নক্ষত্র হইতে আমাদের পৃথিবীতে কোন রশ্মিরেখা সূর্যসন্নিকট শূন্যপথে আসিতে আসিতে যদি 'বেঁকিয়া বসে' তাতে বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া শ্রীহানি হইল ভাবিয়া বিব্রত হইও না। যাকে মহাশূন্য মনে করিতেছ, সে যে পরমাশ্রীর চরণাঙ্কের 'আলপনা' দিয়ে এমন চিরচিত্রিত যে, সে আলপনার মর্যাদা যদি ঐ সুদূরের যাত্রী রশ্মি-রেখাটিকে ভুলেও ভুলিতে দাও, তবে সে বিশ্বে ওতপ্রোতা যে মহালক্ষ্মী তিনি হইলেন মহাশূন্য অথবা খামকাখেয়াল! ফলকথা প্রত্যেকটি মহাবীজ সৃষ্টির সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট এবং উদাহৃত। কেননা, মহামায়াই এই মহাবীজরূপা। নাম ও নামী মূলে যে এক। বিশেষের বিচারে কোন শক্তি (ক্রিয়া-জ্ঞান-ভাব) সংগ্রহ, সমূহ এবং সমিদ্ধ করিতে 'হ্রীঁ' বীজের সবিশেষ উপযোগ; আকৃতি-ছন্দঃ প্রভৃতিতে বিষমতা (শ্রীহানি) নিবারণে 'শ্রীঁ' বীজ; অর্বাক্-পরাক্-তলবৃত্তিতা কাটাইবার জন্য ঐঁ বীজ; এবং যোগে জ্ঞানে ভক্তিতে ইষ্টে পরমাবিষ্টতার নিমিত্ত ক্লীঁ বীজ কেবল অথবা প্রণবসহ সমাশ্রয়ণীয়।

কারিকাটির শেষপাদে প্রণবকে ব্রহ্মণ্যবাচক বলিয়া শেষ করা হইয়াছে। সুতরাং, সপ্রণব হ্রীঁ, শ্রীঁ, ঐঁ, ক্লীঁ।

বিষ্ণুমায়া সমগ্রস্য সাকল্যে যোগপূর্ব্বিকা।
নৈষ্কল্যে নিজমায়া চ 'মা যে'তি দ্ব্যর্ণ বারণাৎ॥
সর্ব্বসাং মর্য্যাদামাতৃ মহামায়েতি তুর্য্যগম্॥ ২৬

সমগ্রব্যাপিকা সম্বন্ধে বিষ্ণুমায়া; সাকল্যের (নিখিল কলায় বিকাশ এবং আস্বাদের) পরিপূরয়িত্রী যোগমায়া; নৈষ্কল্যে নিজমায়া (সেখানে পরমবস্তুটি যেন বিষ্ণুমায়া এবং যোগমায়া দুইকেই ডাকিয়া বলেন—'মা যা'—নিবৃত্ত হও।

যোগমায়াসমাশ্রিতা রাসলীলা অন্তে ভগবান্ তাঁর নিজ অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তিটিকে লইয়া, ‘অন্তর্দ্ধান’ করিতেছেন। কোথায়? তা কে বলিবে? যোগমায়াকে যেন বলিতেছেন—তুমি ঐ রাসমণ্ডলেই থাক, আর সঙ্গে যেও না। জ্ঞানীর যে ব্রহ্মাকারা চরমাবৃত্তি, তাতেও ঐ চরম কথা দুইটি—‘মা যা’। জপে পশ্যন্তীপারে পরায় কি হয়?)। যাই হোক্, এ সকলেরি মর্যাদামাতৃ ‘তুর্য্যগম্’ (তুরীয়,—যেটি সকল মায়াকেই বলে—তোমরা আমার দেওয়া মর্যাদাতেই নিখিলের ‘মান’ দিয়াছ এবং নিরস্তও হইয়াছ, কিন্তু এই দেখ আমি পূর্ণ পরম মহিমায় আছি) তত্ত্বটি কি? ‘মহামায়েতি’।

ক্ষরাক্ষরা চ সামগ্র্যে সাকল্যেঽপ্যক্ষরক্ষরা।
নৈষ্কল্যেপ্যেক্ষরা যোনিঃ পারম্যে যোনিরুত্তমা॥ ২৭

সামগ্র্যে যাহা ক্ষরা এবং অক্ষরা দুইই; সাকল্যে নিখিল ক্ষরেও যেটি অক্ষরা (যথা পূর্বোক্ত শ্রীরূপে—as Harmony Relation); নৈষ্কল্যে যেটি নিখিলক্ষরের আধারভূতা অক্ষরা যোনি; এবং শেষে পারম্যে যেটি ‘যোনিরুত্তমা’—সেই মহামায়া এখানে কথিতা হইতেছেন। গীতায় ব্রহ্মের ভগবত্তা যেভাবে ‘পুরুষোত্তম’রূপে কথিত হইয়াছেন; এস্থলে সেই ভগবত্তাই (লিঙ্গাদিনিরপেক্ষভাবে) ‘যোনিরুত্তমা’ বলিয়া কথিত হইলেন। আবার নৈষ্কল্যস্থলে যে আধারভূতা অক্ষরাযোনির কথা হইল, সেটিকে কেবলমাত্র ‘অজামেকাং লোহিত-শুক্লা-কৃষ্ণাং’ শ্রুতির মত গুণময়ী, গুণাত্মিকা, অক্ষরা ভাবিও না। সেটি গুণাশ্রয়া, গুণাতীতাও বটে। (প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীকালিকাষোড়শীর শেষ শ্লোকটি ধ্যান কর)।

ব্যক্তাব্যক্তব্যঞ্জনাদ্যে সাকল্যে নিত্যব্যঞ্জনা।
নৈষ্কল্যে ব্যঞ্জনাব্যক্তাঽত্যাশ্চর্য্যব্যঞ্জনাঽন্তিমে॥
আপূর্ণতা সমগ্রা যা সকলা পরিপূর্ণতা।
সম্পূর্ণতা চ নৈষ্কল্যেঽন্তিমে পূর্ণাচ্চ পূর্ণতা॥
আদ্যে পরাপরে দ্বে স্তঃ সাকল্যে চ পরোর্জিতা।
নৈষ্কল্যে চ পরাব্যক্তা পরমা প্রকৃতিঃ স্বয়ম্॥ ২৮–৩০

CC0. In Public Domain, Digitizaqtion by eGangotri

সৃষ্টিতে ব্যক্তাব্যক্তাদি যে সব ভাব দেখা যাইতেছে, তাদের সঙ্গে সামগ্র্যাদি মহামায়ার ঐ চারিটি 'ভাব'কে মিলাইয়া দেখা হইতেছে। মহামায়ার সমগ্রতাভাবে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই ব্যঞ্জনাই (meaning, import) রহিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্ত (সৎ) এবং অব্যক্ত (অসৎ) দুই লইয়া তিনি সমগ্রা। সাকল্যে সকল কিছু নিত্যব্যঞ্জনা (as perfectly and eternally realised) রূপে অবস্থিত। স্থিতিরূপ (সত্যম্) এবং গতিরূপ ('ঋতম্') সাকল্যভাবে নিজেদিগকে পুরাপুরি মেলিয়া ধরিয়াছে। নৈষ্কল্যে যেটি ব্যঞ্জনা সেটি অব্যক্তা (শুদ্ধ অস্তিতা ভাতিতারূপেও বটে, আবার বিশ্বাতিগারূপেও বটে,—as transcending whatever is manifested or manifestable) শেষে, যেটি অন্তিম, অর্থাৎ পারম্য, সেটি অত্যাশ্চর্য ব্যঞ্জনা। সে ব্যঞ্জনা কোনরূপ সংজ্ঞা, লক্ষণ বা বিবৃতির মধ্যে আনা যায় না। এইরূপ, সমগ্রতা হইল বিশ্বে সর্বতঃ আপূর্ণতার ভাব। এইটিকে লইয়া বিশ্বে সমস্ত কিছু ব্যাপ্তি এবং সীমা (বা কাষ্ঠা) অভিমুখে 'আপূরিত' হইতেছে। কোথাও স্তব্ধতা (staticity) নেই, সর্ব্বত্র আপূর্যমাণতা (dynamic fulfilling)। সকলতা হইল পরিপূর্ণতার ভাব। সমস্ত কিছুর (বস্তু, আকৃতি, শক্তি, ছন্দঃ) একটা নিত্য পরিপূর্ণতার ভূমি অবশ্যই আছে। সেই ভূমি থেকে ব্যক্তাব্যক্ত সব কিছুতে ঐ চারিটিরই নিরন্তর আপূরণ হইতেছে, ফলে কিছুই একান্তভাবে রিক্ত বা শূন্য হইয়া যায় না; বরং উন্মেষ-বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনাটি (unlimited possibility of increasing evolution) মিলায়। 'Cosmic running down'এ এটি 'সোম'। মহামায়ার এই সাকল্যভাবটি—বিশ্বের 'বীজমব্যয়ম্'। সাকল্যে যেটি নিত্যোদিতা পরিপূর্ণতা, ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বে তার দেশ-কাল-নিমিত্ত 'অবচ্ছেদে' (determinationএ) ক্রমিক আংশিক প্রকাশাদি (gradual and partial representation) হইতেছে। মূল presentationটি 'Idea' ('কল্পনা' নয়), আর এটি হইল—Event. যে কোন event-এর যে পূরা ব্যঞ্জনা (complete meaning and perfect reason) তার মূলে যে Idea, তাতেই আছে। তারপর নৈষ্কল্যে সম্পূর্ণতা (Perfectly Equilibrated Wholeness or Absolutely Quiescent Wholeness)। 'সর্ব্বতঃ স্পৃষ্টা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্', 'একাংশেন স্থিতং জগৎ'—ইত্যাদি; আবার, 'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যঃ' ইত্যাদি। দুই ভাবের এই যে 'আতীত্য' (transcendence),

তাতে সম্পূর্ণতা এই লক্ষণটি যাইবে। অবশ্য ভাবান্তর (re-orientation of sense) করিয়া লইয়া। শেষকালে, যেটি মহামায়ার পারম্য, সেখানে 'পূর্ণাচ্চ' পূর্ণতা—যে 'পূর্ণমদঃ' মন্ত্র পূর্বে কথিত ও আলোচিত, সেই পরম ও আশ্চর্য পূর্ণতাই সেখানে সঞ্জাত। পুনশ্চ, সামগ্র্যে অপরা-পরা দুই প্রকৃতিই সংগৃহীত। সাকল্যে তদুভয়ই, 'পরোর্জ্জিতা'—নিরতিশয় উৎকর্ষে, মহিমায় ও সুষমায়, উর্জিতা। নৈষ্কল্যে, 'পরাব্যক্তা'—নিরতিশয়রূপে ব্যক্ত (মনসা বাচা) না হবার ('আতীত্য'কে আগের মত যে ভাবেই লও না কেন)। আর যেটি পরমা প্রকৃতি, সেটি তো মহামায়া স্বয়ম্। এটি 'কাজে লাগার' সময় (যথা, 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়') বিশেষণীভূতা হইয়া 'স্বা প্রকৃতি' ও হন। এই যুক্তবেণী' (স্+উ+আ) আবার 'মুক্তবেণী' হইয়া ত্রিধারায় (স্ব, নিজ, আত্ম) স্বব্যাপার নির্বহণে প্রবাহিত হন। এ প্রসঙ্গে পরে আসিবে।

সপ্তার্ণাদি-মনুস্ফোটং কাদি-হাদি-স্বরশ্রুতি।
উদ্গানং গীয়তে তস্যাঃ ষড়ধ্বাম্নায়সন্ততম্॥
কর্পূরাদৌ নবার্ণাদা-বর্ণারোহাবরোহতঃ।
আত্মবিদ্যে মূর্চ্ছয়ন্তী ধমতি শিবমূর্চ্ছনা॥
শিবশক্ত্যোঃ প্রকাশস্য বিমৃশে মৈথুনান্বয়-।
ব্যতিরেকোদয়াস্তাদি-স্পন্দ-বিস্পন্দ-তায়নম্।
ধীঃ কাপি কলয়েৎ তত্ত্বং ধীরেব কলনা স্বয়ম্॥
অষ্টাদশদশার্ণাদি বেণু-স্বারসিকস্বরা।
মদাসেবিতপাদাঙ্ক-প্রেষ্ঠালীবল্লভাধরা॥
অন্তরঙ্গান্তরাহ্লাদাকর্ষিকাকর্ষকো রসঃ।
ভগবতী স্বয়ং সৈব কৃষ্ণঃ স ভগবান্ স্বয়ম্॥৩১-৩৫

সেই মহামায়াই 'উদ্গান' রূপে গীত হইতেছেন। 'ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'—এইরূপ সপ্তার্ণাদি জনু নিত্য অব্যয় 'স্ফোট' রূপে সে উদ্গানের আধাররূপে বিদ্যমান। অর্থাৎ মনুর জপমননাদি হোক না হোক্, নিত্য স্ফোটরূপে সেটি বিদ্যমান

আছেনই। সঙ্গীতে যেমন কোন রাগ বা ছন্দের নিজরূপ। তন্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ কাদি-হাদি (ব্যক্ত, স্ফুটরূপে) হইল সে উদ্‌গানে স্বর এবং শ্রুতি। নিত্য স্ফোটের আধারে কাদি হাদি স্বরশ্রুতিবিন্যাস এবং বিতানটি ঘটে 'ষড়ধ্বা' 'ষড়াম্নায়' ইত্যাদি মার্গ এবং চর্যার পদ্ধতিক্রমে। এ স্থলে পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যাখ্যাত হইল না, তবে ষড়ধ্বা সম্বন্ধে আমাদের The Philosophy of the Tantra নামক নিবন্ধটি আলোচ্য। আচ্ছা, সঙ্গীতালাপে আরোহ-অবরোহ ক্রমে মূর্চ্ছনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানে? দ্বাবিংশত্যক্ষর (যথা, কর্পূরাদিস্তবে) মনু অথবা নবার্ণমনুতে বীজব্যূহের আরোহ-অবরোহ ভঙ্গীরূপ মূর্চ্ছনা দেখান হইয়াছে। প্রণবাদি একাক্ষরেও বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু, 'ক্ষণশয়ন'—ইত্যাদিরূপে মূর্চ্ছনা রহিয়াছে, তাও দেখিয়াছি। আচ্ছা, এ মূর্চ্ছনায় তত্ত্বতঃ কে বা কারা মূর্চ্ছিত হইল? আত্মতত্ত্ব এবং বিদ্যাতত্ত্ব—এ দুটিকে মূর্চ্ছিত করিয়া (মূর্চ্ছয়ন্তী) শিবমূর্চ্ছনা (অর্থাৎ শিবতত্ত্বের ইতর সর্ব্বতত্ত্ব-মূর্চ্ছনকৃৎ পরমতা) মহামায়ারূপে যেন স্বয়ংই পূর্বোক্তক্রমে নাদাদিধ্বনি করিতেছেন (ধমতি)। (সাধনের সন্ধানরূপে এই রহস্য কারিকাদ্বয়ে প্রণিধান করিও)। শিবশক্তি, প্রকাশ-বিমৃশি (বা বিমৃশ্)—এ দুয়ের 'মৈথুন' (মিথুনীভাব)—আসঙ্গাদি বশতঃ যে প্রাথমিক স্পন্দ (the Primordial Thrill of Cosmic Awakening), সে মূলস্পন্দের স্পন্দ-বিস্পন্দ-পরিস্পন্দ-প্রতিস্পন্দাদিরূপে 'তায়ন' বা বিস্তার হওয়া আবশ্যক এই বিশ্ববিপুল উদ্‌গানের নিমিত্ত। শুধু তাই নয়। স্পন্দসমূহের অন্বয়-ব্যতিরেক, উদয়াস্ত—এ চারিটি ভাবও থাকা চাই। মহামায়া স্বয়ং মিথুনীভূতা হইয়া এইভাবে নিজেকে স্পন্দবিস্পন্দতায়নরূপে দেখাইতেছেন। 'আনন্দ লহরী' প্রভৃতিতে বহুধা যেভাবে গীত হইয়াছে—কোন বুদ্ধি (ধী) তত্ত্বকে নিজেই এভাবে কলন করিবে? বুদ্ধি সে নিজেই যে তাঁরি কলনা!

আবার, তাঁকে স্বয়ং ভগবতী ও স্বয়ং ভগবান্ দুইভাবেই ভাবনা কর। শিবৈকতত্ত্বময় মূর্চ্ছনা স্থলে বেণুবাদনবিমোহন মূর্চ্ছনা। অষ্টাদশাক্ষর (গোপীজনবল্লভ) অথবা দশাক্ষর (যথা, ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ), ইত্যাদিই হইল বেণুর স্বরসাকর্ষক স্বর। অর্থাৎ আমার ঐ স্বরটি ঠিক ঠিক হইলে (ভাবে ও ছন্দে) বেণুর স্বরও স্বারসিক হইল। আমার ঐ মনুটিও যে বেণু! তিনি আপনি বাজান

তাঁর কানুর বেণু, আর আমার মত বেণুটিতেও বাজান তাঁর নাম বা মনুর বেণু। তাঁর আপন বেণুর স্বরে স্বারসিক করিয়া লন। আমার এবং তাঁর এই উভয় স্বররূপাই তুমি। আর আমি যে প্রেষ্ঠ গোপীজনের পাদাঙ্ক অনুগমনে তাঁরি সেবায় চলিতে চাই, সেই আমার প্রেষ্ঠালীবল্লভের অধরপুটরূপাও তুমি। এ দু'য়ে তোমাকে 'পরমা' রাসোজ্জ্বলারূপা পাইলাম। কিন্তু পরমরসোজ্জ্বলরূপে? যুগলরূপে? অন্তরঙ্গেরও আন্তর যে আহ্লাদ, সে আহ্লাদের আকর্ষিকা যে হ্লাদিনীর সার্ শ্রীরাধাতত্ত্ব, তাঁরও আকর্ষক পরমোজ্জ্বল রসস্বরূপ 'পুমান্' ও তুমি। অতএব, সেই পরমতত্ত্ব স্বয়ং যেমন ভগবতী, তেমনি তিনিই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ।

ভগবত্তাই মহামায়া, সুতরাং, এটা বহিরঙ্গাশক্তি, ছায়াশক্তি, ইত্যাদি ভাবিয়া এঁর স্বরূপে বিভ্রান্ত হইও না।

পূর্বখণ্ডের শেষভাগে 'তৎ' এবং 'সৎ' লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সে লক্ষণদ্বয় অবশ্য শুদ্ধ নির্বিশেষ ব্রহ্মত্বে নিরবকাশ নয়। শুদ্ধ নির্বিশেষ ব্রহ্ম লক্ষণাতীত হইয়াও একান্ত নৈকটিকভাবে ঐ দুয়ের দ্বারা লক্ষিত হয়েন। এরূপ লক্ষণকে পরমার্থতঃ লক্ষণীয়তা বলিয়া স্রষ্টৃত্বাদি অপরাপর লক্ষণ হইতে সরাইয়া রাখিতে পার। কিন্তু, সমগ্রত্বাদি ঐ চারিভাবে যে পরব্রহ্মের ভগবত্তা সূচিত ও কথিত হইল, তাতে ঐ লক্ষণদ্বয় 'সরাসরি' ও 'পূরাপূরি' (অর্থাৎ, কোনওরূপ ভাগত্যাগাদি না করিয়াই) সঙ্গত হয়। 'তৎ' সূত্রের 'হানোপাদানবিরহতা' নির্ব্যূঢ়ভাবে স্থিত; কিন্তু 'মায়া' এবং যৎকিঞ্চিৎ 'মায়াবিজৃম্ভিত' তাদের ক্ক স্থিতিঃ কা গতিঃ? শুদ্ধব্রহ্মের বাধ কোন কালাদিতে অবশ্যই সম্ভবে না। কিন্তু, এই যে রজ্জুসর্পটির বাধ হইল, সে বাধ কোথায়, কার? 'বাধমাত্র' বলিতে স্রষ্টৃত্বাদি।

স্রষ্টৃত্বাদি থেকে রজ্জুসর্প, স্বপ্ন ইন্দ্রজাল, বন্ধ্যাপুত্র, স্কোয়ার-ট্রাঙ্গল পর্যন্ত সবেরেই বাধ। এ সকল বাধেরই শুদ্ধ অস্তিভাতি ছাড়াও একটা যে কোনরকমের ঠাঁই যোগাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ তোমার দেওয়া আধার বা অধিষ্ঠানটি স্বয়ং শুদ্ধ-নির্ব্যূঢ় (Pure and Absolute) হইল বটে, কিন্তু সর্বাশ্রয়, সর্বভূতাধিবাস জগন্নিবাস (All-embracing Self-complete Background) হইল না। শ্রুতি এবং অনুভব দুই-ই তাই পরব্রহ্মকে নিরতিশয় শুদ্ধ এবং নিরতিশয় পূর্ণ ভগবত্তারূপে দেখিয়াছেন। এখানে আর বিচারে কাজ নাই।

আছেনই। সঙ্গীতে যেমন কোন রাগ বা ছন্দের নিজরূপ। তন্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ কাদি-হাদি (ব্যক্ত, স্ফুটরূপে) হইল সে উদ্‌গানে স্বর এবং শ্রুতি। নিত্য স্ফোটের আধারে কাদি হাদি স্বরশ্রুতিবিন্যাস এবং বিতানটি ঘটে 'ষড়ধ্বা' 'ষড়াম্নায়' ইত্যাদি মার্গ এবং চর্যার পদ্ধতিক্রমে। এ স্থলে পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যাখ্যাত হইল না, তবে ষড়ধ্বা সম্বন্ধে আমাদের The Philosophy of the Tantra নামক নিবন্ধটি আলোচ্য। আচ্ছা, সঙ্গীতালাপে আরোহ-অবরোহ ক্রমে মূর্চ্ছনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানে? দ্বাবিংশত্যক্ষর (যথা, কর্পূরাদিস্তবে) মনু অথবা নবার্ণমনুতে বীজব্যূহের আরোহ-অবরোহ ভঙ্গীরূপ মূর্চ্ছনা দেখান হইয়াছে। প্রণবাদি একাক্ষরেও বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু, 'ক্ষণশয়ন'—ইত্যাদিরূপে মূর্চ্ছনা রহিয়াছে, তাও দেখিয়াছি। আচ্ছা, এ মূর্চ্ছনায় তত্ত্বতঃ কে বা কারা মূর্চ্ছিত হইল? আত্মতত্ত্ব এবং বিদ্যাতত্ত্ব—এ দুটিকে মূর্চ্ছিত করিয়া (মূর্চ্ছয়ন্তী) শিবমূর্চ্ছনা (অর্থাৎ শিবতত্ত্বের ইতর সর্ব্বতত্ত্ব-মূর্চ্ছনকৃৎ পরমতা) মহামায়ারূপে যেন স্বয়ংই পূর্বোক্তক্রমে নাদাদিধ্বনি করিতেছেন (ধমতি)। (সাধনের সন্ধানরূপে এই রহস্য কারিকাদ্বয়ে প্রণিধান করিও)। শিবশক্তি, প্রকাশ-বিমৃশি (বা বিমৃশ্)—এ দুয়ের 'মৈথুন' (মিথুনীভাব)—আসঙ্গাদি বশতঃ যে প্রাথমিক স্পন্দ (the Primordial Thrill of Cosmic Awakening), সে মূলস্পন্দের স্পন্দ-বিস্পন্দ-পরিস্পন্দ-প্রতিস্পন্দাদিরূপে 'তায়ন' বা বিস্তার হওয়া আবশ্যক এই বিশ্ববিপুল উদ্‌গানের নিমিত্ত। শুধু তাই নয়। স্পন্দসমূহের অন্বয়-ব্যতিরেক, উদয়াস্ত—এ চারিটি ভাবও থাকা চাই। মহামায়া স্বয়ং মিথুনীভূতা হইয়া এইভাবে নিজেকে স্পন্দবিস্পন্দতায়নরূপে দেখাইতেছেন। 'আনন্দ লহরী' প্রভৃতিতে বহুধা যেভাবে গীত হইয়াছে—কোন বুদ্ধি (ধী) তত্ত্বকে নিজেই এভাবে কলন করিবে? বুদ্ধি সে নিজেই যে তাঁরি কলনা!

আবার, তাঁকে স্বয়ং ভগবতী ও স্বয়ং ভগবান্ দুইভাবেই ভাবনা কর। শিবৈকতত্ত্বময় মূর্চ্ছনা স্থলে বেণুবাদনবিমোহন মূর্চ্ছনা। অষ্টাদশাক্ষর (গোপীজনবল্লভ) অথবা দশাক্ষর (যথা, ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ), ইত্যাদিই হইল বেণুর স্বরসাকর্ষক স্বর। অর্থাৎ আমার ঐ স্বরটি ঠিক ঠিক হইলে (ভাবে ও ছন্দে) বেণুর স্বরও স্বারসিক হইল। আমার ঐ মনুটিও যে বেণু! তিনি আপনি বাজান

তাঁর কানুর বেণু, আর আমার মত বেণুটিতেও বাজান তাঁর নাম বা মনুর বেণু। তাঁর আপন বেণুর স্বরে স্বারসিক করিয়া লন। আমার এবং তাঁর এই উভয় স্বররূপাই তুমি। আর আমি যে প্রেষ্ঠ গোপীজনের পাদাঙ্ক অনুগমনে তাঁরি সেবায় চলিতে চাই, সেই আমার প্রেষ্ঠালীবল্লভের অধরপুটরূপাও তুমি। এ দু'য়ে তোমাকে 'পরমা' রাসোজ্জ্বলারূপা পাইলাম। কিন্তু পরমরসোজ্জ্বলরূপে? যুগলরূপে? অন্তরঙ্গেরও আন্তর যে আহ্লাদ, সে আহ্লাদের আকর্ষিকা যে হ্লাদিনীর সার্ শ্রীরাধাতত্ত্ব, তাঁরও আকর্ষক পরমোজ্জ্বল রসস্বরূপ 'পুমান্' ও তুমি। অতএব, সেই পরমতত্ত্ব স্বয়ং যেমন ভগবতী, তেমনি তিনিই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ।

ভগবত্তাই মহামায়া, সুতরাং, এটা বহিরঙ্গাশক্তি, ছায়াশক্তি, ইত্যাদি ভাবিয়া এঁর স্বরূপে বিভ্রান্ত হইও না।

পূর্বখণ্ডের শেষভাগে 'তৎ' এবং 'সৎ' লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সে লক্ষণদ্বয় অবশ্য শুদ্ধ নির্বিশেষ ব্রহ্মত্বে নিরবকাশ নয়। শুদ্ধ নির্বিশেষ ব্রহ্ম লক্ষণাতীত হইয়াও একান্ত নৈকটিকভাবে ঐ দুয়ের দ্বারা লক্ষিত হয়েন। এরূপ লক্ষণকে পরমার্থতঃ লক্ষণীয়তা বলিয়া স্রষ্টৃত্বাদি অপরাপর লক্ষণ হইতে সরাইয়া রাখিতে পার। কিন্তু, সমগ্রত্বাদি ঐ চারিভাবে যে পরব্রহ্মের ভগবত্তা সূচিত ও কথিত হইল, তাতে ঐ লক্ষণদ্বয় 'সরাসরি' ও 'পূরাপূরি' (অর্থাৎ, কোনওরূপ ভাগত্যাগাদি না করিয়াই) সঙ্গত হয়। 'তৎ' সূত্রের 'হানোপাদানবিরহতা' নির্ব্যূঢ়ভাবে স্থিত; কিন্তু 'মায়া' এবং যৎকিঞ্চিৎ 'মায়াবিজৃম্ভিত' তাদের ক্ক স্থিতিঃ কা গতিঃ? শুদ্ধব্রহ্মের বাধ কোন কালাদিতে অবশ্যই সম্ভবে না। কিন্তু, এই যে রজ্জুসর্পটির বাধ হইল, সে বাধ কোথায়, কার? 'বাধমাত্র' বলিতে স্রষ্টৃত্বাদি।

স্রষ্টৃত্বাদি থেকে রজ্জুসর্প, স্বপ্ন ইন্দ্রজাল, বন্ধ্যাপুত্র, স্কোয়ার-ট্রাঙ্গল পর্যন্ত সবেরই বাধ। এ সকল বাধেরই শুদ্ধ অস্তিভাতি ছাড়াও একটা যে কোনরকমের ঠাঁই যোগাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ তোমার দেওয়া আধার বা অধিষ্ঠানটি স্বয়ং শুদ্ধ-নির্ব্যূঢ় (Pure and Absolute) হইল বটে, কিন্তু সর্বাশ্রয়, সর্বভূতাধিবাস জগন্নিবাস (All-embracing Self-complete Background) হইল না। শ্রুতি এবং অনুভব দুই-ই তাই পরব্রহ্মকে নিরতিশয় শুদ্ধ এবং নিরতিশয় পূর্ণ ভগবত্তারূপে দেখিয়াছেন। এখানে আর বিচারে কাজ নাই।

২। সামগ্রীং মিমীত ইতি মায়া॥

যেটি মানার্হ, মানযোগ্য, মেয় নয়, সেই ‘সামগ্রী’ যাহাতে মানার্হ, মানযোগ্য, মেয় হয়, তাহা মায়া।

মানেন লক্ষণীয়ত্বং গ্রাহ্যত্বমপি তেন চ।
ব্যপদেশ্যত্বমেতেন সম্বন্ধাসঙ্গিতান্বয়ঃ॥
পাদস্য পদ্যমানত্বং মাত্রায়াশ্চ নিরূপ্যতা।
কাসস্থিতিশ্চ কাষ্ঠায়াঃ কলাকলনবৃত্তিতা।
চতুঃ সম্ভাবনাবীজং হ্রীমিতি চতুর্বর্ণকম্॥ ৩৬-৩৭

মহামায়া সূত্রে সমগ্র, সমগ্রতা, সামগ্র্য এই সকল শব্দ বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। মহামায়া স্বয়ং সর্ব-অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদাদি রহিতা অমেয়া (মহা+অমায়া) তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে সামগ্র্য-সাকল্যাদি চারিভাবে লইয়া একান্ত অবোঝার সামগ্রীকে বোঝাপড়ায় আনিতে গিয়াছি। Absolute Alogical যেন সাজিয়াছেন Perfect Logical. এ ‘সাজ’ অবশ্য তাঁরই। ধীবৃত্তির অতীত যে পরমতত্ত্ব, সেটি নিজেই পারীণা, ঋতম্ভরা-সত্যম্ভরা, বিশারদী প্রভৃতি ধীরূপে সমাধি-ধ্যান-ধারণা-মনন-ভাবনাদিতে নিজেকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সাজাইয়া গোছাইয়া দেখাইয়াছেন। বুদ্ধির ‘দেখাটি’ পাদমাত্রা কলায় কাষ্ঠায় হয় বটে, কিন্তু যে বুদ্ধি সমস্ত কিছুই সঙ্গতি-সমাবৃত্তি (co-ordination and synthesis) দেখে, সেই বুদ্ধিই তত্ত্বের সংবাদিনী, বিশারদী। আর, কেবল বিভাগ ও ব্যাবৃত্তিতে (division and separation-এ) দেখিলে ও লইলে, সে হয় বিসংবাদিনী, বিশিরণী। মহামায়া ‘তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ’—রূপে অস্মদাদির বুদ্ধিকে ঋতম্ সত্যমের ‘সংবাদে’, বিসংবাদে নয়, ‘প্রচোদয়াৎ’। বর্তমানসূত্রে সামগ্র্যাদি ঐ চারিটিকে ‘সংবাদে’ লইয়া বলা হইতেছে— ‘সামগ্রী’। সামগ্রীর তো স্বরূপতঃ মান নাই। এটির ‘মান’ দেওয়াই হইল ‘মায়া’। মহামায়া একান্ত স্বতন্ত্র তত্ত্ব। মায়া মহামায়ারই ‘তন্ত্র’ (Self-emanating Function)। এটিকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব অথবা শক্তি যেন মনে না করি।

এখন, মান ও মেয়তাকে সবিশেষ ভাঙ্গিয়া দেখ। এই মানের দ্বারা চারিটি মূল বৌদ্ধ ব্যাপার (Logical) সম্ভব ও নির্বাহ হয়। সব কিছু লক্ষণীয় বা লক্ষ্য হয় (definable); সব কিছু গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য হয় (cognisable); সব কিছু ব্যপদেশ্য (predicable) হয়; এবং সব কিছু সম্বন্ধ+আসঙ্গা (patent relation and latent affinity) –এর অন্বয়যোগ্য হয় (relatable and affiliable)। এগুলি মুখ্যতঃ বুদ্ধির 'ঘরওয়া' কাজ,—অর্থাৎ, বুদ্ধি কোন কিছু গ্রহণের পর 'নিজের মধ্যে' ফিরিয়া, 'আপন ঘরে বসিয়া' যেন এই কর্মগুলি করে। কিন্তু বাহিরে (মুখ্যতঃ objectively or self-projectively) আর চারিটি মূল মাপের কাজও সে করে—সেই পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠা। পাদের পদ্যমানতা (পূর্বখণ্ডে 'তপঃ এবং সত্যম্' সূত্রে আলোচিত) হয় যে মানে; মাত্রার নিরূপ্যমাণতা হয় যে মানে, কাষ্ঠার পূর্ণকাসমানতা হয় যে মানে, এবং কলার আকল্য-সঙ্কল্যাদি 'মানতা' হয় যে মানে, সেটিকে, বর্তমান লক্ষণানুসারে, মহামায়ার মায়া বলিয়া জানিবে। পাদাদির পূর্বে বহুলালোচিত ভাবার্থগুলি এস্থলে স্মরণ কর। কাষ্ঠার স্থলে যে 'কাস' সেটি বিকাশ অর্থে লইলে আপাততঃ চলিবে। ['ক'=ব্যঞ্জনমুখবর্ণ; এটিতে, কিনা, নিখিলব্যঞ্জনাবীজে যেটি 'আস্তে' (=আস) রহিয়াছে; অথবা, 'অস্যতে' (অস্)—নিজেকে ছড়াইয়া দিতেছে, উদার করিতেছে।] কাষ্ঠা মানে সীমা (Limit or Limiting Value)।

এখন দেখ আগের চারিটি (লক্ষণীয়াদি) এবং পরের চারিটি (পদ্যমানাদি)—এই চারিটি সম্ভাবনা বীজ হইল সেই সামগ্র্যবীজ হ্রীঁ। এর প্রসাদে যেটি সামগ্রীরূপে অমেয় এবং অব্যক্ত সেটি হয় সামগ্র্যরূপে (progressively measurable ad infinitum and actually realizable to the end)—ঋধ্যমান, সমৃদ্ধমান, সমর্থমান, পূর্ণমান ইত্যাদি; এবং অনুভূতির দিক থেকে পূর্বালোচিত সেই অনন্তবত্ত্ব-জ্যোতিষ্মত্ত্বাদি। হ্রীঁ এই বীজটিকে মায়াবীজও বলা হয়। হ, র, এবং চন্দ্রবিন্দু—এই চারিটি অর্ণ এতে মিলিত। 'হ' এ পদ্যমানতা, 'র' এ নিরূপ্যমাণতা, 'ঈ' এ কল্যমানতা, এবং চন্দ্রবিন্দুতে কাসমানতা বিশেষভাবে গৃহীত।

৩। অব্যবহারোঽমেয়ামানামিতস্য।।

যাহা অমেয়, অমান এবং অমিত তার ব্যবহার এবং ব্যবহারযোগ্যতা নাই॥

কর্ত্তৃকর্ম্মাদিনিস্পাদ্যা গতিস্থিতী ধৃতিস্মৃতী।
ক্রিয়াকারকফলত্বেন গচ্ছেয়ুর্ব্যবহার্য্যতাম্॥

কারকযজ্ঞরূপঃ কঃ ক্রিয়াগ্নিশ্চ ররূপকঃ॥
ফলায় যদভীপ্সত্বং স্যাদীবর্ণস্তদেব চ।
নাদো হোতা হবির্বিন্দু ক্রীমিতি হ্যখিলান্বয়ম্।
অযজমানযাজকো যাগো যাগায় চেজ্যতে॥৩৮-৪০

'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোঽধ্যজায়ত'—এই সৃষ্টিসূক্তের ভাবকথা পূর্ব-পূর্ব খণ্ডে সবিস্তার নিবেদন করা হইয়াছে। তপঃ নামক রহস্যব্যাপারটিকে উপলক্ষ্য করিয়া মূল তত্ত্বের 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপে 'অধিজাত' হওয়াই আদিব্যবহার (Primordial Creative Activisation)। আর, ঐ তপঃটি Primordial Creativity যদি বলা যায়; পুরুষাদি সূক্ত এবং উপনিষদাদি আদিব্যবহার আদি-যজ্ঞরূপেও ভাবিত হইয়াছে। যেটি একান্ত অমেয়, অমান সেটি সেভাবে ব্যবহারে আসে না; কেননা, ব্যবহার মানমেয়তা লইয়াই। যেটি অমিত, (যেমন অন্তরের কোনও অব্যক্ত বেদনা বা ভাব), সেটিও ঠিক তাই রহিয়া ব্যবহারার্হ হয় না। যেমন, সে ভাবটি যখন যতটা ধ্যানে, গানে বা কবিতায় ধরা দিয়া 'মিত' হইতেছে, (measured), তখন ততটাতেই তার ব্যবহার্যতা। জপে অক্ষরসমূহ যৎকালে নাদলীন হইয়া যায়, তখন তাদের ব্যবহার্যতা থাকে না। তারপর বিন্দুলীন, জ্যোতির্লীন, রসলীন ইত্যাদিতে আগের আগের কার ব্যবহার্যতা চলিয়া যায়। শেষকালে, সকল মান হারাইলে—পরমতুষ্ণীলীন। কাজেই, ব্যবহারে মানের হিসাব রাখিয়াই চলিতে হয়। ব্যবহারের আদিমরূপ যখন 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপে 'অধিজাত' হওয়া, তখন তাকে এক ধারারূপ (as Cosmic Flux) এবং এক ধ্রুবরূপ—(as Cosmic Constant) এই যুগ্ম আকৃতি ধরিয়াই চলিতে হয়। ধারায় অনুলোম-বিলোম, আরোহ-অবরোহ; আর ধ্রুবের দিক থেকে ধৃতি (Interiorization) এবং স্তৃতি (Exteriorization)। কোথাও কখনও বিন্দুবৎ হইয়া সব কিছু আপনার মধ্যে গুটাইয়া লয়; আবার কখনও কোথাও ঊর্ণনাভের মত বাহিরে সব বিস্তার করিয়া ধরে।

আচ্ছা, 'অধিজাত' হওয়া মানে কি? কোন কিছুর অধিকারে এবং কোন কিছু অধিকৃত করিয়া জাত হওয়া। যার অধিকারে, সেটি তো সেই আদিবস্তু এবং তার আদিতপঃ বা যজনেচ্ছা (যিযক্ষা)। আর যাহা সে অধিকৃত করে—সেটি সংক্ষেপে

ক্রিয়াকারক-ফল। ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় রাখে কর্তৃকর্মাদি যে ছয়টি কারক, সেই কারককে পূরাপূরি লইতে হইবে। নতুবা বিশ্বে গতি-স্থিতি-ধৃতি-স্মৃতি এই চারি আকারের যে মৌলিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তার নিষ্পাদ্যতা (নিষ্পন্ন হওয়া) নাই;—বিশ্বে সমষ্টি অথবা ব্যষ্টিতে, অণুতে অথবা মহানে, যাহা গতি-স্থিতি ইত্যাদিরূপে দেখা যাইতেছে। ক্রিয়াকারক নিষ্পাদ্য ফল; আবার নিজেরাও ক্রিয়াকারকরূপে ফলান্তর প্রসব করে। এইরূপে ক্রিয়াকারকফল চক্রনেমি ক্রমাগত ঘুরিতেছে।

এই চক্র কাটাইবার নিমিত্তই 'তারচক্র' 'জপযজ্ঞ' সমাশ্রয়ণীয়। আচ্ছা, কারকের মধ্যে প্রথমটিই হইল কর্তা। এ কর্তাটি আসলে কে? মূলে যে আসলেও সেই। কর্তা একেশ্বর। কাজেই, ভজিতে হয় সেই একেশ্বর কর্তাকেই ভজ; জপিতে হয় তো সেই একেরই নাম জপ। কর্তা বা কর্ত্রীটির একটি বীজনাম এখানে (ব্যবহাররূপ যাগ নিষ্পাদনে) বলা হইতেছে। কারকরূপ যজ্ঞবিতানে ('যজ্ঞেন যজ্ঞং বিতনুতে'), 'ক' এই বর্ণ আদিব্যঞ্জনরূপে 'কল্পিত' হইল। ক্রিয়ারূপ অগ্নি কল্পিত হইল 'র' বর্ণ দ্বারা। সেই 'মূলমালেক' (কর্তা) স্বয়ং এ কল্পনা করিতেছেন বুঝিও। তিনিই যজ্ঞ হইয়া যজ্ঞ বিস্তার করিবেন বলিয়া, ক্রিয়ার ফলোন্মুখীনতা। ফল প্রসবের নিমিত্ত যে অভীন্ধভাব, সেইটি হইল 'ঈ' বর্ণ। নাদ স্বয়ং হোতা, বিন্দু হবিঃ। মিলিল 'ক্রীঁ' এই বীজ—যে বীজে অখিল বিশ্বব্যবহার (সেই আদিম তপঃ এবং ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ গোড়ায় রাখিয়া) অন্বয় পাইয়াছে। এই অন্বয়কে ছন্দোরূপে ভাবনা কর (যেরূপ আগে করা হইয়াছে)। 'ক্রীঁ' বীজের ভুবনযজ্ঞ (তন্মধ্যে জপযজ্ঞও) রূপে বিতান প্রদর্শিত হইয়াছে এবং হইতেছে বটে, কিন্তু আসল মূলের মালিক বা মালিকানী 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'! কোথাই বা যজমান! কোথাই বা যাজক (অর্থাৎ কোথায় দ্বৈত)! অথচ কেমন দেখ না—যাগই যাগের জন্য নিজেই 'যাজিত' হইতেছে (যাগো যাগায় চেজ্যতে)! আদি যাগরূপে ঐ ক্রীঁ বীজ নিজেই কারকক্রিয়াফল। হোতৃ-হবিঃ-হবন এ সবাই আপনাতেই উদ্ভাবিত (evolve) করিতেছে। এ উদ্ভবে হোতা বা যাজকটি অথবা যজমানটিও আসল কর্তাটি নয়। নিয়োগে 'by delegation' কর্মকর্তা। সুতরাং ক্রীঁ কেবল মূল ব্যাপারের বীজ নয়, মূল ব্যাপারীর বীজ। 'ল' দিয়া এ বীজ 'ক্লীঁ'।

আগে উভয়-আকৃতিতেই এ পরমতাবীজকে দেখিয়াছি। রসতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব, রাস এবং ভাস, দুই দিক দিয়াই এই বীজের পরমত্ত্ব।

৪। তস্যা অখণ্ড-পরমতত্ত্বালয়ত্বম্॥

'তস্যাঃ'—সেই মায়ার আলয় অখণ্ড পরম যে তত্ত্ব, তাহাই॥

'আলয়' বলিতে কি বুঝিব? লয় অবধি 'বৃত্তিতা' (পাঁচটি বৃত্তিসূত্র পরে এক পাদে আছে) যে আধারে তাহাই আলয়। 'পিবত রসমালয়ম্' ভাগবতের এই 'আলয়টি'ও তুলনীয়। অখণ্ড পরম যে তত্ত্ব, সেটি পাদের প্রথম সূত্রে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। সেটিকে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মে ভগবত্তা। ইনি মহামায়া। মায়া অমেয়-অলক্ষ্য পরমকে লক্ষণাদি-পাদাদি মানে পারীণাদি ধীবৃত্তিতার, বেদাদি প্রমাণ-প্রমেয়তার ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে। এটি অবশ্য মহামায়ার নিজব্যবহার স্বব্যবহার্যতারূপে স্বাবচ্ছেদকতা (self-limitation)। 'তপঃ', 'কাম' প্রভৃতি এই অচিন্ত্যাবচ্ছেদকতার রূপ। কিন্তু অবচ্ছেদটি স্ববিশেষণীয়তা—(self-determination) অচিন্ত্য, অনিরুক্ত হইলেও অবচ্ছেদ বা মান তো বটে। কাজেই, মায়া, মহামায়ার অপেক্ষায় ন্যূনসত্তাকা (সমসত্তাকা নয়), ন্যূনশক্তিকা, ন্যূনব্যাপ্তিকা এবং ন্যূনব্যক্তিকা। এ ন্যূনাদিও মহামায়ার মায়াতেই হইতেছে। নতুবা, 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্'। (Being, Potency, Extension and Intention (বা Connotation) —এ চারিটি দিক দিয়াই অখণ্ড পরম বস্তুটি 'যেন গোড়াতেই এক ন্যূনতা মানিয়া লইতেছেন। সেটির অপেক্ষায় ন্যূনতা এইভাবে 'স্বীকৃত' হইলেও, নিখিল বিশ্বব্যবহারে ('ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' থেকে আরম্ভ করিয়া) মায়ার পারে কে রহিয়াছে বা গিয়াছে? কে বলিতেছে আমি লক্ষণাদির মধ্যে নই? মূলে এবং আসলে অবশ্য কেহই মায়ার মানে নেই। কিন্তু 'কেহটি' যতক্ষণ 'কেহ' ততক্ষণ তো আছেই। এখন, এমন নিখিল বিশ্ব ব্যাপিকা মায়ারও যখন 'পরমের' অপেক্ষায় ন্যূনব্যাপ্তি, তখন, সেই অখণ্ড পরমতত্ত্বই হইল মায়ার ব্যাপ্তির লয় বা বিলয়ের আধার ভূমি (আলয়)। সুতরাং সেই পরমতত্ত্ব সমাশ্রয় ব্যতিরেকে মায়ার পারে যাবার উপায় নেই। উপায়—জপধ্যান, মননবিচার, ভাবভক্তি, যেমন করিয়া পার ঐ মায়াবীজটি পরাক্‌প্রবণ না রাখিয়া প্রত্যক্‌প্রবণ করিয়া লও।

পুনশ্চ, এখানে মায়া যে ভাবে লক্ষিত হইল, তাহাতে ইহা প্রমাণ-প্রমেয়াদি সর্ববিধ বৌদ্ধব্যবহারের মূল নির্বাহয়িত্রী। সত্য মিথ্যা ব্যবহারের মূলেও এটি। বিশেষ বিশেষ প্রসজ্যতায় 'গুণমায়া' 'ভবমায়া' 'ভোগমায়া' ইত্যাদিরূপে জীবের সাধারণ

বন্ধব্যবহারটি ইনি নির্বাহ করিয়া যাইতেছেন। এঁকে লইয়া যে সব সম্প্রদায়গত বিচার-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে সে সকলের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রসজ্যতা নেই। তবে কয়েকটি মাত্র কথা কারিকায় বলা হইতেছে।

সাংসিদ্ধিকী ন বৈ মায়া ন চ নৈমিত্তিকী পুনঃ।
নাকস্মিকী ন বাহ্যাপি বৈকল্পিকী চ নান্তরা।
মান-মেয়স্য যোনিত্বেঽমেয়া মায়া স্বযোনিজা॥ ৪১

মায়াকে সাংসিদ্ধিকী (সম্যকরূপে সর্বথা যেটি সিদ্ধই আছে) ভাবিও না। আবার নৈমিত্তিকী (নিমিত্তের অপেক্ষা রাখিয়া যেটি বৃত্তিমতী হয়), এমনও ভাবিও না। Unconditionality and conditionality—এ দুইই তাতে বর্তে না; কেননা, নিমিত্ত বা conditionalityর বীজই এটি স্বয়ং। আকস্মিকী (আপন সিদ্ধিও নেই, নিমিত্তও কিছু নেই, এমনি আচম্‌কা একটা কিছু)—এটি নয়। বৈকল্পিকীও (অন্য কিছুর বিকল্প, রূপান্তর, নামান্তর ইত্যাদি—alternationality) এটি নয়। বাহ্যও (বাহির থেকে আগন্তুক, অধ্যস্ত—superimposed) ভাবিও না। আন্তরাও (অন্তর্নিহিতা—involved, immanent) ভাবিও না। Externality and Internality—এ দুটিই মায়ার সম্বন্ধে 'এহ বাহ্য'।

ব্যাপার তো তা হইলে মন্দ দাঁড়াইল না! তা হইলে তো মায়াকে বলিতে হয় Alogical Logicality or unrooted Root of Logicality! অবশ্য, Logic শব্দটাকে সেই মূল 'Logos' এর সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছি। যাহা কিছু মান মেয়, তার যোনি মায়া; সুতরাং, নিজে অমেয়া। তবে যে ন্যূনসত্তাকা ইত্যাদিরূপে এঁর 'মান' পরমের অপেক্ষায় 'খাটো' করা হইয়াছে? সত্য! কিন্তু খাটো বড়োর হিসাব করিতেছে বা লইতেছে কে? ঐ মায়ার অন্তর্গত কোনও প্রমাতা, নয় কি? পরম বা মহামায়ার তরফ থেকে? তিনি বলেন—কেবল আমার নয়, আমিই মায়া। ঐ মায়ারূপে আপনাকে যেন 'ন্যূন' করিয়াছি। মায়াকে যেন বলিতেছি—তুমি আমাতে জন্মাও, আমাতেই লয় পাও। কাজেই পরমের অপেক্ষায় মায়ার এই ন্যূনতারূপ মেয়তা ঐ ছোট্ট 'যেন'-টিকে চাপিয়া ধরিয়া আছে। যোনিজত্বও তাই। এ 'যেন'র 'কেন'র

উত্তর কে কবে দিয়াছে? এই নিমিত্ত কারিকায় মায়াকে 'অমেয়া' এবং 'স্বযোনিজা, বলা হইল। মায়া সাংসিদ্ধিক প্রভৃতি কোন আকৃতিতেই (category or formula) নিরূপণীয়া নয় বটে, কিন্তু এক পরম সাংসিদ্ধিক ব্যতীত অপরগুলির 'যোনি' মায়া। যেটি পরম তার কোন যোনি নাই!

জপের সাধারণ প্রয়োজনেও এইসব লাগাও। যে জপবৃত্তি গোড়াতে মনে হয় বাহ্য এবং আকস্মিক, সেটিকে আন্তর ও বৈকল্পিকরূপে পাইতে যত্ন কর। সেরূপে পাইলে কখন? যখন বুঝিবে এটা 'আমাতে কারুর দ্বারা চাপান' একটা কিছু নয়, এটা আমার আপন কর্ম, তখন বাহ্য হইল আন্তর। জপানুকূল বৃত্তি বা ভাবটি গোড়ায়-গোড়ায় যেন আকস্মিক মনে হয়। কখন যে গাঙ্গে জোয়ার আসিবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই! এটি নৈমিত্তিক এবং বৈকল্পিকরূপে পাইতে সাধন করিতে হয়। জপের সঙ্কল্প, ইচ্ছা আর আবশ্যকীয় 'যোগাযোগ'টি জুটিলেই জপ স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। বৈকল্পিকে জপ না চলিলেও জপানুকূল ভাব, চিন্তা, পাঠ, কীর্তন, সৎসঙ্গাদির মধ্য দিয়া চালু রহিল। এইভাবে স্থূল অভ্যারোহটি চলিতে চলিতে জপ এক ধ্রুবধারায় যাইয়া পর্যবসিত হয়।

এখানে 'বৈকল্পিক'কে 'সংবাদী' করিয়া লওয়া হইল। এমনভাবে বৈকল্পিক হইলে, জপ সাঙ্কল্পিক না হইয়াও আনুকল্পিকাদি প্রকারভেদে নিজেকে চালু রাখিতে চেষ্টা করে। আজে-বাজে বিক্ষেপ, অথবা কামক্রোধাদির তাড়না, দৌর্ম্মনস্য—এ সবে পড়িলে বিসংবাদী বিকল্প। 'নিমিত্ত' বলিতে আরম্ভক, উদ্দীপকাদি হেতু নিজের মনে এবং বাহিরে, ইহাই এখানে লওয়া হইল। ধর, কোনও নির্দিষ্ট সময়ে জপসংস্কার প্রথমে জাগরিত হইতে চায় না; 'গড়িমসি' করে; এখন কেন, পরে মনটার ফুরসুৎ হইলে করা যাবে—এই রকমধারা বায়না ধরে। কিন্তু ঠিক সময়েই জপসংস্কারের জোর ধরা চাই। ধরিলে, বুঝিলে জপ 'খামখেয়ালি' ছাড়িয়া হেতু বা নিমিত্তের হিতকথাটি শুনিতেছে।

৫। অপাবৃত্য প্রত্যাকুরুত আবিরিতি বৃত্তিঃ শুক্লা॥

অপাবরণ করতঃ 'প্রতি' কিনা, অভিমুখীন ভাবে, আকরণ করে আবিঃ। ইহা শুক্লা বৃত্তি।

মায়া যে ভাবে কথিত হইল, তাতে এটিকে কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে (যথা

বহিরঙ্গা ইত্যাদি) গ্রহণ করিলে ঠিক হইবে না। পরমবস্তুর আপনাকে, সত্তাশক্তি, প্রকাশ এবং আনন্দ বা রস—যে কোনও ভাবেই 'মান' দেওয়াকেই মায়া বলা হইয়াছে। সে মান 'প্রাকৃত' 'মায়িক' হইলেই মায়া, অন্যথা নয়, এমন সর্ত দেওয়া হয় নাই। মহামায়া যদি পরমা প্রকৃতি, 'পরব্রহ্মমহিষী' ভগবতীরূপা হন, তবে সেই পরমমানও তাঁর নিজমায়া। এতে তাঁর পরম অমেয়তা পরমমানরূপা হইল। এরূপ হওয়াতে এক পরম রহস্যময়ী 'ন্যূনতা' (Self-limitation, ছোট হওয়া নয়) তিনি যেন মানিয়া লইলেন। কেন? যদি সাধ হয়তো বল—লীলা-প্রয়োজনে।

পরম পুরুষ ভগবান্‌ও লীলাময় হইতে অনুরূপ একটা কিছু করেন। যে দ্বিভুজ মুরলীধর আদিরূপ লীলা করেন, তাতে তাঁর রসমাধুরীর পরম ঘনীভাব, কিন্তু সে মাধুরীর শেষ নেই, ইয়ত্তা নেই, সনাতন পুরাতনতা নেই। নিতুই নব, নিতুই অপূর্ব, নিতুই অফুরাণ। সে মাধুরী আস্বাদ করিয়া কেহই তো বলিল না—এই তো আমার আশ মিটিয়াছে, সব ভরপুর, এখানেই শেষ! কাজেই, ঐ পরমমানের সঙ্গে, তাঁকে ঘেরিয়া, তাঁর নিত্য নবায়মান ঘনায়মানতারূপে পরম অমেয় বস্তুটি তো আছেনই। তুমি পরম অমেয়ের এইভাবে পরমমান মানাকে যদি অচিন্ত্য স্বরূপশক্তি বলিয়া ভাল বোধ কর তো তাই কর, কিন্তু, নিজমায়া যোগমায়া, স্বরূপশক্তি এই পরম রহস্যময়ী 'ন্যূনতা' (এতোতেও ফুরায় নেই, আরও কত না আছে—এই রহস্যময় ভাবটি) বলিয়াই না রক্ষা! নহিলে 'পরম ভরপুর'। সেই পরম ভরপুর রহিলে লীলা কোথায়, 'লৌল্য' কোথায়, আস্বাদনাদি কোথায়?

অতঃপর, মূলা মায়াতে দুই মূলা-বৃত্তির কথা বলা হইতেছে। কেবলমাত্র, সৃষ্ট্যাদি বোঝার জন্য নয়, জপাদি সাধন ইত্যাদিতেও এই দুটি মূলা-বৃত্তির সবিশেষ উপযোগ রহিয়াছে, : একটি—'প্রতি' (towards looking on, looking out, ইত্যাদি,); অপরটি—'বি' (inwards, drawing in, enfolding ইত্যাদি)। আগেরটিকে 'অনুলোম' বলিলে, এটিকে বল 'বিলোম'। একটা বল 'সোজা' তো অপরটা 'উল্টা'। এই 'সোজা উল্টা' ব্যাপারটা মূলা মায়ার গোড়ারই কথা। অদ্বৈতবিচারী একে পাইয়াই বলেন—সত্তাবিবর্ত; রসিকও আবার এটিকে পাইয়া বলেন আর আস্বাদন করেন—রসবিবর্ত। এই মূল বিবর্তের গরজেই না কৃষ্ণ হইলেন গৌর!

আচ্ছা, 'প্রতি' এবং 'বি' এই দুইয়ের সঙ্গে আ+কৃ (যা থেকে আকরণ, আকৃতি, আকার) লাগাও। ফলে পাইলে প্রতি+আকরণ, আর বি+আকরণ। যেটি 'কোন্ মুখে, কোন্ দিকে'—মাত্র বোঝাবার সঙ্কেত (Symbol) ছিল, সেটি এইবার নির্বাহ বা নির্বহণ রূপ ধরিল। এইবার Symbol হইবে Significant, Form হইবে Content। প্রথমটি এইবার যেন বলিল—আমি ঈক্ষণ করিব, স্বয়ং আবিষ্কৃত আবির্ভূত হইব। 'অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহম্' ইত্যাদি হইল এই প্রত্যাকরণপ্রবাহরূপ। কিন্তু 'প্রতি 'ও' বি' তো পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না। যেখানে এটি, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ওটি আছে। এইজন্য প্রশ্ন হয়—কার প্রতি বা কিসের প্রতি, আর কার বা কিসের প্রতি নয়? কার দিকে সোজা আর কার দিকে উল্টো? প্রতিমুখ আর বিমুখ। ইষ্ট প্রতিমুখ, ইষ্ট বিমুখ। বি বা উল্টোর বেলাতেও এই প্রশ্ন। 'প্রতি'কে যদি ভাব যোগ, তবে 'বি' বিয়োগ। একে connect করিতে, অপরটার disconnect, পরেরটাকে যদি বল 'বাধ' তবে আগেরটাকে বল 'সাধ'। একটা Basic Affirmation যদি বল, তবে অপরটা Basic Negation। একটা যদি বলে 'ক'='ক', তা হইলে অপরটা বলিবে—'ক', না-ক নয়। এরা দুয়ে মিলিয়ে বলিবে— কোন কিছু হয় 'ক', নয়তো 'না-ক'; চূড়ান্ত করিয়া দেখিলে (যেমন একটা বৃত্ত আঁকিয়া সেইটাকে 'ক' বলিয়া) রফা নেই। বুদ্ধির মূল ব্যবহারগুলি এসব স্বতঃসিদ্ধের উপরই তো চলিতেছে; এ তিনের ব্যবহারে অন্যোন্যাপেক্ষা আছে (Mutual implication)।

এই নিমিত্ত, আবিঃ সূত্রে প্রথম পদটি 'অপাবৃত্য'—অপাবৃত করিয়া; কোন না কোন প্রকারের বাধ বা আবরণ ধর আছে; সেটিকে সরাইয়া (অপ; শ্রুতির মন্ত্রে আছে, 'অপাবৃণু': এই অপ বর্ণদুটির রহস্য ব্যঞ্জনাও আছে, যে জন্য শ্রুতি ঐ দুটিই বলিলেন) তবে পূর্বোক্ত প্রত্যাকরণ। তোমার যদি ইষ্ট-বৈমুখ্যরূপ বাধ থাকে তো সেইটি সরাইয়া তোমাকে ইষ্টপ্রতি-আকৃত, আকারিত করা আবশ্যক। রসপন্থায় আকৃত হইবে 'আকৃষ্ট' হইয়া; জ্ঞানে 'আজ্ঞাত' এবং যোগে 'আয়ত' হইয়া। নাম জপিতেছ; নাদ (বেণু নূপুরাদি মধুরসে অথবা অন্যপ্রকারে) এখনও শুনিতেছ না। কোথাও বাধ রহিয়াছে। হয়ত যোগ বিয়োগটি উল্টা হইয়া আছে। প্রথমে চাই 'অপাবৃণু'—সরাও, যার জন্য এই বিয়োগ বিচ্ছেদ। এই বিধুরতা বোধটিকে প্রবোধ

দিয়ে যোগটি, মিলনটি ঘটিয়ে কেউ যেন 'প্রত্যাকুরুতে'। দৃষ্টান্ত তো পদে পদে। এখন এইরূপ 'অপাবৃত্য প্রত্যাকুরুতে' যে মূলা বৃত্তি (সেটাকে 'মায়া' বলিতে এখনও যদি গোসা হয়তো বল 'দয়া'), সেটিকে বলে আবিঃ। এটি শুক্লা বৃত্তি। সাধারণ লক্ষণ দেওয়া হইল, এর ব্যাপ্তি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।

একেবারে সেই গোড়ায় যাও। পরম অব্যক্ত বস্তু গোড়ায় যেন তাঁর পরমাব্যক্ততা 'সরাইয়া', নিজেকে নিজে 'আবিষ্কার' করিতেছেন। 'অহম্'ও নেই, 'ইদম্'ও নেই। গাঢ় নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা এই রকম আমাদেরও হয়। নয় কি? এর কথা আগে বলিয়াছি। এই মূল অনির্বচনীয় আবিঃটি অহম্-ইদমাদির 'প্রতি' হইতে চলিল, তখন 'প্রতিকুরুতে' হইল প্রতিকুর্ব্বাণ। বাকের দিকে পরা থেকে পশ্যন্তীতে আবির্ভাব মূলতঃ এই রকমের, বীজ থেকে অঙ্কুর, তাতেও তাই। 'প্রতি'র সঙ্গে 'বি' তো থাকেই। গোড়ায় পরমাব্যক্ত এবং পরম-অমেয় নিজকেই যেন 'সরাইতেছেন'। 'প্রতি' যাতে হয় তার জন্য 'বি' হইতেছে। সুষুপ্তি, বীজাদির উদাহরণেও তাই।

'প্রতি' এবং 'বি' এ'দুটি যে শুধু এই ভাবে অন্যোন্যাপেক্ষী (এ-পিঠ ও-পিঠ) এমন নয়। শুধু পাশাপাশি নয়, তারা 'পালা' করিয়াও সর্বত্র চলিতেছে। আবার শুধু তাও নয়, ঐ 'পাশাপাশি' আর 'পালাপালি' দুই চালাইতে হয় বলিয়া সর্বত্র এক চক্রাকারা বৃত্তি (ঘোরাফেরা) ঘটিতেছে। দুইটি মূলা বৃত্তি ('প্রতি' আর 'বি') ছাড়াছাড়ি না করিলেও, কখনও এটা ওটাকে বলে—তুমি একটু জিরোও, আমি চালাই। তখন সেইটে dominant (উদার), অপরটা recessive (ক্ষীণ) হয়। এর ফলে বিশ্বে ক্রমান্বয়িত্ব (alterationality)—একবার এটা চালু, পরের বার ওটা। ফলে স্থূলে-সূক্ষ্মে ভিতরে-বাহিরে সমস্ত কিছু তরঙ্গায়িত (Wave Pattern)। তরঙ্গের চূড়াটিকে (Apex) যদি বল 'প্রতি', তবে উপত্যকাটি (Wave Valley) হইল 'বি'। সঙ্কোচ-প্রসার রূপটাও সর্বত্র। Cosmic Elasticity, তথায় 'Strain' হইল 'বি', আর 'Stress' 'প্রতি'। আবার, সব কিছুতে একটা আবৃত্তিমত্ত্ব (Cyclicity) ও রহিয়াছে। ইলেকট্রন পাক্ খায়, গ্রহনক্ষত্রাদিও খায়। ভিতরে জাগৃতি-সুষুপ্তি, শ্রান্তি-বিশ্রান্তি; ইত্যাদি। সংক্ষেপতঃ দ্বন্দ্বভাব (Polarity and Contrariety), গুণ-প্রধান ভাব (বিবৃত্ত-প্রবৃত্ত) এবং বৃত্ত-প্রত্যাবৃত্ত ভাব বিশ্বে সার্বভৌমিক।

সুতরাং অধ্যাত্মজীবনে জপাদি সাধনে এ তিনের সবিশেষ অপেক্ষা রাখিয়াই চলিতে হয়। যেমন, জপে সুষমভাবে জপাভ্যাসচক্র চালাইয়া প্রাকৃত যে চক্রনেমি ঘুরিতেছে, তার ব্যাজ কিনা বিষমতা দূর করিতে হয়। Eccentric cyclicity-কে পাইতে হয় rhythmicity-রূপে। প্রাকৃত বাড়া-কমা, উঠা-নামা, তেজী-মন্দা এ সব 'জয়' (control and regulate) করার নিমিত্ত নাদাদি অক্ষাশ্রয় করিতে হয়। ২য় খণ্ডের (ক) পরিশিষ্ট দেখ। 'অক্ষ' (Axis)ও আবার, প্রাণ (যেমন নাদ), ভাব (যেমন প্রপত্তি), বোধ (যেমন স্থিতধী) এবং যোগ (যেমন শমদমাদি)—মুখ্যতঃ এই চারি আকারে আশ্রয় করিতে হয়। শেষকালে, দ্বন্দ্বভাব কাটাইবার নিমিত্ত, দ্বিদলস্থিত শ্রীগুরুতত্ত্বে সমাপত্তি এবং তদ্দ্বারা পরমে সমাপত্তি হওয়া আবশ্যক। আবিঃ এবং রাত্রি (চরমভাবে লইয়া) হইল নিখিল দ্বন্দ্বের চরমভূমিকা। যেমন, সুষুপ্তি বলে—আমায় আবিঃর ভূমিকা আগে দাও, তবে আমি জাগৃতি হইব; আবার জাগৃতি বলে—আমায় রাত্রির ভূমিকা দাও, তবে আমি সুষুপ্তি হইব। এ কথাগুলো আপন আপন জাগা-ঘুমানোর অনুভবে মিলাইয়া লইও (১।৩।৬ সূত্রে দ্বন্দ্ব লক্ষিত হইয়াছে)।

আবিঃকে শুক্লাবৃত্তি বলা হইল কেন, তাতেও প্রণিধান করিও। একটা নমুনা লও। ধর, একখানা ঘোর কালো রঙের কাগজ। সব রঙ গ্রাস করিয়া সে হইয়াছে কালো। সে কাগজখানায় যদি হল্‌দে, সবুজ কোন রঙ ফোটাইতে চাও তো কি করিবে? অপাবৃত্য—সেই কালো আগে উঠাইতে হইবে। সাদা করিয়া লইতে হইবে। কালায় সব রঙ 'গ্রস্ত' (absorbed); ধলায় সব রঙ 'মুক্ত' (reflected)। কাজেই কালোয় রঙগুলো 'বি', ধলায় 'প্রতি'। যে রঙকে ডেকে বসাবে সেই এসে স্বচ্ছন্দে বসিবে।

অন্তঃকরণের দুটি নাম আছে—চিত্ত আর চেতঃ। এ দুটি হইল ঐ 'বি' আর 'প্রতি'। সংস্কারাদির গ্রস্ত ভাবটি চিত্ত, মুক্ত স্যন্দমান ভাবটি অথবা সেরূপ হবার প্রবণতাটি (proneness) চেতঃ। যে কোন রঙ ধরাতে গেলে চিত্তকে আগে তার গ্রস্তভাব থেকে কাটিয়ে তুলিতে হইবে। তাকে চেতঃ (prone, responsive, receptive, reactive) করিয়া লইতে হইবে। ইহাই তো আবীরূপ—অপাবৃত্য প্রত্যাকুরুতে। শুক্ল কৃষ্ণ সম্বন্ধে অন্যকথা পরে।

এইবার কারিকা—

অনিরুক্তেনিদানেঽপি যত্তপসোঽধ্যজায়ত।
তস্য যদাদিসংমানং মানাতিগং তদিষ্যতে॥ ৪২

সৃষ্টিসূক্তের সেই বহুশঃ আলোচিত 'তপসোঽধ্যজায়ত'—পরমতত্ত্বের এই রাহস্যিক তপঃ এবং অধিজাতত্ব (Absolute Being, becoming prone to evolve and manifest as a system of relations)—এই মূল ব্যাপারে আবিঃকে আবিষ্কার করিতে হইবে। Alogical Absolute and Supreme Logical-এর মাঝে সন্ধিরূপ এই আবিষ্ট্ব। সমস্ত কিছু সম্বন্ধাদি 'ব্যক্তিমাম্পন্ন' হয় ইহাতে, অথচ আগের ঐ কাগজখানার মত কোন রঙই সে নিজে মাখে নাই। পরমাব্যক্ততাটি সে খুলিতেছে মাত্র, এবং সব কিছু রঙ ফলানর নিমিত্ত (প্রতি+আকরণ) সে মূল প্রস্তুতিরূপে (fundamental preparedness) আপনাকে বিছাইয়া দিয়াছে মাত্র। এই 'মাত্র' কথাটায় খেয়াল দিও। ব্যক্তিতা সম্বন্ধে এটা যেমন 'কোন রঙই এখনও গায়ে না মাখা'র মত অবস্থা, মেয়তা সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিবে। অর্থাৎ, আদিমমান এবং অমেয় পরম, এ দু'য়ের সেতুরূপে আবিঃকে জানিও। যেটি অমেয় সেটি, মানমেয়রূপতা লইতেছে, আবিঃকে মাঝে রাখিয়া। এই নিমিত্ত ঠিক অমেয় বা মেয় না বলিয়া এটিকে 'মানাতিগ' বলা যায়। আর, এর নিদান (হেতু)—the reason why—যে অনিরুক্ত (বৌদ্ধ ব্যবহারে নির্বচনযোগ্য নয়) এও ঠিক। (১।৩।১৬ সূত্রে নির্বাচ্যত্ব লক্ষিত হইয়াছে)।

আবিঃকে তার স্বরূপের দিক আর তার ব্যাপারের দিক—এই দুই দিক দিয়া দেখিয়া প্রথমটাকে মুখ্যবৃত্তিতা, পরেরটাকে গুণবৃত্তিতা বলিয়া ব্যবহার হৌক। তা করিলে, বীজ যৎকালে বলে—আমি আর সঙ্কুচৎ-অব্যক্ত থাকিব না, বড় হইব, নিজেকে ছড়াইব, তখন এই উচ্ছূনতা (swelling from within) হইল তার মুখ্যবৃত্তিতা, আর আপন আবরক ত্বক্ ইত্যাদি স্থূল-সূক্ষ্ম বাধ সরাইয়া দেয়া হইল তার গুণবৃত্তিতা। বীজের আপন 'উচ্ছ্বাস' বা আবেগটি হবার আগে তার আবরণ ত্বক চিরিয়া দিলে তো কিছুই হয় না। বীজটা নষ্টই হয়। জপাদি যে কোন সাধনে এটি স্মরণ রাখিবে। বাইরের 'খোলস' (রূপাদি) নিজে থেকে চিরিয়া যাইতে দাও। যে রহস্য-হংসী নিত্য সুবর্ণ ডিম্ব দেয়, তার জঠরে অস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হইও না। ধর

সংখ্যাজপ, জোর করিয়া ছাড়িও না। সে আপনি ছাড়িবে এক একটা মেরুসন্ধিতে (critical function-এ) আসিয়া।

এখন, 'আবিঃ' বা 'আবিস্' শব্দে আদিতে ঐ 'আ' স্বরটি হইল মুখ্য। এইটে সেই পরমবীজের আপন উচ্ছ্বাস। এটি সর্বত্র মূল 'সাধ'রূপ। এটি করে কি? বি='বাধ'রূপকে (বীজের আবরণের মত ভাঙ্গিয়া) অপসারণ করে। সম্পূর্ণভাবে? একেবারে শূন্য (Nil)? না। সেটি সম্ভবপর নয়। কেননা, পরমাব্যক্তই অব্যক্তরূপে ('ব') বাধরূপতা 'যেন লইয়াছেন'। সুতরাং সে বাধও অমেয়, অপরিসীম। 'আ'ও পরমে তাই। কিন্তু 'তপোমুখাৎ' ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ রূপতায় এবং সৃষ্টিতে নামিয়া 'আ' তার পারম্যের ন্যূনতায় যেন নামাইয়া লইয়াছে; 'ব'ও তাই। কাজেই 'আ'=সাধ, 'ব'=বাধকে আয়ত্ত করে (অপাবৃত ইত্যাদি) পূর্ণভাবে নয়, ধ্রুবভাবে নয়, পরন্তু পাদমাত্রায়, কলায় কাষ্ঠায় (যেমন বীজ থেকে পাদপোদ্গমে দেখি)—ক্রমিক, ধারাবাহিকরূপে। ফলে, 'ব' হয় 'বি'। এটি হইল অমিত বাধরূপতার বিশেষণ বা অবচ্ছেদ।

আচ্ছা, 'ব' রূপ মূল অব্যক্ত ভাণ্ডার (unbounded primordial potentiality) থেকে কোনও এক পরিচ্ছেদ ('বি'), 'আ' দ্বারা 'বশীকৃত' হইল। 'ব' রূপে কোনও 'মুখীনতা' নেই, যেমন 'প্রতি'তে আছে। 'বি'তে 'মুখীন' হইতেছে। তখন 'প্রতি' আর 'বি'তে প্রতিদ্বন্দ্ব (polarity)। ধর, বীজের বাহিরের ত্বকটা ভাঙ্গিল। এতে কি হয়? যে বাধরূপটা গেল, সেটা আসলে লোপাট হইল না, কার্যকরী শক্তি বা তেজঃ ইত্যাদিরূপে বিবর্তিত হইল (transformed) জড়ে, প্রাণে, মনে সর্বত্রই আবিঃ এইভাবেই আপনাকে আবির্ভূত করিতেছে। ঐ তেজঃ বা অগ্নি হইল অন্তিম 'র' বর্ণ। প্রকারান্তরে 'স্' বর্ণ। 'আবিঃ' এই শব্দেই পূর্বালোচিত সব কথাই সূক্ষ্মাকারে আছে। এই 'আবিঃ' আবীরূপেই আমাতে এস ('ম এধি')! রসে ভাবে, যোগে যাগে, জ্ঞানে—এই আবিঃকে আবীরূপে মিলাইবে কিরূপে তাই ভাব। এইবার নীচের এই কারিকা দুটি :—

আবিরিতি চ শব্দস্যাদিমে যা মুখ্যবৃত্তিতা।
মাধ্যমস্যাক্ষরাত্তস্যা গুণীভাবো ররূপতা॥

অশেষা ব্যাপিকাব্যক্তিরাবর্ণেন প্রচোদিতা।
বশ্চাশেষং যদব্যক্তং বীতি ব্যক্তে বিশেষণম্॥ ৪৩-৪৪

আদিমে=আ বর্ণে। মাধ্যমস্য=‘বি’ ইহার। ররূপতঃ=‘র’ এইরূপ গুণীভাব। আ=অশেষা ব্যাপিকা ব্যক্তি (manifestation)। ব=অশেষ অব্যক্ত, ‘বি’=ব্যক্তির জন্য ‘ব’ এর বিশেষণ।

যে কোনও একটা অব্যক্তের ‘ব্যক্তিমাপন্ন’ হইবার ধারা (expanding manifestation) চলিতেছে। এটি ‘আ’। যেখানে যখন বাধা বা বাধ উপস্থিত, সেখানে তখন তাকে কি করিতে হয়? সে বাধা বা বাধকে কার্যতঃ অপসারিত করিয়া, সেটিকে আবার শক্তীন্ধন করিয়া আপন তেজোভাণ্ডারে জমা করিতে হয়। তা হইলেই আবিঃ হবেন ‘তেজী’—(generating and gathering momentum), নচেৎ ‘মন্দা’। অনেক স্থলে রেখাচিত্র এঁকে এটা দেখান যায়। সাধনে এই ‘আবিঃ’ রেখাচিত্রটিতে সবিশেষ অবহিত হইবে। যেমন, ডাক্তারকে রোগের রেখাচিত্রে।

‘আবিঃ’ মন্ত্রের ব্যাহরণে ‘আকরণটি’ অপেক্ষাকৃত নির্বাধ বোধ করিলে, ‘আ’ এই স্বরটি প্লুত এবং মুখ্য ভাবে উচ্চারণ সঙ্গত। বাধ বা বাধা স্পষ্ট বা প্রবল (যথা, ক্রোধাদি কোনও রিপু) বুঝিলে ‘বিঃ’ ভাগে জোর দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু, সত্বর ‘আ’তে যে ব্যাপিকা শান্তবাহিতা তাতে ফিরিয়া আসাই বাঞ্ছনীয়। যেমন, কোনও রোগের চিকিৎসায় কোনও বিশেষ উপসর্গ দেখা দিলে সেটার নির্বাধ (counteract) করার ব্যবস্থা করিতে হয়, কিন্তু ‘নেচারে’র (Nature) নিরাময়ী ধারায় যতটা রাখিতে বা রহিতে পারা যায় ততটাই ভাল।

এইবার রাত্রিসূক্ত। ‘আবিঃ’র পরমতার ভূমির একেবারে ‘কাছাকাছি’ কোনও পরম রহস্যসন্ধিতে আদিম ‘আবির্ভাব’টি হইয়াছে। আমাদের সাধারণ ব্যবহারের ভূমি পর্যন্ত সে আদিম রহস্যকে ওতপ্রোত এবং উদাহৃত হইতে দেখি। ‘রাত্রি’তে রহস্যঘটনা গহনতরা। বেদে নাসদীয়সূক্তে যে ‘গম্ভীরাম্ভঃ’ উদ্দেশে বলা হইয়াছে, কোন এমন ধী আছে যে তাতে অবগাহন করতঃ তলের সন্ধান পাইবে? অথচ, ‘আবিঃ’ যেমন, ‘রাত্রি’ও তেমনি সর্বভূমিতে ওতপ্রোত, অনুস্যূত। অথবা, ‘আবিঃ’র সঙ্গে তফাৎ করার জন্য বল—আবিঃ ওতপ্রোত, রাত্রি অনুস্যূত। রাত্রি ‘মহারাত্রি’, ‘মোহরাত্রি’

ইত্যাদি ভেদে পরম তত্ত্বের (মহামায়ার) গহনতম রহস্য রূপ। গহন কথাটা বলা হইতেছে এইজন্য যে—রাত্রিই পরমের যেটি গহনতা তাকে সর্বভূমিতে অনুস্যূত এবং উদাহৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত কিছুর (একটা ধূলিরেণুরও) মধ্যেই রাত্রি একটা অগাধনিগূঢ়তা (unfathomed mystery and inscrutability) রূপে বিদ্যমান। কাঠায় লইলে এইটি হইল 'শুদ্ধা তামসীতনু'। তিনটি গুণের এক গুণ তমঃ সেটি নয়। এ পরা তামসীকে 'কৃষ্ণা' বলা হয়। রসের এবং রস-মাধুরীর যে পরম, অগাধ অনির্বচনীয় রূপ, সেটিকে কি বলিবে? 'কৃষ্ণ?' পরমাশ্চর্য নাম! সর্বভূমিতে গহনতা, গম্ভীরতা, নিগূঢ়তা, অব্যাকৃত অব্যক্ততারূপে যেটি বিদ্যমান, অবিনাভাবে যেটি বিদ্যমান, সেটি রাত্রি। বেদে রাত্রিসূক্ত একেই উদ্দেশ করিয়াছেন।

পরমতত্ত্ব একাধারে পরম প্রকাশ আর পরম অব্যক্ত। পরম প্রকাশরূপ যদি 'আবিঃ'কে লও তো সে 'আবিঃ' নির্ব্যূঢ়-নিরন্তর-নিরপেক্ষ আবিঃ। আর রাত্রি সে পরমপ্রকাশভূমিতে পরমশূন্যতা। কিন্তু, পরমতত্ত্বকে পরম অব্যক্তরূপে দেখ। অমেয়, অলক্ষণ, অনিরুক্ত ইত্যাদি 'নেতিকরণে' দেখ। সে যে কিছুই বুঝিতে দেয় না, বলেও না। এভাবে রাত্রি সেখানে নির্ব্যূঢ়া-নিরপেক্ষা-নিরন্তরা। আবিঃর ভাগ্যে শূন্য! তুমি কি বহিঃপ্রজ্ঞ?—না। অন্তঃপ্রজ্ঞ?—না। ঘনপ্রজ্ঞ?—না। ইত্যাদি। শূন্যের পর শূন্য!

কিন্তু, 'হাঁ' উত্তরটাও সেই মূলে রহিয়াও কে যেন দেয়। আমিই সব—সব হইয়া এবং সবেতেই আমি পূর্ণ। মহামায়াসূত্রে এ উত্তরটাও সবিশেষ শুনিয়াছি। কাজেই 'না'—'হাঁ' দু'য়ে মিলিয়া এক নিরুক্তি বা কৈফিয়ৎ দাবী করে যে! দু'য়ের কোনটাই সরাসরি 'ন স্যাৎ' হইতে চায় না যে! তাই পরমের ঐ আবিঃ এবং রাত্রিকে পরস্পরের সঙ্গো সন্ধি পাতাইতে হইয়াছে। তার মানে, তারা অন্যোন্যাপেক্ষী হইয়াছে। 'প্রতি' এবং 'বি' এ দুটিকে লইয়া তাও আমরা সবিশেষ দেখিয়াছি। ব্যবহারে, সৃষ্টিতে সব কিছুতেই তাই এই এক আকৃতি—আমার কিছুটা বুঝিবে বোঝ, কিন্তু বোঝার তো শেষ নেই; কিছুটা বলিবে বল, কিন্তু বলারও তো অন্ত নেই। বুদ্ধি আর বাক্ ঐ অবোঝা-অবলার সঙ্গো এক 'নাইকো-ফাইনাল' রেস খেলিয়া চলিতেছে! অর্থাৎ আবিঃ আর রাত্রির পালাপালি লুকোচুরি। সেই 'যস্যামতং তস্য মতম্', 'বিজ্ঞাতমবিজানতাম্' থেকে সুরু করিয়া ঐ 'নাম-না-জানা তৃণ কুসুম', অথবা, 'এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি। শুনেছি তার বরণ

কালো'—ইত্যাদি পর্যন্ত সব তাতেই আবিঃ এবং রাত্রির ঐ পালাপালি চলিতেছে। রসের পরমোৎকর্ষ বিলাস, তার জন্যও সারদোৎফুল্লমল্লিকা রাত্রিকে চাই; আবার মহানিশাও আবশ্যক হয় সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী যে শ্যামা তাঁর পূজায়। অঙ্কুর অপেক্ষা করে বীজের; নাদ বিন্দুর; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সর্বত্র। জপাদি সাধনে কেবল 'কাল' হিসাবে নয়, তত্ত্ব-হিসাবে (as Principle) রাত্রির উপযোগ অসামান্য। বীজাশ্রয় তত্ত্বতঃ রাত্রিতত্ত্বেরই সমাশ্রয়। দীক্ষায় রাত্রিতত্ত্বই পরম সম্ভাবনাশক্তিরূপে বৃত্তিমান্ হয়। সাধনভজনে সেটির আবীরূপতা হইয়া থাকে।

নাসদীয়ের গম্ভীরাম্ভঃ প্রসঙ্গে 'তল' কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। 'তল' শব্দে 'ত'কার, সেটি যে কোনও তল বা ভূমি বোঝাক্। দেখিব যে ইহা কেবল পারিভাষিক (conventional) মাত্র নয়। হেতু আছে। শুধু 'ত' বলিতে স্তব্ধ (static) তল বুঝাইল। তাতে দাও রফলা স্তব্ধতা গেল—static হইল dynamic, কিন্তু বিজ্ঞানে Energyর মত এটা এখনও 'scalar' 'দিক্' বা 'মুখ' পায় নাই (undirected)। যোগ কর 'ই'। এবার তল বা ভূমিটি কোনদিকে বা 'মুখে' গতিশীল, ক্রিয়াশীল। পাইলাম—'ত্রি'। সৃষ্টির যে ধারা, সেই এই 'ত্রি'কে পাইয়াই। ত্রিদেবতা, ত্রিগুণ ইত্যাদি এই মূল 'ত্রি'র দৃষ্টান্ত। প্রণবে ত্রিমাত্রা। ত্রি মহাব্যাহৃতি। এখন ধর—'রা' বলিতে পরমা যে শক্তি তাঁর (ভগবত্তার) অসীম সমবিতান (Unbounded Homogeneous Expansion) বুঝাইল। এ অসীম বিতানে শূন্যতা, আধিক্য (শক্তির, প্রকাশের, রসের ইত্যাদি) এখনও নাই। 'নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্ম'—নির্দোষ সম ব্রহ্মই। কাজেই, 'রা'এর দ্বারা ব্রহ্ম উপলক্ষিত। এইবার এই 'রা' 'ত্রি'কে স্বীকার করিলেন। অর্থাৎ যে অসীম সমতায় তল বা ভূমি, তার স্তব্ধতা বা গতি এবং গতিমুখের কোনও প্রসজ্যতা ছিল না, তাতে সে প্রসজ্যতা আসিল। ফলে আসিল আবরণ, গহনতা, নিগূঢ়তা, অব্যক্ততা ইত্যাদি। যেটি শুধুই পরিনিষ্ঠিত (as fact), সেটি হইল সম্ভাবনা, সম্ভূতি। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। এই ভাবে বিন্দু নাদে, নাদ বিন্দুতে, নাদবিন্দু দুয়ে 'অউম' ইত্যাদি অক্ষরে 'গূঢ়' হইয়াছে। 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। ইহাই হইল রা+ত্রি। পরম-রস-বস্তু যেটি, সেটিকে 'যোগমায়া' সহকারে বা পুরস্কারে, তার পরমলীলায়নের নিমিত্ত এই মূল রাত্রিকে অপরূপ করিয়া সাজাইয়া আপন 'সেবায়' মিলাইতে হয়। জ্ঞান, যোগাদি সর্ববিধ

সাধনেই এর ঠাঁই অবিসংবাদিত। যাহা সর্বত্র একভাবে রহিয়াছে, 'তাকে জড়ো করিয়া' 'গোপন করিয়া' 'মজুদি করিয়া' রাখে রাত্রি। বিশ্বে সর্ববিধ Currencyর Reserve Bank রাত্রি। শিষ্যের দ্বিদলে অধিষ্ঠিত শ্রীগুরুশক্তি আপন 'রা'তে 'ত্রি'র ঐ আলাদা 'র'টি টানিয়া লয়েন। ফলে 'ত্রি' হইল 'তি'। আর শিষ্যের যেটি 'রাত্রি' (গহন কর্ম এবং গহনতর সংস্কারের চোরা ভাণ্ডার), সেটি শ্রীগুরু কৃপায় হয় 'রাতি' (রক্ষা)। গুরু বলেন—ওগো! তোমার 'র'টিকে 'ত্রি'র সঙ্গে যুড়ে আলাদা করে আর রেখো না, আমার 'রা'তে সঁপে দাও! 'রাম', 'তারা', 'রাধা'—এই মহানামগুলি ভাবনা করিও। পরে এসব আসিবেন।

আগে রাত্রি=র+অত্রি ইত্যাদি রকমেও প্রসঙ্গক্রমে ভাবিত হইয়াছে। তাতে ঠিকই হইয়াছে মনে হয়। রাত্রি তো স্বয়ংই গহনতার, নিখিল রহস্যের খনি। রাত্রিই সব কিছু 'রহসি', সব বিদ্যাকে 'গুহ্য', 'উপনিষৎ' করে। রাত্রি নইলে তো ভাবরসের মজাও মজে না! জপ বল, নাদ বল, ধ্যান বল—সব কিছু 'মজায়' রাত্রি। রাত্রিসূক্ত 'ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা' ইত্যাদি বলিয়া কতই না বাখানি করিয়াছেন!

আর এক কথা। সরাসরি রাত্রি=তমঃ বা তমস্ করিও না। রাকা রাত্রিটা কেমন স্বচ্ছ উজল সোনালি ঘোমটা ঢাকা অপরূপ মাধুরী! রাত্রিসূক্ত স্বয়ং বলেন—'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'। মনে রাখ যে,—'রা' 'ত্রি' আকৃতিটি লইয়া কখনই তাতে নিঃশেষিত হইয়া যায় না। একটা কিছু 'গুহা' বা 'বৃহ' হইল বটে, কিন্তু তার আধার এবং আশ্রয়রূপ (as containing and sustaining Plenum) সেটি থাকেই। সব তাতেই দেখ। নাদ অ, উ ইত্যাদি হইয়াছে, কিন্তু স্বয়ং আছেই। 'ত্রি' থেকে সেই 'রা'তেই তো যাইতে হইবে। তমসের আকৃতিটি কি? কোন তল তার অন্তিম স্পর্শ পর্যন্ত (মকার) দিতেছে বটে। কিন্তু, তার আপন তল প্রান্তে (at the end of the plane), ধর, আমাদের সাধারণ যে চেতনা বা normal consciousness তার অবধিতে, প্রান্তে আসিয়া সে আপন 'কেজো শক্তি'কে যেন ঝাড়িয়া ফেলে (অস্) আর বলে—thus far and no farther!

চোখ বলে, আর তো আমি দেখি না; মন বলে—আর তো আমি বুঝি না, ইত্যাদি। একেই বলে তমস্। রাত্রি তমস্ বা তমসাকে কাজে লাগায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া রাত্রি তমস্ নয়। রাত্রি তমসাকে দুই বিপরীত কর্মেও লাগায়। অন্য সব কিছুর

আবরণে তো বটেই, তা ছাড়া তার আপন আবরণেও। তার ফলে, আবরণ নিজে আবৃত হইয়া যায়। শেষের এই আবরণটি 'যোগ', 'পূরণ' অথবা 'বিয়োগ' হইতে পারে। প্রথম স্থলে—আবরণ নিজে জানে না যে সে আবরণ (প্রকাশাবরণ), এটি 'মোহ-রাত্রি'। দ্বিতীয় স্থলে—আবরণ নিজেই নিজেকে যেন প্রকাশ করে—জানে সে আবরণ (আবরণ প্রকাশ)। রাত্রির যেটি 'রা' সেটি তার 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।' প্রকাশ আর বিমর্শ দুটি। বিমর্শ 'ত্রি' প্রভৃতি আকৃতিতে মর্শন করে বটে, কিন্তু প্রকাশ দর্শক 'রা'রূপে অবিনাভাবেই থাকে। যেটাকে আবরণ বলা হইতেছে সেটাকে পূরা (+-) লইয়া 'নিরোধিকা' শক্তিতে প্রবিষ্ট হইতে দাও।

কাজেই নিরোধিকায় দুই মুখে দুই বিপরীত পরিণাম প্রবণতা ঘটিয়াছে। এ্কটা মুখ—তমসা, অপরটা বেদসা ('জাতবেদসে')। প্রকাশ ও চেতনা তমসার মুখে আবরণের আবরণকে গাঢ় আরও গাঢ় করিয়া রাখিয়াছে। মানুষে আত্মাবরণের সংজ্ঞা বা চেতনা যেন নাই বলিলেই চলে। ইতরপ্রাণী, অশ্মাদিতে সেরূপ নয় মনে করি। তমসার এভাবে একটা কাষ্ঠা যদি আছে মনে ভাবি, তবে সেই কাষ্ঠা 'মহামোহা'। আবার, প্রকাশ বা চেতনার দিকেও একটা 'উপরমুখো' ঝোঁক ও গতি আছে। সেটার কাষ্ঠা মহাবিদ্যা। এই দুই কাষ্ঠা পরা বা পরমে যাতে মিলিত ও পরিসমাপ্ত হয়, তাকে বলে পরাবিদ্যা বা পরমাবিদ্যা। এটি একাধারে আবরণেও পরিপূর্ণ আবরণ এবং প্রকাশেও পরিপূর্ণ প্রকাশ। মহামায়া এই অবম কাষ্ঠা থেকে মহাবিদ্যা ও পরাবিদ্যারূপ পরম কাষ্ঠা পর্যন্ত সমস্তেরই প্রকাশ। গহনতার অতল তলটিও সেখানে 'দুরবগাহ' নেই; প্রকাশের পরমশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতাও সেখানে কুণ্ঠিত নেই। আবরণেও তার গভীরতার অতল পর্যন্ত এটি আপন পরমপ্রকাশে বিরাজমানা, এই নিমিত্ত এটি তমসার মহাঘোরে 'তামসী'। 'মহামেঘপ্রভা ঘোরা'। কালীতত্ত্বের ধ্যানে আবরণের পরমতা ও প্রকাশের পরমতা দুই মিলিয়াছে। (প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীকালিকা-ষোড়শী ভাবনা কর।) বিশেষতঃ রস-মাধুর্যের যেটি পরম অনির্বচনীয়তা তথা পরম প্রকাশ (নিত্য এবং লীলা দুইভাবে) সেটি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ মূল ভগবত্তা।

আবরণের আবরণ তিনভাবে—প্রথম, আবরণকে একান্ত শূন্য করিয়া; দ্বিতীয়, আবরণকে একান্ত পূর্ণ করিয়া; তৃতীয়, আবরণকে অবম ও পরম দুই সীমা পর্যন্ত চালু রাখিয়া; অর্থাৎ এ ধারায় যেখানেই আবরণ বলে, 'এইবার আমি সরি',

সেখানেই তাকে চাপিয়া ধরা—একেবারে সরিতে না দেওয়া। সরিতে দিলে তো সংসারে'র যেটি 'সার' (সৃ) সেটিই সরিয়া যায়।

অবরোধ প্রতিরোধাদিরূপ নিরোধিকাকে আমরা আগেই দেখিয়াছি। জপাদি সাধনে নিরোধিকা কেবল যে রাধিকা এমন নয়, সাধিকাও। একান্ত অপরিহরণীয়া সাধিকা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কথা প্রসঙ্গক্রমে পরে আসিবে। যেমন, তারচক্র-প্রসঙ্গে দিবা ও নক্তমের কথা, আর নক্তমে যে 'শয়ন' করিতে হয়, ইহা বলা হইয়াছে। নক্তম্=ন+ব্যক্তম্ এভাবে বুঝিও।

এইবার নিরোধিকাকে আবরণ এবং প্রকাশ দুইভাবেই চিনিয়া তবে 'রাত্রি' যে আসলে কি তত্ত্ব, সেটি বুঝিতে যত্ন কর।

৬। আবৃত্য প্রতিনিরুন্ধে রাত্রিরিতি বৃত্তিঃ কৃষ্ণা॥

আবরণ করিয়া কোনও কিছু সম্বন্ধে বা মুখে (প্রতি) যাহা নিরোধ করে (অমিত সত্তা, শক্তি প্রভৃতি), তাহা রাত্রি। ইহা কৃষ্ণা॥

'আবিঃ'র যেমন, 'রাত্রি'রও তেমন স্বপ্রকাশতা হানি হয় নাই। (যেমন সুষুপ্তিতে সুষুপ্তির প্রকাশ থাকেই)। রাত্রির স্বসম্বন্ধে আবরণ নাই। তাই সূত্রে 'প্রতি'। 'কৃষ্ণা'= বর্ণরূপাদি সব আবরণ (অব্যাকৃত, absorb) করে বলিয়া; সব কিছু প্রতীতিতে এবং যুক্তিতে আসলে অব্যক্ত এবং 'অমত' করিয়া রাখে, তাই। ইত্যাদি।

এইবার, কারিকা:—

অনুপ্রতীতি মৈথুন্যং দ্বন্দ্বভাগ্‌বৃত্তিতাশ্রিতম্।
ব্যতিরেকো নিষেধশ্চ হ্যাক্রমতেঽন্বয়ং বিধিম্॥
সৃতে প্রতিপ্রসূয়েত প্রতিকুর্ব্বীত কর্ম্মণি।
রসেঽন্তরিতমান-বিপ্রলম্ভাদি-বৈভবম্॥ ৪৫-৪৬

যে কোনও প্রতীতির পরে তার স্মৃতি ইত্যাদি রূপে অনুপ্রতীতিটি দেয় রাত্রি (সংস্কারাদি ঢাকিয়া রাখিয়া) যেখানে 'আমি', 'সে', 'কর্তা', 'কর্ম' ইত্যাকার কোনও দ্বন্দ্বগর্ভ বৃত্তি হইতেছে, সেখানে সে দ্বন্দ্বের (আসঙ্গাদি) মিথুন ভাব ঘটায়

রাত্রি। ব্যতিরেকরূপে অন্বয়কে, নিষেধরূপে বিধিকে 'আক্রমণ' করে রাত্রি। কোনও কিছুর ব্যাপ্তি সর্বতঃ নয়, অব্যাপ্তি থাকেই—ইত্যাদি ভাবে এটি বুঝিয়া লইও। জপে অনুব্যাহরণ, অনুস্মরণে রাত্রিকে ধ্যান করিও। জপে কোথায় অন্বয়-ব্যতিরেকাদি এবং তাদের আবার মিলন-সঙ্গাতি কিসে, কোথায়—তাও চিন্তা করিও রাত্রিকে ধ্যান করিয়া। মিথুনীভাব, মিলন—এসব রাত্রির বিশেষ 'কারিগুরি'। তারপর, কিছু প্রসূত হইল বা প্রসব করিল (সূতে); কিন্তু দেখি—প্রতিপ্রসবও ঘটিতেছে। কিন্তু, প্রসব-প্রতিপ্রসব দু'য়ে মিলে আসে কোথা থেকে?—রাত্রি। কর্ম আর প্রতিকর্ম (action-reaction) এর বেলাতেও তাই (প্রতিকুর্ব্বীত কর্ম্মণি)।

শেষ—রসের আস্বাদে ও সম্ভোগে 'অন্তরিতা' 'বিপ্রলম্ভ' 'মান' ইত্যাদি চমৎকারি বৈভব সুষ্ঠুভাবে বিস্তার করে রাত্রি। দৃষ্টান্তস্থলগুলি সংক্ষেপে কথিত হইল। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিও। আর, সাধনে এই রাত্রিরূপা মহামায়া যেন প্রসন্ন হইয়া অনুকূল, স্বারসিক অনুপ্রত্যয়াদি তোমায় দেন, এ নিমিত্ত তাঁতে, তাঁর পরম ভগবত্তাতে প্রপন্ন হইও। যেটি সূক্ষ্ম, গাঢ়, গহন, নিবিড়, দুর্জ্ঞেয়, দুঃসাধ্য তাকে না সাধিয়া তো উপায় নাই।

'মহামায়া' জপসূত্রমে 'আকরসূত্র', আর 'আবিঃ' এবং 'রাত্রি' হইল 'সন্ধিসূত্র।'

অতঃপর, 'আবিঃ' এবং 'রাত্রি' এই দুটি অপাবরণী এবং আবরণী মূল বৃত্তিকে 'দ্যৌঃ', 'পৃথিবী', 'অন্তরীক্ষ' এই তিনে বিশেষ বিশেষ ভাবে অন্বিতরূপে দেখা হইতেছে, পরের তিন সূত্রে।

৭। দ্যৌঃ স্বরাবিঃ শুক্লাঽনুলোমা চাপূরণী॥

পূর্বোক্ত 'আবিঃ' 'স্বঃ' এই আকৃতিতে (আকরণ পূর্বক) শুক্লা, অনুলোমা আপূরণী দ্যৌঃ॥

সৃষ্টিসূক্তে 'ততো রাত্রিঃ'—বলিয়া ক্রমটি দেখাইয়াছেন। আদিম তপোরূপে যে আবিঃর আবির্ভাব, তারও পশ্চাতে পরমাব্যক্ততায় যে 'রাত্রি', তার তো কোনও নাম-নিরুক্তি ইত্যাদি নাই। তবে, তপঃ থেকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' যেই আবির্ভূত হইল, অমনি আবার রাত্রি। এ রাত্রি সৃষ্টিক্রমে ও ধারায় প্রবেশ করিতে 'সম্মতা' 'রাত্রি'। পূর্ব সূত্রে

সেখানেই তাকে চাপিয়া ধরা—একেবারে সরিতে না দেওয়া। সরিতে দিলে তো সংসারে'র যেটি 'সার' (সৃ) সেটিই সরিয়া যায়।

অবরোধ প্রতিরোধাদিরূপ নিরোধিকাকে আমরা আগেই দেখিয়াছি। জপাদি সাধনে নিরোধিকা কেবল যে রাধিকা এমন নয়, সাধিকাও। একান্ত অপরিহরণীয়া সাধিকা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কথা প্রসঙ্গক্রমে পরে আসিবে। যেমন, তারচক্র-প্রসঙ্গে দিবা ও নক্তমের কথা, আর নক্তমে যে 'শয়ন' করিতে হয়, ইহা বলা হইয়াছে। নক্তম্=ন+ব্যক্তম্ এভাবে বুঝিও।

এইবার নিরোধিকাকে আবরণ এবং প্রকাশ দুইভাবেই চিনিয়া তবে 'রাত্রি' যে আসলে কি তত্ত্ব, সেটি বুঝিতে যত্ন কর।

৬। আবৃত্য প্রতিনিরুন্ধে রাত্রিরিতি বৃত্তিঃ কৃষ্ণা॥

আবরণ করিয়া কোনও কিছু সম্বন্ধে বা মুখে (প্রতি) যাহা নিরোধ করে (অমিত সত্তা, শক্তি প্রভৃতি), তাহা রাত্রি। ইহা কৃষ্ণা॥

'আবিঃ'র যেমন, 'রাত্রি'রও তেমন স্বপ্রকাশতা হানি হয় নাই। (যেমন সুষুপ্তিতে সুষুপ্তির প্রকাশ থাকেই)। রাত্রির স্বসম্বন্ধে আবরণ নাই। তাই সূত্রে 'প্রতি'। 'কৃষ্ণা'= বর্ণরূপাদি সব আবরণ (অব্যাকৃত, absorb) করে বলিয়া; সব কিছু প্রতীতিতে এবং যুক্তিতে আসলে অব্যক্ত এবং 'অমত' করিয়া রাখে, তাই। ইত্যাদি।

এইবার, কারিকা:—

অনুপ্রতীতি মৈথুন্যং দ্বন্দ্বভাগ্‌বৃত্তিতাশ্রিতম্।
ব্যতিরেকো নিষেধশ্চ হ্যাক্রমতেঽন্বয়ং বিধিম্॥
সূতে প্রতিপ্রসূয়েত প্রতিকুর্ব্বীত কর্ম্মণি।
রসেঽন্তরিতমান-বিপ্রলম্ভাদি-বৈভবম্॥ ৪৫-৪৬

যে কোনও প্রতীতির পরে তার স্মৃতি ইত্যাদি রূপে অনুপ্রতীতিটি দেয় রাত্রি (সংস্কারাদি ঢাকিয়া রাখিয়া) যেখানে 'আমি', 'সে', 'কর্তা', 'কর্ম' ইত্যাকার কোনও দ্বন্দ্বগর্ভ বৃত্তি হইতেছে, সেখানে সে দ্বন্দ্বের (আসঙ্গাদি) মিথুন ভাব ঘটায়

রাত্রি। ব্যতিরেকরূপে অন্বয়কে, নিষেধরূপে বিধিকে 'আক্রমণ' করে রাত্রি। কোনও কিছুর ব্যাপ্তি সর্বতঃ নয়, অব্যাপ্তি থাকেই—ইত্যাদি ভাবে এটি বুঝিয়া লইও। জপে অনুব্যাহরণ, অনুস্মরণে রাত্রিকে ধ্যান করিও। জপে কোথায় অন্বয়-ব্যতিরেকাদি এবং তাদের আবার মিলন-সঙ্গতি কিসে, কোথায়—তাও চিন্তা করিও রাত্রিকে ধ্যান করিয়া। মিথুনীভাব, মিলন—এসব রাত্রির বিশেষ 'কারিগুরি'। তারপর, কিছু প্রসূত হইল বা প্রসব করিল (সূতে); কিন্তু দেখি—প্রতিপ্রসবও ঘটিতেছে। কিন্তু, প্রসব-প্রতিপ্রসব দু'য়ে মিলে আসে কোথা থেকে?—রাত্রি। কর্ম আর প্রতিকর্ম (action-reaction) এর বেলাতেও তাই (প্রতিকুর্ব্বীত কর্ম্মণি)।

শেষ—রসের আস্বাদে ও সম্ভোগে 'অন্তরিতা' 'বিপ্রলম্ভ' 'মান' ইত্যাদি চমৎকারি বৈভব সুষ্ঠুভাবে বিস্তার করে রাত্রি। দৃষ্টান্তস্থলগুলি সংক্ষেপে কথিত হইল। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিও। আর, সাধনে এই রাত্রিরূপা মহামায়া যেন প্রসন্ন হইয়া অনুকূল, স্বারসিক অনুপ্রত্যয়াদি তোমায় দেন, এ নিমিত্ত তাঁতে, তাঁর পরম ভগবত্তাতে প্রপন্ন হইও। যেটি সূক্ষ্ম, গাঢ়, গহন, নিবিড়, দুর্জ্ঞেয়, দুঃসাধ্য তাকে না সাধিয়া তো উপায় নাই।

'মহামায়া' জপসূত্রমে 'আকরসূত্র', আর 'আবিঃ' এবং 'রাত্রি' হইল 'সন্ধিসূত্র।'

অতঃপর, 'আবিঃ' এবং 'রাত্রি' এই দুটি অপাবরণী এবং আবরণী মূল বৃত্তিকে 'দ্যৌঃ', 'পৃথিবী', 'অন্তরীক্ষ' এই তিনে বিশেষ বিশেষ ভাবে অন্বিতরূপে দেখা হইতেছে, পরের তিন সূত্রে।

৭। দ্যৌঃ স্বরাবিঃ শুক্লাঽনুলোমা চাপূরণী॥

পূর্বোক্ত 'আবিঃ' 'স্বঃ' এই আকৃতিতে (আকরণ পূর্বক) শুক্লা, অনুলোমা আপূরণী দ্যৌঃ॥

সৃষ্টিসূক্তে 'ততো রাত্রিঃ'—বলিয়া ক্রমটি দেখাইয়াছেন। আদিম তপোরূপে যে আবিঃর আবির্ভাব, তারও পশ্চাতে পরমাব্যক্ততায় যে 'রাত্রি', তার তো কোনও নাম-নিরুক্তি ইত্যাদি নাই। তবে, তপঃ থেকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' যেই আবির্ভূত হইল, অমনি আবার রাত্রি। এ রাত্রি সৃষ্টিক্রমে ও ধারায় প্রবেশ করিতে 'সম্মতা' 'রাত্রি'। পূর্ব সূত্রে

এই রাত্রিই সবিশেষ কথিত হইয়াছে। যদিও পরমের ইঙ্গিত রহিয়াছে। সৃষ্টিক্রমের উপসংহার (final summing up) হইয়াছে— ‘পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।’ এই উপসংহারেই নিখিল ব্যবহার সংগৃহীত। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাহৃতিসূত্রে ভূরাদিকে মৌলিক ও ব্যাপক ভাবেই লক্ষিত করিয়াছি। ‘অয়মিতি প্রত্যয়ঃ’ ইত্যাদি রূপে। এখানে দ্যৌঃ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষভাবে তাদের বিশেষণ (determination)। এ তিনের মধ্যে প্রথমটি শুক্লা ‘আবিঃ’র আকৃতি (ঐ রূপে আকরণ); সুতরাং দেবনশীলা দ্যুতিমতী (Radiant)। সৃষ্টিতে যে অনুলোম ভাব, সেটি দ্যৌঃ এর প্রকৃতি। অর্থাৎ, দ্যৌঃ রহিয়াছে বলিয়া সব কিছু সোজা (direct) চলিতে চায় (যথা, আলোক রশ্মি)। এবং দ্যৌঃ আপূরণী—সৃষ্টিতে সব কিছুর সত্তাশক্তি ইত্যাদি আপূরণ (filling in and filling up) করে দ্যৌঃ। Cosmic Reservoir of Mass-energy. ‘Mass’ কথাটা কেবল জড়ার্থে (physically) লইও না। শুধু পূরণ নয় বলিয়া আপূরণ বলা হইতেছে। ‘আ’ এই স্বরে যে ব্যাপিত্ব, সেইটি লইবে। শুধু পূরণ বলিলে—কোথায়, কোন্ অবয়বে, কোন্ ভূমি বা স্তরে বা সংস্থায় পূরণ?—এ প্রশ্ন আসে। দ্যৌঃ সব কিছুর অন্তর্বহিঃ সর্বতঃ ভরিয়া দেবার সামগ্রী। গতির যে প্রথমাকৃতি—আমি সোজা চলিব, নিরন্তর চলিব (নিউটন তাঁর Laws of Motion এ যার এক রূপ দেখাইয়াছিলেন)—সেটিকে অনুলোমতা বা আনুলোম্য বল। দ্যৌঃ এটিরও মঞ্জুরী (assurance) দেয়।

কারিকা:—প্রকাশস্য বিকাশস্যাবকাশসমতার্জ্জবম্।
লোকালোকৌ বিভর্ত্তি দ্যৌঃ স্বধাপূর্য্য মহীয়সা॥
(লোকালোকৌ প্রধাবেতে হ্যাপূর্য্যমাণতালয়ম্॥) ৪৭

সব কিছুকে প্রকাশ বিকাশের সম, ঋজু (এবং উদার) অবকাশ (scope) বিধান করিয়া দৌঃ লোক এবং আলোক দুটিকেই ভরণ করিতেছেন। কি ভাবে? আপনাতে যে নিখিলা অব্যয়া পূরণী শক্তি ন্যস্ত রহিয়াছে (স্বধা), তদ্দ্বারা উহাদিগকে নিরন্তর আপূরিত করিয়া (আপূর্য)। লোক আর আলোক উভয়েই তাঁর আপূর্যমাণালয়ে (Ever filling and refilling Plenum of Energyতে) প্রধাবিত

হইতেছে। 'লোক' বলিতে মূর্ত আকৃতিতে (as rest-energy) আবির্ভাব। 'আলোক' বলিতে অমূর্ত আকৃতি (as radiation)। কেবল জড় পদার্থের কথা হইতেছে না। সকলকে সমান (equal) ঋজু (free and straight) এবং উদার (unbounded) প্রকাশ, বিকাশ, সুযোগ (opportunities) মিলাইয়াই দ্যৌঃ নিরন্ত নন। সব কিছুর যে ধাবিত হইয়া হইয়া হরণ, 'হয়রাণি' হইতেছে! কে নিরন্তর এ হরণের পূরণ করিয়া দিবে? যে পূরণ করিবে তার আপূরণী শক্তি কি এতই মহীয়সী? এমন ধারা এক বিশ্বজনীন মহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যেখানে একটা ধূলিরেণুরও আন্‌লিমিটেড্ ক্রেডিট (credit) —এমনটা না হইলে এই নিরন্তর বিশ্বভঙ্গুরতা আর বর্দ্ধিষ্ণু সর্বরিক্ততার মাঝে কেবলি 'ব্যাঙক্রাপ্ট' হওয়া ছাড়া আশা ভরসার কিছুই রহিত না যে! সুতরাং ব্রহ্ম ভগবত্তার এই যে চিরদেবন-দ্যোতনাময়ী, সমতার্জ্জবদাত্রী, অনুলোমা, আপূরণী মহামহীয়সী তনু, তাঁর কাছে নিত্য উর্দ্ধমুখে, উর্দ্ধকরে প্রপন্ন হও। সন্ধ্যায় সূর্যোপাসনাদিতে যেমন করিতে হয়। ধ্যানে আপন মানসকোরকটিকে উর্দ্ধের এই অসীম শুভ্র আশিষের পানে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলিতে দেও। 'দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ' প্রণবপুটিত এই শান্তিপাঠ ব্যাহরণ ও অনুস্মরণ কর। জপাদি সাধনকে শুক্লাগতি দান করিতে, অনুলোম করিতে, 'উর্দ্ধধাম্না' নিরন্তর আপূরণ করিতে—দ্যৌঃ। উর্দ্ধধাম থেকে অবতরণ ধারা (Descent from Above) দ্যৌঃএর মাধ্যমিকে। এ রহস্য শব্দের 'আকৃতি' পরে বিবেচিত হইবে। যেমন কোনও বীজ মন্ত্রে আদিম স্বর বা ব্যঞ্জন 'পৃথিবী', শীর্ষে নাদবিন্দু বা অর্দ্ধমাত্রা দ্যৌঃ এবং 'ঈ' 'উ' ইত্যাদি মধ্যম স্বর 'অন্তরীক্ষ'।

কিন্তু, আবিঃ যেমন রাত্রির অপেক্ষা করে, দ্যৌঃ সেইরূপ 'পৃথিবী'র। এ পৃথিবী নিশ্চয়ই Earth নয়। এমন কি কেবল Matter নয়, Materiality নয়। ইহা দ্যৌঃ এর এক দ্বন্দ্বস্থতা (Polarity) রূপ। এ দ্বন্দ্ব মানে অবশ্য বিরোধ (contradiction) নহে। একটা বড় মহাসঙ্গাতির পরস্পরাপেক্ষ, অন্যোন্যসাধক পক্ষ (Thesis-Antithesis) এ দুটি। দ্যৌঃ তত্ত্বে আবিঃ মুখ্য, পৃথিবী তত্ত্বে রাত্রি মুখ্যা। মহাসঙ্গাতিটি আবার পরম (Supreme) সঙ্গাতিরূপ হইলে, বেদের এই মন্ত্র—'অদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম্' ইত্যাদি।

এইবার পৃথিবীসূত্রঃ—

৮। পৃথিবী ভূ রাত্রিঃ কৃষ্ণা প্রতিলোমাহ্হরণী॥

'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিকে 'অয়মিতি প্রত্যয় প্রতিযোগী' বলা হইয়াছে, পূর্বখণ্ডে। দ্যৌঃ সর্বব্যাপিকা হইলেও তাঁকে 'ঐ' বলিয়া প্রতীতি করিতে হয়। পৃথিবীও সর্বব্যাপিকা (পৃথ্বী) হইলেও তাঁকে 'এই' বলিয়া প্রতীতি করিতে হয়। ইহা বাস্তব (concrete) গোচরতা ও ব্যবহার্যতার ভূমি। সেরূপ হইয়াও (সেরূপ আবির্ভাবসত্ত্বেও), পৃথিবী রাত্রিতত্ত্বমুখ্যা (রাত্রিতত্ত্বই পৃথিবীতে মুখ্য); সুতরাং কৃষ্ণা। পৃথিবী প্রতিলোমা, আহরণী।

কারিকাঃ—

নিরুধ্য চ সমাহৃত্যাবকাশং বক্রতান্বয়া।
অবব্যাপূর্ব্বকৈর্লোপৈঃ পৃথ্বী বিভর্ত্তি সর্ব্বগা॥ ৪৮

পূর্বে যে সম, ঋজু, উদার অবকাশের প্রসঙ্গ হইয়াছে, সে অবকাশকে 'নিরুদ্ধ' ও 'সমাহৃত' করিয়া সমস্ত কিছুর যেটি অন্বয় (প্রকাশবিকাশে প্রবণতা), সেটিকে বক্র (curve pattern) করিয়াও তাদের ভরণ করেন পৃথ্বী। এবং তাদের যেটি স্বচ্ছন্দ অনুলোমতা, তারও প্রতিযোগিতা করেন ('প্রতিলোমা')। কি ভাবে? অবলোপ, আলোপ এবং বিলোপ এই তিন পরিণাম ঘটাইয়া। এ সব করিয়াও তিনি তাকে ভরণই করেন। এই পৃথ্বী সর্বত্র অনুস্যূতা (সর্বগা)। অন্তর্বহিঃ বিশ্বে সর্বত্র এই পৃথ্বীকে সন্ধান করিয়া দেখিও। 'পৃথু' মানে বিস্তীর্ণ ইত্যাদি বটে; সে অর্থে দ্যৌঃ এর মত পৃথিবীও বিশ্বজনীনা, সার্বভৌমা। নিরোধ, সমাহার আদি বিশ্বভুবনে—জড়ে, প্রাণে, মনে, নাই কোথায়? বক্রতা, বক্রভাবটিও সর্বত্র। কোনও বিজ্ঞান বা বিদ্যাই এই মৌলিক পৃথিবীতত্ত্ব বাদ দিয়া এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। আবার পৃথু মানে গুরু, স্থূলও হয়। সত্তাশক্তির ঘনতা-গাঢ়তা-স্থৌল্য-গোচরতা (perceptibility), এই মৌলিক পার্থিবত্ব থেকে। অবলোপ=দাবাইয়া (compress) রাখা। আলোপ=আড়াল বা বিযুক্ত করিয়া রাখা (screening and switching off)। বিলোপ=কোনও কিছুকে তার আপন আকরে বা বীজে লীন করিয়া দেওয়া। ইংরাজী Contraction, Commutation, Concentration–এই তিন শব্দ ব্যাপক অর্থে

লাগিবে। Physical অথবা যে কোন analysis এদের বাদ দিয়া হবার নয়। এদের সঙ্গে নিরোধ ও সমাহার (counteraction and co-ordination—যথা, এক কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ইলেক্‌ট্রন, ইত্যাদি) তো আছেই। আ, অব, নি, বি, সম্—এই এই পাঁচটি উপসর্গ দ্বারা লক্ষিত এই পঞ্চবৃত্তি।

আচ্ছা, দ্যৌঃ তো জ্যোতিধামের মুক্তির ঋজুবাণী বহন করেন, কাজেই তাঁতে প্রপন্ন অবশ্যই হইবে। কিন্তু, এই পঞ্চ উপসর্গের দরুণ বন্ধ, তার বক্রবারতা যে বহন করে, তাকে তো দূরেই রাখিতে হইবে? বিশ্বভুবন তো দূরে (irrelevant) করিয়া রাখে নাই, রাখিতে পারে নাই; রাখিতে গেলে বিশ্বভুবনই হইতে না, চলিত না। তুমি এর থেকে একে বাদ দিবে কেমন করিয়া? তবে রাত্রির এই পৃথিবী রূপটি এক অন্ধ, অলঙ্ঘ্য নিয়তি? (Blind brute cosmic Destiny?) না, তা তো নয়। পৃথিবী থেকে নিরোধ বক্রতা—অবলোপাদি বটে (বিশ্বসৃষ্টি, রক্ষা এবং পরিণতির নিমিত্তই বটে); কিন্তু, পৃথিবী স্বয়ং (কিনা স্বভাবতঃ) নিরুদ্ধা, বক্রা, অবলুপ্তাদি নহেন। —হইলে, আপন স্বভাব থেকে মুক্তি তাঁর নিজেরও ছিল না, তাঁর ভিতরে যাহা কিছু তাদেরও ছিল না। 'রাত্রি' এবং 'ভূ' বলিয়া আপন যে ক্রিয়াদি ব্যবহার, তা থেকে স্বাধীনা, অতিগা তত্ত্ব পৃথিবী। এইজন্য এই বক্র বন্ধ ব্যবহার কাটাইতে পৃথিবীকে প্রসন্না দেখিতে ও পাইতে হয়। তোমার ভিতর অনাদি জন্মের কত না বন্ধ সংস্কার—রিপু, ভয়, ইত্যাদি। এগুলি দৌঃ এর দৌলতে 'অবাধ বেপরওয়া' খোলা মাট, যেখানে 'সব সমান'—পাইলে কি আর রক্ষা আছে! চাই যম-নিয়ম-প্রত্যাহার-সংযম-নিরোধ। 'যে বিষের বাণটি' সোজাই আসিতেছে, তাকে কোনও গতিকে 'বেঁকিয়ে' না দিলে বাঁচি কি করিয়া?

জপাদি আধ্যাত্মিক সাধনায় ঐ পাঁচটি উপসর্গকেই গুরুকৃপায় আপন উপকারক ভাবে পাইতেই হয়। গভীর মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও আমাদের এই চিত্ত স্থূল। গোচরা পৃথিবীর (Earth) ছাঁচেই যেন গড়া। স্তর বিন্যাসাদির কথা ভাবিতেছি। এটাও আগে বলা হইয়াছে। ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ।। ওঁ পৃথিবী মে প্রসীদতু।। তোমার নিরোধিকা শক্তিতে শম-দমাদি থেকে নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত সিদ্ধ হোক। প্রত্যাবৃত্তি (মোড় ঘুরিয়ে আনা, উলটে দেয়া) শক্তিতে প্রত্যাহার, সমাহরণী শক্তিতে সংযম (ধারণা, ধ্যান, সমাধি) সিদ্ধ হোক্। অবলুপ্তি, আলুপ্তি ও বিলুপ্তি—এ তিনের কল্যাণে আমার জপ গাঢ়,

গাঢ়তর হইয়া নাদলীনাদি হইয়া চলুক। জপধ্যান, ভাব-ভক্তি এদের কেবল যে গাঢ়তা নিবিড়তাই আসে ভগবানের এই পৃথ্বীরূপা প্রত্যাহরণী সমাহারণী শক্তির কল্যাণে এমন নয়; সে সকলের স্থিরত্ব বা স্থৈর্যও এই পৃথ্বী থেকে। স্থিরতা বা স্থৈর্য বিধান এবং রক্ষা—পৃথ্বীর মুখ্যা বৃত্তি। কূর্মশক্তির আধার। ক্ষিতি তত্ত্বরূপা হইয়া সমস্ত কিছুর মূলাধারে। দৌঃ থেকে দোহন কর যোগ, পৃথিবী থেকে ক্ষেম। দু'য়ে (দ্যাবাপৃথিবী) মিলে যোগক্ষেম। অজপায় এবং প্রাণায়ামাদিতে বায়ুর স্থিরতা আসে। যে কোন মূর্ত দ্রব্যে ভারকেন্দ্র, 'কেন্দ্রীণ' (nucleus) ইত্যাদি। সকল আবর্তনে অক্ষ। রসাশ্রিত সাধনে ব্রজভূমি—যাহা গোষ্ঠ-গোবর্দ্ধন-নিধুবনাদিরূপে ভূমা যে রসবস্তু সেটিকে একান্ত সান্দ্র নিবিড় করিয়া ধরিয়াছেন। আসনের মূল আসনরূপা, যজ্ঞের বেদিরূপা। 'পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ'। শ্রীচণ্ডী মহীস্বরূপা মহাদেবী। বসুকে (বস্+উ) সকল রূপেই ধারণ করেন, তাই বসুন্ধরা বা বসুধা। 'বসু'=value. তা ছাড়া উ+অস্+উ এভাবেও এক রহস্য শব্দ। পূজায় আবাহনে 'ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। স্থাং স্থীং স্থিরা ভব'—এ স্থান-স্থিতি পৃথিবীতত্ত্বেই। 'পৃথিবী' নামে মাঝে যে 'থি', সেটি পৃথিবীর এই মুখ্যাবৃত্তির দ্যোতক। প=ওষ্ঠ্য, স্পর্শবর্ণ। ঋ=আহরণের যেটি 'হৃ'। 'পৃ'=প্রত্যাহার বা প্রতিনিবৃত্তি করার বৃত্তি (let-in, let-out valve)। ব=ওষ্ঠ্য; (storage and safety valve)। ঈকার (তালব্য) যোগে, বী=অভীদ্ধা সমাহার বৃত্তি ('অভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত' ইত্যাদিতে 'অভীদ্ধ'টিকে বোঝার চেষ্টা হইয়াছে।) মধ্যে ঐ 'ই'কার (পৃথিবী) আকৃতিতে নিরোধ-আহরণী আকৃতিটি সবিশেষ ব্যক্ত; 'ই' লোপে ক্ষেমঙ্করী ধাত্রীভাবটি। গাভী, ওষধি, বনস্পতি—এই তিনরূপে পৃথ্বীমাতার ধাত্রীমূর্তিটি সবিশেষ পরিস্ফুট ও অঙ্কিত। এগুলি পরে লক্ষণে পাইবে।

স্থূল যে তামসভাব, সেটি বলিষ্ঠ (as mass inertia) হইলেও পৃথ্বীমাতার শুদ্ধ স্বরূপ নয়। এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত সিংহ-বীর্য দ্বারা মতঙ্গারূপী ঐ জড়তমসকে বিমথিত করিয়া 'মা-টি' আমার 'কনকোত্তমকান্তিকান্তম্' যে জগদ্ধাত্রীরূপ সেটি ধরিয়াছেন। এ হেন পৃথিবীমাতাকে মাটিতে মাথা রাখিয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রসন্ন কর।

যে ভাবে লক্ষিত হইল, তাতে দেখা যায় যে—দ্যৌঃ এবং পৃথিবী দুটিই শুদ্ধ তত্ত্ব। এই পাদের ১৪ সূত্রে 'তত্ত্বতোঽবস্থিতিঃ শুদ্ধিঃ' বলিয়া শুদ্ধির লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সেটি কারিকাসহ পরে আলোচনায় আসিবে। দেখা যাবে—

'তত্ত্বতোঽবস্থিতি'র কতিপয় নিরূপ্য 'ভূমি' (assignable planes) আছে। শেষে সমতা ও পরমতা। আমরা বর্তমান পাদে মহামায়া থেকে মায়া, তারপর আবিঃ এবং রাত্রি, তারপর দ্যৌঃ এবং পৃথিবী—এই ভাবে অবতরণ (logically descend) করিতেছি। গোড়ায় যাহা Alogical Absolute, সেটিরই এভাবে 'বৌদ্ধ পরিক্রমা' (logical appreciation)। তন্ত্রে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবৃতিতে শুদ্ধ-অশুদ্ধের ভেদ করা হয়। একান্ত বা 'নির্দ্দোষ' 'সম' এবং পরমভাবে দেখিলে শুদ্ধ একটিই, অথবা সেটিকে 'এক দুই' কিছুই বলা যায় না। বলা-কওয়ার ছোঁয়াচটুকু লাগলো তো সেটা 'অশুদ্ধ'! বর্তমানস্থলে, শুদ্ধ ততদূর নয়। সব কিছু হইয়া ও করিয়াও যেখানে ভগবত্তা স্বরূপে ও স্বভাবে 'সংস্থিতা'-ই ('বিষ্ণুমায়েতি সংস্থিতা' ইত্যাদি) রহিয়াছেন, কাজেই যাঁতে ভগবত্তার আবির্ভাবরূপেই প্রপন্ন হইতে হয়, সেখানে শুদ্ধই বলা হইবে। অর্থাৎ যেখানে নিজেরই অবলুপ্তি-আলুপ্তি-বিলুপ্তি বশতঃ তত্ত্বতঃ না হোক ব্যবহারতঃ স্বরূপ-স্বভাবে অনবস্থান ঘটিতেছে না। শান্তিপাঠে এটি 'অনিরাকরণম্'। স্থিতির পাঁচটি রূপ দেখিব—অবিস্থিতি, সংস্থিতি, পরিস্থিতি, উপস্থিতি, অনুপস্থিতি। এ পাঁচের আধাররূপে পরিনিষ্ঠিততা। এখন শেষ দুটিতে ব্যবহারতঃ অশুদ্ধি বিস্পষ্ট হয়। পরিস্থিতিতে 'লেশ'রূপে দেখা দেয়।

এই কথাগুলি মনে রাখিয়া অন্তরীক্ষসূত্র প্রণিধান কর।

৯। দ্বে দ্বন্দ্বান্তরিতে ভুবঃ সন্ধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধে॥

দ্যৌঃ এবং পৃথিবী এদুটি স্বতঃ শুদ্ধতত্ত্ব, অন্তরিত বা ব্যবহিত হইয়া, দ্বন্দ্বভাবে আসিলে হয় 'ভুবঃ'। তখন 'সন্ধি' ও 'সন্ধ্যা'রূপতা আসে। এবং শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ এ দুটি সম্ভাবিত হয়।

কারিকা:—

সর্ব্বং দ্বন্দ্বস্থিতং যেন ব্যবধানেন ব্যাদিতম্।
অন্তরিক্ষং তদেব স্যাদণুতনুপৃথুতামিতম্॥
সান্তানন্তমুদাসীনঞ্চেতরচ্ছু ন্যমন্যথা।
হ্রস্বদীর্ঘান্তরীক্ষেণ সন্ধিঃ সিতাসিতাদিষু॥ ৪৯-৫০
(ব্যাপ্যন্তে শুদ্ধতাদয়ঃ॥)

দ্বৈত-দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। যে ভাবেই হোক্। এমন অবস্থায় দ্বন্দ্বস্থিত পদার্থ—(যেমন ধর, ক খ) যেটির জন্য পরস্পরের সম্পর্কে ব্যবধান সহকারে 'ব্যাদিত' কিনা, ব্যাকৃত, ব্যাহৃত (evolved, specifically collected and exhibited) হয়, সেই নিমিত্তটিকে অন্তরিক্ষ (Interval Principle) বলিয়া জানিবে। এই অন্তরিক্ষ পদার্থটিকে অণু (কারণ), তনু (সূক্ষ্ম), পৃথু (স্থূল)—এই তিনভাবে বৃত্তিমৎ হইতে দেখি। যেমন, সুষুপ্তিতে স্বরূপের সঙ্গে 'আণব' ব্যবধানটি থাকে। জপে বৈখরীর সঙ্গে মধ্যমার ব্যবধান 'তনু' বা 'তানব'। কিন্তু বাচিক-উপাংশু ব্যবধান 'পৃথু'। ('পার্থিব' শব্দটি ব্যবহার হইল না)। এইভাবে অপরাপর স্থলে চিন্তা করিও। ব্যবধান সম্বন্ধে 'হ্রস্বদীর্ঘ'—এখানে শব্দের মাঝে যে 'ইকার', সেটিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিও। অন্তরিক্ষকে ক্রিয়মাণ (as function) অথবা চিকীর্ষু (as tendency) দেখিলে দিকের প্রশ্ন ওঠে—কোন্ অভিমুখে? 'সহঃ' বা সাহস (Intensity) এর প্রশ্নও ওঠে—কেমন জোরাল? ধর, জপে বসিয়া বৈখরী-মধ্যমার সন্ধিতে (যোজক অন্তরিক্ষে) আসিলে; সে স্থলে কোন্ রকমের ক্রিয়ামাণতা (activisation) ও বোধ করিলে (ধর, তোমার জপে একটি 'আবিষ্ট' ভাব)। তখনই ঐ দুটি প্রশ্ন। মুখ কোন্ দিকে? পশুনিদ্রার দিকে নয়ত? আর, কেমন জোরালো সেটা? একটা কিছু ছুঁয়ে গেল, একটুখানি নাড়া দিয়ে গেল, এমন নয় তো?

কিন্তু, অন্তরিক্ষ বা ব্যবধান 'ফাঁকা', তার আবার এসব কি কর্ম? না, অন্তরিক্ষ বা অন্তরিক্ষজন্য 'ফাঁকা' (void) নয়। এটি বোঝার নিমিত্ত অন্তরিক্ষকে তিন রকম করিয়া চিন্তা কর। এটি সান্ত অথবা অনন্ত; এটি উদাসীন অথবা সাপেক্ষ; এটি শূন্য অথবা গর্ভিত (with intrinsic relations, যথা Einstein এর space)। এই তিনটি বিকল্প স্থলে অন্তরিক্ষ যে কি কি রূপ ধরিবে, সেটি চিন্তনীয়।

ব্যবহারতঃ অন্তরিক্ষ বা ব্যবধানকে সান্ত, সাপেক্ষ এবং সগর্ভ (with intrinsic scheme or pattern) ভাবেই পাইয়া থাকি। নাম-নামী, ভজন এবং রতি, জপ ও নাদ, ধারণা ও ধ্যান, কর্ম ও অনাসক্তি, আয়াস ও প্রপত্তি, শ্রবণ ও সাক্ষাৎকার, ভক্তি ও ভাব—ইত্যাদির মাঝে যে 'কার্য্যতঃ' ব্যবধান, সেটি অনন্ত-উদাসীন হইলে কি হইত? শূন্য ও নির্গর্ভ হইলেই বা জপ ভজনাদি ব্যবহার কোথায়? রসাশ্রিত সাধনেও ব্যবধানটিকে বিয়োগ বিরহাদি নানা রসনিবিড়ভাবে পাইতেই হয়।

'কলহান্তরিতা'—এখানে 'অন্তরিতা' তো আর অন্তর্হিতা হইয়া নেই! নিখিল বিশ্বব্যবহারেই সান্ত-সাপেক্ষ-সগর্ভ-অন্তরিক্ষের একান্ত আবশ্যকতা আছে। জড়বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদিকেও শুধাইতে পার। সান্ত বলিতে পাদ মাত্রাদি চারিভাবেই পরিমিত ও পরিমেয় (measurable)। সাপেক্ষ বলিতে—অনুকূলে না প্রতিকূলে, ঐ প্রশ্নটা বিশেষতঃ আসে। ধর, সেই উর্দ্ধতন অধ্যাত্মলোক (স্বঃ—Higher Spiritual Realm) এর অভিমুখে তোমার এই কারবারি চেতনার উন্মেষ ঘটিতেছে। মাঝখানে যে অন্তরিক্ষ (hiatus) সেটিকে (higher opening) দিয়া তুমি ঐ অদ্ভুত অন্তরিক্ষ দেশের (Psychic or Parapsychic Realm) কিছু আভাস (glimpses) —নাদশ্রবণ, ভাবপুলকাদিরূপে পাইলে। একটা নূতন দিশারী জ্যোতির এবং রসের। কিন্তু সাবধান! এ নূতন দিশারীটি দিশেহারা করিয়া দেবারও ওস্তাদ! যদি বিভূতি, 'সিদ্ধাই' এসবে ঝুঁকিয়া পড় তো, 'বিদ্যা'কে উপাসনা করিয়াও 'তমঃ (অন্ধং) ভূয়ঃ প্রবিশন্তি'! তাই, 'ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ সমাধাবন্তরায়াঃ।' পথ মিলিলে, সে অণু পন্থায় ঋজুই চলিতে হইবে।

তারপর, অন্তরিক্ষের স্বগত (intrinsic) —এ আকৃতিও যে কোনও দ্বন্দ্বস্থিত বস্তু সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ঐটিই নিরূপক ও নিয়ামক— 'ক' 'খ' এর সম্পর্কে কিরূপ, ইত্যাদি। তাদের পরস্পরের ব্যবহার-বিনিময় তাদের ব্যবধাননিষ্ঠ 'আকৃতি' দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে—যেমন পৃথিবী আর সূর্যের বর্তমান ব্যবধান। কর্ম-অদৃষ্ট, এ দুয়ের অনুপাত-সংঘটক তাদের ব্যবধান। ব্যবধানের যেটা আকৃতি (scheme), তাতে কোন 'অদৃষ্ট' (ধর, সংস্কার) কোন্ সংস্থায় (positionএ) রহিয়াছে; উদার হবার দিকে অথবা তনু হবার দিকে ইত্যাদি, তারই উপর নির্ভর করে—উক্ত সংস্কারটি কোন কর্মকে কি ভাবে কতটা প্রভাবিত করিবে না করিবে। অবচেতনার গতিবিজ্ঞানের—প্রাণনবিদ্যার—একটা প্রশ্ন। অন্তরিক্ষ বা ব্যবধান এই পরিস্থিতিতে (contextএ)—মুখ্যতঃ সন্ধি, সেতু, মেরু এই তিন আকৃতি গ্রহণ করে। এদের কথা বলা হইয়াছে।

ব্যবহারে সান্তাদিরূপ ধরিলেও, অনন্ত-উদাসীন শূন্য (নির্গর্ভ, নির্বীজ) এই তিনটি শুদ্ধ রূপও অন্তরিক্ষে আছে। জ্ঞান বল, যোগ বল, রস বল—এ তিন সাধনার পরিসীমা এবং নিরতিশয়তা সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ তিনটি শুদ্ধরূপকে পাইতেই হয়। মিথ্যাপ্রপঞ্চ, ব্যুত্থান, বিশুদ্ধ-চিন্ময়-রস-বিমুখীনতা—এ সকলকে 'অনন্ত' ব্যবধানে

সরিতে হয়, শূন্য হইতে হয়; উদাসীন (অস্পর্শ) রূপও হইতে হয়। কোথায়, কিরূপ সেটি প্রণিধান করিও। যেমন, সাংখ্যে পুরুষ তো উদাসীন বটেই, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত প্রকৃতি-পুরুষের ব্যবধানটিও উদাসীন হওয়া আবশ্যক। অন্যোন্য 'ছায়াপত্তি' আর সম্ভব নয়। ইত্যাদি।

এইজন্য, অন্তরীক্ষ স্বতঃ অশুদ্ধ তত্ত্ব নয়। হইলে অশুদ্ধি থেকে অনুশুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি ও সংশুদ্ধি—এই ক্রমের 'ক্রমগ', ও 'ক্রান্তগ', এই দুই-ই সেটি হইত না। এটি 'দেব' বা 'দেবতা' হইত না। দেবতারূপে অন্তরিক্ষ সিতাসিত (শুক্লকৃষ্ণ) আদি নিখিল দ্বন্দ্বস্থতার মাঝে সন্ধি, সেতু ইত্যাদি হন। ফলে শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি একটা ব্যবস্থিত ক্রমান্বয়িত্ব (determinate gradedness) পাইয়া থাকে। এই দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া সন্ধি-আরাধনা (সন্ধিকোপাক্ড়ো) সন্ধ্যা-উপাসনা (যাতে শোধন কর্মটি গোড়াতেই করিতে হয়)। দ্যৌঃ এবং পৃথ্বী দুয়ে মাতা ও দুহিতা। দুয়ে কামদুঘা গাভী। অন্তরিক্ষ সন্ধ্যাদিরূপে দোগ্ধা। প্রথমেই শুদ্ধির। হৃদয়ে, নাভিদেশে ন্যস্ত যুক্ত করে এই শুদ্ধি দোগ্ধাকে বন্দনা কর। স্বয়ং পৃথিবীও দুহিতৃরূপে এই দোগ্ধার দ্বারাই দ্যৌঃকে নিরন্তর দোহন করিতেছেন—আলোক, তাপ, তড়িত, বারি, প্রাণ-চেতনা—কতই না ব্যক্তাব্যক্তরূপে!

১০। সাম্যঞ্চ তয়োরনন্তরিতশুদ্ধিসাম্যে॥

যে দুটি দ্বন্দ্বস্থরূপে অন্তরিত (ব্যবহিত), তাদের অনন্তরিত (অব্যবহিত) শুদ্ধির সমতা, সেই সমতা হইলে যে দুয়ের সাম্য বা সমতা হইল॥

কারিকা:—

অন্তরীক্ষেণ পার্থক্যমিদং জ্যোতিরিদং তমঃ।
অনবচ্ছিন্নমেতেন শুদ্ধৌ চ সমতামিয়াৎ॥
দ্বন্দ্বানামপি সর্ব্বেষাং তদ্‌বৃত্তিভেদজন্যতা।
তদ্‌বৃত্তিহীনতাকাষ্ঠা সাম্যং যা পরমাস্থিতিঃ॥ ৫১-৫২

কোন দুটি পদার্থ (কখ) তদুভয়ের 'মাধ্যম' যে অন্তরীক্ষ, তার দ্বারাই 'এটি আলো' 'ওটি আঁধার'—এভাবে পার্থক্য (শুদ্ধি অশুদ্ধিরূপতাদি) প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ,

এই মাধ্যমটি বলিয়া দিতেছে—'তুমি আলো, আর তুমি আঁধার।' আরও বলিতেছে—'এই দেখ দুয়ের মধ্যে ক্রম (gradation), এইখানে সন্ধি, সেতু, মেরু, ইত্যাদি। ঐ ব্যবধান দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশেষিত) যদি না হয়, তা হইলে দুয়ে সমতায় আসে এবং স্থিত হয়। জড়ে, প্রাণে, অন্তঃকরণে যত কিছু দ্বন্দ্ব (polarity, contrariety) দেখা যায়, তার জমক বা ঘটকরূপে ব্যবধানবৃত্তিভেদ বর্তমান। অর্থাৎ, ব্যবধানটি কার্যতঃ কি আকৃতিতে বৃত্তিমান হইয়াছে, তার উপর। Interval Functionটি সে ক্ষেত্রে কি আকারে (equationএ) function করিতেছে তার উপর। অণু, বিরাট সব কিছু লইয়া পরীক্ষা কর। উক্ত ব্যবধানবৃত্তির হীনতা বা শূন্যতার যেটি কাষ্ঠা (Limit of Evanescence) সেটি সাম্য। এবং ঐকান্তিক নির্দোষ হইলে পরমতাস্থিতি বা পরিনিষ্ঠিত পরমতা।

কেবল অদ্বৈতমননে ত্বং পদার্থ তৎপদার্থ বলিয়া কেন, সমস্ত কিছু দ্বৈতদ্বন্দ্বকে সমতায় আনিতে গেলে দুটিকেই শুদ্ধির সমতায় আনিতে হয়। তা না করিতে পারিলে, দুয়ের সাপেক্ষ (conditional) সমীকরণ (equation) হইতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষ নির্ব্যূঢ় সমতা (Identity) হইবে না।

একতরফা একদেশী শোধনে যথার্থ সমতাটি হইবে না। সাধন এবং তার লক্ষ্য—Effort and End–এ দু'য়েরই শোধনসীমা মিলাইতে হয়। উপায় উপেয়—Means and End সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রকৃতি বা মায়া, তাকেও সরাসরি বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া কৈবল্যাদি হয় না। প্রকৃতি আপন শুদ্ধির এক কাষ্ঠায় না আসা পর্যন্ত তাতে 'পরবৈরাগ্য'ই হইবে না; সুতরাং পুরুষের যেটি স্বরূপশুদ্ধি সেটি হইতে দিবে না। এইজন্য পুরুষকে 'ধ্রুবঘুঁটি' করিয়া রাখ, কিন্তু প্রকৃতির ঘুঁটিগুলি লইয়া পরমকৌশলে 'খেলিয়া' প্রকৃতিকেও ধ্রুবঘুঁটি করিয়া লইতে হইবে; অর্থাৎ প্রকৃতি বলিবে—'আর আমি কিছুতেই খেলিতে পারিব না।' একে 'নিষেধীধ্রুব' বা 'নেতিধ্রুব' বলিবে তো তাও বল। এমন ধ্রুবে আসিয়া দুই আর দুই থাকে কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্যই আসে। তবে কি পরমধ্রুবটি এতেও মেলেনি? আমি জীব, তুমি ভগবান্। আমি কি তা তো জানি না। আর তুমি? একটা মহা-আবছায়া, মহাত্রাস, মহৈশ্বর্য, না আর কিছু? আমার বোধের এবং ভাবের (feeling attitude)এ দুয়েরই পরিচয়ে তোমার আসা চাই, নৈলে তোমার সঙ্গে 'সম্বন্ধ' পাতাই কি করিয়া? কাজেই এই খাঁটি সম্বন্ধটা পাতানর জন্যও তাঁকে ও আমাকে শুদ্ধি

সাম্যে আসিতে হইবে। জপ যে অভ্যারোহবিশেষ, সমাবৃত্তিরূপ, সেও তো আসলে এই শুদ্ধিসমতা স্থাপনের যত্ন। শুদ্ধির সমতা যে ভূমিতে নিরতিশয় এবং একান্ত নির্দোষ, সে ভূমি পূর্ণতা পরমতার ভূমি।

ধর, নাম ও নামী। অভেদ শতবার বলিলেও তো অভেদটি বোধে ওভাবে দাঁড়াইতেছে না। নিরপরাধ হইয়া নামকে ব্যাহরণ, কীর্তন, অনুস্মরণ, অনুধ্যান করিতে করিতে সেটি 'পরা' পর্যন্ত লইয়া যাও। সঙ্গে নামীকে তুমি নামের 'বাহ্য' ইত্যাদি বিকল্পনা শোধন করিয়া একেবারে নামের 'মরমে' তাঁকে 'পশিতে' দাও। নাম যতক্ষণ বলে—'তাবকীন'—আমি তোমার, তখনও নামী অন্তিকে বটে, তবু যেন একটু 'ফারাগে'। ভেদাভেদ। কিন্তু যেই নাম বলিল—'মামকীন'—'তুমি আমারি' অমনি নামে নামীতে অভেদ। কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। দ্রৌপদী এক হাতে নীবি চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতটি তুলিয়া, 'বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারকানাথ—আমি যে তোমার দাসী!' —বলিয়া ডাকিতেছেন কিন্তু নাম-নামীর 'ফারাগটি' তো যায় নাই; কিন্তু, যেই ডাকিলেন 'আমার সখা, আমার প্রাণনাথ!' অমনি কি হইল?—বলত! সাধনভজনে উপায়-উপেয়-উপেত এ তিনটিকে শুদ্ধি সাম্যে আনিতে যত্ন করিতে হয়। জানিও যে—আপন যত্নে কার্পণ্য না করিয়া কৃপার পাবনী ধারায় নিজেকে পাতিত করিতে পারিলেই এই শুদ্ধি সমতাটি সুষ্ঠু সম্পন্ন হয়। কেননা, ব্যবধানের বিপুলতা, গভীরতা জটিলতা ইত্যাদি নিমেষে নিরাকরণ করিতে সমর্থা কৃপা—'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্' ইত্যাদি। 'মনুয়ারে দাঁড় বেয়ে চল'—যদি সে পরমানন্দের করুণাধারায় তোর ভজনডিঙ্গি ফেলতে চাস।

কিন্তু তা হইলেও শুদ্ধিসমতাসাধনে একটা অভ্যারোহী ক্রম অবশ্যই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য পরের সূত্রটি হইতেছে—

১১। দ্বৈধেন ধারাবাহিতা ত্বন্যথা॥

কিন্তু অন্যথাস্থলে (তু অন্যথা) দ্বিধারূপে ধারাবাহিতা লক্ষিতা হয়॥

শুক্লা চ ভামতী ধারা কৃষ্ণাহপরা চ তামসী।
শুদ্ধে শুদ্ধেহন্তরীক্ষে তে শুদ্ধা দ্বিধৈতয়োর্গতিঃ॥ ৫৩

ধারা বা ধারাবাহিতা যেটি আদি শুদ্ধরূপ, সেটি অগ্রে বলা হইতেছে। এক শুক্লা ভামতী (জ্যোতিষ্মতী) ধারা, অপরা কৃষ্ণা তামসী। এ দুয়ের মধ্যস্থ দ্বন্দ্বভাব, যদি শুদ্ধ অন্তরিক্ষ সহকৃত হয়, তা হইলে এ দুটিই (শুক্লা ও কৃষ্ণা) শুদ্ধা। আর এদের (এতয়োঃ) যে দ্বিধা গতি ('শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে'), সে গতিও শুদ্ধা। অন্তরিক্ষ শুদ্ধ হওয়া মানে (অন্তরিক্ষসূত্রে) অনন্ত, উদাসীন (নিরপেক্ষ) এবং শূন্য (নির্বীজ) হওয়া। অন্তরিক্ষের এই অনন্তত্বাদি 'মান'এর ভূমিতে আসিয়া; পরমের ভূমিতে 'মান' যায়, কাজেই সেখানে 'অনন্ত' ইত্যাদি অন্যভাবে। মানের মধ্যে আসিয়াও অনন্তবৎ ইত্যাদিরূপে এটি ব্যবহারে লাগিয়াছে। এখন, শুক্লা এবং কৃষ্ণাকে শুদ্ধা রহিতে গেলে, তাদের 'ব্যবধান' আর নাই (অন্তবৎ) এরূপ হইলে হয় না। ব্যবধান যদি এক 'রেখামান'ও হয়তো, সেটিকে অবশ্য নিরপেক্ষ ও নির্বীজ হইতে হয়। অর্থাৎ রেখা যদি বলে—আমি শুক্লার পানে একটু যাইব, কি কৃষ্ণার পানে তা হইলেও হয় না। আবার, আপন 'গর্ভ' হইতে কিছু প্রসব করিয়া এর ভাগে ওর ভাগে চাপাতে গেলেও হয় না। শুদ্ধভাবে 'শুক্ল'কে 'অহঃ' এবং কৃষ্ণাকে 'ক্ষপা'রূপে প্রসন্ন করিও। আগে আবিঃসূত্রে এবং রাত্রিসূত্রে শুক্লা ও কৃষ্ণা শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সে সেস্থলে শুদ্ধরূপেই। অমেয় ভগবত্তা 'মানে' অবতরণ করতঃ শুক্লা এবং কৃষ্ণা এই মৌলিক শুদ্ধাবৃত্তি এবং শুদ্ধা ধারারূপতা ধরিয়াছেন। সুতরাং এই দুই রূপেই ইহা ভজনীয় তত্ত্ব। তামসী (শুদ্ধা) মানে আসুরী নয়। 'Black' 'Dark' এসব বলিলে যে Devilএর ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তা এতে আদৌ নেই।

শুদ্ধা শুক্লা অথবা শুদ্ধা কৃষ্ণ—এ দুয়ের কোনটিই 'অসুরবিদ্ধা' 'পাপ্মাবিদ্ধা' পদার্থ নয়। এ দুটিকে শুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় লইলে, শুক্লা=উমা, হৈমবতী, গৌরী; কৃষ্ণা=শ্যামা মা। আবার গৌর=কৃষ্ণ, কৃষ্ণ=গৌর। গৌরী=শ্যামা, শ্যামা=গৌরী। শুক্ল মানে প্রকাশ (অ-ঢাকা), কৃষ্ণ মানে গোপন (ঢাকা), ব্যক্ত আর অব্যক্ত—এভাবে লইয়া ঐ অভেদ সমীকরণ দুটি ভাবিয়া দেখ। শ্যামারূপে সমস্ত কিছুই তিনি যেন ঢাকিতেছেন; গৌরী, ত্রিপুরাদিরূপে সমস্ত কিছু ঐশ্বর্যমাধুর্য প্রকাশ করিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে রাধাভাবের যে অপূর্ব চমৎকারিত্ব, সেটি কৃষ্ণে যেন 'গোপন'। সেই গোপনকে সাক্ষাৎ আস্বাদনের নিমিত্ত কৃষ্ণ হ'লো গৌর। অন্তরিক্ষ বা ব্যবধানকে পূর্বোক্ত প্রকারে অনন্তবৎ এই অর্থে না লইয়া যদি অনন্ত, অসীম এই

অর্থে নাও তবে, সে ক্ষেত্রে, শুক্লা যদি ভাব + ∞, আর কৃষ্ণাকে −∞, তবে এই দুই রকমের আনন্ত্যে দুটি মিলিয়া এক হইয়া যায়। উদাসীন=দ্বন্দ্বাতীত ভাবিলেও তাই। এবং শূন্য ভাবিলেও তাই। বর্তমানে ব্যবহারে নামিয়া আসিয়াও বৃত্তি এবং ধারারূপে এই দুই পদার্থের (real concept) যে শুদ্ধিভাব, তার কথাই লক্ষণে এবং কারিকায় বলিতেছি। এখানে পদার্থ দুটি না মিশিয়া দ্বন্দ্বস্থিতই রহিয়াছে (as polarised) এবং না মিশিয়া পাশাপাশি দুটি ধারা রূপ গ্রহণ করিয়াছে. প্যারালাল (Parallelism) দুটি ব্যবহারে মুক্ত এবং পাশাপাশি, কিন্তু পরাকাষ্ঠায় (অনন্তে) মিলিত, অভিন্ন।

সাধনায় এ দু'য়ের এই শুদ্ধ মুক্ত পাশাপাশি ভাবটা মিলাইতেই হয়। এই নিমিত্ত শুদ্ধা শুক্লা এবং শুদ্ধা কৃষ্ণা ভজনীয় তত্ত্ব। দুটিকে সাধিয়া বলিতে হয়, 'ওগো তোমরা দুটিতে বৃত্তি এবং ধারা এই দুইরূপেই আমার জীবনে, আমার সাধনে শুদ্ধ হ'য়েই এসো।' যেমন, সুষুপ্তি যদি কৃষ্ণার শুদ্ধরূপ হয় তো—'ওগো তুমি ব্রহ্মস্বরূপে অভিসম্পন্নভাবেই এসো, ভঙ্গা হ'য়ে, বিদ্ধা সঙ্কীর্ণা হ'য়ে এস না।' ভাবকেও তাই বলিতে হয়। দিনের আলোককে যেমন বলিতে হয়,—'তুমি সব প্রকাশ কর, কিছু ঢেকে রেখো না', তেমনি রাত্রির আঁধারকে বলিতে হয়,—'তোমায় অতল কালো স্নেহের তলে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর...বাইরে তোমার না যায় দেখা।' ইত্যাদি। একদিকে পরিপূর্ণ প্রকাশ প্রবণতা—সেটি অকুণ্ঠ-অকৃপণ হোক্। অন্যদিকে পরিপূর্ণ মৌন-বিশ্রান্তি এবং ভাব-গভীরতা তন্ময়তা—এটিও নিশ্চিন্ত-নিবিড় হোক। ওখানে কুণ্ঠা, এখানে চিন্তা আসিলে কোনোটাই খাঁটি হইল না, চরিতার্থও হইল না। মোটামুটি একটাকে প্রকাশের ধারা, অপরটাকে ভাবের ধারা বলিতে পার। ভাবের আপন স্বভাবই হইল—'চুপ'। সে কিছু বলিতে পারে না, বলে না। তাকে কিছু ভাবাতে বা বলাতে গেলে, সে 'মুষড়ে' যায়; 'উপে' যায়। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তাই তো উত্তম নয়। পক্ষান্তরে, প্রকাশের বেলা বস্তুকে যতটা 'খুলে মেলে' দেখতে পার ততই ভাল। একটা ফুল। কবির ভাবযুক্ত দৃষ্টিতে এক রকম। বিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ আর বিশ্লেষণ দৃষ্টিতে অন্যরকম। দুটোই শুদ্ধ করিয়া পাইলেই ভাল।

জপ চলিতেছে। জপাক্ষরের সুষ্ঠু-ব্যাহরণাদি পুরা ও শুদ্ধভাবেই চলুক। এটি প্রকাশের ধারা শুক্লা। এর মধ্যে অপ্রকাশ বা অস্ফুটরূপতা মিশিতে না দেওয়াই ভাল। তারপর, অর্দ্ধমাত্রায় জপাক্ষর যখন স্ফুটরূপতা ছাড়িয়া লীনরূপতা পাইল, তখন

তাতেই নিশ্চিন্ত স্থিত ও চালিত হও। এর মধ্যে 'ঝাঁকুনি' দিয়ে জপাক্ষর এবং তার স্ফুটরূপকে ফুটাইতে যাইও না। দুটিকে শুদ্ধ রাখিতে পারিলেই শ্রেয়ঃ এবং চরিতার্থতা। জপ অন্তে যখন ব্যুত্থান ব্যবহারে আছে, তখন (সম্ভব হইলে) জপধারাটিকে অবিচ্ছেদে ফল্গুধারায় বহাইতে হইবে। গোপনে, ভাবের ও রসের ভূমিতে জপ চলিতেছে, ভঙ্গ হয় নাই। বরং আরও গাঢ়, আরও সরস হইয়াছে। বাহিরে পড়াশুনা বা অন্য ব্যবহার বেশ সজাগ ও নিপুণ ভাবেই করিয়া যাইতেছ। এখানে বাহিরে নিবিষ্টতা-রূপে শুক্লা, ভিতরে আবিষ্টতারূপে কৃষ্ণা। গোড়ায় এ শুদ্ধিরূপটা সহজে আদায় হয় না। দুটিকেই প্রসন্না করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই মিলিবে।

কিন্তু, এ শুদ্ধি তো সাধনের নিধি। আগে যে দ্বিদলের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, তাতেই এই দুই শুদ্ধভাবে (অর্থাৎ শুদ্ধ প্রকাশ আর শুদ্ধভাব) উপায়টি দেওয়া আছে। যা কিছু মিশ-বিমিশ্র তাকে অমিশ্র অবিমিশ্র করার পরম কৌশলটি ঐ দ্বিদলে। সে পরম কৌশলটি কুশলী হয় আপন কৃপায় আর কুশল হয় তোমার প্রপত্তিতে।

এইবার, শুদ্ধ থেকে মিশ্র, জিহ্ম, সঙ্করে পড়ল। কেন? উত্তর কে দেবে? 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ'! কিন্তু, পতন তো যেভাবেই হোক, ঘটিয়াছে।

১২। সান্তাদিত্বে মিশ্রতাপত্তিঃ ॥

অন্তরিক্ষ বা ব্যবধান যদি সান্ত (অন্তবৎ—আর নাই) প্রভৃতি হয়, তা হইলে মিশ্রতা আসিয়া থাকে।। সান্ত আদি বলিতে সান্ত, সাপেক্ষ, সগর্ভ বা গর্ভিত বুঝিতে হইবে।

সান্তাদিত্বেঽন্তরীক্ষস্য পারস্পরিকতাশ্রয়াৎ।
উভয়ব্যাপ্তিবিদ্ধত্বাদ্ ভবেদ্ ভবাদিসঙ্করঃ॥ ৫৪

সাধারণ বিশ্ব-ব্যবহারে ও ভাবপ্রত্যয়ে কি ভাব দেখিতেছি? উভয়ের মিশ্রভাব বা সঙ্কর। শুদ্ধ আকারে কোনওটিই মিলিতেছে না। ব্যবধান (Interval Principle) সান্ত, সাপেক্ষ ও সগর্ভ হইয়া দুটিকে মিশাইয়া বিশ্বে এবং তার প্রত্যয়ে বহাইয়া দিতেছে। পরমে প্রকাশ এবং 'স্বপ্রকাশ' (অব্যক্ত) দুইই অভেদে থাকে। পরম প্রকাশ

বা স্বপ্রকাশে 'অপ্রকাশ' আবার কি? সে অপ্রকাশ অনিরুক্ত-অলক্ষণাদিরূপ অবাঙ্‌মনসগোচরতা। সেখানে ভেবে-চিন্তে বলবার কইবার ভূমি আর নেই। সেভাবে সেটি পরম শুক্লা অথচ পরম কৃষ্ণা। 'নামিয়া'ও যতক্ষণ শুদ্ধভাবে স্থিতা এবং বাহিতা, ততক্ষণ শুক্লা কৃষ্ণা পূর্বোক্তভাবে ভজনীয়া এবং সমাশ্রয়ণীয়া। 'বোধ'কে তার 'শোধে' (শুদ্ধিতে) রাখ, 'ভাব'কেও তার আপন ভাবে রাখ। যদি না থাকে তো, তাই করিয়া লও। জ্ঞানের আলোটি যতই 'সাদা' (uncoloured, impartial) হয় ততই জ্ঞানের যথার্থতা। ভাবের ভঙ্গী যতই সান্দ্রমৌন আবিষ্টতায় আপনাকে জড়ো করিয়া রাখিবে, ততই তারও স্বাভাবিকতা। এই নিমিত্ত সাধনে শুক্লা এবং কৃষ্ণা এই দুটি শুদ্ধা ধারার যখন যেটি মিলিয়া যায়, তখন সেইটিকে শুদ্ধভাবে ভজনা করাকে বলে নিষ্ঠা।

প্রণবাদি নাম জপ চলিতেছে। সে জপের ধ্বনিরূপে যে প্রকাশরূপতা (পরিস্ফুটতা), সেইটি তৎকালে শুক্লা। সে শুক্লাকেই শুদ্ধা রূপে ভজনা কর। ভাবরস, জ্যোতিঃ ইত্যাদি যা কিছু এখন অব্যক্ত, তার জন্য বিক্ষিপ্ত, বিচলিত হইও না। 'টানা হেঁচড়া করে' সেটিকে এর ভিতর ঢোকাতে ব্যস্ত হইও না। সে সব পর্দার ওধারে ঠিক প্রস্তুতই আছে। তোমার এধারের পার্টটা শেষ, বেশ সুষ্ঠুভাবেই শেষ হবার অপেক্ষায় আছে। ফুলটি ফলটি যেমনধারা তার কুঁড়ির অপেক্ষায় থাকে. কুঁড়িটি নষ্ট হইলে তো সবই নষ্ট হইল। ফলকথা, প্রকাশ্য এবং নেপথ্য-দুটিকেই তাদের পালা ভাল করিয়াই পালিতে দাও। প্রকাশ্যের মাঝখানে নেপথ্যের পরদা তুলিয়া পালা পণ্ড করাই হয়। তার চক্রের সমাচরণে যখন বিন্দুলীন ভাবে 'শয়ন করিলে' তখন শয়নই কর, কোথায় গেল 'অউম' করিয়া ব্যস্ত হইও না। এই রকম শুদ্ধাকে শুদ্ধভাবে ভজনা কর। কতই না সুযোগ এবং ক্ষেত্র রহিয়াছে এবং আসিতেছে! শুদ্ধির সমতা এবং পরমতা সাধনের নিমিত্ত নিষ্ঠা আবশ্যক।

কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যভিচার তো দেখা যাইতেছে। জ্ঞানেও ভাব আসিয়া দৃষ্টি সজল করিয়া দেয়; স্বচ্ছ উন্মুক্ত ভূমি থেকে হয়ত' একটুখানি টলিয়েও দেয়। তাতে প্রকাশের আবরণ হয়। ভালভাবের কথাই বলিতেছি। কিন্তু রাগ-দ্বেষ-বিপ্রলিপ্সাদিও তো আছে। সে সবের কথা পরে হইতেছে। ভাবের মধ্যেও সেটাকে 'উল্টেপাল্টে' দেখা, 'জাহির' করা—ইত্যাদিও আছে—যাতে সে ভাবের শুদ্ধতা এবং আবিষ্টতা দুই-ই ভাঙ্গিয়া যায়। এইভাবে, যদি পূর্বব্যাখ্যাত শুক্লা এবং কৃষ্ণার উভয়ের ব্যাপ্তি উভয়ের দ্বারা

বিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দুইটি বৃত্তের মত যদি তারা কাটাকাটি করে, অথবা দুটি ঊর্মি শ্রেণীর (wave-system) মত পরস্পরকে আঘাত (interfere) করে, তবে তার ফলে জাত হয়, মিশ্রতা বা সঙ্কর। পরস্পরকে বেধ বা আঘাত করার আগে (as pre-condition) কি হওয়া চাই? যে দুটি ছিল স্বতঃশুদ্ধ, সেটি কোনও প্রকারে এক পারস্পরিকতাধর্ম (correlationality) আশ্রয় করিয়া বসিল। এই পারস্পরিকতা (আমরা পরস্পরে কিছু ভাঙ্গিব গড়িব—এই ভাব) বশতঃই তাদের স্বতঃশুদ্ধির যেটা ব্যাপ্তি সেটি বিদ্ধ হয়। এ পারস্পরিকতা সম্বন্ধের ঘটকটি কে? সেই অন্তরিক্ষ! অন্তবৎ অন্তরিক্ষ সাপেক্ষতাধর্মীও হইয়াছে। অর্থাৎ সে কখনও শুক্লাকে লইয়া কৃষ্ণায় মিশাইবে, আবার কখনও কৃষ্ণাকে লইয়া শুক্লায়। সাদা আর কালো—total reflection and total absorption—দুয়ের এইরকম ব্যাপ্তিবেধ জন্যই না যত বর্ণালী! বিশ্বে অশেষ মিশ্রতার উৎপত্তি। এ মিশ্রতা থেকে সঙ্কর (অন্তর্বহিঃ বিশ্বে)—ভাবসঙ্করাদি অনেক প্রকারের। এগুলি ক্রমে দেখা যাইবে।

আচ্ছা, অন্তরিক্ষের এরূপ ঘটকত্বের আবার ঘটক কে? এ অতি দুরবগাহ সমস্যা। মূলে এক বা দুই যাই থাকুক, তা' থেকে বিশ্বে এই অশেষ মিশ্রণটি ঘটিল কি প্রকারে? বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিয়া এর উত্তর পাই না,—শেষ প্রশ্নের শেষ উত্তরটি প্রজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি শির অবনত করেন এবং নাসদীয়াদি সূক্ত শোনান। কাজেই, মিশ্রণকে মানিয়া লওয়া ছাড়া গতি কি? তবে সাধনের দিক থেকে ভরসার কথা এই যে, মিশ্রণ মানেই সঙ্কর নয়, যে সঙ্করো নরকায়ৈব। মিশ্রণে অনুরূপতা-বিরূপতাদি আছে। কাজেই, মিশ্রতাপত্তি থেকে শুদ্ধি সমাপত্তি যাবার এক অভ্যারোহী পন্থাও আছে। অর্থাৎ মিশ্রের ভেতরেও মিশ্রভাব আছে! শ্রেয়ঃ এবং হেয় আছে। অরি ও মিত্র আছে। যেমন নাম জপের সঙ্গে পূজা, স্তব, পাঠ, কীর্তন, সাধুসঙ্গ আদি মিত্র। কিন্তু ব্যাজ-বিঘ্ন জনক সঙ্কর মিশ্রণটি সর্বথা পরিত্যাজ্য। পরের সূত্রে সেইটি লক্ষিত হইতেছে।

১৩। তথা চ বক্রতাজিহ্মতাপত্তিঃ ॥

পূর্বোক্ত মিশ্রতাপত্তি ঘটিলে বক্রতাপূর্বা জিহ্মতার সম্ভব হয়।

শুদ্ধে সাধননিষ্ঠা উত্তম অধিকারে এবং সেটি বিরল। শুদ্ধটিকে ধ্রুবভাবেই হোক, আর ধারাবাহিক ভাবেই হোক, নিষ্ঠার সঙ্গে খাঁটি করিয়া আশ্রয় করা, সহজ নয়।

শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধাভক্তি, শুদ্ধকর্ম (নিষ্কাম, অনাসক্ত, অথচ দক্ষভাবে) এই তিনটি সচরাচর নাগালের বহুদূরে। অথচ সাধন মাত্রেরই শুদ্ধি আর নিষ্ঠার (একতত্ত্বাভ্যাস) সাধন। শুদ্ধি পরে লক্ষিত হইতেছে। সেখানে যে 'তত্ত্বতঃ অবস্থিতি'র প্রসঙ্গ, সেটি তো একবারে, সঙ্গে সঙ্গে হয় না, ক্রমান্বয়ে, ধারাবাহিকতায় সিদ্ধ হয় (কার্যতঃ)। আর, এই ক্রমানুসারিতায় মিশ্রণকে, সাহিত্যকেও মানিয়া লইতে হয়। এই জন্য সহিত জপ, বৈধী ভক্তি, কর্মাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি করতঃ জ্ঞান—ইত্যাদি সাধারণ 'মার্গ' চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু শুদ্ধির সমতা এবং পরমতাই যখন লক্ষ্য, তখন এটি অবশ্যই দেখিতে হয়—যাতে 'মিশ্রণ'টিতে 'সাহিত্য'ই হয়, রাহিত্য-পাতিত্যাদি না হয়। বৈরূপ্য (ব্যাজ) এবং বৈগুণ্য (বিঘ্ন) ঘটে, এমন কিছুর মিশ্রণ, অথবা এমনভাবে, অনুপাতে মিশ্রণ ঠেকাইতে হয়। রসায়নে যেমন ধারা করিতে হয়। সঙ্গীতাদি সাধনে যেমন করিতে হয়। মূলস্পন্দের সঙ্গে সারূপ্যকে যদি বলি শুদ্ধি, তবে যেটির সঙ্গে বৈরূপ্যাদিজনক কিছু মিশিতে দিলে চলে না। এরূপ অপমিশ্রণকে ব্যামিশ্রাদি (incompatibility, incongruity) বলা হইবে।

এই ব্যামিশ্রাদি পরিহারের নিমিত্ত বর্তমান সূত্র। আগেই মিত্রতাপত্তি তো ঘটিয়াছে। কিন্তু সে আপত্তি অনিষ্টাপত্তি হবেই এমন নয়। মিশ্রণ ছাড়া সর্জন (সৃষ্টিই) নেই। এ সর্জনকে সরাসরি বর্জন করে কে? আর, এতে কি অপরূপ বিচিত্রতা! বর্ণ বল, সুর বল, ছন্দঃ বল, ভাব বল, ব্যঞ্জনা বল—সব তাতে গোড়াতেই যে এই মিশ্রতাপত্তি। সুতরাং এ আপত্তিতে 'আপত্তি' নেই। কিন্তু—যদি তার সঙ্গে, সেরূপ হইয়া আবার (তথাচ), বক্রতাপূর্বা জিহ্মতাপত্তি ঘটে, তবে তো সত্য সত্যই 'আপত্তির' বস্তু দেখা দেয়। বক্রতাপূর্বা কেন? বক্রতা (curving, curvature), মিশ্রণের মত সর্জনের গোড়ার কথা। বরং আরও গোড়ার কথা। এটিরও বর্জন সম্ভব, এসব থাকিতে, হয় না। আগে, রাত্রিসূত্রে তাই বক্রতান্বয়ের কথা বলা হইয়াছে। যেটি ব্যক্ত রূপে আবিঃ (manifest, kinetic) সেটির অব্যক্ত (unmanifest, potential) ভাবটি পাইতে গেলে আবিঃর ঋজু রেখাটিকে বক্র (curve, fold, envelope) আকৃতিতে আসিতে হয়। সরলরেখাকে বৃত্ত, বৃত্তাভাস, বর্তুলাদি অশেষ অনৃজু আকৃতি ধরিতে হয়। নচেৎ, কিছুই যে গাঢ়, গূঢ়, গভীর, গম্ভীর ভাবটি পাইবে না। সত্তা, শক্তি, আকৃতি এবং ছন্দঃ—এই চারিটিই বঙ্কিমের ভজনায় নিযুক্ত। একটা ক্ষুদ্র রেণু থেকে বিরাট বিশ্ব, একটা সামান্য মাত্রাস্পর্শ

থেকে গভীরতম ভাব—কোথাও এই বঙ্কিম ভঙ্গিমায় ভঙ্গা বা রদ দেখিবে না। রসের দিক থেকে 'বঙ্কিম' রসনিগূঢ়তার প্রাণ। রসাস্বাদের সর্বস্ব। কিন্তু এহেন মিশ্রতা এবং বঙ্কিমতার সাথে যদি জিহ্মতা জোটে তবে কি হয়? তা' হইলে, সুষম মিশ্রণের স্থলে হয় ব্যামিশ্রাদি বিষম (বিগুণ) মিশ্রণ; আর বঙ্কিম সুন্দরটি বিরূপবক্র। যেমন, সঙ্গীতে স্বরভ্রংশ তালভঙ্গা আদি হইলে হয়। যেমন আবার, ধর কোন জ্যোতিষ্ক আপন নির্দিষ্ট কক্ষটিতে সুষম ছন্দে পাক খাইতেছে। কিন্তু তার কক্ষে যদি ঐ জিহ্মতা (বিষম বিরুদ্ধ বক্রতা) দেখা যায় তো, তার ছন্দোগত্ব টুটিল। ফলে—আপদ। স্থূলতঃ এ সকল রেখাবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের প্রশ্ন, ভূতবিদ্যা। সূক্ষ্মেতে, স্পন্দবিজ্ঞান এবং প্রাণবিদ্যা। কারণে মহাবিদ্যা। মূলে, মহামায়া। কোন রেখা সুষম, বক্রতা বা বঙ্কিমতা রূপ পাইবে, কি বিষম বক্রতা বা জিহ্মতারূপ, সেটি নির্ভর করে বক্রতা সম্পাদক সহগ (components বা co-factors) গুলির অনুপাতিত্বের উপর। অনুপাতটি সুষমের দিকে বা অনুকূলে না হইলে ঐ জিহ্মতা জন্য কুটিল জটিল ইত্যাদি রূপ। যে সমস্ত প্রতিকূল সহগ ত্রুটি ঘটায় তাকে বল আসুর, পাপ্মা, এনস্, মন্যু ইত্যাদি। এদের ভেদ আছে। অর্থাৎ বৈজাত্যেও 'জাতি' আছে।

আচ্ছা, বৈজাত্যের (জিহ্মের) ঘটক সেই অন্তরিক্ষ তো? ধর, দুটো জ্যোতিষ্ক—সূর্য আর এক তারা। 'স্বাধিকারে' তারা ঠিক রহিয়াছে এবং চলিতেছে, কিন্তু মাঝের ব্যবধানটা যদি সবিশেষ বদ্‌লাইয়া যায় তো দুয়েতেই বিপ্লব। এই রকম বিপ্লবের ফলেই পৃথিব্যাদি গ্রহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক মনে করেন। এক্ষেত্রে, অন্তরিক্ষ স্রষ্টা, সংহর্তা নন। কিন্তু সংহর্তাও হইতে কতক্ষণ! এ দৃষ্টান্তেও অন্তরিক্ষ 'বদলান' ব্যাপারটা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ, জ্যোতিষ্কদ্বয় কাছাকাছি হবার নিমিত্ত, মধ্যের অন্তরিক্ষ নূতন আকৃতিতে 'গর্ভিত' (intrinsically predisposed) হইয়াছে কিনা। ঐরূপ স্বগত প্রবণতা দ্বারা 'প্রচোদিত' হইয়া অন্তরিক্ষ দ্বন্দ্বস্থিত যে কোন দুটির মাঝে 'ঘটকালি' করে কিনা, ইহা প্রণিধানের বিষয়। বিশ্ব ব্যবহারে সর্বত্র অন্তরিক্ষ সগর্ভ বা গর্ভিত (শূন্য নয়)। একটা বীজভাব, সম্ভাব্য-সম্ভাবনাশক্তি আপনাতে ধারণ করিয়া থাকাই তার গর্ভিতত্ব। একটা incalculable potential charge. বীজপ্রদ পিতা অন্তরিক্ষকেও বীজাধান পূর্বক গর্ভিত করিয়াছেন। এই গর্ভিতত্ব নিবন্ধন তার এক স্বগত-প্রবণতা আছে। যেটি সমষ্টি বা বিশ্বের

'প্রারব্ধ' অপেক্ষায়, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, 'সুর' পক্ষে অথবা 'অসুর' পক্ষে হয়। অসুর পক্ষে হইলে (অন্তরিক্ষে সাপেক্ষতাও থাকে), পূর্বোক্ত জিহ্মতা পাপ্মা, এনস্, মন্যু প্রভৃতি। এর জন্য অন্তরিক্ষকে 'দায়ী' না করিয়া ভবপ্রারব্ধকেই কর। সে বেচারী আবার কার দিকে আঙ্গুল দেখাবে? অন্তরিক্ষ স্বয়ং দেবতা; গায়ত্রী মন্ত্রে 'ধীমহি' দ্বারা এই দেবতাকে প্রসন্না পাইতে হয়। 'বরণ্যেং ভর্গঃ=দ্যৌঃ, 'ধিয়োয়োনঃ'=পৃথিবী, আর ঐ 'ধীমহি'=অন্তরিক্ষ। 'প্রচোদয়াৎ'=প্রসাদন।

এইবার কারিকা দুইটি:—

দেশকালাত্মকে যুগ্মে বস্তুনি চাপি ছন্দসি।
বক্রতাব্যাপ্যতাকৃতেস্তজ্জনিঃ সান্তব্যূঢ়তা॥
আনন্ত্যমৃজুবৃত্তিত্বং শান্তবৃত্তিশ্চ শূন্যতা।
সঙ্করে চাসুরী বৃত্তির্বক্রতায়াং হি জিহ্মতা॥ ৫৫-৫৬

দেশকালরূপ যুগ্মকে (space-time) শক্তিসম্ভাব্যতা রূপ যে বস্তু, বিদ্যমানতা-সম্ভাব্যতা-ক্রিয়মাণতা রূপে যে ছন্দঃ—এ সকলেরি আকৃতি (pattern) পূর্বোক্ত বক্রতা দ্বারা ব্যাপ্য (covered); অর্থাৎ এ সকলই বক্রতাপন্ন হইয়াছে (বিশ্ব-ব্যবহারে)। এর জন্য সমস্ত কিছুতেই সান্ত এবং ব্যূঢ়ভাব (measured and involved) দৃষ্ট হয়। একান্ত ঋজু হইলে অনন্ততা, একান্ত শান্ত হইলে শূন্যতা (পূর্বোক্ত নির্বীজ ভাব)। আর বক্রতা ঘটিয়া সান্তব্যূঢ় হইলে যদি আবার তাদের পারস্পরিক 'বেধ' (mutual penetration) ঘটে, আর সে 'বেধ' যদি পূর্বোক্ত ক্রমে আসুরবিদ্ধতা এবং তন্নিবন্ধন আসুরী বৃত্তি জনয়িত্রী হয়, তা হইলে সেরূপ মিশ্রণটি 'সঙ্কর' এবং সে অবশ্যই (হি) জিহ্মরূপতা। মিশ্রণ মাত্রই 'সঙ্কর' নয়। বক্র মাত্রই 'জিহ্ম' নয়। এ সবের ব্যাখ্যা আগে মিলিয়াছে, পরেও মিলিবে। এইবার পরের সূত্র—

১৪। উভয়থা সঙ্করধারা সা চ শুদ্ধিমুখ্যা ধূম্রা
মলমুখ্যা মলিনা॥

উভয় প্রকার হইলে, অর্থাৎ মিশ্রভাবাপত্তির সঙ্গে ঐ বক্রতা-পূর্বা জিহ্মতাপত্তি ঘটিলে সঙ্কর বৃত্তি এবং সঙ্করধারা হয়, আর সেটি শুদ্ধিমুখ্যা (সুর ভাবটি প্রবল,

অসুর ভাবটি দুর্বল) হইলে হয় 'ধূম্রা'; এবং মলমূখ্যা (বিপরীত) হইলে হয় 'মলিনা'।

দেখিয়াছি যে, অন্তরিক্ষের যেটা সগর্ভ (intrinsic potentiality) সেটি জিহ্মতা ঘটানোতে মুখ্যতঃ ঘটকত্ব করে। এই নিমিত্ত জাতকের জন্মকুণ্ডলী (রাশি নক্ষত্রাদি সংস্থা) তার ভাগ্য নিরূপণে এতটা প্রধান। কিন্তু অন্তরিক্ষের অপর দুটি রূপ—সান্ত এবং সাপেক্ষ—সহকারী, উপকারক ভাবে সঙ্গে থাকে। সান্ত—একটা রেখা টানিয়া যেন বলে, নিরূপণ যেভাবে করিতে হয় কর, কিন্তু এই রেখার দিকে নজর রাখিয়া করিও। নিরূপণটি সাধারণতঃ ঐ রেখা বা সীমার মধ্যেই হয়। একটা সান্ত, পরিমিত, দেশ-কালাদি সংস্থায় নিরূপণটি ঘটে। একটা মাপা-জোকা কাগজ দাও, স্কেল দাও, তোমার 'ম্যাপটা' ছকিয়া দিতেছি। আর, সাপেক্ষ কি বলে? যার ম্যাপ ছকিতেছ, যাকে ছকিতেছ, যে স্কেল ইত্যাদিতে ছকিতেছ অর্থাৎ (উপরের দৃষ্টান্তে, জাতক এবং রাশি চক্রাদি) দুটি পক্ষেরই (নিরূপ্য-নিরূপক) স্বতঃসংস্থা (basic makeup) তোমাকে 'অপেক্ষা' করিয়া ছকিতে হইবে। আবার স্বতঃসংস্থা বা স্বভাব ধর্মেই যেটি নিষ্ঠ (নিতরাংস্থিত) সেটি অপেক্ষা থাকেই। ছক অবশ্য বলিবে আমাতে সমস্ত কিছুই ছকিয়া আছে। সেটা এক দৃষ্টিতে ঠিক। সেটা হইল ছকটাকে 'খুলিয়া মেলিয়া' দেশকালাদি আধারে বিশ্বান্বয়ে (cosmically) দেখা। এটা ছকের উদ্ভূত বা সম্ভূত রূপ। এর আগেই 'পাশার চালে'র পালা শেষ হইয়াছে। যেটি সম্ভাব্য ('probable') মাত্র সেটি নিজেকে সম্বরণ করিয়াছে। অণুর জগতেও এটি দেখি।

প্রতিটি বস্তুর 'নাভিতে' স্বয়ং মহামায়াই 'বিন্দুবাসিনী' হইয়াছেন। অর, নেমি এসব বিস্তার করতঃ আপনাকে মাপে আনিতেছেন, ছকে (ম্যাপে) ফেলিতেছেন। কিন্তু পূরাটা নয়, আসলটাও নয়। এও আমরা দেখিয়াছি যে—বোধের যেটি 'ভান' রূপ তার সম্বন্ধে কোনও 'ছকাছকি' নাই। ভান, ভাসাদি রূপতায় আসিলে, আছে। শুধু তাই নয়। 'ছকে' 'নিছকে' পাল্লাও দেখাইতেছেন। কিন্তু এ গভীরে এখন আর নামিতে চেষ্টা করিব না। তবে, এ কথাটা এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে—আমার স্বভাবে, আমার 'কেন্দ্রে' বা 'নাভিতে' এমন এক মহারহস্য রহিয়াছে, সেটি বাইরের সব কিছু ছককে সতর্ক করিয়া বলে, এই পর্যন্ত, আর না। আর বলে আমার যেটি 'স্বত্ব' সেটি নস্যাৎ করিয়া, নাই মনে করিয়া, তোমার কিছুই ছকা চলিবে না। এই

স্বত্বটুকুতেও আনন্দের যেটি লীলাকৈবল্য, সুতরাং লীলাসম্বন্ধ পাতানর স্বত্ব, সেটি নাকচ হয় নাই। সাধনের জীবনে এই মূলভরসাটুকু হারাইতে দিলে তো হয় না।

এই নিমিত্ত যে সঙ্করভাব ও সঙ্করধারার প্রসঙ্গ আসিল, তাতেও শুদ্ধিমুখ্য, আর মলমুখ্য, এই দুটি বৃত্তি, আর তাদের যথাক্রমে ভজনীয়তা ও অভজনীয়তার প্রসঙ্গও আসিল। কেননা, সাধারণ জীব এই সঙ্কর ধারাতেই পতিত। তাকে কি স্রোতের মুখে কুটোটির মত ভাসিয়া যাইতেই হইবে? অবশ্য, ধারাতেও ঐ দুটি 'মুখ'। পালা করিয়াও থাকে। শুদ্ধিমুখীকে ভজনা করিব, করিতে চাই, কিন্তু পারি কি? এইখানেই আমার মূল স্বত্ব, মূল দলিলের কথা। ও দলিল অবশ্য 'তামাদি' হবার নয়, কিন্তু বাইরের ছকের পর ছকে সেটা চাপা আছে। 'পহিলে আত্মকৃপা'ই তার খোঁজ তল্লাস করিয়া দেয়। তারপর গুরুকৃপায় 'পাকা' হয়। শুদ্ধিমুখ্যা সঙ্করধারাকে বলে 'ধূম্রা'। 'ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।' ইনি ভজনীয়তত্ত্ব সঙ্করে অবগাহন করিয়াও। ইনিই সঙ্করকে করিলেন 'শঙ্কর'। ধূম্রা ধূমাও হন—পরমা ব্যাহৃতি রূপে। মলমুখ্যা ধারা মলিনা। এটি কাটাও।

অন্তরিক্ষের সেই পারস্পরিকতা আর উভয়-বেধবিদ্ধতা মনে আছে? ধূম্রায় পরে ঐ বিদ্ধতাটি প্রায় নেই, কিন্তু পারস্পরিকতাটি আছে। অর্থাৎ শুদ্ধা শুক্লা এবং কৃষ্ণায় পরস্পরে ছায়াপত্তি হইলে হয় ধূম্রা। বেধের মুখ্যতা নেই। কাজেই সহজেই, দুটিকে আবার শুদ্ধভাবেই মিলান যায়। মলিনায় বেধ মুখ্য। যেমন, mechanical mixture (করাতের গুঁড়া লোহার গুঁড়া) আর chemical compound.

কারিকা:—

শুদ্ধা শুক্লা চ কৃষ্ণা চৈকস্যামিতরেতয়াশ্রয়া।
জহত্যজহতীত্যেবং সঙ্কীর্ণা স্যাচ্চ জিহ্মগা॥ ৫৭

একেতে (ধূম্রায়) শুদ্ধা শুক্লা এবং শুদ্ধা কৃষ্ণা ইতরেতরাশ্রয়া মাত্র। এটিকে আগে বেধস্পর্শরূপা ছায়াপত্তি বলা হইল। এটি সঙ্করের মাঝেও শুদ্ধিমুখ্যা; ইনিও সন্ধ্যা দেবতার রূপ। উপাসীত। অপরটি বেধমুখ্যতাবশতঃ শুক্লাকৃষ্ণায় আপন আপন শুক্ল রূপটিকে 'জহৎ অজহৎ' (তিরোহিত অথচ তা নয়ও) আকারে লইয়াছে এবং 'সঙ্কীর্ণা' করিয়াছে। সঙ্করে এইরকম বেধবৃত্তির মুখ্যতা হইলে 'সঙ্কীর্ণ' রূপতা হয়। তখন সেটি জিহ্মগা জানিও। এইজন্য, জীবনে ও সাধনে অসুরপাপ্মা এদের দ্বারা

'বেধ'টি বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ার স্থল। রোগাদির বেলাতে যেমন। সন্ধ্যা বন্দনাদিতে সযত্নে আশ্রয় করিতে হয়। সর্বগায়ত্রীতেই 'ধীমহি' পদের 'ধ' ও 'ম' এই দুটি বর্ণ ধ্যান করিও। এইবার শুদ্ধিসূত্র।

১৫। তত্ত্বতোঽবস্থিতিঃ শুদ্ধিঃ ॥

তত্ত্বতঃ অবস্থিতিকে শুদ্ধি বলে।

শুদ্ধির কথা আগে বারবার নানাপ্রসঙ্গো নানা আকারে আসিয়াছে। এস্থলে শুদ্ধির 'স্বরূপ' লক্ষণটি মাত্র দেওয়া হইল। দ্বিতীয়খণ্ডে শেষভাগে 'তত্ত্ব' সূত্রিত হইয়াছে। সেইরূপ তত্ত্বভাবেই অবস্থানকে এখানে শুদ্ধি বলা হইল। যখন কোন কিছুতে বাদ দেবারও কিছু নেই, অন্য থেকে যোগ করারও কিছু নেই, তখন সেই তত্ত্বরূপে পরিনিষ্ঠিত হওয়া, অথবা অচ্যুতপ্রতিষ্ঠ হওয়াকে, পূর্ণশুদ্ধি বলে। ইহাই নীচের এই কারিকাটির ভাব—

> ন কিঞ্চিদ্ধেয়মত্রাস্তি ন বোপাদেয়মন্যতঃ।
> শুদ্ধিঃ পূর্ণা হি বিজ্ঞেয়া তত্ত্বেঽচলপ্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

এটি চরমা ও পরমা শুদ্ধি। যতক্ষণ দ্বন্দ্বসুতা, ততক্ষণ শুদ্ধি সমতার সাধন! দ্বন্দ্বের পরে পরমা বা তত্ত্বপরিনিষ্ঠিতা শুদ্ধি। Elimination and Addition দুই-ই সেস্থলে অনবকাশ। কিন্তু শুদ্ধিসমতার নিমিত্তও যে সাধন, তাতে ক্রম বা ধারারূপটি অবশ্যই আছে। জপাদি সাধনে যেটি 'অভ্যারোহ' বা 'সমাবৃত্তি' সেটি তো এই শ্রেয়ঃ ক্রম বা ধারাকেই সমাশ্রয়। শ্রেয়ঃ ক্রমটি ক্রমশঃ প্রেয়ঃক্রম হইয়াও যায়। শুদ্ধি সমতায় পৌঁছিলে যেটি শ্রেষ্ঠ, সেটিই প্রেষ্ঠ। রসভূমিতে সে ধারায় ক্রমশঃ রাধাভাব-সুবলিতা কায়ার ছায়ার পরশটি লাগিতে থাকে।

ক্রমে আসিয়া শুদ্ধি হয় অনুশুদ্ধি, প্রতিশুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, সংশুদ্ধি, সমশুদ্ধি এবং স্বতঃশুদ্ধি। সঙ্গীতাদি সাধনে এই স্তরগুলি মিলাইয়া লইও। ওস্তাদের অনুকরণ অনুশুদ্ধি। আপন সুরছন্দের যে মগ্ন সংস্কারভূমি তার অথবা অনুরণনাদির 'পোষক' প্রতিক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধি—প্রতিশুদ্ধি। বিশ্লেষণ পূর্বক বিশেষ বিশেষ স্বরাদির

যে ব্যষ্টিশুদ্ধি, সেটি বিশুদ্ধি। সমগ্র সমষ্টিভাবে শুদ্ধি পরিশুদ্ধি। রাগ বা ছন্দের নিগূঢ় ভাব বা ব্যঞ্জনার শুদ্ধি সংশুদ্ধি। বিশেষ গুণী সাধক ব্যতীত শুদ্ধির এ ভূমিতে আরূঢ় বড় কেউ হয় না। সুর এবং ছন্দের যেটি বৈরাজরূপ (নাদ ইত্যাদি) তাতে সমন্বয় ঘটাইতে পারিলে সমশুদ্ধি। আর শেষে পরমাব্যক্ত রসমাধুর্যে একান্ত আবিষ্টতায় স্বতঃশুদ্ধি। যেরূপ কিম্বদন্তী তাতে তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী এই শেষ দুটি ভূমিতেও আরূঢ় ছিলেন। জপাদি সাধনেও এই ভূমিগুলি মিলাইতে যত্ন কর। 'গুরুকা সাথ ধ্বনি ফুকারো' এতেই শুদ্ধির খাঁটি অনুক্রম। আগের খণ্ডে, পরিণয়ি প্রভৃতি যে পাঁচটি ছন্দের সাধন সাধকস্তর বলা হইয়াছে, সে পাঁচটিকেও স্মরণ কর। এই খণ্ডের গোড়ায় 'ভূতশুদ্ধি' প্রকরণটিও অনুধাবনীয়। শুদ্ধিতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রয়োগ বর্তমান স্থলে বিবেচিত হইল না। তবে মূলে যখন প্রাণ এবং স্পন্দের ব্যাপার, তখন শুদ্ধিসাধনে অধ্বগত্বের নিমিত্ত সংখ্যাদি, ছন্দোগত্বের নিমিত্ত ভাবাদি এবং ধামগত্বের নিমিত্ত মনন-ধ্যানাদিকে সমাশ্রয় করিতেই হইবে। অশুদ্ধিরও এক অধোগাধারা আছে। যেমন, কোন পাতকের গুরুত্ব এবং পৌনঃপুনিকত্ব নিবন্ধন 'পাতিত্য'। এখানেও সংখ্যা আছে। ধর, মানুষের ক্রোমোজোম নাম্বার যদি হয় ৪৮, তবে কোনও গুরুপাতক ৪৮ বার একাদিক্রমে হইলে, পাতিত্য ঘটাইতে পারে। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের মূলে প্রাণ ও স্পন্দবিজ্ঞান তাই প্রাসঙ্গিক। শ্রীভগবানের বা মায়ের নাম মহাশোধন। সে নাম নিষ্ঠা সহকারে জপে, কীর্তনে, সংখ্যাশঙ্কাদ্রিপাটন পর্যন্ত হইয়া যায় যে! সুতরাং পাতক তার সংখ্যাদির যে ভয় দেখাইল, সে সংখ্যাশঙ্কাই তো উন্মূলিত হইয়া গেল!

পরের সূত্রে শুদ্ধি বা পাবনীধারা বিশেষভাবে সূত্রিত হইতেছে।

১৬। ধূম্রমলিনয়োর্মন্থন-শুদ্ধিকৃচ্ছঙ্করধারা।।

পূর্বোক্ত ছায়াপত্তিরূপা (অবেধমিশ্রা) ধূম্রা এবং বেধসঙ্করা মলিনা—দুয়েরি মন্থনপূর্বক শুদ্ধি সম্পাদন করে শঙ্করধারা। অবেধবেধমিশ্রা শুদ্ধিমুখ্যা ধূম্রা স্বয়ংই ঐ ছায়াপত্তিরূপ ধূম্রভাব উন্মোচন করতঃ সাধককে শুদ্ধে লইতে সহায়তা করেন। কিন্তু বেধমিশ্রা মলিনা (মলমুখ্যা) সঙ্করধারা, তাতেই জীব বিশেষভাবে পতিত। এইটির শুদ্ধিই একান্ত আবশ্যক। এই সঙ্করধারার এক ঘোরাবর্তরূপ হইল বেদমন্ত্রের সেই 'মর্ত্তস্য ধূর্ত্তিঃ।' অসুর বা আসুরএর (জিন্নের) সাধারণ রূপ।

এনস্ (কৌটিল্য) মন্যু (জাটিল্য) ইত্যাদি। এর শুদ্ধি সাধনটি মন্থনপূর্বক হয়। মন্থন এই নিমিত্ত যে—অশুদ্ধিমুখ্য বেধ মুখ্য যে সঙ্কর, তার নিম্নগা অধোগা বৃত্তি আছে। তার ফলে, সে ক্রমেই 'পাতালে' গূঢ় ব্যূঢ়াদিরূপে আড্ডা গাড়িতে চায়, ফ্রয়েড। মগ্ন চেতনায় (sub-conscious) এ 'repression', 'fixation', 'complex'-এই সবই হইল তার গোপন দুর্গ। মগ্ন চেতনার কোন তলে তারা যে জমাট হইয়া আছে, জট পাকাইয়া আছে, তার ঠিকানা নাই। সময়ে সময়ে কোন 'fault' 'fissure' বা অন্য weak crust উপলক্ষ্য করিয়া সেগুলো উপরে ভাসিয়া উঠিয়া অনর্থের সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড প্রভৃতি অনেকে বর্তমানে এই সব গভীর স্তরে 'বোরিং' করিয়া দেখাইয়াছেন। পুরাণবিদ্যায় (বেদতন্ত্র যোগাদিতে) এ সব 'অবতলের' (sub-surface formations) খোঁজ খুবই রাখা হইত। অসুররা সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইল, হয়ত বিনষ্টও হইল, কিন্তু 'শেষাঃ পাতাল মাযয়ু'। সেখানে দল পুষ্টি এবং বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল. এদের জয় করিতে গেলে দক্ষ-কুশল মন্থন আবশ্যক হয়। শুধু সমতালিক ক্রিয়ায় কুলায় না—surface reaction does not materially help. উপরে প্রকাশ্যে যতটা, তার চাইতে অনেক বেশী (মাত্রায় ও বিক্রমে) অবচেতনার ভিতরে, নেপথ্যে সঙ্করধারার উপদ্রব। উপরে লক্ষণ (symptom), ভিতরে ব্যাধির বীজাধার।

এখন, কুটিল, জটিল, সর্পিল অথচ প্রমাথী এই সঙ্করকে মন্থন করে শঙ্কর। দন্ত্যের মন্থন তালব্যে। মন্থনে চারিটি অঙ্গ—আধার, অক্ষ, গুণ, গুণী। মন্ত্রে—বাগ্‌ভব ঐঁ। এর মধ্যে অ=আধার, অ+ই=এ হইল আধারাশ্রিত অক্ষ; নাদবিন্দু=গুণ, অগ্নি ও সোম=গুণী। মন্থনে অমৃতই উঠে, কিন্তু অগ্নীষোম অসমঞ্জস (কিম্বা সুর-অসুর) হইলে, বিষও উঠিতে পারে। জপাদি সাধনে সাধারণ মন্থনের এই আকৃতিটি সবিশেষ কার্যকরী—শ্রীভগবানের কৃপাঘনমূর্তি শ্রীগুরুতত্ত্বই আধার, সাধকের দৃঢ় শুভ সঙ্কল্পরূপ আত্মাই হইল অক্ষ, দীক্ষাদি পুরঃসর জপাদিসহকারে ভগবৎ সঙ্গাই হইল গুণ, আর অশেষ কল্যাণগুণাকর শ্রীভগবান্ স্বয়ং গুণী। অন্যভাবেও মন্থনটি ভাবনা করিবে (আবশ্যক মত), এবং নিষ্পাদন করিবে। শঙ্করধারা ঊর্দ্ধগা, সুতরাং অধশ্চেতনার প্রচ্ছন্ন ব্যূঢ় যে আসুরী-সম্পৎ, সেটি মন্থন করতঃ তোমার 'এই' চেতনায় 'তুলিয়া' দেখাইয়া, এবং সম্ভব মত শোধন করিয়াই

সে ক্ষান্ত হইল না। তার 'অক্ষ' ঊর্দ্ধ, সমূর্দ্ধ চেতনাতেও সমুত্থিত বা সমুত্থানসমর্থ। সুতরাং ঊর্দ্ধলোক পরম্পরার দৈবীসম্পৎ সেটি দোহন করিতে পারগ।

'প্রকৃতি' পরে সূত্রিত হইয়াছে। যেটি গীতার 'অপরা' সেটি বেধসম্ভবা (যাতে বেধের সম্ভব আছে বা হইতে পারে)। সঙ্কর এই অপরাকেই বিশেষভাবে আক্রমণ করে। 'পরা' ('জীবভূতা সনাতনী'), বেধবিরহ ছায়াপত্তির অধিকারে আসে। পরা অসুরাদি বিদ্ধা হন না। কিন্তু পরাতে অপরার 'ছায়া' পড়ে, আবার পরমার 'আভা'ও ফোটে। শঙ্কর এই পরাতেই পরমামুখী করতঃ অপরাধ বেধ এবং পরার ছায়া এ দুয়েরি মন্থন করে। কেননা, সে ছায়াটি বেধবিদ্ধা অপরারই ছায়া। 'ধীমহি' এই ছায়া মুছিয়া তাতে পরমের শুদ্ধ আভা ফোটানর নিমিত্তই। এইবার কারিকাটি—

জিহ্মং ব্যূঢ়মধঃ স্রোতস্তস্য হ্যক্ষাদিমন্থনম্।
শুদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ শিবায়াপি শঙ্করধারয়ৈমিতি॥ ৫৯

এর ভাব আগেই ব্যক্ত হইয়াছে। স্রোতের বিশেষণ ত্রয়ে—জিহ্ম, ব্যূঢ়, অধঃ—মনোযোগ দিও। 'অক্ষাদি' বলিতে আধার-অক্ষাদি চারিটি। শ্লোকের শেষে শঙ্করধারার মাত্রীতনু—'ঐঁ ইতি'। শঙ্করেরও তিনটি বৃত্তি ধ্যান করিও—শুদ্ধ্যৈ, শান্ত্যৈ, শিবায়। লক্ষ্য করিও যে 'ধূম্রা' ও 'ধূমা' এ দুটি তত্ত্বই মিশ্রতাপত্তিসত্ত্বেও বিদ্যা ও সুরপক্ষে। সুতরাং, শঙ্কর সাধিকা, সঙ্করপালিকাভাবে নয়। 'আ' বর্জন করিলে, ধূম্র (যথা, ধূম্রলোচন) এবং ধূম (যেমন, ধূমযান)—এ দুটি সঙ্করের ভাগে। পূর্বেরটি 'র' যোগে, রাজস, পরেরটি 'তামস'।

আচ্ছা, তবে কি যে তত্ত্ব শুদ্ধ, শান্ত, শিব, সত্য, সুন্দর, সে তত্ত্ব—অর্থাৎ পরব্রহ্ম—সেটি ঐ জিহ্মের গ্রাসে কবলিতই আছেন? ব্রহ্মকে জিহ্মমুক্ত করাই শুদ্ধি? এই আশঙ্কা বারণের নিমিত্ত পরের সূত্র—

১৭। ন হ্যনিত্যেন নিত্যস্য প্রসজ্য প্রতিষেধত্বম্॥

নিত্যবস্তু যেখানে 'প্রসজ্য' কিনা, প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, সেখানে কোন অনিয়ত অনিত্যব্যাপারাদির দ্বারা সেই প্রসজ্য নিত্যেরই প্রতিষেধ হইয়াছে, এরূপ হয়

না। প্রসজ্য হইয়াছে প্রতিষেধ যার, এমন নিত্য-প্রসজ্য প্রতিষেধ নিত্য। এখানে প্রসজ্য=নির্ব্যূঢ় প্রসজ্য বুঝিও। অনিত্যে অনিত্যে বাধ=প্রতিষেধ হোক্। কিন্তু যে প্রসঙ্গো নিত্যই উদ্দিষ্ট, সে প্রসঙ্গা কোনও ক্রমেই নিত্য প্রতিষেধ প্রসঙ্গা হইতে পারে না। কেননা সেটি অসম্ভব। তাতে প্রতিজ্ঞাহানি। নিত্যের (যেটি প্রসজ্য নয় এমন) প্রতিষেধ হয়—যেমন 'এই ঘটে নিত্যতা নাই'। এ স্থলে এইঘটে নিত্যের প্রতিষেধ হইল। 'শব্দ অনিত্য'—তার্কিকাদির এই সিদ্ধান্তেও নিত্যের প্রতিষেধ হইতেছে এবং মীমাংসকের শব্দ, বৈয়াকরণের 'স্ফোট' ইত্যাদির মত শব্দে নিত্যতার প্রসজ্যতা আছে বটে, কিন্তু নির্ব্যূঢ় প্রসজ্যতা নেই। সব অনিত্য সব ক্ষণিক—এ সব করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত 'শূন্য'কেই তো নিত্য করিতে হয়। তা যদি হয় তো কোন অনিত্যের দ্বারা সেই শূন্যের নির্বূঢ় প্রসজ্যতার প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ, যে স্থলে শূন্যই উদ্দিষ্ট সে স্থলে শূন্যই নাই—এমন বলা চলে না। তা বলিলে আত্মঘাতিত্ব ঘটিল। এ সব দার্শনিক বিচার এখানে আর চলিল না। জপের যেটি আধার সিদ্ধান্ত, তাতে বাধমাত্রবিরহ আছে এমন এক 'সৎ' (১।১।৩০) প্রতিষ্ঠিত। সেটির বাধ কোথাও নেই। আর, যে স্থলে সে নির্ব্যূঢ় প্রসজ্যতা, সে স্থলে সেটির প্রতিষেধও হয় না। এই দুটি কথা মনে রাখিতে হইবে। No absolute contradiction, and no negation in the case of unconditional affination. তা করিতে গেলে self-contradiction ঘটে।

এখন, নিত্যে, সতে, শুদ্ধত্বও নিত্যত্ব। যে স্থলে এই শুদ্ধতার প্রসঙ্গাই নিব্যূঢ় ভাবে (unconditionally) আসিতেছে সে স্থলে, কোনও অনিত্য (অনিয়ত ব্যাভিচারী) দ্বারা সে শুদ্ধত্বের প্রতিষেধ (negation) হয় না—এইটি বলা সূত্রের অভিপ্রেত। 'তৎসৎ'-এর অবম যে কোনও ভূমিতে শুদ্ধতার অনিয়তা ব্যাভিচার ইত্যাদি দেখা যাইতে পারে। সুতরাং সে সব ভূমি লক্ষ্য করিয়াই সঙ্কর এবং শঙ্কর ধারাদ্বয় বৃত্তিমতী। পরম ভূমিতে শঙ্করেরও পরমসমাহিতা বিশ্রান্তি। শুদ্ধ রস ভূমিতে, ধারা রূপটি হ্লাদিনীর সারাৎসারারূপে নিজের 'বিবর্ত্ত' রূপে শুদ্ধ রসের পরম অনির্বচনীয় লীলায়নটি করে। জ্ঞানভূমি আর যোগভূমি, আর রসভূমির শুদ্ধি লইয়া এখানে প্রসঙ্গা করিব না। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত—এ তিনের লক্ষণ এ স্থলে আলোচ্য নয়। তবে, জপের আধার-

অধিকরণে ঐ তিন মিলিয়া অখণ্ডপূর্ণ। জ্ঞানে বিশেষ করিয়া বুদ্ধ, যোগে মুক্ত, রসে শুদ্ধ। কোন সম্প্রদায়সিদ্ধান্তের কথা হইতেছে না। জপাদিসাধন সর্বাধিকরণেই, কাজেই জপের নিজস্ব আধার সম্প্রদায়পক্ষপাতমুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুদ্ধ পরমে যে কি বস্তু তা পরমাই জানেন। তবে, জপাদিসাধনে শুদ্ধিকে জ্যোতীরসের এক পরমপাবনী ধারারূপেও পাই। পাই বলিয়া না রক্ষা! বিচারী এ ধারাকে সাপেক্ষশুদ্ধি বলিয়া বিচারে ক্ষান্ত হউন্; যুঞ্জান মুমুক্ষু এটিকে ঋতম্ভরাদি শুদ্ধি বলিয়া যুক্ত-মুক্ত হবার উপায় করুন্; আর, ভক্তরসিক এটিকে বৈবর্ত্তশুদ্ধি বুঝিয়া তাতে আকৃষ্ট-অনুগ-ধামগ হউন্। এইবার কারিকাটি—

যা ধূমধূম্ররোধোভ্যাং শাশ্বতী স্যন্দতে সরিৎ।
ধূমধূম্রায়মাণায়াং তস্যামানবকাশতা॥ ৬০

যে শাশ্বতী সরিৎ (বিশ্বপাবনী শুদ্ধিধারা) নিম্ন ব্যবহারের ভূমিতে অবতরণ করিয়া ধূম এবং ধূম্র (তামস এবং রাজস)—এই দুই তটমধ্যবাহিনী হইয়াছেন (স্যন্দতে), সে সরিৎ ঐ তটদ্বয়ের কলুষ ধৌত করিয়া নিজেই ধূমধূম্রায়মাণাই যেন হইয়াছেন মনে হইতেছে বটে; কিন্তু নিখিল কলুষমল ধৌত করিয়া অশুদ্ধকে শোধন করাই যাঁর স্বভাবধর্ম, তাঁতে ঐ ধূমধূম্রের মালিন্য সাবকাশ হয় কিরূপে? নিখিল অশুদ্ধিশোধনে তাঁর সাংসিদ্ধিকী শুদ্ধি অবশ্যই ব্যাহত হয় না। যেমন সাধারণ ক্ষেত্রে অগ্নি, সূর্যরশ্মি, গঙ্গাদি পুণ্যপ্রবাহ। এত কুটিল, এত জটিল যে 'সঙ্করনরক', ধূর্ত্তিই যার নীতি, তা থেকে পরিত্রাণের ভরসাই তো ঐ 'শাশ্বতী স্যন্দমানা সরিৎ'! 'সর্ব্বভাবেন' এটিকে সমাশ্রয় কর। পঞ্চগঙ্গা এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহশক্তির বিগ্রহ শ্রীগুরুতত্ত্বে ঐ পঞ্চগঙ্গার একাধারে সমাবেশের প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ডেই হইয়াছে।

আচ্ছা, যেটি প্রকৃতি তা থেকে চ্যুতিস্খলনাদি না ঘটিলে তো বিকৃতি হয় না, আর বিকৃতি না ঘটিলে তা থেকে পুনঃ 'প্রকৃতিস্থ' হবার নিমিত্ত শুদ্ধিসংস্কারেরও প্রসঙ্গ আসে না। এই নিমিত্ত শুদ্ধির আধার এবং 'অনুবন্ধ' (বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অধিকার) রূপ 'প্রকৃতি-প্রত্যয়' সূত্রিত হইতেছে।

১৮। তত্ত্বমধিকৃত্য প্রকৃতি-প্রত্যয়ৌ।।

তত্ত্বকে অধিকার-করতঃ প্রকৃতিও বটে, প্রত্যয়ও বটে। যেখানে কিছু বাদ দেবার অথবা যোগ দেবার অপেক্ষা নেই, সেখানে 'তৎ+ত্ব'। এটি ঠিক এই-ই, এ থেকে বাদ কিছু দেওয়া হইল না, এর সঙ্গো যোগও কিছু করা হইল না—এভাবে হরণ পূরণ দুটিকেই শূন্যে আনিলে যেটি থাকে, সেটি তত্ত্ব। তত্ত্বসূত্রে ইহা বহুধা আলোচিত হইয়াছে। যদি বল, বাঁধাকপির পাতা বাদ দিতে দিতে শূন্যই দাঁড়ায়; যদি সত্যই তাই হয় তো শূন্যই তত্ত্ব। রূপসংজ্ঞাদি স্কন্ধ কাটিয়া গেলে ঐ শূন্যই শেষ, মাধ্যমিকাদিরা মনে করিতেন। পরমে বা চরমে যাইয়া তত্ত্ব শূন্য না আর কিছু, সে বিচার এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। দার্শনিক বিচারের কূট কলাকৌশলগুলি প্রদর্শন তো উদ্দেশ্য নয়। সে যত্ন অন্যত্র হইয়াছে—আবশ্যক মত গণিতের পরিভাষা গ্রহণ করিয়াও বিচারের সাধিষ্ঠ বিশদতা রক্ষার নিমিত্ত। প্রথমখণ্ডে তত্ত্বের নির্দেশে 'ভান'ই পুরোভাগে চলিয়াছিল। ভান থেকে মর্শপঞ্চকের ফলে ভাসপঞ্চক। অস্মদ্ ভান কি যুষ্মদ্ ভান, অত্র ভান কি তত্র ভান, ইদানীং ভান কি তদানীং ভান, এ সম্বন্ধে কি ও সম্বন্ধে—এ সব রকম করিয়া লইতে গেলে ভান আর ঠিক ভান থাকে না—এও বলা হইয়াছে। নির্ব্যূঢ় অখণ্ড সমগ্র যে ভান তাই তত্ত্ব, এ ভাবেই উপসংহার করিয়া পরব্রহ্মে যে পরমপূর্ণতা তাহাই তত্ত্ব, এই ভাবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

এই পূর্ণ ও পরম যে তত্ত্ব, তাতে, অর্থাৎ সেই অধিকারে, প্রকৃতিও তদ্রূপ, প্রত্যয়ও অনুরূপ। সে তত্ত্বে যাহা প্রকৃতি তাও পরমা, এবং তাতে যে প্রত্যয় (যেমন, পূর্বসূত্রে ধারা এবং লীলারূপে আবির্ভাব), সেটিও পরম। ভগবত্তার যে প্রকৃতি সেটি পরমা, তাঁতে যে লীলাদি প্রত্যয় সেটিও পরম। কিন্তু 'মানে' বা ব্যবহারে আসিয়া, তত্ত্বও আর নির্ব্যূঢ়ভাবে (unconditionally) তাই থাকে না; অর্থাৎ, তত্ত্বের লক্ষণ সেখানে পুরাপুরি বর্তে না। 'যথাসম্ভব' নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে (হানোপাদানরহিত) কোন ভান (experience) হইলে, সেটি তত্ত্ব (Fact) বলিয়াই আদৃত (appreciated) হয়। এতে মানব্যবহার (limitation) থাকে, সুতরাং এ তত্ত্বকে লইয়া ধ্রুবাস্থিতি নেই। একটা কাষ্ঠা বা Limit এর প্রশ্ন সঙ্গো সঙ্গো থাকেই। তবে 'যথাসম্ভব স্বয়ংস্বত্ব' (self-existing and functioning independently) ভাবেই তার 'সমাদর'টি করিতে হয়, তার 'মর্য্যাদা'টি দিতে হয়। মনুষ্যসমাজে 'ব্যক্তিকে' 'রাষ্ট্রকে'

যেমনধারা দেবার চেষ্টা হয়। এই যুক্তিতে, ঠিক লক্ষণে না আসিলেও, জীবও তত্ত্ব, জীবের প্রকৃতিটিও (গীতার কথায়) পরাপ্রকৃতি। আবার, ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব, এবং ভেতরের আর তিনটি লইয়া এরা অপরা প্রকৃতি। সাংখ্যে, পাতঞ্জলে, শৈবশাক্তাগমে তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা। অথচ, মূল লক্ষণ মত তত্ত্ব সংখ্যেয় পদার্থই নয়। জপে মন্ত্রতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, ইষ্টতত্ত্ব—ইত্যাদি তিন, পাঁচ এবং আর আর সংখ্যাতেও তত্ত্ব পদার্থকে লওয়া হয়। জপ্য অক্ষর কি তত্ত্ব, অর্দ্ধমাত্রা কি তত্ত্ব, কলা কি তত্ত্ব—ইত্যাদি তত্ত্ব ঘটিত প্রশ্নের তো অন্ত নেই! আর, সে সব তত্ত্ব অধিকারে প্রকৃতিই বা কি, বিকৃতিই বা কি; সে সব সম্বন্ধে শুদ্ধ, যথার্থ, 'ঋত' প্রত্যয়ই বা কি, বিপরীতই বা কি; —এসব প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তার যেমন লাঘব নেই, এদের সংখ্যারও তেমনি গৌরব নেই। 'ওঁ' ব্যাহরণ করিলে; প্রকৃতিতে হইল তো? জপ করিতেছ; তোমার প্রত্যয়টি কোন মাত্রায়? আগ্নি না সোম? উদয়ে কোন্‌মুখী, বিলয়ে? এ সব প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ঘটিত প্রশ্ন, খুবই জরুরি। ঐ প্রণব বা তার তত্ত্বকে অধিকার করতঃ এসব প্রশ্ন। মীমাংসায় যাগের বেলা যেমন প্রকৃতি-বিকৃতি ইত্যাদি বিচার। ও স্থলে তত্ত্ব যাগ। তার পিছনেও 'আম্নায়, চোদনা, অপূর্ব্ব' ইত্যাদি কত কি! তত্ত্ব এবং তদধিকারে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের নিরূপণ ও সমাচরণই তো সর্ববিধ বিদ্যাপূর্বক ব্যবহারে (জড়াদি বিজ্ঞানেও বটে) মুখ্যকথা। কোন তত্ত্বকে লইয়া প্রকৃতি-প্রত্যয় করিতে গেলে ঐ অনুবন্ধ চতুষ্টয়—প্রসঙ্গতঃ উত্থিত হইয়া থাকে। এসব কথা যেমন দরকারী, তেমনি সহজ। কিন্তু গোড়ায় ঐ মূল তত্ত্বটিকে,—তার মূলা প্রকৃতি (রসভূমিতে স্বরূপ শক্তি), আর মূল প্রত্যয় (লীলাকৈবল্য)—মূলে রাখিয়াই এ সমস্ত 'রূঢ়' তত্ত্বাদির 'আদর' করিতে হইবে। যেটি নির্ব্যূঢ়, সেটি এই সব তাতে আসিয়া রূঢ়ও হইয়াছেন, গূঢ়ও হইয়াছেন। যেটি Fact Absolute, সেটি Pragmatic Fact হইয়াছে। যেটি খাঁটি তত্ত্ব নয়, সেটিকে কোন ব্যবহারনিষ্পত্তির গরজে, অবচ্ছিন্ন-পরিচ্ছিন্ন করিয়া, অথবা সেভাবে লইয়া, মনে করা হইতেছে, এইটিই এ ক্ষেত্রে তত্ত্ব। এরূপে লইতে গেলে, রূঢ়ি আর ব্যূঢ়ি—এই দুটি আকৃতি অবশ্যই আসিয়া থাকে। গোটা তত্ত্বের এক টুকরা (হয়ত' তার নাভি বা কেন্দ্রটাই বাদ দিয়া) আদৃত (in acceptance and usage) হইতেছে; এইটে রূঢ়ি। বাকিটা অনাদৃত (veiled and ignored) হইতেছে; এইটে ব্যূঢ়ি। তত্ত্বকে অধিকার করতঃ যে প্রকৃতি আর প্রত্যয়, তারাও এই দুই আকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে।

পঙ্কে তো শামুকাদিও জন্মে, কিন্তু পঙ্কজ বলিতে পদ্মই বুঝাইল; মনে তো ক্রোধাদিও জন্মিতেছে, কিন্তু মনোজ বা মনসিজ বলিতে কামই হইল। এ সবে ব্যাপিকা যে অভিধাদি শক্তি সেটিকে এক নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আনিয়া 'রূঢ়' (আড়ষ্ট, rigid, জমাট) করিয়া লওয়া হইতেছে। অক্ষর বর্ণ এবং রেখা—এ সকলের নিখিল অভিব্যঞ্জকতা আছে। থাকারই কথা, কেননা, প্রাণব্রহ্ম—ওসবের প্রতিটিতেই পূর্ণই রহিয়াছেন। সুতরাং, প্রণবের অ, উ, ম, হ্রীঁ আদি বীজ, কালী কৃষ্ণাদি মহানাম—এঁদের প্রতিটি অক্ষরে নাই কি? তবে, বিশেষ বিশেষ অধিকারাদি অনুবন্ধের অনুরোধে ঐ সব অক্ষর, বর্ণ, রেখাদি এক এক বিশিষ্ট আকৃতিতে যেন 'রূঢ়' হইয়া আবির্ভূত হন। বাকি সবটাই, তদধিকারানুরোধে, 'গূঢ়ি' এবং 'ব্যূঢ়ি'। অক্ষরাদির বিশেষ বিশেষ সংহতি, সমূহাদি বশতঃও তাদের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিচিত্র 'রসায়ন' ও 'রূপায়ণ' (basic bio-chemistry and spectrography)। প্রণবের ঐ তিন অক্ষর তো নানা অধিকারাদিতে নানাভাবে রূঢ় হইয়াছে এবং হইবে; কিন্তু মাণ্ডূক্যশ্রুতি তাদের অমাত্র-তুরীয়েই পর্যবসান করিলেন। হ্রীঁ আদি বীজ সম্বন্ধেও তাই। অনুবন্ধের অনুরোধে তত্ত্ব, এবং সে তত্ত্ব-অধিকারে প্রকৃতি-প্রত্যয়। Pragmatic এর অনুবাদ ব্যবহারিক মন্দ নয়, তবে এ ক্ষেত্রে 'আনুবন্ধিক' নামটা আরও স্পষ্টার্থ। ব্যাকরণে 'স্ফোট' নিত্য এবং তাঁতে ব্রহ্মভাবনাও হইয়াছে। ইনি পরাপশ্যন্তীভূমি হইতে 'হৃদয়ে' মধ্যমায় স্থিত হইয়াও 'কণ্ঠে' বৈখরীরূপে যখন ব্যক্ত হন, তখনই বিশেষ বিশেষ দেশকালনিমিত্ত সম্বন্ধে অবতরণ করতঃ বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধানুরোধে বিশেষ বিশেষ রূঢ়তা অঙ্গীকার করেন। রূঢ়তাও নমনীয় (elastic, plastic)। সঙ্কোচপ্রসার ঘটিতেছে, ব্যাপ্তি বাড়িতেছে কমিতেছে। কাজেই, স্ফোটের নিজস্ব যেটি তত্ত্ব, এবং সে তত্ত্বাধিকারে যেটি প্রকৃতি-প্রত্যয়, সেটি বৈখরীতে ঠিক তাই রহিয়া ব্যক্ত হইল না। সাধারণ ব্যাকরণে ধাতু-প্রাতিপদিকে হইল প্রকৃতি; আর, সুবন্ত-তিঙন্তাদি তাতে প্রত্যয়। পরাবিদ্যায় (উপনিষদে) প্রাণ, আকাশাদি শব্দ বিভিন্ন অনুবন্ধে বিভিন্নভাবে অর্থবোধক হইয়াছে, কিন্তু অনুক্রমোপসংহারাদি ষড়্লিঙ্গদ্বারা সে সকল শব্দের পরব্রহ্মেই লক্ষ্যতাপর্যাপ্তি করার জন্য কত না প্রয়াস! তবু গোল মেটে না, উপলব্ধিতে মহাসমন্বয় এবং পরমসমন্বয়ে না আসা পর্যন্ত।

এই সব কারণে, তত্ত্ব এবং তদধিকৃত্য প্রকৃতি-প্রত্যয় শুদ্ধ লক্ষণে 'পরম' এবং 'নির্ব্যূঢ়' রহিয়াও, ব্যবহার অপেক্ষায় এবং অনুবন্ধনিবন্ধন রূঢ়-ব্যূঢ়াদি দ্বন্দ্বের ধারায়

নামিয়া আসিয়াছেন। এই নিমিত্ত, তত্ত্বশুদ্ধি, প্রকৃতিশুদ্ধি, প্রত্যয়শুদ্ধিও প্রাসঙ্গিক হইয়াছে।

প্রণবাদির জপ ধ্যানাদি কর্মে ঐ তিনটিকেই দীক্ষা-শিক্ষাসম্মত ক্রমে 'আনুবন্ধিক' ভাবেই সাধিতে হয় বটে, কিন্তু সাংসিদ্ধিকের পানে লক্ষ্য রাখিয়াই। রসাশ্রিত সাধনেও অন্যথা নয়। কি তোমার ভজনীয় তত্ত্ব, তাঁর এবং তোমার কি-ই বা প্রকৃতি, এবং সে সম্বন্ধ-আধারে কি ভাবে প্রত্যয়টি হইতেছে বা হওয়া আবশ্যক—এই তো প্রশ্ন!

এইবার কারিকা—

কিং নিত্যং কিমনিত্যং বা সাধিতং কিঞ্চ বাধিতম্।
ন তত্ত্বমধিকৃত্যেদং নিরূপ্যমাণতাং ব্রজেৎ॥৬১

কি নিত্য, কি-ই বা অনিত্য, কি সাধিত, কি-ই বা বাধিত, এ সবের কোনই নিরূপণীয়তা নেই, তত্ত্বের অধিকরণ মননাদিতে না আনিয়া। অর্থাৎ তত্ত্ব যদি সাংসিদ্ধিক এবং আনুবন্ধিক ভাবে থাকে, তবেই এ সব প্রশ্নের সমাধেয়তার প্রসঙ্গ হয়, অন্যথা হয় না।

এইবার প্রকৃতি সূত্র—

১৯। প্রকৃতিরনন্তরিততথাত্বং তত্ত্বস্য॥

তত্ত্বের যে তথাত্ব, কিনা স্বভাব, সমরূপতা, সেটি যদি অনন্তরিত ভাবে, কিনা, সমরূপতা থেকে কোন অন্তর বা ব্যবধানে না রাখিয়া লওয়া হয়, তখন সে ভাবকে বলে প্রকৃতি।

এটি অবশ্য প্রকৃতির স্বভাব লক্ষণ। অন্তর বা ব্যবধান=সেই Interval Principle and Function। দেশ-কালাদি নানা অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ আকারে এই ব্যবধান 'ক্রিয়া' করিয়া থাকে। অন্তরিক্ষসূত্রে এর পরিচয় পাইয়াছি। এ ক্রিয়াটিরও অব্যক্ত-ব্যক্ত (potential-kinetic), ব্যস্ত-সমস্ত (differentiated integrated) ইত্যাদি আকৃতি আছে। ব্যবধানের প্রাথমিক বৃত্তিটি হইল—যেটি স্বতন্ত্র-নিরপেক্ষ (self-existing unconditional), সেটিকে কোনরূপে অপরত্বের অপেক্ষায় (conditionalityতে) লইয়া যাওয়া। এখন, এই ব্যাপারটি শূন্যের দিকে লইতে পার, অথবা অনন্তের দিকে। একান্ত শূন্য করিলে তত্ত্বের তথাত্ব আর প্রকৃতি একই হইল। শূন্যবৎ বা শূন্যকল্প করিলে, ঐ অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ 'লেশ' বা 'ছায়ামাত্র' থাকিল। তত্ত্ব, যদি ধ্রুব এবং পূর্ণের ভূমি হয় তো, তবে এই শূন্যকল্প (evanescent) স্থলে, প্রকৃতি হইল—ধ্রুবায়মাণতা এবং আপূর্যমাণতার প্রান্তভূমি। 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' ইত্যাদিতে এই অনির্বচনযোগ্য অচিন্ত্যভেদাভেদটি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তত্ত্ব=ভগবত্তা=পরমাপ্রকৃতি, এটি এই অভেদসমীকরণরূপে গ্রাহ্য। অর্থাৎ শূন্য শূন্যই। অন্তরটিকে অনন্ত করিলেও—মহাশ্চর্য! আবার, সেই পরম. কেননা শূন্যও অনন্ত কেবল ঐ ক্ষেত্রেই সমাপ্ত। অন্তরটি সান্ত হইলেই কিছু-না-কিছু সাপেক্ষ ভাব। আর, 'অন্তর'টি শান্ত হয় শূন্যে অথবা অনন্তে। পরা, অপরাদি অশেষ প্রকৃতিবৈচিত্র্য—সবই আসে শূন্য আর অনন্ত, এই দুই পরাকাষ্ঠার মধ্যে। ব্যবধানের দুটি বৃত্তির কথা আগে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে—একটি পারস্পরিকমুখ্যা, অপরটি বেধমুখ্যা। শ্রীভগবান্ অথবা ভগবতী আপন অনন্ত ঐশ্বর্য প্রকটন অথবা অশেষ মাধুর্য রসায়নের নিমিত্ত যে স্বীয়া প্রকৃতি সমাশ্রয় করেন, সেটি তাঁর পরমতায় পরমাই; অথচ, সেটিতে যেন পারস্পরিকতা মুখ্যারূপে প্রকাশ করেন। তিনি আর তাঁর প্রকৃতি যেন 'দুয়ে' অন্বিত, মিলিত রূপে তাঁদের ঐশ্বর্য মাধুর্যাদি প্রত্যয় সম্ভাবিত, বিস্তারিত করিতেছেন। অপরা প্রকৃতিতে কিন্তু এরূপ শুদ্ধ পারস্পরিকতার ভূমিটি যেন ঢাকা পড়িয়াছে, বেধমুখ্যতাও দেখা দিয়া বৈরূপ্য বৈগুণ্যাদি অশুদ্ধিকে সামনে বসাইয়াছে। জীবের পরা প্রকৃতি—পূর্বোক্ত প্রকৃতিদ্বয়েরই 'তটস্থা'। শুদ্ধ পারস্পরিকতাভূমিমুখীন হইলে প্রত্যক্, অশুদ্ধ বেধমুখ্যভূমিমুখীন হইলে পরাক্। কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুসরণে নয়, কিন্তু যেটি মৌলিকতত্ত্বাধার, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই এই বিবৃতি দেবার যত্ন হইতেছে। 'তটস্থা'—ও তো ভক্তির কথা, জ্ঞানী কি বলেন, যোগী কি বলেন—এ সব জেরা তুলিয়া গোল করার কিছু নেই। যেমন, জ্ঞানে—ত্বং পদার্থ আর তৎ পদার্থ—এ দুয়ের পারস্পরিকতামুখীন যে শোধন সংস্কার, সেইটি প্রত্যক্প্রবণতা। এ প্রবণতা হইতে গেলে, উভয় পদার্থে অধ্যস্ত যে বেধমুখ্যতা, সেটি কাটাইতে হয়। 'বেধ' সূত্রে বেধের প্রকারতাদি বিবেচিত হইবে। 'বেধ' শোধনে 'বেদ'। যোগী প্রকৃতি-পুরুষের 'ছায়াপত্তি',

'সান্নিধ্যমাত্রোপকারকতা' ইত্যাদি বলেন বটে, কিন্তু, কার্যতঃ, ভবপ্রত্যয়ে বেধমুখ্যতা ঘটিয়াছে। গোড়ায় 'বৌদ্ধবেধ' (logical interpenetration) বটে, কিন্তু বুদ্ধির যে প্রত্যয় ধারা, সেটা তো শুধু ঐ 'বৌদ্ধে'ই বদ্ধ থাকে না—নিজেকে 'গোচর'এর, concrete এর ভূমিতেও 'জমাট' করিয়া লয়। কাজেই, যোগেও বৈরাগ্যাদির মুখ হইবে—বদ্ধবেধ থেকে, বৌদ্ধবেধ, তা থেকে প্রকৃতি পুরুষের 'নিছক' পারস্পরিকতা মাত্রে। যেমন, অয়স্কান্ত আর লৌহ সন্নিধি স্থলে পরস্পরকে টানিয়া পরস্পরে আসক্তই হয়; কিন্তু জবা আর শুভ্র স্ফটিক, পরস্পরে ছায়াপাত করে (জবাও স্ফটিকের ধারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে), কিন্তু পরস্পরে 'লাগিয়া' যায় না। এর পরে, পর বৈরাগ্য ভূমিতে—বিবেকখ্যাতি। কিন্তু এখানেও তত্ত্ব আর তদধিকৃত্য প্রকৃতি-প্রত্যয়ের দিক্ থেকে কিছু গোল বাধে। সেটি এস্থলে বিবেচ্য নয়। যাই হোক, 'অনন্তরিত তথাত্ব' এই পারিভাষিক লক্ষণটি অনুবন্ধানুরোধে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচৎপ্রসরৎ (elastic) করিয়াই বিশ্বব্যবহারে যে সব প্রকৃতিবৈচিত্র্য এবং প্রত্যয় বাহুল্যের ভূমি, তাতে নামিতে হয়। জপ সাধন-বিজ্ঞান; এ বিজ্ঞানে সিদ্ধ বিদ্যার খোঁজ তো চাই-ই; কিন্তু তাতে অধিরূঢ় হবার সোপানাবলী বিশেষতঃ। এখন ধর, গায়ত্রী জপধ্যান করিতেছ। গায়ত্রীতে (যথা, কামদেব) 'বিদ্মহে' অধিরূঢ় ভূমি; 'ধীমহি' অধিরুরুক্ষু ভূমি। কামদেব তত্ত্ব; ক্লীঁ তাঁর অনন্তরিত তথাত্বরূপা প্রকৃতি। তাঁতে 'ধীমহি'-এই অধিরুরুক্ষু প্রত্যয় (ব্যাহরণ-অনুস্মরণাদি) মাধ্যমে 'বিদ্মহে' এই অধিরূঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হও। রসভূমি, জ্ঞানভূমি—সব দিক্ দিয়াই এই প্রকৃতিপ্রত্যয়টিতে ধ্যান দাও। তোমার প্রকৃতি, (আগ্রহরূপা), গুরুতত্ত্বের প্রকৃতি (অনুগ্রহরূপা), নাম জপধ্যানাদি প্রত্যয়ে মিলাইয়া লও। দীক্ষা দুটি প্রকৃতির সমীকরণের আকৃতিটি ছকিয়া দেয়। তোমাকে আপন প্রত্যয়ে সমীকরণটি সমাধান (solve) করিতে হয়। Equationটিকে শোধন করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত Identityতে পাইতে হইবে।

আচ্ছা, এইবার কারিকা—

রজ্জুসর্পে ভুজঙ্গাত্বং বদ্ধত্বমপি চাত্মনি।
অন্তরিততথাত্বে হি নাতঃ প্রকৃতিতা মতা।
অনুবন্ধানুরোধেনাভেদেঽতিন্নাপি ভিদ্যতে॥ ৬২

রজ্জুসর্পে যে ভুজঙ্গজ্ঞান, আত্মায় বন্ধের জ্ঞান—এই সব দৃষ্টান্তে তত্ত্বের তথাত্ব 'অনন্তরিত' ('unremoved') নেই, কাজেই আগেরটায় রজ্জুত্বই প্রকৃতি, ভুজগত্ব নয়; পরেরটায় শুদ্ধত্ব-মুক্তত্বই প্রকৃতি, বদ্ধত্বাদি নয়। তথাপি, অনুবন্ধানুরোধে, যেটি অভিন্না, সেটি তত্ত্বে অভেদে রহিয়াও, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হইতেছে (ভিদ্যতে)।

প্রত্যয় সূত্রটি পরে আসিতেছে। এখানে আগে আকৃতি সূত্র—

২০। আকৃতিরন্তরিতত্বেন॥

তত্ত্বের যেটি তথাত্ব সেটি কোনক্রমে 'অন্তরিত' হইলে হয় আকৃতি। 'অন্তরিত' মানে সোজাসুজি 'অন্তর্হিত' বুঝিলে হইবে না।

জপসূত্রে 'আকৃতি' শব্দটি বোধ হয় সব চাইতে বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি—এই চতুষ্টয়ীতে বারবার। এটিকে স্পষ্টরূপে ধারণা করার জন্য এই লক্ষণ। 'আ' এই স্বরের মুখ্যবৃত্তিও বহুধা আলোচিত ও উদাহৃত হইয়াছে। যেটি আবৃত সেটিকে অপাবৃত করা—এটি তো সুস্পষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যাপ্তি ও কাষ্ঠার কথা থাকাতে, দিক বা মুখের কথা আসে। অর্থাৎ 'আ' স্বরে একমুখে যেমন অপাবরণ হইল, অন্যমুখে তেমনি আবরণও হইল। একটা ধনমুখী, অন্যটা ঋণমুখী বলিতে পার। সাধারণ দৃষ্টান্তে—দিবায় সূর্যের আলোক। এটি একদিকে তমের আবরণ সরাইয়া রূপাদি অনেক কিছু প্রকাশ করে; কিন্তু আবার আলোর আবরণে নৈশগগনের নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জকে ঢাকিয়া দেয়। 'আ' স্বরে এ দ্বৈধদিঙ্মুখতাটি আছে। এর সঙ্গে 'কৃ' এবং 'তি' আসিয়া এটিকে প্রাণের এক বিশিষ্ট (ধর্মসম্বন্ধাদি বিশিষ্ট) আকৃতি (Pattern) দান করে। পরে বিশ্লেষণে দেখিব যে, এই প্যাটার্ণটি তলবৃত্তিতা লম্ববৃত্তিতা, বেধবৃত্তিতা, এবং এ তিনের সংহতবৃত্তিতা এবং অতিগবৃত্তিতা—এই কয়টিরই দ্যোতনা করে। কথাগুলি পরে পরিষ্কার হইবে। তলবৃত্তিকে এ স্থলে মূলবৃত্তি বা 'ভিত্তিবৃত্তি' (Basic Function) মনে কর। অর্থাৎ, এইটি আছে তো আর সবই আছে বা থাকিতে পারে। এখন, এইটিকে ধরিয়াই আকৃতির লক্ষণটি বুঝিতে যাও। অর্থাৎ মনে কর যে—গোড়ায় তত্ত্বের যেটি তথাত্ব সেটি আপন ভূমিতেই আছে, আর, সেভাবে থাকিয়াই একটা

'অন্তর' বা অন্তরাল ('আড়াল') স্বীকার করিতেছে। সুতরাং, আকৃতির আদিমরূপটি হইল—

১। তথাত্বে সতি অন্তরালবৃত্তিতাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।।

তত্ত্বের তথাত্বই রহিয়াছে, অথচ অনির্বচনীয়ভাবে এক অন্তরালবৃত্তি (আপনাকে সত্তাশক্তি প্রভৃতিতে যেন 'আড়াল' দেওয়া) আসিয়াছে, এবং তত্ত্বকে তদাকারে বিশেষিত করিতেছে। পরব্রহ্মে যে নির্বিশেষ ভাব, সেটি এইভাবে (তথাত্বে সতি) আড়াল করিয়া তাঁতে সবিশেষ সর্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিমত্তাদি ভাব (অদ্বৈত সিদ্ধান্তে—মায়াধীশের শুদ্ধমায়োপাধিকত্ব); ভক্তিসিদ্ধান্তে ভগবত্তা স্বীয় বিভূত্বাদি 'অন্তরাল' করিয়া দ্বিভুজ-চতুর্ভুজাদি আকারমত্তায় থাকেন; এতে ভগবত্ত্বের তথাত্বই; বরং কেবল বিভুত্বাদিতে তত্ত্বের যেটি তথাত্ব, সেটির একদেশিত্ব, অসম্যক্ত ইত্যাদি হইবে। রসতত্ত্বে ভগবত্তার যেটি ঐশ্বর্য, সেটিকে অন্তরালে রাখিয়া মাধুর্য এবং মাধুর্যলীলা প্রকাশ। এসব স্থলে আকৃতি শুদ্ধ। ভক্তিসিদ্ধান্তে চিন্ময়, অপ্রাকৃত ইত্যাদি। দৃষ্টান্তরূপে কথা কয়টা পাড়া হইল। বিচারের স্থল ইহা নয়।

২। তথাত্বে সতি পারস্পরিকতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

তত্ত্বের তথাত্বই আছে, অথচ তত্ত্বের সত্তাশক্তি প্রভৃতি এক অনির্বাচ্য পারস্পরিকতা সম্বন্ধটি স্বীকার করিতেছে। যেমন, ব্রহ্মের 'স্ত্রী চ পুমাংশ্চ' ভাব; শক্তিশক্তিমান্‌ভাব; যুগলভাব; নাম-নামী ভাব। কয়টি দৃষ্টান্ত। এ আকৃতি শুদ্ধ। এ স্থলে দুটি 'পক্ষে'ই ভগবত্তার অখণ্ড-বিদ্যমানতা। Such Basic Polarity is *not* division and separation.

৩। তথাত্বাঽবিতথত্বে সতি সাপেক্ষতাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

দার্শনিক প্লেটো যেগুলিকে Pure Archetypes বা Idea বলিতেন, সেগুলি 'আকৃতি', কিন্তু সে আকৃতিপরম্পরার (hierarchy) সঙ্গে বর্তমান 'ধারা' তুলনা করিও, মিলাইয়া দিও না। পূর্বোক্ত দুই স্থলে তত্ত্বের তথাত্ব নিয়ত পরিনিষ্ঠিতই আছে। কিন্তু এই তৃতীয় স্থলে, সেটি 'অবিতথ', অর্থাৎ, অন্যরূপ (other than itself) হয়

নাই বটে, কিন্তু নিয়ত পরিনিষ্ঠিত ভাবে 'যেন' নাই। যেমন, ভগবত্তার শ্রীবিগ্রহ, অবতারাদি। অনুগ্রহ শক্তির মূর্তরূপ শ্রীগুরু। এসব স্থলে সাপেক্ষত্বনিবন্ধন (যথা, শিষ্যের আগ্রহ সাপেক্ষ শ্রীগুরু-অনুগ্রহ) অন্তর বা ব্যবধানে ঐ 'যেন' টুকু প্রবিষ্ট হইয়াছে। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভাবভক্তি এসবের দ্বারা ঐ 'যেন' টুকুর শোধন-ক্ষালন করিয়া লইতে হয়।

৪। তথাত্বহ্‌বিকলত্বে সতি সপক্ষেতরসাপেক্ষতাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

তথাত্ব ঠিক অবিতথ আর নেই, কিন্তু তার বিকলতাও ঘটে নাই, এমত অবস্থায় 'সপক্ষ' ব্যতীত অপরের সাপেক্ষতা নিবন্ধন সত্তাশক্তি প্রভৃতির যে ভাব, সেটিকেও আকৃতি বলা হইবে। ধ্রুবাদি সাধকের ধ্যানাদিতে যে আকার বা ভাবের 'দর্শন' হয়, তাতে ধ্যাতা এবং ধ্যেয় এই দুই সপক্ষ ব্যতীত অপর কোন কোন পক্ষেরও (অনুকূল বা প্রতিকূল) অপেক্ষা কিছু থাকে, কিন্তু সে অপেক্ষাবশতঃ তথাত্বের বৈকল্য (বৈরূপ্য-বৈগুণ্যাদি) যদি না সম্ভাবিত হয়, তা হইলে সেটিও, ইতর ছায়াপাত সত্ত্বেও, যথাসম্ভব শুদ্ধ আকৃতি। পশ্যন্তী-ভূমিতেও দর্শন মাত্রেই 'অবিতথ' হয় না। তবে, যথাসম্ভব অবিকল হইতে চায়, যদি বাধক বা পরিপন্থীর প্রবলতা না ঘটে। এই জন্য—

৫। তথাত্বপ্রত্যক্ত্বে সতি বিপক্ষবেধগৌণসাপেক্ষত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

তথাত্ব অবিতথও নেই, ঠিক অবিকলও নেই, অথচ বিপক্ষ (বাধকসংস্কারাদি) জনিত যে 'বেধ', সেটি যদি গৌণই হয়, এবং গৌণভাবেই সপক্ষদ্বয়ের যে সাপেক্ষতা, সেটিকে বিশেষিত (qualify, condition) করে, তা হইলে তত্ত্বের সত্তাদির যে 'রূপ', সেটি 'প্রত্যক্' আকৃতির পর্যায়ে পড়িবে। ধর, তুমি জাপক, প্রণবাদি তোমার জপ্য। তোমরা দুটিতে সপক্ষ। প্রণব ব্রহ্মবাচক, তাঁর সপক্ষ বিপক্ষ কি? তবে কৃপাপরবশ তিনি তোমার সপক্ষ হইয়াছেন। কিন্তু তোমার বিপক্ষ রাজস-তামস (ধূম্র-ধূম) অনেক। এদের বেধও রহিয়াছে (ব্যাধিস্ত্যানদৌর্মনস্যাদি)। ধর, বেধ রহিয়াও গৌণ, সুতরাং সাপেক্ষভাবটিকে বেধমুখ্য করিতেছে না। এমত স্থলে

প্রণবের ব্যাহরণানুস্মরণাদিতে যে আকৃতি, সেটি প্রত্যঙ্‌মুখী। এ ক্ষেত্রে ধূম-ধূম্রের মার্জনে ধূমা-ধূম্রা আকৃতির সবিশেষ উপযোগ। কেন—তা ভাবিয়া দেখ। সাধারণ ভাবে—বড় ধোঁয়াটে বা ধোঁয়া—বন্ধঘর খুলিয়া তাকে ছড়াতে দাও। সেই 'আ' স্বর। ধূমের 'ম'তে (স্পর্শান্তে) যে জ্বালা (চক্ষুরাদিতে), সেটির পরিহার কিরূপে? ধূমস্থলে আবৃত কর, অধূমস্থলে আয়ত বা আতত কর। আবার, সেই 'আ' স্বর।

৬। তথাত্বপরাক্তে বিপক্ষবেধমুখ্যসাপেক্ষসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

বিপক্ষের (যেমন, তোমার জপাদিতে) বেধটি গৌণ না হইয়া মুখ্য হইলে তথাত্বের পরাক্ত্ব—পরাগ্‌ভাব। তথাত্বের অভিমুখে নয়, পরন্তু বিপরীতমুখে, আকৃতি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। পূর্বেরটায় শুদ্ধিমুখতা, এস্থলে অশুদ্ধিমুখতা।

৭। অতথাত্বে সাপেক্ষস্য বিপক্ষবেধবাধিতসত্তাদিকত্বম।

এই শেষ স্থলে, যথায় তত্ত্ব তথারূপে না রহিয়া অতথারূপ হইয়াছে, সাপেক্ষ সম্পর্কে (সাপেক্ষস্য), তত্ত্বের সত্তাদি বেধবাধিত (বিরুদ্ধ হানোপাদান নিমিত্ত তিরোহিত) আকৃতিটি পায়। পূর্বে যে তথাত্বের পানে উল্টারূপ পরাকের কথা হইল, সেই পরাকের কাষ্ঠা কোথায়?—এইরূপ বেধবাধিত অতথাভাবে। নামজপে 'অপরাধ'—এই পরাকের বিমুখীন-প্রবণতা। অপরাধ একান্ত গুরু হইলে, নামের 'তৎসাপেক্ষ' তিরোভাব। নতুবা, নাম এবং নামশক্তি দুই-ই তত্ত্বতঃ নিরপেক্ষ। সাপেক্ষতায় আসিলেই আবির্ভাব-তিরোভাবাদি প্রসঙ্গ।

আকৃতি সম্বন্ধে আর অধিক বিস্তার এখন অনাবশ্যক। ঐ সপ্তভূমিতে আকৃতিকে 'আকরণ' করিতে হইবে। নচেৎ, ঠিক আকৃতিটি মিলিবে না। জপাদির উদাহরণই দেখান হইল। অপরাবিদ্যায় (বিজ্ঞান-গণিতাদিতে) এসব 'পর্য্যায়' যথাসম্ভব উদাহৃত। অর্থাৎ, আকৃতি এক সার্বভৌম পদার্থ। এইবার কারিকা—

রজ্জুঃ সর্পাকৃতির্বৈষা চাত্মা দেহাকৃতিঃ পুনঃ।
এবং যামাকৃতিং ধত্তে প্রকৃতেঃ সা ভুবর্বশাৎ॥
পারস্পরিকসাপেক্ষে প্রত্যক্ পরাগিতি দ্বয়ম্।
বেধমুখ্যত্বগৌণত্বে যথোপযোগমাকুরু॥

কায়-চ্ছায়ে চ মায়েতি ত্রিধা চেহ স্থিতাকৃতিঃ।
কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা চাপি লুণ্ঠিতা চাবপূর্ব্বিকা॥ ৬৩-৬৫

প্রকৃতি (তত্ত্ব থেকে অনন্তরিত তথাত্ব যেটি), সেটি 'ভুবঃ', কিনা, অন্তরিক্ষ বা অন্তরিতরূপতার 'বশে' (এস্থলে—'চেহ'—সাধারণ প্রত্যয়ভূমির প্রসঙ্গ হইতেছে, নচেৎ, পূর্বোক্ত শুদ্ধ আকৃতিস্থলে কোন বশ্যতা নেই) রজ্জুসর্পাকৃতি, দেহাত্মাকৃতি প্রভৃতি আকৃতি ধরিতেছে। শুদ্ধভূমিতে বশ্যতা নেই, কিন্তু স্বীকার বা ঐ রকম অনির্বাচ্য একটা কিছু আছে। পূর্বে যে আকৃতিকে শুদ্ধাশুদ্ধ উভয়ভাবে সপ্তধা দেখান হইল, তার ঘটকগুলি সংক্ষেপতঃ বলা হইল দ্বিতীয় শ্লোকে। এ ঘটক যথোপযোগ আকরণ কর (আকুরু)। 'ইহ'—কিনা, সাধারণ প্রতীতিস্থলে—কায়াকৃতি, ছায়াকৃতি এবং মায়াকৃতি, এই তিনরূপে আকৃতি স্থিত দেখিতে পাই। অবকুণ্ঠিত, অবগুণ্ঠিত, অবলুণ্ঠিত—এই তিনটি তাদের ভেদক লিঙ্গ। বস্তু (কায়া) ঠিক আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে নাই; বস্তুর যেটি স্বরূপ সেটি ঢাকা পড়িয়াছে; বস্তুর যেটি স্বভাব সেটি সেভাবে নেই। স্বভাবে পরভাব, স্বধর্মে পরধর্ম অধ্যস্ত অথবা বিদ্ধ হইয়াছে। দীপকে বা জীবকে নির্বাতগৃহে রাখিলে সে স্বচ্ছন্দে থাকে না। চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিলে, স্বরূপে থাকে না; প্রতিবিম্বে বিম্বও ঠিক স্বরূপে থাকে না। দুধ নষ্ট হইয়া দুধের মতই দেখায়, কিন্তু স্বভাবে নেই; রজ্জুসর্প, দেহাত্মা ইত্যাদি স্থলেও নেই। অবচ্ছেদ, প্রতিবিম্ব, আভাস—এ তিনই মায়াবাদে মায়ারই রূপভেদ বা প্রকারভেদ। কিন্তু, এস্থলে আমরা শেষের দুটি দৃষ্টান্তে (একটা পরিণাম, অন্যটা বিবর্ত্ত) মায়াকৃতি পরিভাষাটি দিতেছি। যেখানে ঠিকভাবে নয়, 'ভাণ' ভাবে কোনও আকৃতি ফুটিতেছে, সেখানে এই মায়াকৃতি। বাহ্যাদি সাধারণ অনুভবে এ তিনের উদাহরণ সর্বদা মিলিতেছে। জপাদি সাধনে এদের খোঁজ রাখিতে হয়। ব্যাহরণ-অনুস্মরণাদি ব্যবহারে ঐ তিনটি প্রশ্ন করিয়া জবাব পাইতে হয়। আর, আকৃতির শোধনকরতঃ তাদের ক্রমশঃ বেধরহিত যে শুদ্ধভূমি, তাতে তুলিয়া লইতে হয়। কোন কিছুর দ্বারা জপ ধ্যান কুণ্ঠিত হইতেছে কিনা; কোন কিছু দ্বারা ছায়াগ্রস্ত হইতেছে কিনা; কোন কিছুতে সেটি বঞ্চিত, প্রতারিত হইতেছে কিনা;—এই তিনটি প্রশ্ন করিয়া চলিতে হয়। কায়া, ছায়া, মায়া—এ তিনটিকে প্রয়োজনমত, স্থূল সূক্ষ্ম সব রকমেই

লইও। যেমন, কথাঞ্চিৎ সূক্ষ্মে—জপে নাদ এবং ভাব কায়া; ব্যাহরণে এবং অনুস্মরণে নাদ-ভাবের স্পর্শই ছায়া; আর জপের অক্ষরাদির যে জন্যত্ব, নাশ্যত্ব, অভিঘাতাদিবাধ্যত্ব ইত্যাদি সাধারণ আকৃতি, সেটি মায়া।

আকৃতির আলোচনা কিছু 'পারিভাষিক' ভাবে হইল। যে সব সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সে সব আসিয়াছে বিচার প্রয়োজনে নয়; জপের সাধনে যে সর্বসিদ্ধান্তসাধারণ উদার আধারভূমিটি মেলান চাই, সেই আধারভূমির দিগ্‌দর্শন ভাবে। সিদ্ধান্তসংঘর্ষ এবং সিদ্ধান্তসঙ্কর—এ দুই-ই যথাসম্ভব পরিহার করিয়া অভ্যারোহ এবং সমাবৃত্তি সাধনটি সাধিতে হইবে।

এইবার বিকৃতি লক্ষণ।

২১। বিকৃতিঃ সত্যন্তরিতত্বেঽতথাত্বে চেতরবেধাপত্তিঃ ।।

অন্তরিত হইলে যে 'অতথা' ভাব আসে, সে অতথাভাবে অন্যের বেধ হওয়াকে বিকৃতি বলে।

আকৃতিসূত্রে সপ্তধার বিবরণ দিতে যাইয়া বেধসম্ভব (গৌণ বা মুখ্য) স্থলে বিকৃতিকে আমরা পাইয়াছি। তত্ত্ব থেকে অনন্তরিত থাকিলে তো প্রকৃতিই রহিল; কিন্তু অন্তরিত হইলেও (যেমন পূর্বোক্ত শুদ্ধ আকৃতিস্থলে) তাকে বিকৃতি বলা যাবে না, যদি, সেরূপ অন্তরিত হওয়াতে, তত্ত্ব (সত্তাদিতে) যেরূপ ছিল, সেরূপ হইতে চ্যুত না হইল। কোনও রূপ অন্তরিত হইতে গেলেই লক্ষণে এবং পরিভাষায় কিন্তু 'অন্তর' (difference) অবশ্যম্ভাবী। এটিও খুব ব্যাপক অর্থে অতথাত্ব বটে। কিন্তু যেটি 'লক্ষ্য' এবং 'অভিধেয়' (the thing without respect to its logical appreciation and description), সেটি যদি তত্ত্বতঃ, হানোপাদানের প্রতিযোগী বা বিষয় না হয়, (অর্থাৎ, logical difference without real distinction), যদি তত্ত্বতঃ, কিনা, সত্তাশক্তি ইত্যাদির স্বত্ব সম্পর্কে, তা থেকে সত্যই কিছু বাদ যাইল না, অথবা যুক্তও হইল না;—এমত স্থলে সেটিকে বিকৃতি বলা হইবে না। 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ'—এখানে কোন্‌টি বিদ্যাবিষয়ক, কোন্‌টি অবিদ্যাবিষয়ক, এ প্রশ্ন আচার্যেরা তুলিয়াছেন, এবং বিবিদিষার সঙ্গো বিস্তর বিবদমানতাও আসিয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মের মূর্তভাবকে বিকার বা বিকৃতি বলা হয় না, 'বিবর্ত্ত' বলা হয়; এবং

অদ্বৈতপক্ষে, বিবর্ত্তে তত্ত্বের অন্যতাপত্তি হয় না, যদিও অনির্বচনীয়খ্যাতিবশতঃ অন্যথাপত্তি সম্ভাবিত। বিবর্ত্তকে অপরে অন্যরকমেও বুঝিয়াছেন—বিশেষতঃ রসিকভাবুকেরা। 'দুই পাশে' অস্তি আর ভাতি; 'মাঝখানে' প্রিয়ং বা আনন্দ বা রসবস্তু। দুপাশের ঐ দুটি যেন মাঝখানেরটিকে 'ঘুম পাড়াইয়া' রাখিয়াছে—রসের শান্ত, মৌন, স্বলসিতভাবে। রস নিজেকে শুদ্ধ 'অস্তি' ও 'ভাতি' রূপেই জানিতেছে। রসিকেরা এটিকে পরমতার স্বয়ংস্বাদুভাব বলিতে রাজি হবেন; কিন্তু সম্পূর্ণতার স্বয়মাস্বাদনভাব বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন। আনন্দ বা রস যেন জাগিয়া আপন ঐ স্বয়ংবেদ্য ভাবটি স্বয়মাবেদ্যভাবে ফুটাইয়া লইতেছেন। এটি ব্যতীত রসবস্তুর উল্লাস-বিলাসাদি 'লীলা' সম্ভব হয় না মনে হয়। গোড়ায় রসবস্তুর 'মুখ'টি রহিয়াছে শুদ্ধ অস্তিতা-ভাতিতার দিকে; সে 'মুখ' ঘুরিয়া ফিরিল আপন দিকে; সঙ্গে সঙ্গে, রসবস্তুর স্বরূপাকর্ষণে, অস্তি-ভাতিও ফিরিল তারির দিকে। নিজের রসজাগৃতিতে যথাসম্ভব এই আদিম 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত'টি মিলাইয়া লও। রসবস্তুর স্বভাবই হইল এই প্রকার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—এই স্বলসিত, এই আবার বিলসিত! এতে রসবস্তুর অন্যথাত্ব (অন্যভাবভাসিতত্ব) হয়, কিন্তু অন্যতাপত্তি ঘটে না। জপসূত্রে, অন্যথা এবং অন্যতা, এদুটি ব্যবহার হইল না, কিন্তু 'অতথাত্ব' বলা হইল। ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে জীবত্বাদির অধ্যাসকে অদ্বৈতপক্ষ বিকার বা পরিণাম বলেন না। আবার, রসিকপক্ষ, রসে স্বলসিতের আধারে যে বিলাস-উল্লাস, সেটিকেও বিকার বলেন না। নিত্য-অপরিণামের আধারে পরিণাম পক্ষও, পরিণাম মাত্রই বিকার বলেন না। আকার আবার যেখানে চলে, বিকার সেখানেও অচল। এইজন্য, ব্যাপক যে 'অতথা', তার সঙ্গে ইতর-বেধাপত্তি' জুড়িয়া সকল পক্ষকে ডাকিয়া এক পঙ্‌ক্তিতে বসাইতে হইয়াছে। সিদ্ধান্তাভিঘাত জন্য যে আবর্ত, সেটি এড়াইয়া জপের তরণীটি স্বচ্ছন্দে চালাইবার নিমিত্ত এসব।

কাজেই, কাজের কথা। যাগে প্রকৃতিযাগ, বিকৃতিযাগ, এসব আছে; সঙ্গীতে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরাদি। গণিতে বিজ্ঞানে প্রমেয় পদার্থের প্রকৃতি এবং বিকৃতি দুই-ই বিবেচ্য। যেমন সোডিয়ামের স্পেক্‌ট্রাম্; পিওর্ কার্ভ বা ফর্‌মূলা, ইত্যাদি। জপাদিতে বিকৃতের খোঁজ বিশেষ করিয়া রাখিতে হয়, বিশেষতঃ ব্যাজ-বিঘ্ন এই দুই আকৃতিতে। গায়ত্রী জপে 'ধিয়োযোনঃ' বিকৃতি; তারচক্রে বিলয়েও উদয়ের রূপ

বিকৃতি। সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে—প্রাণ আর ভাবের ভূমিতে—বিকৃতিরই বাড়াবাড়ি। Subconscious (অন্তশ্চেতনার, চিত্তের) উপদ্রব-উপসর্গগুলো তো সেখানেই বেশী বেশী। প্রাণভূমি, ভাব ভূমি, মনন-চিন্তনাদি ভূমির যে সমস্ত রূপ 'অতথা', কিনা স্বভাবে, প্রকৃতিতে নেই, সেগুলিকে (জপস্পন্দ, ভাবচ্ছন্দঃ এবং জ্যোতিঃস্যন্দ—এই তিনের দ্বারা) 'তথা' করিয়া লওয়াই তো সাধন! গণিতে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতাদি ব্যবহারে অতথার তথাত্ব সাধনাই তো সাধন! যেখানে বৈরূপ্য-বৈগুণ্যাদি (তা একটা গ্রহের কক্ষবর্ত্মেই হোক্, বা সংস্কারের ভূমিতেই হোক্), সেখানে ঐ 'বি'-কে কি করিয়া 'সম' করা যায়, এই তো চিন্তা। যে ইতরবেধাপত্তি' রহিয়াছে, সেটি, আকৃতির বিচারে যেরূপ দেখান হইয়াছে, শুদ্ধস্থলে যথার্থই হয় না। একটু আগে যে দুইরকমের বিবর্তের কথা হইল, তাতেও হয় না। নিত্য অপরিণামী, পরিণামে নামিয়াও বিদ্ধ হন না। এসব কথায়, কেউ সায় দিয়াছেন, কেউ বা দেন নাই। কিন্তু জপাদিতে সে সব 'বাদ' বাদ দিয়া এক সুস্থির সামান্য আধারে দাঁড়ানই শ্রেয়স্কর। অভ্যারোহ ও সমাবৃত্তিটি সুষ্ঠুভাবে হইলে, মহাসমন্বয়ী এবং পরমসমন্বয়ীর ভূমিতে আসা যায়। সেখানে সর্ববিসম্বাদসম্বাদিনী স্থিতি। Supreme Synthesis and Reconciliation. তবে বিসম্বাদ ছাড়িয়া স্বানুবন্ধানুরোধে সিদ্ধান্তসমাশ্রয় চাই। এই স্বীয়ানুবন্ধানুরোধের রাস্তাটি স্বচ্ছন্দে খোলা রাখিয়াই জপসূত্রে বিজ্ঞেয়-এক-সাধারণ-তত্ত্ব-তথ্য-মার্গ-চর্যাধার প্রস্তুতির যত্ন হইতেছে! 'তথা' শব্দ খুব ব্যাপক অর্থে 'ঠিক সেই প্রকার', 'ঠিক সেই-ভাবে' ইত্যাদি বুঝায়। ন্যায়ের রীতিতে এক 'মাজাঘষা' লক্ষণও দেওয়া যায়। তৎপ্রকারতা, তদ্‌বিশিষ্টতা ইত্যাদির যেখানে অভাব, সে অভাবের প্রতিযোগিত্ব এই তথাত্বে। এও মোটামুটি। আরও অনেক চিকণ কারুকার্য চলিতে পারে। তাতে এখন কাজ কি? এ তথার তো বেড়াজাল। কিন্তু আকৃতিসূত্রে ৬।৭ এই দুটিতেই 'অতথা' বেধরূপতায় দেখা দিয়াছে। আর, পক্ষদ্বয়ের পরস্পর বেধ ব্যতীত, ইতর (অন্য) বিপক্ষের বেধ যদি সম্ভাবিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে, আকৃতির যে গুরুব্যতিক্রম, সেটিকে বিকৃতি বলা উচিত।

'বেধ' কথাটাও ভালমতে বোঝা দরকার। পরে সূত্রও আছে। এখানে, দুটি বৃত্ত আঁকিয়া পরস্পরবেধ এবং ইতরবেধটির এক ছবি তুলিয়া লও; ধর, বর্গীয় সমীকরণ—Quadratic Equation. এতে অজ্ঞাত রাশি একটাই থাকে। এর

আকৃতিতে ‘c’ বলিয়া এক রাশিকেও দেখান হয়। এর মান কিন্তু প্রস্তাবিত কোনস্থলে ধ্রুব (constant)। কিন্তু এটি যদি অপর এক অজ্ঞাতের দ্বারা (ধর, y) এমনভাবে বিদ্ধ হয় যে, এটি উক্ত প্রস্তাবিত স্থলেও, অধ্রুব হইয়া পড়ে, তবে উক্ত সমীকরণের যে দুই ‘মূল’ দিয়া যেভাবে সমাধান করিয়া থাকি, সে ভাবে হইবে না। সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি, এ চারিটিতেই বিপক্ষবেধ সম্ভাবিত, এবং জপাদিসাধনে সে বেধ উদ্ধার (লক্ষ্মণের সেই শক্তিশেলের মত) হয়। যেমন, জপে অক্ষর বা বর্ণকে (অউম ইত্যাদি) যদি বল সত্তা, প্রাণ ও ভাবকে বল শক্তি, ব্যাহরণাদির যথার্থ রীতিকে বল ছন্দঃ, আর অর্দ্ধমাত্রাদিসহ, সম্পূর্ণ আকৃতিকে বল আকৃতি, তবে এসবের কোনটাতেও বেধজন্য বিকৃতি আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

আকৃতির মত বেধকেও কায়া-ছায়া-মায়া, এই তিন ভাবে পরখ করিতে হয়। অক্ষর বল, নাদ বল, জ্যোতি বল, ভাব বল—জপকালে যেটাকে স্পষ্টতঃ এবং মুখ্যতঃ লইয়া জপ চলিতেছে, সেইটা তৎকালে কায়া; এই কায়ার সঙ্গে অনুষঙ্গ বা আনুষঙ্গিক ভাবে যেটা থাকে বা থাকা উচিত, মুখ্যের উপকারক ভাবে, মুখ্যের ‘সেবা’ করিয়া, সেটি ছায়া। আর, এ দুটি ব্যতীত যা কিছু কল্পিত-আরোপিত ভাবে থাকে অথবা থাকিতে চায়, সেটি মায়া। সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই এক ত্রিধাবিন্যাস রূপটি আছে। এখন, কোন বেধাশঙ্কা ঘটিলে, এ তিনের কোন্‌টি ‘বিদ্ধ’ হইল—এইটি ভাবিয়া দেখিয়া প্রতীকার করিতে হয়। মুখ্যপ্রাণ অসুরবিদ্ধ হন না—শ্রুতি বলেন। সুতরাং, জপাদিকে মুখ্যপ্রাণভূমিতে লইতে পারিলে, বেধাশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে। সেটি হয় কিরূপে? নাদাদি সন্ধানে। এতে মুখ্যপ্রাণের যে অবেধ্যভূমি, সেখানকার পথ খুলিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একবারেই না। নাদ, জ্যোতিঃ, ভাব—এদের সঙ্গ সমাশ্রয় করতঃ ‘অনেকদূর’ হাঁটিলে, অনেক চড়াই-উতরাই ভাঙ্গিলে, তবে মেলে—ঐ বেধরহিত। বাধরহিত আরও পরে। বেধভূমিতে এক সঙ্কটস্থান (ফাঁড়া) আছে, সেটি হইল—বধভূমি। এইটি কাটাইয়া, শঙ্করধারার আশ্রয়ে, অবেধ ভূমিতে (কিনা, শুদ্ধে) আসিতে হয়। আসিতে পারিলে তবে বোধভূমি—শুদ্ধ জ্ঞানের এবং শুদ্ধ রসের। এই শুদ্ধি আবার ‘বাধমাত্র বিরহ’-রূপ হইলে, বাধভূমিও কাটিয়া গেল। তখন, ‘স্বতঃসিদ্ধ’ ভূমি। এভূমিতে ‘সাধ’ ও ‘বাধ’, দুয়েরি পরমতা।

বেধ সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানভূমি, তাতে পরে আবার দৃষ্টিপাত হইবে। অণু থেকে মহান্ পর্যন্ত বিশ্বে, অন্তর্বহিঃ স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) দেখি। বিকার (Strain) এবং সংস্কার (Stress) —সর্বত্র সহগ ও সহানুপাতী হইয়া বিদ্যমান। অনুপাতটি কোথাও সৌষম্য, কোথাও বৈষম্যের দিকে। সেতার বা বেহালার তার বা তাঁত একভাবে বাঁধিলে (strain করিলে), সুষমতা, অন্যভাবে নয়; ইত্যাদি। ভেতরের ব্যাপারেও তাই। বিকারটা বে-আড়া রকমের হইলে, সংস্কার বলে—আমার কর্ম নয়; শঙ্কর বা শঙ্করীকে ডাক। লাটিম ঘুরিতেছে, একটু আধটু 'ধাক্কা' সামলাইয়া সে আবার স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে পারে। পাতকের পৌনঃপুন্যে পাতিত্য। এ সবের মূলে মৌলিক স্পন্দবিজ্ঞান রহিয়াছে। এজন্য, এনস্, মন্যু, পাপ্মা—এদিকে এতখানি বেধসঙ্করে আসিতে দিতে নেই, যাতে সংস্কার—প্রকৃতির আপন স্থিতিস্থাপকতাকে 'জবাব' দিতে হয়, অথবা, অন্যত্র আঙুল দেখাইতে হয়।

আর এক কথা। বেধমাত্রেই বাধক না হইতে পারে। ব্যাধির শরীরে অস্ত্রোপচার কি বাধক? দুধ পচিয়া নষ্ট হইলে একরকম, ভাপা দই হইলে আর এক রকম। দুটিই বিকার। আমাদের ভুক্তদ্রব্য বিকারে আসিয়াই পরিপাক হয়। পেটে গিয়ে যেমন তেমনটা থাকিলে—গোলমাল। যাগে বিকৃতি যাগও আবশ্যক, গানে বিকৃত স্বরও বটে। এই জন্য, বিকৃতিকেও, প্রয়োজন মত, হেয় না করিয়া উপাদেয় করিতে হয়। এ বিকারে পচা দুধের বোটকা গন্ধ নেই, টাটকা ভাপা দই-এর সুঘ্রাণ আছে। বাসেও ভাল, রসেও ভাল। ধর, তোমার জপ সাধারণতঃ সোম মাত্রাতেই চলে, আর তাতে ভালই চলে। কিন্তু 'স্ত্যান' আসিল। গুরু বলিলেন—কিছুদিন অগ্নিমাত্রায় যাও। এ বিকারে সংস্কারই হয়। পেটে খাঁটি দুধ না সইলে, দই ঘোলের ব্যবস্থা। ভালবাসো ঠিকই, তবু তো মাঝে মাঝে 'মান' কর, মুখটি ফিরাও! ওতে রসের বাধ হয় না, সাধই হয়, তাই। তা হইলে—বিকার দুই রকমের—সঙ্কর বিকার, আর শঙ্কর বিকার। এসব প্রসঙ্গ পরে বিশদ হইতে থাকিবে আশা করা যায়।

অনেক 'চোরাবালি' দুধারে পাশাইয়া সন্তর্পণে পা ফেলিতে হইতেছে, তবু এ প্রসঙ্গে কথা আভাসেই বলা হইল। এইবার কারিকা—

দ্বে বৃত্তী অন্তরীক্ষে স্তঃ স্বর্ভূরিত্যত্র মেলনাৎ।
একয়া হ্রিয়তে সর্ব্ব মন্যয়াপূর্য্যতে তথা॥
এতয়োঃ সহপাতিত্বেঽন্যথাভাবেঽপি তত্ত্বতঃ।
বেধে প্রসজ্যমানে চ বিকৃতির্ব্যপদিশ্যতে॥
সহপাতিত্বানুপাতিত্বাদ্ ব্যাপ্যন্তে গুণকর্ম্মণোঃ।
বৃত্তয়ো বক্রজিহ্মাদ্যা অনুলোমবিলোমতঃ॥ ৬৬-৬৮

পূর্বালোচিত স্বঃ এবং ভূঃ অন্তরিক্ষে একত্র মিলিত হওয়াতে অন্তরিক্ষে যুগপৎ দুটি বৃত্তি—হরণ এবং পূরণ। অর্থাৎ, নিখিল পদার্থেই 'অন্তর' বা ব্যবধান তত্ত্বটি রহিয়াছে, আর তার ঐ দুইটি বৃত্তি। যেমন, ধর চিত্তে, জীবকোষে (metabolism) ইত্যাদি। এই দুটির সহপাতিত্ব বা সহগত্ব হইলে, যেটি তত্ত্ব (thing as it is, without *plus* or *minus*), তার অবশ্য অন্যথাত্ব ঘটে। কেননা, হরণও হইতেছে, পূরণও হইতেছে। কিন্তু ধর এই হরণ-পূরণ ঠিক স্বচ্ছন্দে (in its own rhythm) থাকিল না, বেধ আসিল (কোন intruding, interfering factor)। তা হইলে কি হইল? বিকৃতি। নিখিল পদার্থের গুণ এবং কর্মের যে বক্রজিহ্মাদিক নানা বৃত্তি, অনুলোমে অথবা বিলোমে, দৃষ্ট হয়, (বাহিরেও বটে, ভিতরেও বটে), সেটি নির্ভর করে—ঐ অন্তরিক্ষের হরণী পূরণী, এই দুই সহগা বৃত্তির অনুপাতের (ratio) উপর। যেমন বাহিরে—কোনও গ্রহের আপন কক্ষে 'ব্যাজ' দেখা দিলে বোঝা যায়, অন্য কোন জ্যোতিষ্ক সেটিকে আপন আকর্ষণে বেধ করিতেছে। এখানে অনুপাতেরই প্রশ্ন। সাধনে কামাদি বাসনা জন্য বেধ—জপে ধ্যানে কীর্তনে এই প্রকার জিহ্মতা ঘটায় প্রায়শঃ। বাসনাবেধই গুরুবেধ। গোড়ায় এটির Isolation, মাঝে Elimination, শেষে Sublimation করার উপায় দেখিতে হয়। ঐ যে 'অনুলোম' বলা হইল, তাতে শত্রুপুরীতেও মিত্রটিকেও মিলাইবার সঙ্কেত রহিল। কামনা-বাসনা বিলোমা, তাই প্রমাথিনী; অনুলোমা কর, তারা হইবে প্রমন্থনী। কামের দ্বারা কাম, ক্রোধের দ্বারা ক্রোধ, লোভের দ্বারা লোভ প্রমথিত কর, তা হইলে তারা আর তোমায় 'প্রমাথিত' করিবে না। জপে নাদ এবং ভাব এদুয়ে অন্তর্গোপৌ'—ভিতরে রক্ষক। ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট (ক) তে যে নিরক্ষা' ভূমি, সেখানে বেধের প্রশ্নই নাই। 'ধ্রুবাক্ষে' বেধ প্রতিহত,

যথা সেই দিব্য কিরাত-কলেবরে। 'অন্তরক্ষা' বেধ সম্ভাবিত, কিন্তু নাদ ও ভাব রক্ষায় আছেন। তাঁদের ছাড়িতে নাই। আর 'বহিরক্ষায়' বেধ ঠেকান' দায়। [সহপাতিত্ব = co-incidence; অনুপাতিত্ব = Co-ordination and correlation; proportionality. মোটামুটি, এইরূপ।]

২২। প্রকৃতিমুদ্দিশ্য ব্যাপারবত্ত্বং প্রত্যয়ত্বম্॥

প্রকৃতিকে উদ্দেশ করতঃ (in regard to, with reference to) ব্যাপারবত্তাকে প্রত্যয়ভাব জানিবে। [এখানে প্রতি + অয় (ই ধাতু), এতে যে 'প্রতি', সে প্রতিকে শুধু তদভিমুখীন (to-words) অর্থে লওয়া হইল না। কিন্তু প্রকৃতিসম্বন্ধসাপেক্ষত্বাবচ্ছিন্ন যে ব্যাপারবত্তা, সেই ব্যাপারবত্তার প্রতিযোগী ভাবে (অর্থাৎ কিসের ব্যাপার, কোন্ ব্যাপার?) লওয়া হইল। 'ব্যাপার' শব্দটি ন্যায়াদির পরিভাষা অনুসরণে ঠিক নেয়াও হইতেছে না। জপ সাধনশাস্ত্র, কাজেই, মুখ্যপ্রাণের (পরে সূত্রিত) কোন্ বিষয়ে, 'কোন অভিমুখে' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ 'মান' স্বীকার করতঃ গতি-প্রয়োগাদিরূপ যে বৃত্তিমত্ত্ব, সেইটি প্রত্যয়রূপে এ স্থলে অভিপ্রেত। বেশই ব্যাপক লক্ষণ; ব্যাকরণে প্রকৃতির সম্বন্ধে যে প্রত্যয় হয় তাও বাদ পড়িল না; চিত্তের, বুদ্ধিরও না।]

আকৃতিভিশ্চ স আকার্য্যাবেধ্যো বিকৃতিভিঃ পুনঃ।
উদ্দিশ্য প্রকৃতিং যাতি ভাবজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ॥ ৬৯

পূর্বোক্ত আকৃতিগুলি প্রকৃতিতে নানাভাবে আকারিত করে; বিকৃতিগুলি নানাভাবে বেধবিদ্ধও করে কতকদূর অবধি (আ); প্রকৃতিকে এইভাবে আকরণ-আবেধনাদি করিয়া প্রত্যয় ব্যাপাররূপে চলিতেছে। প্রত্যয়ের যেটি ব্যাপার, তার অবশ্য সমগ্র বিস্পষ্ট ছবি বা আকৃতি, সেটি ঐ আকৃতি-বিকৃতিতেই মিলিতেছে না। প্রতিকৃতি-অনুকৃতি প্রকৃতির যোগে সেটি ফুটিয়া উঠিতে পারে। তবে, আন্তরদৃষ্টিতে প্রত্যয়কে ভাব-জ্ঞান-ক্রিয়া এই তিনরূপে আগেই চিনিয়া লও। ভাব=হওয়া, হইতে যাওয়া (to-be and to become); মনের দিক্ থেকে এটি 'Feeling' (We are and become as we feel)। দ্বিতীয়, জানা (to apprehend, know)— 'Thinking'; আবার সেই ডেকার্টের 'cogito ergo sum'—জানিতেছি, অতএব আছি—স্মরণ কর। তৃতীয়, করা (সঙ্কল্প ও কার্য) —'Willing'; পুনশ্চ, সোপেনহাওয়ারের The world as Will—স্মরণ কর। যোগবাশিষ্টাদিও বিশ্বের এই চিত্তসঙ্কল্পরূপতা বা স্পন্দরূপতা বহুধা প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই আন্তররূপগুলি (to-be, to-know, to-do) ই মৌলিক প্রত্যয়। বাহিরে এদের সঙ্কোচরূপ। এই প্রত্যয় প্রসঙ্গের অনুসরণ হইতেছে, কাজেই, এখানে আর বিস্তার নয়। তবে, একটা দৃষ্টান্ত। জপে মন্ত্র, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ—এই পঞ্চাবয়ব থাকে। মন্ত্রকে যদি বল প্রকৃতি, ঋষি ও দেবতা হয়েছেন শুদ্ধ আকৃতি, বিনিয়োগ প্রত্যয়; ছন্দঃ সন্ধিরক্ষা এবং পুষ্টি দুই-ই করে। অর্থাৎ, ছন্দঃ (প্রাণে, ভাসে এবং রসে) সন্ধিতে থাকিয়া প্রকৃতির যেটি শুদ্ধ আকৃতি, সেটিকে বিষমবিকৃতি থেকে রক্ষা করে, এবং তাতে মন্ত্রের যেটি পরমাপ্রকৃতি, সেটি প্রাপ্ত করায়। কাজেই, 'সন্ধিকো পাক্ড়ো'। ছন্দোভঙ্গ হতে দিও না।

২৩। বাক্‌কায়বুদ্ধিপ্রত্যয়া অপি॥

(জপ সম্বন্ধে উপযোগ (relevancy) আরও বিস্পষ্ট হইতেছে এই সূত্রে।)

প্রত্যয় বাক্‌প্রত্যয়, কায়প্রত্যয় এবং বুদ্ধি বা ধীপ্রত্যয়—এই তিন আকৃতিতেও লইবে।

যেমন, সাধারণ গায়ত্রীজপে—বাক্‌প্রত্যয়, ব্যাহরণটি; কায়প্রত্যয়, পূর্বাস্যাদি পূর্বক আসন, যতেন্দ্রিয়ভাব, প্রাণের সমতা, ইত্যাদি; ধীপ্রত্যয়—'ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ'—এতেই ধীবৃত্তির সাহিত্য। এ সকল দৃষ্টান্ত এক সাধারণ আকৃতিতে আনা হইতেছে—

বাচাঙ্গেনাপি বুদ্ধ্যা চ কারকান্বয়বৃত্তিতা।
প্রত্যয়ে সতি বর্ত্তন্তে বাক্‌প্রত্যয়াদয়ঃ ক্রমাৎ॥ ৭০

বাক্যের দ্বারাই হোক্, আর অঙ্গের দ্বারাই হোক্, আর বুদ্ধি দ্বারাই হোক্—প্রত্যয়ের যেটি 'অয়' (গতিবৃত্তি), সেটি 'অনু'—পশ্চাদ্‌গমন করে, অনুষঙ্গ

করে—imply and enquire করে কার? কারকের। গীতায়— 'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা' ইত্যাদিরূপে এই কারকটিরই সমাচার দেয়া হইয়াছে, আর, পরে যা বলা হইয়াছে, তাও দেখিও। 'কারক' বলিতে—কে? কাকে? কার দ্বারা? কার নিমিত্ত?—ইত্যাদি কয়টি প্রশ্ন আসিয়া থাকে। প্রত্যয়কে 'ভাঙ্গিয়া' দেখিতে গেলেই এই কয়েকটি মূল প্রশ্ন। যেমন, বাক্ জপ করিতেছে। কে করিতেছে, কি করিতেছে, কিসের দ্বারা করিতেছে, কি জন্য করিতেছে, কোথা থেকে করিতেছে, কার সম্বন্ধে করিতেছে (ষষ্ঠীকেও ধরা হইল), কোন্ অধিকরণে করিতেছে—এই সবকয়টি কারকান্বয়বৃত্তি না ধরিলে তো ঐ জপরূপ বাক্‌প্রত্যয়টিকে ধরা হইল না। কায় এবং ধী সম্বন্ধেও ঐ কয়টি মূল প্রশ্ন। সব কয়টি লইয়া প্রত্যয়ের 'আধার-পট'। প্রত্যয়ের রেখা (curve)-টি এই আধারে ফুটিতে দিতে হইবে। তবে মিলিবে পূরা আকৃতি—complete picture এর নিমিত্ত 'x-ray'র প্রয়োজনও আছে। প্রত্যয়কে কাটিয়া টুকরা করিয়া লইলে লাভ হয় না। 'পূরা'কে যদি বলি ব্রহ্ম, তবে—মাহংব্রহ্মনিরাকুর্য্যাম্। অর্থাৎ, প্রত্যয়ের 'প্রত্যয়যোগ্য' পূরারূপ ও ভাবটি আমি যেন নিরাকৃত করিয়াই না রাখি। রেখার কথা আসিল, তাই—

২৪। অনুতনূরব ঋজুবক্রপ্লুতাশ্চাপি।।

প্রত্যয়বৃত্তি সার্বভূমিকী—সর্বভূমিতেই প্রকৃতিতে উদ্দেশ করিয়া (গণিতে যেমন 'Base', 'Origin', 'Frame', 'Field as given' ইত্যাদি) প্রত্যয়রূপ ব্যাপারবত্ত্ব আছেই, এবং প্রতিস্থলেই (স্পষ্টতঃ অথবা অন্যথা) ঐ 'কারকান্বয়'টিও আছে। অন্বয় নির্ণায়ক সূত্রটি (Equation) মিলাইতে পারিলে, প্রত্যয়কে নিরূপিত (অন্ততঃপক্ষে অংশতঃ) রেখাচিত্রে দেখানও সম্ভাবিত হয়। রোগে তাপ বা অন্য পরিমেয় উপসর্গও (গণিতের সূক্ষ্মতা অভাবেও) রেখায় দেখান হয়। এতে রুজ্‌প্রত্যয়টি সম্বন্ধে বিদ্যার বিনিয়োগ সম্ভব হয়। জপেও তাই। ২য় খণ্ডে ছন্দের প্রসঙ্গে এটি সোদাহরণ আলোচিতও হইয়াছে। এখন, বলা হইল যে—

এক আকৃতিতে প্রত্যয় অণু-তনু-উরু, অন্য আকৃতিতে ঋজু-বক্র-প্লুত। কেবল, বহির্বিজ্ঞানে নয়, জপাদি সাধনস্থলেও এই ত্রিপুটীদ্বয়ের সবিশেষ উপযোগ আছে।

উরুর্ব্যক্তং তনুঃ সূক্ষ্মং কারণমুদ্দিশেদণুঃ।
প্লুতিবিপ্লুতিসংপ্লুতিরূপা প্লুতিস্ত্রিধা মতা।
ঋজুস্তত্ত্বং ছবিং বক্রঃ প্লুতশ্চধুরমিচ্ছতি॥ ৭১

স্থূল যে ব্যক্ত, তাতে, পূর্বোক্ত কারকান্বয়ে, অর্থাৎ, কে, কাকে ইত্যাদিভাবে যেটি প্রত্যয়, সেটি উরু। যেমন, টেবিলের ওপরে তোমার একটা বল আছে; আমি, হাতে করিয়া বলটিকে টেবিল হইতে সরাইয়া মাটিতে রাখিলাম। এ স্থলে প্রত্যয় বরাবর স্থূলে ব্যক্তভাবেই হইতেছে। বিজ্ঞানে Molar, Molecular, Atomic, Sub-Atomic ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যয়কে ক্রমে সূক্ষ্মে নেয়া হয়। সূক্ষ্মে, একটা সীমানা পার হইলে, আগেকার ছন্দঃ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, এমনও দেখা যায়। চিকিৎসায় এলোপ্যাথিও ক্রমে সূক্ষ্মে নামিতেছে; হোমিওপ্যাথির তো সূক্ষ্মেই কারবার। জপে স্থূলবৈখরীরূপে—প্রত্যয়টা ব্যক্ত এবং স্থূলই মনে হয়; তবে, সূক্ষ্মা গতি। মধ্যমায় সূক্ষ্মভাবটা প্রধান। সূক্ষ্মে যাইলে প্রত্যয়কে বলে তনু। আর, কারণে অণু। মধ্যমাতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম—গাঢ়তা (density) বেশী। 'স্ফোট' এই মধ্যমাকে আশ্রয়করতঃ অব্যক্ত থাকেন। কিন্তু ব্যক্তের ভূমি কেবল স্থূল বৈখরীই নয়। তা হইলে যাঁরা 'দ্রষ্টা', 'ঋষি', তাঁদের মন্ত্রাদিদর্শন স্থূল হইত, এবং স্থূলের জন্যত্ব-নাশ্যত্যাদি ধর্মে আক্রান্ত হইত। পশ্যন্তীতে সূক্ষ্ম—বিতত (expanded), বিশোধিত (refined) এবং সুব্যক্ত। এখানে কারণের সন্ধান (অণুপ্রত্যয়)টিও সুরু হয়, কিন্তু সমাপ্ত হয় পরায়। কেননা, পরাভূমিতে না যাওয়া পর্যন্ত মূলপ্রাণব্রহ্মস্পন্দনকে ঠিক ঠিক 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্'রূপে পাওয়া যায় না।

অন্যদৃষ্টিতে, প্রত্যয় আবার ত্রিবিধ—ঋজু, বক্র, প্লুত। তার মধ্যে, তত্ত্বকেই 'প্রকৃতি' করিয়া তা হইতে এবং তদভিমুখে যে প্রত্যয়, সেটি ঋজু প্রত্যয়। যাতে হান বা উপাদান, এ দুয়ের নিষেধ, সেটি তত্ত্ব। Pure Thatness. নির্ব্যূঢ়ভাবে লও, কিংবা সাপেক্ষভাবেও ব্যবহারে লইতে পার। এখন, তত্ত্বের সম্বন্ধে প্লাস্-মাইনাস্ দুই যদি নিষেধ কর, তবে তার সম্পর্কে যেটি 'অন্তর' বা ব্যবধান, সেটি উদাসীন (neutral)-এর রূপ ধরিবে। আপেক্ষিকতাবাদের কথায়, সে অন্তরিক্ষ (Space-Time Interval with respect to that Pure Thatness), সূক্ষ্ম হইবে, অবক্র ('even')

হইবে। তাতে কোনরূপ পক্ষপাতাদিজনক সংস্কারবেধ (intrinsic unevenness and partiality) থাকিবে না। কাজেই, সে সম্বন্ধে প্রত্যয়টির বক্রাদি হবার হেতু রহিল না। এই নিমিত্ত, জপাদিসাধনে যে পরিমাণে অস্মিতাধারে 'রাগ-দ্বেষাভিনিবেশ' এই অনৃতত্ত্ব-অনৃজুত্ব-উৎপাদক (factor)টিকে শূন্যের কাছাকাছি আনিতে পারিবে, ততই প্রত্যয়টি বক্রতা ছাড়িয়া ঋজু হইল। ঋজু হবার, আর্জবের সাধন তাই মুখ্য সাধন। উৎপাদকটি 'বাসনা' ক্ষেত্রেই বেশী বাস করে। 'অসতো মা' ইত্যাদি অভ্যারোহ তো অনৃত-অনৃজুকে ঋত-ঋজু করার সরণি। সমাবৃত্তিতে সমাপন।

তারপর, বক্র। এটি 'বাঁকা' বা 'বাঁকে' হইলে তো উত্তম, কিন্তু 'বেঁকা' হইলেই ভয়াল! বক্র বাদ দিয়া তো কিছুই হয় না, হইতেছেও না, হইবেও না। কিন্তু বক্রের জিহ্ম-ক্রূরাদিরূপ কাটাইয়া, তাকে ঐ 'উদাসীমুখো' করিতে হইবে। অর্থাৎ, সে কেবলি বেঁকাইয়া বেঁকাইয়া বাঁধনের পর বাঁধনই আঁটিবে না, সে বাঁধনে শক্ত গাঁটগুলোও আরও শক্ত কষিয়াই যাবে না, পরন্তু, উল্টো প্যাঁচে ওসব থেকে 'আলগ' হবারই ফিকির দেখাইবে। শেষে আবার, প্লুত। প্রত্যয়ের যেটি 'মান' (measure—quantitative, qualitative), ধারারূপে (প্লব) চলিতেই চায়। হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ, দীর্ঘ থেকে প্লুত—এইভাবে এক দিকে বেগবান্ হইলে প্লুত। বিপরীত দিকে—ঋণমুখী—হইলে বিপ্লুত। আর, আরোহ-অবরোহ—তল, লম্ব, বেধ—এ তিনেই হইলে সংপ্লুত। যেমন, তারচক্রে উদয়ে প্লুত, বিলয়ে বিপ্লুত, সমগ্র অভ্যাসে (মেরুলঙ্ঘন না করতঃ)— complete revolution-এ সংপ্লুত। প্রণবাদির দ্বারা এই সংপ্লুতভাবটি সংসিদ্ধ হইলে— 'তাবান্ সর্ব্বস্য বেদস্য' ইত্যাদি। অর্থাৎ, তা হইলে, সর্ববেদের যেটি 'অর্থ' (প্রয়োজন), সে অর্থ চরিতার্থতায় আসে। 'বেদ টেদ সব ভেসে যায়'—এ মানে নয়। জপের প্রত্যয়ে ঐ প্লুতির বিচার অত্যাবশ্যক। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল—ঋজু যেমন তত্ত্বকে চায়; বক্র (curvature principle) যেমন চায় 'ছবি'কে (World as picture, as representation, as review); তেমনি, প্লুত চায় আবর্তমান ভুবনচক্রের যেটি 'ধুর' (Axis), তাকে। ধুরোটি থামিলে তো সবই থামিল। আর অভ্যাস, আবৃত্তি নেই। জপে কিন্তু এটি চাই—বিষমচক্রজালচ্ছিৎ, সুষমচক্রবৃদ্ধিকৃৎ এবং ভুবনচক্রনাভিভিৎ—এই তিনরূপেই চাই। তত্ত্ব (Pure Given or Presentation) আর ছবি (Review), এ দুয়ের ভেদও জপাদিতে করিতেই হয়।

দুটো একই নয়। ছবিতে ‘ছায়া’, ‘বেধ’ এসবের সম্ভাবনা থাকে। ‘ছায়া’ অভাব পদার্থ নয়। ভাব পদার্থ— ‘ছায়ারূপেণ সংস্থিতা’।

তারপর আসিতেছে ঐ ‘গাঁঠ’ বা গ্রন্থির কথা।

২৫। বিশেষতঃ প্রত্যয়পরিপন্থিনো গ্রন্থয়ঃ।।

বিশেষভাবে প্রত্যয়ের যেগুলি পরিপন্থী, তারা গ্রন্থি।

হৃদয়গ্রন্থি, ব্রহ্মগ্রন্থি ইত্যাদি আকারে গ্রন্থি বহুস্থলে শ্রুত এবং স্মৃত হইয়াছে। বর্তমানে, repression, fixation, complex, ইত্যাদি আকারে গ্রন্থি বহুধা বিবেচিত হইয়াছে। ‘অহং’কে চিদচিদ্গ্রন্থিও বলেন কেহ কেহ। ধর, ‘গৃহ্ণাতি’ = গ্রহণ করে। এতে মধ্যে যে ‘হা’ উচ্চারিত, সেটি শক্তির ব্যাকৃত বিস্তাররূপতা সূচনা করে। যথা, স্রোতের বাহিতা ও ব্যাপিতা। এটি চালু রহিলে, ‘জট পাকান’ (ঐ fixation and complex) সম্ভাবিত হয় না। এখন ধর, ‘আ’টি বাদ গেল। ফলে, ‘হ’ হইল স্থাণু (static or rest energy)। এইটি, পরের ‘ত’কে আশ্রয় করে, এবং তার ফলে, ‘ত’ যদি আপন তলবৃত্তিতে (in its given plane and state) ‘বন্ধ’ (bound, congealed, stagnated) হইয়া পড়ে, এবং আদিতে গতি বা প্রত্যয়সূচক যে ‘গ’কার, সেটি আপন ‘ঋ’কারকে (কর্ষণীকে), ‘গুণ’ করিয়া লয়, যার ফলে, ‘ঋ’ হয় ‘অর্’; এবং এটিকে উল্টাইয়া (‘র’রূপে) নিজেকেই বন্ধ করে, তবে, এইসব প্রাণিক ব্যাপারের সংহতি ফল হইল—গ্রন্থি। ‘গৃ’ এবং ‘গ্র’ এ দুটি উচ্চারণ করিয়া দেখ যে ‘গৃ’তে ‘গ’ মুক্ত, ‘গ্র’তে ‘গ’ বন্ধ। গ্রন্থি গৃহ্ণাতিরই যেন ‘জট পাকানো’ ছবি। প্রত্যয় গতিরূপেই কিছু ধরিতে যায়, গ্রন্থি বলে—এইখানে আটকে যাও। সুতরাং প্রত্যয়পরিপন্থী গ্রন্থি। ‘অন্তরায়’ যেটি অন্তর বা ব্যবধানে আসিয়া পড়িয়া আটকায়। পরিপন্থী, পন্থায়—প্রত্যয়ের আপন পথেই (curve-এ) যে ভেদাপেক্ষ সঙ্কটরূপতা, তাই। ভেদাপেক্ষা রহিয়াছে, ভেদ করা চাই—তাই, ‘বিশেষতঃ।’ কায়া, ছায়া, মায়া—ইত্যাদি অনেক প্রকারে এই সব বিশেষকে সবিশেষ জানিতে হয়। গ্রন্থিটি পড়িয়াছে কোথায়?—এই প্রশ্ন। জপে নাদকে যদি কায়া বল তো—নাদ শ্রবণে কোন গ্রন্থি আসিতেছে না তো, আসে তো কি আকারে? আশ্রিত ভাব সম্বন্ধেও এই কথা। ভগবৎ প্রীতিকাম হইয়া জপ করিতেছ; কিন্তু সেটি অধোগ জিহ্মগ সকামভাবে নামিয়া

সেখানে জট পাকাইতেছে না তো? কায় বা কায়ার সঙ্গে নিত্য অনুষঙ্গরূপে বিদ্যমান ছায়া। এটি কায়ার সঙ্গে অন্বিত থাকে, এবং কায়ার চারিধারে সূক্ষ্ম 'পরিমণ্ডল' (spherical projection) ভাবেও থাকে। সম্ভবতঃ স্থূলসূক্ষ্ম সকল বস্তুরই এইরূপ 'কায়াপরিবেশ' আছে। 'ছায়া' বলিতে সচরাচর shadow বুঝি, কিন্তু সেটা আসল ছায়ার তুলনায় উপচ্ছায়া। ধর, এই পৃথিবী। এর যেটি কঠিন কায়া, তাকে বহুদূর পর্যন্ত ঘেরিয়া যে পরিবেশটি রহিয়াছে, সেটি শুধু বায়ুমণ্ডল নয়। আইওনোস্ফিয়ারের স্তর (layer) পরম্পরাও দেখা গিয়াছে। এগুলি অনেকক্ষেত্রে এক সূক্ষ্ম বর্মের মত পৃথিবীর মর্মবস্তুটিকে রক্ষা করিতেছে। সাধারণ ছায়া আলোকাদি রেডিয়েশন আর সেগুলিকে 'আড়াল' (screen) করার ব্যাপার। যাই হোক্ কায়গ্রন্থির মত, ছায়াগ্রন্থিও আছে। পৃথিবীর কায়গ্রন্থির ফলে ভূকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি; ছায়াগ্রন্থির ফলে, ঝঞ্ঝাবাত, ম্যাগ্নেটিক্ স্টরম্ ইত্যাদি। যেটা 'আরোপিত' তাকে মায়া বলিলে, পৃথিবীর মায়াগ্রন্থি ঘটে যখন ধূমকেতু প্রভৃতির সান্নিধ্য হয়। জাতকের বা শিষ্যের রাশিচক্রাদির বিচারেও এই বিবিধ গ্রন্থি বিবেচিত হইতে পারে। গানে রাগের রূপটিকে কায়া বল তো, গমক মূর্চ্ছনাদিতে তার তান-বিতান (resonance)কে বল ছায়া; আর, তাতে অপর কিছু আরোপ করিয়া তাকে অন্যরকমে দেখান, যার ফলে বিভ্রান্তি হয় সংশয় হয়, সেটি হইল মায়া। এই সব স্থূল দৃষ্টান্ত লইয়া অধ্যাত্মজীবনে সাধনটিকে 'তিন ভূমিতে সাজাইয়া লইও, আর কোথায় গ্রন্থি তার সন্ধান করিও। ধর, তোমার মন্ত্র, গুরু, ইষ্ট। এঁদের প্রত্যেকের নিজ রূপ (কায়া) যেমন আছে, তেমনি আবার নিত্য-অনুষঙ্গ-পরিবেশ রূপটিও আছে। এটি কায়ার নিজ ছায়া। কিন্তু তুমি আবার আপন সংস্কার এবং কল্পনাবশ হইয়া ঐ নিজ কায়তত্ত্বে আর নিজ ছায়াতত্ত্বে অনেক কিছু 'আরোপ' বা প্রত্যারোপ করিয়াছ। তোমার দেওয়া এই 'হান-উপাদান' কল্পিত। কাজেই, মায়িক। কিন্তু কল্পিত হইলেই বাধক গ্রন্থি হয় না, সাধক সন্ধিও হয় কখনও। যদি বোধ, বাধকগ্রন্থিরূপা তোমার ঐ কল্পনা, তবে সে গ্রন্থি কাটাও। ও-তে (মিথ্যা কাল্পনিকে) বিচার এবং অসঙ্গই কাটাইবার দৃঢ় অস্ত্র। এখানে আর দৃষ্টান্ত লইব না। তবে—সন্ধিগ্রন্থি, সেতুগ্রন্থি, মেরুগ্রন্থিও ক্রমশঃ বিবেচ্য।

এসকলই একসঙ্গে লইয়া—

ক্রিয়াজন্যান্বয়াজ্জন্যা কারকৈশ্চ সমুদ্‌ভবা।
বৃত্তির্বিষমবেধত্বে গৃহ্ণাতি গ্রন্থিরূপতাম্।
গ্রথ্নাতি গ্রন্থতে গ্রন্থির্ব্রহ্মবিষ্ণু চ রুদ্রকঃ॥ ৭২

ক্রিয়া থেকে জাত যে বৃত্তি, ক্রিয়ার সঙ্গে জন্য-জনক সম্বন্ধে থাকে যে বৃত্তি, কারক থেকে, এবং ক্রিয়া কারকের অন্বয় থেকে যে যে বৃত্তি জাত হয়, সে বৃত্তি 'বিষম-বেধ' গ্রস্ত হইলে, গ্রন্থিরূপ গ্রহণ করে। বিষম বেধ বলিতে, 'বেঁকানো, পাকানো, বেঁধানো, জড়ানো, বাঁধানো'; এই সব কয়টি বুঝিতে হইবে। 'গ্রন্থ' ধাতুটিও এইসব বোঝায়। ধর, জপ। এটি ক্রিয়া; তুমি, তোমার বাক্, প্রাণ, মন ইত্যাদি কারক; ক্রিয়া আর কারকের মধ্যে 'আনুগত্য', সহযোগই অন্বয়। এ তিনটি সম্পর্কে গ্রন্থির ঐ পাঁচটি বিষমরূপের খোঁজ রাখিয়া জপ করিবে। জপের অক্ষর, তাদের সাহিত্য, মাত্রা, ছন্দঃ—এসব তাতেই 'গাঁঠ' বাঁধিয়া উঠিতে দিতে নেই। তোমার নিজের মধ্যেও না। তোমাতে আর মন্ত্রের জপে, যে সহপাতিত্ব, সহযোগ, সৌহার্দ্য-সামরস্য, তাতেও না। Concordant relationটি থাকা চাই। বিশ্বটাই দ্বন্দ্বের ভূমি। কাজেই, গ্রন্থিও সঙ্কর এবং শঙ্কর দুইরকমের আছে। একটা ক্ষয়-ক্ষোভ গ্রন্থি; অপর, যোগ-ক্ষেম গ্রন্থি। যজ্ঞোপবীতে গ্রন্থির কথা ভাব। শঙ্করে, ঐ পাঁচটির মধ্যে শেষ দুটোর মুখ্যতা—ভালবস্তু ভাল করে জড়িয়ে বেঁধে রাখতে হয়। ভেতরে ভাল ভাব অনুভূতিগুলো সম্বন্ধেও তাই। তাদের খুলে মেলে জাহির করে রাখতে নেই। এরূপ শঙ্করগ্রন্থি, অশুদ্ধিপ্রত্যয়ের পরিপন্থী; কিন্তু শুদ্ধি প্রত্যয়ের পথে (পন্থায়) পরিতঃ পন্থী—সহায় এবং সুহৃৎ পন্থী—যেমন, পথযাত্রীর গাঁঠে-বাঁধা পথের সম্বলটি, খেয়ার কড়িটি। আপন সম্বলটি গিঁড়ে বেঁধেই রাখ, কিন্তু গিঁরেটো যেন ঐ 'বেঁকানো, প্যাঁচানো, বেঁধানো' কায়দায় না হয়! তা হইলে সঙ্কর-সঙ্কট।

গ্রন্থিকে সব রকমে দেখানর জন্য কারিকায় 'গ্রন্থাতি গ্রন্থতে' দুটো রূপই (গ্রথ্যতে গ্রন্থ্যতে) দেয়া হইল। শেষকালে, একেবারে গোড়ায় যাইয়া, ক্রিয়ামাত্রে যে ব্যক্তাব্যক্ত, মুক্ত-বুদ্ধ দ্বন্দ্বটি থাকেই, সেটি সদসদ্ গ্রন্থি (ব্রহ্ম-গ্রন্থি); কারকে যে সুখ-দুঃখ, আত্ম-পর দ্বন্দ্বটি থাকে, সেটি মুদমুদ্‌গ্রন্থি (রুদ্রগ্রন্থি), আর, এ দুয়ের অন্বয়ে যে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় দ্বন্দ্বটি থাকে, সেটি চিদচিদ্ গ্রন্থি (বিষ্ণুগ্রন্থি)। এ

মূল গ্রন্থিরূপগুলি আরও সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিতে হয়। এখানে গ্রন্থিত্রয়ের 'ফলতঃ' (practical) আকৃতি-গুলিই দেখান' হইল। সঙ্কর-শঙ্কর যেভাবেই নাও, এই মূলগ্রন্থিত্রয়ে আসিয়া শেষ পর্যন্ত ঠেকিতেই হইবে।

এইবার, গ্রন্থিভেদ উদ্দেশে শুদ্ধি প্রত্যয়—

২৬। গ্রন্থিভেদে সব্যাপারঃ শুদ্ধিপ্রত্যয়ঃ ॥

গ্রন্থিভেদকর্মে ব্যাপারবান্ প্রত্যয়কে বলে শুদ্ধিপ্রত্যয়।

সঙ্করগ্রন্থিগুলি তো ভেদ করিতেই হইবে। এ 'ভেদ' মানে গ্রন্থির ঐ পাঁচটি অবয়বের মধ্যে প্রথম তিনটিকে (জিহ্মতা, ক্রূরতা, বেধকতা) পরিহার করা। ওঁ, ঐঁ, 'গুরু', 'শিব শিব'—ইত্যাদি নাম ব্যাহরণ এবং স্মরণ সহায়ক। সেগুলি শঙ্করগ্রন্থি (যেমন, ঐ পথের সম্বল, খেয়ার কড়ি, সেটি শঠতস্করের কাছ থেকে বাঁচাইতে গাঁঠে বাঁধিয়াছে—যাতে মর্ত্ত্যস্য ধূর্ত্তিঃ কাড়িয়া না লয়), সেও তো খুলিতে হইবে—শ্রীগুরুর চরণে, ইষ্টের দুয়ারে! বলিতে হইবে—সম্বল বল, কড়ি বল, সবই তোমার কৃপা, তোমার নাম! আমি যদি আত্ম-অভিমানে গাঁঠ বাঁধিয়া থাকি, তুমিই সে গাঁঠ খুলিয়া আপন অযাচিত দেওয়া নিধি আবার একান্ত আপনারি করিয়া রাখ! ফল কথা, শঙ্কর গ্রন্থিগুলো মোচনেরও এক পরম ঠাঁই মেলান' চাই। নচেৎ, তালুতে যাকে তুলিয়া রাখিয়াছ, তাকে দাঁতে কাটিতেই (শ কে স করিতে) বা কতক্ষণ! আর, সর্বশেষে ঐ মূল গ্রন্থিত্রয় তো আছেই।

উদ্দিশ্য প্রকৃতিং যাতে প্রত্যয়ে হি পদে পদে।
শুদ্ধিমিচ্ছতি বাধন্তে গ্রন্থয় আণবাদয়ঃ॥
আণবো বীজনিষ্ঠো যোহঙ্কুরগ্রন্থিস্তু তানবঃ।
প্ররোহগ্রন্থিরন্যশ্চ পাশব (পাটব) ঔর্ব্ব এব চ॥ ৭৩-৭৪

শুদ্ধি প্রত্যয় আপন প্রকৃতি বা স্বভাবকে উদ্দেশ করিয়া যাইতে যাইতে পদে পদে (শুদ্ধি ইচ্ছা করিলেও) আণবাদি গ্রন্থি পরম্পরা কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। এই আণবাদি গ্রন্থিভেদ না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধিকামী (জপাদি) প্রত্যয়ের খাঁটি শুদ্ধিটি হয় না। এ স্থলে, গ্রন্থিকে আণব, তানব এবং ঔর্ব্ব—এই তিন ভাবে দেখা হইতেছে।

একটা বীজের দৃষ্টান্তে। যেটি বীজেই নিহিত, সেটি আণবগ্রন্থি। তোমার জপ্য বীজে (যদি সেটি মৈত্র-সম্বন্ধে না থাকে), এই গ্রন্থি থাকিতে পারে; তুমি জাপক, তোমার আপন 'বীজে'ও থাকিতে পারে; আবার, দুয়ের অন্বয়, যে ছন্দে, শক্তিতে বা আকৃতিতে হইতেছে; তাদের বীজে বা মূলেও থাকিতে পারে। সূক্ষ্ম যে অঙ্কুরভাব, সেটি গ্রন্থিগ্রস্ত হইলে, তানব; আর, প্ররোহে হইলে ঔর্ব্ব। বীজ থেকে প্ররোহ-পাদপ। মাঝে, অঙ্কুরটি অন্বয়। অঙ্কুরে (অর্থাৎ, বাক্‌প্রাণচিত্তের সূক্ষ্ম-উন্মেষ ভূমিতে) গ্রন্থি আসিলে, অঙ্কুর আর প্ররোহ হইল না। প্ররোহ বা পাদপে (স্থূলে, উরুতে) গ্রন্থি হইলে, ঠিক সফলতাটি হয় না, বিফলতা-নিষ্ফলতাই হয়। স্থূলের গ্রন্থিভেদ কর 'পাটবে'। এতে পাশব বা পশুভাবের যে গ্রন্থি, সেটি কাটিবে। সূক্ষ্মে, 'লাঘবে'। পাশের গ্রন্থির গৌরব ঘুটাইয়া লঘু, লঘীয়ান্, লঘিষ্ঠ কর; আর, আপন (অভিমান) কল্পিত গুরুত্ব, শ্রীগুরুর গৌরবে একান্ত লঘু করিয়া তাতেই মিলাও। লঘুগুরু-জ্ঞানটি ঠিক-ঠিক হওয়া চাই, নৈলে গুরুতে গুরুতে গুঁতোগুঁতি! ইহাই প্রকৃষ্ট বীরভাবের সাধন। পাশের কাছে বজ্র, কিন্তু তাঁর পায়ের কাছে ধুলো! শেষে আণবে যাইয়া, 'আর্জ্জবে'। ঋজুনিষ্ঠ হইতে হইতে পাশমুক্ত সদাশিব। না বেঁকিলে চুড়িলে তো গ্রন্থি হয় না! এতে স্থিতিকে স্বভাব বল, দিব্যভাব বল। প্রকারান্তরে, ঔর্ব্বাদি ঐ গ্রন্থিত্রয়কে যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি প্রভৃতি তিনটির রূপও মনে করিও। আবার দেখ—বীজটি কারক রূপ, স্থূল প্ররোহাদি ক্রিয়ারূপ, আর সূক্ষ্ম অঙ্কুরটি অন্বয়রূপ। বীজেই প্রকৃতি বা স্বভাবটি অব্যক্ত, অব্যাকৃতরূপে দেয়া থাকে। সে প্রকৃতি বা স্বভাব বিকৃতিতে না যাইয়া, অথবা রুদ্ধ না হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিলে—বীজের শুদ্ধি-প্রত্যয়। ভাল ল্যাংড়ার গাছে ভাল ল্যাংড়াই প্রচুর ফলিল! কিন্তু সে রূপটি কি?—তাই পরের দুটি সূত্র।

[ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শুদ্ধিপ্রত্যয়টি বস্তুগত্যা (as fact), ভাবগত্যা (as feeling) এবং বোধগত্যা (as appreciation)—এই তিন রকমে নিজেকে প্রত্যয়ে আনা চাই।]

২৭। প্রকৃতেঃ প্রত্যয়লেপনিমিত্তকপ্রত্যনুপ্রত্যয়ঃ প্রতিকৃত্যনুকৃতী॥

প্রকৃতিতে প্রত্যয়ের 'লেপ' নিমিত্ত যে প্রতিপ্রত্যয়, অনুপ্রত্যয় সম্ভাবিত হয়, তাকে প্রতিকৃতি ও অনুকৃতি বলে।

'লেপ' শব্দটি ব্যাপক করিয়াই লওয়া হইয়াছে। প্রত্যয়ব্যাপারসম্বন্ধ-সাপেক্ষত্বাবচ্ছিন্ন ব্যাপারবত্ত্বং—প্রত্যয়রূপ ব্যাপারটি হইলে, সেই ব্যাপার সম্বন্ধে সাপেক্ষ ব্যাপার প্রকৃতিতেও হইলে (Nature reacting to a process or action bearing upon it), সেটি হইল প্রকৃতিতে প্রত্যয় লেপ। ফটোগ্রাফিক্ প্লেট্—তাতে রশ্মিপ্রত্যয়; ফলে, সে প্লেটের যে প্রতিক্রিয়া। এরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে যে 'ছবি' মেলে, তাকে সচরাচর প্রতিকৃতি বলে। এখানে, লক্ষণ ব্যাপক। কন্‌কেভ্ মিরার—তাতে শব্দ-আলোকাদি বীচি প্রত্যয়ে মেলে কেন্দ্রীণতা—ফোকাসিং। ত্রিপার্শ্ব কাচ, স্ফটিক ইত্যাদি কত কি দৃষ্টান্ত! রসায়নে, দ্রব্যক্রিয়াদি রূপ প্রত্যয়ের ফলে অশেষ পরিণাম হইতেছে। রোগে কোন ভেষজ ব্যবহার করিয়া দেখিতে হয়, 'নেচার' বা 'ধাতু' কিভাবে প্রতিক্রিয়া করিল না করিল। সকল ক্ষেত্রেই সর্বত্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'নেচার' তো সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর করিয়া বুঝিতে হয়। মোটামুটি অপরা এবং পরা। শেষেরটাই গোড়াকার—Basic. বীজমব্যয়ম্। অপরাতে স্থূল-সূক্ষ্ম, তামস-রাজস ইত্যাদি অন্তরিক্ষ বা media মাঝে রাখিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়ের কারবার হয়। কাজেই, বেধ-জিহ্মতাদি (absorption, refraction, defraction ইত্যাদি) সম্ভাবিত হয়। ব্যবধানটা শুদ্ধ হইলে ঐ বিক্ষোভ (বিক্রিয়া, অপক্রিয়া) বিশেষ থাকে না। একেবারে শুদ্ধ হওয়া মানে—অপরার 'অধঃ' থেকে পরাকে মুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধে রাখা। সেটি হইলে, নামজপ, ধ্যান, ভজনাদি যা কিছু 'পরমা'কে উদ্দেশ করিয়া করিতেছি, সেগুলি শুদ্ধভাবে স্বচ্ছন্দেই পরায় পৌঁছিবে (শুদ্ধপ্রত্যয় লেপ), এবং পরাও শুদ্ধ, অবিতথ ভাবেই সে শুদ্ধ প্রত্যয়ের প্রতিকৃতি এবং অনুকৃতি দুই-ই ফুটাইয়া দেখাইবে। সে শুদ্ধ প্রতিকৃতি (pure reflection and representation) দেখিয়া বুঝিব—জপে এত মহিমা, এত গরিমা, এত মধুরিমা! আবার, শুধু প্রতিকৃতিই নয়, অনুকৃতিও। প্রকৃতি এবং প্রত্যয় দুয়ের শুদ্ধ কৃতিতে (ব্যাপারে) কৃতির অপূর্ব পুষ্টি এবং ঋদ্ধিও হয়। এর ভেতর পড়ে—Resonance Effect—সুষমস্পন্দ সমুচ্চয়—যার কথা বারবার বলা হইয়াছে। এর দ্বারা কি হয়? প্রকৃতি করে—আপূরণ প্রত্যয়ের। ভাব স্বভাবকে জাগায়, স্বভাব ভাবকে বাড়ায়। প্রাণের সকল ভূমিতেই এটি হয়।

কিন্তু অপরার উপদ্রবে 'লেপ'টি অশুদ্ধ, অশুচি হইলে—শুদ্ধি প্রত্যয়ের কর্মই হবে—ঐ লেপটিকে ক্রমশঃ 'লেশ', পরে 'লোপে' আনা। লেপটি অশুদ্ধ হইলেই

জপাদিতে বুঝিব—ময়লায় ঢাকা পড়িয়া অথবা বেয়াড়া দোলায় দুলিয়া সব সাধনই কেমন যেন 'বিশ্রী' হইতেছে, 'মন্দা' হইতেছে। ঠিক প্রকৃতিতে ছুঁইতে না পারিয়া শুধু কতকগুলো বিশ্রী প্রতিকৃতি আর মন্দা অনুকৃতি লইয়া সাধন ঝকমারি! শ্রীগুরুকৃপা সম্বল করা চাই। তা হইলে বিশ্রী হবে সুশ্রী, মন্দাও হবে তেজী অথচ সান্দ্রা।

ক্রিয়ানুপাতিনী যা হি প্রত্যয়স্য প্রতিক্রিয়া।
প্রকৃতেরনুরোধাৎ সা প্রতিকুর্য্যাদ্ দ্বিরূপতঃ।
আভাসপ্রতিবিম্বাবচ্ছেদবিকল্পনা ততঃ॥৭৫

প্রকৃতি উদ্দেশে কোন প্রত্যয় হইলে, সেই প্রত্যয়ের যেটি ক্রিয়া, তার 'অনুপাতে' এক প্রতিক্রিয়াও অবশ্যই হয়। সে প্রতিক্রিয়াটি প্রকৃতির 'অনুরোধে' পূর্বোক্ত দুইরূপে (প্রতিকৃতি এবং অনুকৃতি) আকারিত হয় (প্রতিকুর্য্যাৎ)। লক্ষ্য কর যে, প্রত্যয়ের দিক্ থেকে অনুপাত, প্রকৃতির দিক্ থেকে অনুরোধ। পরায় পৌঁছিলে, এই অনুরোধ পরমার যেটি অনুগ্রহ শক্তি, সেই শক্তিরই অনুরোধ আকার গ্রহণ করে। তখন, ক্রিয়ার যে অনুপাত (proportionality) সেটি, অনুগ্রহানুরোধে, অপরায় যেমন, তেমন আর থাকে না। তখন ক্রিয়া ভাবাদি আর অনুপাতভূমিতে থাকে না। অপরার মত পরা 'বাধ্য' প্রকৃতিও নয়। সুতরাং, সেখানে স্বসত্তাসম্বন্ধাদি অনুরোধটি আছে। সে বলিতে পারে—ও ভাবে, ও সম্বন্ধে আমি থাকিব না। প্রকৃতিতে যে 'লেপ'টি হইল, সেটি কি আভাস মাত্র, না প্রতিবিম্ব, না অবচ্ছেদ—ইত্যাদি যে সব বিকল্পনা, সে সব পরে। এস্থলে একান্ত প্রাসঙ্গিক নয়।

প্রকৃতিতে প্রত্যয় লেপটি অশুদ্ধ হইলে প্রতিকৃতিটিকে শোধন ক্রিয়াটি হইল সংস্কৃতি; অনুকৃতিটি 'সুস্থ সবল' করার ক্রিয়াটি হইল উপকৃতি। শ্রীগুরু, সন্ত—এঁদের সেবা-আনুগত্যাদি দ্বারা এই দুইটিই সহজে সম্ভাবিত হয়। সংস্কৃতির জন্য বিশেষতঃ দীক্ষা; উপকৃতির জন্য শিক্ষা। উভয়তঃ—প্রত্যক্সঙ্গা।

এইবার, প্রকৃতিকে আপন প্রতিকৃতিতে দেখিতে যত্ন কর। সব কিছুর 'লেখা' তুমি তো তুলিয়া ধরিতেছ—কোনটা বিশ্রী, কোনটা বা সুশ্রী। কিন্তু নিজ প্রতিকৃতি? আপন 'লেখা'?

২৮। বীজনিষ্ঠশক্তিকূটপ্রতিকৃতির্হৃল্লেখা।।

বীজ বা কারণে নিগূঢ় এবং অবিনাভাবে স্থিত যে শক্তিকূট সেই শক্তিকূটের প্রতিকৃতিকে ‘হৃল্লেখা’ বলে।

ধর, বীজ বা কারণকে বলি প্রকৃতি। এই প্রকৃতি যে কিরূপ, তাতে কি নিগূঢ়ভাবে আছে বা না আছে, তা তো জানি না। সে সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় হইতেছে না। কিন্তু জানার নিমিত্ত প্রত্যয় আরম্ভ হইল (যেমন, বিজ্ঞানে, যেমন যোগজজ্ঞানে, ইত্যাদি)। বিজ্ঞানের প্রত্যয় যন্ত্রপাতি সাহায্যে পরীক্ষায় এবং সমীক্ষায়; যোগের প্রত্যয়—সংযম (mind concentration)। এই সব প্রত্যয়ের ফলে, প্রকৃতি যে যে ভাবে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিপ্রত্যয় করিল, সেই সেইটি তার প্রতিকৃতি। কিন্তু ছবি তো অনেক রকমই উঠিতেছে—অন্দরের ছবি (inside picture) ও উঠিতেছে। বাইরে অণু-বিরাট্ সব তার ‘ঘরওয়া ছবি’ আর ‘হাঁড়ির খবর’ বেশী বেশীই মিলিয়াছে এবং মিলিতেছে। মনের দিক দিয়ে সাইকো-এনালিসিস্ প্রভৃতিও অনেক ভেতরকার ‘গুপ্তচিত্র’ ফুটাইয়াছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘শনৈঃ পন্থাঃ’ ভাবেই। শেষ বা অবধি কোথায়? বরং গণা-গাথার সুবিধাটা ক্রমে বেশী হইলেও, অর্থাৎ, ছন্দঃ আর আকৃতি বেশী বেশী মাপের মধ্যে আসিলেও, সত্তা এবং শক্তি যেন আরও ‘গহনে’ ও ‘গভীরে’ ডুব মারিতেছেন। আসলে কিন্তু ছন্দঃ আর আকৃতি সত্তাশক্তিরই প্রকটরূপ। বীজ, কারণ, প্রকৃতি ওতেই নিগূঢ়-নিশ্চিত রহিয়াছে। সেটি, সত্য প্রতিকৃতি, সাচ্চা ছবি না তুলিতে পারা পর্যন্ত, সবি ‘বাহ্য’—ছায়াচিত্র বা মায়াচিত্র। বিজ্ঞান অণুর কেন্দ্রীণ প্রতিকৃতি তুলিতেছে, কাজেও বিকাইতেছে। কিন্তু একেবারে মর্মচিত্রটি? প্রাণ, চেতনা, আনন্দ—এসব ‘অবান্তর’ রাখিয়া কি কোন কিছুর মর্মচিত্রটি উঠিবে? একথা ঠিক যে—প্রতিটি পদার্থের যেটি ‘মর্ম্মৌকঃ’ (inmost core), সেখানে সত্তাশক্তি নিজেকে এক নিগূঢ়ব্যূঢ়-রূপতায় বিন্যস্ত ভাবেই পাইয়াছে। পরের সূত্রে ঐ মর্মৌকঃটিকে ‘হৃৎ’ নাম দেয়া হবে। সুতরাং ঐ হৃদের যেটি নিগূঢ়-নিশ্চিত শক্তিব্যূহরূপ (inmost Power-Structure or Basic Dynamic Diagram), সেইটিই হৃল্লেখা। এই হৃল্লেখায় পৌঁছিলে তবে বীজাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানাদির প্রত্যয়টি শুদ্ধি প্রত্যয় হইবে. আর, হৃল্লেখায় পৌঁছিলেই শক্তি মণ্ডলের (Power Field এর), কেবল নেমি আর অর নয়, মূল ‘নাভি’ পর্যন্ত গতি হইল। আর, নাভি তো ‘সবৃহি’!

যে বীজ প্রত্যয় এই নাভিতে লইতে, আর তা হইতে 'সব্‌হি' দোহন করিতে সাধিষ্ঠ-সমর্থ, সেটি হইল হ্রীঁ।

এখানে অবশ্য 'পরম' পর্যন্তই প্রত্যয় লইয়া যাবার প্রয়াস হইতেছে না। পরমে যে প্রপঞ্চোপশম, একান্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন ভাব, সেখানে সব কিছু 'লেখা' এবং সকল প্রত্যয়েরই অবসানভূমি। নিরঞ্জন ভাবটিই অবাস্তব (মায়া) অথবা অবান্তর (ছায়া) ভাবিলে, ঐকান্তিক নির্ব্যূঢ়তার ভূমিটিই থাকিবে না, সবই সাপেক্ষ-ব্যূঢ়রূপতার 'ছায়ায়' পড়িবে। পক্ষান্তরে, নিরঞ্জন-নির্বিশেষ পরমের সঙ্গে যে আকারেই হোক্ (আভাসাদি বাদ এইবার মল্লে নামিতে পারেন) এক অনির্বচনীয় সকল সবিশেষ রূপটিও আছে। এই পাদের প্রথম (মহামায়া) সূত্রে সেটিও তত্ত্বের পূর্ণতায় সমাহৃত হইয়াছে। এখন, এই পরিপূর্ণ সকল ভাবে মূলে যে পরিপূর্ণা কলাশক্তি (ধর, ক্লীঁ), তিনি সৃষ্টির সব কিছুতেই তার হৃল্লেখা রূপে অনুপ্রবিষ্টা আছেন। আর, সে ভাবে, তিনি হ্রীঁ। এই বীজটিকে, অন্য সকল বীজ শক্তিব্যূহকেই, পরমঘনতায় লইলে হইল—পরম বিন্দু। এই বিন্দুরূপেই ব্রহ্ম সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং, বিন্দুই হইল পরম হৃল্লেখা। অথচ, এই পরম হৃল্লেখা (বিন্দু) সব কিছুতে পূর্ণ রহিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ হৃল্লেখা আকারেও (সত্তাশক্তিতে, ছন্দে, আকৃতিতে) যেন নিজেকে অশেষ সুষমায় সৌষ্ঠবে লীলায়িত করিয়াছেন। এই অশেষ সুষম লীলায়নটি হইল শ্রীঁ। আর, পরমা সকলার এসব শুদ্ধ সম্পূর্ণ আকৃতি-প্রকৃতিতে যেটি নির্বাধ শুদ্ধি-প্রত্যয়, সেটি ঐঁ। বাগ্‌ভব বা গুরুবীজ।

বীজে যা পুটিতা শক্তিশ্ছন্দসা ব্যূঢ়তাং গতা।
হৃল্লেখা সাঽপি বিজ্ঞেয়া স্বব্যূহচ্ছান্দসচ্ছবিঃ॥
শ্রীলেখা কামলেখা চ বজ্রলেখা পুনস্ত্রিধা।
সৌষ্ঠবং কামতন্ত্রঞ্চ চামোঘত্বং যথাক্রমম্॥ ৭৬-৭৭

বীজে শক্তি সম্পুটিতা—নিগূঢ়নিষ্ঠিতা। ছন্দসা=আপন (intrinsic) ছন্দেই সেটি ব্যূঢ়রূপা (বীজপ্রকৃতিই আকৃতিরূপে বিন্যস্তা) হইয়াছে। বীজপ্রকৃতির এবম্বিধ 'স্বশক্তি-স্বচ্ছন্দঃ-স্বআকৃতি' রূপকে হৃল্লেখা বলে। এটি শ্রীলেখা, কামলেখা এবং বজ্রলেখা

ভেদে তিন প্রকার। সৌষ্ঠব, কামতন্ত্র বা স্বতন্ত্র ও অমোঘত্ব—Rhythmic, Spontaneous, Sure—এই তিন যথাক্রমে লক্ষণ। (শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ বীজত্রয় যোগে—শ্রীঁ হ্রীঁ, ক্লীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ। এর সঙ্গে শুদ্ধিপ্রত্যয়বীজ ঐঁ।

এইবার, 'হৃৎ' সূত্র।

২৯। স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-মর্ম্মৌকস্ত্বং হৃত্ত্বং সর্ব্বস্য।।

সব কিছুর স্থিরতম, অন্তিকতম বা নিকটতম, যে মর্মস্থানতা, সেটি 'হৃৎ' এই শব্দের দ্বারা অভিধেয়। 'স্থেষ্ঠ' বলিতে অস্থির, অনিয়তের (varying, fluctuating) এর মাঝে যেটি (ঐকান্তিক নির্ব্যূঢ় রূপে না হইলেও, অপরা এবং তার বিচিত্র বিকৃতির অপেক্ষায়) নিয়ত এবং ধ্রুব (যথা, বহির্বিশ্বে Cosmic Constant; প্রাণিজগতে Continuity of the germplasm, ইত্যাদি)। সব কিছু চক্র বা মণ্ডলাকৃতিতে (as 'sphere', 'packet', 'field') হইয়াও নিজেদিগকে একাধিক 'প্রকোষ্ঠে' (ring) সাজাইয়াছে দেখি (যথা, পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল, অণু, কোষ, ইত্যাদি)। এসব প্রকোষ্ঠের মধ্যে অন্তরতম যেটি, সেটি নেদিষ্ঠ। রসভূমিতে রাসমণ্ডলের কেন্দ্র বা নাভি রাসকমলকর্ণিকা। জীবে পঞ্চকোষ বা সপ্তকোষ তার নিজ 'জগৎ'। 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'—সেটি জীবত্ব বা জীবের নিজপ্রকৃতি। অন্য বাক্ সম্পর্কে প্রণব; প্রণবের নিজ সম্বন্ধে নাদ-বিন্দু-কলা, এই ত্রয়ীরূপা অর্দ্ধমাত্রা। সেটিকে সমাশ্রয় করতঃ, সেটিরই অন্বয়ে ও অনুবাদে (as dependent relation, and as its rendering)—ঐ বস্তুটির ব্যাপার-ব্যবহারের পটভূমিটি (frame of reference) নির্দ্ধারিত হইতেছে—এই নিমিত্ত বলা হইল, মর্ম্মৌকঃ। আগে, অনুবন্ধচতুষ্টয়ের কথা (বিষয়-সম্বন্ধাদি) বলা হইয়াছে, সেটি, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, নিরূপিত হয় এই 'মর্ম্মৌকঃ' ভাব ও ধর্মের দ্বারা। প্রতিবন্ধ-চতুষ্টয়েও (অবরোধ প্রতিরোধাদি) তাই। সম্বন্ধচতুষ্টয়েও (মন্ত্র-মন্ত্রী-মন্ত্রদাতা-মন্ত্রিত) তাই। ঐ মর্ম্মৌকঃ বা Basic Frame টি বাদ দিয়া কিছুই 'ছকিবার' যো নেই। এই মর্ম্মৌকে ব্যষ্টিত্ব (individuality) আর জীবত্বই (personality) কেবল নিজেদিগকে স্থেষ্ঠ নেদিষ্ঠরূপে 'কেন্দ্রীণ' করিয়াছে এমন নয়। এখানে বিন্দু ও বিন্দুবাসিনী ভগবত্তাকে জীবত্বের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিয়াছেন। Divinity বা Life

Divineএর মর্ম উৎস (Basic Spring) টি এইখানে। 'অহং জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।'

চতুর্মানানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা প্রতিযোগিতা।
অস্যাস্তীত্যত ওকস্ত্বং তদধিকরণঞ্চ হৃৎ॥ ৭৮

বহির্ব্যাপারে যে চতুর্মান (কালসমেত দেশের তিনটি মান) আবশ্যক, সে চতুর্মান (four-dimensionality) একে বিশেষিত (অবচ্ছিন্ন) করে না; বরং চতুর্মানের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিতা, তারই বিষয়তা এতে আছে। অর্থাৎ হৃৎ দেশকাল সম্বন্ধে 'নামিয়াও' (স্মৃতি-জ্ঞান-অপোহন ইত্যাদিতে), তাদের অতীত। তা না হইলে, ঐ স্মৃতিজ্ঞানাদির মত অনিয়ত, বহিরঙ্গ, পরতন্ত্রাদি হইত। এভাবে, ও অনুবন্ধাদি সম্বন্ধে, অবতরণ করা সত্ত্বেও, সে সকলের দ্বারা বিশেষিত বা বাধ্য নয়। তা হইলে, অনুবন্ধ-প্রতিবন্ধাদি পরিবর্তনের সঙ্গে এটিও পরিবর্তিত হইত। 'ওকঃ' শব্দটি অনুগ (immanent) অথচ অতিগ (transcendent) ভাবটি ব্যক্ত করার নিমিত্ত। ['লোকঃ' এবং 'ওকঃ' শব্দে ব্যঞ্জনা একরূপ নয়। 'লোকস্' বলিতে কোনও বিশিষ্টরূপে নিরূপিত—দেশকালাদি সম্বন্ধে—যে আধার লেখ, তাতেই বৃত্তিটিকে লওয়া হইল]। উক্ত মর্মৌকঃটিকে অধিকরণ করতঃ, বিন্দুভাবের স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-সম্পর্কে, যেটি বিদ্যমান, তাকে বলে 'হৃৎ'।

হৃৎ আর স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ মর্মৌকঃ—এ দুয়ের পরস্পর তাদধিকরণ্য আছে, অর্থাৎ, যেখানে হৃত্ত্ব, সেখানে মর্মৌকস্ত্ব। দুটি বৃত্ত বলিলে, তারা একেবারে মিলিয়া যায়। আর, যেটি হৃল্লেখা? হৃল্লেখা হইল হৃদ্‌বস্তুর নিগূঢ়-নিষ্ঠিত-শাক্তী প্রতিকৃতি। এটি হৃদ্‌বস্তুর অধিকরণেই থাকে, কিন্তু তাদাত্ম্যসমীকরণ করিলে হইবে না; অর্থাৎ, হৃল্লেখা=হৃৎ, সোজাসুজি এভাবে লইলে চলিবে না। যেমন, নাভি বা কেন্দ্রকে আধার করিয়াই চক্র বা মণ্ডল আকৃতিটি থাকে, কিন্তু মণ্ডল=নাভি বলা সমীচীন হয় না। নাভি বিন্দুরূপে সমগ্র মণ্ডলটিকে আপনার বিন্দুরূপতার লীন করিতে সমর্থ, পুনশ্চ আপনা থেকে সেটি বিস্তার করিতেও সমর্থ। একটা বৃত্ত; তার পরিধি এবং ব্যাস হ্রস্ব হইতে হইতে কেন্দ্রেই মিলিয়া গেল। তখন আর বৃত্তরূপতাই থাকে না। কোন বস্তুর

যেটি হৃল্লেখা, সেটি বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-নিমিত্তাদির অপেক্ষায় আসিতে বাধা নেই। যদিও হৃৎস্থ বলিয়া সেটি সে অপেক্ষায় একান্ত বাধ্যবাধিতও হয় না। সেইটি সে বস্তুর আপন Basic-Power-Pattern বটে, কিন্তু প্রত্যয়-প্রতিপ্রত্যয়ে উদাসীন নয়। কিন্তু হৃদ্‌বস্তুতে যে পরম অহংটি (ভগবত্তা) সন্নিবিষ্ট, তিনি নিখিলের হৃল্লেখারও লেখাধার। সুতরাং, হৃল্লেখার বিশেষ বিশেষ আকৃতি-প্রতিকৃতিগুলি, তাঁতেই আহিত হইলেও, তাঁকে তৎতৎ ভাবে অবচ্ছিন্ন-পরিচ্ছিন্ন করে না ('ন চ তেম্বহম্')। এ প্রসঙ্গাও এখন এই পর্যন্ত।

তার পরের দুটি সূত্রে কথঞ্চিৎ অনুসরণ হইতেছে।

৩০। বিশেষতঃ দেশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা হৃদ্দেশত্বম্॥

হৃল্লেখা বিশেষ সম্বন্ধে উদাসীন নয়। এইটি যখন বিশেষভাবে দেশসম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, তখন হৃৎকে বলে হৃদ্দেশ। 'হৃৎ' স্বয়ং তাঁরই 'ধাম'। এখানে দেশাদি সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ নেই। কিন্তু দেশসম্বন্ধাতীত এই বস্তুকে দেশের সম্বন্ধে ভাবিলে, ইহা হয় হৃদ্দেশ। এদেশ অবশ্য বাইরের Space মাত্র নয়। এটি অন্তর্বহিঃ সর্বত্র বিতত (as Extension, Co-existence) রূপে প্রত্যয়ের আধারপট। আন্তরভাবনাতেও এটি থাকে। সুতরাং 'অন্তর' বা ব্যবধান বস্তুটিও এখানে সাবকাশ।

'হৃদ্দেশ' পদার্থটিও সার্বভৌম, অর্থাৎ, নিখিল বস্তুতেই 'হৃদ্দেশ' আছে। হৃদি স্থিতা হৃল্লেখা যখন ঐ রকম যুগপত্তাসহকারে (as co-existence) বিতত, বিস্তৃত করিয়া দেখায়, তখনই হয় হৃদ্দেশ। যেমন, অণুর প্রতিকৃতিতে দেখি ইলেকট্রন-প্রোটনদের। জীবকোষেও। আন্তরভাবনায় চিত্তেও।

যন্ত্রারূঢ়ং হি যত্রৈব ভ্রাম্যতে নিখিলং জগৎ।
সদসৎ স্থূলসূক্ষ্মঞ্চ তস্য হৃদ্দেশতা মতা॥ ৭৯

গীতার সেই 'হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি' শ্লোকটি স্মরণ কর। দেশসম্বন্ধের সঙ্গে নিমিত্ত সম্বন্ধটিকেও নাও। 'হৃদি' তিনি সন্নিবিষ্ট হইয়া এক পরমভাব দেখাইয়াছেন। সেটি—'অহমেব বেদ্যঃ'। বিদ্যার ভাব। মধ্যে হৃল্লেখা যদি বিদ্যারূপা হন, তবে 'হৃদি'

তিনিই পরম বেদ্যা। এই বেদ্যতার রূপ স্মৃতি-জ্ঞান-অপোহন (অপাস্তং উহনং যস্মিন্)। কিন্তু হৃল্লেখা 'হৃন্মুখী' না হইয়া দেশনিমিত্ত-কালনিমিত্ত-সম্বন্ধের অপেক্ষায় আপনাকে আনিলে কি হয়? জ্ঞানের স্থলে অজ্ঞান ইত্যাদি। কাজেই, তখন সেই হৃদ্দেশটিকে মায়া যন্ত্ররূপে লইয়া সদসৎ, স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল জগৎকে, তিনি ঈশ্বররূপে, ভ্রামিত করিতেছেন। পরাঙ্মুখীন হইলে হৃদ্দেশ মায়ারূঢ় সব কিছুকে ভ্রাম্যমাণ করার ঠাঁই। স্থূলে সূক্ষ্মে, ব্যক্তে অব্যক্তে,—সর্বত্র। এখানে 'যুগপত্তা' ধর্মটি থাকে বলিয়া, কেহই বা কিছুই পরস্পরের ঐ দেশ নিমিত্ত বন্ধ (co-existence bond) সহজে কাটাইতে পারে না। সবাই পরস্পরকে এক অবস্থিতিতেই চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কেউ কাকেও সহজে 'মায়া' কাটাতে দেবে না। এটি যন্ত্রারূঢ় ভাব। কারুরই, যন্ত্র থেকে সহজে নেমে বা উঠে পড়ার যো নেই! The inexorable concourse of cosmic whirl of events. প্রত্যক্ প্রবণতায় এটিতে ঐ হৃৎ বা নাভিমুখে এক বৃত্তি দেখা দেয়। সেখানে তিনি স্বয়ং সন্নিবিষ্ট—পরম বেদ্য ভগবতা। সেটি হইলে—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' ইত্যাদি।

সুতরাং হৃদ্দেশ দেশবন্ধমুখ্যতা নিবন্ধন (predominantly space-bound and plane-bound) মহামায়ার মায়া যন্ত্রটি পাতার ঠাঁই বটে, কেবল মনুষ্যাদির জন্য নয়, 'সর্ব্বভূতানাং'। এ মায়া—অবিদ্যা, মদ্ভ্রান্তি এবং তদ্ভ্রান্তি। নিজেকেও চিনি না, তাঁকেও জানি না। কাজেই, যন্ত্রারূঢ় পক্ষে নিরন্তর নিষ্পেষিত হওয়া রূপ যে মহাভয়, সেই মহাভয়ের স্থান। কিন্তু মহাভরসার ঠাঁইও ঐ হৃদ্দেশ। ঐ হৃদ্দেশটিকেই বেদী করতঃ তোমার জপাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ধ্যানের, ভাবগাঢ়তার ঠাঁই হৃদ্দেশ। চলতি চাক্কিতে চাপাইয়া সব কিছু ভ্রান্তিরূপে নিরন্তর ঘুরাইয়া মারিতেছেন যিনি, তিনি অন্ধ নিয়তি নয়, তিনি ঈশ্বর—গতির্ভর্ত্তা ইত্যাদি। চলতি চাক্কির কীলটিও তিনি প্রপন্নকে দেখাইয়া ও ধরাইয়া দেন। কীলকাশ্রয়ে হৃন্মুখী হৃল্লেখাতে স্থিতি, সুতরাং সেই পরমবেদ্যের ধ্রুবপদেই স্থিতি। ধ্রুবপদে লইবে— 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'। যে বেদীতে জপাদি যজ্ঞ করিবে, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরও সেখানে—হৃদ্দেশে। বলির মতো তোমার আপন বলিটিও সম্পূর্ণ করার জন্য তিনিও হৃদ্দেশে যেন সাধে বাঁধাই রহিয়াছেন! হৃৎ এক যায়গায়, হৃদ্দেশ আর যায়গায়, এমন ভাবিও না। হৃদ্বস্তুই বিশেষভাবে দেশ নিমিত্ত সম্বন্ধে আসিয়া হৃদ্দেশ, এটি মনে রাখা চাই। বৈয়াধিকরণ্য

নেই। ওটা অন্য অধিকরণ, কাজেই ওখানে অধিকারী, অপর কেহ, এমন নয়। তুমি ও তিনি—ত্বং এবং তৎ—সব তাতেই, ভোল' ফিরাইয়া তিনি।

মায়ার তলদেশবদ্ধতারূপ আবরণের আধিক্যে ঐ মায়াযন্ত্রারূঢ় অধিভূতভাব। এটি থেকে অধিদৈব, অধ্যাত্মাদিক্রমে অভ্যারোহটি সাধিতে হইবে। প্রথম দুটিতে দৃষ্টি মুখ্যতঃ পরাক্—বাহিরে। অধ্যাত্মে হয় মুখ্যতঃ প্রত্যক্। ভোল' আর ভোলা ছেড়ে ভোলানাথের খোঁজ।

এখন, এই দেশতলবদ্ধবৃত্তিতাটির মুখ্যতা (predominance), কমে, কাটে কি হইলে? কমে, কাটে যদি ঐ চলতি চাক্কিকে বলা যায়—তুমি ঘুরিতেছ, ঘোর; কিন্তু দেশের বাঁধন আর তলের বাঁধন ক্রমশঃ আলগা করিয়া ঘোরার ফিকির ধর। ধরিব কি করিয়া? এক উপায় আছে—যদি এর সঙ্গে কালনিমিত্ত সম্বন্ধটাও স্বচ্ছন্দে জুড়িয়া দিতে পার। তাতে ঐ দেশতলবদ্ধতা থেকে ক্রমে রেহাই—ক্রমমুক্তি। বিজ্ঞানে নিউটনের যুগের 'দেশ' আইনস্টাইন-যুগের কালের সঙ্গে মিলিয়া বিজ্ঞানের জড় 'অধিভূত' ভাবের 'ভূত' ছাড়াইয়াছে। ভূত এখন শক্তি। আচ্ছা, এই অবিদ্যা দেশ এবং তলে বদ্ধ যে ভাব, তাতে কালকে স্বচ্ছন্দে নেয়া মানে? তার মানে—কাল এসে গোড়ায় বলিবে—সময় ধরে, ঘোর; ঘোরার ঝোঁকে বাধ্য হয়ে নয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে ওঠ, শৌচাদি সার, সন্ধ্যাজপাদি কর। দেশের বাঁধন আলগা করে কালের নিয়মে এস। এটা ঠিক হইলে, শমদমতিতিক্ষাদি। এগুলোও ঠিক হইলে উপরতি, শ্রদ্ধাভাবভক্তি এবং শেষে সমাধান। সমাধান হইলে যেটি পরমবেদ্য এবং পরমাস্বাদ্য তাঁর সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধটি সংঘটিত হইল।

পরের সূত্রে, এই কালসম্বন্ধের কথা—

৩১। তস্য বিশেষতঃ কালসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা হৃদয়ত্বম্.
তথা চ গ্রন্থিভেদেঽপাবরণং সত্যস্যেতি॥

বিশেষভাবে কালসম্বন্ধে আসিলে, হৃদ্‌বস্তুর যে আকৃতি, তাকে বলে 'হৃদয়'। সেরূপ হইলে যদি গ্রন্থিভেদটি হয়, তবে 'সত্যস্য মুখম্' অপাবৃত (নিরাবরণ) হইয়া থাকে। (পাদশেষ—ইতি।)

উভয়সূত্রেই 'বিশেষতঃ' পদটিতে মনোযোগ দিও। পূর্বসূত্রে হৃদ্দেশ যে কি

বিশেষ আকারে মায়ায় বন্ধ এবং ভ্রাম্যমাণ ভাবের হেতু হয়, আর কি বিশেষ আকারে তা থেকে মুক্ত হবারও সহায়কভূমি হয়, সেটি বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু, হৃদ্দেশটি হৃদয় হইলে, তাতে (হৃদ্দেশে) দেশতলবন্ধতার হরণ করে, সুতরাং মুক্ততার পূরণ করে, এমন এক বিশেষ বৃত্তি আসিল। সেটিকে কাল নিমিত্তবৃত্তি বলা হইতেছে। 'ই' (গত্যর্থ) থেকে 'অয়'। অথবা, জাত্যর্থ 'অয়' ধাতু। স্বরের আদি এবং সকল ব্যঞ্জনের আশ্রয় যে 'অ' বর্ণ, তার সঙ্গে বায়ুবীজ 'য' যোগে এই ধাতু। আধার বা অধিকরণ ঠিকই আছে, অথচ বহন করিতেছে, বিস্তার করিতেছে, ঊর্দ্ধগ করিতেছে ('ই' এবং 'য'—দুটিই ঊর্দ্ধগ), ঐ বায়ুবীজ 'য'। পক্ষান্তরে, 'হৃদ্দেশ' শব্দের আকৃতিতে দুটি দন্ত্যবর্ণের যোগে তলবৃত্তিতা এবং দন্ত দ্বারা (কীল) বন্ধবৃত্তিতাই প্রধান হইয়াছে। কিন্তু 'এ' (অ+ই) এবং উষ্ম তালব্য ('শ'কার) তাতে থাকাতে বক্র অথচ ঊর্দ্ধগ একটা সহগ (component) সম্ভাবিত রহিয়াছে। অর্থাৎ, চাক্কি ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু ঐ সহগটিকে ঠিক ঠিক (ঋতচ্ছন্দে) বাড়িতে দিলে, শঙ্খাকৃতিতে (as spiral) ঊর্দ্ধগ হইতে পারে, এবং কাষ্ঠায় (in the limiting position) 'ঐ' কীল (axis) 'এই' তে আনিয়া মিলাইয়া দিতে পারে। হৃদ্দেশ এবং হৃদয় শব্দ দুটি উচ্চারণ করতঃ তাদের প্রাণিক আকৃতি লক্ষ্য কর। হৃদয়ে ঐ দ্বিত্ব 'দ' এর ক্রিয়াটি একটি 'দ' এ লাঘব (reduced) হইয়াছে। দুটি 'দ'-একটি লম্বগ (vertical), পরেরটি সমতালিক (horizontal)। এই 'দ' দুটি চাক্কিকে বলে,—আমি কীলকদণ্ডরূপে অক্ষ এবং ঊর্দ্ধগ রহিয়াছি বটে কিন্তু তোমাকে তোমার এই নির্দিষ্ট তলেই ঘুরিতে হইবে। বেশ চাপিয়া, শক্ত হইয়াই ঘুরিতে হইবে, যাতে যন্ত্রারূঢ় সমস্ত কিছুর ভালমতে পেষাইটি হয়। হৃদয়ে পরের 'দ'টি আর নেই, 'অয়' রহিয়াছে। বায়ু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে কাল। কালের এক মুখ্যবৃত্তি—সংখ্যান। সেই দার্শনিক কান্টও সেটি ধরিয়াছিলেন। Magnitude and Number. যেটা দেশ-আকারে শুধুই magnitude, তাকে কাল আকারে সংখ্যানে না আনা পর্যন্ত, সেটি যেন বন্ধ (tied, bound)। সংখ্যারূপতা পাইলে সে হয় মুমুক্ষু-মুক্ত। এক বলে—দুই হব, বহু হব, হরণে-পূরণে ইত্যাদিতে। বীজ যতক্ষণ স্তব্ধ তখন সেটি 'হৃদ্দেশ'; যেই উচ্ছূন হইল, অঙ্কুর হইল, অমনি সে 'হৃদয়'। ভাব প্রকৃতি সব কিছুরই এই দুটি ভাব। শ্রীগুরু যে বীজ বা নামটি দেন, সেটি হৃদ্দেশভাবেই থাকিলে তো হয় না, তাকে জপ (সংখ্যানপূর্বক) দ্বারা হৃদয়ভাবে

আনিতে ও পাইতে হয়। তা ছাড়া কাল=ঋতচ্ছন্দঃ। এ সবের আবশ্যকমত বিস্তার পরে হইবে। কলে পড়িয়াছ, কল কাটাইবার উপায়—কালিক (regular) হও; তবে বাঁধা আছ; তল কাটাইবার উপায় 'তালিক' (rhythmic) হও।

কালনিমিত্ত সম্বন্ধকে 'বিশেষতঃ' অবলম্বন করিতে পারিলে 'হৃদয়' (কাজের, ভাবের 'heart') মেলে।

অব্যক্তং কারণং হৃদ্ বৈ তদধিষ্ঠানতা পরে।
হৃদয়ং ব্যক্তমব্যক্তং যৎ পরাবরতাং শ্রিতম্।
ব্যক্তঞ্চ বিদ্ধি হৃদ্দেশং মায়াযোগেন চাবরম্॥ ৮০

শেষের এই কয়টি (হৃৎ, হৃল্লেখা, হৃদ্দেশ, হৃদয়) আর এক দৃষ্টিতেও দেখ। সব কিছুর যে অব্যক্তকারণভাব, সেটি হৃৎ। এটি পরতত্ত্ব বা পরমকে অধিষ্ঠান করিয়া আছে। কারণের দুটি দিক্—উপাদান এবং নিমিত্ত—কি? এবং কেন? পরে দেখিব যে, 'কি' ভাবে সমস্ত কিছুরই হৃৎ হইল আনন্দ (যার স্বলসিতাদি ভাব বিবেচিত হইয়াছে)। 'অস্তি' 'ভাতি'র সঙ্গে তত্ত্বতঃ তাদাত্ম্যও। কিন্তু একটা 'কেন' বা হেতু বা নিমিত্তের দিক্‌ও আছে, নেই কি? সেটি মূল (Basic) শাক্তী-প্রতিকৃতি—হৃল্লেখা। কোন কিছুর সম্বন্ধে সব কিছু 'কেন'র মূল জবাবটি ঐখানে। হৃল্লেখা হৃদি অধিষ্ঠিতা। ভগবত্তার মূল নিমিত্তভাবেরই রূপ। হৃদি যেটি অব্যক্ত, যেটি হৃল্লেখাতে ব্যক্তাব্যক্ত এই দ্বিভাবে 'বিসৃষ্ট' হবার শক্তিরূপতা। বীজ আর উচ্ছূনভাব। বীজে যেটি, সেটি অব্যক্ত, অজানা। বীজ 'ফুলিয়া' (চীয়মান) যেন বলে—এই দেখ, বিমর্শ হইয়াছে, কলন হইয়াছে, শাক্তী আকৃতিটি দেখ। শাক্তী লেখা দেখ—The Basic Power Formula. বীজরূপে দেশকালনিমিত্ত সম্বন্ধে 'ঘুমন্ত' ছিল (যেমন, সুষুপ্তিতে)। উচ্ছূন হইয়া দেশকালনিমিত্তের পানে 'উন্মুখ' হয়। কিন্তু 'বিশেষতঃ' সে সম্বন্ধে অবগাহন করে না। বিশেষতঃ হয়—হৃদ্দেশে এবং হৃদয়ে। উচ্ছূনবীজের যে আবরণ ত্বক্, সেটিকে হৃদ্দেশের ভূমিকায় লইতে পার। সেটি 'ফাটিয়া' অঙ্কুরাদি উদ্‌গমে—হৃদয়। যেটি আবরণ ত্বক্, সেটি ব্যক্তই। কিন্তু অঙ্কুর?—ব্যক্তাব্যক্ত। এই নিমিত্ত হৃদয়কে বলা হইতেছে—ব্যক্তাব্যক্ত। আর,

সেটি 'পরাবর'কে আশ্রয় করতঃ আছে। আর, হৃদ্দেশকে জানিও ব্যক্তভাব—এটি মায়াযোগে 'অবর'। কথাগুলি, আপন জপ-ভাবাদির সঙ্গেও মিলাইয়া বুঝিয়া লও। কেবল বৈখরী ব্যক্তা, অবরা। বীজের খোসাটি যেমন। কিন্তু চাই। শ্রদ্ধাপূর্বক সংখ্যাদি সহকারে জপ কর। অক্ষর উচ্ছূন হইবে, এবং মধ্যে নাদ-ভাবাঙ্কুরটি উদিত হইলে, সেই অঙ্কুরই আবরণটিকে ভঙ্গ করিবে। ডিম্বের কুসুমে শাবকটিই ডিম্বের আবরণ টুটিয়া বাহির হইবে। তখন মধ্যমার সূচনা ইত্যাদি। ভিতরে অঙ্কুরভাবটি না হওয়া পর্যন্ত আবরণ ভঙ্গাটি হয় না। তাই, হৃদ্দেশটি হৃদয় হইলে তবে গ্রন্থিভেদ। গ্রন্থিভেদেরও পরম্পরা আছে। কাষ্ঠায় যেটি—সে গ্রন্থিভেদে পরাবর তত্ত্বটি দৃষ্ট হন। অর্থাৎ, তখন হৃদয় নিজেকে এবং নিজের আধার তত্ত্বকে পূরা জানিতে পারে। আর, সেটি জানিলে কি হয়? সত্য—সেই পরতত্ত্বই—হৃৎ এবং হৃল্লেখার আধার যিনি তিনিই—নিরাবরণ হন। যোগভূমি, জ্ঞানভূমি এবং রসভূমি—এ তিন ভূমিতেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদের পরিসীমাটি দেখিয়া লও।

যোগে ধারণার দেশবন্ধ বলিয়া হৃদ্দেশতা-আকৃতি; ধ্যানে প্রত্যয়ের একতানটা—নিরন্তর বাহিতা, তাই হৃদয়ত্ব। (নাভিদেশে ধ্যান-ধারণাদি হইলেও, ঐ আকৃতি দুটি সেখানেও; যেমন, বাচিক-উপাংশু-মানস, এটি বৈখরীরূপেই বিশেষ আকারে পরিস্ফুট বটে, কিন্তু মধ্যমাদি ভূমিতেও আছে, অন্য প্রকারে; বেদপাঠে যেমন আবার উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত)। ধ্যানেও আবার দেশবন্ধ ভাবটি অধিক হইলে (যেমন ধ্রুবাদির ধ্যানে), ঐ হৃদ্দেশতা আসিল; ধ্যানে লীলাপ্রত্যক্ষের নিমিত্ত আবশ্যক হৃদয়ত্ব। এখন, যোগে হৃদয়গ্রন্থিভেদের পরিসীমা—প্রকৃতি এবং পুরুষের শুদ্ধিসমতায়। জ্ঞানভূমিতে ত্বং এবং তৎপদার্থ হৃদ্দেশ; 'অসি'=হৃদয়; এবং শোধন পরিসীমাই গ্রন্থিভেদ। অনুভবে—পরমব্যক্ত (প্রকাশ) এবং পরম অব্যক্ত মিলাইতে পারিলে গ্রন্থিভেদ। রসভূমিতে, 'হম্' ছাড়িয়া 'তুঁহু' ধরিলে হয় হৃদয়। তখন, তুঁহুর সঙ্গে, তার অনুগভাবে 'হম্' করে রসাশ্রিত ভজন। আস্বাদ্য-আস্বাদক ভাবটি যখন অভিন্ন-পরমাস্বাদন নিবিড়তায় মিলিয়া যায় (২য় খণ্ডে অদ্বৈতাদ্বৈতদশকম্‌টি আবার দেখ), তখন শেষ রসগ্রন্থিভেদ।

প্রথমখণ্ডে শ্রীশ্রীকালিকাষোড়শীর শেষ শ্লোকের আগেরটি এস্থলে পুনশ্চ প্রণিধেয়।—

'হৃদ্যাদ্যা যা শয়ানা' ইত্যাদি। 'কাল' শব্দে যে 'কল' সেটিও উক্ত ষোড়শীতে ব্যক্ত হইয়াছে। 'কালস্য কলনাৎ কালী'। কলনের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তিন ভাব। জপে 'অউম' প্রভৃতি অক্ষর ইত্যাদি স্থূল কলন। প্রধানতঃ এই স্থূলকলনটি যতক্ষণ, ততক্ষণ হৃদ্দেশ। নাদ-বিন্দুরূপে অর্দ্ধমাত্রা হইলেন সূক্ষ্ম কলন। আর, কারণরূপে হইলেন আদ্যা কলা বা কলনী শক্তি (কালী); তিনি সমস্ত কলন করিয়াও অতীতা। এই ভাবটি ঐ ষোড়শীর-শেষ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। এখানে, সূত্রে যে বিশেষতঃ কালসম্বন্ধের কথা বলা হইল, সেটি কি? সেটি হইল—স্থূলব্যক্ত যে হৃদ্দেশতা, সেটিকে সূক্ষ্ম ব্যক্তাব্যক্ত মাধ্যমে অব্যক্ত কারণভূমি এবং পরমাব্যক্ত কারণাতীত ভূমিতে লইবার সম্বেগ। এই সম্বেগের সূচনা হইলে হৃদ্দেশ হইল হৃদয়।

পুনশ্চ, সত্যের মুখ অপাবরণ সম্বন্ধেও কালিকাষোড়শীর 'সত্যাস্যং যা পিধায়' ইত্যাদি শ্লোকটি অনুধাবনীয়। 'তৎসত্যং বাধমুক্তং হৃদনভসি নঃ কুর্ব্বতী সা সুহাসা।'—এই শেষের চরণে 'হৃদয়' শব্দটিতেও ধ্যান দিও। 'আদিত্যহৃদয়ম্' ইত্যাদি স্থলে 'হৃদয়ম্' বস্তুটি কি, তাও ভাবনীয়।

জপসূত্রম্

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

গ্রন্থে পুনঃপুনঃ 'বৃত্তি' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বৃত্তি অতঃপর তৃতীয় পাদের প্রথম পাঁচ সূত্রে 'বৃত্তিপঞ্চকম্' নামসহকারে সূত্রিত ও বিবৃত হইতেছে। 'বৃত্তি' ন্যায়বেদান্তাদি দর্শনব্যবহারে অত্যাবশ্যক এক পদার্থ। সাধনশাস্ত্রেও অন্যথা নয়।

১। অস্তিভাত্যচ্ছতিমোদত ইতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং বৃত্তিত্বম্॥

অস্তি (আছে), ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), ঋচ্ছতি (গমন করিতেছে), এবং মোদতে (প্রিয়ভাবে অনুভব করিতেছে), এই চারিটি মূল প্রত্যয়ের প্রতিযোগিতা (বিষয়তা) যাতে আছে, সেইটি হইল, বৃত্তিতা। চারিটির সমুচ্চয়েও বটে, বিচয়েও বটে।

প্রথম তিনটি সম্বন্ধে সংশয় তেমন নেই, কিন্তু মোদতে? এটিও এক মূলা বৃত্তি। সুখ,-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ—এই রকম দ্বন্দ্বাশ্রিত অনুভব সচরাচর হইতেছে বটে, কিন্তু মূলে আছে 'অস্মি' (অহংমাত্র নয়) বোধ, এবং এই অস্মিবোধের সঙ্গে প্রিয়তাবোধটি তাদাত্ম্যেই থাকে। 'মা ন ভুবম্' ইত্যাদি প্রত্যয়ের মূল এখানে। তা হইলে বৃত্তি হইল—Whatever affirms in terms of the four fundamentals of experience. 'ঋচ্ছতি'—এইটি না থাকিলে, প্রত্যয়ই নাই, কাজেই, বৃত্তিও নাই। 'অস্তি ভাতি প্রিয়ং' শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বই। কিন্তু অস্তি, ভাতি ইত্যাদিরূপে প্রত্যয় হইতে গেলে, 'ঋ' ধাতুটিকে চাই। তখন হয় 'অস্তি' এই আকারা বৃত্তি। শুদ্ধ ব্রহ্মত্বে এটি অবশ্য নাই। তন্ত্রে প্রকাশের সঙ্গে বিমর্শ। বিমর্শ জপসূত্রের রীতিতে মর্শপঞ্চক এবং তা থেকে ভাস পঞ্চক হইতে থাকিলে বৃত্তি। 'মোদতে' সম্পর্কেই কারিকা—

মোদত ইতি যা বৃত্তিঃ সংবিদি ভাতি মুখ্যতঃ।
এষ আকাশ আনন্দো নো চেদন্যান্ন কোঽপি চ॥

আনন্দং খলু জানীত ভুবননাভিমিত্যতঃ।
কোঽন্যাৎ প্রাণ্যাদিতি জ্ঞাতমৃতমপ্যস্মিতাশ্রয়ম্॥ ৮১-৮২

সংবিদে বা চৈতন্যে 'মোদ' বা প্রিয়তাটি মুখ্যভাবেই রহিয়াছে। এই নিমিত্ত সংবিৎ স্বভাবেই প্রিয় সংবিৎ, স্বরস সংবিৎ। দুঃখদ্বেষাদি ব্যতিক্রমটি স্বভাবে নেই। শ্রুতি 'এষ আকাশ আনন্দঃ' বলিয়াছেন, অর্থাৎ আকাশ আনন্দেরই সর্বব্যাপী বিশ্বাধার রূপ। 'আনন্দাদ্ধ্যেব' ইত্যাদিও ভাবনা কর। তা না হইলে (নো চেৎ), কেহই মূলস্পন্দরূপ যে 'অনন' (যা থেকে প্রাণন), সেটি নির্বাহ করিতে পারিত না। অর্থাৎ, আনন্দই উল্লসিতাদিরূপ লইয়া হয় মূল প্রাণস্পন্দ। এই নিমিত্ত (ইত্যতঃ) আনন্দকেই বিশ্বভুবনের মূলনাভি (হৃৎ) জানিও। নাভির বহিরপেক্ষ (বাহিরের অপেক্ষা রাখে এমন) কার্যরূপতা আছে। এটিকে ভেদ করিতে হয়। অন্তরপেক্ষ কার্যরূপতাও আছে, প্রত্যক্‌প্রবণ হইয়া এটিকে সমাবৃত্ত করিতে হয়। তারপর, কারণরূপতা। সেটি পরতন্ত্রতা পরিহারপূর্বক স্বতন্ত্র হইয়া হয় 'হৃৎ', তখন সেটি আনন্দই। হৃৎ বা কেন্দ্রীণ আনন্দের তন্ত্রতায়িকা হৃল্লেখা। কেইবা সূক্ষ্মপ্রাণস্পন্দে অথবা অভিব্যক্ত প্রাণস্পন্দে বৃত্তিমান হইত? এই যে জিজ্ঞাসা, এই জিজ্ঞাসাই, অস্মিতাশ্রয়রূপে যে মূল 'ঋতং' (ঋচ্ছতিভাব), সেটিকে যেন অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দেয়। অর্থাৎ, ঐ জিজ্ঞাসাই যেন বলে—আকাশানন্দই আমার পরমাধার। সেই আধারে 'হৃৎ' রূপে আনন্দই 'কেন্দ্রীণ' ভাবটি লইয়াছেন। কাজেই, মোদ বা প্রিয়তা আমার কেন্দ্রে। সেই কেন্দ্র বিশেষ বিশেষ 'অহং' রূপে না আসিয়াই নিজেকে জানে —'অস্মি'। এ অস্মির কথা ২য় খণ্ডে ব্যাহৃতিসূত্রে সবিশেষ আলোচিত। 'অহং' তে সঙ্কীর্ণ হইয়া 'অহং সুখী, অহং দুঃখী', এসব প্রত্যয় হয়। 'অস্মি'তে মূলপ্রিয়তা এখনও ওভাবে দ্বন্দ্বস্থ (polarised) হয় নাই। যোগে অস্মিতাসমাধির কথা ভাব। 'হৃৎ' রূপ ঐ যে আনন্দসংবিৎ, রসসংবেদন কেন্দ্র, ঐটিতেই তিনি সন্নিবিষ্ট, কাজেই, কোথায় আনন্দের মর্ম্মকেন্দ্র, কোথায় আমার রসের মূল উৎস,—এইভাবেই আমার অন্তরতম স্থলে যে ভগবত্তা, সেটিকে খুঁজিতে এবং পাইতে হইবে। ব্যথার সকল প্রদীপ জ্বেলেও এই উদ্দেশেই পরম মরমীর আরতি করিতে হইবে। কেননা সে যে আমার পরম দরদী সুহৃৎ!

চারিটি মূল প্রত্যয়, এবং বিশেষ করিয়া, 'মোদ' প্রত্যয়কে তদ্‌তদ্‌বিষয়ক বৃত্তিরূপে দেখিয়া, পরের সূত্র—

২। বাগ্‌বুদ্ধিবিষয়ত্বাবচ্ছেদকত্বং বা॥

বাক্ এবং বুদ্ধির যেটি বিষয় (বাগ্‌বুদ্ধির সঙ্গে বিষয়তাসম্বন্ধে যেটি আছে), তাকে অবচ্ছিন্ন, কিনা, বিশেষ করিয়া নিরূপিত করে যাহা তাহাও বৃত্তি।। ('বা' = সমুচ্চয়ে কিংবা বিকল্পে।)—Whatever defines the Predicable (Namable) and Thinkable.

বাগ্‌বিষয়ং চ যৎকিঞ্চিদ্ বুদ্ধিবিষয়কং তথা।
তস্য তদ্‌বিষয়তাবৃত্তং বৃত্তিতয়া বিশিষ্যতে।
বৎসো জাতো মৃতো বাত্র জন্মাদের্বৃত্তিতা মতা॥৮৩

বাগ্ বিষয় যাহা কিছু, যেমন, অকার, উকার, মকারাদি স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণ অথবা কোন শব্দ (ধ্বনি-সুরসহ), কোন নাম (যার, নিরূপিত অভিধালক্ষণাদি শক্তি আছে); বুদ্ধির বিষয় হয়ও যাহা কিছু, —যেমন অর্থ, ভাব, ভাবার্থ, মর্ম রহস্য; সেটি (অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিৎ ঐ ঐ ভাবে বাক্ এবং বুদ্ধির বিষয়রূপে 'আকৃত') এখানে 'বৃত্তি'র লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইল। সাধারণ এক দৃষ্টান্ত—বৎস জন্মিল অথবা মরিল, এখানে জন্মাদি বাক্ এবং বুদ্ধির বিষয়রূপে বৃত্তি হইবে।

লক্ষ্য কর যে, বাকের বিষয় বাচ্য, বুদ্ধির বিষয় বোদ্ধব্য বা 'ভাব্য', যাবৎ, অনিরূপণীয় বা অনিরূপিত (অবচ্ছেদকের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন)—undefined and undefinable—তাবৎ সেটি এ লক্ষণে আসিতেছে না। সামান্যতঃ, এটি বাক্ বা বাকের বিষয়, অথবা এটি বুদ্ধি বা বুদ্ধির বিষয়, অথবা বাক্ বুদ্ধি দুয়েরি বিষয় এভাবে নিরূপণীয় বা নিরূপিত হইলেও বৃত্তি। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽ প্রাপ্য মনসা সহ'—এস্থলে পরম অব্যক্তে এবং অনির্বচনীয়ে বৃত্তিমাত্রের নিষেধ বলা হইল। জপ বৈখরী থেকে পশ্যন্তীর প্রান্ত পর্যন্ত বৃত্তি থাকে; পরায় সমাবৃত্ত (নদী যেমন নদীনাথে) হয়। পরমে কোনও লক্ষণ, নিরুক্তি দেয়া চলে না। বৃত্তি সম্ভূত এবং

সম্ভাব্যও হয়। যেমন, প্রণব জপে 'অউম' রূপ বৃত্তি সম্ভূত, নাদাদি সম্ভাব্য। জ্ঞান ভূমিতে শেষ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি—'অহং ব্রহ্মাস্মি'। যোগে বৃত্তি-নিরোধভূমি ভাবনীয়। প্রণব ব্রহ্মবাচকরূপে ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা পর্যন্ত বৃত্তির লক্ষণে, অমাত্রে, তুরীয়ে, নয়। রসভূমিতে বিলসিত অবধি বৃত্তি। একান্ত স্বলসিত বৃত্তির ব্যাপ্তিতে আসে না।

আচ্ছা, অনিরূপণীয়তা এবং অনিরূপিতত্ত্ব (বাক্ এবং বুদ্ধি প্রত্যয়ের দ্বারা) একভাবে তো সমস্ত কিছুরই আছে, একটা ধূলিরেণুরও। থাকারই কথা। মহামায়াই ঐ ধূলিরেণু হইয়াছেন এবং তদ্রূপে নিজেকে দেখাইতেছেন। মায়া দিয়া মাপে (নানাভাবে) নিজেকে আনিয়াও অমেয়াই আছেন। কাজেই, অমেয়তার আধারে অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদাদি রূপে ঐ মেয়তা। অনিরূপণীয়তার ভিত্তিতে নিরূপণীয়তার নক্সা। এ নক্সাও সর্বদা বুদ্ধি এবং বাকের ব্যবহারে বদলাইতেছে। বিজ্ঞানে, যোগজ জ্ঞানে বিশেষতঃ। মূল অনিরূপণীয়তার ভিত্তিতে এই ব্যবহারিক অনিরূপিতত্বও আছে। তবে বাক্ এবং বুদ্ধির প্রত্যয়ে যতটা গৃহীত বা গ্রাহ্য, ততটাই বৃত্তির এই লক্ষণে আসিল। ব্যবসায় ('এই ঘট'), অনুব্যবসায়াদি ('আমি এই ঘট দেখিতেছি') আকৃতিতে উদ্ভূত এবং ব্যক্ত না হইলেও বৃত্তি হইতে বাধা নেই। সাধারণ নির্বিকল্পক, 'আলোচন মাত্র' জ্ঞানেও বৃত্তির লক্ষণ যাইবে। তবে তটস্থ হইয়া। ঐ সব জ্ঞানে অন্য সম্বন্ধ বা প্রকারতা যদি না 'ভাসে', তবু 'ইদং' বা 'এই' রূপে নিরূপিতত্ব থাকে, এবং সেটি যদি ব্যক্তভাবে না হইয়াও অব্যক্তভাবে (implicitly, incipiently) বাক্ বুদ্ধির বিষয় হয়, তবে সেটি লক্ষণে আসিল। 'যদি' বলিয়া একটা সর্ত করা হইল, তাই তটস্থ।

এটি সব সময় মনে রাখা দরকার যে, বিস্পষ্ট চেতনায় (focus of consciousness) যাহা নেই, অস্পষ্ট চেতনায় বা ছায়া চেতনায় (in the umbra of consciousness) সেটি সম্ভবতঃ আছে; আর, অব্যক্ত বা অবচেতনায়, কি যে নাই, আর কিইবা হইতেছে না, তা বলা শক্ত। জপাদি সাধনে যেটি 'বৃত্তিলেখ' সেটিকে ঐ বিস্পষ্ট ভূমিতে কতটুকু কিভাবেই বা দেখিতে পাই? সাধারণ প্রত্যক্ষ স্থলেও ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা আনিয়া দেয়, পরোক্ষভাবে (সংস্কারভূমি থেকে) তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু যুড়িয়া না দিলে তো ঐ প্রত্যক্ষটাই হয় না। যেমন, রূপ প্রত্যক্ষে, স্থৌল্য-কাঠিন্য-দূরত্বাদি। বাক্ এবং বুদ্ধিকেও সাধারণ-জ্ঞানভূমির তলেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। যেখানে বাক্ বা বুদ্ধির কোনও ব্যাপার বা প্রত্যয় নেই

ভাবিতেছি, সেখানেও ব্যাপারের পূর্ণলেখটি না মেলা পর্যন্ত নিশ্চয় বা অবধারণ করা যায় না।

জপাদি অধ্যাত্মসাধনে এই 'পূর্ণলেখ'টিই মুখ্যভাবে মিলাইবার বস্তু। উপরে, ভাসাভাসা কিভাবে বৃত্তি হইতেছে না হইতেছে, সেটি ওর তুলনায় গৌণ, কিন্তু দরকারী। জপাদিতে বাক্ কেবল তো বৈখরী নয়। চারিটির ভূমিতে বাক। কাজেই, বৃত্তি (অভীষ্ট বা অনভীষ্ট) কোন্ ভূমি পর্যন্ত, সেটি জানা জরুরি। বৈখরীতে নাই, অথচ মধ্যমায় আছে, এমন বৃত্তি তো বিশেষ করিয়াই অনুসন্ধেয়। তবে, বৈখরীরই প্রসঙ্গ যে স্থলে, সে স্থলে বৃত্তিকে বৈখরীভূমিকাবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে এবং কহিতে হয়। বুদ্ধিকেও তার সাধারণী ভূমিকাটিতে লইলেও তো চলিবে না। তনুমানসাদি বিশারদী ভূমি আছে। এ ভূমিটি আবার 'উতরাই'এ ধূমবর্ত্মে নামিয়া গিয়াছে, সাধারণ চেতনার অধস্তন 'আসুর' তলাভিমুখে। এখানেও বিভূতি, 'সিদ্ধাই' আছে। আবার, 'চড়াই'এ অর্চ্চিঃ বর্ত্ম—সুর বা দিব্য অনুভূতির লোকসমূহের দিকেও উঠিয়াছে। বুদ্ধি 'তমসা'র দিকেও খুলিতে পারে (যেমন সমুদ্রের গভীরে যে সব প্রাণী থাকে, তাদের অন্ন-অরি ইত্যাদি বোধ); আবার 'বর্চ্চসা'র দিকেও। যাই হোক, বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধির বস্তুকে (Thinkable) এই আমাদের কারবারী 'আটপৌরে' ভূমিতেই 'নজরবন্দী' করিয়া রাখার যুক্তি নেই। তবে, এখানেও তত্তদ্ভূমিকাবচ্ছিন্ন করিয়া বৃত্তিকে বলা কহা হয়। অধ্যাত্মসাধনায় বাক্ ও বুদ্ধির বিষয়তাকে ব্যাপিকাভাবেই লইতে হয়। সুতরাং, বৃত্তিলেখ অযথাখণ্ডিত (তললম্বাদি মানে—dimensionsএ) হইলে পাদহীন, তত্ত্ব এবং তথ্য সম্পর্কে অযথার্থ।

নিরূপিততা এবং নিরূপ্যতা (Definability as Predicable and Thinkable), এ সূত্রসম্মত বৃত্তির লক্ষণ ধরিলে, এটি মুখ্যতঃ দুই প্রকারের—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। ব্যবহারিকের মধ্যে আবার প্রাতিভাসিককেও ঠাঁই দিতে হয়—যেমন, আমাদের এই পৃথিবী এক স্থানে স্থিরই আছে; ঐ চন্দ্রমণ্ডল স্বতই উজ্জ্বল, ইত্যাদি। তত্ত্বতঃ দুই প্রকারের—কেবল ব্যতিরেকী; যথা, একান্ত অমেয়, অনিরুক্ত, অলক্ষণ পদার্থে রাগ্-বুদ্ধি নিরূপিকা রূপ বৃত্তি একান্তই নেই। অন্বয়-ব্যতিরেকী; যথা, ওঁ এই-শব্দে ত্রিমাত্রাদিরূপে নিরূপ্য বৃত্তি আছে বটে, কিন্তু অমাত্ররূপে নেই। কেবল, প্রণব নয়, সব কিছুর (একটা ধূলিরও) তাই; কিছুটা নিরূপণে আসে, কিছুটা নিরূপণে আসিতে

পারে বলে, কিন্তু সবটা বলে—আমি নিরূপণে আসিব না। ব্যবহারিক (প্রাতিভাসিক বাদেও) তিন প্রকারের—প্রথম, বাক্‌বুদ্ধির সাধারণ (pragmatic and normal) অধিকরণে। এইখানে বৃত্তি (predicables and thinkables) লইয়াই সাধারণ কারবার। দ্বিতীয়—ঊর্দ্ধগ্রামে—অর্চ্চিঃ বর্ত্মে। বাক্ ও বুদ্ধিকে এবং এ দুয়ের যোজক প্রাণকে—এবং তাদের সংহতিতে নিরূপ্যমাণ অনুভূতি সমূহকে, উত্তরোত্তর ঋদ্ধিমত্তর, জ্যোতিষ্মত্তর, রসবত্তর ভাবে মিলাইতে হয়। তৃতীয়—নিম্নগ্রামে—ধূমবর্ত্মে। বর্তমান বিজ্ঞানবিদ্যা আপন বিদ্যা বা টেক্‌নিক (বাক্—enunciation এবং বুদ্ধি—reasoning and verification, দুই দিয়াই) খুব উন্নত করিয়া যে বিরাট্ বৃত্তিলেখটি অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে, সেটি ঋজুগামী হয় নাই, সুতরাং, সে বিদ্যা ঊর্দ্ধগ্রামে শ্রেয়স্করী হইয়াও নিম্নগ্রামে 'ভয়ঙ্করী' হইতেছে।

৩। বস্তুসম্বন্ধবিষয়তাঘটকত্বমপি বা।।

বস্তুকে সম্বন্ধ বিষয়ে (relatedness-এ) আনে (ঘটক) যেটি, সেটিও বৃত্তি।।

লক্ষণগুলি যে পরস্পরকে ব্যাবৃত্ত (exclude) করে না, দুইটা পরস্পরের বাহিরে বৃত্তের মত, এইটি সূচিত করার জন্য 'অপি' শব্দ। 'বা' বলিলে সংশয় থাকে—এগুলো কি অন্যোন্য-ব্যাবর্ত্তক (mutually exclusive)?

ব্রহ্ম থেকে একটা তৃণ পর্যন্ত সবই কোন না কোন সম্বন্ধে আসিতেছে দেখিতেছি। যেমন, ব্রহ্ম আদি কারণ, মূল নিমিত্ত; ইত্যাদি। তৃণটি অমুক জাতীয়, অমুক 'গোত্র' ইত্যাদি। এই ফুলযোনি, আর ঐ ফুলরেণু; দুয়ে মিলাতে ঘটকালি করে মধুকর, ইত্যাদি। শিষ্য, গুরু, দীক্ষা ইত্যাদি। সম্বন্ধ বহুধা প্রপঞ্চিত, কয়েক শ্রেণীতে ফেলারও চেষ্টা হইয়াছে তাদের। সম্বন্ধে আসিলে সম্বন্ধীয় প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানবিষয়ত্ব হইয়া পড়ে। যেমন, কারণ। কার কারণ? কার্য আছে তাই না কারণ! কার্যটা কি তা না জানিলেও, 'কারণ' এই পদার্থ জানিতে গেলে 'কার্য্য' পদার্থটিও জানিতে হয়। কাজেই, প্রতিযোগি যে কার্য, তার জ্ঞানের অপেক্ষা রাখিয়া কারণের জ্ঞান। 'দীক্ষা' 'মন্ত্র', 'শুদ্ধি', 'প্রত্যয়'—প্রভৃতিও এই রকমের। সম্বন্ধজন্য প্রতিযোগিতা কোথাও বা আড়ালে থাকে। সাদৃশ্য, অভাব—এদের বেলা প্রতিযোগিজ্ঞানাধীন জ্ঞানটা বিস্পষ্ট। রামের বই, কি প্রদীপের তেল, এসব ক্ষেত্রে

একের জ্ঞানকে অপরের জ্ঞানের সঙ্গে যেমন শক্ত করিয়া যুড়িয়া দিল না মনে হয়, কিন্তু বইটা তার মালিক সম্পর্কে, তেলটা তার আধার সম্পর্কে জানিতে, অপেক্ষা আছেই। যাই হোক, বস্তুকে কোন সম্বন্ধে আনিয়া সেটির জ্ঞানকে (যেমন, ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব) তৎসম্বন্ধে প্রতিযোগী যেটি (যেমন, জগৎ), তার জ্ঞানের সাপেক্ষ করায় যেটি, সেটি বৃত্তি।

এই লক্ষণে যে বৃত্তি, তাতে বস্তু হয় প্রমেয়। আগের লক্ষণে কি তা ছিল না? ছিল, কিন্তু সম্বন্ধ বিষয় ভাবটি (relatedness), এখানে সবিশেষ ব্যক্ত। 'অয়ং' বা এই বলিতে সামান্যতঃ নিরূপণটি হইল, কিন্তু 'অয়ং' এবং 'অসৌ' এ দুয়ের বলাতে সম্বন্ধরূপটি পরিস্ফুট (explicit) হইয়া উঠিল। ওঁ একটি বাক্—এ বলায় সামান্যতঃ নিরূপণ; কিন্তু এটি 'বাচক' বলায় সম্বন্ধখ্যাতি। সুতরাং, এ সম্বন্ধের প্রতিযোগী যে বাচ্য—ব্রহ্ম—তাঁর জ্ঞানের অপেক্ষা প্রণবের জ্ঞানে। 'প্রমেয়' বলিতে এই অপেক্ষাটি স্পষ্ট হয়। প্রমাতা এবং প্রমাণের অপেক্ষা হয়। এ প্রমেয়ের প্রমাতা কে, প্রমাণ কি? প্রমা ই বা বলে কাকে? এসব সম্বন্ধে কিছু কিছু সূত্রও পরে আছে। তবে এখানে বলা হইল যে—যেটি বস্তুকে সম্বন্ধে আনিয়া প্রমেয় রূপতা (সঙ্গে অবশ্য প্রমাতা এবং প্রমাণ) দেয়, সেটি বৃত্তি। এই তিনের সাধারণ অসাধারণ দৃষ্টান্ত তো সর্বত্র। বেদান্তাদিতে বৃত্তির যে লক্ষণ করা হয়, সেটি মুখ্যতঃ ঐ তিনকে লইয়া। প্রমাণাত্রবচ্ছিন্ন চৈতন্য, প্রমেয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ইত্যাদি। বৃত্তি প্রসঙ্গেই অবচ্ছেদ, আভাস, প্রতিবিম্ব— এসব বিকল্পনা। শুদ্ধ অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, তাতে বৃত্তির প্রসজ্যতাই যদি না থাকে তো, বৃত্তি কাকে লইয়া, কার সম্পর্কে, এবং অধিষ্ঠান চৈতন্য না থাকিলে বৃত্তির ভাস হয়ই বা কিরূপে—এসব আলোচনায় বেদান্ত-বিচারিণী ধী আপন বৃত্তি বা গতিটি সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠায় আনিতে চাহিয়াছে। যোগ এবং রসভূমিতেও বৃত্তি মূল সিদ্ধান্তের মূল স্পর্শ করিয়াই মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে। জপ মুখ্যতঃ সাধন। এই সাধন বিজ্ঞানেরও এক দৃঢ়ভূমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সুস্থির হবার অপেক্ষা আছে। কিন্তু বিচারাদি সব কিছুই স্বীয় অনুবন্ধানুরোধে। যেমন, জড়বিজ্ঞান এবং গণিতেরও অপেক্ষা করিতে হয় আবশ্যকমত, তাই বলিয়া বিজ্ঞান বা গণিতের মত Differential Equations ইত্যাদি পাতিয়া তাদের সমাধানের চেষ্টায় লাগিয়া যাইতে হইবে না। মননবিচারাদির অনেক সূক্ষ্মভূমি সম্বন্ধেও এই কথা।

এ স্থলে মূল অনুবন্ধটি এই—জপ করিতে করিতে নাদের মত একটা কিছু শুনিলাম। ঐ ধ্বনি শ্রবণটি এ স্থলে বৃত্তি। এটিকে প্রমেয় বলিলে আমি তার প্রমাতা, আর আমার জপ তার প্রমাণ। কিন্তু প্রশ্ন—ঐ প্রমেয় বৃত্তিটি কি যথার্থ? এ প্রশ্ন করিলে, 'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞানের একটা লক্ষণ এবং আদর্শ (standard) আবশ্যক হইবে। 'প্রমা' বস্তুটি লক্ষণ ও আদর্শ অনুরূপ হইলে, তখন দেখিতে হইবে— 'আমি' প্রমাতা কি ঠিক সেইটি ধরিতে যোগ্য, আর আমার বর্তমান জপরূপ প্রমাণই কি সেটি ঠিক প্রমানুরূপ ভাবে পাইতে পারগ? যদি উত্তর হয়— 'না', তবে উপায়ের কথা, শুদ্ধির কথা (প্রমাতা এবং প্রমাণ উভয়েরি) উঠিবে। শাস্ত্র, গুরু, সন্তমহাজনবর্গ শুদ্ধ অবাধিত যে প্রমা, তার আদর্শ সাধকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আমার প্রণবাদি ব্যাহরণ কি ঠিক হইতেছে, তার চক্র কি ঠিক চলিতেছে, অনুধ্যান ভাবাদি ঠিক ঠিক হইতেছে?—এ সবই তো বৃত্তির প্রশ্ন এবং বৃত্তিশুদ্ধির প্রশ্ন। বিজ্ঞানাদি সর্ববিধ ব্যবহারেই প্রমাতা এবং প্রমাণ এ দুয়ের ক্রমিক শোধন দ্বারা প্রমেয়শুদ্ধি সাধন করিয়া যাইতে হইতেছে।

যয়ৈব বস্তু যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধিত্বেন গৃহ্যতে।
অত্রামুত্র কথঞ্চৈব কদাতদাদিরূপতঃ।
সা বৃত্তিস্তত্ত্বমস্যাদৌ যাঽসিপদেন লক্ষিতা॥ ৮৪

যাহার দ্বারা বস্তু সম্বন্ধী বা সম্বন্ধবিশিষ্টভাবে গৃহীত হয়— 'এখানে', 'সেখানে', 'কি নিমিত্ত', 'এখন', 'তখন', এভাবে (প্রধানতঃ) দেশ, কাল এবং নিমিত্ত সম্বন্ধে গৃহীত হয়, সেটি বৃত্তি। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যে 'অসি', 'অস্মি' ইত্যাদি পদে সেটি লক্ষিত হইয়াছে।

৪। ভানবিষয়তানিরূপকত্বমপি চ॥

(পূর্বে সবিশেষ আলোচিত) যে 'ভান', তার 'বিষয়' এবং 'বিষয়ী' (Object and Subject) ভাবটি, এবং এটি ভানের বিষয়, ঐটি নিরূপণ করে যাহা, তাকেও বৃত্তি বল। (এখানে সূত্রশেষে, 'অপিচ'। পূর্ব সূত্রের ব্যাপ্তি ঠিক রাখিয়া সেটি

ভানবিষয়তার দিক্ থেকে দেখান হইতেছে।)—Whatever defines the alogical, undefined whole of experience.

সমস্ত কিছু প্রত্যয় এবং প্রতীতির মূল এবং আধাররূপে যেটি আছে, সেটিকে সমগ্রভাবে 'ভান' বলা হইয়াছে। এটি নিজে সমগ্রভাবে এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে কোন সম্বন্ধনিরূপণে আসে না। কিন্তু তাতেই 'বিষয়-বিষয়ী' ইত্যাদি সম্বন্ধ ফুটিতেছে; অংশ-অংশী, ইত্যাদি। এ হইল ভানের স্ববিমর্শ (self-review, self-treatment)। এই মূলবিমর্শ অনুমর্শাদি পঞ্চ আকৃতিতে ভাসাদি ভাসপঞ্চক ভানের আধারেই ফুটাইয়া তোলে। এসব সবিস্তার করা হইয়াছে। ভানে মূলবিমর্শ বশতঃ এবম্বিধ বিষয়-বিষয়ী ইত্যাদি রূপ ফুটিয়া ওঠাকেও বৃত্তি বলা হইল। Alogical Fact এবং Reviewing Fact বা Logical হবার ঘটককে যদি বল বিমর্শ, তবে ঘটক-ঘটিত-ঘটনা হইল বৃত্তি।

যৎ সামগ্রীতয়া ভানং সহতে ন নিরূপকম্।
তত্রেদন্তাদিরূপেণ নিরূপ্যমাণতা যয়া।
নির্ব্বাচ্যত্বমনির্ব্বাচ্যে দীয়তে বৃত্তিতা হি সা॥ ৮৫

অখণ্ড সামগ্রীভাবে ভান 'অদিতি', সেভাবে ভান কোন নিরূপকই ('এইরূপ' বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয় যেটি) সহ্য করে না। অথচ, সে ভানে 'অহং' 'ইদং' (বিষয়ী-বিষয়) ইত্যাদি আকারে নিরূপ্যমাণতা (definability, determinateness) ফুটিয়া ওঠে; আর, যেটি তত্ত্বতঃ অনির্বাচ্য (alogical), সেটি নির্বাচ্য (logical-predicable, thinkable, related) হয়ও দেখি। এ ঘটনা (ঘটক-ঘটিত সহকারে) বৃত্তি।

জপে প্রাণসামগ্রীকে একদিকে বাক্, অন্যদিকে ভাবপ্রত্যয় ও বোধপ্রত্যয়রূপে 'নিরূপ্যমাণ' করিয়া চলিতে হয়। ইহাই জপাকারা বৃত্তি। এ নিরূপণে প্রাণ সমগ্রতঃ নিরূপণে আসেন না। জপারম্ভে অথবা জপপূর্বে প্রাণের যে অনিরূপিত ভাব, সেটি জপপ্রমাতার কাছে 'তমসা' (vieled and covered indeterminateness); জপপ্রমাণ দ্বারা আবৃত প্রাণ-প্রমেয়টি ক্রমশঃ ছন্দ, আকৃতিতে, ভাবে, বোধে অপাবৃত হইতে থাকে। কিন্তু asymptote যেমন hyperbola কে নিকট হইতে

নিকটতর হইয়াও একেবারে, স্পর্শ করে না, তেমনিধারা প্রাণসম্পর্কে, প্রমাতা-প্রমাণ এবং প্রমেয়ের 'রেস্' চলিতে থাকে। প্রাণ নিজেকে ক্রমে উজ্জ্বলতর, মধুমত্তর, সমৃদ্ধতর করিয়া ফুটাইয়া যান। এর শেষ কোথায়? অনন্তে। অথবা, শূন্যে। এদের কথা পরে আসিতেছে। তবে, এই চলার পথে, প্রমাতাকে গুরু-সন্ত-শাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া যাইতেই হয়—বৃত্তিটি আভাস (illusion), অপভাস (delusion) —এসবের দিকে যাইতেছে না তো? ভান নব নব ভাসরূপেই ভাসিতেছে, কিন্তু ভাণরূপে পড়িতেছে না তো? আর, অন্তে (in the last limit) —সব ভাসই সেই পরম প্রকাশ, পরমস্বরস অথচ পরম অনির্বাচ্য যে ভান, তাতেই পর্যবসানের দিকেই চলিয়াছে তো! পরমের এ অনিরূপ্যতা 'জ্যোতিষা' এবং 'রসৌজসা' বা 'রসমহসা'।

৫। অভাবপ্রত্যয়াভাবপ্রতিযোগিত্বমিতি চ॥

'কিছুই নাই' এভাবে যে অভাবের প্রত্যয় হয়, সে প্রত্যয়ের আবার যেটি অভাব (অর্থাৎ, ঐ 'কিছুই নাই' ভাবে প্রত্যয় না-হওয়া), সেই অভাবের (কিনা, অভাবের অভাবের), যেটি প্রতিযোগী, কিনা, বিষয়, সেটি বৃত্তি—Whatever negates pure negation. 'ইতিচ' বলিয়া বৃত্তিপঞ্চকের উপসংহার করা হইল। বৃত্তির পাঁচটি লক্ষণ এইখানে শেষ হইল।

বৃত্তিতে যে 'ঋচ্ছতি' বা গতিরূপতাটি নিহিত, সেটি পূর্বের চারিটি লক্ষণে এক এক আকৃতিতে ফুটিয়াছে। প্রথমটিতে 'মোদতে' বা আনন্দজাগৃতি ইত্যাদি রূপে ঋচ্ছতি; 'বহুস্যাম্'—সদসৎ রূপে অস্তিতায় ঋচ্ছতি; অস্মি-অসি-ব্যক্তা-ব্যক্তরূপে ভাতিতায় ঋচ্ছতি। দ্বিতীয়ে, বাক্ ও বুদ্ধির বিষয়রূপ হইয়া ঋচ্ছতি। তৃতীয়ে, বস্তুসম্বন্ধঘটকঘটনারূপে ঋচ্ছতি। চতুর্থে, ভানের নিরূপকরূপে ঋচ্ছতি। আর এই পঞ্চমে, ঋচ্ছতি বলিলেই যে ভাবাভাব (Becoming = Being + non-Being) সূচিত হয়, সে ভাবাভাব, অভাবেই শেষ কি ভাবেই, এটির নির্দেশ। প্রকারান্তরে—প্রথম লক্ষণটি তত্ত্বকে উদ্দেশ করতঃ, দ্বিতীয়টি, বিশেষতঃ প্রমাণকে; তৃতীয়টি, প্রমেয়কে; চতুর্থটি, প্রমাতাকে; এবং শেষেরটি বিশেষত শূন্যকে। এ শূন্য পদার্থটি পরে লক্ষিত হইতেছে। ইহা ঐকান্তিক অভাবমাত্র নয়। অভাব, ব্যবহারে, অন্তর বা ব্যবধান।

ভূতলে ঘট নাই, কিন্তু অন্যত্র আছে; খপুষ্প আকাশে নাই, কিন্তু কল্পনায় বা উপমায় আছে; কাঁটালের আমসত্ত্ব, কল্পনাতেও নেই, কিন্তু কথায় আছে। ব্যবহারে যাকে বলা হয় 'ভাব' বা 'থাকা', সে ভাবের সঙ্গে এদের অন্তর বা বিয়োগরূপতা আছে। এ নিমিত্ত, ব্যবহারে অভাব মানে (ন্যায়ের আত্যন্তিকাদি চারিপ্রকারের অভাব স্থলেই) কোন নির্দিষ্ট বা নিরূপিত ভাবের অভাব—ভাবাভাব। ভাবের এই অন্তর বা বিয়োগরূপ যে অভাব, সেটিকে যদি শূন্য করা যায়, তবে ভাবই হইল।

পুনশ্চ, ব্যবহারে, সকল পদার্থ ভাবাভাব মিশ্রিত। 'ক'এ কেবল যে 'খ', 'গ' ইত্যাদির অভাব, এমন নয়; 'ক'ই আপন মাত্রা-পাদ-কলায় কতক আছে, বাকিটা নেই। এখন, যে বাকিটা নেই, সেটা হইল যতটা আছে, তার সঙ্গে 'অন্তর'। এই অন্তরটিকে শূন্যে আন। 'ক' মাত্রাপাদাদিতে কাষ্ঠায় আসিল। জপাদি সকল সাধনের উদ্দেশ্যই হইল, এইরূপ অন্তর বা অভাবকে শূন্য করিয়া ভাবে পূরা করিয়া লওয়া। Gap, hiatus reduce করিতে করিতে nil করিয়া আনা। তা হইলে শুদ্ধ, একান্ত অভাব নেই, সব অভাবকে ক্রমে শূন্যে আনিয়া পূরাভাব করা যায় যার দ্বারা, সেটি বৃত্তি। বৃত্তি পূরণী এবং হরণী। 'ক' এতে 'খ' মিশ্রিত আছে। অর্থাৎ, সবটা 'ক'ই নয়, খানিকটা 'ক' এর অভাব আছে। 'খ'কে হরণ করিলেই, এ অভাবের অভাব ঘটিল, অর্থাৎ, 'ক' শুদ্ধ হইল, খাঁটি হইল। সাধনে দৃষ্টান্ত তো পদে পদে। 'ক'কে শূন্যের স্থলে রাখ। শূন্যের দুদিকে দুই রেখা টান—একটা হরণ, একটা পূরণ। এখন, 'ক'কে পূরা করিতে পূরণ রেখায় (on the positive side) যা কিছু অন্তরে রহিয়াছে, তাদের সে অন্তর শূন্যে আনিয়া 'ক'তে মিলাও। জপে ছন্দঃ নেই? নাদ নেই? রস নেই?—অন্তর শূন্য করার যত্ন কর। যেটি দূরে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ, তাকে অন্তিকে অব্যভিচারে আন। নাদ এক আধবার শুনিলেই হইল না, ইত্যাদি। আবার, 'ক'এ শুদ্ধি আনার জন্য, 'ক' এ 'খ' ইত্যাদি যা কিছু গলদ-গলতি আছে, তাদের হরণ করিয়া যাও শূন্যের অপর দিকে। এতে 'খ' ইত্যাদি যত অন্তরে সরিতে লাগিল, ততই 'ক'এর আপন স্বভাব বা শুদ্ধির অভাব শূন্যের দিকে আসিতে থাকিল। এখন, 'ক'কে যদি বল 'তত্ত্ব', তা হইলে হরণ-পূরণ, হান-উপাদান দুটি রেখাকেই অসীম করিতে হয়; অসীম হইতে কিছু পূরণের দিকে আসিতেছে, কিন্তু তত্ত্বকে স্পর্শ করিতেছে না; আবার, কিছু নেবার (হান), সেটিও হরণের দিকে অসীমে রহিয়াছে,

তত্ত্বে (ঐ শূন্যস্থলে) আসিয়া তাকে আপন বৃত্তিব্যাপ্য করে না। দুইদিকে + ∝ আর – ∝ একযোগে মধ্যে শূন্যটিকে তত্ত্বেই রাখিতেছে। এসবের প্রসঙ্গ পরে আরও আসিতেছে।

আত্যন্তিকতয়া যোঽপি চাভাবপ্রত্যয়ো ভবেৎ।
শূন্যমিতি হি যৎকিঞ্চি-ত্বেন সোঽপি নিষিধ্যতে।
শূন্যমপেত্যবৃত্তিত্বং ধনমৃণমিতি দ্বয়ম্॥ ৮৬

ঘটে জল আদৌ নাই, ঘটটি একেবারে শূন্য, এইভাবে অত্যন্তরূপে যে অভাব-প্রত্যয় হয়, সেটি 'যৎকিঞ্চিৎ' রূপে নিরূপিত যে ভাব (যেমন জল, বায়ু বা আকাশ নয়), সেই সম্পর্কে। অর্থাৎ, ঘটটি একেবারে শূন্য বলিলে, ঐ যৎকিঞ্চিত্বের নিষেধ (negation) হইল। শূন্য ঐকান্তিক অভাব নয়। শূন্য (যেমন, পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে) হইল সেই ধ্রুবস্থল (যথা, গণিতে Origin), যার অপেক্ষায় 'ধন' (পূরণী), এবং 'ঋণ' (হরণী), এই দ্বিবিধা বৃত্তি দুই মুখে 'অপেত'—অপেক্ষাসহকারে 'ইত' বা চলিত হইয়াছে। এখানেও ঋচ্ছতি, কিন্তু শূন্যে আসিয়া সেটির সমাপন হইতেছে। সমাপন মানে ধ্রুব হইতেছে। এভাবে শূন্য কিন্তু তত্ত্ব, স্বভাব-প্রকৃতি।

বৃত্তির মধ্যে যে 'ঋচ্ছতি' কলা (aspect or partial), সেটির এক অবসান ভূমিও আছে, তাহা এই সূত্রে নির্দেশ করা হইল। নানাদিকে ঋচ্ছতিরূপবৃত্তি হইতেছে, যদি তাদের সমাস (algebraic sum), শূন্য হয়, তবে বস্তুটি স্থিরভাবেই আছে। 'সচল' আর 'অচল' গতিবিজ্ঞানের মূলে এই ঋচ্ছতিকলার মাত্রা, পাদ এবং কাষ্ঠায় অনুধাবন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানেও অন্যথা নয়। জপ, ধ্যান, পূজা, কীর্তনাদি যা কিছু সাধন করা হোক, তাদের ঐ ঋচ্ছতিকলাটিকে সুষ্ঠুভাবে মাত্রায়, পাদে, কাষ্ঠায় চালাইতে হইবে। জপে মুখ্যতঃ শুদ্ধ আকৃতি (ব্যাহরণাদিতে), শুদ্ধ ছন্দঃ, শুদ্ধভাব এবং শুদ্ধ ভাতি—এই চারিটি আশ্রয়ণীয় বস্তু। জপবৃত্তির ঐ ঋচ্ছতিকলা কিভাবে কতটা এতে অগ্রসর হইতেছে, অগ্রগা এবং ক্রমে অগ্র্যা হইতেছে, এইটিই লক্ষ্য রাখার বিষয়। ঋচ্ছতি ঋজু বা অনৃজু হয়। অনৃজু আবার সুষম অথবা বিষম (জিহ্মাদি) হইতে পারে। প্রত্যক্ষাদি স্থলেও যে এসবের প্রসজ্যতা আছে, তা দেখা যাইবে। বাহ্য

প্রত্যক্ষস্থলে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, এ দুয়ের সমানাধিকরণতা সংঘটনে ঋজু-সুষম 'ঋচ্ছতি'টি থাকা চাই। ইত্যাদি। যেটি প্রমাতা আর যেটি প্রমেয়, এ দুয়ের মধ্যে 'অন্তরিক্ষ' বা ব্যবধান 'নানা স্তরে' এবং নানা ভঙ্গীতে বর্তমান। কাজেই, ওটা হইতে এটা, অথবা এটা হইতে ওটা—ঋচ্ছতিবর্ত্মটি 'সম' (homogeneous) নয়। এটিকে যে পরিমাণে সমতার অভিমুখে আনা যাইবে (যথা, প্রমাতা রাগদ্বেষাদি পক্ষপাতমুক্ত হইয়া), ততই ঋচ্ছতিটি ঋজু ও সুষম হবার অভিমুখে যাইবে। এখানে আর দৃষ্টান্ত নয়।

শূন্যের ধ্যান, শূন্যের সাধন (কেবল বৌদ্ধচর্যায় নয়), যোগতন্ত্রাদিতে সবিশেষ উপদিষ্ট। ধ্যানে যে একতানতা (ঋজু-সুষম ঋচ্ছতি), সেটি কোন ভূমিতে যাইয়া আপন অবসান প্রাপ্ত হয়, এটি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করার বস্তু। কিন্তু শূন্য পদার্থ টি কি?

৬। সর্ব্বসাপেক্ষকাষ্ঠারম্ভকত্বং শূন্যত্বম্॥

সকল সাপেক্ষ (যেটি আরম্ভ, সীমা বা কাষ্ঠা, এবং এ দুয়ের ব্যবধান—এ তিনের অপেক্ষা রাখে), আপন কাষ্ঠায় যাইতে যে (অপেক্ষারহিত) আরম্ভকে আশ্রয় করে, সেটি শূন্য।—The unspecified (i.e. neither *plus* function nor *minus*) starting Point or Origin of any specification (such as a series) moving (positively or negatively) to a Limit.

স্পন্দং দ্বন্দ্বং তথা স্যন্দ মাশ্রিত্য যদপেক্ষতে।
তদ্‌বৃত্তিবৃত্তসঙ্কোচে যত্রর্ণং যাতি লীনতাম্।
যত আরভতে সর্ব্বং ধনং তচ্ছূন্যমুচ্যতে॥ ৮৭

স্পন্দ = আদি যে ঋচ্ছতি ভাব (Basic Stress), দ্বন্দ্ব = আদি পারস্পরিকত্ব (Basic Reciprocity); স্যন্দ = আদি সচলভাব (Basic Mobility or Currency)। মূল স্পন্দ ঠিক স্যন্দ নয়, কিন্তু স্যন্দ হবার ঠিক আগে তার কারণরূপ যে অব্যক্ত আবেগ (*elan*), সেটি। বীজে যেমন উচ্ছূনতা, ইত্যাদি। এখন, এই তিনকে আশ্রয় করতঃ যে সাপেক্ষতা (relatedness or conditionality), তার

(অর্থাৎ, সেই সাপেক্ষ পদার্থের) কাষ্ঠাভিমুখে বৃত্তি হইতেছে (তদ্‌বৃত্তি)। ধর, এই বৃত্তিটি একটা বৃত্ত আঁকিয়া নির্দেশ করিলাম। অর্থাৎ, ঐ বৃত্তির (যেমন, ধর বৈখরী জপে মানস পর্যন্ত) ব্যাপ্তি (sphere or field) এখন এই অবধি, ঠিক করিলাম। এই বৃত্তের ব্যাপ্তিকে যদি সঙ্কোচের দিকে নিই, তবে সেটা বৃত্তির ঋণমুখতা (negative phase), প্রসার বা অগ্রগতির দিকে লইলে ‘ধন’। এখন, সঙ্কোচ বা ঋণমুখে বৃত্তটি আসিতে আসিতে যেখানে আসিয়া বলে—এই শেষ, আর আমি নেই (যাতি লীনতাম্); আর ‘ধন’ ও যেখানেই বলে আমার আরম্ভ, সেই (ধন ও ঋণ, আর তাদের বৃত্তির অপেক্ষারহিত) ‘স্থল’ হইল শূন্য। বিয়োগ বা হরণ বলে—আমার কাষ্ঠাভিমুখে বৃত্তি হইতে গেলে এই স্থলেই আরম্ভ; যোগ বা পূরণও তাই বলে। শূন্যতাই সর্বসাপেক্ষের আরম্ভক। এটা যোগ না বিয়োগ, ধন না ঋণ?—এটা জানিতে ঐ আরম্ভককেই ধরিতে হয়। ঐটি ধরিয়াই (as fixed Origin or Point of Reference), সব কিছু মেয়ের (ধনে-ঋণে, হরণে-পূরণে) মান। শূন্যে কেবল আরম্ভকতা নয়, অবসান ভূমিও আছে, সেটি বলিবার নিমিত্ত ঐ বৃত্তসঙ্কোচের দৃষ্টান্ত। বাস্তবপক্ষে, একভাবে যেটি আরম্ভ, অন্যভাবে সেটি অবসান। অসীমও প্লাস্-মাইনাসে মিলিয়া শূন্যে অবসান পায়। স্পন্দ কোথায় আরম্ভ হইবে—ঋচ্ছতিভাব যেখানে শূন্য, সেখানে। দ্বন্দ্ব আরম্ভ হবে, যেখানে reciprocal or polar দ্বয়ের ব্যবধানটি শূন্য, সেখানে। স্যন্দ— flow or currencyর যে বিশ্রাম বা বিরাম ভূমি, সেই শূন্য থেকে। যেমন, সুষুপ্তি। এখানে স্যন্দ এবং দ্বন্দ্ব দুই-ই নিরপেক্ষ আরম্ভক শূন্যে আসিয়াছে, কিন্তু স্পন্দ আসে নাই। স্পন্দও শূন্যে আসিলে তুরীয়। নিখিল সৃষ্টির আরম্ভক এইভাবে শূন্য, কিন্তু সে শূন্য Void নয়, ঐকান্তিক অভাব পদার্থ নয়, নৈরাত্ম্য নয়। গণিতাদিব্যবহার (উচ্চাঙ্গেও) শূন্যকে আশ্রয় করিয়াই। সমাপ্তি বা অবসানটি যেন ‘গোচরে’ আসিতে চায় না, কিন্তু আরম্ভটি যেন গোচরে আসিল, এই বোধেই সর্বব্যবহার। শূন্য স্বাভাবিক আরম্ভক, তাই তারচক্র জপে, এবং অন্যবিধ জপে, ‘মেরু’ লঙ্ঘন করিতে নেই। যথা, গায়ত্রী জপকে যথাসম্ভব বিন্দুলীন করিয়া, অর্থাৎ শূন্যের সান্নিধ্যে আনিয়া, আবার সেখান থেকে নাদে উদয়, এইভাবে জপ করিতে হয়। জপারম্ভেও যথাসম্ভব শান্তবিরামের ভূমি থেকেই হওয়া উচিত। সঙ্গীতালাপে এটি

আরও সুস্পষ্ট। তালাদিতে শূন্য অঙ্কটি অন্যত্র থাকিলেও, 'সমে'ই যথার্থ মেরু, এবং সেইখানে বিরাম দিতে হয়, যদিও আরম্ভটি সচরাচর ফাঁকে বা শূন্য অঙ্কস্থলে হয়। এখানে আর দৃষ্টান্ত নয়। শূন্য-অধিকারে কতিপয় সূত্র আছে। কিন্তু তাদের আগে 'পূর্ণ' সূত্র। শূন্যে আরম্ভক ভাবটি যেন 'গোচর', আর অবসান ভাবটি যেন অগোচর। 'যেন' এই জন্য যে, দৃষ্টিটা কোথায়—ঋচ্ছতির, 'ঋ'তে, না 'তি'তে—এর উপরে ঐ গোচর-অগোচর ভাবটা নির্ভর করে। যদি 'ঋ' এই গত্যাত্মক ধাতুটিই হয়, তবে শূন্য আরম্ভক (starting point), আর কালবাচক 'তি' যদি দৃষ্টিতে থাকে, তবে বিরাম বা অবসানরূপে শূন্য। চলিতেছে তো, কিন্তু কতদূর অবধি, কখন শেষ, কোথায় শেষ?

এটা ঠিকই যে ঘট শূন্য করিয়াই ঘট ভরিতে হয়—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা যে কাম সে কামের গন্ধটুকু থাকিতে শুদ্ধপ্রেম তাতে হইবে না, ইত্যাদি। ঘটটি ভরে কিসে, কি ভাবে? আরম্ভ ও অবসান, ঐ 'ঋ' ও 'তি'। কিন্তু সমাপন?

৭। সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োঃ সমত্বং পূর্ণত্বম্॥

সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ দুই-ই সমতায় আসার যে ভূমি, সেটি পূর্ণত্ব।—The Limit where the related and the unrelated meet and unify.

অন্তরিতত্বেন সর্ব্বস্য সাপেক্ষতানপেক্ষতে।
অপূর্ণত্বাদিবৈষম্যমাদধাতে বিশেষতঃ।
তস্য বিলোপকাষ্ঠায়াং সমতা পূর্ণতা মতা॥ ৮৮

'ক' পদার্থ 'খ'-এর অপেক্ষা রাখে, তার সাপেক্ষ; 'গ' এর অপেক্ষা রাখে না, তার সম্পর্কে অনপেক্ষ। ব্যবহারে এইরূপ ভেদ সচরাচর করা হয়। এ ভেদ করা সম্ভবপর হয়, 'ক', 'খ', 'গ' ইত্যাদিকে সত্তাশক্তি ইত্যাদিতে যথাসম্ভব পরস্পর থেকে তফাতে রাখিয়া (অন্তরিতত্বেন)। প্রতিটি পদার্থ যেন এক একটা বর্তুল (spheroid); প্রত্যেকটি আছে এবং ক্রিয়া করিতেছে, আপন বর্তুলটিতে থাকিয়া (by limitation and Separation)। এটা ঘট, পট নয়; এটা বটের বীজ, অশ্বত্থের নয়;

ইত্যাদি। অবশ্য, বর্তুলে বর্তুলে অবচ্ছেদাদিও করে, যথা মিশ্রণে, রসায়নে, ইত্যাদি। অঙ্গা-অঙ্গী, অংশ-অংশী, কার্য-কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তারা আসিয়া থাকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, সাপেক্ষতা (relatedness) এবং অনপেক্ষতা (unrelatedness) -এ দুয়ের ব্যবধান ব্যবহারে থাকিয়া যায়। ব্যবহারে 'ক' এমন মনে করে না যে—বিশ্বের ভূত-ভব্য সবার সাথে তার সাপেক্ষতা, অথবা, অন্য ভাবে, সে শুদ্ধ 'কেবল', কারুর সাথেই তার অপেক্ষা সংবন্ধ নেই। Universal relatedness and pure unrelatedness, এ দুয়ের কোন স্থিতিতেই সে নিজেকে অবস্থিত দেখে না। উদারের যে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' সেটিও তাতে নেই, আবার উদাসীর যে 'মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' তাও নেই। 'প্রত্যগাত্মা' শব্দে দ্বিবিধ বৃত্তি, সে দুয়ের কোনটিই নেই। সুতরাং পরস্পর থেকে অন্তরিত যে ব্যবহারিক সাপেক্ষতা ও অনপেক্ষতা, তারা বিশেষরূপে অপূর্ণতার অশেষ বৈষম্য প্রপঞ্চিত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে (আদধাতে বিশেষতঃ)। কেবল অপূর্ণতা নয়, ওর আনুষঙ্গিক এবং আনুপাতিক অপরাপর বৈষম্যও। বেশী জ্ঞানী, কম জ্ঞানী, ইত্যাদি। বহির্জগতের যে সমালোচন (appreciation), তাতেও অপূর্ণাদি বৈষম্যের অন্ত নেই।

এখন সাপেক্ষতা অনপেক্ষতার মধ্যে ঐ যে অন্তরিত ভাব, ধর সেটিকে সঙ্কোচ করিয়া বিলোপের কাষ্ঠায় আনিলাম। ফলে, সাপেক্ষ-অনপেক্ষ দুই মিলিয়া সমতায় আসিল। এই সমতাই পূর্ণতা। ধর, আমার সাপেক্ষকে এক বৃত্ত আঁকিয়া তাতে পূরিয়া রাখিয়াছি। বৃত্তের বাহিরে অনপেক্ষ। বৃত্তের পরিধি বড় করিতেছি, অনপেক্ষ সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু আছে। কিন্তু বৃত্ত যদি অনন্ত, অর্থাৎ, পরিধিরূপ 'অন্তর' রহিতই হয়, তবে? সবই সাপেক্ষ (universal inter-relatedness-এ) আসিল, কিছুই আর বাদ থাকিল না। বেশ, অন্যদিকে, যদি আবার সাপেক্ষের বৃত্তটি ক্রমে ছোট করিয়া আনিয়া শূন্যে (আরম্ভক কেন্দ্র বিন্দুতে) আনি, তবে? তা হইলেও বৃত্তির পরিধিরূপ 'অন্তর' বিলুপ্ত হইল। ফলে, সবই অনপেক্ষ— 'আকাশো নোপলিপ্যতে।' দুই দিক্ দিয়া এই সমতাটি সাধিত হইলে হয় পূর্ণতা। একদিকে অনন্ত (∞), অন্যদিকে শূন্য, এই দুই কাষ্ঠায় 'অপেক্ষা'কে লইলে, তবে এতে স্থিতি। অপেক্ষার যেটি আনন্ত্য কোটি, সে ভূমিতে 'বোধে' এবং 'ভাবে' আসিলে, অপেক্ষার 'অপ'টি অপগত হইয়া যায়। তখন, 'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' 'বোধে' আত্মৈবেদং সর্ব্বম্' এই

পরমবোধের সমীক্ষা-পরীক্ষা-অন্বীক্ষা। 'সর্ব্বংব্রহ্মৌপনিষদম্।' আর, ভাবে—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" উত্তম ভাগবতের যেটি হয়। সুতরাং, cosmic interrelatedness as a fact এক বস্তু, তার appreciation and realization অন্য বস্তু। এইটির সঙ্গে পরম-অনপেক্ষভাবেরও ভানটি চাই। এ দুয়ের মিলানর সমতা আনার সাধনায় তুমি যদি একটি কীটের ক্লেশেও ক্লিষ্টবোধ কর, তবে সেটি কি জান?—'পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ।' অনপেক্ষ পরম প্রকাশ ও আনন্দের আধারে এই পরমমরমী পরমদরদী ভাবটি এক পরমাশ্চর্য সামগ্রী! ভগবত্তায় অপার অহেতুক 'করুণারূপে, এবং ভগবত্তার অনুগ্রহশক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুতে এই পরমাশ্চর্য সমন্বয় সমতাটি বর্তমান। এই পাদের প্রথম সূত্রে পূর্ণতা সামগ্রী বিস্তারিত করা হইয়াছে। এখানে এটা লক্ষ্য কর যে—সাপেক্ষ ভাবটি তার পরিসীমায় আসিয়া (ক) অনপেক্ষভাবের সঙ্গে ব্যবধান (hiatus) টি ঘুচাইল, সমতায় আসিল; (খ) সুতরাং, সেটা এক বিশ্ববেড়া জালে (cosmic destiny or determinationএ) জড়াইল না; (গ) যেহেতু, ঐ সমতাই 'যোগ', এবং নির্দোষ ও পরিনিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্ম, কাজেই, উহা নিত্যযুক্ত, নিত্যমুক্ত ভূমি (প্রকাশ ও আনন্দ); (ঘ) এই ভূমিতে 'অপেক্ষা' শূন্যে আসে না, পরন্তু ছন্দের মহাসমন্বয়ী ও পরম সমন্বয়ীতে অপেক্ষাকে তুলিয়া ধরে, কাজেই, cosmic inter-relatedness হয় এক Cosmic Symphony, Divine Orchestra—যাতে যেখানে যত করুণ কোমল পরদাগুলো বাজে, তত পরম সুরব্রহ্ম পরমমরমী পরমদরদী ভাবেই তাঁর পরম সংবেদনে যুড়িয়া, গাঁথিয়া লন। 'নাম না জানা ঐ তৃণকুসুম'টিও তাতে বাদ অবশ্যই পড়ে না! কাজেই, (ঙ) এটা হইল universal, unmeasured Resonance and Responsivenessএর ভূমি।

শূন্যে যেমন আরম্ভ এবং অবসান, পূর্ণে তেমনি সমতা ও সমাপন। এই সমাপনটি পরের সূত্রে বলা হইতেছে—

৮। তত্র সর্ব্বসাপেক্ষানপেক্ষকাষ্ঠাসমাপ্তিঃ ॥

পূর্ণে সকল সাপেক্ষ এবং অনপেক্ষ তাদের কাষ্ঠা সমাপন করে।

ব্যবহারে সাপেক্ষ এবং অনপেক্ষ দুটিই পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠায় থাকে।

সর্বতোভাবে কাষ্ঠায় কোনটাই নেই। সাপেক্ষের যেটি বৃত্ত, সেটি তার বিস্তারে ‘ক্রম’ (seriality) দেখাইতেছে, অনপেক্ষও তাই। দুয়ের মাঝে অন্তরিত ভাব (hiatus) আমরা পূর্বসূত্রে দেখিয়াছি। বর্তমান সূত্রে ঐ যে ক্রম বা ক্রান্তি, সেটির সমাপ্তির কথা বলা হইতেছে। এই সব সূত্র সার্বভূমিকে—বহির্বিজ্ঞান, গণিতাদিতেও প্রাসঙ্গিক। জল বরফ হইবে। তাপ হ্রাসের অপেক্ষা আছে। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে সে অপেক্ষাটি আপন কাষ্ঠায় আসিল। বরফ হইয়া তাপহ্রাস ব্যাপার সম্পর্কে সে অনপেক্ষও হইল। আরও কমায়, কিছু যায় আসে না, কিন্তু বাড়াইও না। যেখানে দুই ভূমিতে (field এ) ‘Energy Level’ এর তফাৎ, সে স্থলে ‘উচ্চ’ ভূমি থেকে ‘নিম্ন’ ভূমিতে স্যন্দ (flow) হইবে। যাবৎ সমতা না ঘটে। ইত্যাদি। জপের সংখ্যা পূর্ণ, অথবা পুরশ্চরণটি পূর্ণ হইল, বলি কখন? পূর্ণ হওয়া মানে (এ সব স্থলে), ক্রিয়া-কারক-ফলের কোন এক নিরূপিত ভূমিতে আসা। জপাদি যতক্ষণ পূর্ণ হয় নাই, ততক্ষণ সংখ্যাদির অপেক্ষা আছে, এবং ‘পূর্ণ’ বলিতে যাহা বুঝায়, তার সঙ্গে এক অন্তরিতভাব (hiatus) ও আছে। সংখাদি পূর্ণ হইলে এই ‘অন্তর’টি অন্তর্হিত হইল, সংখ্যাদি সাপেক্ষ ভাবটি তার কাষ্ঠায় আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কে অনপেক্ষও হইল। পূর্ণ হইয়াছে, আর সংখ্যাদি চালাইবার অপেক্ষা নেই। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা বিবিদিষা আসিল, তখন এষণাত্রয় ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস। তখন, পূর্ব সাপেক্ষ ভূমিতে কর্তব্য (বিধি-নিষেধ) কাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঐ বিবিদিষাসন্ন্যাসে অনপেক্ষায় আসিল—অতঃপর সে সবের অপেক্ষা নেই। বিদ্বদ্‌ভূমিতে, পারমহংস্যে দুয়ের কাষ্ঠাসমাপ্তি এবং সমতা। রসাশ্রিত সাধনেও মুখ্যতঃ ভাবকে লইয়া অপেক্ষা-অনপেক্ষার কোথায় সমতা ও সমাপ্তি সেটি অনুধাবন করিও। যেমন, ভাবটি রাগানুগ হইলে বিধি অপেক্ষাটি কাষ্ঠায় আসিল, এবং অনপেক্ষায় সমতা লাভ করিল। বৈখরী জপে নাদাদির অপেক্ষা রহিয়াছে। জপাদি সুষ্ঠুভাবে চলিলে, অপেক্ষার ‘অন্তর’টি কমিয়া আসিতে থাকে, তখন ‘মাঝে মাঝে একটু আধটু’। অপেক্ষার দুটো দিক্—এক, ঐ ব্যবধান; সেটা শূন্যে আসিলে অনপেক্ষা; আর অপেক্ষা নেই, নাদ মিলিয়াছে। দুই—জপ সৌষ্ঠবাদি ক্রিয়া ও ভাব রূপে; এটা এক কাষ্ঠায় আসিয়া নিজেকে সমাপ্ত না করা পর্যন্ত তো নাদ মিলে না! ক্রিয়া-ভাবকে এক critical efficiency level reach করিতে দিতেই

হইবে। ব্যবহার ক্ষেত্রে, ‘পূর্ণ’ হবার এই সব দৃষ্টান্ত। লক্ষণ মিলাইয়া যাও। এইবার, মূলের কথা কয়টি—

বিন্দৌ কেন্দ্রত্বমাপন্নে হ্যেকো বহুত্বমর্হতি।
ব্যাবৃত্তত্বঞ্চ কেন্দ্রাণাং পারস্পরিকসংগ্রহঃ॥
পারস্পরিকভেদোঽপি যোঽন্তরিক্ষব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বসাপেক্ষতাসীমা পূর্ণে হি পরিনিষ্ঠিতা॥ ৮৯-৯০

বিন্দু আগে বহুধা কথিত হইয়াছে, পরের সূত্রে লক্ষিত হইতেছে। এই বিন্দু ‘কেন্দ্র’ রূপে আসিলে ‘এক’ তখন ‘বহু’ হইয়া দেখা দেয়। বিন্দু = Absolute as ‘Perfect Point’, সুতরাং, one and indivisible—এক এবং অবিভাজ্য। কেন্দ্র = Centre of being and functioning, সুতরাং, many, বহু (পূর্বালোচিত বৃত্তিরূপতায় অভিব্যক্ত হইতে, এরূপ বহু কেন্দ্রের আবশ্যক হইয়া পড়ে)। তারপর, আবার কেন্দ্র থেকে বীজভাব এবং প্ররোহভাব (Potential and kinetic) ও আসে। আচ্ছা, কেন্দ্ররূপে বহু হইয়া সেগুলি ব্যষ্টি ও ব্যক্তি হইল; ব্যষ্টিরূপে পরস্পরকে আলাদা করিল (ব্যাবৃত্তি), আর ব্যক্তিরূপে পরস্পরকে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ করিল (সংগ্রহ)। ব্যষ্টি-ব্যক্তি কেন্দ্র (centres of segregation and individualization) গুলির যে পারস্পরিক ভেদ (differentiality), সেটি তাদের মধ্যে যে ‘অন্তরিক্ষ’, সেই অন্তরিক্ষদ্বারা ‘ব্যবস্থিত’ (conditioned and maintained as such) হইয়া আছে। এটিও পূর্বে দেখা হইয়াছে। বিন্দুকে আধার করতঃ এই যে ভুবনাকৃতি, এতে সাপেক্ষ-অনপেক্ষ (অর্থাৎ, অপেক্ষা) ব্যবহারিক ভাবে ‘ক্রমে’ আসিয়া ‘আপেক্ষিক’ হইয়াছে। মাত্রাপাদকলায় আসিয়াছে; বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতিকে বিচিত্ররূপে বিষয় করিয়াছে। কিন্তু আপেক্ষিকের দুটি পক্ষই (ব্যবহারিক সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ), পরম কাষ্ঠাকে (যেখানে, একদিকে শূন্যভাবে আরম্ভ ও অবসান, অন্যদিকে, পূর্ণভাবে সমতা ও সমাপন) চাহিতেছে। সেটি আদিতে বিন্দু, তাই। অধ্যাত্মভূমিতে এই পরম কাষ্ঠা প্রবণতাটি ফুটিয়া উঠে—আবেগ, আকুতি, আগ্রহ, আস্পৃহা, ইত্যাদি আকারে। একটা fulfilling and perfecting Endএর দিকেই নিখিল বিশ্বের অনির্বাণ অপেক্ষা!

তাই, পরে 'বিন্দু' সূত্র—

৯। সৰ্ব্বারম্ভসমাপ্তিকাষ্ঠাবচ্ছেদকত্বং বিন্দুত্বম্॥

সর্ব আরম্ভের কাষ্ঠার যে পরমতা, এবং সর্বসমাপ্তি কাষ্ঠারও যে পরমতা, এই দুই পরমতার অবচ্ছেদক ('এই এখানে'—অত্রৈব—বলিয়া নিরূপক) হইল বিন্দু। বিন্দু ঐ দুই পরমতার অবচ্ছেদক, কিন্তু স্বয়ং 'অবচ্ছিন্ন' নয়। অর্থাৎ, বিন্দু যেন দুটি পরমতাকেই বলে—তোমরা দুটি এখানেই একত্র হও, কিন্তু বলে না—এই তো আমি এতেই নিরূপিত হইয়া আছি। তবে তো, বিন্দুস্বরূপে কোন লক্ষণই যায় না। লক্ষণ তাটস্থ্যপরিসীমা (closest possible approximation) অবধি। বস্তুতঃ 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ'—ব্রহ্মবস্তুকে জানিয়াছি, কেহ বা বলিল, কিন্তু বিন্দু? তারাদি সকল বীজ এই বিন্দুকে শীর্ষে ধরিয়াছেন; ব্রহ্ম এই বীজরূপেই সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্টং, ইত্যাদি। কিন্তু ধারণায় ধ্যানে আনা কি সহজ? রেলেটিভিটি থিওরিতে 'Now-line' আর 'Here-line' যেমন ধারা cross করিয়া 'here-now' এই প্রতীতিটি ঘটায়, এখানেও যেন সেইরূপ। 'ক' এর আরম্ভ 'খ', 'খ'এর 'গ'—ইত্যাদিক্রমে আরম্ভকাষ্ঠা, এভাবে সমাপ্তিকাষ্ঠা। এ দুই কাষ্ঠা ব্যবহারে বিপরীতমুখিনী মনে হয়। কিন্তু, তাদের পরস্পর অবচ্ছেদের এক ভূমি আছে। যেমন, বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে পাদপের ফলে সমাপ্তি। এখানে, কিনা, ফলে আরম্ভরেখা এবং সমাপ্তিরেখা পরস্পরকে পাইল। ফলে আবার বীজ। কাজেই ফল বলে—আমি অঙ্কুরাদি ক্রমে ধারার সমাপ্তি বটে, আবার আরম্ভও বটে। তারচক্রাদি জপে বিন্দু থেকে আরম্ভ, আবার বিন্দুতেই সমাপ্তি। বৃত্তাদির কেন্দ্রবিন্দুতেই আরম্ভ, এবং তাতেই সমাপ্তি— 'অরা ইব নাভৌ সমর্পিতাঃ'। সৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত সর্বক্ষেত্রেই।

আরম্ভশ্চ সমাপ্তিশ্চ গচ্ছতঃ ক্রমিকতান্বয়ম্।
কাষ্ঠায়াং বিন্দুভাবেন সঙ্গচ্ছেতে পরস্পরম্।
সৰ্ব্বাদ্যন্তবিভেদস্য স বিন্দুরদ্বয়স্থিতিঃ॥ ৯১

আরম্ভ আর সমাপ্তি দুটিই ধারারূপে ক্রমান্বয়ে (one link or stage after another) চলিয়াছে। এ ক্রমান্বয় দুটি বিপরীতদিকে বা মুখে, এও দেখা যায়। যেমন,

গঙ্গানদীর আরম্ভ খুঁজিতে খুঁজিতে (ইহলোকে) গোমুখী, সমাপ্তির সন্ধানে গঙ্গাসাগর। জড়বিশ্ব আরম্ভ হইল সম্ভবতঃ Cosmic Nebula তে, সমাপ্ত কিসে হবে তার খোঁজ এখনও নেই। পৃথিবীর প্রাণিজগৎ এক ঘরওয়া দৃষ্টান্ত। অধ্যাত্মজগতেও আদি একটায়, অবসান অন্যকিছুতে। এ দুয়ের ক্রমান্বয়ের 'লেখ' আমরা অংশতঃ পাই, সমগ্রতঃ নয়। বিশ্বটা শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়া 'যথাপূর্ব্বম্' আসে কিনা, আমাদের 'লেখে' সেটি দেখায় না। কিন্তু কাষ্ঠা বা পরিসীমা মানিতে হয় তো? এই কাষ্ঠা বা পরিসীমায়, আরম্ভ এবং সমাপ্তি, এ দুয়েরি ক্রমান্বয় আসিয়া পরস্পরে 'সঙ্গত' হইতেছে (সঙ্গচ্ছেতে পরস্পরম্)। দেশ অসীম, কিন্তু 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' চরাচর সকলেরই সংস্থারূপে; কালও নিরবধি, কিন্তু বিশ্বঘটনাপুঞ্জসহ এক মহানেমিবৎ আবর্তন করিতেছে। চরাচর সম্পর্কে ঐ অখণ্ডমণ্ডল, আর 'চর'—সঞ্চর, প্রতিসঞ্চরাদিরূপেও—as cosmic cycle of events—অখণ্ডমণ্ডল। এ দুটি মণ্ডলই সঙ্কোচ-প্রসারধর্মী। ঠিক ধ্রুব-আকৃতিতে নেই। কিন্তু এই দুই মণ্ডলেরই 'ধ্রুব' এক ওকঃ বা স্থল আছে। সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ সমস্ত কিছুরই যেমন থাকে। সেইটিতেই—দেশে হোক, কালে হোক, নিমিত্তে হোক্—সমস্ত কিছু আরম্ভের মূল আরম্ভ, আর সব কিছু সমাপ্তিরও চরম সমাপ্তি। বিশ্বে আদি আর অন্ত বলিয়া যে বিভেদ, তার ঐ 'ধ্রুবৌকঃ' স্থলেই অদ্বয়স্থিতি—অর্থাৎ, দুই নয়, এক হইয়া স্থিতি। দেশ-কাল-নিমিত্ত—মুখ্যতঃ এই তিনটি বর্ত্ম ধরিয়া সব কিছুর আরম্ভ ও সমাপ্তি খুঁজিয়া চলিয়াছি। বর্ত্ম তিনটি কখনও কাছাকাছি হয়—যেমন, সারনাথে বুদ্ধদেব এই সময়ে তাঁর উপদেশ প্রচার করেন। কিন্তু এরূপ সাহিত্য অনিয়ত। কাষ্ঠায় চলিতে—তারও আরম্ভ কিসে, কোথায়, ইত্যাদি—আবার অধ্রুবে, অনিশ্চয়ে পড়িতে হয়। মহামণ্ডল-পরিক্রমা করিয়াও 'ঐকান্তিক'কে, 'অনাপেক্ষিক'কে পাই না। যে স্থলে পাইব, সেটি বিন্দু। যেমন, দুটি বা তিনটি সরলরেখা। তারা যদি পরস্পরকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে, তবে সে বিন্দুতে আসিয়াই বলিতে পারি—আমি তিনটিতে আছি। অন্যত্র, এতে আছি, তো ওতে নেই। শুধু তাই নয়, ঐ এক স্থলেই বলিতে পারি যে—এখানেই সব রেখাগুলির এক সঙ্গে আরম্ভ ও শেষ। বিন্দুটিকে শূন্য ভাবিলেও বটে, আবার অসীম, অনন্ত ভাবিলেও বটে।

সুতরাং, বিন্দুকে এই চারি ভাবে 'যেন ভাঙ্গিয়া' বুঝিতে চেষ্টা কর:—(ক) আরম্ভকের ক্রমান্বয় (series of beginnings); (খ) সমাপ্তির ক্রমান্বয় (series of endings); (গ) ঐ দুটি অন্বয়ের দুইদিকে কাষ্ঠা (limits, *infra* and *ultra*); এবং (ঘ) যে 'স্থলে' (শূন্য অথবা পূর্ণ) ঐ দুই কাষ্ঠা সমসংস্থায় আসিয়াছে (the point or continuum where the limits co-inhere)। ধর, 'অউম'। 'অ'তে আরম্ভ ভাবিতেছ, আর 'ম'তে সমাপ্তি। কিন্তু দুইকেই 'ক্রমান্বয়ে' দেখ। আরম্ভেরও আরম্ভটি কোথায়, সমাপ্তির সমাপ্তিটিই বা কোথায়? সন্ধান কর। এই সন্ধানই তো প্রণবজপ। সন্ধান শেষ বিন্দুতে। বিন্দু নাদরূপে উদিত হইয়া 'অ' স্বরাকৃতিতে উচ্চারিত; 'ম'ও নাদকে ধরিয়া বিন্দুতেই লীন। এই উদয়-স্থিতি-অস্ত-সমস্ত বৃত্তিরূপে কলাশক্তি নিজেকে আকলিত করেন। শক্তিরূপে কলা, তার শাক্তীতনুরূপে অর্দ্ধমাত্রা।

পরের সূত্রে স্পষ্ট করিয়া—

১০। তত্র শূন্যতাপূর্ণতে একত্র।।

সে 'স্থলে' শূন্যতা এবং পূর্ণতা দুই-ই একত্র হইয়াছে, কিনা, সমসংস্থায় মিলিয়াছে। —Point as pure, and Continuum as perfect both meet and unite.

আদিরারম্ভধারায়াঃ স্পন্দাদীনামভাবো যঃ।
অসদেবাগ্র আসীদ্ বৈ শ্রূয়তৈবং হি শূন্যতা॥
সদেব চাগ্র আসীদ্ বৈ পূর্ণতাপি বিবক্ষিতা।
সদসদ্ব্যাপিকা বৃত্তির্বিন্দুত্বেন হি গৃহ্যতে॥ ৯২-৯৩

স্পন্দাদিরূপে বিশ্বে যে আরম্ভধারা, তার আদি যাহা, অথচ, যেটি স্বয়ং স্পন্দাদিরূপে আরম্ভধারা নয়; 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ'—এসব অগ্রে 'অসৎ' (যেন নাই হইয়া) হইয়াছিল,—এইভাবে যেটি শ্রুত আছে; সেটি এবম্বিধ শূন্যতাকে উদ্দেশ করিয়াই, এটি বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ, শ্রুত আছে—'সদেবেদমগ্র আসীৎ'—এসব অগ্রে 'সৎ' (আছেই, নাই বলিয়া তো কিছু নাই) হইয়াছিল, —এর দ্বারা পূর্ণতাও বলা হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টান্তে একটা বীজ, অথবা সুষুপ্তি, অথবা এক অক্ষর লইয়া বুঝিতে যত্ন কর। এইভাবে 'সৎ' (সব আছে) এবং 'অসৎ' (কিছু নাই), এতদুভয়কে ব্যাপিয়া আছে যে বৃত্তি, তাকে বিন্দুর লক্ষণে গ্রহণ করিবে।

এই 'সদসৎ' উপলক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যকাদির ভাষ্যে এবং অন্যত্র যে বিপুল

বিচার, সেটি এখানে তুলিয়া লাভ নেই। তবে লক্ষ্য করিও যে, সকল বিবাদ যথাসম্ভব এড়াইয়া, অথচ সকল পক্ষকে (বিজ্ঞান গণিতাদিকেও) মিলাইয়া, মুখ্যতঃ জপাদি সাধনের অনুবন্ধানুরোধে, লক্ষণগুলি সূত্রিত ও আলোচিত হইতেছে। ধর, তারচক্রে অথবা নামজপে যখন 'বিন্দুলীন' হইতেছে, তখন কি শুধু শূন্যেই অবসান? না, তখন তার অথবা নামের যেটি পূর্ণতা, তাতেও স্থিতি। It is a state of perfected equilibrium and harmony. পাদে মাত্রায় কলায় কাষ্ঠায় যে ব্যক্তভাবটি উন্মেষের পর উন্মেষ, বিকাশের পর বিকাশে চলিয়াছিল, সেটি এখানে 'দপ্ করিয়া' নিভিয়া শেষ হইল না; সেটি এক পরম অব্যক্ত নিবিড়তায় সম্পূর্ণ হইল। এই যুগ্মভাবটি (শূন্যতা-পূর্ণতা) সৃষ্টির সমষ্টি-ব্যষ্টি সব ভাবেতেই রহিয়াছে। যেমন, কালোতে সব রং মিলিয়া লীনভাব পাইয়াছে, তেমনি যেটাকে ব্যবহারে 'blank' (ফাঁকা) বলি, (যেমন, সুষুপ্তি), সেইটাই সব কিছুর সমতা ও সমাপনে (perfect equilibrium) আসার স্থল। এটি আরম্ভ ও অবসানের স্থলও বটে। Equilibrium (সমতা) এবং Harmony (সুষমতা)—দুটিই এভূমিতে perfected (সমাপ্ত) হয়, অথচ, এটি নিখিল বিশ্বব্যবহারের আদি আরম্ভ ও শেষ অবসান ভূমি। ব্যক্ত অব্যক্ত, ব্যাকৃত অব্যাকৃত—এ দ্বন্দ্বের সন্ধিভূমি এটি। তাই—

১১। তমেবাধিকৃত্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ॥

এই বিন্দুকে অধিকার করতঃ ব্রহ্ম সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট।

ব্রহ্মের বিন্দুরূপে অনুপ্রবেশ পূর্ব পূর্ব খণ্ডে ('হ য ব র ল' ইত্যাদি প্রসঙ্গে) সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। মহামায়া সূত্রটি পুনশ্চ প্রণিধেয়।

সৃষ্ট্বানুপ্রাবিশদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বং খল্বিদমেব চ।
বিন্দুব্রহ্মত্বমায়াতি সমন্বয়াদিতি দ্বয়োঃ॥
পূর্ণাপূর্ণে ন বা শূন্যং সমেত্য যন্তি সর্ব্বতাম্।
কলাবাচৌ তথা বিন্দুর্দিত্যদিতী চ কশ্যপঃ॥৯৪-৯৫

শ্রুতি বলেন—সেটি সৃষ্টি করতঃ ব্রহ্ম তাতে অনুপ্রবেশ করিলেন; আবারও বলেন—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। শুদ্ধ নির্বিশেষরূপে (শুদ্ধ সদ্‌রূপে), এ দুয়ের সমন্বয়

আছেই। কিন্তু, সবিশেষস্থলেও, ব্রহ্মের বিন্দুরূপতায় ঐ দুয়ের (অর্থাৎ, সবেতেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট, এবং সবই তিনি) সমন্বয় হইয়াছে। সৃষ্টির সর্বত্র এই সমন্বয় উদাহৃত। কেবল, বীজ, সুষুপ্তি বলিয়া কেন, ঐ একটা ধূলি, মনের এই একটা ভাব লইয়া দেখ। আরম্ভ-অবসান এবং সমতা-সমাপনের ভূমিটি খোঁজ। সর্বত্র আছে। ঐ দুইভাবের কাষ্ঠার অবচ্ছেদক ও সংযোজকরূপে আছে। এমন এক ঠাঁই—যেখানে আরম্ভ-অবসানও বলে—আর না, এই খতম; সমতা ও সমাপনও বলে—আর নয়, আমি পূরা। ব্যবহারে, অর্থাৎ, পাদমাত্রাদিতে, সর্বরূপটি কি আকারে রহিয়াছে ও চলিতেছে? পূর্ণ-অপূর্ণ এবং শূন্য-অশূন্য—এ যুগ্ম-দ্বন্দ্বস্থিত হইয়াই। ঐ যুগ্মদ্বন্দ্ব ছাড়িয়া তো 'সর্ব্বের' কোন রূপটিই হইতেছে না। অর্থাৎ, সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট যে বিন্দুব্রহ্ম, তার ঐ শূন্য-পূর্ণ—এই দুইভাব ছাড়িয়া। কলা (কলাশক্তি নয়, বর্ণাদিরূপে যে কলা = aspect or partial), বাক্ (স্ফোট এবং নাদরূপে)—এ দুটি যথাক্রমে দিতি ও অদিতি (স্ফোট বা নাদ ছিন্ন হয় নাই), আর, বিন্দু স্বয়ং কশ্যপ, ইহা ভাবনা করিও। যেমন, কোনও বীজ বা নামে যদি বিন্দু 'ভরণ' না করেন তো, তাতে বীজাধান বা বীজত্বই হয় না। অক্ষরকে ব্রহ্ম, বাক্‌কে ব্রহ্ম ভাবিবার উপদেশ আছে। ব্রহ্ম বিন্দুরূপে তাদের ভরণ না করিলে তাদের ব্রহ্মভাবনা নিষ্ঠিত হয় না। এই বিন্দুতে বীজাদি স্থিত হইলে 'বিন্দুধারণং' এবং তা হইলে, বীজের 'জীবনং'; আর, 'মরণং বিন্দুপাতেন'। এই সগুণ-সবিশেষ স্থলে, অনুপ্রবেশ = কেন্দ্র-নাভি-বীজাদি আকৃতিতে সমস্ত কিছুর কেবল সূক্ষ্ম নয়, পরন্তু কারণভূমি পর্যন্ত, অধিকার করতঃ বৃত্তিমত্তা = Involution of Becoming into Being. যেমন ধর, একটা ত্রিভুজ বা বৃত্তে তার সকল ধর্ম অনুপ্রবিষ্ট। এস্থলে logical implication. বীজের বেলাতেও functional implication.

এইবার, সেই পরমারম্ভক শূন্যে আবার আরম্ভ করা হউক্।

১২। শূন্যমপেত্য বৃত্তিত্বং দ্বন্দ্বত্বম্॥

শূন্য থেকে অপেত, 'সরিয়া যাইয়া', যে বৃত্তিমত্তা, তাকে বলে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব = Polarity; state of being 'something' and its opposite. the condition of A becoming 'A and not-A'. সুতরাং, 'সরিয়া থাকা' মানে দেশে, কালে অথবা

নিমিত্তাদিতে অন্যথা হওয়াই নয়। কোন রকমে অন্যথাত্ব (otherness) হইলেই যে দ্বন্দ্ব, এমন নয়। সমসংস্থাক অসমসংস্থাক হইলে দ্বৈত বা ভেদ হয়। আগে যে বিমর্শের কথা হইয়াছে, সেই বিমর্শের অপেক্ষায় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধটি উদিত হইলে, দ্বন্দ্ব দেখা দিল। যথা, অহং-ইদং, অস্মি-অস্তি, পুং-স্ত্রী, ইত্যাদি। দিবা-রাত্রি, সুখ-দুঃখ, শীতোষ্ণ, নর্থ পোল-সাউথ পোল, এসবও। যেটি দ্বৈত বা ভেদমাত্ররূপে প্রতীত, সেটিও 'দ্বন্দ্বগর্ভিত' থাকে। যেমন, ঘট ঘট, ঘট পট-নয়—এভাবে অন্যোন্যাভাবটি ফুটিলে দ্বন্দ্ব। অথবা, ঘটটি উত্তরে, পটটি দক্ষিণে। কাজেই, ভেদস্থলে 'দ্বন্দ্ববীজ'টি থাকে। 'দ্বন্দ্বপ্ররোহ' না থাকিলেও থাকে। হরগৌরীও কলহ করেন, 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'; ব্রজে শ্রীমতীও তো কলহান্তরিতা হন। এই সব পরমযুগলে দ্বন্দ্ব স্বারস্য-সামরস্য আধারে দ্বন্দ্ব। প্রাপঞ্চিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে সজাতীয় নয়। জপে নাদবিন্দুর যে দ্বন্দ্ব সেটি স্বভাবমৈত্র এবং পুষ্টির দ্বন্দ্ব। কিন্তু অগ্নিমাত্রা এবং সোমমাত্রার দ্বন্দ্বে মৈত্র এবং পুষ্টির বাধাও ঘটিতে পারে। অর্থাৎ, মাত্রাদির সমতার স্থলে বিষমতা আসিয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।

একটা চুম্বক লইয়া দেখ। মধ্যে এক উদাসীন (neutral) স্থল আছে। সেটি থেকে আরম্ভ করিয়া দুই দিকে চৌম্বকত্ব ধন ও ঋণ এই দুইভাবে দ্বন্দ্বস্থ হইয়াছে। উদাসীন স্থলে চৌম্বকবৃত্তি ('reaction index') শূন্য। এ দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে লইয়া বলা যায়—শূন্য হইল সেই 'স্থল' (state or point or plane), যেখানে কোন নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার যেটি সূচক বা মাপক (বাহ্যে সমীক্ষাদিতেই হোক্ অথবা আন্তর প্রতীতেই হোক্)—বলে, আর কোন সূচক বা মাপকে সূচন বা মাপন হইল না (zero or measureless)। সে স্থলটি থেকে 'অপেত' হইলে সূচন ও মাপন সম্ভাবিত হয়।

শূন্যন্ত্বাত্যন্তিকাভাবশ্চাথবা দ্বন্দ্বশূন্যতা।
অথবালোচনাধারমূলবিন্দুর্নিরূপকঃ।
ঋণতা ধনতা বা স্যাচ্ছূন্যতাস্থিত্যপায়তঃ॥ ৯৬

শূন্য সূত্রে সবিশেষ কথিত হইয়াছে। এ স্থলে, 'অপেত' ভাবটি বিশেষভাবে দেখানর জন্য বলা হইতেছে—আত্যন্তিক (ঐকান্তিক নয়) অভাব (যেমন, ঘটটি

একবারে শূন্য) বলিতে শূন্য বলা হয়; দ্বন্দ্ব নেই, অর্থাৎ, উদাসীন নিরপেক্ষ ভাবটি বলিতেও শূন্য; অথবা, কোন 'আলোচন' (review or representation, যেমন, গণিতে বিজ্ঞানে analysis স্থলে) হইতে গেলে, তার আধার (frame) নিরূপক যে মূল বিন্দু (যথা, 'Origin'), সেটিকেও শূন্য বলে। কেবলমাত্র, বহিরালোচন ক্ষেত্রে নয়, আন্তরালোচন ক্ষেত্রেও (subjective analysisএ) এক আলোচনাধার এবং সেটির কোন নিরূপকস্থল (point or plane of reference) আবশ্যক হয়। যেমন, জপে ধ্বনি-সম্বন্ধ, ভাব-সম্বন্ধ, ভাতি-সম্বন্ধ, ক্রান্তি-সম্বন্ধ ইত্যাদি ভাবে আলোচনাধারাটি পরিকল্পিত হইতে পারে। আর, প্রত্যেক আধারে একটা একটা নিরূপ্যমাণতা-নিরূপক 'স্থল' (যেমন, ধ্বনিতে নাদ বা বিন্দু) চাই। এখন, নিরূপ্যতা-নিরূপক (যে স্থল হইতে আরম্ভ করতঃ সমস্ত বৃত্তিলেখ সমীক্ষা করিতে হইবে, এবং তার অবসানভূমিটিও যেখানে) ঐ স্থলটিকেও শূন্য বলা হইলে, সেই শূন্য স্থিতি (ধ্রুব) থেকে কতটা কোনদিকে 'অপায়' হইল না হইল, সেটি দেখিয়া সব বৃত্তির 'ঋণ' বা 'ধন' মান নিরূপিত হয়। যেমন, জপে নাদস্ফুরণ হইতেছে বটে, কিন্তু ঝিল্লী-চুল্লী ইত্যাদির সঙ্গে জড়াইয়া, খণ্ডিত ভাবে। 'লেখ'টি সাবধানে দেখিতে হয়। শুদ্ধ অখণ্ড নাদকে যদি ঐ শূন্যস্থলে রাখি, তবে আমার 'লেখ'টি কোনদিকে কতটা—এটা নিরূপণীয় হয়।

দ্বন্দ্বের প্রকারতা আগেই কিছু বলা গেল। ভেদস্থলে দ্বন্দ্ব প্ররোহরূপে না থাকিলেও বীজ (গর্ভিত) রূপে থাকে। ভেদের মত দ্বন্দ্বকেও স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় করিয়া দেখা যায়। একই Germplasm থেকে দুই সহোদর বা সহোদরায় অনেক স্থলে দ্বন্দ্ব বিজাতীয় আকারেও দেখা যায়। কোন বীজমন্ত্রে অগ্নি ও সোম স্বগত-সজাতীয় দ্বন্দ্বেই সচরাচর থাকেন, কিন্তু বৈজাত্যও ঘটিতে পারে। অর্থাৎ, অগ্নি=শুধু হরণ, আর, সোম=পূরণ, এই আকার হইলে। অথবা, তাদের মাত্রাদির অনুপাতবৈষম্যে জপলেখটি সুষমতা (rhythmicity) ছাড়িয়া বিষমতায় আসিলে। প্রকাশ-বিমর্শ, নিষ্কল-সকল, শূন্য-পূর্ণ, হরগৌরী প্রভৃতি 'নিত্যযুগল'—এ সকলে দ্বন্দ্ব ভাবটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কতিপয় আকৃতি পূর্বেই সবিশেষ দেখা হইয়াছে। সূত্রে যে 'অপেত্য' পদটি আছে, অথবা, কারিকায় যে 'অপায়তঃ', সেটি স্বানুবন্ধানুরোধে বুঝিয়া লইতে হইবে। শূন্য (অথবা পূর্ণ) কে যদি বল 'অনপায়',

তবে এ থেকে 'ভিন্ন' হইয়া কোন এক ভাব হইল, এবং সেটি ঐ অনপায়ভূমির সম্বন্ধে প্রতিযোগী হইল (যেমন, নিষ্কল আর সকল ভাব)। এখানে 'অপায়'টি যে কি তা ভাবিয়া দেখ। আবার, লৌহে চৌম্বকত্ব ছিল না, আসিল। এখানেও অনপায় থেকে অপায়টি ভাবিয়া লও। অনপায়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরাসম্বন্ধে, দুইভাবেই দ্বন্দ্ববিচার করিও।

১৩। শূন্যমপেক্ষ্যবৃত্তিত্বং সব্যাপারত্বম্॥

শূন্যকে 'অপেক্ষা' করতঃ যে বৃত্তিমত্ত্ব, তাকে বলে সব্যাপার (ব্যাপারবান্) হওয়া।

অভাবং কঞ্চনাপেক্ষ্যাথবোদাসীনতামপি।
সর্ব্বো ব্যাপার আয়াতি কঞ্চিদ্ বিন্দুং নিরূপকম্।
দেশবিন্দুং কালবিন্দুং বীজবিন্দুমহঙ্কৃতিম্॥ ৯৭

অন্তর্বহিঃ যে কোন ব্যাপার পরীক্ষা কর, কি দেখিবে? কোন না কোন অভাব (মাত্রা-পাদ-কলায়, অথবা 'আত্যন্তিক') অপেক্ষায় ব্যাপারটি হইতেছে। অথবা, কেবল অভাব না বলিয়া উদাসীনতাও বলিতে পার। যে ভাবেই বল, ব্যাপার মাত্রেই কোন নিরূপক বিন্দুর সম্বন্ধেই যায়। অর্থাৎ, বাহ্য বা আন্তর ব্যাপার মাত্রেই বলে—আমি যে আমার 'লেখ'টি আঁকিব, তার নিরূপক বিন্দুটি (Point of Reference, Base of Operation) দাও। ঐ 'Base' টিকে অভাব অথবা উদাসীনতার আধারে (Frame and contextএ) পাইতে হয়। কিছু নেই অথবা কম আছে, সেটি পূরণ করিতে হইবে, অথবা 'হেয়' থাকিলে সেটি হরণ করিতে হইবে, কিন্তু কোন্‌টা ধ্রুবস্থানে বসিলে (End, Ideal, Finished Result), হরণ-পূরণ ব্যাপার চলিবে? অথবা, অভাব ঠিক না থাকিলেও, এক উদাসীন অনপেক্ষ ভূমিকে আধার করিয়া, নিরূপক বিন্দু লইয়া ব্যাপারবান্ হইতে হয়। যেমন, একটা সাদা কাগজ। 'লেখ' সম্বন্ধে উদাসীন। কাগজে এক স্থলে এক বিন্দু বসাও, এবং বল—এই বিন্দুকে নিরূপক স্থলে রাখিয়া বৃত্ত কি প্যারাবোলা আঁকিব। যাঁরা মুক্তসঙ্গ, তাঁরা এই উদাসীন

ভূমিতে স্থিত হইয়াও ব্যাপারবান্ হন। জপে নাদস্ফোটভূমিতে স্থিত হইয়াও জপাদি করা যায়। যার নাদস্ফোট হয় নাই, তার ভূমি অভাবভূমি। ত্বংপদার্থ ও তৎপদার্থের শুদ্ধিসাম্যে, অর্থাৎ উদাসীনভূমিতে, আসিয়াও শ্রবণাদিব্যাপার (জীবন্মুক্ত ক্ষেত্রেও) চলিতে পারে। রসভূমিতেও দৃষ্টান্ত দেখ।

ঐ বিন্দুটিকে দেশবিন্দু, কালবিন্দু, কালদেশাবচ্ছেদক বিন্দু ('Here-Now Point'), বীজ বা কারণবিন্দু, এবং অহঙ্কৃতি, এই পাঁচ রকমে কারিকায় বলা হইল। এতে বাহ্য-আন্তর নিখিল ব্যাপারে ব্যাপ্তিটি হইল। প্রথম তিনকে আশ্রয় করিয়া Event in the Space-Time Continuum নিরূপিত হইবে। শেষেরটি চেতনার ভূমিতে বিশেষতঃ অভিব্যক্ত হইলেও, ব্যষ্টিসৃষ্টিতে মৌলিক। অর্থাৎ, এই অহং বিন্দুটি না পাইলে সৃষ্টি কোথাও ব্যষ্টি আকারে (যথা, এক বটবীজ, একটা হাইড্রোজেন অণু) আসিবে না। অহঙ্কৃতি ঐ সব দৃষ্টান্তস্থলেও আছে। বীজবিন্দু এ মৌলিকটিরও মূলে।

জপাদি সাধনেও এই পঞ্চধা বিন্দুকে আশ্রয়ের বিশেষ উপযোগ আছে। জপে অভাবভূমি আর উদাসীনভূমির কথা বলা হইয়াছে। অভাবটি অনুকূল বেদনীয় (ধনমুখী) হইলে উল্লাসাদি জপের লসিতভাব। প্রতিকূল-বেদনীয় (ঋণমুখী) হইলে (তীব্রস্থলে, আতুর আবির্ভাব), একটা অবুঝ ব্যথা বেদনা, ইত্যাদি। তারচক্রে উদয়াস্তের সন্ধি বা মেরুটি হইল দেশবিন্দু; নাদের উদয়, 'মধ্যাহ্ন' এবং অস্ত হইল কালবিন্দু; স্বয়ং অর্দ্ধমাত্রা বীজবিন্দু; এবং প্রণবে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মবিন্দু জাপকের 'ধীমহি' এবং 'প্রচোদয়াৎ' এই দুটির সম্পর্কে অহংবিন্দু। জাপক নিজ অহংবিন্দুটিকে 'ধীমহি' ভাবে ঐ ব্রহ্মবিন্দুতে আহুতি দিতেছেন, আর, ব্রহ্মবিন্দু 'প্রচোদয়াৎ' ভাবে হবনটিকে সফল, চরিতার্থ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, বিন্দুসূত্রে বিন্দু যে ভাবে লক্ষিত, এ সব নিরূপক, ব্যবহারিক বিন্দুতে সেটির ব্যাপ্তি সঙ্কোচ করিয়া লইতে হয়। সাধনামাত্রেই সেটি করিতে হয়।

১৪। শূন্যং সমেত্য বৃত্তিত্বং নির্ব্যাপারত্বম্।।

শূন্য 'সমেত' (সম্যক্ এবং সমভাবে ইত বা যাত) যে বৃত্তিতা, তাকে বলে নির্ব্যাপার, বা ব্যাপাররহিত হওয়া।

সমেত্যেত্যস্য বোদ্ধব্যা শূন্যতাস্থিতিকল্পনা।
অথবা শূন্যতাবাপ্তিঃ সমাসে দ্বন্দ্ববৃত্তয়োঃ॥ ৯৮

ধর, ক, খ, গ এই তিন শক্তি কোন কিছুর উপর ক্রিয়া করিতেছে। সে ক্রিয়ার ফলে ধর কোন দিকে গতি হইতেছে। এখন, নির্ব্যাপার হইতে গেলে, ক, খ, গ এদের প্রতিটিকে হয় শূন্যস্থিতিতে লইতে হয় (individually vanish); অথবা, সমাসে (সঙ্ঘাতে) তাদের শূন্যের স্থিতিতে সমীকরণ হওয়া চাই (sumtotal equated to zero)। প্রথম কল্পকে শূন্যতাস্থিতি, দ্বিতীয়টিকে শূন্যতাবাপ্তি (শূন্যতা+অবাপ্তি) বলা হইল। সুষুপ্তি, প্রকৃতি-লয়, প্রভৃতিতে এই শেষের কল্পটি সম্ভাবিত হয়। তৎতৎ সংস্থায় নির্ব্যাপারতা বটে, কিন্তু নির্ব্যূঢ় ভাবে নয়। বীজভূমিতে 'প্রসুপ্ত' বলিয়া একটা অবস্থা আছে; সেখানে, স্থূলে, এমনকি সূক্ষ্মেও ব্যাপার থাকে না, কিন্তু কারণেও কিছু থাকে না বলিলে, তাহা হইতে ভাবী ব্যাপার কল্পনায় 'গৌরব' হয় (অর্থাৎ, একান্ত নির্ব্যাপার কারণ আবার কিরূপে সব্যাপার হইল, এটি বোঝা সহজ হয় না)। দ্বন্দ্ববৃত্ত (polarity condition and function), শূন্যে সমীকৃত হইয়া উদাসীনবৃত্ত (neutral) হইল। কিন্তু শূন্য শুধু অবসানভূমি নয়, আরম্ভেরও ভূমি। লয়েই সৃষ্টি। কাজেই, আবার আরম্ভ হইবার যদি কোন সম্ভাব্য সম্বেগ (potential momentum or latent urge) থাকিয়া যায় তো, সেটি ঐ শূন্য থেকেই আবার আরম্ভ করিবে। প্রথমকল্পে যে শূন্যতাস্থিতি, তাতে অবাপ্তি (শুধু reach করা নয়) লয়, স্থিতি (rest)। কাজেই, শূন্য ছাড়িয়া সে আর ব্যাপারে যাইবে না। নিখিল সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট যে বিন্দু, তাতে শূন্য ও পূর্ণ সমানাধিকরণ হওয়ায়, সৃষ্টিতে প্রতিটি পদার্থে কখনও নির্ব্যাপার হইয়া (যথা, সুষুপ্তিতে) শূন্যে গতি হইতেছে (equilibrated or balanced rest), তেমনি আবার নিরন্তর পূর্ণতার দিকে (as evolution) যাত্রাও হইতেছে। শূন্যে আসিয়া প্রতিটি পদার্থ 'জিরাইয়া' লইতেছে, কিন্তু 'জাগিয়া' আবার যাত্রাপথের পান্থটি হইতেই হয়। Involutionটা absolute হয় না এই কারণে যে, evolutionটা এখনও perfect হয় নাই। বীজ থেকে ধীরে ধীরে ফলন্ত পাদপটি হইল। সেখানে আবার বীজটি হয় এই আবেগে যে আমার বিকাশ ও সফলতার চরিতার্থতাটি এখনও যে হয় নাই!

জপাদি সাধনে, ঐ শূন্যে অবসান ও আরম্ভ, এ দুটিই এমন আকারে পাইতে যত্ন করিতে হয়, যাতে প্রথমটি (অবসান) শুদ্ধ হয়, আর দ্বিতীয়টি পূর্ণাভিমুখে ঋজুগ, ছন্দোগ ও ধামগ হয়। বৈখরীকে নাদানুসন্ধান করতঃ মধ্যমার অবর-বর সন্ধি এবং সেতু পার করাইয়া পশ্যন্তীর পরোবরীয়ান্ গ্রামসমূহে—ইত্যাদি ক্রমে লওয়াই হইল পূর্ণ-পরিক্রমা। এ যাত্রাপথে যেখানে যেখানে 'অবসান-আরম্ভ' ভূমিগুলি মিলে, সেগুলি শুদ্ধ, খাঁটি করিয়াই মিলাইতে হয়। যেমন, সকালে উঠিয়া যদি বড় একটা চড়াই ভাঙ্গিতে হয় তো, রাত্রিতে নিদ্রা ও বিশ্রামটা গাঢ় হইলেই উত্তম।

১৫। শূন্যং ব্যতীত্য বৃত্তিত্বং ভূমত্বম্॥

শূন্য ব্যতীত (তার স্থলে অবসান ও আরম্ভ এই অপেক্ষা না রাখিয়া) যে বৃত্তিমত্ব, সেটি হইল ভূমত্ব (ভূমা)। ব্যতীত্য = without reference to any 'origin' or plane of reference whatever.

ন দ্বন্দ্বো নাপ্যভাবশ্চ নাস্তি যত্র নিরূপ্যতা।
নিরূপকত্বমন্যস্য তত্রৈবাস্তি চ ভূমতা।
ব্যতীত্যেত্যত আয়াতি বিশেষাতীতবৃত্তিতা॥৯৯

যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, অভাবও নাই, নিরূপ্যতা বা নিরূপকত্বও নাই, সেখানে ভূমা লক্ষিত জানিবে। সূত্রে যে 'ব্যতীত্য' পদটি আছে, তদ্দ্বারা কোন বিশেষ বা বিশিষ্টতার ('এইভাবে' বা 'এইরূপে' বলিয়া যেটি কোন বিশেষ নিরূপণে আনে) অতীত (transcending) বৃত্তিতা (স্থিতি) বুঝাইতেছে। সুতরাং 'শূন্যং ব্যতীত্য' বলিতে সোজা 'শূন্যবাদে, শূন্যছাড়া' বৃত্তিতা বুঝিলে হইবে না। ভাব এই যে, 'ভূমা' পদার্থের নিমিত্ত এটা আবশ্যক করে না যে—আগে মূল নিরূপক (আরম্ভ এবং অবসান দুয়েরই) শূন্যকে লও, তারপর ভূমা যে কি বস্তু তা ধরিতে বুঝিতে যাও। ভূমার বেলা সে আবশ্যকতা নাই। দেখা যায় যে—দ্বন্দ্ব, অভাব, নিরূপিত এবং নিরূপক—এই চারটি ভাব (Categories) লইয়া প্রত্যয়াদি হইতে গেলে, শূন্যরূপ মূল নিরূপক (Point of Basic Reference) বাদ দিয়া (ব্যতীত্য) সেটি

সম্ভবপর হয় না। কিন্তু, ভূমা ঐ চারিটি ভাবে বিশেষিত হয় না। সুতরাং শূন্যং ব্যতীত্য ভূমত্বম্। এই ব্যতীত্য (transcending 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্')—ভাবটিই ভূমত্বকে অন্য পদার্থ থেকে বিলক্ষণ করিয়া দেখায়। ভূমা বলেন—আমি বহুত্ব বা ব্রহ্মত্বই, আমাকে কোন অল্পে, খণ্ডিতে, পরিমিতে পূরিতে গেলে, আমি সেটার অতীত হইবই। অল্পে, খণ্ডে, পরিমিতে থাকিলে তো সুখ নেই; নিরতিশয়ভাবে 'বহুল' না হওয়া পর্যন্ত, নদীর তটাদির মতো বাধা থাকেই, আর, গতিতে প্রাপ্তিতে, উপলব্ধিতে বাধা থাকা মানেই দুঃখ (impeded activity প্রভৃতি)। সৃষ্টিতে সর্বত্র নিরন্তর তাই অল্প থেকে ভূমার পানে অসীম অভিযান! অথচ, সকল সীমাকে সীমা দেখাইয়া দেয় যে সীমাতীত, সেই সীমাতীতেই নিখিল সসীমের স্থিতি। তার বিশেষ সংস্থা—অবস্থিতি পরিস্থিতি—তার অসীমে এই স্বভাবস্থিতিটিকে ভাবিতে দেয় না। বন্ধ কূপের জল, গর্তের জল, তাই না এত দীন, এত কৃপণ, এত কুণ্ঠিত!

ভূমাই রস। কেননা, অস্তি-ভাতিতে 'নেতি নেতি' করিয়া সীমাতীত অখণ্ডের বোধ ধারণায় আনা চলিতে পারে (approach by negation); কিন্তু রসের বেলা 'এটা নয় ওটা নয়' করিয়া তো কিছু হয় না। এখানে শুধু অনুভূতিতে নয়, ধারণাতেও অন্বয়মুখে— 'এই যে, এই তো'—যাইতে হয় (approach by positive affirmation)। আর, ঐ যে 'এই যে, এইতো', সেটি কোন বাধা না মানিয়া সীমাতীতের পানেই চলিতে থাকে। রসে পর্যাপ্তি নেই। আরম্ভ-অবসান নেই, সমতা-সমাপনের 'বার্ত্তা' (খবর দেবার ভূমিটি) আনাটিও নেই। 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং' ইত্যাদি। এইজন্য, 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি', 'রসো বৈ স ভূমা'। রসে অল্প ছাড়িয়া বহু, নির্ব্যূঢ় বহু হবার বৃত্তিটি একান্ত 'সাক্ষাৎ'। 'বহু' শব্দ থেকে 'ভূমা', তাও আবার নিপাতনে! শব্দটিও কোন বিধিবাঁধনে যাবে না।

এটি স্বয়ং সাক্ষাৎ অবচ্ছেদাদিরহিত, অতিশয়রহিত অস্তিস্বরূপ এবং ভাতিস্বরূপ। ভূমা আনন্দই অস্তি ভাতি। সুতরাং সবকিছুর অস্তিতামান ও ভাতিতামান ভূমার 'স্বরূপমানেই'। নিজে কিছু পূর্বোক্ত ঐ চারিটির কোনটিতেই ধরা দেন না। শূন্য ও পূর্ণ—এ দুটির সম্পর্কে নৈকটিক-তাটস্থ্য (close approximation) ভাবে আরম্ভাদি দ্বারা লক্ষণ চলিয়াছিল। এখানে তা চলে না। তাই 'ব্যতীত্য'। শূন্য বা পূর্ণ স্বভাবে

অনিরূপ্য হইলেও, মানের ভূমিতে যথাক্রমে আরম্ভ ও অবসান, এবং সমতা ও সমাপনের নিরূপক হয়; কিন্তু ভূমা নিরূপ্য-নিরূপকভাবেরই ব্যতীততা।

১৬। শূন্যং সমীক্ষ্য বৃত্তিত্বং নির্ব্যূঢ়ত্বম্॥

শূন্যকে সম্যক্ (সমগ্রতঃ, সর্বথা এবং সর্বতঃ) ঈক্ষণ করতঃ যে বৃত্তিতা, সেটি নির্ব্যূঢ়ত্ব।

সামগ্র্যেণ সর্ব্বথাপি সর্ব্বতোঽপি সমীক্ষণাৎ।
হানোপাদানশূন্যত্বে নির্ব্যূঢ়ং স্যান্নিরূপণম্।
অন্যাপেক্ষনিরূপ্যত্বং ব্যূঢ়ত্বমিতি কল্প্যতে॥ ১০০

ভূমা বিষয়ে নিরূপ্য-নিরূপক-নিরূপণ নেই। ভূমা সূত্রে শূন্য প্রবিষ্ট এই কারণে যে, শূন্যকে লইয়াই যাবতীয় নিরূপণ। কিন্তু, নিরূপণটি ব্যূঢ় এবং নির্ব্যূঢ় দুই আকারে হইতে পারে। অন্য যেটি (কিছুর আপন ভূমি বা বৃত্তের বাহিরে), তার অপেক্ষা রাখিয়া যে নিরূপণ, সেটি ব্যূঢ়। অংশতঃ বা খণ্ডতঃ যে নিরূপণ (সাধারণ ব্যবহারে অথবা বিজ্ঞানাদিতে), সেটি ব্যূঢ়। কেবল, নিরূপ্য বিষয় নয়, নিরূপণটিও যদি সর্বাধিকরণে হয়, (complete as a process) না হইয়া কোন কোন অধিকরণে হয়, তা হইলেও ব্যূঢ়। আবার, শুধু নিরূপ্য-নিরূপণ এ দুটি নয়, নিরূপকও যদি যথার্থ শুদ্ধ না হয় তা হইলেও ব্যূঢ়। 'সামগ্র্যেণ', 'সর্ব্বথা' এবং 'সর্ব্বতঃ'—এ তিনের দ্বারা ঐ তিনের ভর্তি, পূর্তি এবং শুদ্ধির কথা বলা হইল। এ তিনটি আবার কাষ্ঠায় লইতে হইবে—অন্যের তুলনায় বা অপেক্ষায় রাখিলে হইবে না। কাষ্ঠায় বা পরিসীমায় আসিলে নিরূপণটি যদি হানোপাদানরহিত হয়, তবেই (অর্থাৎ, তত্ত্বে উপনীত হইলে) সেটি নির্ব্যূঢ়। শূন্য, পূর্ণ, বিন্দু, ভূমা, ব্রহ্ম—সবই ব্যবহার মানে ব্যূঢ়ভাবে নিরূপিত হইতেছে, কিন্তু নির্ব্যূঢ় নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্ব পরিনিষ্ঠিত হইল না।

বহির্বিজ্ঞানের মত জপাদি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে 'তত্ত্ব' যে কি, এবং তত্ত্বের সঙ্কোচ, ব্যতিক্রম, ব্যভিচার আদিও যে কি, সেটি সবিশেষ সমীক্ষাদির আবশ্যকতা আছে। মিথ্যা আলেয়া, অথবা আলোকপুলকের একটুখানি 'আভাস' মিলিলেই তো হইল না। তাই, নিরূপণে তত্ত্ববিনিশ্চয়ই লক্ষ্য।

১৭। শূন্যং পরীক্ষ্য বৃত্তিত্বং প্রমাণত্বম্॥

শূন্য বা মূলনিরূপককে পরীক্ষা করিয়া যে বৃত্তি, সেটি প্রমাণ।

প্রায়শঃ প্রত্যয়ক্ষেত্রেঽবিস্পষ্টতাদিহেতুকঃ।
আভাসঃ প্রতিভাসশ্চ ভাসো বৈকল্পিকো ভবেৎ।
শূন্য ত্রিবিধমাশ্রিত্য প্রমাণং হি পরীক্ষণম্॥ ১০১

ব্যূঢ়ত্বনিরূপণেই বিজ্ঞানাদি যাবতীয় জাগতিক ব্যবহার। বহির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয়—Science is measurement—যথার্থ মানই বিজ্ঞান। কিন্তু মানের এই যাথার্থ্য ব্যূঢ়ভাবেই (on a restricted scale and under set conditions) পরখ করাই সম্ভাবিত। সকল পরীক্ষা ক্ষেত্রেই নিরূপ্য-নিরূপক নিরূপণ এ তিনটিকেই, বাধ্য হইয়া অথবা অনুবন্ধানুরোধে, কোন না কোন সঙ্কীর্ণ এবং আপেক্ষিক 'কাঠামো'তে (frame of investigationএ) বেশ শক্ত করিয়া (as rigidly as possible) আঁটিয়া ফেলিতে হয়। এতটা প্রাসঙ্গিক (range of what is relevant to the purpose), বাকিটা 'এক্ষেত্রে' প্রাসঙ্গিক নয়—এইভাবে একটা ভেদকরেখা (line of demarcation) টানিয়া পরীক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোগজজ্ঞানেও জ্ঞানভূমির পরম্পরা আছে। এই নিমিত্ত প্রমাণ, ব্যবহারস্থলে, ব্যূঢ়সম্বন্ধস্থাপক, নির্ব্যূঢ়ে তার ব্যাপ্তি নেই। অথচ সেইটেই আদর্শ এবং লক্ষ্য। অন্যথা, প্রতিষ্ঠা নেই। এখন, কি সাধারণ, কি বৈজ্ঞানিক, কি যৌগিক—সকল প্রত্যয়স্থলে ব্যাবৃত (veiled), বিসংবাদিত (doubtful and disputed), এবং বৈকল্পিক (alternate and antithetical)—মুখ্যতঃ এই তিন আকারে বিস্পষ্টতাদির অভাব দেখা যায়, যাতে প্রত্যয় পরীক্ষা এবং পরিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণ (যাথার্থ্য নিরূপণ) আবশ্যক হয়। যেটি যথার্থ সেটি বিশেষতঃ ব্যাবৃত হইলে হয় আভাস, কোন অশুদ্ধ অসংস্কৃত প্রতিফলকে (আন্তরস্থলে—ইন্দ্রিয়, চিত্ত ইত্যাদি) অযথা প্রতিক্রিয়া (reaction) আকারে আসিলে প্রতিভাস; আর, বৃত্তিটি পরস্পর বিরোধক বিকল্পে ভাঙ্গিয়া (as mutually exclusive or opposed components) দেখা দিলে হইল বৈকল্পিক ভাস। বিজ্ঞানে এবং জপাদি সাধনে এ তিনেরই দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন জপে দৈহিক রক্তচলাচলাদি নিমিত্ত যে ছিন্ন ছিন্ন সূক্ষ্মধ্বনি গোড়ায় শোনা যায়, সেটাকে নাদ ভাবিলে, আভাস। এটাকে চুল্লী (ঝিল্লীর পর)

ধ্বনি বলাই ঠিক—'রাবণের চিতা'—the sound of slow physical combustion। বিরাটের ক্ষেত্রে এটি আছে। এটি সোমনাদ নয়, পজিটিভ্ নয়, নেগেটিভ্ (লোকক্ষয়কৃৎ অগ্নির দহনধ্বনি)। প্রতিভাস এবং বৈকল্পিক ভাসের দৃষ্টান্তও নিজেতে লক্ষ্য করিও। শুদ্ধ ধ্বনি, বর্ণ, আকৃতি, ছন্দঃ সবই অবচ্ছেদক (receiving and projecting media) এর দোষে অযথা প্রতিক্রিয়া, অপক্রিয়া এবং বিক্রিয়ারূপে আসিতে পারে। এইজন্য, আত্মপ্রত্যয়স্থলে গুরু, সন্ত এবং শাস্ত্র—এই ত্রয়ীর (শাস্ত্রকে আলাদা করিয়া নয়) শরণ একান্ত আবশ্যক। 'তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে'। শাস্ত্র মানে—Standard Experience—ব্যবস্থিত যাথার্থ্য' এখন, ঐ আভাসাদি তিনটি, প্রত্যয়কে যাথার্থ্য থেকে অন্তরে রাখিতেছে। সুতরাং, ঐ তিনকে ধরিয়া শূন্যে ফিরিতে হইবে (অর্থাৎ, ঐ অন্তরটিকে শূন্যে আনিতে হইবে—the difference and divergence factor must be brought as near as possible to zero)। এইরূপ করিয়া যে 'পরীক্ষণং' (সর্বতোভাবে, সমগ্রভাবে এবং সর্বপ্রকারে), তাকে 'প্রমাণ' বলা হইবে। যথা, পরীক্ষক সম্বন্ধে আপ্তভূমি—রাগদ্বেষাদি পক্ষপাতশূন্যতা, ভ্রম-প্রমাদবিপ্রলিপ্সারাহিত্য—যথার্থ প্রমাতা হইবার নিমিত্ত আবশ্যক হইবে।

যেমন, সাধারণ প্রত্যক্ষস্থলে, বুদ্ধির যে স্বচ্ছ, অবভাসক কেন্দ্রে স্থিত হইয়া প্রমাতার প্রমেয়টিকে গ্রহণ করা উচিত, সে কেন্দ্র সচরাচর নানাবিধ তামস-রাজস সংস্কারের মলিন বিকৃত স্তর পরম্পরায় আচ্ছাদিত থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রামও (Brain-কে ধরিয়া) স্বচ্ছন্দ-পাটবভূমিতে থাকে না। কাজেই, বাস্তব ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রমাতার সম্বন্ধে যে ক্রিয়া, সেটি ঋজু ও ঋত হয় না; প্রমাতার প্রতিক্রিয়াটিও (বিষয়দেশে গমনাদি) ঋজুগা ও ঋতগা হয় না। যেখানে যে বস্তুটিকে যেভাবে দেখিলাম শুনিলাম, সে সে ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আভাসাদি 'আপতিত' হইয়াছেই। অনুমানাদিস্থলেও তো 'গোল' বাড়ে বই মেটে না। এই নিমিত্ত পরে 'প্রমা' সূত্র—

১৮। শূন্যমন্বীক্ষ্য বৃত্তিত্বং প্রমাত্বম্॥

শূন্যের অন্বীক্ষাপূর্বক যে বৃত্তি, সেটি প্রমা।

তত আভাসিকে ক্ষেত্রে ত্বন্যয়ব্যতিরেকতঃ।
স্থাপিতত্বং হি যোগ্যত্বে যুক্তস্যেতি ভবেৎ প্রমা।
স্থাপনং শূন্যমন্বীক্ষ্য যুক্তশিষ্টসমন্বয়ঃ॥ ১০২

অতঃপর, অন্বীক্ষ্যবৃত্তিতা দ্বারা কোন্‌টি 'প্রমা', তাহা বলা হইতেছে। পূর্ব সূত্রে যে তিন প্রকারের 'আভাসিক ক্ষেত্র' (apparent given; presented or represented field) এর প্রসঙ্গ হইল, সে তিন ক্ষেত্রেই যেটি 'স্থাপিত' (settled fact) তাতে এখন পর্যন্ত স্থাপনা হয় নাই, স্থাপনের বাধক কোন 'অন্তর' (অন্তরাল বা অন্তরায়) রহিয়াছে, এটি তো বুঝা যায়। যেটি স্থাপিত বা ব্যবস্থিত, সেটিকে বল 'ধ্রুব'। তা হইলে, অপরটি অধ্রুব, ব্যভিচারী। সুতরাং, বাধিত হইবে। সমগ্রতঃ, সর্বতঃ এবং সর্বথা বাধিত তো কিছুই হইবার নয়; এমন কি, খপুষ্পাদিও নয়। এই অধ্রুব বাধযোগ্যের (যেমন, পৃথিবীটি স্থিরই আছে), সেই 'ধূমাবতীর শূর্পে' ব্যাহৃতিটি হওয়া আবশ্যক। তার ধ্রুবটি অন্বয়ে আসা চাই, আর তার ব্যভিচারী, আরোপিত অনৃত ভাগটি ব্যতিরেকে যাওয়া চাই। যেমন, তত্ত্বমস্যাদির শোধনে করিতে হয়। জপের তো এইটিই প্রধান কর্ম। যেটি assimilable সেটি assimilated আর যেটি eliminable সেটা eliminated হওয়া চাই। পরীক্ষা ক্ষেত্রে (Experiment এ) তো বটেই, মননের ক্ষেত্রেও ঐ অন্বয়-ব্যতিরেক রীতিটি (Method of Agreement and Difference) সর্বথা প্রযুক্ত হওয়া চাই। 'কেবল' হইলে, সে কেবলত্বও স্থাপিত হওয়া চাই। এই প্রকার ব্যাহৃতির ফলে, যেটি ব্যভিচারী 'অযুক্ত' ছিল, সেটি 'যোগ্যত্বে' যুক্ত হয়। এইবার ধ্রুব যেটি 'তথ্য' বা 'তত্ত্ব', তাতে যুক্ত, অন্বিত হইবার যোগ্য হইল। সচরাচর এটি ব্যূঢ়ভাবে হয়, নির্ব্যূঢ়ভাবে হয় না। এই নিমিত্ত, কি বহির্বিজ্ঞানে, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে স্থাপনার এক 'পরোবরীয়ান্' ক্রম চলিতেছে। কোন এক ব্যূঢ়প্রসঙ্গে (with respect to any restricted and relative analysis), যেটি, 'প্রমা'রূপে গ্রাহ্য, সেটি সাপেক্ষপ্রমা। এইজন্য, ব্যাপকভাবে (বহির্বিজ্ঞানকেও লইয়া) বলা হইল যে—যোগ্যত্বে যুক্তরূপে স্থাপিত করিয়া দেয় যে (আন্তর) বৃত্তি, সেটি প্রমা। কার সম্বন্ধে যোগ্যত্ব, তাও বলা হইয়াছে। আস্তিক দর্শনগুলিতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এ তিনের প্রমাজনকত্ব একরকম (যদিও বৈশেষিক একটু যেন

'চাপা গলায়') সকলেই মানেন। এ সব লইয়া তর্কেরও অন্ত নেই। তাতে আমাদের কাজ কি? বেদশব্দের (মন্ত্রের বিশেষতঃ) প্রামাণ্য চূড়ান্ত— 'রবেরিব রূপবিষয়ে'। এটিকে 'প্রত্যক্ষ'ও বলা হইয়াছে। জপাদিসাধনে এই প্রত্যক্ষ-প্রমার ভূমিতে প্রথমে যোগ্য, মধ্যে যুঞ্জান, শেষে যুক্ত (যুক্ততর-যুক্ততম) হইতে হয়। সুতরাং জপসাধন প্রমার সাধন। যেটি ব্যূঢ়স্থাপিত তাকে বল 'তথ্য', আর নির্ব্যূঢ়স্থাপিত 'তত্ত্ব'। প্রথমে, গুরুশাস্ত্রাদির 'অন্বয়ে' তথ্যাশ্রিত করিয়া, অন্তে তত্ত্বাশ্রিত করিতে হয়। প্রথমটি মুখ্যতঃ উপায়াশ্রয়, শেষেরটি উপেয়াশ্রয়। উপায়াশ্রয় সহকারে উপেয়াশ্রয়ে অস্থাপিতের সংস্থাপিতত্ব। যোগ, জ্ঞান, রস, তিনভূমিতেই এই প্রমাসাধনটি অপ্রমাদে করিয়া লও। 'অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্'।

সেই মূলনিরূপক শূন্য (আরম্ভ-অবসানভূমি)-টি ঠিক রাখিয়াই ঐ অন্বীক্ষাটি অস্থাপিত-স্থাপনে লাগাইতে হইবে। এমন কি, রসভূমিতেও তাই। যেমন, প্রাকৃতকামগন্ধের অবসানে কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ (মৃগমদ আর নীলোৎপলের সঙ্গে তুলনা দিতে গিয়া রসকবি যেখানে লাজে 'জিব কাটিয়া' বসেন)। ভাল, কিন্তু, 'অন্বীক্ষা' কেন? এতে যে যুক্ত আর শিষ্ট, দুয়ের সমন্বয়টি ঘটিয়া যায়। যেটি 'যোগে' আসিল, আর যা 'বিয়োগে' গেল (শিষ্ট, remainder), সে দুটিই এ স্থাপনরূপ প্রমায় আসিয়া বলে—আর আমাদের বিরোধ নেই, আমরা এইবার মিলিয়াছি। ললিতাসখী শ্রীমতীকে মিলনকুঞ্জে 'পরমযোগে' স্থাপিত করিয়া নিজে সরিয়া গেলেন। বিয়োগে বিধুরা? তা তো নয়, ঐ পরমপূর্ণযোগেই সংযুক্তা। প্রাকৃতকামের কৃষ্ণকামে ('লৌল্যে') simple eliminationটি নয়, perfect sublimation. অপরাপর ভূমিতেও এটি মিলাইও। বিজ্ঞান, গণিতাদিও আপন আপন ভূমিতেও এই 'প্রমা' এবং 'প্রমাণ'কে ঠিক 'আপনার মতো' করিয়া পাইলেন। দৃষ্টান্তে যাইলাম না।

১৯। শূন্যমুপেক্ষ্যবৃত্তিত্বমুদাসীনত্বম্॥

শূন্যকে 'উপেক্ষা' করিয়া যে বৃত্তি, তাকে বলে উদাসীন।

এখানে 'উপেক্ষ্য' পদটি তাৎপর্য্যবিভ্রমে না পাতিত করে দেখিও। 'উপ' এই উপসর্গের সামীপ্যাদি বৃত্তি আছে। সুতরাং সমীপস্থ বা তটস্থ হইয়া (দৃশ্যে এবং ভোগ্যে পাতিত ও লিপ্ত না হইয়া) যে ঈক্ষণ, সেটিও উপেক্ষণ বা উপেক্ষা হইতে পারে।

এই পাতিত্য বা লিপ্ততাও নানাভাবে হইতে পারে। মুখ্যতঃ এ দুটিকে তল, লম্ব এবং বেধ, এ তিনের সম্বন্ধে ধরা যাইতে পারে। যে 'তলে' বিষয় আছে, তুমিও সেই তলে পাতিত; অথবা, কোন উর্দ্ধতন বা অধস্তন তল থেকে তাতে পাতিত; আবার, সে বিষয়টি তোমাকে, অথবা বিষয়টিকেই তুমি 'বিদ্ধ' করিতেছে বা করিতেছ। এসবের দৃষ্টান্ত বাহিরে ও ভিতরে সহজেই মিলিবে। জপে তলবৃত্তিতা যখন, ধর, স্থূলেই ব্যাপার চলিতেছে। স্থূল জপ করিতে করিতে কোন স্থূল শব্দ শুনিলে, চিত্ত তাতে গেল। মধ্যমায় গিয়াছ, নাদও শুনিতেছ, চিত্ত তাতেই আছে। তা থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্থূলে আসিলে। বেধ-এর দৃষ্টান্তও প্রচুর। এখন, উদাসীন ভাবটি কি?

তলাদি ঐ তিন অবস্থান সম্পর্কেই পাতিত্য বা লিপ্ততার স্থলে যদি কেবল সামীপ্য বা তাটস্থ্যে স্থিতিটি ঘটান যায়, তা হইলে 'উপেক্ষণ' হইল। লিপ্তত্ব, পাতিতত্ব এবং বিদ্ধত্ব—এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ঐ তিনটি সম্বন্ধে ব্যবহার কর। এ তিনকেই তাদের অবসানভূমিতে (শূন্যে) লইয়া, দৃশ্য-ভোগ্যাদি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সামীপ্য বা তাটস্থ্য ভূমিতে অবস্থান করায় উদাসীনভাব। চলচ্চিত্রের ছবি দেখার মত। তাতেও ঠিক উদাসীনভূমিতে স্থিত হইতে গেলে, আপন দেহাদি সঙ্ঘাতটিকেও ঐ ছবির সামিল করিয়া লইতে হয়। বিশেষ করিয়া, আপন চিত্তে যে সব বেদনামাখা ছবি উঠিতেছে, সেগুলো। অনাসক্ত ভূমি থেকে 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' ভূমি পর্যন্ত শ্রুতির সেই অপর সুপর্ণটিকে ('অনশ্নন্' ইত্যাদি) মিলাইতে হয়। অথচ, এই উদাসীন উপেক্ষণে দৃশ্য-ভোগ্য-প্রপঞ্চ অথবা তাদের যেটি ভান, সেটি মুছিয়া যায় নাই। বরং, তাদের যেটি 'রস', যাহা 'মধু'; সেটির শুদ্ধ সম্পূর্ণ 'সন্দোহ'টি সম্ভাবিত হয় এই ভূমিতেই। গোপাল-তাপনীতে শ্রীকৃষ্ণ তাই না 'ব্রহ্মচারী', আর দুর্বাসাও উপোসী! খাঁটি বৈরাগী না হইলে তো যথার্থ অনুরাগী হওয়া যায় না। রসে যেটি অপ্রাকৃত, চিন্ময় ভূমি, সেখানেও এই পরমসামীপ্য বা তাটস্থ্য ভাবটি আছে। 'মজিয়াও মজি নাই' এই ভাবটি।

এইবার, বিজ্ঞানাদি সকলকেই ডাকিয়া আর প্রকারে দেখ।

স্পন্দদ্বন্দ্বৌ তথা স্যন্দ ইতি লিঙ্গৈর্নিরূপিতম্।
শূন্যমুপেক্ষ্যবৃত্তিত্বমৌদাসীন্যমিতীরিতম্।
ব্যতীত্যবৃত্তিতা-কল্পা নৈব সোপেক্ষ্যবৃত্তিতা॥ ১০৩

স্পন্দ, দ্বন্দ্ব এবং স্যন্দ, এ তিনের কথা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। Principles of Vibration, Polarity and Flux—VPF. প্রণবে, অ=স্পন্দ; অ-ম=দ্বন্দ্ব; উ=স্যন্দ। এখন, এই তিনটি লিঙ্গ (index) লইয়া শূন্যের (আরম্ভ-অবসানভূমির) সন্ধান কর। যথা, প্রণবজপে আরম্ভেও বিন্দু, অবসানেও বিন্দু। এইভাবে নিরূপিত যে শূন্য, তাতে সামীপ্যে বা তাটস্থ্যে অবস্থানকে ঔদাসীন্য বলে। শূন্যেই একান্ত স্থিতিতে ঐ চলচ্চিত্রটিই অবসানে শেষ হইয়া যায়। কাজেই, উৎ + আসীন ভাবটিই থাকে না। এইজন্য, সামীপ্য (উপ)। চিত্রটি রহিয়াছে এবং চলিতেছে, কিন্তু আমি তার যেটা আরম্ভ ও অবসানভূমি তার 'নিকটেই' রহিয়াছি। জপ করিতেছি বা চলিতেছে, কিন্তু বিন্দু-বিচ্যুত হইয়া নয়। উর্দ্ধ্বরেতাঃ, উর্দ্ধ্বস্রোতাঃ ভূমিটি আসা চাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি স্থলেও, ঐ তিনটিকে (অবাঞ্ছিত) যথাসম্ভব উদাসীনভূমিতে (a background or context of unprejudiced neutralityতে) আনিতে হয়।

এই যে উদাসীনভূমির কথা হইল, এটি 'ভূমা' সূত্রের 'ব্যতীত্য বৃত্তিতা' ঠিক নয়। তৎকল্পা—approximation, কিন্তু ঠিক তাই নয়। এই বিভেদটি ভাবনা করিও। উদাসীনভূমিতে ব্যবহার্যতা সম্ভব, ভূমাভূমিতে সেটি নেই। 'উপ' শব্দের অপরাপর অর্থ লইয়াও 'উপেক্ষ্য' বুঝিও। যেমন, উপকার, উপবন, উপদেশ ইত্যাদিতে। উভয়স্থলেই transcendence, কিন্তু বিলক্ষণতা আছে। দ্রষ্টৃ, কর্তৃ, ভোক্তৃ, নিয়ন্তৃ, নির্বাহয়িতৃ—এসব ভাবেই উদাসীনতা বাধিত নয়। এইজন্য— 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা' ইত্যাদি। এখানে দ্রষ্টৃত্ব, ভোক্তৃত্ব নয়।

২০। শূন্যং প্রতীক্ষ্য বৃত্তিত্বং নির্ব্বাচ্যত্বম্॥

শূন্যের প্রতীক্ষায় যে বৃত্তিতা, তাকে বলে নির্বাচ্যতা বা নিরূপণীয়তা—The state of being definable and specifiable.

কিং নির্ব্বাচ্যমনির্ব্বাচ্যং বেতি বিকল্পনাস্থিতৌ।
শূন্যং প্রতি নিধায়াস্থাং কুরুধ্বমধ্বনিশ্চয়ম্।
নিরূপ্যমাণতাধর্ম্মাবচ্ছেদিকেয়ং হি শূন্যতা॥ ১০৪

কোনটি নির্বাচ্য বা নিরূপণীয়, আর কোন্‌টি নয়, এরূপ বিকল্পনা বা সংশয়ের অবকাশ স্থলে কি করিবে? ভাবিয়া দেখিও—এমন কোন স্থল বা ভূমি আছে কি না, যেটি নিঃসংশয়ে বলে—এইতো আমি ধ্রুব নিরূপকভাবে আছি (যেমন, রাত্রিকালে অনন্তসাগরবক্ষে পোতের পক্ষে ধ্রুবতারা), আমাকে পাইয়াই সকলেরই নিরূপ্যমাণতা (অর্থাৎ, পূর্বাদি দিকের ঐ দৃষ্টান্তে) সম্ভাবিত হয় (নিরূপ্যমাণতাধর্ম্মাবচ্ছেদিকা): সুতরাং, আমাতে 'আস্থা' নিধান করিয়া নিরূপণাদির 'অধ্ব' (way, method—ঋতাধ্ব) নিশ্চয় করিয়া লও। সকল অনিশ্চয় স্থলে আমাকে নিশ্চায়করূপে আগে মিলাইয়া লও। গ্রহগুলি কোন্ বর্ত্মে পাক দিতেছে? এখানে কোন উৎক্ষিপ্ত বস্তু (projectile) কোন্ বর্ত্মে চলিতেছে? উত্তর দিতে গেলে, ঐ নিশ্চায়ক শূন্যটিকে (ফোকাস্ ইত্যাদি রূপে) মিলাইতে হইবে। একটা ধ্রুব রেখা আঁকিয়াছ, তবু প্যারাবোলা যে সচল বিন্দুর ঋতাধ্ব (লোকাস্), সে বলে—শুধু ওতে হবে না, একটা স্থির বিন্দুও বসাও। তবে আমি দুয়ের সঙ্গে দূরত্বটি একই রাখিয়া চলিব ইত্যাদি। আমাদের লক্ষণে শূন্য=শুধু ধ্রুব বিন্দুটি নয়। এটি কত বড় ব্যাপক সংজ্ঞা, তা দেখা গিয়াছে। এ দৃষ্টান্তে, ঐ ধ্রুব বিন্দু, ধ্রুব রেখা, ধ্রুব তল বা আধার, এবং ধ্রুব অন্বয় (সমদূরত্ব), এই চারি ধ্রুব মিলিয়া ঐ প্যারাবোলার নিরূপ্যমাণতা-ধর্মাবচ্ছেদিকা শূন্যতা; অর্থাৎ, ঐ কার্ভের আরম্ভ এবং অবসানের যে ভূমিটি নিয়ত এবং নিশ্চিত আছে। গণিতে Equation দিয়া এই নিরূপ্যমাণতাধর্মকে অবচ্ছিন্ন করিয়া দেখান হয়।

এখন, অধ্যাত্মক্ষেত্রেও এই অবচ্ছেদক বা নিশ্চায়কটিকে মিলান চাই। নচেৎ, সবই আন্দাজি, ধোঁয়াটে। জপে (যেমন, তারচক্রে) বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু, এভাবে আরম্ভ অবসান হইতে গেলে নাদের ঐ সূক্ষ্মভাব বিন্দুটিকে নিরূপক শূন্যরূপে (যথাসম্ভব) পাইতে হয়। যে কোন নির্বচনস্থলেই এই 'শূন্যং প্রতীক্ষ্য বৃত্তিতা' আবশ্যক। যেমন, রোগে জ্বরের আরম্ভ ও অবসান স্থলটি ঠিক পাওয়া চাই (৯৮°), যেটিকে ধ্রুবে রাখিয়া জ্বরের ওঠা-নামার চার্ট আঁকিবে। সঙ্গীতে ধ্রুবে পরদা বাঁধিয়া লইতেও হয়। জপে গুরু যে ধ্বনি, যে ভাব ধরাইয়া দিয়াছেন, প্রাণের, হৃদয়ের মূল তারটিকে সেই ধ্রুবেই বাঁধিয়া জপ-কীর্তনাদি সাধিতে হইবে। ভূমা যিনি, পূর্ণ যিনি, বিন্দু যিনি, তিনি এই অনিরূপ্য-নিরূপক অনিশ্চেয়-নিশ্চায়ক শূন্যরূপেই আমাকে 'কৃপা' করিতেছেন। এই শূন্যে (রন্ধ্রে) 'সোঁ' করে পরমপুরুষটি ফুকার

দেন, তাই না পূর্ণ ধরেন পরম আলাপনের 'পোঁ', আর ভূমা রাখেন পরম আস্থায়ীর 'ভোঁ'! কারিকায় 'আস্থাং নিধায়' অংশটিতে ভাবনা দিও। প্রণবে, ভূমা বলেন—আমার আবার ঠাঁই কি, তবে ঠাঁই দিতে হয়তো দাও কলাতীতে। পূর্ণ বলেন—আমি তো সবেই; তবে, বেশ, কলাশক্তিতে থাকলাম। শূন্য বলে—আমিই বা কি কম! তবু, না হয়, ঐ বিন্দুতে বসলাম।

এইবার, 'বস্তু' কাকে বলে—

২১। সর্ব্বসাপেক্ষত্বাশ্রয়বিন্দুত্বব্যাপকবৃত্তিত্বং বস্তুত্বম্।।

বিন্দুত্ব (The Fundamental 'Point' or Basic 'Pointness') আশ্রয় করতঃ নিখিল সাপেক্ষ ভাবটি (universal tissue of relations or relatedness) রহিয়াছে। এই বিন্দুত্বকে ব্যাপিয়া বর্তমান হওয়াকে বলে 'বস্তু' (the Thing-as-such)। অর্থাৎ, বস্তুটি কি তা জানিতে হইলে, সে জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঐ বিন্দুত্ব পর্যন্ত (তার কম নয়) যাওয়া চাই। এ বিন্দুত্বটি কি বস্তু, যে অবধি গিয়া তবে যে কোন বস্তুর বস্তুত্ব ঠিক হইবে? বিন্দুসূত্রে যে বিন্দু লক্ষিত, সেটি বিন্দুভাবের 'পরমতা'। শূন্যকেও তো নিরূপক বিন্দুরূপে ভাবনা করা হইয়াছে। জপে নাদের যে সূক্ষ্মভাবটি মেলে, সেটিও বিন্দু। পরম বিন্দুকে এইভাবে আরোহ-অবরোহ বা 'মূর্চ্ছনায়' বাঁধিয়া, 'পরোবরীয়ান্' ক্রমে তাঁর পরমতায় পৌঁছিতে হয়। সাধনশাস্ত্রে এই দস্তুর। বিন্দুসূত্রে যে বিন্দুত্ব, সেটি বিন্দুস্বরূপ; আর, এস্থলে যে বিন্দুত্ব, সেটি বিন্দুজাতি বা বিন্দুগোত্র। বর্তমান সূত্রে সে গোত্রেরও অবম বা মধ্যমে নয়, আবার পরমেও নয়, কিন্তু তটস্থ-পরমে সর্বসাপেক্ষতাশ্রয়রূপ যে পরমকল্প, পরমপ্রতিভূ বিন্দু, সেখান পর্যন্ত; অর্থাৎ, যে কোন পদার্থের সর্বসাপেক্ষতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে ব্যষ্টিত্ব ও ব্যক্তিত্ব, তার আশ্রয়, কিনা, কারণ বা বীজ পর্যন্ত গতি লক্ষিত হইয়াছে। জড়ে হোক, অথবা প্রাণমনের ভূমিতেই হোক, যে কোন পদার্থ (ভাব, আকৃতি, নাম) এক এক 'ব্যষ্টি' ভাবে রহিয়াছে। সে ব্যষ্টির অবশ্য 'বীজ'টিও আছে। জড়াণুতে সেটি Nucleus, প্রাণীতে Germplasm, চেতনে 'অহং', আকৃতিতে ব্যক্তিত্ব। ব্যূঢ় নির্বচনের জন্য, এদের প্রত্যেকটিকে পাদে, মাত্রায়, কলায় এবং কাষ্ঠায় পরিমিত বা পরিমেয় (measured or measurable) সাপেক্ষ ভাবিয়া লই। নতুবা, ব্যবহারে নির্বচনটি ঘটিয়া উঠে

না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তার সম্বন্ধজালটিকে দরকার মত গুটাইয়া ছোট করিয়া লইলেও, সে জাল বিশ্বভুবনজাল। একটা রেণুও ঐ নিখিলের সাথে আপনাকে না জড়াইয়া নেই, থাকা অসম্ভব। অথচ, তার নিজত্ব-নিরূপক একটা বীজও তাকে নিখিলের বা অখিলের সাথে সত্তাশক্তি-ছন্দঃ-আকৃতিতে অচ্ছেদ্য-গ্রথিত করিয়াও 'খিলবৃত্তি', 'ব্যষ্টিবৃত্তি' করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং, ঐ রেণুর 'বস্তু' কি, তা জানিতে, গত শতকের এটম্, অথবা বর্তমানের Nuclear Energy, এমনকি, Wave Mechanics পর্যন্ত গেলেও পর্যাপ্তি হইল না। রেণুটি, আমি যে তার জ্ঞাতা, তার ঠিক বাহিরেও নয়, তাকে বাদ দিয়া ত' নয়ই। প্রাণমন (বিরাট্ ও ব্যষ্টি), দুই তাকে 'আপন' করিয়া লইবে, 'অহল্যা পাষাণী'র রেণুটি হইয়া অসাড় প্রাণহীনতায়, তলহীন অচেতনায় পড়িয়া থাকিতে দিবে না! Mass আর Energyকে শুধু সমীকরণের সূত্রে বাঁধিয়াই ছুটি? বহির্বিশ্বে, আন্তর জগতে শুধুই তো ছায়ার পেছনে কায়া, ছবির আড়ালে বস্তুর সন্ধানই চলিতেছে! জপাদিতেও ফাঁকা রঙ্গীন বুদ্‌বুদের বাজিটিও দেখিতে হয় যে! কিন্তু, বস্তু, বাস্তব কি আর কোথায়? মীমাংসক সম্প্রদায়বিশেষ তো দেবতাদের মান্ত্রীতনু ছাড়া (শাব্দীতনুও বটে), দর্শনাদিপ্রত্যক্ষযোগ্য অন্য তনু মানিলেন না। তাতে বস্তু-বাস্তবটি বাদ গেল, না, গেল না? ভক্ত-সাধকেরা সে 'বাদে' প্রমাদই গণিবেন। যাই হোক্, ছায়া-বুদ্‌বুদাদিও বস্তুকে একান্ত বর্জন করিয়া ত' নেই—শুক্তিরজতাদি স্থলে রজতাদির 'অনির্ব্বচনীয় উৎপত্তি' ভাবিলেও নেই। আমাদের লক্ষ্য হইল দর্শনীয়-দর্শন, দার্শনিক মর্শনটি নয়।

যথোর্ণনাভস্তথাহি বিন্দুঃ
সূতে চ ধত্তে চ নিসর্গজালম্।
ব্যাপ্নোতি বিন্দুমভিতশ্চ জাল
মমেয়বৃত্তি স্বয়মেব বস্তু॥ ১০৫

যেমন উর্ণনাভ, তেমনি বিন্দু এই দেশ-কাল-নিমিত্তাদিতে বিস্তারিত নিসর্গজালটি আপন 'নাভি' থেকে প্রসব করে, আবার সেটি ধারণাদি ('গৃহ্নতে চ') ও করে। এস্থলে, 'বিন্দু' বলিতে পরম নয়, কিন্তু পরম তটস্থ পরম গোত্রীয় বিন্দু।

পরম সম্বন্ধে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবটি ঠিক যায় না। এখন, ঐ নিসর্গ-জাল (cosmic relatedness), সেটি 'অমিত' (unmeasured, unended) রহিয়াই যায় (বহির্বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই)। আর, যেটি বস্তু, সেটি কেবল 'অমিত' নয়, স্বয়ং 'অমেয়বৃত্তি' হইয়া ঐ বিন্দু (নিসর্গজালের সমষ্টিসাপেক্ষ ব্যষ্টি নাভি) পর্যন্ত ব্যাপিয়া বর্তমান। সুতরাং, বস্তুর জ্ঞান=নিসর্গজ্ঞানের সমষ্টিসাপেক্ষ যে ব্যষ্টি বা ব্যক্তি, সেটির জ্ঞান। অর্থাৎ, 'ক' অখিল সাপেক্ষতায় স্থিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে খিলবৃত্ত বা ব্যষ্টিবৃত্তরূপে নিজেকে পাইল, তার জ্ঞান। যেমন, ইলেক্ট্রনাদি, প্রোটোপ্ল্যাজমাদি, 'মাইণ্ড স্টাফ্' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবস্তুতে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি? না. ব্রহ্মবস্তু=পূর্ণব্রহ্ম=ভগবত্তা, এই অভেদ সমীকরণটি ভাবিয়া দেখ। নির্গুণ, নির্বিশেষ ভাবের এবং সগুণ সবিশেষ ভাবের জন্য, সূত্রে ঐ বিন্দুত্বকে 'পরম' ভাবনা কর। এতে শূন্যত্ব পূর্ণত্ব একত্র। সর্ব্বং সাপেক্ষতাকে একান্ত শূন্য কর, নির্গুণ ভাব। একান্ত পূর্ণ কর—ভাব সবই তিনি—সর্ব্বংব্রহ্মৌপনিষদম্—এবং সবেতে পূর্ণ বিন্দুরূপে অনুপ্রবিষ্টও তিনি, তিনি 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্', তা হইলে সর্বসাপেক্ষটি একান্ত পূর্ণে আসিল (বিশিষ্টাদ্বৈতে চিদচিদ্ জগৎ তাঁর শরীর; দ্বৈতাদ্বৈতে—অক্ষর, ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ; ইত্যাদি)।

এইবার বস্তু থেকে 'দ্রব্য'।

২২। তস্যৈব প্রমেয়তাবচ্ছিন্নত্বে সতি সর্ব্বসাপেক্ষতাবচ্ছেদক-সংব্যূঢ়ত্বাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বং দ্রব্যত্বম্॥

বস্তু যদি 'প্রমেয়' (প্রমাণের যোগ্য) রূপে বিশেষিত হয় (বস্তুমাত্রই তা নয়), এবং প্রমেয় রূপে সেটি যদি 'সংব্যূঢ়' ভাবে (পূর্বোক্ত) সর্বসাপেক্ষতা (universal relatedness) টিকে অবচ্ছিন্ন করতঃ (limiting, restricting, conditioning), তদ্দ্বারা (সংব্যূঢ়তা দ্বারা) বিশেষিত হয়, তবে বস্তু হয় দ্রব্য। সংব্যূঢ়তা = Compact and stable co-inherence. ধর, একটা হিলিয়াম এটম্। এতে চারিটি ইলেক্ট্রন এক (আপেক্ষিক) ধ্রুব সংহতরূপতা পাইয়াছে; কোন প্রাণীর জারম্‌সেল, ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত সর্বক্ষেত্রে। বস্তু দ্রব্য হইতে গেলে—(ক) প্রমেয় হইবে; (খ) প্রমেয়টি

'সংব্যূঢ়' হইবে; (গ) ঐ সংব্যূঢ়রূপে সেটি সর্বসাপেক্ষতাটিকে (the tissue of cosmic relations) 'বিশেষ' করিয়া স্বানুরোধসম্বন্ধ করিয়া লইবে। কেবল, মূর্তদ্রব্য নয়, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা—এদেরও দ্রব্যত্ব এই লক্ষণে স্থাপন কর। লক্ষণে ঐ অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভাবটি আছে বলিয়া ব্রহ্মবস্তু ব্রহ্মদ্রব্য হয় না; অথবা, 'ভূমৈকরসঃ' যে রসবস্তু, সেটি রসদ্রব্য হয় না। Spinoza র Substance = দ্রব্য, ইহাও সরাসরি নয়।

প্রমেয়তাস্তি দ্রব্যে সমস্তে
সাপেক্ষতাপি দ্রব্যে প্রসক্তা।
সংব্যূঢ়তা চ তস্মিন্নিধেয়া
প্রমেয়মাত্রতা দ্রব্যতা ন॥ ১০৬

প্রমেয় সমস্ত দ্রব্য বটেই। কিন্তু কেবল প্রমেয় হইলেই (প্রমেয়মাত্রতা) দ্রব্য হয় না। পূর্বোক্ত সর্বসাপেক্ষতাধর্ম, এটিও দ্রব্যে প্রসক্ত (incidental to its being a knowable or definable substance)। এ দুটি ব্যতীত তৃতীয় আর এক লক্ষণও চাই—সংব্যূঢ়তা (নিজেকে কোন নির্দিষ্ট সংহতিতে ক্ষেম বা ধরিয়া রাখা)। এই শেষেরটিকে কেহ নির্দিষ্ট আকৃতি (Pattern) বলিবে, কেহ বা ধরা-ছোঁয়া না দিয়া বলিবে— 'Permanent possibility of characteristic reactions'. মীমাংসক বলিবেন—এই 'মন্ত্র'ই ইন্দ্র বা বরুণের দ্রব্যত্ব (substantiality); মন্ত্রকে যন্ত্র-তন্ত্রের সঙ্গে লইয়াও কেহ বা কথাটি বলিবেন। বিচার এখানে অনাবশ্যক। তবে, 'সংব্যূঢ়' শব্দটিতে ধ্যান দিও। জপে বাক্, চিত্ত ও প্রাণ সংব্যূঢ়তায় আসিলে তবে মন্ত্রটি হয় সমর্থ, অর্থাৎ, মন্ত্রই হইবে দ্রব্য, এবং দ্রব্য পরিশেষে হইবে বস্তু।

কিন্তু সংব্যূঢ় হইতে গেলে 'ধর্ম্ম'এর অপেক্ষা আছে তো? মিছরীর জল যেভাবে 'দানা বাঁধে', নুণ বা ফট্‌কিরির জল তো সে ভাবে সে আকারে বাঁধে না।

২৩। সংব্যূঢ়তাসংগঠিতত্বাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বং ধর্মত্বম্॥

সংব্যূঢ়টিকে সংগঠিতভাবে বিশেষিত করতঃ (analytically) দেখিলে ধর্ম। সমগ্রভাবে (যেমন, একটা বীজ, মনের কোন এক ভাব) দেখিলে (totally apprehended and appreciated), সেটি সংব্যূঢ় (a system, organic unity, etc.); 'ভাঙ্গিয়া' দেখিলে, এবং পাদমাত্রাকলাদির পরস্পর 'ধৃতি', অথবা, যোগ-ক্ষেম, গতি-স্থিতি, হরণ-পূরণ-নিয়ামক, স্থিতিস্থাপক ভাবে দেখিলে, 'সংগঠন'। এখন, ধর্ম করে, সর্বক্ষেত্রেই, সংগঠন। এ 'ধর্ম' মানে রিলিজন্ শুধু নয়, আর, অধ্যাত্মক্ষেত্রেই এটি সীমাবন্ধ নয়। (Principle of cohesion, coordination, co-operation, equipoise, balance)। 'যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'—এও লক্ষণে আসিবে।

সংব্যূঢ়তাং সমাশ্রিত্যোপকুর্ব্বাণাঃ পরস্পরম॥
সহগাঃ সমমন্ত্রাশ্চ সমতন্ত্রাঃ সমন্বিতাঃ॥
বিভাগশো হি ধর্মাঃ স্যুরবিভাগেন ধর্মতা।
জনিসূত্রক্রিয়াসূত্রাকৃতিসূত্রৈশ্চ সূত্রিতা॥ ১০৭-১০৮

সংব্যূঢ় হওয়াতে ধর্মের অপেক্ষা আছে। অপেক্ষিত ধর্ম আবার ঐ সংব্যূঢ়কে সমাশ্রয় করিয়াই তার সংগঠিত রূপটি দেখাইয়া থাকে। অন্যোন্যাশ্রয়, কিন্তু স্বাভাবিক। যেমন, চক্ষু আর তার ধর্ম। চুম্বক আর চৌম্বকত্ব। মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র আর তাদের ধর্ম। দ্রব্যভাবে (structurally as an organic unity) দেখা, আর ব্যাপারভাবে (as functional co-ordination and unity) দেখা। এই দুই রকমে দেখা আবার 'সমাসে' ও 'ব্যাসে' সাধিতে হয়। এদেরও পরস্পরাপেক্ষা। সমাস-ব্যাস দুই প্রকারেই দেখিলে দেখা যায় যে—যেটি সংব্যূঢ়ভাবে বিদ্যমান, তার অঙ্গ বা অবয়বগুলিও যেমন ধারা পরস্পরের উপকারক ভাবে আছে (উপকুর্ব্বাণাঃ পরস্পরম্), তাদের সংগঠন-সংঘটক ধর্মগুলিও সেইভাবে আছে। ধর্মগুলির এই উপকুর্ব্বাণ রূপটি কেমন? (১) তারা সহগ, অর্থাৎ, সংব্যূঢ়ের যেটা সমগ্রতা (organic or structural integrity), সেটি তারা সহগামী ও সহকারী হইয়া (congruently and coefficiently) বজায়ও রাখে (যেমন, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি); আবার, তাদের তাদের ক্রিয়াবৃত্তির যেটা সমচ্ছন্দভাব (functional order and harmony), সেটাও তারা বাহাল রাখে। 'সহগ' বলিতে এই দুটিই বুঝিতে হইবে। জপে যেমন কোন মন্ত্র (ধর, গায়ত্রী), আর ব্যাহরণ-অনুস্মরণ। জপটি ধর্মে স্থিত আছে মানে ঐ দুটিতে

বৈরূপ্য-বৈকল্য নেই। যথা, তারচক্রে 'মেরু'টির লঙ্ঘন হইতেছে না, কাজেই প্রাণশ্রান্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। বিজলী বাতিতে circuit -টি ঠিক আছে, current-এর leakage ইত্যাদি ঘটিতেছে না।

এই সহগত্ব আবার দুইভাবে বিশ্লেষপূর্বক দেখিতে হয়। প্রথমভাবে, তাদের সমমন্ত্র, সমযন্ত্র এবং সমতন্ত্র হওয়া চাই। কেন, কি আকারে, কি ভাবে?—এ তিনের উত্তর ঐ মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র। এদের কথা বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, তাদের এক Formula বা Equation -এ আসা চাই; তাদের লেখ বা Curveটি একই গোষ্ঠী (family) ভুক্ত হওয়া চাই, এবং তাদের মধ্যে গণিতে যাকে congruity, symmetry, homology ইত্যাদি বলে, সে সব লক্ষণ থাকা চাই। আমরা যাকে পাদমাত্রাদি বলিয়াছি, তাদের লেখ এক সমানাধিকারে (common type or patternএ) স্থিত হওয়া চাই। আর, সমতন্ত্রতা (functional and reactional sympathy and alliance)—এটিও চাই। কারিকায়, 'সমন্বিতাঃ' পদে সমযন্ত্রতার নির্দেশ বুঝিবে। জপাদিসাধনে অধিকার, মন্ত্রাদি চর্যা,—এসব নিরূপণে এই ধর্মলক্ষণগুলি বিশেষভাবে ভাবনীয়। কোনও স্থলে 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ' (antipathy ইত্যাদি) ঘটিলে, তখন ধর্মের 'অভ্যুত্থান'টি পরমকৃপার ঐ ত্রিমূর্তিতেই সাধিত হওয়া আবশ্যক।

এইগুলি বিভাগশঃ কিনা, analytically, লইলে বলা যায়, ধর্ম; আর, অবিভাগশঃ লইলে—ধর্মতা। পুনশ্চ, ধর্মকে জনিসূত্র, জননসূত্র এবং জাতসূত্র (শেষের দুটি আকৃতি ও ক্রিয়া)—এই ত্রিসূত্রী রূপেও দেখিবে। যজ্ঞোপবীতে এই ত্রিসূত্রী। প্রথম সূত্র বলে—এ স্থলে সব কিছুর এক সামান্য নিয়ামকভাব (theme and formula) রহিবে। দ্বিতীয়টি বলে—সমস্ত কিছুর এক সামান্য নিয়ত আকৃতি (common basic plan or pattern) থাকিবে। তৃতীয়টি বলে—সব কিছুর ক্রিয়ায় এক সামান্য নিয়ন্ত্রিততা (common devotion, direction and determination) থাকিবে। কেহ গড়ে, কেহ সেইটাই ভাঙ্গে, ইত্যাদি হইবে না।

তারপর, স্বধর্ম—

২৪। তস্যৈব নাভিনিষ্ঠত্বং স্বধর্মত্বম্॥

ধর্ম যদি 'নাভিনিষ্ঠ' হয় তো সেটি স্বধর্ম।

নাভিকেন্দ্রং সমাশ্রিত্য বৃত্তৌ সংব্যূঢ়তা স্থিতা।
অন্তর্বহিশ্চ সর্ব্বত্র স্থূলে সূক্ষ্মে চ কারণে॥
তন্নাভিনিষ্ঠবৃত্তিত্বং স্বধর্মত্বং হি মন্যতে।
গত্যা স্থিত্যা চ তন্নিষ্ঠা দ্বৈবিধ্যং ভজতে পুনঃ॥ ১০৯-১১০

কোন বৃত্তি সংব্যূঢ়রূপ হইতে হইলে সেটিকে কোনও 'নাভি' সমাশ্রয় করিতে হয়। বৃত্তিটিকে স্থিতিভাবে-ই (static persistence) নাও, আর গতিভাবেই (kinetic performance) নাও, একটা নাভি (Nucleus, Centre, Focus, Origin) তাকে মিলাইতে হইবে। বহির্বিশ্বে অথবা মানসক্ষেত্রে, এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দেখা না যাবারই কথা। সর্বত্র যে 'বিন্দু' অনুপ্রবিষ্ট। স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে সর্বত্র সন্ধান কর— 'নাভিকা পাতা লগাও'। বিন্দু পরমভূমি থেকে কারণে নাভি, সূক্ষ্মে কেন্দ্র, স্থূলে ব্যূহ বা ব্যূঢ় রূপে 'অবতরণ' করিয়াছেন। মধ্যে দুটি সন্ধিরূপও আছে—কারণ-সূক্ষ্মে বীজ, সূক্ষ্ম-স্থূলে কেন্দ্রীণ। সর্বসমেত পাঁচটি। মন্ত্রে—কারণে কলাশক্তি, সূক্ষ্মে বিন্দু-নাদ, স্থূলে হকারাদি বর্ণ। যে কোন পদার্থের কারণরূপা যে নাভি, সেই নাভিনিষ্ঠ যে স্থিত্যাত্মক ও গত্যাত্মক বৃত্তি, সেটি হইল সে পদার্থের স্বধর্ম। সে কারণরূপটি যদি বল 'স্বভাব', তবে সেই স্বভাবনিষ্ঠ ধর্ম (স্থিতি ও গতি) স্বধর্ম। এই নাভি বা স্বভাবটি 'স্বো ভাবঃ'—যেটিকে গীতা 'অধ্যাত্ম' বলিয়াছেন। এস্থলে ভাবটি 'স্ব' থেকে 'আত্মা'কে 'অধিকৃত্য' সম্ভাবিত। It is the core of self-existence and self-activity. স্বতন্ত্রভাবে যদি বিশ্বে কোথাও থাকে তো বিন্দুর প্রতিভূ এই নাভিতেই আছে। এখানে spontaneous, স্বভাব-স্বচ্ছন্দবৃত্তিতা সম্ভাবিত। নাভি থেকে নিম্নভূমিতে আসিয়া এটি কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিত-লুণ্ঠিত হইয়াছে। এইজন্য, 'স্বভাবে চল', সেই Stoic দেরও সূত্র। 'আত্মানং বিদ্ধি', 'সম্বন্ধ'টি জান, ইত্যাদি। জড়ের ক্ষেত্রে, রেডিও একটিভ্ দ্রব্যে ঐ 'স্বোভাবঃ'টির ছায়া লক্ষিত হয়। প্রাণভূমি ও মানসভূমিতে mechanistic ব্যাখ্যা নিরস্ত হয় নাই, কিন্তু জড়ই যে নিজেই 'ভণ্ডুল' করিয়া দেবার যোগাড়ে আছে। নাভিটাভি সবই আগন্তুক কারণে, একের স্বভাবটি বহুর বহুভাবের সমষ্টিভাব—এসব পক্ষ সহজে হটিবে না। হটিতে হবেও না। স্বভাব পরভাবের 'বাজি' (race) অফুরান চলিবে। কারণেই তার নিদান আছে।

তবে, বস্তুতঃ যেটিই হোক্ (যেটি, সেটি এখানে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে), ব্যবহারতঃ এবং কার্যতঃ নাভিনিষ্ঠ গতি ও স্থিতি দ্রব্যমাত্রে না মানিয়া উপায় নেই। একটা রেণুও বলে—'এই আমি স্থির আছি তো আছিই, কেউ না চালাইলে চলিব না; আবার, চলিলে কেউ না থামান পর্যন্ত থামিবও না, মোড়ও ফিরিব না'। সমস্ত কিছুর মধ্যে intrinsic, innate, original বলিয়া একটা কিছু কার্যতঃ না মানিয়া চলিতেছে কৈ!

জপাদিতে প্রত্যেকটি বীজ বা নামের ঐ নাভিনিষ্ঠ ধর্ম বা স্বধর্ম আছে। শ্রীগুরুর আছে ইত্যাদি। 'নিষ্ঠ' বলিতে নিতরাং স্থিতঃ—ব্যভিচারী, অনিয়ত, আগন্তুক অধ্যস্ত নয়। স্থিতি আর গতি, দুইভাবে এটি দেখা হইয়াছে। স্থিতিতেও একপ্রকার গতি—স্থিতি-স্থাপকতা (cosmic elasticity)। এর ফলে, স্বভাবে কোনও 'অভিঘাত' স্থলে (impact ইত্যাদি), সেটি কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতাদিবৎ হইলেও স্বভাবে ফিরিয়া আসে—যথা, বহিরঙ্গ সঙ্গ সত্ত্বেও আপন শুদ্ধভাব। আর, গতির বেলা নিষ্ঠা দুই প্রকারের—আকর্ষণী ও বিকর্ষণী। এই বিকর্ষণী (যথা, রসে মান, বিরহ ইত্যাদি) বিরোধে 'কর্ষণী' নয়, 'বিশেষে' কর্ষণী। এই বিশেষটি বিরোধে না যায়! এ সব কথা প্রাণপ্রসঙ্গে বিস্তারিত হইবে।

আর এক কথা। 'স্বধর্ম' যে লক্ষণে আসিল, তাতে সেটি বাদে আর সব ধর্ম 'পরধর্ম' করিও না। ভয়াবহ যে পরধর্ম, সেটি 'স্বমৈত্র' স্থলে নয়, 'স্ববৈর' স্থলেই আসে। অর্থাৎ, কারণে (যথা, সুষুপ্তিতে বা ভাবে), শুধু নাভিনিষ্ঠ যে স্বধর্ম, সেইটি ফুটিল; স্বপ্নে বা জাগরে শুধু সেটি নয়, অপরাপর ধর্মই বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া সে 'সবই' ভয়াবহ নয়, সে সবে ভয়াপহও থাকে; সেগুলি মিত্র। চাতুর্বর্ণ্যের স্বধর্মাদিও বিচার করিও। জাবাল সত্যকাম গোত্র না জানিয়াও গোতমের অন্তেবাসী হইতে পাইলেন; কর্ণ গোত্রটি গোপন করিয়াও পরশুরামের শাপগ্রস্ত হইলেন; ইত্যাদি। এ সবে 'স্বধর্ম'টি কোথায় কিভাবে ফুটিল?

২৫। আদিত্যো নাভির্ভুবনস্য॥

আদিত্য ভুবনের নাভি।

ভুবনস্য সমগ্রস্য নাভিতাদিত্যকল্পিতা।
জগতস্তস্থূষশ্চাপি সূর্য্য আত্মেতি মন্ত্রিতম্॥
পূষা চ নাভিবৃত্তিত্বং দ্বিধা বিশ্বে হি বিশ্রুতম্॥ ১১১-১১২

এইবার, শেষের কয়টি সূত্রে লক্ষণের সাধনে বিনিয়োগটি দেখান হইতেছে। বিন্দুর যে পরমভূমি, সেখানে 'ব্যাস' (differentiation) অথবা 'সমাস' (integration) এ দুয়ের কোনটার অবকাশ নেই। কিন্তু নাভিতে আছে। নাভিতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাব। সমষ্টিভাবটি আবার ব্যক্তিসমূহ সম্বন্ধে 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্'। স্থূলে বিরাট্, সূক্ষ্মে হিরণ্যগর্ভ, কারণে ঈশ্বর। এ তিন পরস্পর ব্যাবর্তক তিনটি বৃত্তের মত নয়। কারণবৃত্তের মধ্যে সূক্ষ্মবৃত্ত, সূক্ষ্মের মধ্যে স্থূল। দেশ-কালের ব্যাপ্তিতেই শুধু এটি নয়। প্রতি পদার্থের কারণভাবটি যে ভূমিতে সব চাইতে বেশী নিবিড় ও নিষ্ঠিত (compact and composed) রূপটি পাইয়াছে, সে ভূমি হইল সেটির পক্ষে নাভি। জড়াণুতে যেমন Nucleus, ভুবনে এরূপ নাভি তো সংখ্যাতীত। কিন্তু নিখিল ব্যষ্টিকারণতার আধার এবং 'কারণত্রয়হেতু' এক অব্যয়ভূমিও অবশ্য আছে। প্রজাপতি সৃষ্টি করেন, কিন্তু পদ্মনাভের নাভিপদ্মে আসীন হইয়া।

এখন ভুবনসম্বন্ধে এই যে নাভি তিনি আদিত্যরূপে বেদাদিতে শ্রুত হইয়াছেন। 'আদিত্য' শব্দ 'অদিতি' বা ছেদহীন অখণ্ড সামগ্রীও বুঝায়। এই 'ভুবনস্য নাভিঃ' আদিত্যকে 'সূর্য্য' এবং 'পূষা' এই দুই দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। বেদমন্ত্রে সূর্যকে চরাচরের 'আত্মা' বলা হইয়াছে। 'আত্মা' বলিতে এস্থলে মূলনাভি। নাভির দুইটি মুখ্যাবৃত্তি—সূতে ও ধত্তে—প্রসব ও বিস্তার, পোষণ ও পালন। প্রথমটি সম্বন্ধে সূর্য, দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে পূষা। Creating and Sustaining। বলা বাহুল্য, আদিত্যের এ দুটি রূপকে স্থূল কোন রূপের সঙ্গে (Solar Mass ইত্যাদি), একান্ত মিলাইয়া ফেলিও না। অণুতে জীবকোষে, মানসে—সর্বত্র আদিত্য ভুবনস্য নাভিঃ। অণুতে nuclear, কোষে metabolic, মনে parapsychic (subliminal and superliminal), এসব নাভিবৃত্তির নমুনা (কারবারি)।

২৬। অদিতিত্বেন তস্যায়নমাদিত্যহৃদয়ম্॥

অদিতিস্বরূপে, অখণ্ডকারণভূমিরূপে (এবং বিশেষতঃ কালসম্বন্ধে) আদিত্যের যে 'অয়ন', সেটি আদিত্যহৃদয়।

'অদিতিস্বরূপ' বলাতে 'হৃৎ' উদ্দেশ করা হইল। সুতরাং, স্থূলে অথবা অন্য কোন সম্পর্কে যদি আদিত্যকে 'অল্প', 'অংশ', 'খণ্ডিত', 'পরিচ্ছিন্ন-পরিমিত' করিয়া দেখ তো, 'হৃৎ'টি রহিল না। 'আদিত্যহৃদয়ম্' নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রে এবং জপে এই অদিতিস্বরূপটি বিশেষ করিয়া ধ্যানে আনা হইয়াছে।

নার্ব্বৌকস্ত্বেন নাভৌ তু বৃত্তিরর্কস্য খণ্ডিতা।
হৃদি স্থিতোঽপি সর্ব্বত্রায়ত ইতি রবির্ব্বিভুঃ॥ ১১৩

নাভিতে বৃত্তিমান্ বলিয়া এটি ভাবিও না যে অর্কের বৃত্তি 'অর্ব্বৌকস্ত্ব' ধর্মে পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত হইয়াছে। 'অর্ব্বৌকঃ' বলিতে দেশ-কাল-নিমিত্তাদি সম্বন্ধে অল্প ব্যাপ্তি। যেমন, সৌরজগতে সূর্য তো ঐখানে আছেন, এখানে নেই, দিবায় আছেন, রাত্রিতে নেই, আপন তাপকিরণাদিতে আছেন, অগ্নি বিদ্যুতাদিতে নেই—এইসব অর্ব্বৌকঃ ভাবনা। অণু সম্বন্ধেও তাই। কোন এক ইলেকট্রন স্পন্দভাবে সর্বত্রই বিদ্যমান, ইত্যাদি। মন সম্বন্ধেও অর্ব্বৌকঃ ভাবনা নিবৃত্তির জন্য হিরণ্যগর্ভ ভাবনা। রবি নিখিলের হৃদি (মর্মৌকঃ) স্থিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র অবাধ-অকুণ্ঠিত গতি (অয়তে), এই জন্য তিনি বিভু (সর্বব্যাপক)। এই 'হৃদি ধিষ্ঠিতম্' অথচ বিভু ভাবটি ভুবনের নাভিস্বরূপ আদিত্যে পরিস্ফুট। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নাভি মূল মহানাভিতে বিধৃত এবং সমন্বিত রহিয়া পরস্পরের সম্পর্কে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যধর্মে অবচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু মহানাভ যে আদিত্য, তিনি বিভু। ওঁ হ্রীঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ—মন্ত্রে তাঁকে জপ ও ভাবনা কর। 'ঘৃণি' বলিতে ভুবনের রেতঃ বা ওজঃ স্বরূপ (ভর্গঃ যার শ্রেষ্ঠ রূপ)। 'সূর্য্য' এবং 'আদিত্য' পূর্বেই কথিত। প্রণবে ঘৃণি, 'হ্ র্' বর্ণে সূর্য্য, এবং 'ঈঁ' আদিত্যকে বিশেষভাবে সূচিত করে। বিজ্ঞানে, ঘৃণি = Prime Energy, সূর্য = Nuclear Condensed Mass; আদিত্য = Basic Cosmic Radiation। শরীরে, ঘৃণি = Life Energy (মুখ্যপ্রাণ); সূর্য = Vital Centre for storing and propagating Energy (প্রাণকেন্দ্র); আদিত্য = the Universal Plenum of Life (প্রাণব্রহ্ম)।

২৭। তত্রারনেমিসম্বন্ধেনাগ্নীষোমীয়ত্বমপি।।

সেই ভুবননাভি আদিত্যকে আশ্রয় করতঃ 'অর' এবং 'নেমি' সম্বন্ধ লইয়া 'অগ্নীষোম' এইভাব আসিয়া থাকে।

দিগ্‌বৃত্তিত্বমরত্বেন নেমিবৃত্ত্যা চ চক্রতা।
দিক্ষু বিস্তারয়ত্যগ্নিররস্থো হব্যবাহনঃ॥
যতো হি পৌরুষে যজ্ঞে বিশ্বেঽগুর্জনা জনিম্।
অন্নং ভূত্বা চ সোমেন স্থাপ্যতে নিখিলং স্থিতৌ॥ ১১৪-১১৫

'অর' বলিতে দিগ্‌বৃত্তিত্ব—দিক্‌রূপে অভিব্যক্ত হওয়া (directedness, vectorization)—সূচিত। 'নেমি' বলিতে চক্রবৃত্তিত্ব—কোনরূপ পরিধি বা সীমা (limitedness, boundedness, whence roundedness), ভাবে আসা। নাভি সৃষ্টির সর্বত্রই এই মৌলিক আকৃতিটি (basic Pattern) গ্রহণ করিয়াছে। এ তত্ত্বটি আগে নানাপ্রসঙ্গে ভাবিত হইয়াছে। এখন, অগ্নি বিশেষভাবে 'অর'কে ধরিয়া (অরস্থ) সমস্ত কিছু সত্তাশক্তি দিকে দিকে (দিক্ষু) বিস্তারিত করেন, এবং এই মূলব্যাপারের নির্বাহয়িতা বলিয়াই অগ্নি হব্যবাহন (বহ্নি)। অগ্নিই সমস্ত কিছুতে বিস্তার এবং উন্মেষ নির্বাহক (Expanding and Unfolding *Elan*)। আদি যে পুরুষযজ্ঞ (ঋগ্‌বেদে অথর্ববেদে বিশ্রুত), সে যজ্ঞে 'বিশ্বে জনাঃ' জনি (উদ্ভব, অভিব্যক্তি) পাইয়াছে এবং পাইতেছে (অগুঃ); আদিপুরুষ বহ্নিরূপেই (ছন্দোভিঃ দিক্ষু বিস্তারয়ন্) সে আদি জনিযজ্ঞটি নির্বাহ করিয়াছেন। আবার, স্বয়ং 'অন্ন' রূপ হইয়া (যেমন, ঐতরেয় উপনিষদে) নিখিল জাতকে পোষণ করিতেছেন (পুষ্ণাতি), এবং পোষণ করিয়া তাদের নিজ নিজ স্থিতিতে স্থাপন করিতেছেন। এই স্থিতিস্থাপনটি নেমিবৃত্তিতা। সমস্ত কিছুই নিজ নিজ 'নেমি' বা পরিধিতে বর্তমান রহিতে পারিয়াছে, এবং নিজ নিজ 'কক্ষে' আবর্তন করিতে পারিতেছে, এই অন্নসংস্থা ব্যবস্থাপক সোমের কল্যাণে। সোম তাই সর্বত্র Balancing, Conserving, 'Rounding' Principle. অগ্নি ও সোম দুয়ে অগ্নীষোম রূপে নিখিলের নাভিকে 'অর-নেমি' আকৃতিতে ব্যাকরণ ও বিধারণ করিতেছেন। একটা জড়রেণু থেকে বিরাট্ বিশ্ব পর্যন্ত

সর্বত্র এই যুগ্মকটিকে চিনিয়া লও, এবং আপন জপাদিতেও এঁদের সন্ধান লও। যেমন, অগ্নিমাত্রা ও সোমমাত্রা, ইত্যাদি। গানে রাগের যেটি বাদী স্বর বা ধ্রুব স্বর, সেটিকে নাভি ধরিলে, সংবাদী অনুবাদী স্বর দ্বারা অর-নেমিত্ব নিরূপিত হয়; বিবাদী স্বর সেটি বিদ্ধ করিতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি থাকা চাই। তানে অগ্নি, লয়ে সোম।

২৮। অরেণাদিশো দিশিতি॥

অরত্ব আসিলে যেটি (যথা, নাভি) নিজে 'অদিশ্' (দিগ্‌বৃত্তিত্ব-রহিত—undirected), সেটি 'দিশ্' এই রূপ প্রাপ্ত হয় (become directed or vector)।

দিক্‌শূন্যে যেন দিগ্‌বৃত্তিস্তস্যৈবারত্বমুচ্যতে।
অব্যাকৃতস্য মূলস্য ব্যাকরণং তদাশ্রয়ম্॥ ১১৬

যেটি দিক্‌শূন্য অথবা সেভাবে প্রতিভাত, তাতে দিগ্‌বৃত্তি—এটি এদিকে, উটি ওদিকে, এখন এমুখী, তখন ও-মুখী—এভাবে দিগ্‌বৃত্তি অথবা তার প্রত্যয় হইলে বলা যায় যে, সেটি এইবার 'অরতা' পাইল। মনের কোন বৃত্তি, কিন্তু কোনমুখী তা বুঝিতেছি না। অররূপতা হয় নাই। যেই জানিলাম, পরাক্, প্রত্যক্, গুরু, ইষ্ট, নাদ, বিন্দু, লয়, ইত্যাদি মুখী, সেই অররূপতা আসিল। অর-নেমিতা আসিলে চক্রতা। কিন্তু চক্রমাত্রেই 'চক্কোর' নয়। বিষম ও সুষম ভেদটি আগেই করা হইয়াছে। সুষম চক্র সুদর্শনের কৃপাগোত্র। পরাগাদি ক্রমে মুখটি হইলেই পেষণচক্র, ইত্যাদি। অধ্যাত্মসাধনে এই গুরুমুখীনাদি ভাবটি পরমযত্নে সাধিতে হয়। বিজ্ঞান গণিতাদির ক্ষেত্রেও এই 'অর' -এর খবর সঠিক রাখা চাই—পজিটিভ্, নেগেটিভ্, এঞ্জুলার মোমেন্‌টাম, ইত্যাদি কত আকারে। সঙ্গীতাদি শিল্পে, চিকিৎসাদি ব্যবহারে, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, ঐ 'অরকেই ধর'। সকল দৃষ্টান্ত সমবেত করিয়া এটি নিশ্চিত বলা যায়, যেমন প্রাচীনেরা এবং নবীনেরাও কেহ কেহ বলিয়াছেন, অরকে আশ্রয় করিয়াই যেটি অব্যাকৃত মূল (undifferentiated root or continuum),–সেটির ব্যাকরণ (differentiation and integration, analysis and synthesis) ঘটিয়া থাকে।

সৃষ্টিতে এই দিগ্‌দৃষ্টি বা মুখ-মুখীন ভাবটি গম্ভীর। মূলে যে 'ঈক্ষণ', তাতেই এটি নিহিত। 'দিশ্' 'অদিশ্' শব্দ দুটিকে সকল পার্শ্বেই সংলগ্ন করিয়া দেখিও। বাহ্য ব্যবহারে এবং সাধন ব্যবহারে যে 'যন্ত্র' গৃহীত বা পরিকল্পিত হয়, তাতে কোন নাভি (মন্ত্র বা Principle) কে 'অর-নেমি' আকৃতিতে পাইতে হয়, এবং সেরূপে পাইয়া সেটিকে সমর্থ ও সফল তন্ত্রে কাজে লাগাইতে হয়।

২৯। অকারেণাদিগুকারারেণ দিক্ চেতি॥

অকার দ্বারা 'অদিক্' এবং উকার দ্বারা 'দিক্' সূচিত—ইহাও জানিবে।

অকারেণ হ্যদিগ্‌বৃত্তিমুকারেণাশ্নুতে দিশম।
মকারেণ চ মেয়ত্বমিত্যোঙ্কার ইদং জগৎ॥ ১১৭

প্রণবে যে 'অ' সেটিতে অদিগ্‌বৃত্তি, 'উ' দ্বারা দিগ্‌বৃত্তি, 'ম' দ্বারা মেয়বৃত্তি যথাক্রমে লক্ষিত করিয়া মিলাইও। সর্বস্বরের আদি এবং সর্বব্যঞ্জনের আশ্রয় 'অ' নাভি; এটি মূল থেকেই 'উচ্চারিত'। বৈখরীরূপে কণ্ঠমূল হইলেও, নাভি; আর, নাভিতে উচ্চারিত হইলে, মাতৃকাদ্যাপীঠ মূলাধার। 'উ' ওষ্ঠ্যবর্ণ। এটি অরবিস্তার বা সঙ্কোচ (কূর্মবৎ) ঘটায়। 'ম' অন্তিম স্পর্শবর্ণ (ওষ্ঠ্য)। এটি 'নেমি'রূপে সীমা বা পরিধি দেখাইয়া দেয়। কিন্তু, 'ম'তে যেটি নেমিত্ব ও মেয়ত্ব, সেটি কূর্মবৎ সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ। কাজেই, অর্দ্ধমাত্রারূপ সেতুটি উভয়মুখে (নাভিমুখে বিন্দু এবং নেমি মুখে নাদ) কাষ্ঠা পর্যন্ত ধরাইতে পারে। কিন্তু অগ্রে 'উ' দ্বারা অরের ঐ কৌর্মবৃত্তিটি সম্যক্ সাধিত হওয়া আবশ্যক। এইজন্য, নাদানুসন্ধানে 'উ'কেই প্রথম 'জ্যা' করা হইয়াছে প্রণবসাধনায়।

সুতরাং, মূল নিখিলভুবনাকৃতিটি ও ওঁকারে নিহিত। 'ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্'।

৩০। মকারেণ মেয়ত্বমিতি সর্ব্বমোঙ্কার এবেতি॥

মকার মেয়ত্ব বা পূর্বোক্ত নেমিত্ব লক্ষিত করে। সবই ওঁকার।

পূর্ব সূত্রেই এই মেয়ত্ব বা নেমিত্ব বলা হইয়াছে। তারচক্র সমাচরণে 'উদয়ে'

উবর্ণকে মাঝে করিয়া বিস্তারে 'ম'কে ব্যক্ত করিতে হয়। 'অন্তে' বা বিলয়ে, ঐ 'উ' দ্বারা বিলোমে 'ম'কে আবার আদ্যস্বরে বা মাতৃকাপীঠে 'গুটাইয়া' লীন করিয়া আনিতে হয়। এটি 'বিন্দুলীন' ভাব বা ভাবের তটস্থ। অত্র মেরু। মেরুটি লঙ্ঘন করিতে নাই। প্রণবের সর্বাত্মভাবটি নানারূপে এ গ্রন্থে দেখান হইতেছে। বাহিরে ঐ বীজটি, রেণুটি, কোথাও বাদ নেই। এস্থলে নাভি-অর-নেমি আকৃতিটি যে ওঁকারেই নিষ্ঠিত, সেটি বলা হইল। প্রণবই সব, কাজেই, প্রণব সমাশ্রয়ে সর্বসমাশ্রিত। অবাঙ্মনসগোচর যে পরমতত্ত্ব, তিনিই কৃপাক্ষররূপে তাঁর বাচক প্রণব এবং নাম হইয়াছেন, যাতে নামাশ্রয়েই তদাশ্রয় সম্ভাবিত হইতে পারে। এইবার নীচের কারিকাটি—

কিং বাগ্ ব্রহ্মেতি কা বা বিষয়িবিষয়তা বাচকং কিঞ্চ বাচ্যং
সর্ব্বং তুর্য্যেঽপি ধাম্নি ত্বনবসরপদং কেন সম্পদ্যমানম্।
নাদো বিন্দুঃ কলেতি ত্রিতয়মপি কুতো বাধিতং সাধিতং বা
গম্ভীরেঽস্মিন্নপারে ধ্রুবমতিতরিতুং ধ্রৌব্যদিগ্‌দর্শনং কিম্॥ ১১৮-১১৯

শ্রুতি 'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম' বলিয়া নামনামীর অভেদ শোনাইয়াছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মননবিচারে পতিত হইয়া বুদ্ধি বলে—যেখানে বিষয়ি-বিষয়তা সম্বন্ধই নেই, সেখানে আবার বাচকই বা কি, বাচ্যই বা কি? তুরীয় যে ধাম, সেখানে তো পাদমাত্রাদি সব কিছুই 'অনবসরপদ' (অর্থাৎ, সে ধামের প্রান্তেও পা বাড়াইতে পারে না), তবে আবার সে পরমে উপনীত করার যে 'পদ' (তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপদটি মিলাইবার যে পদ), সে পদরূপে 'সম্পদ্যমান' হইল কিসে? অর্থাৎ, কোন পদের দ্বারাই যেটির পদ্যমানতা নেই, সেটি, প্রণবাদিতে পরমপ্রাপ্তির সম্পদ্যমানতা দিল কেন এবং কিভাবে? শুধু আবার পদ্যমানতা নয়, সম্পদ্যমানতা। একে আশ্রয় কর, পরমে সম্পন্ন হবেই। যে তুরীয় ধামের প্রসঙ্গ চলিতেছে, সেটি তো নাদবিন্দুকলাতীত, নয় কি? যদি তাই, তা হইলে, তাতে নাদবিন্দুকলা (অর্থাৎ, প্রণবাদির কেবল ব্যক্তমাত্রাই নয়, সাধারণতঃ অব্যক্ত অর্দ্ধমাত্রাও) 'বাধিত' হইয়াও 'সাধিত' হয় কেন, কি ভাবে? অর্দ্ধমাত্রা প্রণবের ত্রিমাত্রা আর অমাত্রের মধ্যে সেতুই বা হন কিরূপে? কাজেই বুদ্ধির

মননবিচার এক অতি গম্ভীর এবং অপারে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। এই যে গম্ভীর-অপার 'কুতস্তা'-'কথন্তা'র অগাধ অম্ভরাশি, তাকে ধ্রুব 'উত্তরিতে' ধ্রৌব্যের দিগ্‌দর্শন (তোমার নিজ কৃপা বই) আর কি আছে? তোমার নিজ কৃপাই এ গম্ভীর-অপারের মাঝে ধ্রুবতারাটির মত দিগ্‌দর্শনী হইয়া বিভ্রান্ত জীবকে বলিতেছে— 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, নিষ্ঠা করি ভজ'! যে স্থলে আর সমস্ত কিছুই 'গম্ভীরাম্ভঃ', কিছুতেই আপন তলটি কুলটি দেখাইবে না, সে স্থলে এই পরমা কৃপাই (প্রণবাদিরূপে) সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ধ্রুব অবলম্বন। এর আশ্রয়েই 'আত্মপ্রত্যয়ৈকসারং' পরম তুষ্ণীম্ পর্যন্তও যাওয়া যাইবে।

উপসংহারে জপোল্লাস-বিলাসবল্লীর সেই 'নাম্না নাম্নি' শ্লোকটি পরম পদে সম্পদ্যমান হবার নিশ্চিত উপায়রূপে 'নাম'কেই নির্দেশ করিয়াছে। সে শ্লোকটি পুনশ্চ অনুধাবনীয়।

ইতি—জপসূত্রে প্রথমাধ্যায়ে বৃত্তিতানিরূপণং নাম তৃতীয়ঃ পাদঃ।

জপসূত্রম্

(প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ)

১। তত্ত্বস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়ত্বাপত্তিস্তৎকল্পনম্॥

যে মূল ব্যাপারে তত্ত্ব প্রকৃতি-প্রত্যয়রূপে রূপিত হয়, সেটিকে বলে 'তৎকল্পনম্'।

মূলে এই যে কল্পন, সেটি 'তৎ' বা তত্ত্বেরই স্বকল্পন, অন্য কিছু কর্ত্তৃক কল্পন নয়।

সোঽকল্পয়ত বশীদমকাময়ত চৈক্ষত।
বহুস্যামিতি তত্ত্বস্যানিরুক্তা স্পন্দমানতা॥
তপসা চেতি লিঙ্গেন ক্বচিদ্ জ্ঞেয়া ক্বচিন্ন বা।
ঋত-সত্যে ইতি দ্বন্দ্বঃ প্রত্যয়প্রকৃতীত্যপি।
সর্ব্বং তৎকল্পনং গূঢ়মাত্মদৃষ্ট্যা হি বুধ্যতাম্॥ ১২০-১২১

তিনি 'বশী', কিনা, কল্পনাদি সর্বব্যাপারস্বতন্ত্র হইয়াও (not as one merged and involved in the process, but as One eternally transcendent and emergent), 'ইদং'—এই অখিলকে— 'কল্পিত' করিয়াছেন; তিনি কামনা বা 'ইচ্ছা' করিলেন; তিনি 'ঈক্ষণ' করিলেন; ইত্যাদি। পরমতত্ত্ব আপনাকে 'প্রকাশ' এবং 'বিমর্শ' শক্তিরূপে 'কলন' করিলেন; ইত্যাদি। সূত্রে এই কলনাদি মূল ব্যাপারকে 'তৎকল্পনম্' বলা হইল। মূল থেকে নিঃসৃত এই যে প্রাপঞ্চিক প্রবাহ, এটিকে 'আত্ম' দৃষ্টিতে এবং অনাত্ম বা ইতর দৃষ্টিতে দেখা হয়। পরেরটি বাহ্য, 'প্রাকৃত', 'জড়' দৃষ্টি। এর পরিণতি প্রকৃতিবাদ, অজ্ঞাতবাদ, অথবা জড়বাদ (Naturalism, Agnosticism, Objective Materialism)। এ দৃষ্টিতে তত্ত্বের কুণ্ঠিতাদি ভাব মিলিয়া

থাকে। আত্মদৃষ্টিকে শুধু Subjective ভাবিলেও চলিবে না। কাণ্টের 'Critical Outlook' ও ঠিক ধরাইয়া দেয় না। জপসূত্রমে তত্ত্বের লক্ষণে এবং অন্যত্র যে দৃষ্টির অনুসরণ হইতেছে, সেটি অপরোক্ষ ভানদৃষ্টি। সাক্ষাৎ অনুভবটিকে সমগ্র, অখণ্ড এবং নির্ব্যূঢ়ভাবে (as 'Fact') ধরিয়া লও। এই 'আত্মদৃষ্টি'তে (upon the background of Experience as Fact, not as 'Fact-section', etc.) পূর্বোক্ত কল্পনাদিকে বুঝিতে যাও (বুধ্যতাম্)।

মনে ভাবিও না যে এতে কেবল অধ্যাত্ম-বিশ্লেষণ (Subjective Analysis) ই হইবে, অধিভূতাদি (Objective Reality প্রভৃতি) বাদ পড়িবে। আমাদের আলোচনায় সেটি বাদ পড়িতেছে না—an appreciation of the Cosmic Order as a whole, বহির্বিজ্ঞান, গণিতাদি ক্রোড়ীকৃত করিয়াই, জপের আধার প্রস্তুতিতে লাগিতেছে। একদেশীরা এবম্বিধ 'সার্ব্বভূমিকতায়' কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করিলেও, জপপদার্থকে জপমালার একটা একটা রুদ্রাক্ষাদির মত আলাদা 'এতটুকু' করিয়া দেখিলে চলিবে কেন?

এখন আত্ম বা তত্ত্বদৃষ্টিতে চারিটি মূল 'অবভাসক' (Exponents)। এদের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এখানে উল্লেখমাত্র। প্রথম, অস্তিতা; দ্বিতীয়, ভাতিতা; তৃতীয়, প্রিয়তা; চতুর্থ, ঐ তিনের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং বিবিধ নাম-রূপ-ভাবাদিতে স্বতঃমূর্ততা। এই চারিটি মূল অবভাস (প্রকৃতি এবং প্রত্যয় উভয় আকারেই) নিজের অনুভবেই মিলাইয়া লও। নিজের ভিতরের বস্তুটি যেন বলিতেছে— 'আছি এবং হইব'; 'দেখিতেছি এবং দেখিব'; 'রস ও রসভুক্ আছি এবং হইব'; এবং এই যে 'আছি এবং হইব' এ দুয়ের অন্তহীন স্ফূর্ত এবং মূর্তভাবেও আছি এবং রহিব। এইভাবেই চারি রকমে, নিজ বস্তুটির আত্মসংবেদনটি হইতেছে। এই চারিটি, মূলে যাইয়া, যথাক্রমে, 'অকল্পয়ত', 'ঐক্ষত', 'অকাময়ত', 'অতপ্যত'। এর মধ্যে, রস অথবা কাম ('ন বৈ রেমে') আনিয়া দেয় বিশ্বের মূলে স্পন্দ বা 'দোল'। তপঃ আনিয়া দেয়, মূল আবেগ (*elan vital*), উচ্ছ্বাস, উচ্ছূনতা ('তপসা চীয়তে ব্রহ্ম')। আর, তপসার মধ্যস্থতায় অস্তিতা থেকে সৃষ্টির আদিতে এবং আধারে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'। ভাতিতা থেকে বিশ্বে প্রতিটি কেন্দ্রে আত্মদৃষ্টি, কোথাও 'মূঢ়', কোথাও বা 'রূঢ়' (explicit, 'emergent')। ব্যষ্টিতে

বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ; সমষ্টিতে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর। 'তপসা' কে মাধ্যমরূপে রাখিয়া সমস্ত কিছুর বিকাশ-সঙ্কোচ (Evolution-Involution) পরিকল্পিত হইতেছে; তাই এই অপরূপ বৈচিত্র্যে লীলায়ন। সঙ্গীতে নাদ, নাদাভ্যন্তর জ্যোতিঃ, এবং তদভ্যন্তর রস যেমন। এখানে 'জ্যোতিঃ' বলিতে রাগাদির শুদ্ধ অবভাস। কলাবিদের 'তপসা'র মাধ্যমে এ তিনের অপূর্ব নিবেদন-সংবেদনটি সম্ভাবিত হয়। বহির্বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে, অস্তি দেয় তলবৃত্তি, ভাতি লম্ববৃত্তি, রস বেধবৃত্তি, তপঃ কালিক বৃত্তি বা ছন্দঃ (*x, y, z, t*)। অস্তি থেকে পাদ, রস থেকে মাত্রা, তপঃ থেকে কলা, ভাতি থেকে কাষ্ঠা। এইভাবে নানারূপেই ঐ চারিটি 'মৌলিক' (fundamentals) কে বুঝিয়া লইও।

কারিকায়, তত্ত্বের 'বহু স্যাং' ইত্যাদিভাবে স্পন্দরূপতাকে 'অনিরুক্তা' বলা হইয়াছে দেখিও। পুনশ্চ, 'তৎকল্পনং'কে 'গূঢ়ং' ও বলা হইয়াছে, যেমন শ্রুতি আগমাদি বারম্বার বলিয়াছেন। এ দুটি শব্দে ধ্যান দিও। প্রথমটির দ্বারা বুদ্ধির মননাদি যে বিমর্শবৃত্তি, তদ্দ্বারা ব্যাপ্য হবার নয়, এটি বলা হইল। আর, পরের দ্বারা বলা হইল যে, বুদ্ধির যে আত্মদৃষ্টি (Intuition প্রভৃতি), সেটিকে সমাধির গভীরতায় না-আনা পর্যন্ত, অর্থাৎ, সব কিছুর 'হৃৎ' এবং 'আত্মা' পর্যন্ত গতিটি না-হওয়া পর্যন্ত, ঐ গূঢ়, গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ ভাবের 'ভাবে' অনুপ্রবেশ ঘটে না।

আর, এক কথা। 'ঋতং' এবং 'সত্যং' এই চকার-যুক্ত দ্বন্দ্বভাবকে 'প্রত্যয়' এবং 'প্রকৃতি' আকারেও বুঝিও। অর্থাৎ, সত্যম্=প্রকৃতি, আর, ঋতম্=ঐ প্রকৃতি উদ্দেশ করতঃ যে শুদ্ধ প্রত্যয়। যেমন, প্রণব জপে, প্রণবের যেটি প্রকৃতি, সেটি সম্বন্ধে শুদ্ধপ্রত্যয় বা 'ঋতম্' হয়, যদি উদয়-বিলয়-সন্ধি (মেরু) এই তিনে অবহিত হইয়া জপ করা হয়, তবেই। অন্যান্য জপেও এটি উদাহৃত।

এই সূত্রে এবং কারিকায় সৃষ্টির 'মৌলিক'গুলিকে সংক্ষেপতঃ দেখান হইল। এইবার, মৌলিকেরও যেটি মূল—

২। তস্যানন্দস্যৈব বৃত্তত্বম্॥

সেই তৎকল্পনাদি মূলতঃ আনন্দ বা রসেরই বৃত্তভাব, বৃত্তিমান্ হওয়া॥

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বেবং মিথুনকল্পনাদিতঃ।
উল্লসিতত্বমস্যৈব স্বোভাবোঽধ্যাত্মমীরিতঃ।
সর্ব্বনিদানতায়াং যদনিদানং যথাত্মনি॥ ১২২

আনন্দ এবং রস—পরম সান্দ্রতার সমাধি থেকে 'জিজাগরিষু', জাগৃতিরূপে নিজেকে অন্তহীন বৈচিত্র্যে ফুটাইতে এক নিগূঢ় 'কাম', আপন পরম অস্তি এবং ভাতির আধারেও, রাখিয়া থাকে। বিশ্বকে একান্ত বাদ দিয়া (acosmic state), তাই যেন 'ন স বৈ রেমে'। আনন্দ আর লীলা, রস এবং রাস, এ দুয়ে অবিনাভাব যুগলে না থাকিলে ঐ মূল 'আকাঙ্ক্ষা' (Basic Yearning)। সৃষ্টিতে এবং মূলে দৃষ্টি দিলে এটি না দেখিয়া উপায় নেই। এই মূল আকাঙ্ক্ষা থেকে মিথুনাদিক্রমে লীলাবিস্তার ও রসবিতান। আনন্দের ঐ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটিকে যদি 'উল্লসিত' বল, তবে, সেটি আনন্দেরই 'স্বোভাবঃ'=অধ্যাত্মভূমিকা। আপন আত্মাকে লইয়াই এটি হইয়া থাকে, অন্যাপেক্ষা নেই। শ্রুতি কোথাও বা 'সোঽবিভেৎ'—তিনি যেন 'একা' ভয় পাইতেন, এও বলিয়াছেন। অথচ, 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি'। এ ভয়টিকেও সৃষ্টিতে, লীলায় ভাল করিয়া চিনিয়া লও। চিনিলে তবে অভয়। গোপালকে বক্ষ থেকে কক্ষে নিতেই যশোমতির কত না ভয়, আর—গোঠে, দূরবনে পাঠাতে! প্রলয়ে যে 'আসীদিদং তমোভূতং' সেটি সৃষ্টিতে সরিল, লুকাইল, কিন্তু যাইল না। আলোর সাথে তার অফুরান লুকোচুরি। কত অপরূপ রূপ সেও না জানি ধরিয়াছে—লজ্জা, সরম, ভয়, ভরম। এদের ছাড়িয়া ত' রস আপন রসায়নে যাইতে নারাজ! ভয়ের কথাটাও মূলের কথা। সমগ্র সৃষ্টির নিদান আনন্দের অথবা রসের এই—'চাই' আর 'কিন্তু কৈ'—এই দুটি মূলভাবে খুঁজিয়া পাইতে হয়। অথচ, স্বয়ং এটি অনিদান (সেই যে 'মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্'!) পরমে পরমায় 'মান'! অথচ, এই অনিদান মানটি থেকেই, মানের সায়রটি থেকেই নিখিল—তা এক নাম-না-জানা তৃণকুসুমই সে হোক্, যার কাছ থেকে অবুঝ গরজী অলি বার বার আসে, বার বার ফিরে যায়—তার আপন মানের ঘাঘরীটি দিবাবিভাবরী সকালসাঁঝ ভরিয়া নিতেছে!

আপন রসানুভূতিতে এটি মিলাইয়া দেখ— 'যথাত্মনি'। 'আনন্দাদ্ধ্যেব' ইত্যাদি শ্রুতি এবং আগমাদিরও মূলমন্ত্র এ স্থলে ভাবনা করিও। ক্লীঁ বীজ কামবীজ।

উপরে ভাষাটি নধর কোমল বোধ হইল, কিন্তু এইবার আবার সেই অবচ্ছিন্নাদি ভাষা—

৩। নিরতিশয়সাক্ষাদ্‌ঘনত্বাশ্রয়ত্বেঽনবচ্ছিন্নহৃত্ত্বং সর্ব্বস্যানন্দঃ ॥

আনন্দকে লক্ষণে কে আনিবে, তথাপি বর্তমান সূত্রে সর্ববস্তুর 'হৃৎ' (inmost 'core'; আগে সূত্রিত) রূপে আনন্দকে বলা হইতেছে।

সাক্ষাদিতি চ সংবিত্ত্বং ঘনত্বেন হ্যমেয়তা।
আদিলিঙ্গেন কাষ্ঠা চ তারতম্যক্রমস্য বৈ।
স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-ভূমৌকো-নিষ্ঠত্বমপি গৃহ্যতে॥ ১২৩

সূত্রে যে 'সাক্ষাৎ' আছে, তাতে সংবিৎ বা সংবিত্তি লক্ষিত বুঝিও। অপরোক্ষ সংবেদনরূপ আনন্দ, পারোক্ষ্যে এটি কখনই যায় না। স্মৃতি স্থলে তো নয়, দুঃখাদির স্থলেও নয়। যেখানে 'জাড্য' ভাবি (যথা, ঐ প্রস্তরাদিতে), সেখানেও নয়। পদার্থ মাত্রের যেটি 'হৃৎ', সেটি আনন্দই। সূত্রে যে 'ঘনত্ব', সেটি দ্বারা এটি বুঝিতে হইবে যে, 'এষ আকাশ আনন্দঃ'—এভাবে আনন্দ যে কেবল নাদ বা বিস্তাররূপেই আছে, এমন নয়। পরন্তু, যেন বেধনিরূপক বা লিঙ্গ (depth dimension) অঙ্গীকার করতঃ আনন্দ বিন্দুভাবে অগাধ ঘনীভাবও বরণ করিয়াছে। এটি রসঘন, আনন্দঘনরূপ। এভাবেরও তল নেই, অন্ত নেই। আনন্দই এই ঘনরূপে 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'। রসচক্রের নাভি, মর্মৌকঃ। সুতরাং, 'ঘনত্ব' শব্দে অমেয়ত্বই হইল। 'নিরতিশয়' এই আদি লিঙ্গে কি বুঝিবে? সর্বত্র রসবোধের যে তরতমতার ক্রম, সে ক্রমের কাষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিটিও এই 'হৃত্ত্বে'। তবে, 'হৃৎ' বস্তুটিকে আগে ব্যষ্টিভাবেও দেখা হইয়াছে,—তোমার, আমার, ঐ রেণুটির। কিন্তু, এখানে 'ভূমৈব রসঃ'—ভূমার আধারে দেখ। একটা রেণুর স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-মর্মৌকঃ যে 'হৃৎ', সেটি শুধু ব্যষ্টি ভাবেই রস বা আনন্দ নয়, সেটি—ভূমাই। সূত্রে, 'অনবচ্ছিন্ন' শব্দটি আছে, দেখিও। সমস্ত কিছুর 'হৃৎ' বস্তুটি হইয়াও রস বা আনন্দ সর্ব নিরূপ্য-নিরূপণ-নিরূপকের অতীত (ব্যতীত্যবৃত্তিত্বং')। এ ভাবটিও আপন রসানুভূতিতে বুঝিয়া লও। তোমার অন্তরের মধুমত্তম

‘কণিকা’টি কখনই বলিবে না—‘আমি সে সায়র ছাড়া’। কারিকার অনুবাদেই সূত্রের ভাবানুবাদ হইল।

আনন্দ পরমাকাশ, রসভূমা, সুতরাং, পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠা এ চারিটির অতীত। তথাপি, ‘সর্ব্বস্য হৃত্ত্বং’ রূপে আনন্দ নিখিলে অনুপ্রবিষ্ট। প্রণবাদিবীজে এবং নামে বিন্দুকে নাভি করিয়া নাদে এবং কলায় আনন্দ ও রসের ঘনীভাবে প্রকাশ এবং সংবিত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য, নিষ্ঠা ও ভাব এ দুয়ের সঙ্গ ধরিয়া ‘ধুনে’ (ধ্বনিতে) যাও। নাদাভ্যন্তর জ্যোতিঃ, জ্যোতিরভ্যন্তর রস— জ্যোতীরসের সাড়া ও সাক্ষাৎ মিলিবে। নিষ্ঠাপূর্বক ব্যাহরণ বা নামগ্রহণ করিতে করিতেই এই ‘বেসুরা’ যন্ত্রে সুর বাঁধা (tuning) হইয়া যাইবে। আর, যন্ত্র (বাক্, প্রাণ, মন) সুরে বাঁধা হইলে তাতে ভাবের পুলক আর ভাসের আলোক ফুটিতে বাকি রহে না। যত অপেক্ষা ঐ সুরটি বাঁধার। ও-তে বেদনাও আসে, ‘ধৈরজ’ ও চাই। গুরুভরসাই একান্ত ভরসা। সুর যে বাঁধিব—কিসে মিলাইয়া, আর কেই বা সেটি মিলাইবে?

শুধু হৃত্ত্বং নয়, আনন্দই সর্বের স্বরূপ।

৪। তস্যৈব সর্ব্বস্য স্বরূপত্বম্॥

সর্বের স্বরূপও সেই আনন্দ।

স্বরূপত্বেন বোদ্ধব্যা পরমত্বেন বৃত্তিতা।
কিংরূপত্বক্রমাবাপ্ত-কাষ্ঠানন্দে সমর্পিতা॥ ১২৪

‘স্বরূপ’ বলিতে পূর্বালোচিত সেই অপরা-পরাকে অতিক্রম করিয়া পরমা পর্যন্ত গতি সূচিত হইতেছে। অপরায় আনন্দ গুণ্ঠিতাদি আকারে লুপ্তবৎ। কিন্তু আছেই, সমস্ত কিছুর ‘হৃৎ’ রূপে। আনন্দের মাত্রাতেই সব কিছু জায়ন্তে, জীবন্তি, ইত্যাদি। পরা প্রকৃতিতে লুণ্ঠিত (carried off) ভাবটি থাকে না, কিন্তু গুণ্ঠিত ও কুণ্ঠিত এ দুটি ভাবের অবশেষ থাকে। এই তো আমার অন্তরতম বস্তুটিই (হৃৎ) মধু, রস, আনন্দ—এটি সব কিছু আগমাপায়ের মাঝে ঠিকই আছে (‘সনাতনী’), আর আমার যে ‘জগৎ’ (universe), সেটি এই মূল নাভিতে বিধৃত হইয়াই চলিতেছে (revolves)

—'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'। 'ইদং' পদটি লক্ষ্য করিও।—এ সংবিত্তি থাকিলেও, পরমতার পানে এক স্বতঃ আকাঙ্ক্ষা, 'পরমে কাম'ও তাতে অবশ্যই থাকে। যোগী, জ্ঞানী, রসিক, ভক্ত তাই সেই আকাঙ্ক্ষাটি মিটাইবার নিজ নিজ পন্থায় চলেন। 'তত্ত্বমসি' সাধারণভাবে পন্থার অনুসরণ।

সব পদার্থকেই যেমন, (যেমন, একটা ধূলিরেণু) যদি জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, তোমার 'রূপ'টি, ভাবটি কি, আমায় বলিবে?—তবে সে তো একেবারেই, একান্তভাবে কোন উত্তর দেয় না। বিজ্ঞানকেও দেয় নাই। তার কিংরূপতার (What? How? Why? ইত্যাদির) একটা ক্রম সে দেখাইয়া দিয়া বলে—এগিয়ে যাও, আরও যাও। 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। 'এহ বাহ্য'টি 'এহ হয়' হয়, যখন অপরার প্রান্তে আসি। পরার ভূমিতে 'এহ উত্তম', কিন্তু তবু 'আগে'। যোগী, বিজ্ঞানী, জ্ঞানী সবাই এ ক্রমান্বয়টি আপন আপন পন্থায় বুঝিয়া যান। এখন, এই যে ক্রমান্বয়, এর যেটি কাষ্ঠা সেটি আনন্দে (নিরতিশয় ভূমা, নিখিল হৃদের হৃৎ) সমর্পিত। সুতরাং, নিখিল সন্ধানের অবসান এখানেই। কিংরূপতার পরাকাষ্ঠা যেখানে, সেটিই স্বরূপ।

এইবার পাদমাত্রাদি।

৫। এতস্যৈব পাদা অধ্যাত্মাদীনি॥

অধ্যাত্ম, অধিদেবাদি এই আনন্দের বা স্বরূপের পাদ।

অধ্যাত্মমধিদেবঞ্চাধিভূতঞ্চাধিকারতঃ।
অধ্যক্ষরাধিযজ্ঞে চানন্দপাদা ইমে মতাঃ।
পাদেনাত্র বিজানীত সম্পদ্যমানবৃত্তিতা॥ ১২৫

কত পদে বা ভূমিতে, অধিকারে বা অবস্থায় নিজেকে অভিব্যক্ত করিব, ফুটাইব—এ ভাবটির অপেক্ষা আসে, যখন ভূমা পদার্থ সবিশেষ অভিব্যক্তিতে 'অবতরণ' করেন। তখন 'অপাদ-আনন্দ' (পরসূত্রে কথিত) হন সপাদ। এখানে 'পাদ' বলিতে কোন লিঙ্গ, সংজ্ঞা, আকৃতি ইত্যাদি অধিকার করতঃ নিজেকে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে, আয়তনবান্ রূপে সম্পাদিত করা। পাদের প্রসঙ্গ ব্যাহৃতিসূত্রে হইয়াছে।

'আয়তন' (Magnitude, Extension) কথাটা ব্যাপকভাবে (অর্থাৎ, Physical মাত্র নয়) লইয়া (যেমন, পূর্বে আয়তনবত্ত্ব সূত্রে হইয়াছে), বলা যায় যে, তদধিকরণে যে সম্পদ্যমানতা, সেটি পাদ। এখানে, অধ্যাত্ম, অধিদেব, অধিভূত, অধিযজ্ঞ এবং অধ্যক্ষর, এই পাঁচ অধিকারের প্রসঙ্গ হইল। এর মধ্যে, শেষেরটি বাদের আগের চারিটি গীতায় কথিত এবং নিরূপিত। জপসূত্রে এ সব বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে। আনন্দের এই পঞ্চপাদ সূত্রে উল্লিখিত হইল।

'অধ্যক্ষর'টি, একভাবে, প্রণবাদি সেই অক্ষরের বাচক, আবার, অক্ষররূপ অধিকরণে তাঁর বাচক। প্রণবাদির অধ্যাত্মাদি চতুর্বিধ পাদত্ব আছে। যেমন, স্থূল বৈখরীভাবে অকারাদি অধিভূত (জড় নয়); মধ্যমায় নাদাদিরূপে নিত্য-স্ফোটসন্ধানে অধিদেব; বিন্দুমুখী বা হৃন্মুখী হইলে, অধ্যাত্ম; আর, বিন্দুতে যিনি অধিষ্ঠিত, 'হৃদি' যিনি সন্নিবিষ্ট, তাঁতে সমর্পিত হইলে অধিযজ্ঞ।

বিশ্বেও স্বরূপ-আনন্দ আপনাকে এই চারিটি পাদে সম্পাদিত করিয়া দেখাইয়াছেন। একটা বীজ বা ধূলি লইয়া পরীক্ষা কর।

পাদের পর মাত্রা।

৬। এতস্যৈব মাত্রা ভুবনানি বিশ্বা।।

বিশ্বভুবনে (কেবল যে পাদরূপতা এমন নয়) এই আনন্দই 'মাত্রা'রূপে রহিয়াছেন।

অমেয়ো মেয়তাবৃত্তিরঙ্গীকুর্ব্বংস্তনোতি বৈ।
বিশ্বভুবনরূপেণ তন্মাত্রা বিশ্বজীবনম্॥ ১২৬

পাদমাত্রাদি চারিটি লইয়া সংখ্যেয়ত্ব—Measurability। সংখ্যানের যোগ্য সংখ্যেয়। সংখ্যান, এই আকৃতি (category) তে যাহা আসে। 'মেয়' বা 'মেয়তা' আরও ব্যাপক বৃত্তি, অর্থাৎ, যেটি মেয়; সেটি সংখ্যেয় নাও হইতে পারে। ব্যবহারতঃ দুটির ব্যাপ্তি মিলিয়াও যায়। এখন, মেয়তা আর সংখ্যেয়তার মধ্যে সন্ধি বা যোজকরূপা মাত্রা। যেমন, কর্তা (কারণ) আর কর্মের মাঝে করণ। কারণ

করণব্যাপারকে মাঝে রাখিয়া কার্য করে। সোজাসুজি বুঝিয়া লও, পারিভাষিক বিচারে প্রয়োজন নেই। কর্তাকে যদি বল 'মাতা', তবে লক্ষ্য কর যে, এর তৃতীয়ার একবচনে 'মাত্রা'। পাদের বেলা অধিকরণতা, মাত্রায় করণতার মুখ্যতা। অপরগুলিও সঙ্গে থাকে। সম্প্রদান-অপাদান, এ দুটির মুখ্যতা কলায়। কর্তা-কর্ম, বিশেষতঃ এ দুয়ের দ্বারা কাষ্ঠা (কোথা থেকে কোন্ অবধি বা কি) নিরূপিত।

এখন দেখ, মেয়তার অতীত (ভূমা) যে আনন্দ, তিনি মেয়তাবৃত্তি অঙ্গীকার করতঃ নিজেকে বিশ্বভুবনরূপে বিস্তার করিতেছেন (তনোতি বৈ)। অমেয় স্বয়ং আপন 'মাতা' হইতেছেন; আনন্দ হইতেছেন 'আনন্দী'। শুধু তাই নয়, নিজেকে বিচিত্র ভাবে ও ছন্দে সমস্ত কিছুতে মিলাইবার জন্য হইতেছেন, 'আনন্দভুক্'। এইটি মাতার মাত্রারূপতা। অখিলভুবন, অণুতে মহানে, সর্বত্রই এই মাত্রারই মূর্তত্ব। প্রতিটি পদার্থ বলিতেছে—যে আনন্দ আমার হৃদ্‌বস্তু, সেটিকে আমি এই এই করণে (উপায়ে, রূপে ও ভাবে) ভোগ করিব। অন্নঅন্নাদ সম্বন্ধ থেকে বিমল রসাস্বাদ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে আনন্দমাত্রাকে লইয়াই আমি বাঁচিয়া থাকিব। যেটাকে অণু-বিরাটের জড়বিশ্ব ভাবি, সেখানে অনবদ্য ছন্দোরূপে ঐ আনন্দমাত্রা কি অপরূপভাবে সেটিকে ফুটাইয়া রাখিয়াছে, আর 'জীয়াইয়া' রাখিয়াছে! কবির বিস্ময়, বিজ্ঞানের ততোধিক বিস্ময়!

মাত্রা মুখ্যতঃ করণরূপ হইলেও 'কৃত' বা ফলরূপেও লইও। জপাদি সাধনে মাত্রাকে করণ এবং কৃত, এই দুইভাবেই আনন্দে (হৃত্ত্বে) স্থাপিত রাখিবে। যেমন, অগ্নি ও সোমমাত্রা। দুটিই মাত্রা, আনন্দেরই করণ। কিন্তু দুটির সমতা রক্ষিত না হইলে, কৃতটি 'ঋত' হয় না। সুতরাং আনন্দ থেকে লুণ্ঠিতাদিভাবও আসিতে পারে।

৭। অপাদস্তু স পরম আকাশঃ ॥

'অধিকৃত্য' বা অধিকরণতাবচ্ছিন্নভাবটি বাদ দিলে, অর্থাৎ, কোন কিছু অধিকার করতঃ, বা কিছুর অধিকরণে রহিয়াছে, এটি না মনে করিলে, আনন্দ পরম আকাশ। এখানে পদ্যমানতা নেই, সম্পদ্যমানতারও অবসান।

কোঽন্যাদিতি বাক্যেনাকাশস্যানন্দরূপতা।
ভূমৈব পরমাকাশো যো বৈ রস ইতীরিতঃ।
সর্ব্বাধারত্বসর্ব্বত্বে তস্মিন্নেব প্রতিষ্ঠিতে॥ ১২৭

আনন্দকে আকাশরূপে (as Unbounded Plenum) না পাইলে, কেই বা স্পন্দিত হইত, প্রাণনবৃত্তিমৎ হইত? এই বাক্যে শ্রুতি এই আনন্দাকাশকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দ শুধু যে 'হৃৎ' অধিকৃত্য সর্বত্র রহিয়াছেন, এবং মাত্রাপাদাদিরূপে নিজেকে ফুটাইতেছেন, এমন নয়। আনন্দ পরমাকাশরূপে আছেনই। মেয় এবং সংখ্যেয়ে অবগাহন করিয়াও আনন্দ অমেয়, অসংখ্যেয়। আনন্দের এই পরমাকাশভাব ভূমা। এটি 'রসো বৈ সঃ'। রসপদার্থের যে স্বাভাবিক্ ভূমত্ব ও বিভূত্ব, সেটি মূর্তভাবেও বাধিত হয় না। অমূর্ত এবং মূর্ত ব্রহ্ম বা আনন্দের একান্ত বাধরহিত ভূমিই ভগবত্তা। 'মূর্ত্ত'কে স্থূলেই বাঁধিও না। এই নিমিত্ত বলা হইতেছে যে, আনন্দে 'সর্ব্বাধার' এবং 'সর্ব্ব', এ দুই-ই পরস্পরকে 'উৎখাত' না করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রপঞ্চোপশমে সর্বটি শূন্যে আসিলেও আধার আনন্দ; আবার সর্ব পূর্ণ হইয়া রহিলেও আধেয় আনন্দ। প্রথমটির কথা পরের সূত্রে—

৮। অমাত্রশ্চ স শান্ত আত্মা॥

অপাদ-আনন্দ অমাত্রও হইলে শান্ত আত্মা।

এই শান্ত আত্মা কাঠকে 'যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসি' মন্ত্রে, এবং মাণ্ডুক্যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতং প্রপঞ্চোপশমং স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ' মন্ত্রে বিশেষতঃ শ্রুত হইয়াছেন। মাণ্ডূক্য 'অমাত্র'ও বলিয়াছেন। পাদ-মাত্রা এই দুইকে লইয়াই কলা-কাষ্ঠা, কাজেই পাদ-মাত্রা যেখানে নেই (অর্থাৎ, মুখ্যতঃ অধিকরণ এবং করণ নেই), সেখানে কারক-ক্রিয়া-ফল, এই ত্রিপুটীই নেই। মেয় আবার অমেয়েই ফিরিয়া গেল, নিরুক্ত অনিরুক্তে, ইত্যাদি!

নান্তঃ প্রজ্ঞং বহিঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনা সমূহিতম্।
আত্মপ্রত্যয়ৈকসারং যৎ তদেবামাত্রমূচ্যতে।
প্রপঞ্চোপশমাত্তত্রাপ্রসঙ্গোঽবাধবাধয়োঃ॥ ১২৮

অন্তঃ প্রজ্ঞ নয়, বহিঃ প্রজ্ঞ নয়, উভয়তঃ প্রজ্ঞ নয়, ঘন প্রজ্ঞ নয়, ইত্যাদি 'নেতি নেতি' মুখে যে চরম অনুভব ভূমিটি শ্রুতিবাক্যে 'সমূহিত' (বলার ও চিন্তার

বস্তু না হইলেও ধরাইতে যত্ন করিয়াছেন), সেটিকে, অনিরুক্তাদি বলিয়াও, 'আত্মপ্রত্যয়ৈকসারং' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এটি অমাত্র। কেননা, বাক্ বা মনের কোন লিঙ্গা, সূচক, নিরূপক (অর্থাৎ করণ) দ্বারা এটির তো 'মান' হয় না। আর প্রপঞ্চোপশম পরমভাবরূপ সে শান্তভূমিতে অবাধ-বাধ এ দ্বন্দ্বেরও প্রসজ্যতা আর নেই। অর্থাৎ, ঐ 'উপশম'টি লইয়া মননবিচারে নামিলে, সেটি তা থাকে না। নীচের (বৌদ্ধ বা বাচ্যভূমির) কোন 'পক্ষ'ই সেখানে পক্ষধর্মতা রাখে না। তাটস্থ্যে যা বলিবে, স্বরূপে সেটি পরমতুষ্ণীম্। অদ্বৈতাদি কোন পক্ষেরই 'বিবাদ', সে চরম ও পরম অনুভব পর্যন্ত যায় না। পূর্বখণ্ডে অদ্বৈতাদ্বৈতদশকমটি দেখ। 'শান্ত আত্মনি' চরম আহুতিতে সবই শান্ত। শ্রুতি ও অনুভব এতে কোন সন্দেহ রাখেন নাই।

যোগে, জ্ঞানে ও ভক্তিতে যে পরমনিবিষ্টতার ভূমি আগে বলা হইয়াছে, এবং আনন্দের যে পরম স্বলসিতভাবটি পুনঃ পুনঃ উদ্দেশ করা হইয়াছে, সেটি এই পরমশান্তকে লক্ষ্য করিয়াই। শমদমাদির যে শান্ত, সেটির সঙ্গো এই পরমশান্তকে গুলাইলে চলিবে না।

৯। সপাদস্তু স বিষ্ণুরুরুক্রমঃ. তথা চ গায়ত্রী॥

আনন্দ সপাদ হইলে বিষ্ণু উরুক্রম। তথাচ, গায়ত্রী।

ত্রেধা যো নিদধে পাদং পাদস্যেতি চ শ্রূয়তে।
সম্পদ্যমানঃ স এব স্বয়ং বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥ ১২৯

বেদের শ্লোকোদ্ধৃত ঐ দুইটি মন্ত্রে 'পদ' এবং 'পাদ' শব্দদ্বয় শ্রুত হইয়াছে। 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাদি কত না রূপে তিনি তাঁর 'পরমপদ'টি বিশ্বচেতনায় 'পাদ'রূপে নিধান করিয়াছেন! অথচ, এই বিশ্বচেতনা (Cosmic Consciousness) ভূমিতে তিনি কি নিজেকে নিঃশেষ করিয়া রাখিয়াছেন? না, কোথাও তাঁর ঐ পাদরূপটি তাঁর পরমপদকে নিঃশেষিত করে নাই। বিরাট্ বিশ্বও নয়, একটা ধূলিরেণুও নয়। এই বিশ্বভুবন তাঁর একটি পাদ; এই পাদটিতে 'ক্ষর'ভাবও লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু 'অয়ং' বা 'এই'রূপে যেটি প্রতীত, তার ঊর্ধ্বে (transcending it) 'অসৌ' বা 'সেই' যে

ভূমি, 'দ্যৌঃ'রূপে সে ভূমিতে (স্বঃ), তাঁর 'অক্ষর' (অমৃত) পাদও রহিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। আর, সে অমৃতপাদও 'ত্রিপাৎ'। সুতরাং 'অয়ং' বা ব্যক্ত ভূমিতে তিনটি ক্ষরপাদ, 'অসৌ' বা অব্যক্তভূমিতেও তিনটি অক্ষর ও অমৃতপাদ। আর, ক্ষর ও অক্ষর, মৃত ও অমৃত, এ দ্বন্দের অতীত 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'। এতৎ প্রসঙ্গে গীতার— 'যস্মাৎক্ষরা-দতীতোঽহম্' ইত্যাদি স্মরণ কর। বিশ্বে সমস্ত কিছুতে এই সপ্তধাভাবটি ধ্যান করিও। প্রণবে অ, উ, ম—এই তিনটি প্রথম 'ত্রিক'; নাদ-বিন্দু-কলা দ্বিতীয় 'ত্রিক'; অন্তে, কলাতীত। জপে, বৈখরীতে ক্ষর বাচিকাদি তিন; মধ্যমা-পশ্যন্তী-পরা, এ তিন 'অমৃতং দিবি'। এ তিনেরও অতীত পরম। যাবৎ সম্পদ্যমানতা, তাবৎ পাদ। স্থূলে, সূক্ষ্মে কারণে; ব্যক্তে অব্যক্তে, ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে; অণুতে মহানে; ভিতরে বাহিরে;—সর্বত্রই সম্পদ্যমানতা রহিয়াছে, চলিয়াছে। কিন্তু কোনও মেয় কাষ্ঠাতে এটি নিঃশেষিত হইতেছে না। যেমন বীজে, সুষুপ্তিতে, প্রলয়ে, ইত্যাদি। 'ক্রমানুসার' চলিতেছে; চক্রাবৃত্তি চলিতেছে। যেখানেই 'রেখা' টান, বিষ্ণু উরুক্রম সেটি অতিক্রম করতঃ বলিতেছেন—দেখ, আমি এর পারে! নিরূপ্যমাণতা প্রসঙ্গে এটি বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। জপে এই 'উরুক্রম'টি বাক্ প্রভৃতির সম্পদ্যমানতায় মিলাইতে হয়। 'নাদোরুক্রমাষ্টকম্' যেমন। গায়ত্রী-আদির 'পাদ' এই সূত্র ধরিয়া সবিশেষ ভাবনা করিবে। বস্তুতঃ সমস্ত সপাদের সংপাদয়িত্রী 'ছন্দসাং মাতা' গায়ত্রী।

১০। সমাত্রশ্চ স ওঁকারমাত্রা॥

আনন্দ সমাত্রও হইলে ওঁকারমাত্রা।

অকারাদয় এব স্যুর্জাগ্রদাদিবিলক্ষণাঃ।
আনন্দস্যৈব মাত্রাস্তা নাদবিন্দুকলাত্মনঃ॥ ১৩০

জাগ্রদাদি অবস্থা, ভূর্ভুবঃ স্বরাদি নানাভাবে বিশেষতঃ লক্ষিত ওঙ্কারের অকারাদিকে আনন্দেরই মাত্রা বলিয়া ধ্যান করিবে। অকারাদিকে বহিঃপ্রজ্ঞাদি মাত্রা, এবং 'তুরীয়'কে 'অমাত্রম্' রূপে দেখান হইয়াছে, মাণ্ডূক্যাদিশ্রুতিতে। জপসূত্রমে

'সেতু' বা অর্দ্ধমাত্রার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, এবং সেই সেতুই সর্বপ্রযত্নে সমাশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে। এখানে কারিকায় নাদ-বিন্দু-কলাত্মাকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করা হইল। লক্ষ্য কর যে, এস্থলেও সূত্রে 'চ'। অর্থাৎ পাদ ও মাত্রা পরস্পরে অন্বিত ও মূলতঃ অভেদে রহিয়াছে। এক দৃষ্টিতে যেটি পাদ, অন্যদৃষ্টিতে সেটিই মাত্রা। প্রত্যয়ভেদ মাত্র। পদ্যমানতা আর মীয়মানতা। গায়ত্রী ইত্যাদিতে, যে ভাবে পাদবিন্যাস হয় তাতে, অন্বয়টি আছে, কিন্তু এভাবে তাদাত্ম্য (দৃষ্টিভেদপূর্বক) নেই, মনে হয়। কিন্তু পাদের পদ্যমানতা ছন্দের অনুরোধে যেরূপ, মূলপ্রাণপ্রযত্ন (as basic Pranik function) দৃষ্টিতে যে ঠিক সেইরূপ, এমন নয়। এভাবে বর্ণদৃষ্টিতে প্রণব ও ব্যাহৃতি ব্যতীত চতুর্বিংশতি, প্রণব এবং ব্যাহৃতি সহ অষ্টাবিংশতি। পদদৃষ্টিতে সপ্রণব সব্যাহৃতি চতুর্দশ ইত্যাদি। এ সব আকারে গায়ত্রীতে পদ্যমানতা বা পাদ নির্দেশ হইতে পারে। চতুর্দশ ভুবনই গায়ত্রীর পদরূপ ঐ চতুর্দশপাদে সংগৃহীত হইয়াছে। মীয়মানতা বা মাত্রার দৃষ্টিতেও (অনুবন্ধানুরোধে) অনেক প্রকারে নেয়া যায়। তন্মধ্যে সাতটি অগ্নিমাত্রা এবং সাতটি সোমমাত্রা, এই চতুর্দশ মাত্রায় গ্রহণ এবং এদের সমতা বিধানপূর্বক ব্যাহরণ-অনুস্মরণ, সাধনে একান্ত আবশ্যক। পদ্যমানটি যেমন মীয়মান হয়, মীয়মানটিও সেইরূপ পদ্যমান হয়। যেমন সঙ্গীতের তালে চৌতাল আর একতালা। দুয়েই বারটি করিয়া মাত্রা; কিন্তু তাদের পাদবিন্যাস একরূপ নয়। পাদমাত্রা এই পাদেরই অন্যত্র আবার কথিত হইবে। পূর্বে যে অধিকরণমুখ্যতা আর করণমুখ্যতার প্রসঙ্গ হইয়াছে; সেটিও স্মরণ রাখিতে হইবে। অধিকরণ আর করণ অন্যোন্য অপেক্ষাতেই থাকে। শাস্ত্রাদি দেন 'পদ'। যেমন 'বরেণ্যং'। শ্রীগুরু এই পদটিকে পাদমাত্রায় মিলাইয়া দেন। তিনিই ধরাইয়া দেন, ঐ পদটিকে ত্রিপাৎ নয়, পরন্তু চতুষ্পাৎ করিয়া ব্যাহরণ করিতে, এবং অগ্নি এবং সোমমাত্রাদ্বয়ের অনুপাত সমতা রক্ষা করিতে। বস্তুতঃ গায়ত্রীতে এইটিই অগ্নীষোমীয় সমতাবিধানের সন্ধিস্থল ('key position')।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পন্দন এবং বীচির বিচয় এবং সমুচ্চয় বিচারে এবং গণনায় (Wave Mechanics), পাদমাত্রা জ্ঞানই তো বিজ্ঞান। আবার, পাদমাত্রার ছন্দটি অন্যরূপ বলিয়াই কার্বন কাঠকয়লাও হয়, আবার হীরেও হয়। আর, সঙ্গীতাদিতে তো পাদমাত্রাই কলাকলনের প্রাণ।

১১। অব্যবহার্য্যত্বেনাপদ্যমানত্বমপাদত্বম্॥

কোনরূপ ব্যবহারযোগ্য নয়, বলিয়া যাহা পদ্যমানও নয় (অর্থাৎ, যেটি সম্বন্ধে উপপন্ন, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, নিষ্পন্ন, এসব কোন সংজ্ঞারই ব্যাপ্তি নেই), সেটি অপাদ। (পূর্বে এক সূত্রে, ইহা 'পরম আকাশ' কথিত হইয়াছে।)

অলক্ষণতয়া যস্য ন ব্যবহারযোগ্যতা।
ক্রিয়াকারকভেদো বাঽপাণিপাদঃ স উচ্যতে॥
জবনগ্রহণে তস্য কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতদিত্যপি ভাবয় সুধীঃ॥ ১৩১-১৩২

কোন লক্ষণে যেটি আসে না বলিয়া যেটিকে লইয়া কোনও ব্যবহার সম্পাদিতও হইতে পারে না; যাতে ক্রিয়াকারক ভাব (সুতরাং অধিকরণাদিও) কোনরূপে সঞ্জাত হয় না, অর্থাৎ যেটির সম্বন্ধে ক্রিয়াও বলা যায় না, আবার কারকও বলা যায় না;—সেইটিকে (কিনা, পরব্রহ্মকে) উদ্দেশ করিয়াই শ্রুতি এবং অনুভব দুই-ই বলিয়াছেন—'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি। কিন্তু আবার, এর চাইতে আশ্চর্যই বা কি আছে যে, সেই 'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি (নেতিমুখে শ্রুত) পরমতত্ত্বটিকেই উদ্দেশ করতঃ তাঁরা বলিতেছেন—'জবনো গ্রহীতা', 'পশ্যত্যচক্ষুঃ' ইত্যাদি! তিনিই গমন করেন, গ্রহণ করেন, দেখেন, শোনেন, সমস্ত কিছুই করেন! তাঁকে ছাড়িয়া কোন কিছু করাও নেই, হওয়াও নেই! শুধু আবার, মূল আধার বা অধিষ্ঠানরূপেই তিনি সমস্ত কিছুর নির্বাহয়িতা, এ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াই বা চলিতেছে কৈ! 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্' ইত্যাদি; 'সহস্র শীর্ষা' ইত্যাদি;—এ সব যে সেই অপাদ পরমের শুধু 'পরমপদং' নয়, 'পরমপাদ'টিও বাদ দিতে নারাজ দেখিতেছি! 'বিদ্যাবিদ্যাবিষয়' করিয়াও তো একান্ত নির্বিষয় হওয়া হইতেছে না! এই নিমিত্ত, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

১২। তস্মিন্ ক্রিয়াকারকব্যবহারযোগ্যতাপত্তিঃ সপাদত্বম্॥

অপাদে ক্রিয়াকারক ব্যবহার আসিলে ('অধ্যাস' অথবা অন্যপ্রকারে, তা লইয়া এখানে বিচার অনাবশ্যক), সেটি হয় সপাদ।

বর্তমান স্থলে, অপাদের সপাদ হওয়াটি যে কি প্রকারে, তার আলোচনা হইতেছে না। ঐ পরমাশ্চর্যটিকে আশ্চর্যরূপেই মানিয়া লওয়া হইতেছে। (প্রসিদ্ধ 'আশ্চর্য্য' মন্ত্রে এবং অন্যত্র নানাস্থলে শ্রুতি এবং অনুভব যেরূপ করিয়াছেন)।

সম্পদ্যতে ত্বপাদোঽপি সমৃধ্যতে স আত্মরাট্।
ঊর্ণনাভঃ স কূর্ম্মো বা মায়াবী কিমুতান্যঃ সঃ॥
বিন্দৌ চ নাদতাপন্নে প্রসক্তা পদ্যমানতা।
মীয়তা বিন্দুমুদ্দিশ্য সোমার্দ্ধং বীজতা দ্বয়োঃ॥ ১৩৩-১৩৪

আশ্চর্য যে, অপাদ হইয়া এবং রহিয়াও সেটি সম্পন্নতাদি সম্বন্ধে আসিয়াছে—যেমন, 'জবনো গ্রহীতা' ইত্যাদি। অচক্ষুঃ অথচ দৃষ্টিবৃত্তিসম্পন্ন; ইত্যাদি। আবার, আত্মরাট্ রহিয়াও, সেটি সমৃদ্ধতাদি সম্বন্ধে আসিতেছে। স্ব-সত্তায় মিথুনত্ব, বহুত্ব; স্ব-শক্তিতে সর্বজ্ঞত্ব, সর্বস্রষ্টৃত্ব ইত্যাদি ঐশ্বর্য; এইরূপ রসে, ছন্দে, আকৃতিতে, যেটি আত্মরাট্ (অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিত্য স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ হইয়াও); সেটি, আশ্চর্যভাবে, সমৃদ্ধ হইতেছে। পরিনিষ্ঠিত সামগ্রী আবার সম্পন্ন হইতেছে, পূর্ণের আবার পূরণ হইতেছে! সেটি কি ঊর্ণনাভের মত, না, কূর্মের মত, না মায়াবীর মত, অথবা, অন্যকিছুর মত (কিমুতান্যঃ)? এ কয়টি উপমা বিকল্পনায় অপাদসামগ্রীর সপাদ হবার যে-কয়রকমের 'আকৃতি' মিলে, তাতে ভাবনা দিও। তবে ঔপমিক কল্পনায় তো তত্ত্ব-বিনিশ্চয় হয় না। এসব উপমার মধ্যে, ঊর্ণনাভে প্রকৃতি বা কারণ সঙ্কোচ ও প্রসার; কূর্মে প্রত্যয় বা সূক্ষ্ম সঙ্কোচ ও প্রসার; এবং মায়াবীতে প্রতীত বা স্থূল সঙ্কোচ-প্রসার বিশেষভাবে লক্ষিত। মহামায়া বা ভগবত্তাসূত্রে এই মূল আশ্চর্যটি যথাসম্ভব ধারণায় আনিতে চেষ্টা হইয়াছে। 'বিন্দু' প্রভৃতিও পুনশ্চ প্রণিধেয়। এখন, এই মূল আশ্চর্যটিকে যদি দুই দিক্ দিয়া দেখ, তবে পাও ঐ দুটি মূলবৃত্তি—পদ্যমানতা এবং মীয়মানতা। 'সম্পন্ন' বলিতে মুখ্যতঃ প্রথমটি, কিন্তু 'সমৃদ্ধ' বলিতে দুটিই প্রসক্ত হয়। এর মধ্যে, বিন্দুর নাদভাবে আসাতে পদ্যমানতা (পাদ), আর, নাদের বিন্দুকে 'উদ্দেশ' করাতে মীয়মানতা বা মাত্রা। নাদই পাদের সামান্য ও আধার (অধিকরণ) রূপ; বিন্দুই মাত্রার (করণতার) চরম ও পরম

রূপ। ব্রহ্মকারণতার বিন্দুকরণতাই পরমরূপতা। 'কিছু করিতে বা হইতে' বিন্দুকে চাই-ই চাই।

সুতরাং, 'সোমার্দ্ধ'কে পাদমাত্রা এতদুভয়ের বীজরূপে জানিবে। সোম বা ওঙ্কারের মাঝে (অর্দ্ধং), সমাত্র এবং অমাত্রের সেতুরূপে অবস্থিত বলিয়াও সোমার্দ্ধ।

১৩। তত্রৈব মাতৃমানব্যবহারযোগ্যতাপত্তিঃ সমাত্রত্বম।।

সেই সপাদ (আনন্দ) মাতৃ-মান ব্যবহারে আসিলে সমাত্র।

বীজটি অঙ্কুরাদিক্রমে সপাদ হইতেছে; বীজের নাভিতে কোন এক রহস্য বস্তু বলিতেছে—আমি মাতা, তোমার অঙ্কুরাদি সকল পাদই আমি 'মাপিয়া' যাইতেছি; বাহির থেকে যে রস, আলোক-তাপাদি, তাও মাপিয়া লইতেছি। তোমার এই অবিশ্রান্ত সম্পদ্যমানতায় কোথাও একটা রেণু, কোথাও এতটুকু স্পন্দও মাপে, মাত্রায় না আসিয়া যাইবে না। পাদমাত্রার এই প্রকার পরস্পর ওতপ্রোত অন্বয়। কেবল, অধিভূতে নয়, অধ্যাত্মাদিতেও এই দৃষ্টিতে দেখিবে। অথচ, পরমাশ্চর্য এই যে, যেটি (আনন্দ) অঙ্কুরাদি পাদবিস্তার করিতেছেন, তিনি বিষ্ণু উরুক্রম হইয়াও অপাণিপাদ 'পরমাকাশ' ভূমা। আর, নাভিতে ঐ যে 'মাতা', সেটি 'মাত্রা' রূপে অন্তর্বহিঃ নিখিলের পরিমাপ লইতেছে বটে, কিন্তু স্বরূপে সেটি তো সেই বিন্দু যাতে 'শূন্যত্বপূর্ণত্বে একত্র'। কাজেই, বিশ্বে কোথাও সম্পদ্যমানতারও শেষ নেই, মীয়মানতারও অন্ত নেই। যে ভূমিতে এটি 'নিতরাং অপাস্ত' সেটির কথাই কারিকায় বলা হইতেছে—

নান্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপেণ ব্যতিরেকেণ মেয়তা।
অপাস্তা নিতরাং যত্র স আত্মেত্যবগম্যতে।
আত্মৈবেদমিতি শ্রুত্যা সর্ব্বভূতাত্মতা শ্রুতা॥ ১৩৫

বহিঃপ্রজ্ঞ নয়, অন্তঃপ্রজ্ঞও নয়, ইত্যাদি ব্যতিরেকমুখে মানমেয়তা (এবং তার সঙ্গে পাদ-পদ্যতা) একান্তভাবে যে 'ভূমিতে' অপাস্ত, সেটিকে 'আত্মা' জানিতে

হইবে। অথচ, ‘এ সবই আত্মা, আত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়’, এভাবে আত্মার সর্বভূতাত্মতাও শ্রুতি এবং অনুভবে প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং, আত্মাকে শুধু ব্যতিরেকমুখে নিখিলব্যবহারের ‘নিতরাং অপাস্ত’ ভূমিই দেখিতেছি না, পরন্তু অন্বয়মুখে, পাদমাত্রাদির ‘নিতরাং সমস্ত’ ভূমিও দেখিতেছি। আনন্দের এবম্বিধ অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে যে ‘নিতরাং সমস্ত-অপাস্ত’ ভাব, সেটিই আত্মা—‘শান্ত আত্মা’ এবং ‘সর্ব্বভূতাত্মা’ দুই ভাবেই। ‘নিতরাং সমস্ত’ বলিতে, সেই ভূমি যেখানে নিখিলব্যস্ত পাদমাত্রাদির পরমসমাসটি সিদ্ধ (Realm of Complete Integration and Perfect Synthesis)। অপাস্ত-সমস্তের তত্ত্ববিচারের ইহা অবকাশ নয়। দুটিই আছে, এবং জপাদিসাধনে ‘সমস্ত’কে ধরিয়াই ‘অপাস্তে’ আসিতে হয়। এই যে ‘সমস্ত’ ভাব, সেটিকে আবার ব্যষ্টি সুষুপ্তি অথবা সমষ্টি প্রলয়ের মত একটা অব্যক্ত, অব্যাকৃত ভূমি ভাবিয়াই ছাড়িয়া দিও না। পূর্ণভান বা জ্ঞানের ভূমিও অবশ্য আছে। পূর্ণজ্ঞানের নাম যদি দাও ‘বেদ’, তবে সে বেদও নিত্য, এবং ‘বেদবিদেব চাহম্’টিও নিত্য। অপাস্ত এবং সমস্ত, দুইভাবে আনন্দই আত্মা; তাই আত্মা ‘প্রিয়ঃ পুত্রাৎ প্রিয়ো বিত্তাৎ’ ইত্যাদি। এইবার, আত্মার ঐ দুইভাবের মাঝে যেটি সেতুভাব—

১৪। তদুভয়ত্বযোনিরর্ধমাত্রা॥

সেই দুইভাবের (সপাদ-সমাত্র) যোনি অর্দ্ধমাত্রা।

সমাত্রামাত্রয়োঃ সন্ধিঃ সপাদাপাদয়োরপি।
সন্ধিমেনং সমাশ্রিত্য প্রবৃত্তির্মানপাদয়োঃ।
সন্ধিস্তু যোনিরুৎপত্তৌ নিবৃত্তৌ তস্য সেতুতা॥ ১৩৬

সমাত্র এবং অমাত্র, সপাদ এবং অপাদ—এ দুটিভাবের মাঝে এক পরমরহস্য ‘সন্ধি’ হইয়াছে। এ সন্ধির কোনও নিদান নিরুক্তি দেয়া যায় কৈ! অথচ, এই রহস্যময় সন্ধিটিকে ধরিয়াই পাদমাত্রাদির ব্যস্ত-সমস্ত উভয়ভাবেই প্রবৃত্তি। ঐ সন্ধিটি ছাড়িয়া বিশ্বে, অন্তরে অথবা বাহিরে কোথাও, কিছুই, ব্যস্ত অথবা সমস্তরূপে, সম্পাদিতও হয় না, পরিমিতও হয় না। যেমন আবার সেই বীজ আর অঙ্কুর। বীজের যেটি নাভি,

আর তার যেটা অঙ্কুরভাব, এ দুয়ের মাঝে কোন সন্ধিসূত্রটি থাকিয়া যেন নির্দেশ দেয়, প্রেরণা দেয়—তুমি অঙ্কুরে সম্পাদিত ও পরিমিত হও দেখি এইবার! ভিতরে জপাদিতে, ভাবে, রসে, অনুভূতিতেও তাই। ভাবিয়া দেখিও। এই রহস্য সন্ধিটি আবার, পাদমাত্রাদির উৎপত্তি (বিকাশ) সম্বন্ধে 'যোনি'। আর, অপাদ-অমাত্রে তাদের নিবৃত্তি বা বিলয় সম্বন্ধে 'সেতু'। এই 'অৰ্দ্ধমাত্রা' পূর্বে পুনঃ পুনঃ এ গ্রন্থে কথিতা হইয়াছেন। ব্রহ্মা কেন যে অর্দ্ধমাত্রাকে যোগনিদ্রারূপে স্তুতি করিয়াছেন, এবং এখনও আমাদের মাঝে করিতেছেন, তাও চিন্তা করিও। 'অৰ্দ্ধ' শব্দের ব্যঞ্জনাটিও সবিশেষ ধ্যানযোগ্য।

১৫। কলা পাদমাত্রাসমাহারাৎ॥

পাদ এবং মাত্রা দুয়ের 'সমাহার' হইলে কলা।

এই সমাহারকে বীজ এবং ফল, দুইভাবেই দেখিতে হইবে। বীজে ফল সম্ভাব্যরূপে সমাহৃত; ফলে বীজ সম্ভাবিতরূপে সমাহৃত। বীজে 'কল' (কলান' বীজ কথাও আছে), ফলে 'ফল'। প্রথমটিতে কলনী শক্তি; দ্বিতীয়টিতে ফলিত রূপ, ভাবাদি। বীজে শক্য সমাহার (Power or Potency Composed); ফলে ব্যক্ত সমাহার (Resultant Recomposed)। শক্যতা থেকে ব্যক্ততায় পৌঁছিয়া শক্যতা নিজেকে নিঃশেষিত করিল না, অভিনব শক্যতারূপে আবার সমাহৃত করিয়া লইল। কাজেই, কলায় পাদমাত্রার সমাহারটিকে বীজ এবং ফল, শক্য এবং ব্যক্ত (নবশক্যগর্ভ), দুইভাবেই দেখিতে হয়। বীজরূপে পাদমাত্রাদিতে সমগ্রভাবে সমাহার হয়। কিন্তু ফলে, অংশকলাদিরূপটি বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমটি, undifferentiated synthesis; পরেরটি, differentiated integration.

পাদেন পদ্যমানত্বং মীয়ত্বঞ্চাপি মাত্রয়া।
তয়োরেব সমাহারাৎ ফলত্বং কর্তৃকর্ম্মণোঃ।
আনন্দকলয়া বীজ-ফলয়োর্বিন্দুনাদতা॥ ১৩৭

'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ' বলিতে এস্থলে কারকক্রিয়ার অন্বয় বা সংগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে। এ সংগ্রহের গোড়ায় কি? বীজরূপা যে কলনী শক্তি, তাহাই। পদ, বাক্যাদিতে সেটিকে

শব্দশক্তি বলি। আর, ক্রিয়াকারকের এরূপ সংগ্রহের সমাপন কিসে? ফলে বা অর্থে। এখন, ভাবিয়া দেখ, পাদে যে পদ্যমানতা, আর মাত্রায় যে মীয়মানতা (পদবাক্যাদি স্থলে বাচ্যতা এবং প্রমেয়তা), সেই দুই-এর সমাহার না হইলে (সমন্বয়ে, সমানাধিকরণাদিতে আহৃতি না হইলে), বীজত্ব এবং ফলত্ব (যেমন, ঐ বাকের বেলা), এ দুয়ের কোনটিই সাধিত হয় না। বাগাদির দৃষ্টান্ত লইয়া পাদমাত্রার এই সমাহারটি ('কল' ও 'ফল' দুইভাবে) ভাবিয়া দেখিও।

এখন, আনন্দই নিজ কলায় ('অংশ' অর্থে নয়) বিন্দু এবং নাদভাব আশ্রয় করিয়া সমস্ত কিছু ক্রিয়াকারক ব্যবহারে বীজ এবং ফলরূপ ধারণ করিতেছেন, জানিও। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুর বীজই আনন্দের বিন্দুকলা, আর, ফল নাদকলা। 'ক' ব্যঞ্জনমুখ = সুখ = আনন্দ; 'ল' = কলত্ব এবং ফলত্ব; আ = ব্যাপ্তি—কাষ্ঠা। সুতরাং, আনন্দ 'কলা' হইয়া বলেন—'আমি মূলভাব থেকে, (যেমন বীজ, অথবা ওঙ্কারাদি বাক্) বিচিত্র ব্যঞ্জনায় নিজেকে কলন এবং ফলন করি; ব্যাপ্তির এক এক সীমা বা কাষ্ঠাও মানিয়া লই।"

অর্দ্ধমাত্রাকে সমাহৃত-বিন্দু-নাদ আনন্দকলা রূপে ভাবনা করিও। অর্দ্ধমাত্রায় ঋদ্ধি বা ঋধ্যমান ভাবটি থাকে। এইটি শক্তির স্বধর্ম। শক্যকে ব্যক্ত, এবং ব্যক্তকে শক্যে আনাতেই শক্তি স্বভাববৃত্তিমতী। ভগবত্তায় কখনও যোগমায়া, কখনও যোগনিদ্রা। ঐ ঋধ্যমানভাবটি হয় নাদের পরমতা এবং বিন্দুর পরমতা, এই দুটিকে উদ্দেশ করিয়া, এবং উভয়াভিমুখ 'উরুক্রমে' উভয়কে 'সমাহৃত' করিয়া। এর ফলে পাদ ও মাত্রা।

কলাকে পরমা, মধ্যমা এবং অবমা—এই তিন ভাবেই দেখিও। পরমা ভাবে কলা আনন্দব্রহ্ম বা রসভূমার সৃষ্টি-লীলাদিরূপে আত্মকলয়ন বা স্বকলায়ন। মধ্যমারূপে ইনি সন্ধি ও সেতুরূপা। আর, অবমারূপে বর্ণরূপাদি কলা-অংশাদি রূপা (aspects, partials, components)।

১৬। অংশো মীয়মানত্বস্য মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ॥

সেই আনন্দকলা 'অংশ' রূপে লক্ষিত হন, যখন তাঁহাতে 'মীয়মানত্ব' বা পরিমাণার্হত্ব মুখ্যরূপে ব্যপদিষ্ট (লক্ষণ-সংজ্ঞাদি দ্বারা উদ্দিষ্ট) হয়।

সামগ্র্যেণাস্তি সর্ব্বং হি সব্যাপারং তথৈব চ।
তত্র তু মানভাসেন পৃথক্ত্বমংশভাগতঃ।
প্রত্যবচ্ছেদজন্যাংশে ব্যাপ্তে ব্যষ্টিত্বমাপ্যতে॥ ১৩৮

পূর্বে আনন্দের যে স্বকলায়ন প্রসঙ্গা হইল, সে স্বকলায়নের ফলে যে সৃষ্টি এবং লীলা, তাতে কোন কিছুই (এমন কি, এক ধূলিরেণুটিও) তত্ত্বতঃ খণ্ডিত (segmented) এবং ব্যবহারতঃ 'ত্যক্ত' (isolated) হইয়া নেই। মহাসঙ্গীতে এক একটি স্বর, এক এক ছন্দঃ যেমন। অথচ, মান বা মীয়ত্বের ভাসটিও সেই সমগ্র অখণ্ডভাবে উদিত হইতেছে, যাতে বোধ হইতেছে যে, বিশ্বে প্রতিটি পদার্থের সত্তাশক্তি প্রভৃতির 'অংশ' বিলি হইয়া তাদের পৃথক্ত্বা ঘটিয়াছে। মুখ্যতঃ মান বা মীয়তা (Measure) সমগ্র অখণ্ডভাবে ভাসরূপে উদিত (manifest, emergent) হইলে, এবম্বিধ অংশভাগ এবং তন্নিমিত্তক পৃথক্ত্ব ব্যক্ত হইয়া থাকে। Fact হয় Fact-section, এবং Fact-section হয় Fact as 'bounded and rounded'। মীয়তার দিকে দৃষ্টি গেলে এই ভাসরূপটি আসে। মনে রাখিতে হইবে যে, জপসূত্রমে ভাস = আভাস নয়। যেটি স্বয়ং অবৌদ্ধ (alogical), সেটির বৌদ্ধ (logical) 'ছবি' বা আকৃতি ভাস। বিমর্শপঞ্চকবশতঃ এই ভাস আবার পঞ্চধা অভিব্যক্ত হয়। মিথ্যাত্বের লক্ষণ জালটি 'বিশ্ববেড়া' করিয়া তাতে ভান–ভাসাদি সব কিছু টানিয়া লইয়া, ভক্তি প্রভৃতি অপর 'সিদ্ধান্তভেদ' যাতে না জন্মায়, সেই ভাবেই জপের আধার প্রস্তুতিতে জপসূত্রম্ অগ্রসর হইতেছে। এইজন্য, অংশকে 'প্রত্যবচ্ছেদজন্য' বলা হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। যেটি unmeasured, তার মধ্যে কোন কিছুকেও as part, as factor, as component, 'measure out' করা। তুমি আমিই সেটি করিতেছি? করি বটে, কিন্তু মূলতঃ আনন্দব্রহ্ম স্বকলায়নেই (by an inherent, immanent process) সেটি করেন, এবং করিতেছেন। 'প্রত্যবচ্ছেদ' বলিতে এমন প্রকার অবচ্ছেদ (live cross-sectioning), যাতে অংশটি পৃথক্ হইয়াও সত্তাশক্তি ইত্যাদিতে এবং ব্যবহারে অখণ্ড সামগ্রীর সঙ্গো 'যুক্ত'ই থাকে। যেমন, এই সজীব দেহ। এটিকে মারিয়া dissection tableএ টুকরা টুকরা করিয়া দেখাইতেছি না; পরন্তু, জীবন্ত রাখিয়াই X-ray ইত্যাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখাইতেছি। এই শেষের স্থলে অংশগুলির যুক্তভাবটি রহিয়া

গেল; ফলে, গঠন এবং ঘটন (structurally and functionally) দুইভাবে অংশগুলিকে সমীক্ষাপরীক্ষা করা গেল। প্রণব, গায়ত্রী, নাম ইত্যাদিতে অংশও কলাদি এইভাবেই মিলাইতে হয়। এরূপ অংশ-কলাদি 'সমাদরে' (appreciationএ) ভক্তিসিদ্ধান্তাদি ক্ষোভ পাইবেন না, মনে হয়। শ্রুতিস্মৃতি, আগমপুরাণে 'অংশ', 'কলা' বহুধা কথিত হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তেরও নিজ সিদ্ধান্ত আছে। এ সকলেরই সামান্যাধাররূপে এস্থলে অংশসূত্র নিবন্ধ হইল। বহির্বিজ্ঞান, গণিতাদিও বাদ পড়িলেন না। Term of a Series ইত্যাদি।

ঐ যে প্রত্যবচ্ছেদজন্য অংশ, তাতে ব্যষ্টিতা (individuality) এবং মাপ্যতা (measurability), এ দুই ধর্ম ব্যাপ্ত থাকে, দেখিও। আরও ভাবিয়া দেখিও যে, অংশভাবটি অর্দ্ধমাত্রার 'বিন্দুক্রমে' (tendency to centralization, pointedness, focussing) আসিয়া থাকে।

১৭। অংশী পদ্যমানত্বস্য মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাচ্চ॥

আর, পদ্যমানতা (পাদ) মুখ্যরূপে ব্যপদিষ্ট হইলে, অংশী।

'বিন্দুক্রমে' সমস্ত কিছু যেন কূর্মবীজাদির মত নিজেকে সামগ্রিক সত্তা ও সম্বন্ধ থেকে 'গুটাইয়া', কোন কেন্দ্রে এবং সংস্থায় 'জড়ো' করিয়া 'অংশ', কলা হইয়াছে। কিন্তু আবার 'নাদক্রম'টিও তো আছে। এই পদ্যমান বিততভাবটি মুখ্য হইলে, অংশের সম্পর্কে হয় অংশী।

পল্লবং পাদপস্যাংশঃ পাদপস্যাংশিতা মতা।
পার্থিবাংশো ভবেদ্রেণুঃ পাদপাঙ্গাশ্চ পল্লবম্।
ক্রিয়াঙ্গামপি বেদাঙ্গং বাক্যাঙ্গাদীনি চিন্তয়েৎ॥
অবয়বান্ পুনশ্চাপি ন্যায়াবয়বপঞ্চকম্।
অর্থার্থী ধর্মধর্মী চ শক্তিশক্তিমতোর্দ্বয়ম্।
তাদাত্ম্যমভিসন্ধায় সম্বন্ধস্যাধিরোহণম্॥ ১৩৯-১৪০

'অংশ-অংশী' ভাবটি পূর্বোক্ত লক্ষণানুযায়ী সমন্বিত করিয়া বর্ণাদিসমাশ্রিত যে জপাদি, তাতে প্রবৃত্ত ও অগ্রসর হইতে হয়। লক্ষণ 'সার্ব্বভৌমিক', জপাদির ক্ষেত্রে

তাদের যথাযথ প্রয়োগ। প্রয়োগের ক্ষেত্রে (কেবল জপে নয়, বিজ্ঞানাদিতেও) ঐ অংশ-অংশী সম্বন্ধের একপ্রকার অধিরোহণ (জপে যেমন অভ্যারোহণ) আছে, এবং সাধনে সোপানাবলীর মত সেই ক্রমে অধিরোহণ করিতে হয়। প্রথম ভাব বা সোপান—জড়, বা স্থূল (mechanical) অংশ-অংশী ভাব। যেমন, মাটি বা পাথর, আর তার রেণু। সাধনের প্রারম্ভে জপ মন্ত্রাদির বর্ণাদি এই 'জড়ীয়' ভাবে থাকে। এটি আনন্দের এবং কলার 'অলসিত' ভাব। সব যেন পৃথক্, কোন সূত্রে আত্মীয়তায় গৃহীত হয় নাই। পাদপ আর তার পল্লবের অংশী-অংশ ভাব বলা হয়, এই জড়ীয় দৃষ্টিতে। কিন্তু সূত্রান্বয়টিতে দৃষ্টি দিলে ঐ সম্বন্ধ ভাসে অঙ্গী আর অঙ্গ ভাবে। Mechanical দৃষ্টি হইল Organic। তার পরের সোপান, অবয়ব-অবয়বী। কিন্তু তৃতীয়ে আসিবার আগে ক্রিয়াঙ্গ, বেদাঙ্গ এবং বাক্যাঙ্গ, এ তিনের অঙ্গাত্ব অঙ্গিত্ব যে কি প্রকার তা চিন্তা করিয়া লইও। এ তিনে সম্বন্ধটি 'প্রাণিক' (organic) বটে, অর্থাৎ, অঙ্গসমূহের অন্যোন্যাপেক্ষা এবং উপকারকত্ব বিস্পষ্ট বটে, কিন্তু অচ্ছেদ্যত্ব বা অবিনাভাবটি এখনও 'গাঢ়' (compact) ভাবে ভাসে নাই। 'ব্যূঢ়' বা conditional রূপটি এখনও ব্যক্ত। যদি ফলটি চাই তো অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার এই এই অঙ্গ, ক্রম, মাত্রা ইত্যাদি। অপর দুটি দৃষ্টান্তেও ব্যূঢ়ভাব আছে। কিন্তু অবয়ব-অবয়বীতে তাদের আর আলাদা আলাদা করিয়া দেখা যায় না (Psychologically interrelated and logically congruent)। ন্যায়ের (অনুমানের) অবয়বপঞ্চক যেমন; অনুমিতিরূপ যে প্রমিতি সেটি এই পাঁচটি অবয়ব লইয়াই। বাক্যাঙ্গে এর নিকট ভাব আছে। এই সোপানাশ্রয়ে, অর্থার্থী, ধর্মধর্মী, শক্তি-শক্তিমান্, এ তিনকে মধ্যে সমাশ্রয় করতঃ তাদাত্ম্যে উপনীত হও। ন্যায়াবয়বাদিতে ন্যায়ই গঠিত হইতেছে ঐ পাঁচ অবয়বে অথবা তিন অবয়বে। ওদের কোনটি বাদ দিয়া (স্বার্থ পরার্থ কোন স্থলেই) 'ন্যায়'ই হয় না। তথাপি অবয়বগুলির পরস্পর প্রতিযোগিজ্ঞানাধীন-জ্ঞানবিষয়ত্ব নেই। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান' জ্ঞানটি হইতে, ধূম (হেতু) বা মহানস (দৃষ্টান্ত) এর জ্ঞানটি যে চাই-ই এমন নয়। ঘটাভাব বলিতে যেমন ঘটের জ্ঞান চাই-ই। অথবা, শিষ্য এবং গুরু। বাচক এবং বাচ্য। অর্থার্থী স্থলে এটি আসিল, কিন্তু ধর্মধর্মী আর শক্তি-শক্তিমানে যেমন, তেমনভাবে নয়। এগুলি চিন্তা করিয়া দেখিও। সমস্ত কিছু আনন্দ-তাদাত্ম্যে পরিসমাপ্ত করিতে গেলে, অংশীসূত্রের প্রসঙ্গে উল্লিখিত এই অধিরোহণীটি

আশ্রয় করিতে হয়। ভাবিয়া দেখিতে হয়—আমি আর সাধন, পদ্যমানতার কোন্ সোপানে এখন অবস্থিত? দৃষ্টির এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দসংবিত্তির স্ফুরণ পাদে পাদে সম্পন্নতায় উপনীত হইতেছে কিনা দেখিতে হয়। গীতায় যে 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং', তার মধ্যে অর্থার্থীর পূর্ব সোপানগুলিতে অলসিত, সুতরাং, আর্ত-ভাব; অর্থার্থীতে অর্থ বা প্রয়োজনের বোধটি জাগরূক, সুতরাং, উল্লসিতের অঙ্কুর। ধর্ম-ধর্মীতে জিজ্ঞাসু; শক্তি-শক্তিমানে জ্ঞানী। এ দুটিতে জড়াইয়া উল্লাসপ্রৌঢ়ি এবং বিলসিত। আর, 'একভক্তি' এবং 'যুক্ততমে' তাদাত্ম্যাশ্রিত স্বলসিতটিও। সাধনজীবনে এইটিই সব চাইতে মরমী প্রশ্ন—আমি আর্ত, আনন্দবিধুর; ওগো জ্যোতীরসসামগ্রী! কবে বল তুমিই হবে আমার অর্থ, আর আমায় করিবে তোমার অর্থী? রসভূমিতে এই সীমানাটি পার হইয়া রাগানুগ। তখন, ধর্ম-ধর্মী। রাসমণ্ডলে শক্তি-শক্তিমান্। আর, 'প্রমুদিত রাসকমলে' অনির্বচনীয় তাদাত্ম্য। জ্ঞানী শুভেচ্ছা থেকে তুর্যগা পর্যন্ত ভাবিয়া দেখিবেন।

বহির্বিজ্ঞানাদিতে দৃষ্টান্তের জন্য আর গেলাম না। তবে, প্রয়োগ আছে।

এইবার, লীলাসূত্র—

১৮। উল্লসিতত্বমানন্দস্য লীলা॥

আনন্দের উল্লাস লীলা।

বিশ্বস্য ব্যবহারস্য স্বয়ং মূলমমূলং যৎ।
উল্লসিতত্বমব্যক্তমাত্মন্যেবোপলক্ষ্যতে॥ ১৪১

নিখিল বিশ্বব্যবহারের (সৃষ্টি স্থিতি লয়াদির) মূলরূপে যেটি স্বয়ং অমূল, পরব্রহ্মে অথবা আনন্দে সেই অব্যক্ত উল্লসিত ভাবটিই লীলা। আপন আত্মায় উপলক্ষণ (তটস্থ) ভাবে এই অনির্বচনীয় উল্লসিত রূপটি বুঝিয়া দেখিও। 'আত্মৌপম্যেন' বুঝিয়া দেখা বৈ বুঝার উপায়ান্তর নেই। উল্লাসাদি 'এই' আত্মায়ও উপমিত হইতেছে, তাই না রক্ষা! আপন এই আত্মাই নিখিল তত্ত্ব এবং ভাবের উপমাস্থল; সমস্ত কিছু ভাবের ভাব বা নমুনাটি এখানে। 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি

ন তৎ ক্বচিৎ’। পরম তত্ত্ব এবং ভাব সম্বন্ধেও ‘আত্মপ্রত্যয়ৈকসারম্’ বলা ছাড়া গতি নেই! তবে, আত্মাই আবার হিরণ্ময় পাত্র দিয়া সত্যের মুখটি অপিহিত করিয়া রাখে, এবং ‘পূষা’ রূপে স্বয়ংই সত্যের মুখ অপাবৃতও করে। তখন সেটি হয় প্রত্যগাত্মা।

আনন্দের উল্লাসভাব যে লীলা, সেটি আপন আত্মাতেই সত্যের মুখ যথাসম্ভব অপাবৃত করতঃ বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মদৃষ্টি ব্যতীত অধিভূতাদিতে আনন্দ, এবং উল্লাস-লীলাদিভাব, সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে ধরিবার কোন সূত্র নেই। বিশ্বে তাই প্রকাশ এবং আনন্দ এ দুয়েরি গুণ্ঠিতাদি রূপ। নিজের ভিতরেও যাবৎ পরাপ্রকৃতি অপরাতে কবলিতা, তাবৎ যন্ত্র আর যন্ত্রারূঢ় রূপটাই সচরাচর ফোটে। অথচ, আনন্দই সব কিছুর ‘হৃৎ’, সব কিছুর ‘আত্মা’ বলিয়া, কোথাও, একটা ধূলিরেণুতেও, ‘অপিহিত’ হওয়া সত্ত্বেও, আনন্দ এবং লীলা বাধিত ও নিরস্ত হয় নাই। পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠা, এ চারিটি মাপকে মিলিয়া কুত্রাপি সেই স্বরূপতঃ অপাদ-অমাত্রাদি আনন্দ-লীলাকে সর্বথা সম্পাদিত, পরিমাপিত, সঙ্কলিত এবং সীমিত করে নাই। এ সমস্ততে ব্যাপ্ত হইয়াও আনন্দ এবং লীলা ‘অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্’। ‘পাদোঽস্য’—বিশ্বভুবনের যে ‘বজ্রবাঁধুনি’, সেটা তার একটি পাদেই। জপসূত্রমে এই রূপটিই বিশেষতঃ ফুটাইবার যত্ন হইয়াছে, আনন্দ যেরূপ নিখিলের ‘হৃৎ’, উল্লসিতরূপ লীলাও সেইরূপ নিখিলের ‘হৃদয়’, Core and Heart of everything. ‘Heart’ বলিতে ‘Live Pulsating Heart’ বুঝিও। জপাক্ষর লইয়া আর তাদের পাদমাত্রাদি লইয়া আছ। কিন্তু প্রতীক্ষায় আছ কবে—অক্ষরে ‘হৃদি সন্নিবিষ্ট’ আনন্দঘন ‘অক্ষর’, পাদে পদ্যমান, মাত্রায় মীয়মান ইত্যাদি হইতে হইতে বলিবেন—দেখ, এসবই আনন্দের পাদ, আনন্দের মাত্রা, আনন্দের কলা। কাজেই, অলসিত থেকে উল্লাসবিলাসে রূপায়িত হওয়াই এর স্বভাব; আর স্বলসিতে তার সীমাহীন অন্তহীন কাষ্ঠা। এটি ফুটিতে থাকিলে, তোমার জপ পাইল তার ‘হৃদয়’। ‘হৃদ্দেশে’ পাতা যন্ত্রের যেটি ‘কীলা’ সেটি ‘ঢিলা’ হইতে হইতে ‘হৃদয়ে’ হইল ‘লীলা’।

১৯। তস্যা নিরতিশয়নির্ব্যূঢ়ত্বেন স্থিতিত্বং কৈবল্যম্॥

লীলার নিরতিশয় এবং নির্ব্যূঢ়রূপে স্থিতির ভূমি লীলাকৈবল্য।

লীলাহৃদয়সর্ব্বস্য বাধ্যতা ব্যবহারতঃ।
নিরতিশয়নির্ব্যূঢ়ং কৈবল্যং বাধবাধনে॥ ১৪২

সমস্ত কিছু 'আনন্দহৃৎ' এবং 'লীলাহৃদয়' হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহারে যন্ত্রারূঢ় এবং যন্ত্রবাধ্য হইয়া নিজদিগকে দেখাইতেছে। এই যে বাধবাধিততা, এটি কোন কিছুর নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবে নেই; প্রত্যয়েও পূরাভাবে নেই (যথা, Indeterminacy Principle); কিন্তু ব্যবহারে যাহা 'প্রতীত', তাতে বর্তিয়াছে। বিজ্ঞানে ঐ ব্যবহার হইল Statistics, Average ইত্যাদি। 'গড়ে' পড়িয়া সমস্ত কিছুই বলিতেছে—এই তো আমি নাগপাশে বাঁধা আছি, নড়ন-চড়নটি নেই! অথচ, জড় থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কিছুতেই নাগপাশটি মোচনের নিমিত্ত 'গরুড়ের' শরণটিও রহিয়াছে। এই পাদের ২১, ২২, ২৩ সূত্রে জড়ের লক্ষণাদি করা হইতেছে, আর, ২৬ সূত্রে ব্যবহারলক্ষণ। লক্ষ্য করিও যে, বহির্বিজ্ঞানাদিকে অন্তর্ভাবে আনিয়াই এসব লক্ষণ।

এখন, ঐ যে 'বাধবাধ্যতা', সেটি যখন আবার নিজেকেই 'বাধন' (negate) করার দিকে চলিয়াছে, তা হইলে প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, ঐ বাধবাধনটি (negating the negative) কোন ভূমিতে (ক) নিরতিশয়, এবং (খ) নির্ব্যূঢ়? এ দুটি পরিভাষা আগে বোঝার যত্ন হইয়াছে। নিরতিশয় নাদেরও পরমতা এবং বিন্দুরও পরমতা; আর, নির্ব্যূঢ় বলিতে কলারও পরমতা। এইভাবেও নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিও। ভগবত্তায় এই লীলাকৈবল্য নিষ্ঠিত।

২০। বিলসিতত্বমানন্দস্য যোগমায়া॥

আনন্দের বিলাস যাতে হয়, সেটি যোগমায়া।

সম্বন্ধগুণকর্মাদিযোগাদ্ যা মায়তে স্বয়ম্।
সাক্ষাত্বেন পরানন্দং যোগমায়েতি সোদিতা॥ ১৪৩

আনন্দের যে পরমতা এবং লীলাকৈবল্য, সে দুটি ভাবকে 'সাক্ষাৎ' রূপে সম্বন্ধ, গুণ, কর্ম ইত্যাদি (অমায়িক) ভাবে স্বয়ং (স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষভাবে)

বিলসিত (বিচিত্র ও বিশেষ অনির্বচনীয়রূপে) করে যেটি, সেটি যোগমায়া। আনন্দের পরমোল্লাস বিলাসাদিরূপ যে ভগবত্তা, তা থেকে পৃথক কোন তত্ত্ব যোগমায়া নয়। ভগবত্তা স্বয়ংই অনির্বচনীয় বিলাসানুরোধে যোগমায়া, 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' ইত্যাদি বাক্যে যেন পৃথক্ত্ববিভ্রমে পাতিত না হই। আনন্দপরমতার যেটি লীলাকৈবল্য, তার বিলাসভূমির ভূমিকাটি (অমায়িক) সম্বন্ধাদিরূপে 'রচিয়া' দেন এই যোগমায়া। 'যোগ' এবং 'মায়া' শব্দ দুটিতে ধ্যান দিও। কারিকায়— 'যোগাদ্', 'মায়তে', 'স্বয়ং', 'সাক্ষাত্ত্বেন'—এই চারিটি লিঙ্গ ভাবনীয়। 'পরানন্দং' পদটি কর্মে প্রযুক্ত বটে, কিন্তু ঐ চারিটি লিঙ্গ দ্বারা পৃথক্ত্বে এবং পরাক্ত্বে গ্রহণীয় নয়। সুতরাং, সম্বন্ধাদিও 'মায়িক' নয়। ভগবত্তা স্ববিলাসের জন্য যোগমায়ায় যে অনির্বচনীয় (অচিন্ত্য) 'স্বমায়ন' করেন, স্বভাব যে ভগবত্তা, তার যোগেই, বিয়োগে নয়, সেটিকে মায়িকের গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না। মহামায়াদিসূত্রে এটি বিবেচিত হইয়াছে।

তবে আবার, এও ভাবিলে চলিবে না যে, যোগমায়ার কোন 'নামগন্ধ' এ মায়িক প্রপঞ্চে নেই, থাকিতেও পারে না। তা অবশ্যই নয়। একটি ধূলিরেণু, একটা বিন্দু শিশির, এক তৃণকুসুম, ভিতরে কোন এক পুলক বেদনা—কোন স্থলেই (অবশ্য, হৃৎ এবং হৃদয়ে) যোগমায়াকে 'বাদ' দিয়া প্রাকৃত মায়ার 'দখল' বর্তে নাই। যোগমায়ায় যে চারিটি 'লিঙ্গাক', সে চারিটি 'অপিহিত' মাত্র হইয়াছে জড়াদি ক্ষেত্রে, তিরোহিত কুত্রাপি হয় নাই।

কিন্তু, জড়ত্বটি কি?

২১। অলসিতত্বমানন্দস্য জড়ত্বম্।।

আনন্দের (এবং তৎসহ লীলার) অলসিতভাবই জড়ত্ব বা জড়ীয়ত্ব।

আনন্দনিষ্ঠলীলায়াঃ পরিসীমা হি বাধনে।
তত্রৈব জড়তাপত্তিঃ কৈবল্যমিব বাধিতম্॥ ১৪৪

আনন্দে লীলাকৈবল্য নিষ্ঠিত সন্দেহ নেই। স্বয়ং-স্বতন্ত্র ভাবটি, যাতে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যামর্শ ('challenge') নেই—**Absolute Autonomy grounded on** undivided, unchallenged Being and Becoming–সেটি হইল কৈবল্য। এতে যা কিছু 'বাধন' (limitation) দৃষ্ট হইতেছে, সেটি যে আদৌ কি ভাবে আসিল, তার নিদান কেহ দিতে যায় নাই— 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ'—এই প্রশ্নাকারেই তা থাকিয়া গিয়াছে। তবে, সীমাটি, গণ্ডীটি যে ভাবেই হোক্, টানা হইয়াছে। যেটি কৈবল্যরূপে নিষ্ঠিত, সেটি 'সীমিত' রূপে ঘটিত হইয়াছে। এই বাধনঘটিত, বাধনাঘটনের দিকেও এক পরিসীমাও (maximum limitation) দেখা যাইতেছে, অস্মদাদির প্রত্যয়ে এবং ব্যবহারে। কৈবল্যের সন্ধানে বাধবাধনের (negating the negation) দিকে যেটি নিরতিশয়, যেটি নির্ব্যূঢ়, যেটি পরিনিষ্ঠিত, তার পানে চলিতে হইয়াছিল। এস্থলে বিলোমক্রম (affirming the negation)। এর ফলে, আনন্দের স্বলসিত ভাবটি আর নেই, লীলাও আর নেই, এই নিষ্ঠিত নিষেধের অবমভূমিতে নামিয়া আসিলাম। পাইলাম নিষ্ঠিত স্বলসিতের স্থলে স্তিমিত অলসিতত্ব। লীলাস্থলে 'কীলা' (Bondage Factor)। এইটি হইল জড়ত্ব। যদি বল, এটির দরকার এই নিমিত্ত যে, স্বলসিত 'কোন গতিকে' আপনাকে অলসিতে না নামাইলে তো, আনন্দের উল্লাসবিলাসাদিও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে, তবে, বিচারশাস্ত্র যাই বলুক (whatever the dialectics may say) তুমি কেজো কথাটা খাসা 'মিষ্টি' করিয়াই বলিয়াছ, ইহা মানিতে হইবে।

কিন্তু জড়কে জড় করিয়া দেখিলে বা রাখিলে তো চলিবে না। ধর, তোমার জপের অক্ষরগুলো। বিজ্ঞানও আপন হস্তে দেওয়া জড়ের নাগপাশের বজ্র আঁটুনি, নিজেই খুলিয়া দিতেছে, অভিনব বিজ্ঞানের দেওয়া সব 'গরুড় মন্ত্র' (হাইজেন্‌বার্গ ফরমূলা ইত্যাদি) আওড়াইয়া। কিন্তু বাঁধনের গ্রন্থি খুলিয়াও খুলিতেছে না। তাই, এইভাবে 'দৃষ্টিকোণ' পাল্টাইয়া লইতে হইবে—

২২। অনিরস্যমানস্বভাবত্বে সঙ্কোচ্যমানবৃত্তিত্বমেব লীলাকৈবল্যস্য॥

আনন্দের স্বভাবে যে লীলাকৈবল্য, সেটির নিরসন না হইয়া (অর্থাৎ, সেটি থাকা সত্ত্বেও) সঙ্কোচাদি রূপেও সেটির বৃত্তি লক্ষিত হইয়া থাকে।

ধূলিলোষ্ট্রাদিষু জ্ঞেয়ং জড়ত্বং দৃশ্যভোগ্যয়োঃ।
অস্তিভাতিপ্রিয়ত্বেতি প্রকৃতিং কিং বিমুঞ্চতি।
আনন্দস্য চ লীলায়াঃ সর্ব্বনুস্যূততাস্থিতিঃ॥ ১৪৫

ধূলিলোষ্ট্রাদিকে (স্থূলভাবে), পঞ্চতন্মাত্রাদিকে (সূক্ষ্মভাবে), এমন কি, জগতের মূলে যে 'প্রকৃতি' সেটিকেও (কারণ ভাবে), দৃশ্যমাত্র, ভোগ্যমাত্র—এই ভাবে দেখিয়া বা জানিয়া, 'জড়' করিয়াছি। সাংখ্যাদির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অন্তঃকরণ এবং 'মহৎ'ও (যে গুলিকে সাধারণতঃ জ্ঞানের সাধন এবং জ্ঞানই ভাবা হয়), ঐ দৃশ্যভোগ্যের ভাগে পড়ে, কাজেই জড়। এটি অদ্বৈতবেদান্তেরও তটস্থ। ভক্তিসিদ্ধান্তে, বিশেষতঃ রসাশ্রিত সাধনে, 'প্রাকৃত', 'জড়ীয়' এ শব্দগুলির অন্যরূপ ব্যঞ্জনা। নানাপ্রসঙ্গে এ সকলে দৃষ্টিপাত হইয়াছে। জপসূত্রমের আধারে, কেবল বৈজ্ঞানিকের 'Matter' বা জড়ত্বকেই লক্ষ্য করা হয় নাই, অথবা ওদেশের দর্শনাদিতে রূপাদির এবং গুরুত্বাদির আশ্রয় অথবা সম্ভাবনাটিকেই লক্ষ্য করা হয় নাই; এদেশেরও সাংখ্যাদির জড়ত্বেই লক্ষণটিকে বাঁধিয়া রাখা হয় নাই। একটা সর্বানুস্যূত সূত্র পাবার চেষ্টা হইয়াছে। বিজ্ঞানেরই হোক আর দর্শনেরই হোক, যেটি 'জড়' বলিয়া 'খ্যাত' হয়, সেটির খ্যাতিতে একটা 'কুণ্ঠা', একটা 'সঙ্কোচ' থাকিয়া যায়। এটা যেন ভুলিয়া যাওয়া হয় যে, কোন পদার্থ কোন অবস্থানেই তার 'স্বভাব' বা প্রকৃতিটি ত্যাগ করে না, এবং সে স্বভাব হইল তাতে অস্তিতা-ভাতিতা-প্রিয়তার (সচ্চিদানন্দের) অবিনাভাব। এটি অপিহিত হয়, সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু তিরোহিত, নিরস্ত হয় না, হইতে পারে না। একটা ধূলিরেণুতেও না। শুধু আবার সামান্যভাবে তাই নয়। প্রত্যেক পদার্থের সত্তায় আনন্দব্রহ্ম বিন্দুরূপে অনুপ্রবিষ্ট; তার সত্তার যেটি 'হৃৎ', সেখানে অস্তি-ভাতিকে সঙ্গে রাখিয়াই আনন্দ পরম অহংরূপে সন্নিবিষ্ট; সুতরাং লীলাকৈবল্যই হইল তার 'হৃদয়'। এই চারিটি থেকে একটা নগণ্যধূলিও বঞ্চিত, বিতাড়িত হয় নাই, হইতে পারেও না—ব্রহ্মস্বভাব, বিন্দু, হৃৎ এবং হৃদয়। এ কয়টির 'খ্যাতি'তে (in apprehension and appreciation) অবশ্য বিচিত্রভাবে বাধ (negation ইত্যাদি) সম্ভাবিত হইয়াছে। নিউটনের দিনের বিজ্ঞানে জড়ত্বের যে খ্যাতি ছিল, বর্তমানে কি তাহাই? শুধু Mass and Energy সমীকরণসূত্রে গ্রথিত হইয়া নয়, Energy ও সেই বার্ট্রান্ড রাসেলের কথায়—Matter is becoming more and more mental, and Mind more and more material, অর্থাৎ, কার্টিজিয়ান যুগের সে দ্বৈতটির মার্জন হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং, বিজ্ঞানের খ্যাতিতেও শনৈঃ শনৈঃ এক সর্বানুস্যূততা স্থিতিই সম্ভাবিত হইতেছে। আনন্দ-লীলাই যে সেইটি, এ খ্যাতিটি কবে

হইবে? অতি সূক্ষ্ম যে অণু, তার মধ্যেও যদি পরম বিপুলটি (বিন্দুরূপে) বিদ্যমান থাকেন, আর বলেন—আমাকে যে পরিসীমাতেই লইতে যাও না কেন, আমি আপন নিরতিশয়তা এবং নির্ব্যূঢ়তায় কিছুতেই বেদখল হইব না, তবে তো জড়কে তার জড়ত্বেই 'জড়ো' করিয়া রাখিতে পারিলে না! যে সব পদার্থের 'জড়'রূপে খ্যাতি, তাদের প্রাণচেতনা, আনন্দ-লীলাদিরূপে 'অখ্যাতি'-ও যে অস্মদ্ব্যবহারে চলিতেছে, তাও বলিয়া আসিতেছি। বর্তমানে Nuclear Physics শুধু বহিঃপ্রকোষ্ঠের বার্তাই শুনাইতেছে। জড়ের 'হৃদ্দেশে' (যন্ত্রারূঢ়ভাবে), 'হৃদয়ের' স্পন্দনটিও এইবার শোনার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু সে স্পন্দন কার, কিসের? প্রাণ বলিতে এখনও যে প্রাণে শঙ্কা!

তারপর, দৃশ্য-ভোগ্য বলিয়া তুমি যেটিকে 'জড়' করিতেছ, তাতেও কি 'দৃশি' নেই, ভোক্তা নেই? দেখা ও ভোগ করা কি একতরফা? ঐ ফুলটি শুধুই দৃশ্য আর ভোগ্য, দ্রষ্টা আর ভোক্তা নয়? অন্ন নিজেও অন্নাদ নয়? যখন তুমি সেটি ভোগ করিতেছ, তখন সেটিও তোমায় ভোগ করে না? কতকগুলো আড়ষ্ট ফরমূলার কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে যে! নইলে, প্রমাণ-ব্যবসায়ী হইবে, প্রামাণ্য-অনুভবী হওয়া তো হইবে না, আর—'রসং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি!'

এই নিমিত্ত, পরের সূত্র—

২৩। দৃশ্যভোগ্যয়োর্দ্রষ্টৃভোক্ত্রোঃ স্বভাতিপ্রিয়ত্বাভ্যাং
পিহিতবৃত্তিত্বাদলসিতচেতনত্বং জড়ত্বে॥

দৃশ্য-দ্রষ্টা এবং ভোগ্য-ভোক্তা—এইভাবে দ্বন্দ্বস্থিতি (bi-polarity) স্থলে, দ্রষ্টা এবং ভোক্তার যে আপন ভাতিতা এবং প্রিয়তা, তদ্দ্বারা দৃশ্য এবং ভোগ্যের আপন (অস্তিতা নয়, কিন্তু) ভাতিতা এবং প্রিয়তার 'পিহিতবৃত্তিতা', আচ্ছাদিতভাবটি ঘটে, এবং সেই পিহিতবৃত্তিতার ফলে 'অলসিতচেতন' ভাবটি দৃশ্যে ও ভোগ্যে দেখা যায়; সেটি ঘটিলে জড়ত্বখ্যাতি।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, জড়ে অলসিতচেতনত্ব স্বতঃসিদ্ধ নয়। দ্রষ্টা এবং ভোক্তার সম্বন্ধে আসিয়া, তাদের নিজ (বিশেষতঃ ঐ সম্বন্ধে উর্জিত) লসিতচেতনত্বের প্রতিযোগিতায় যেন 'নিষ্প্রভ' ও অলসিত হইয়া যাওয়াই তাদের জড়ত্ব। কেমন?

নক্ষত্রাণাং চ সোমস্য দ্যুতিমাচ্ছাদ্য দীপ্যতে।
ভানুর্যথা তথা দ্রষ্টা ভোক্তা কর্ত্তেতি চিন্ত্যতাম্।
দ্বন্দ্বে ভোক্তুর্হি ভোগ্যস্য ভোক্তানন্দী ন চাপরম্॥ ১৪৬

সূর্য দীপ্যমান হইলে নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থের (কারিকায় ‘সোম’=ঐ উপগ্রহ চন্দ্রমণ্ডলটিই নয়) আপন আপন দ্যুতি আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। তারা কিন্তু দ্যুতিমৎই থাকে। দ্যুতি তাদের স্বভাবেই। দ্রষ্টা, ভোক্তা, কর্তা— এই ত্রিপুটীকে উপমার ঐ ভানুসদৃশ চিন্তা করিবে। নক্ষত্রাদি ভানুপ্রকাশাদির প্রতিযোগিতায় সে স্থলে দৃশ্যাদিস্থানীয়। উপমাস্থলে, নক্ষত্রাদিই অদৃশ্য হয়, কিন্তু উপমিতস্থলে, তাদের স্বভাতিত্বাদি আচ্ছাদিত হওয়ায় তারা হয় দৃশ্যাদি। এইরূপ দ্বন্দ্বস্থিতিনিমিত্ত প্রতিযোগিতা ঘটিলে, ভোগ্যের ‘ভাগে’ চেতন এবং আনন্দী ভাবটি পড়ে না, ভোক্তার ভাগেই পড়ে। অর্থাৎ, ঐরূপ প্রতিযোগিতাস্থলে, ভোক্তাই আনন্দী, ভোগ্যটি নয়, এভাবে খ্যাতি হয়। কিন্তু মিত্রমিলন, বনিতাসম্ভোগাদিস্থলে পারস্পরিকতাটি পরিস্ফুটই থাকে। সুতরাং ‘যোগ্যতা’র প্রশ্নটি আসিয়া থাকে। মিত্রমিলন স্থলে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও পারস্পরিক আনন্দী হওয়ার বাধা হইল না; কিন্তু যখন একটা লেবু খাইতেছি, তখন একা আমিই আনন্দী। এ ভেদের নিয়ামক যে যোগ্যতা (fitness or appropriateness), তার একটা নিরূপণ চাই।

২৪। পারস্পরিকব্যবহারনিয়ামকসম্বন্ধানুপাতিত্বং যোগ্যত্বম্॥

পরস্পরের ব্যবহার স্থলে, সে ব্যবহারনিয়ামক এক সম্বন্ধ থাকে। সে সম্বন্ধটির অনুপাতী যোগ্যতা।

যোগ্যত্বমনুপাতিত্বাৎ ক্রমাপেক্ষব্যবস্থিতম্।
তরতমতয়া তস্য বৃত্তির্মেয়ত্বমৃচ্ছতি॥ ১৪৭

যোগ্যতাটি অনুপাতধর্মী। ব্যবহারক্ষেত্রে একান্ত যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া তো কিছু নেই। সবই আপেক্ষিক। সে সব ব্যবহিতাদি বস্তু সূর্যালোকেও দৃশ্য নয়, সেসব X-ray প্রভৃতিতে দৃশ্য। বিপ্রকৃষ্ট (যেমন, বহুদূরবর্তী নক্ষত্র) সম্বন্ধেও সেই কথা। বৃক্ষলতাদিতে (অন্তঃসংজ্ঞা), পাষাণাদিতে (প্রাণন), সাধারণতঃ ‘সাড়া’ দেয় না;

কিন্তু, যোগে এবং উপযুক্ত যন্ত্রে সে সব, চেতনার ও প্রাণের 'সূচক' সাড়া দেবার যোগ্যতা পাইয়াছে ও পাইতেছে। এই নিমিত্ত, 'অনুপাত' বলিতে এই তিনটি আসে—ক্রমাপেক্ষা, তরতমতা এবং পরিমেয়তা। এ তিনকে, যথাক্রমে, পাদ, কলা এবং মাত্রার রূপ বলিতে পারি। সুতরাং, 'ক' নামক পদার্থে, আমার সম্বন্ধে এবং প্রতিযোগিতায়, যখন বলিতেছি—ও দৃশ্যমাত্র, দ্রষ্টা নয়; ভোগ্যমাত্র, ভোক্তা নয়; কার্যমাত্র, কর্তা নয়; —তখন, এই যে তার দ্রষ্টৃত্বাদিসম্পর্কে অযোগ্যতা, সে অযোগ্যতা কোন্ 'অনুপাতে'? অর্থাৎ, কোন পাদে বা ক্রমাপেক্ষায়? কোন কলায় (in what respect and aspect), তুলনায়? কোন মাত্রায় বা পরিমাপে? এই তিনটি জিজ্ঞাসামূলেই তো বিজ্ঞানের যাবতীয় সমীক্ষা-পরীক্ষা। সাধারণ এবং সাধন ব্যবহারেও অন্যথা হওয়া উচিত নয়। অবশ্য, ঐ তিনের সঙ্গো কাষ্ঠা বা Limit এর প্রশ্নও আসে। 'এই' পাদেমাত্রায়কলায় তো যোগ্যতার অনুপাতটি (proportion) 'এইরূপ'; কিন্তু কাষ্ঠায়—অবমে বা চরমে? ব্যাসনন্দন শুকদেব প্রব্রজ্যায় বাহির হইলে পিতা ব্যাসদেবকে উদ্দেশ করতঃ 'তরবোঽপি নেদুঃ'। প্রস্তরাদির (বিশেষতঃ বিগ্রহাদির) 'যোগ্যতা'ও, অনুপাতের অবমগ্রামে একরূপ, চরমগ্রামে অন্যরূপ। তুমি বিগ্রহের সেবা করিয়া তুষ্ট; বিগ্রহও বলেন—'আমি পরিতুষ্ট; তুমি বর মাগো'। জপাদিদ্বারা 'যোগ্যতা'কে সেই 'শরণ্য' 'বরেণ্য'—রূপ সুহৃদ্‌ভূমিতে তুলিয়া লইতে হয়।

প্রণব, গায়ত্রী, অপর কোন বীজ অথবা নাম, এ সকলে, মাত্রা, ছন্দঃ, ভাব, ভাস, এ সবের অনুপাতে এমন কোন সীমায় আসিতে হয়, যেখানে তাদের জড়ত্বখ্যাতি চলিয়া যাইবে, সে সকলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে, চৈতন্য স্ফুরিত হইবে, তাদের যেটি রস বা মধু, সেটি উচ্ছ্বসিত হইবে। যেমন, গায়ত্রীতে মাত্রা (অগ্নি, সোমাদি) যোগ্যতানুপাতী হইলে মহাব্যাহৃতিত্রয়ে জাগৃতিরূপতা; ছন্দের যোগ্যতা আসিলে, 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং' এই পাদ; ভাসে 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি'; ভাবে, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ;—এই পাদদ্বয়ও লসিতচেতন হইয়া থাকেন।

২৫। যোগ্যত্বনিরূপিতত্বং-জড়ত্বাজড়ত্বয়োঃ ।।

এটি জড়, অথবা জড় নয়—এর নিরূপক পূর্বোক্ত যোগ্যতা।

আগে দেখিলাম যে, যোগ্যতা ধর্মটি ব্যবহারক্ষেত্রে কুত্রাপি নিষ্ঠিত (inflexibly fixed) হইয়া নেই।

লোষ্ট্রে জড়ত্বযোগ্যত্বং ত্বয্যজড়ত্বযোগ্যতা।
ন হি নির্ব্যূঢ়বৃত্তিত্বং ভজেতে ব্যবহারিকে।
যোগ্যতা যোজনাব্যাপ্তাবজড়ত্বং জড়েঽপি চ॥ ১৪৮

তোমার যে সাধারণ ব্যবহারখ্যাতি (ordinary pragmatic appreciation), তাতে তো লোষ্ট্রে জড়তার যোগ্যতা, আর তোমাতে (ত্বয়ি) অজড়তার যোগ্যতা। কিন্তু, এই যে সাধারণ ব্যবহারিক (কারবারি) জড়যোগ্যতা এবং অজড়যোগ্যতা ('dead' materiality and its opposite), এ দুটি অবশ্যই নির্ব্যূঢ়বৃত্তি (unconditionally and unalterably established postion or function) নয়। নির্ব্যূঢ়বৃত্ত হইলে দেশ-কাল-নিমিত্তাদি বদলাইয়াও তাকে অন্যথা করা যায় না। যে জড়, সে জড়ই থাকে, যে চেতন, সে চেতনই। কিন্তু দেখিয়াছি যে, জড়ত্ব যোগ্যতাদ্বারা নিরূপিত। সুতরাং, নির্ব্যূঢ়বৃত্ত (absolute constant) নয়। জড়বিজ্ঞানে Matter এর অবিনশ্বরত্ব তিরোহিত। জড়বস্তুর অক্ষরত্বের স্থলে 'শাক্ত' অক্ষরত্ব আসিয়াছে, কিন্তু তাও গণ্ডী টানিয়া। জড়বিশ্বের সব খবরই মিলে নাই, আর 'ঘরের খবর' (প্রাণমনের) তো সঠিক (পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠায়) কমই মিলিয়াছে, 'আর যোগ্যতাও সম্বন্ধানুপাত দ্বারা নিরূপিত। সুতরাং, কারিকার ঐ শেষ চরণটি বিজ্ঞানের দিক থেকে এখনও যাচাই হইতে বাকি আছে। যোগ্যতার 'যোজনা'টি (যেমন, জপাদির অক্ষরে) সর্বত্র সাধিয়া যাইতেছে, কিন্তু, ঠিক ব্যাপ্তিটি ঘটিতেছে না; ব্যাপ্তিটি ঠিক 'ভূমি' অবধি হইলেই— 'অজড়ত্বং জড়েঽপি চ'। ঐ যে ঠিক ভূমির কথা, সেটি প্রতিটি পদার্থের 'নাভি'র কথা। নাভির সন্ধানেই সব চলিয়াছে। তবে হয়তো মৃগনাভির যে মৃগ, তার মতো।

কিন্তু নাভির সন্ধান তো পরে, ব্যবহারই বলে কাকে?

২৬। ক্রিয়াকারকফলসঙ্ঘাতনিরূপিতবৃত্তিত্বং ব্যবহারত্বম্॥

ক্রিয়া, কারক, ফল, এ তিনের সঙ্ঘাত (co-incidence, congruence, confluence) দ্বারা নিরূপিত (conditioned and assigned) যে বৃত্তি, সেটি ব্যবহার

(Behaviour)। [এই 'ব্যবহার' শব্দ বিজ্ঞানাদির জড়বৃত্তি (physical events) সম্বন্ধেও ব্যাপ্তিমান বুঝিতে হইবে]।

ফলস্য ফলিতত্বায় ক্রিয়া তস্যাশ্চ কারকাঃ।
সংহত্য বৃত্তিতাং যন্তি বিশ্লেষাদিতি পদ্যতে।
সংশ্লেষাদ্ যৎ সমগ্রত্বং তদ্‌বৃত্তির্ব্যবহারতা॥ ১৪৯

কোন ফল (effect desired), ফলিতে গেলে (to be actual, to materialize) উপযুক্ত (যোগ্য) ক্রিয়া ও কারকের সংহতবৃত্তির (coincidence ইত্যাদির) অপেক্ষা করে। সর্বপ্রকার ক্রিয়াস্থলেই, বিশ্লেষ করিয়া (by analysis, adequate and sufficient), এটি প্রতিপন্ন হয়। বিশ্লেষণ করিয়া ক্রিয়ার অঙ্গাগুলি, কারকের অংশ-অবয়বাদি (partials, moments, components ইত্যাদি), পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখিয়া লই। কিন্তু 'ব্যবহার' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? ঐ পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিসমূহকে পুনশ্চ সংশ্লেষ পূর্বক (synthetically) সমগ্রবৃত্তিতায় পাইতে ও দেখিতে হয়। এইরূপ সমগ্রবৃত্তিতা (integrated functioning) রূপে যে ভাস এবং গ্রহণ, তাকে 'ব্যবহার' বলে। বি+অব+হার—এই তিন ভাগে ঐ তিনটি ব্যাপার সূচিত হইতেছে। যে কোন একটা ফল। তার সামান্যভাবে ভাস হইল—এইটি 'ফলিল'। কেন, কোথায়, কিভাবে, কার কর্তৃক, ইত্যাদি এখনও প্রতিভাত হয় নাই। যথাসম্ভব, সূক্ষ্ম ও দক্ষ বিশ্লেষণ করিয়া পাইলাম—ক্রিয়া এবং তার কারকসমূহ কিভাবে সংহতবৃত্তি হইয়া ফলটিকে ঠিক ঐ আকারে ঘটাইল। গীতায় যেমন 'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্' ইত্যাদি ভাবে পঞ্চধা বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানাদিতে সমীক্ষায়, পরীক্ষায় এবং অন্বীক্ষায় এবম্বিধ বিশ্লেষ বা analysisকেই মুখ্য উপায়রূপে অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যথাসম্ভব নিপুণভাবে বিশ্লেষ করিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না যে—ভাগসমূহকে পূরা পাইয়াছি, এবং ঠিক যোগ্য অনুপাতে পাইয়াছি। পাদে, মাত্রায়, কলায়, কাষ্ঠায় যথার্থ সংহতিরূপটি মিলিয়াছে তো? এ সংশয়ের নিরাকরণ হয় পুনশ্চ সংশ্লেষে সমগ্রটি মিলাইতে পারিলে। যেমন, প্রোটোপ্ল্যাজম্। বিশ্লেষণে যে উপাদানগুলি যে অনুপাতে পাইলাম, সেগুলি ঠিক অনুপাতে মিলাইয়া সজীব প্রোটোপ্ল্যাজম্ মিলিল

কি? যদি বল, সজীবের বিশ্লেষণ তো করি নাই। তা হইলে, এটি বলিও না যে—সজীবের বা প্রাণের 'ব্যবহার'টি সঙ্কলিত করিয়াছি। জপাদিতে কুণ্ডলীর জাগৃতি, নাদাদির স্ফুরণের একটা শারীরবিশ্লেষরূপ (physiological picture) অবশ্যই আছে। ধর, সে 'রূপ'টি যথাসম্ভব 'যোগ্য' (adequate and sufficient) রূপেই পাওয়া গেল। কিন্তু, তাতে জপ্যমন্ত্রের, প্রণবাদির, যে 'ব্যবহার', সেটি কি পূর্ণ ও যথার্থরূপে ফুটিল, কি ফুটিল না? এর নিমিত্ত, ঐ শারীরব্যাপারগুলির সংশ্লেষপূর্বক সমগ্রবৃত্তিতায় আনিয়া দেখিতে হইবে—তারা কি ঐ নাদস্ফুরণাদি ফল সম্পর্কে ঠিক যোগ্য? বিশ্লেষণের পর পুনশ্চ 'অবহার'টি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারের ভাসাদি হইল, ইহা বলা যায় না।

২৭। ব্যবহারনির্ব্বাহকসঙ্ঘাতস্য সংব্যূঢ়ত্বং চক্রকোষাদ্যাকৃতিভিঃ॥

পূর্বোক্ত ব্যবহার নির্বাহক যে 'সঙ্ঘাত', সেটি আবার 'সংব্যূঢ়' রূপ হয়, চক্রত্ব, কোষত্ব ইত্যাদি আকৃতি লইয়া।

ব্যবহারানুরোধাদ্ যে সঙ্ঘাতা বৃত্তিতামিয়ুঃ।
তেষাং চক্রত্বকোষত্বাদ্যা কারা অপি চাসতে।
পঞ্চকোষাত্মকো জীবো দ্রব্যে মূর্ত্তেঽপি চক্রতা॥ ১৫০

ব্যবহার অনুরোধে যে সঙ্ঘাত বৃত্তিমান্, সেটিকে ক্রিয়া, কারক এবং ফল, এ তিনের কোন এককে মুখ্য করিয়া, এবং অপর দুটিকে গৌণ করিয়া পূর্বোক্ত বিশ্লেষ-সংশ্লেষ সাধিত হইতে পারে, ব্যবহারতঃ হইয়াও থাকে। মুখ্য-গৌণ ভাবেই সেটি হওয়া উচিত, 'বিযুক্ত' (by mere abstraction) করিয়া হওয়া উচিত নয়। প্রত্যবচ্ছেদে হওয়া উচিত, কেবল অবচ্ছেদে নয়। যথার্থভাবে ব্যবহারনির্বাহক সঙ্ঘাতটিকে লইলে দেখা যাবে যে, ক্রিয়া-কারক-ফল, এ তিনের প্রত্যেকটি অপর দুটিতে কেবল যে 'সংহত' হইয়াছে, এমন নয়। অর্থাৎ, কেবলমাত্র, co-incidence and composition নয়; তাদের co-inherence ও রহিয়াছে। একের মধ্যে অপর দুটি নিজেদিগকে সন্নিবিষ্ট ও সব্যাপার রাখিয়াছে। এভাবে, ফলের মাঝে ক্রিয়া ও কারক, দুই-ই বর্তমান ও বৃত্তিমান।

ফলকে 'ভিন্ধি' (ভাঙ্গিয়া দেখ), তাতে ক্রিয়া এবং কারক বর্তিয়া রহিয়াছে। এ শরীর থেকে একটি বাক্ বাহির হইতেছে, অথবা একটা কণা ক্ষরিত হইতেছে; তাতে এ শরীর ও শরীরী পূরাপূরিই বর্তমান বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র বীজে বা বিন্দুতে নয়। তাতে ঘন এবং সমর্থরূপতা। এ ভাবে সঙ্ঘাতের শ্রেণি, স্তর, পর্ব ইত্যাদিভাবে পরম্পরা আছে। 'সংহত' ভাবটা সাধারণ লক্ষণ। এটি থাকিলে ব্যবহার। কিন্তু সংহতের শ্রেণি, স্তরপরম্পরায় উঠিয়া 'সংব্যূঢ়তায়' পৌঁছিতে হয়। এই সংব্যূঢ়ের কথা আগে বলাও হইয়াছে। ইহা সংহতের এক বিশিষ্ট ক্রমোন্নত ভূমি বা স্তর। সৃষ্টিতে সর্বত্রই (এমনকি, মূর্ত জড়পদার্থেও) সংহতের সঙ্গে সংব্যূঢ়ও ব্যক্ত অথবা গূঢ়ভাবে থাকে। তবে, অধিকাংশ স্থলে, সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় নেই। তাই সংহতরূপটি যদিবা দেখি, সংব্যূঢ়রূপটি ক্বচিৎ দেখি। যেমন, অধুনা বিজ্ঞান জড়াণু আদিতেও চক্ররূপটি (planetary pattern) দেখিয়াছে, কিন্তু কোষাকৃতি? কাজেই, এইভাবে এখনও ব্যবহার হইতেছে যে, জীবে পঞ্চকোষাদি; মূর্ত জড়াদিতে চক্ররূপতা। এরূপ ভেদ, দৃষ্টিগতির কতদূর যে অবগমকতা, তার উপর নির্ভর করে। সুতরাং, মূর্তভূতাদিতেও (যথা, এটমে) কোষরূপতা সাবকাশ। চক্রকোষাদি সম্বন্ধে আগে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে; ভাবী গ্রন্থে সমস্তই লক্ষণে বিস্পষ্ট করার যত্নও হইয়াছে। এখানে এটি লক্ষ্য করিয়া যাও যে, 'সংহত', 'সমূহ' এবং 'সংব্যূঢ়', এ তিনে যথাক্রমে ফল, ক্রিয়া এবং কারককে মুখ্যতায় রাখা হইয়াছে।

২৮। আনন্দস্য সর্ব্বাত্মত্বেঽপি ব্যবহারতো নাভিকোষত্বম্॥

আনন্দ নিখিল আত্মা এবং হৃৎ হইয়াও ব্যবহারনির্বহণে 'নাভিকোষ', এই যুগ্মরূপ ধরিয়াছেন। যেখানে চক্ররূপতা, সেখানে তার 'নাভি', আর, যেখানে কোষরূপতা, সেখানে 'আনন্দময় কোষ' হইয়া আছেন।

ব্যবহারানুরোধে চ আনন্দঃ সর্ব্বভাবনঃ।
নাভিকোষত্বমায়াতি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বহৃৎ স্বয়ম্॥ ১৫১

আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছু জাত, আনন্দেই জীবিত, এবং আনন্দেই প্রত্যাবৃত্ত—এটি তো শ্রুতি অনুভব দুয়েতেই প্রসিদ্ধ। এটি আনন্দের সর্বভাবন রূপ।

ভূমা, আকাশ এবং শান্তরূপে আনন্দই আত্মা; পুনশ্চ, বিন্দুরূপে নিখিল সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্টভাবেও আনন্দ সর্বাত্মা, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। আনন্দবিন্দু স্বকলনে হন আনন্দকলা; সেটি সর্বভূতে আবার, স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ মর্ম-ওকঃ রূপে হৃৎ। সুতরাং, আনন্দই সর্বহৃৎ। এই আনন্দ ক্রিয়া-কারক-ফলাদি ব্যবহারনির্বহণ অনুরোধে কি হইলেন? যেখানে (স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে) যত চক্ররূপ (Spiral আদি Pattern), তার নাভি ও অক্ষ; আর, যেখানে যত কোষাকৃতি (Organic Pattern), তার মূল আধারও কেন্দ্র। যেমন, জীবদেহে মূলাধারে কুণ্ডলীশক্তি আনন্দরূপিণী; তাঁর জাগৃতি আনন্দজাগৃতি। শম্বাবৃত্তে যে ষট্‌চক্র বিন্যস্ত, সে ষট্‌চক্রের অক্ষও (সুষুম্না-চিত্রাদিরূপে) আনন্দ। আর, মুখ্যতঃ যে অক্ষাশ্রয়ে জীব-আয়তনে প্রাণন চলিতেছে, এবং সাধনে বিশেষতঃ চলে, সেটিও আনন্দ (ফলরূপে)। প্রাণনকে যদি বল ফল, তা হইলে 'অণন'কে বল ক্রিয়া; আর, প্রাণ কারক।

২৯। প্রাণস্য প্রাণত্বাৎ॥

যেহেতু আনন্দ প্রাণেরও প্রাণ।

ক্রিয়া-কারক—ফল, এ তিনকেই প্রাণেরই ত্রিধা বৃত্তিভাবে দেখা হইল। কিন্তু প্রাণ নিজে কি বস্তু? পরবর্তী গ্রন্থে 'প্রাণপাদ' বিশেষভাবে সন্নিবেশিত এবং বিবেচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'Life' বা 'Vital Energy' যান্ত্রিকতার (Mechanistic Theoryর) কবলে কবলিত হইয়াও 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'। শুধু তাই নয়। যে জড়ের আদর্শে প্রাণকে 'ছকিয়া' লইব, সে জড়ই যদি দুদিন বাদে বলে— 'আমি প্রাণ। ঐ দেখ তোমার যত কিছু ফরমূলার নির্মোক ফেলিয়া আমি বাহির হইলাম।' —তা হইলে আর আশ্চর্য বোধ করার কিছু নাই। কিন্তু, প্রাণও আপন প্রাণ বা স্বরূপে আনন্দ, এ অববোধটি কবে হইবে?

কঃ প্রাণ্যাদ্ যদি ন স্যাদ্‌বৈ ভূমাকাশঃ সুখাত্মকঃ।
প্রাণস্য প্রাণতা যস্মাত্ততোঽস্য সর্ব্বনাভিতা॥
ক্ষোভজন্যক্রিয়াত্বেঽপি নানন্দান্যত্ববৃত্তিতা॥ ১৫২-১৫৩

আনন্দব্রহ্মের মূলস্পন্দক্রিয়ারূপকে যদি বল 'অণন', তবে বিশ্বে প্রাণাপানাদি

'ফলিত' ব্যাপাররূপকে বল 'প্রাণন'। কিন্তু মূলস্পন্দরূপেই দেখ, আর ফলিত ব্যাপাররূপেই দেখ, শ্রুতি বলিয়াছেন, অনুভবও বলে— 'কোহ্যন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'। আনন্দ ভূমারূপে সর্বাধার আছেন বলিয়াই একটা অণুও স্পন্দিত হইতেছে। বিশ্বে কোন্ নিগূঢ় মর্মে পুলকের শিহরণ, তাই না বিশ্বে এমন হিল্লোল, এত না দোল! আত্মদৃষ্টিতে ভাবিয়া দেখ। এই বিশ্বে অণু মহানে ওতপ্রোত অণন-প্রাণনের 'প্রাণ' স্বয়ং আনন্দ। এই নিমিত্ত, আনন্দ সর্বনাভি। আনন্দব্রহ্মের ভূমা, সর্বাত্মা, সর্বভাবন, সর্বহৃৎ, সর্বনাভি—মুখ্যতঃ এই পঞ্চরূপে সর্বত্ব প্রদর্শিত হইল।

শঙ্কা হইতে পারে, অণন-প্রাণনাদি সমস্তই তো ক্ষোভজন্যবৃত্তি। কিন্তু সে 'ক্ষোভ' আনন্দের ঐ পঞ্চধা সর্বতার আধারেই ক্ষোভ, যেমন, নিস্তরঙ্গ মহোদধিতে লহরীমালা। সুতরাং, সে ক্ষোভে আনন্দের অন্যতাপত্তি হয় না, আনন্দভিন্নবৃত্তিও হয় না। অর্থাৎ, ক্ষোভরূপেও আনন্দ স্বভিন্ন অপর কিছু হন না।

ব্যবহারে, বিশেষতঃ বিজ্ঞান ব্যবহারে, ক্ষোভকে পাই অন্যরূপাপত্তিরূপে (as 'strain')। অন্যরূপ = অন্যতা নয়। যেখানে ক্ষোভ, সেখানে সংক্ষোভ (as 'stress' দেখা যায়। অর্থাৎ রূপান্তরিতটি আবার স্বরূপে ফিরিতে চায়। যেমন, রবার, স্প্রিং ইত্যাদিতে স্পষ্টরূপে। কিন্তু সর্বত্রই এটি বিদ্যমান। ফলে, ক্ষোভ-সংক্ষোভ (strain and stress), এ দুয়ের 'অনুপাত' (ratio) সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এর ফলে, সর্বত্রই স্থিতি-স্থাপকতা (Cosmic Elasticity)। আনন্দ সর্বনাভি বলিয়াই সমস্ত প্রকারের ক্ষোভই আনন্দেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায়। জপাদি সাধনে এই অন্তহীন প্রত্যাবৃত্তি (returning), যেমন সাধারণ উদ্বেগভরা জাগৃতির নিরুদ্বেগ আনন্দঘন সুষুপ্তিতে,—যে চরম পরিপূর্ণতারূপটি ধারণ করে, তাকে বলা হইয়াছে সমাবৃত্তি (ব্যাবৃত্তি থেকে)। রেণুটিও তার স্থিতিরূপে আপন আনন্দনাভিতেই স্থিত। সেটি যখন চঞ্চল হয়, ক্ষুব্ধ হয়, তখন সে তার হারানো স্থিতিরূপটিই খুঁজিয়া বেড়ায়। এ খোঁজার অন্ত নেই, যতক্ষণ না পরমা স্থিতিতে, আনন্দকৈবল্যে, সেটি আসিতেছে। তাই, মূলে এবং স্বভাবে, বিশ্বক্ষোভ হইল (জড়ে তার গুণ্ঠিতাদিরূপ দেখা গেলেও) রসলোভ; আর বিশ্বদোলা হইল ভুবনদোল! Cosmic Stress is Cosmic Yearning; Cosmic Vibration Cosmic Thrill.

৩০। রসতমত্বাচ্চেতি॥

কেননা, প্রাণের যেটি প্রাণ, সেটি যে রসতম।

কয়টি শ্লোকে এই রসতমের একটুখানি সন্ধান নেবার আকুতি হইয়াছে। প্রথম দুটিতে সগুণ, সাকার ভাবের মধ্য দিয়া—

কোঽয়ং কালীয়নাগো বিততশতফণঃ কশ্চ কালীয়কূপঃ
কান্তা গোগোপগোপ্যো বিষমবিষবশাৎ স্তব্ধ সংবেদনা যাঃ।
কালিন্দীকূলচারী মধুরমুরলিকানাদসঞ্জীবনেন
সন্ধ্যায় হ্লাদিনীং কো মথিতফণিফণঃ সংবিদা নৃত্যশীলঃ॥ ১৫৪

শতফণাবিস্তার করে যে কালীয়নাগ, কে সেটি? তার নিবাস কালীয়কূপই বা কি? আর, সেই কালীয়হ্রদের জল, তৃষ্ণায় পান করিয়া, যে গো-গোপ-গোপী সকল বিষম বিষে সংজ্ঞাহারা হইয়াছিল, কারাই বা তারা? এবং কালিন্দীকূলচারী সেই নটবর কিশোরটিই বা কে, যিনি আপন চরণসরোজতলে কালীয় ফণীর শতফণ মথিত করতঃ মধুরমুরলীনিনাদের সঞ্জীবনসুধা ঢালিয়া নৃত্যশীল হইয়াছিলেন? কিশোর নটবরের সে মুরলীনাদে সন্ধান হইয়াছিল কোন রসতমার? সে রসতমাটি পরম আনন্দঘন পুরুষের নিজ 'প্রাণের প্রাণ' যে হ্লাদিনীসার, সেইটি। সে মহাভাবানুগ ভাবটিকে 'সংবিৎ' দিয়া সন্ধান করিয়াছিলেন। কালীয়বিষে স্তব্ধসংবেদন গো-গোপ-গোপীতে নিগূঢ়া হ্লাদিনীর সাথে সংবিদের 'সন্ধিনী' হইয়াছিল মুরলীনাদ। এ যে রসতমের তাঁর রসতমাকে জাগাইবার নিত্যলীলা—অহরহ চলিতেছে। কালীয়কে, তার আবাসকে, তার বিততশতফণকে চিনিয়া লও। নিজের মাঝেই। গো-গোপ-গোপীগুলিকেও চিনিয়া লও। বিষমবিষ, আর, তাতে স্তব্ধসংবেদন দশাটিও ভাবিয়া লও। মধুরমুরলীনাদটি নামে না 'শোনা' পর্যন্ত, অর্থাৎ সন্ধিনীর সন্ধানটি না দেওয়া পর্যন্ত, আমার যে হ্লাদিনীসংবিৎ, সেটি স্তব্ধসংবেদনার কোন অতলে যে ডুবিয়া থাকে, তার তো 'পাতা' মেলে না! গো-গোপ-গোপীকে নানাভাবে নিজের মধ্যে মিলাইয়া লও। যেমন, গো=বাক্, গোপ=বাকের ছন্দঃ, গোপী=বাকের ভাবানুগা রসানুগা বৃত্তি; ইত্যাদি।

তারপর,

> কো রামঃ সানুজো যো দশরথতনয়ঃ শোভনাকান্ত ঐচ্ছ
> ল্লঙ্কাধীশং নিহন্তুং দশবদনমরিং দম্ভিনং চাত্মবধ্যম্।
> সীতারামৌ ভজন্তং সুবিমলযশসং বেত্তি কো বা কপীশ-
> মদ্যশ্বীনং কিমেতদ্ যদঘটঘটনং প্রাক্তনং শাশ্বতং কিম্॥ ১৫৫

শোভনাকান্ত (সীতাকান্ত), দশরথতনয়, অনুজ লক্ষ্মণ সহিত, রাম কে বল তো?—যে রাম, দাম্ভিক, আত্মবধ্য যে দশানন লঙ্কাধীশ অরি, তাকে নিধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন? আর, 'সীতারাম' এই যুগলের একনিষ্ঠভজনশীল সুবিমলযশ সেই কপিশ্রেষ্ঠই বা কে? এবং রামচরিতে যে অপূর্ব অঘটনঘটন, সেটি কি 'আজকালের' (অদ্যশ্বীন), না, পুরাকালের (প্রাক্তন), না, নিত্য চিরন্তন (শাশ্বত)? এসব কি ভাবিয়াছ? এ সমস্ত কি পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনা, অথবা, নিত্যকার জীবনের নিত্যকার ছবি, অথবা, নিত্য শাশ্বত যে জীবনভূমি, সে ভূমিরই মরমী বার্তা? যদি, শেষের দুই দৃষ্টিতে দেখিতে চাও তো, ঐ রামলীলা কোন জীবন দৃশ্যমঞ্চে, কোন প্রাণের প্রেক্ষাগৃহে কিভাবে দেখিবে, তা ভাবিয়া লও। 'দশরথ' শব্দটিতে কোন্ তত্ত্বের ইঙ্গিত? আর, 'দশানন'? দশানন আবার 'আত্মবধ্য' কেন? অধ্যাত্মরামায়ণাদিতে এবং কতিপয় উপনিষদে ও সন্তসদ্‌গুরুমুখে, রামচরিতমানসে অপরূপভাবেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। জপের সাধনে কপিশ্রেষ্ঠটিকে আপন ইষ্ট নামজপরত শ্বাসবায়ুরূপেও গোড়ায় ভাবনা করিও। 'লং' যদি হয় পৃথ্বীবীজ, অর্থাৎ সেই ভূমি, যেখানে সৃষ্টিধারা নামিয়া বলে—এখানে আমি এইবার কুণ্ডলী পাকাইয়া জিরাইব, নিদ্রিত হইব (static, potential রূপ ধরিব), তা হইলে, 'ক' রূপ যে ব্যঞ্জনমুখ, আনন্দের স্বকলনারূপা যে আনন্দকলা, সেটিকে কুণ্ডলিনীরূপে ঘুম পাড়াইয়া রাখে যে অবস্থান, সেটিকে 'লঙ্কা' বলিতে পার। 'লং' বা লয়স্থলে 'কা'—কে? এই অবস্থিতিতে সাক্ষাৎ আনন্দকলা কুণ্ডলিনীরূপা হইয়া 'অশোকবনে' বন্দিনী (সাক্ষাৎ আনন্দসংবিৎ বা হ্লাদিনীসংবিৎ হইয়াও নিদ্রিতা)। তিনি প্রসুপ্তা হইয়াও স্বরূপে শোকরহিতা। বিশেষতঃ স্থূলে ও বৈখরীভূমিতেই এই নিদ্রা। স্থূলে এই দশ ইন্দ্রিয় আর তাদের চালক বা চালিত যে মন, সেই মনেরই আধিপত্য। যেটি

অপরাপ্রকৃতি বলাও হয়। মানসের ‘অব’ এবং ‘উচ্চ’–দুটি গ্রামের কথা বারংবার বলা হইয়াছে। এ দুটিকে লইয়া মানসের অথবা চেতনার তিনটি ভূমি। যদি মানসকে সাধারণভাবে বল দশানন রাবণ, তবে ‘অব’ এবং ‘উচ্চ’ এই দুই গ্রামে সে রাবণের দুই ‘সহোদর’। পুনশ্চ, স্থূলে মানসের ইন্দ্রিয়সহকারে যে বৃত্তি, সেটি যেমন ঐ ভূমিতেই ব্যাপ্ত অথবা ব্যাপনযোগ্য, তেমনি সে মানসের ‘প্রভাব’ কেবল যে স্থূলে বা ব্যক্ত গোচরতার ভূমিতেই ‘সীমিত’ (restricted) এমন নয়। সূক্ষ্মে, কারণে এবং সন্ধিতেও এর প্রভাব আছে। অর্থাৎ, স্থূলে মানসের যে বৃত্তি, সেটি কেবল স্থূলেই থাকিয়া শেষ হয় না, ঐ তিন ক্ষেত্রেও সেটি সংস্কার–বীজাদিরূপে ব্যাপারবতী হয়। এই জন্য, ঊর্দ্ধ্ব–মানসের সে শুভসন্ধি, সেটি উপেক্ষাকরতঃ মানসের যে বৃত্তি, তার ফলে, ‘লঙ্কায়’ পূর্বোক্ত আনন্দকলার নিদ্রায় সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি (সন্ধি=অর্দ্ধ)। এগুলি ভিতরের দিক্ থেকে ভাবিয়া দেখিও।

এখন, নিখিলনাভিতে যে পরম আনন্দ ‘রম্’ বীজরূপে অধিষ্ঠিত, তিনি কি করিলেন? ‘যম্’ এই হৃদয়স্থ বায়ুবীজটিকে সমাশ্রয় করতঃ, ‘বম্’ বা বরুণবীজটিকে অতিক্রম করিয়া (সমুদ্র লঙ্ঘন), ‘লম্’কে (আপন নিদ্রিতা আনন্দকলারূপিণী কুণ্ডলিনীকে) ‘উদ্ধার’ করিলেন। আপন আনন্দকলারূপের সঙ্গে মিলিত হইয়া হইলেন ‘রাম’। রম্ বীজে যে ‘অম্’, সেটি বরুণবীজের ‘ব’কে সম্প্রসারিত ‘উ’কাররূপে (সানুজ লক্ষ্মণ) মিলাইয়া হইলেন ‘ওম্’। বৈখরীভূমিতে প্রসুপ্তা নাদ–বিন্দু–কলা বা অর্দ্ধমাত্রা, মধ্যমার (সেতু বা সাগর) ব্যবধান পার হইয়া পশ্যন্তীতে আসিলেন। এই প্রকারে, কত না ভাবে, রামচরিতরসটিকে আপন মানসে (অনুবন্ধানুরোধে) ফুটাইয়া লইতে হয়! অথচ, এ রামচরিত কেবল কি রূপক? তা তো নয়।

বিশ্বং চঞ্চল্যতে বা চিচলিষতি কুতো বাপি বোভোতি ভূতং
বিশ্বং তেষ্ঠীয়তে বা জিগমিষদপি বা কেন তিষ্ঠাসতীতম্।
বিশ্বং শাশয্যতে ক্কাহপ্যধিশিশয়িষতে কিং বনীবঙ্ক্তি কিন্নু
বিশ্বে জাজায়মানে যদধিকরণতা সা পনীপত্যমানে॥ ১৫৬

বিশ্বং চঞ্চল্যতে (বারম্বারং চলতি) বা (অথবা) চিচলিষতি (চলিতুমিচ্ছতি) কুতঃ (কথং কুত্র বা, কস্তত্র হেতুঃ কো বা আধারঃ?) (সদা চঞ্চল্যমানমপি বিশ্বং

কথং পুনশ্চলিতুমিচ্ছতি কস্মিন্নাধারে বা চলতি? খলু রসমনপেক্ষ্য কদাপীয়ং চঞ্চলতা চিচলিষা বা ন সম্ভবতি।) কুতো বা বিশ্বং ভূতমপি (জাতমপি) বোভোতি (বোভবীতি বারম্বারং ভবতি সকৃদ্‌ভাবে অতৃপ্যদিব? সকৃদ্‌ভাবে অতৃপ্যমাণমিব বিশ্বং রসমেব অনুসন্ধত্তে।) বিশ্বং তেষ্ঠীয়তে বা (বারম্বারং তিষ্ঠতি) জিগমিষদপি (গন্তুমিচ্ছদপি) (কিং তৎ-রসলালসয়া?) কেন তিষ্ঠাসতীতং—(কেন হেতুনা ইতং যাতমপি তিষ্ঠাসতি স্থাতুমিচ্ছতি? কিং তৎ প্রাপ্তমেব রসলেশং ভূয় আস্বাদয়িতুম্?) বিশ্বং শাশয্যতে ক্ব (পুনঃ পুনঃ শেতে কুত্র? প্রলয়াদিষু অস্মাকং সুষুপ্তাবিব আনন্দভুক্, ননু ভবতি?) কিমপি অধিশিশয়িষতে (কিমধিকৃত্য কিমুদ্দিশ্য বা শয়িতুমিচ্ছতি?) বনীবঙ্‌ক্তি কিং বা (নু) কিং বা বারম্বারং বঞ্চয়তে? গমনশয়নাদি-সকল-ব্যবহারেষু রসলিপ্সু বিশ্বং মনাক্ রসভুগপি আত্মানমেব বঞ্চয়তে বারম্বারং ভূমত্বস্য অনুপলব্ধত্বাৎ, কালণ্চাপি বঞ্চয়তে বিশ্বং দুষ্পূররসলিপ্সায়াস্তস্য কালেনানবচ্ছেদাৎ।) বিশ্বে জাজায়মানে (বিশ্বে বারম্বারং জায়মানে) যদধিকরণতা (যা অধিকরণতা, যমেব রসমানন্দমধিকৃত্য জায়মানতা) সা (অধিকরণতা) পনীপত্যমানে (অপি বিশ্বে ইতি শেষঃ) (বিশ্বে বারম্বারং প্রলয়াদিষু পতত্যপি সরস আনন্দ এবাধিকরণম্)॥

বিশ্ব চঞ্চলচরণে কেবলি যে চলিতেছে, তবু তার যেন চলার আশ মেটে না, আবারও চলিতে চায়। কেন? তার এই চির চঞ্চলতা কোন অচঞ্চল রসতমের পানে অভিসার? এই তো সে হইয়াছে (ভূতং), তবু হইয়াও কি তার সাধ মিটে নাই, আবার—আবার বারবার সে হইতেছে (বোভোতি)। সে কি তার রসতমের কাছে বর মাগিয়াছে—ওগো অফুরান রসসায়র! একটি বার জন্মে তোমার একটি কণার আস্বাদনে তো আমার আশ মিটে নাই, আমায় ভক্ত রসিকের মতো বারবার জন্মিতে দাও, তা হইলে বারবার নব নব আস্বাদনে তোমার সাথে আমি মহারাসে মিলিত রহিব! সে যাইতে চাহিয়াও বারবার থমকিয়া দাঁড়াইতেছে কেন? পুষ্পকলিকা থেকে কলিকান্তরে উড়িয়া যাইবে মধুকর, তবু সে উড়ি উড়ি করিয়াও আবার যে বসিতেছে! কেন? মধুরের নিবিড় সঙ্গে তার লালসটি এখনও মেটে নাই, তাই? চলিয়া যাইয়াও যে আবার ফিরিয়া বসিতে চায় (ইতং তিষ্টাসতি)! কেন? কোনও অনাস্বাদিত রসের কুহকে? বিশ্ব চলিতে চলিতে বারম্বার ঘুমাইয়া পড়ে, তার অফুরান চলার পথেই।

কিন্তু তার শুইবার ঠাঁইটি কোথায় (ক্ব)? তার পথচলার ক্লান্তি কোন্ সুষুপ্তির নিবিড় রসে ডুবাইয়া সে আবার নব হইতে চায়? তার এই শোয়াটি, শোবার সাধটি কিসের মাঝারে (অধিশিশয়িষতে কিম্)? তারপর, তার এই নিরন্তর পথচলা, চলিতে চলিতে একটুখানি যেন স্থির হওয়া অথবা ফিরিয়া আসা, ক্লান্তির ভারে লুটিয়া শুইয়া পড়া, ছুটিয়া ছুটিয়া তো রসতমকে পাইলাম না, ঘুমের মাঝে স্বপনে ধেয়ানে কি তারে পাইব, এই আশায়— এ সবই করিয়া সে দেখে আমি যে শুধু বঞ্চনাই করিয়া যাইতেছি, কিন্তু কাকে (বনীবঙ্‌ক্তি কিং নু)? আপনাকে, না আর কিছুকে? ওগো বাঞ্ছিতের, রসতমের অভিসারে বঞ্চিত পান্থ! কেন ভুলিয়াছ—যে পরম আশ্চর্য আধারে বারম্বার তুমি হইলে (জাজায়মান), সেই পরম আশ্চর্য আধারেই যে তুমি আবার বারম্বার পড়িয়া গেলে (পনীপত্যমান)! যেখান থেকে আসিলে সেখানেই তো আবার ফিরিলে! সে ঠাঁই ছাড়িয়া পাদমেকং ন গচ্ছসি! সেটি আনন্দ, রসতম তোমার চিরাকাঙ্ক্ষিত!

সমারম্ভকসম্বন্ধা কালনিমিত্তকা হি যা।
সংযোজকঞ্চ বধ্নাতি বাধা দেশনিমিত্তকা॥
সর্ব্বং সঙ্গচ্ছতে যেন সংগ্রাহকঃ স বৈ মতঃ।
তং বধ্নাতি যা বাধা ছন্দোবৈয়র্থ্যহেতুকা॥
বস্তুস্বভাবনিষ্ঠায়া বধ্নাতি সা সমাপকম্।
বাধা এতাশ্চতস্রো বৈ বধ্নন্তি স্থিত্যুপক্রমে॥ ১৫৭-১৫৯
নিরস্যেত্তস্থুষী হ্যেকাং যুগ্মাং তেষ্ঠীয়মানতা।
স্থাপিকা চ ত্রয়ীং হন্তি স্থিতা তুর্য্যামপি ক্রমাৎ॥
চক্রাদ্ ভ্রমন্ ভ্রমন্ ভৃঙ্গাঃ প্রফুল্লমল্লিকামধু।
পাতুং তিষ্ঠাসতি স্থানে যুঙ্‌ক্তঃ কালস্তু নো চ দিক॥
স্বচ্ছন্দঃ পবনো বা ন স্বচ্ছন্দা নাপি স্বা গতিঃ।
মল্লিকাপি স্বভাবে ন তিষ্ঠাসা সফলা কিমু॥
মল্লিকাং ত্বমধুনা গচ্ছ মা ভ্রমীস্ত্বমিতস্ততঃ।
মল্লিকামীহতে ভৃঙ্গ ইত্থং কালেন চোদিতঃ॥

তস্থুষীয়ং স্থিতিস্তস্য দিগ্‌দর্শনমৃতেঽপি তু।
জহদ্‌বৈলক্ষ্যলক্ষ্যত্বে তেষ্ঠীয়মানতা ভবেৎ॥
অসকৃৎ কর্ণিকাকেন্দ্রং বিশন্ নিবিশতে ন তু।
পেপীয়তে মধুন্যন্তস্ততোঽপি নিবিবৃৎসতি॥
স্বভাবো মধুপস্যায়ং মধুস্বভাবতো যদা।
জহ্যাদ্ বিষমতামন্ধা স্যাত্তদা স্থাপিকা স্থিতিঃ॥
প্রসীদতি পুরঃ কালস্ততো দিক্ চ প্রসীদতি।
প্রসীদতি ততশ্ছন্দঃ স্বভাবঃ সম্প্রসীদতি॥
আসম্প্রসাদমেবাস্য স্বভাবস্য স্বভাবনম্।
সম্প্রসন্নঃ স্বভাবোঽয়ং পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
তস্মিন্ নিবর্ত্তমানে হি ভাতি যত্তত্ত্বতঃ স্থিতম্।
ক্রিয়াকারকফলাসঙ্গাৎ সমাপকঃ সমাপ্যতে॥
ব্যুত্থানে চ সমাধানে ন চ্যোততি স্থিতিঃ স্থিরা।
আসীনময়তে দূরমিত্যাদীনাং সমন্বয়াৎ॥ ১৬০-১৭০

দুইটি বস্তু অন্যোন্যভাবে সম্বন্ধ, ইহা ধরা যায় তিনটি লক্ষণ দিয়া। প্রথমতঃ, তাহাদের সাহচর্য। দ্বিতীয়তঃ, একের অপরটিতে রূপান্তরিত হওয়ার সামর্থ্য। যেমন ধর, বৈজ্ঞানিক টেলিফোন নামক যন্ত্র আবিষ্কার করাতে দেখা যাইতেছে যে তাহার সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গ তাড়িত তরঙ্গে রূপান্তরিত হইতেছে এবং আবার সেই তাড়িত তরঙ্গ, অপর লোকটি যে রিসিভার ধরিয়া আছে, তাহার কর্ণগোচর হওয়ার সময় পুনরায় ধ্বনি-তরঙ্গে বা শব্দ ঊর্মিরূপে রূপান্তর লাভ করিতেছে। ইহাতে শব্দের বা ধ্বনির এবং তড়িতের অন্যোন্যসম্বন্ধই সূচিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, দেখা যায় যাহারা অন্যোন্যসম্বন্ধ, তাহারা এক অপরটির উৎপাদক বা জনকও হইয়া থাকে। ইহাও উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইবে।

জপের ক্ষেত্রে জ্যোতিঃ এবং রসের এইরূপ অন্যোন্য-সম্বন্ধ। জপ করিতে করিতে কখনো আলোকের আবির্ভাব ঘটে ও তার ফলে জপের অন্তর্নিহিত অর্থের যেন কিছু স্ফুরণ দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে আবার একটু পুলকও চিত্তকে স্নিগ্ধ

করিয়া দেয়। এই আলোক ও পুলকের যেন দুটি ধারা parallel ভাবে পাশাপাশি চলিয়া গিয়াছে এবং ইহাদের ক্রমশঃ নৈকট্য হইতে হইতে এক ক্ষেত্রে যাইয়া ইহারা অনন্যতা প্রাপ্ত হয়, অভিন্ন হইয়া যায়। সেখানে জ্যোতিঃই রস এবং রসই জ্যোতিঃ। সেখানে আর আলোকে ও পুলকে বা জ্যোতিঃ ও রসে ভেদ করা চলে না। তাই এই অন্যোন্যতার যেখানে কাষ্ঠা বা চরম সীমা সেইখানেই অনন্যতা।

এখন দেখিতে হইবে অভ্যারোহ কাহাকে বলে। যে অন্যোন্য সম্বন্ধের কথা বলা হইল সাধারণতঃ জপের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সম্বন্ধের অনুপাত সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হয় না, বরং অন্যোন্যতার পরিবর্তে এক অনন্যোন্যত্ব এবং অন্যত্বের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। জ্যোতিঃ এবং রস যেন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং একের আবির্ভাবে অপরের কোনো সাড়া শব্দই পাওয়া যায় না। ধর, জপ করিতে করিতে অনেকেই একটা আনন্দের স্পর্শ পান কিন্তু সেই সুখস্পর্শের নেশাটুকুতেই আবিষ্ট থাকিয়া যান, তাহাতেই 'বুঁদ' হইয়া পড়িয়া থাকেন। তাঁহারা পুলকেই বিহ্বল হইয়া মগ্ন থাকেন, কোনো আলোকের আবির্ভাবই সেখানে ঘটে না। আলোক যেন সেখান হইতে ভূমিকা অভাবে তিরোহিত। তাই সে রস উজ্জ্বল রস না হইয়া মলিন ও স্তব্ধরসরূপেই দেখা দেয়। আবার অনেকের মধ্যে জপের ফলে হয়তো একটু প্রকাশের আভাস দেখা দেয়, অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কিছু উন্মীলন দেখা যায়, কিন্তু সে প্রকাশ যেন একান্তই শুকনো 'প্রখর' প্রকাশ। সেখানে সরসতার প্রবাহ যেন অবরুদ্ধ, তাই প্রকাশটি নীরস, শুষ্ক ও প্রাণহীন। এই সব ক্ষেত্রে জ্যোতিঃ এবং রসের যে গাঢ় প্রণয় বা মৈত্র তাহার অভাব পরিস্ফুট। এই মৈত্রের অভাবেই একদিকে ঘটে রসের মান্দ্য এবং মালিন্য এবং অপর দিকে জ্যোতির নীরসতা ও রুক্ষতা। এই মন্দ বা মলিন রস কিঞ্চিৎ সুখের বা প্রেয়ের কারণ হইলেও শ্রেয়ের কারণ নয়। ইহার উপভোগে কিঞ্চিৎ সুখাবেশ লাভ হইলেও তাহা শ্রেয়োলাভের পরিপন্থী সুতরাং বর্জনীয়। সেইজন্য প্রয়োজন এতদুভয়ের মৈত্র ঘটাইয়া সাধন পথে অগ্রসর হওয়া। শ্রুতিও গায়ত্রী এবং মধুমতী ঋকের এক এক চরণকে পাশাপাশি সাজাইয়া এই মৈত্র সাধনেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। জ্যোতিঃ এবং রসের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, অনন্যোন্যতা এবং পার্থক্য বা অন্যতা দূর করিয়া যাহা তাহাদের অন্যোন্যতা ও পরিশেষে অনন্যতায় লইয়া যায় তাহারই নাম অভ্যারোহ। এই মিলনের ফলে রস হয় ঊর্জিত ও উজ্জ্বল, প্রেমের হয় উদ্দীপন এবং উপনিষদের দ্যুতির হয়

বিকিরণ। তখন পুলকেরও সীমা থাকে না, আলোকেরও 'ওর' থাকে না। শ্রীভগবানের লীলাকীর্তনাদি শুনিতে শুনিতেও অনেক সময় প্রথম এক অপরূপ পুলকের সঞ্চার দেখা যায় ও পরে মহাজন পদাবলীর অন্তর্নিহিত অর্থের উদ্ভাসনে যেন এক পরম প্রকাশের মধ্যে চিত্ত ডুবিয়া যায়।

অভ্যারোহ জপ হইল স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ ইহা ক্রমশঃ চিত্তকে স্থিতিতে আরূঢ় করে। এই স্থিতিরও আবার নানা ধাপ বা পর্ব আছে। প্রথম হইল 'তিষ্ঠাসন্তী' স্থিতি। এই অবস্থায় স্থিতির জন্য একটা প্রবণতা মাত্র দেখা দিয়াছে, স্থিতির অভিলাষ চিত্তে সবে উদয় হইয়াছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া যেন একটু বসিতে চাহিতেছে মাত্র। ইহার পরে দ্বিতীয় ভূমিতে আসে 'তস্থুষী' স্থিতি। এখানে যেন এইবার বসিতে চলিল এই অবস্থা। এখানে আর শুধু স্থিতির জন্য ইচ্ছা মাত্র নয়, স্থিতির অনুকূল ক্রিয়াটিও হইতে চলিল। মানস-ক্ষেত্র হইতে এখন যেন বাস্তব কার্যক্ষেত্রে ইচ্ছাটি ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইতে চলিল। ইহার পরেই তৃতীয় ভূমিতে তেষ্ঠীয়মানা স্থিতি দেখা দেয়। এখানে ভ্রমর মধুর আস্বাদ পাইয়াছে ও উড়িয়া গিয়াও আবার বারে বারে যাইয়া পুষ্পের কেন্দ্রকোরকে গিয়া বসিতেছে। তবে এখনো পাকাপাকি বসা হয় নাই, স্থিতিটি এখনো চঞ্চল। তাই মাঝে মাঝে উঠিয়া যাইতে হইতেছে, তবে আবার বসিতেছে। স্থিতি হইতে এখনো চ্যুতি ঘটিতেছে। যদিও স্থিতিটি খুব ঘন ঘনই ঘটিতেছে তবু মাঝে মাঝে একটু ফাঁক রহিয়া যাইতেছে। স্থিতিটি এখনো নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহার পরে চতুর্থ ভূমিতে যখন 'স্থাপিকা' স্থিতিটি দেখা দেয়, তখন স্থিতিটি যেন পাকা হয়, আর ভাঙ্গিতে চায় না, চ্যুতির ভয় হইতে যেন মুক্ত হয়। 'যেন' বলিতেছি এইজন্য যে এ-ভূমিতে স্থিতির দৃঢ়তাটি ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন। স্থিতির জন্য এখানে একটা কর্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্বের প্রয়াস রহিয়াছে, তাহা 'স্থাপিকা' এই কথা দ্বারাই সূচিত হইতেছে। স্থিতির এই permanence বা স্থিরতাটি যেন স্থিতির প্রতিকূল শক্তি-সমূহকে দাবাইয়া রাখিয়াই সম্পাদিত হইতেছে। তাই ইহা আয়াস-প্রয়াসহীন অনায়াস স্থিতি নহে, সুতরাং 'অভয়ও' নয়। তাই ইহারও ঊর্ধ্বে উঠিয়া পঞ্চম ভূমিতে যাইয়া 'স্থিতা' স্থিতিতে পৌঁছিলে তবে স্থিতিটি নিরাপদ স্থিরতা ও পূর্ণতা লাভ করে; কারণ সেখানকার স্থিতিটি স্থাপিত বা সম্পাদিত স্থিতি নয়, ইহা 'স্থিতা' স্থিতি, 'resting rest'। এখানে যে-স্থিতি নিত্য বর্তমান, তাহাতে আরূঢ়

হওয়া মাত্র প্রয়োজন। তাই এ-স্থিতি স্থিতি-গতি এই দ্বন্দ্বের একটি নয়, ইহার বিরোধী অপর কিছু নাই, ইহা সকল দ্বন্দ্বের opposition-এর ঊর্ধ্বে, নিত্যা স্থিতি, শাশ্বতী স্থিতি। এখানেই স্থিতির চরমতা ও পরমতা।

কিন্তু এই স্থিতিলাভের প্রয়াসের প্রারম্ভেই চারিটি বাধা আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। প্রথম, স্থিতির অনুকূল ক্রিয়াটির আরম্ভই ঘটিতে দেয় না কালজন্য বাধা। স্থিতির জন্য প্রয়াস একটি বিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করে। যেমন কালের পরিণতিতে মানুষ যখন যৌবনাবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়, তখনই তাহার মধ্যে এক অব্যক্ত অভিনব ক্ষুধা, অশনায়া বা রিরংসা ফুটিয়া ওঠে, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও এমনি কালের পরিণতিতে একটি বিশিষ্ট অবস্থায় আসিয়া পড়িলে তবেই ব্রাহ্মী স্থিতির জন্য এক অদম্য বুভুক্ষা, আত্মাতেই রমণের জন্য এক সুতীব্র অভিলাষ ফুটিয়া উঠে। তাহার পূর্বে নয়। সেজন্য এই উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা সকলকেই করিতে হয়। যথোপযুক্ত কাল না আসিলে অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা হইতে পারে না। মধুসংগ্রহার্থী ভ্রমরকেও যথোপযুক্ত কালেই মধুর অন্বেষণে ব্রতী হইতে হয়। অন্যথা তার বৃথা ঘুরিয়া মরাই সার হয়। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে সে ফুল্ল মল্লিকার মধুপানের লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও যথাস্থানে বসিতে চাহিতেছে। কিন্তু চাহিলে হইবে কি? কাল বা দিক্ কিছুরই যে যোগাযোগ নাই। পবনও যে এখন অনুকূল ‘মন্দ মন্দ বহনা’ নয় এবং নিজের গতিও যে এখন স্বচ্ছন্দ নয়, এমন কি মল্লিকাও যে এখন স্বভাবে নাই, অন্তরের মধুর ভাণ্ডার এখনো মেলিয়া ধরে নাই, পূর্ণ প্রস্ফুটনে নিজেকে প্রকাশ করে নাই। তাই মধুকরের বসার আশ মিটিবে কেন, কারণ সে যে যাত্রা করিয়াছে এক অশুভ লগ্নে। সুতরাং তার স্থিতির ইচ্ছা বা বসার আকাঙ্ক্ষার বৈফল্য অবশ্যম্ভাবী এক্ষেত্রে। অনেক সাধকই এইরূপ ক্রমপরিণতির অপেক্ষা না রাখিয়া, যথোপযুক্ত কাল আসার পূর্বেই, স্থিতির ঠিক লগ্নটি না জানিয়াই, স্থিতির প্রয়াসে বৃথা হেথা হোথা ঘুরিয়া মরেন।

কাল এসে করে গেল দূতীয়ালী,
মধু মিলনের চিতমল্লিকার বুকে।
কোন্ মুখে কোন্ পথ ধরি চলি?
পিয়াসী মধুপ পান্থ চায় দিকে দিকে॥

সুপ্রসন্না দিক্ এল অগ্রদূতী,
শুভলগ্নে দেখাইল সরল সরণি।
সরল সরণি—বিষম পবনা,
কেমনে মিলাব বায় নিশ্চিন্ত চলনী॥
কুটিল সরণি করিলে সরল,
রসতম প্রিয় পানে মোর অভিসার।
ক্ষুরধার ক্ষেপা নিশিত পবনে,
তবু অসম্ভব করে তোল বারবার॥
বিষমেরে দাও সুষম ছন্দ,
বায় অনুকূল মন্দ সুমন্দ বহনা।
লগন মধুর, সরণি সুন্দর,
মধুপথিকায় কর স্বচ্ছন্দ গমনা॥
প্রসন্ন লগন, সুপ্রসন্না দিক্,
পবনেও মধুচ্ছন্দা শিখাইলে মন্ত্র।
তবুতো আমার আপন স্বভাবে,
লুকাইলে কত কুণ্ঠা শঙ্কা কত দ্বন্দ্ব॥
সব প্রসাদিলে আমার কারণে,
মোর আপন প্রসাদে রাখিলে বঞ্চিত।
অকুণ্ঠ আকুতি অঝোর আশ্বাসে,
মোর আপনারে কর প্রসাদসিঞ্চিত॥
কৃপণ কুণ্ঠিত ছাড়িয়া অধ্রুব,
সে পরম রসতমে একান্ত বিরাম।
স্থিতা স্থিতি, শুধু স্থাপিকায় নয়,
স্বভাবের স্বভাবন বিনা শুধু নাম॥
যত কাম যত আশা ও আয়াস,
সকলের সমাপিকা নিজে সমাপন।
সকল নির্ঝর, সকল তটিনী,
সমাপিয়া মহাসরিতের সিন্ধুস্নান॥

কভু তরঙ্গিত, নিস্তরঙ্গ কভু,
জাগর স্বপন কিংবা ধেয়ান সমাধি।
কর্ম্মকোলাহলে, মগ্ন মৌনরসে,
বিপুল গভীর দীপ্ত শান্ত নিরবধি॥
মধুমত্তম হে আমার স্বামি,
মধুরের অভিসারে আলোর দিশারী।
তোমারি অনন্ত করুণা প্রসাদ,
ঢেলে দাও, করে নাও একান্ত তোমারি॥

সর্ব্বং শূন্যং ব্রুবন্তঃ কিমধিকরণতাং ব্রূয়ুরাধেয়তাং বা
সর্ব্বং দুঃখং লপন্তোঽনুভববিষয়তামাত্মনোঽনাত্মনো বা।
সর্ব্বং স্যন্দি ব্রজন্তঃ ক্ষণিকচপলতাং বীচিভঙ্গোঽর্ণবে বা
সর্ব্বমাত্মেত্যটন্তো বিগতবিমতয়ো যান্তি নির্দ্বন্দ্ব-সৌখ্যম্॥ ১৭১

সে কোন্ যাদুকর, বিশ্ব ইন্দ্রজাল, যাহার আজব রচনা?
‘শূন্য’ নাম তার? কোথা কারে রাখি, কেমনে, কেন বা, বল না!
আনন্দ দীপালী, ক্ষণপ্রভা ছটা, নির্বাণ চিরতমসায়।
সুখের বুদ্‌বুদ্ দুখের সায়রে, সবে ফুটি সদ্য ভেঙ্গে যায়॥
দুঃখ শুধু সত্য, দুঃখ শুধু নিত্য,—তবু সে দুঃখ অনুভব।
‘আনন্দ আকাশ’, আধার আত্মা—তায় ছেড়ে কভু সম্ভব?
নিখিল ভঙ্গুর, নিখিল স্যন্দি, ভাঙ্গা গড়া অন্তহীন।
এই অবিরাম, বিশ্ববীচিভঙ্গ, কোন্ সমুদ্রে উদিয়া লীন?
সত্য, জ্ঞান, আর অনন্ত আনন্দ—ভুলিয়া আত্মায় ভুলিলে।
অবিশ্রান্ত শোক-তরঙ্গ-প্রহত, শূন্যেতে নিঃশেষ মাগিলে॥
দ্বন্দ্ব ক্রমাগত, ভঙ্গ নিরন্তর, —তায় পেতে চাও প্রশান্তি।
বিগতবিমতি, ভূমসুখরূপ! তেয়াগ’ নিজবোধে ভ্রান্তি॥

এই কারিকায় আভাষে সৎ-চিৎ-সুখ-স্বরূপ বিশ্ববোধের যে পরমাধার, সেটির কথা বলা হইল। সে পরমাধার নিজবোধরূপ আত্মা। শূন্য, দুঃখ, অনাত্মা,

অধ্রুব—ইত্যাদি কোন কিছু বলিয়া এই পরমাব্যক্ত পরম প্রকাশ নিজবোধরূপ আত্মার অপলাপ করা সম্ভব হয় না। বিরুদ্ধভাবগুলি পরিহারের নিমিত্ত যে গহন দুর্গম বিচারসরণি চলিয়াছে,—বহুধা বহুমুখী হইয়াও চলিয়াছে—সে পদে পদে বিভ্রমসঙ্কুল সরণির অনুসরণ বর্তমানে হইল না। শূন্যাদি এই গ্রন্থে যথাস্থানে লক্ষিত ও বিবেচিত হইয়াছে। এখানে সর্ব সংদিগ্ধ এবং সর্ব অধ্রুবের মাঝে কোন্ মুখে অসংশয়-ধ্রুব সত্যটির (দ্বন্দ্বরহিত আনন্দ উপলব্ধিরূপে) সন্ধান করিতে হইবে—তাহারই নির্দেশটি হইল। বিচারের ভূমিকার জন্যও অত্যাবশ্যক যে নিজবোধ (immediate Self-experience) রূপ আধারভূমি, সেটিও দেখান' হইল। বিমতিমত্ততা ছাড়িয়া সেই পরম নিজবোধরূপ আধারে ভ্রান্তিহীন বিশ্রান্তি এবং ক্লান্তিহীন প্রশান্তি মিলাইতে চল।

ইতি জপসূত্রে আনন্দধারনিরূপণং নাম চতুর্থঃ পাদঃ॥

জপসূত্রম্

(দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ)

এই পাদে প্রথমতঃ ভানের ভিত্তিতে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার নিরূপণ হইতেছে।

১। অস্তীতি-প্রতীতিগোচরতানিধানত্বং চৈতন্যস্য ভানত্বম্।।

চৈতন্যের, 'অস্তি' এইভাবে প্রতীতিগোচরতার নিধান বা আধাররূপটি হইল ভান।

লক্ষণে লক্ষ্য কর যে, 'অস্তি' এই প্রত্যয়ের বিষয়তাকে 'ভান' বলা হইল না। সেটি ব্যাহৃতিসূত্রে 'সত্যম্'। ঐ বৃক্ষটি আছে, অথবা মনে এই ভাবটি আছে, এইভাবে প্রতীতি হইল। তখন প্রশ্ন হয়—সাক্ষাৎ বা গোচর রূপেই প্রতীতিটি হইল অথবা হইল না? অপরের কথা শুনিয়া, অথবা অনুমান-আন্দাজ ইত্যাদি করিয়াও তো এক প্রকারের প্রতীতি হইতে পারে, কিন্তু তাতে 'গোচরতা' ধর্মটি (directness, immediateness) থাকে না, অর্থাৎ, সেরূপ প্রতীতির বিষয়টি সম্বন্ধে। যেমন, জপ করিতে থাক, নাদ শুনিবে। তারপর আবার নাদাভ্যন্তরং জ্যোতিঃ, ইত্যাদি। জপে যে এরূপ ফলিতে পারে, তার সপক্ষে কোন কোন যুক্তিও পাইলে। কিন্তু এতে প্রতীতিগোচরতাটি তো হইল না। যখন সেটি প্রতীতিগোচররূপে হয় (নাদাদি), তখনও সেটি খণ্ডিত, 'টুকরা' রূপে হয় না। কোন প্রতীতিই যে সেভাবে হয় না, তা আগে অনেকবার বলা হইয়াছে। একটা অখণ্ড সমগ্র চেতনার আধারভূমিতে ছবির মত সব কিছু ভাসিতে থাকে। সে সমগ্র চেতনার আধারপট ছাড়িয়া কোন বিশেষ রূপাদি থাকে না। এইটি 'চৈতন্যের নিধান' রূপে সূত্রে বলা হইল। এখন, এই অখণ্ড সমগ্র চৈতন্যের আধারে 'অস্তি' আকারে যে সাক্ষাৎ প্রতীতি, সেটি 'ভান' বলা হইল।

পূর্বে বৃত্তিসূত্রে অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি এবং মোদতে—এ চার মূল প্রকারতা (Radicals) কথিত হইয়াছে। এ চারের মধ্যে অন্ততঃ প্রথমটি ভানে 'ভাসিত' হওয়া

চাই। প্রথমটি ছাড়াও অপর কোন কোনটি ভাসিত হইলেও ভান। তবে, সে সব স্থলে, ভান অপর নামও গ্রহণ করে। অন্ততঃ 'অস্তি' রূপে চৈতন্যের যে প্রতীতিগোচরতাধারত্ব, সেটিকে চৈতন্যের 'ভাবক' ভান বলা যাক্। 'চৈতন্য', 'প্রতীতি' এ সব লক্ষণে রহিয়াছে বলিয়া ভাবিও না যে, ভান কেবল মানস বা আন্তর (subjective) পদার্থ। তা নয়। বাহ্য বা objective worldও ভান। বাহ্য-আন্তর ভেদটি ভানের কুক্ষিতে, ভানকে সমগ্ররূপে ব্যাপ্ত করে না।

ভাবকো ভাসকশ্চাপি মাপকো গ্রাহকস্তথা।
ইমে চত্বার এব স্যুর্গোচরতা-নিরূপকাঃ।
অন্তত-আদিমব্যাপ্যবৃত্তিত্বে ভানবৃত্তিতা॥ ১৭২

যে প্রতীতিগোচরতার কথা হইল, সে গোচরতার নিরূপক (determinant) চারিটি—ভাবক, জ্ঞাপক, মাপক, গ্রাহক। এ চারিটির মধ্যে অন্ততঃ প্রথম (আদিম)টি দ্বারা যে প্রতীতি (experience), সাক্ষাৎ 'অস্তি'—এই ভাবে 'ব্যাপ্যবৃত্তি' (subsumed, covered) হইতেছে; অর্থাৎ, যে সাক্ষাৎ প্রতীতিতে অন্ততঃ পক্ষে এই ভাবটি থাকে—'এটি আছে বা রহিয়াছে রূপে ভাসিতেছে'—যেমন, সম্মুখের ঐ পাহাড় বা বৃক্ষ—সেখানেই ভান বৃত্তি, এটি বুঝিতে হইবে। সাক্ষাৎ প্রতীতিতে 'অস্তি' ভাবটি বিশেষতঃ বৃত্তিমৎ থাকিলে, ভানের এলেকাতে আসিবে। এটি 'জ্ঞান'—এভাবে সেটির অনুমর্শাদি (appreciation) না থাকিলেও ভান হইতে বাধা নেই। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বে perception এবং apperceptionএ ভেদ করা হয়। ন্যায়াদিতে 'ব্যবসায়' এবং 'অনুব্যবসায়ে'। সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক জ্ঞানেও। এ সব স্থলেই, 'এটি জ্ঞান', জ্ঞানের বস্তু বা বিষয় নয়, এই রকমের একটা ভেদ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে (explicitly বা implicitly) ধরিয়া লওয়া হইতেছে মনে হয়। ভানে অন্ততঃ 'অস্তি' ভাবটি থাকিলেই হয়, সেটিকে পূর্বোক্ত আকারে জ্ঞানরূপে গ্রহণ করা হউক্ আর নাই হউক্। ভান = Experience as Given or as 'Fact' বটে, কিন্তু সেটি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এভাবে বিশ্লিষ্ট এবং গৃহীত (taken) না হইলেও ভান। ধর, আমাদের মত কোন 'কেন্দ্রে' সেটি জ্ঞানাদিরূপে গৃহীত হইল না; তথাপি ব্যক্তিসম্বন্ধরহিত, কেন্দ্রে

'সংহত' নয় এমন, চৈতন্যে সাক্ষাৎ প্রতীতিরূপে ভান বিদ্যমান। সুতরাং, প্রতীতি বা Experience কথাটা কোনও কেন্দ্রসম্বন্ধে লইয়া, সেটিকে 'আন্তর' (subjective), 'বাহ্য' (objective real) নয়—এই রকমে সঙ্কীর্ণ করিয়া যেন না লই। ভানভূমিতে Ideal এবং Realএর দ্বন্দ্ব সাবকাশ হয় নাই। ধর, ঐ গাছটা। আমার, বা তোমার, বা তার জ্ঞানের 'বাহিরে' সেটা কি আছে, থাকে তো কি ভাবে আছে?—এ প্রশ্ন ভানভূমিতে নেই। জ্ঞানভূমিতে আসিয়া আছে। যদি বল, ভান তো চৈতন্যের সাক্ষাদ্ভাবে প্রতীতি; সুতরাং, Idealism হইল, Realism নয়। তা যদি বল তো মনে রাখিতে হইবে যে—চৈতন্য=প্রচলিত ধারণামত, Ideal নয়। আবার, প্রচলিত ধারণামত, Realও নয়। দুয়ের মূল বা নিধান চৈতন্য; সেই মূল আশ্রয়ে ভানরূপ অখণ্ড কাণ্ড; সেই কাণ্ড আশ্রয়ে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি সব শাখা। বেদান্তে বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাদি পরিভাষা লক্ষ্য করিও।

জপাদি সকল সাধনে আপন অনুভূতিগুলিকে 'শাখাভেদ' থেকে কাণ্ডঅভেদে, জ্ঞান থেকে ভানে আনিতে হয়। যতক্ষণ শাখায়, ততক্ষণ কেবল যে বাহ্য এবং আন্তর (objective এবং subjective feeling ইত্যাদির)—এ দুয়ের ভেদ, এমন নয়; 'এ-কেন্দ্র', 'সে-কেন্দ্র'-গত ভেদ (individual factor) থাকে। ভানভূমিতে এ দুই ভেদই নিরাকৃত (resolve) করিয়া লও। আগের দুটিকে বিজাতীয়, সজাতীয় ভেদের সঙ্গে তুলনা করিও। ভানে স্বগতটি এখনও রহিয়াছে। নিধানে বা অধিষ্ঠানে সেটিকেও 'নাই'রূপে পাইতে হয়। এর সবিশেষ আলোচনার নিমিত্ত আবার মহামায়াসূত্রে ফিরিয়া যাও।

২। অস্তিভাতীত্যুভয়-প্রতীতিগোচরতানিধানত্বং চৈতন্যস্য জ্ঞানত্বম্॥

চৈতন্যের আধারে 'অস্তি' 'ভাতি' এই উভয়রূপ যে প্রতীতিগোচরতা, সেটি জ্ঞান।

আগে সাক্ষাৎপ্রতীতির 'ভাবক' (ভূ=অস্তি) ভাবটি ভানভূমিরূপে দেখান' হইল। এইবার, জ্ঞাপক ভাব। আধার চৈতন্যে অস্তিতা-ভাতিতা-প্রিয়তা নিত্য। তথাপি, সে অধিষ্ঠানে যে নিখিল প্রতীতি হইতেছে, তাতে, অর্থাৎ সেই অশেষ প্রতীতির প্রত্যয়ে, চারিটি ভাব 'যেন' আলাদা আলাদা করিয়া নিজেদের দেখায়। সে চারিটি ভাব—অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি, মোদতে। প্রতীতিরূপ প্রেক্ষাগৃহে যেন চারিটি ভাবের 'সুইচ'। প্রথম (অস্তি) সুইচ্‌টি নিত্য খোলাই বটে। যেমন, প্রেক্ষাগৃহে সবই 'আছে', কিন্তু এখনও

আলো তাতে পড়ে নাই। আলো পড়িল, প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত কিছু 'ভাসিয়া' উঠিল। তারপর, ধর প্রেক্ষাগৃহের 'রীল' চলিতে লাগিল, ছবিগুলো পর পর আসিতে লাগিল। এবার তিনের সুইচ্‌টাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তারপর, ধর, ছবিতে স্বর, সুর, ছন্দঃ ভাব, ব্যঞ্জনাদি ফুটিতে লাগিল। এটি চারের সুইচ্—মোদতে। বিশ্বপ্রেক্ষাগৃহের এই চারিটি সুইচ্—ভাবক, (জ্ঞাপক) ভাসক, মাপক, মোদক। ধর, বীণায় কোন রাগ আলাপিত হইতেছে। স্পন্দ বা ঝঙ্কাররূপে সেটি অস্তি, শ্রোতার কর্ণে ও মানসে অনুভূতি বা জ্ঞানরূপে সেটি ভাতি; সুর-ছন্দাদিরূপে মাতি (ঋচ্ছতি); এবং, রসসংবেদন, ভাব-নিবেদন রূপে প্রীণাতি (মোদতে)। তোমার জপ্যমন্ত্রাদি লইয়াও এই চারদিক্ দিয়া দেখ। রেডিও-তরঙ্গ আকাশে অস্তি; যন্ত্রে ও অনুভবে আসিয়া ভাতি; তরঙ্গ-পরিমাপাদি সম্বন্ধে মাতি; এবং ভাববেদনারূপে প্রীণাতি। একটা পাথর কোথাও অদেখা অজান্তা পড়িয়া আছে। তার এই অস্তিটি তার নিজের সম্বন্ধে অথবা কোন ব্যষ্টি প্রমাতার সম্বন্ধে জ্ঞান (প্রত্যক্ষ রূপস্পর্শাদির সমষ্টি) রূপে ভাতি নয় বটে, কিন্তু অধিষ্ঠানচৈতন্যের সম্বন্ধে সাক্ষাৎপ্রতীতি (direct or immediate 'Given'); তার সে অস্তি ভান, ভানব্যতিরিক্ত নয়। অর্থাৎ, blind, brute being or existence বলিয়া কিছু নেই, থাকিতেও পারে না। শুধু আবার তাই নয়। চৈতন্যের অধিষ্ঠান কি শুধু? 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্বাবভাসক। এটিকে বিভূ সর্বসাক্ষী সর্বদ্রষ্টা চৈতন্য বল। এঁর দৃষ্টিতে ঐ অদেখা পাথরটাও 'দেখা', সুতরাং, ভাতিজ্ঞান। ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ, এবং তাঁর তপঃকেও জ্ঞানময় বলা হয়। ভগবত্তা সম্বন্ধে অ-ভাতি বা অজ্ঞান নেই।

পূর্বোক্ত চারিটি সুইচ্ এক সঙ্গেই পূরাপূরি খোলা থাকার এক পরমভূমি অবশ্যই আছে। কিন্তু কেন্দ্র-সম্বন্ধী, নাভি-সংব্যূঢ় চেতনার ভূমিতে ঐ চারিটিকে সর্বস্থলে যুগপৎ এবং পূর্ণরূপে খোলা পাই না। যেমন, ঐ অদেখা পাথর বা অশ্রুত রেডিওর বেলা। অস্মদাদির ভানে (universe of given experience or Factএ) এসব থাকে আবার থাকেও না। আসে, চলিয়া যায়। ভানে এলেও হয়ত' জ্ঞানে আসে না। তার মানে, পাথরটাকে জ্ঞেয় বা জ্ঞান (as an object or mode of consciousness) করিয়াও সব সময় দেখি না। পশুপক্ষীরা হয়ত' দেখে না, শিশুও দেখে না। আমরাও সাইকোলজিস্ট হই কতটুকু সময়ের জন্য? বস্তুর ভান এক জিনিষ, তার

জ্ঞান (appreciation in consciousness) অন্য জিনিষ। সুষুপ্তি, গাঢ়মূর্চ্ছাদিতে ভান থাকে, জ্ঞান থাকে না। বলা বাহুল্য, জ্ঞান=চৈতন্য, এই সমীকরণ করিয়া এই ভেদটি করা হইতেছে না। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই ত্রিপুটীর লক্ষণে আসিয়াছি। 'বিজ্ঞাতমবিজানতাম্' ইত্যাদি শ্রুতিতেও ভান ও জ্ঞানকে তফাৎ করিয়া বুঝিতে হইবে। বেদান্তে যে চরম ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বলা হয়, সেটিও ঐ চারিটি সুইচ্‌কে একান্ত অভেদে আনার ঠিক পূর্বভূমিকা।

অস্মদাদির ব্যবহারে ভান ও জ্ঞানের এই প্রকার ভেদ দেখা যায় বটে (সেটি দেখাবার জন্য ঐ প্রেক্ষাগৃহ আর চারিটি সুইচ্), কিন্তু জ্ঞানকে ব্যাপক, করিয়া, অর্থাৎ সেই সর্বজ্ঞ সর্ববিদের জ্ঞান পর্যন্তও লইয়া দেখিতে হইবে। শুদ্ধ জ্ঞান কোন লক্ষণে আসে না, তবু সেটির তটস্থ হইবে। সেই জন্য, সুত্রের লক্ষণটিতে পুনশ্চ দৃষ্টি ও ধ্যান লাগাও। আমাদের ব্যবহারের মধ্যে 'সীমিত' হইয়া থাকিলেই চলিবে না। তথাপি, ভানভূমিতে—'Given' or 'Experience' as such (as directly and simply intuited, apprehended); আর জ্ঞানভূমিতে Given as 'posited', cognised as Given (existent); —এই বিশেষটি লক্ষ্য করিও।

ভানভূমি পূর্বালোচিত বিমর্শাদি মর্শপঞ্চকের দ্বারা ভাসপঞ্চকরূপতা আকারে জ্ঞানভূমি হইলেও, ভান তিরোহিত হয় না; ভানের 'কুক্ষি'তেই এই বিমর্শন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং, ভানকে 'সরাইয়া' জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি নয়। ভানে যে অখণ্ডত্ব, সমগ্রত্ব, নির্ব্যূঢ়ত্ব ইত্যাদি, সে সব কখনই চলিয়া যায় না। ভান রূপে চৈতন্যের যে ভাসকতা (তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি), সেটি নিত্য এবং সর্বত্রগ। তথাপি, জ্ঞানভূমিতেই, বিশেষ করিয়া, ভাসকভাবটি ফুটিয়াছে এবং এই বিশেষটি দেখাইবার নিমিত্ত অস্তিতাপ্রতীতিস্থলে 'ভাবক' শব্দটি গিয়াছে।

ভাসত ইত্যবচ্ছেদগ্রহণাদ্ গোচরতাং গতে।
অস্তীত্যপি বিশেষেণ গৃহ্ণাতি জ্ঞানরূপতাম্।
ঘটো ভাতি ঘটশ্চাস্তীত্যনয়োর্ভেদ ঈক্ষ্যতে॥ ১৭৩

'ঘট আছে' আর 'ঘটটি দেখিতেছি বা জানিতেছি' (ভাতি)—এ দুটির মধ্যে ব্যবহারতঃ ভেদ দেখা গিয়া থাকে। যেমন, বেদান্তে প্রসিদ্ধ 'দশমঃ অস্তি' আর

'দশমস্ত্বমসি'। প্রথমটিতে, 'অস্তি' এই প্রত্যয়টি 'ভাসতে' বা 'জ্ঞায়তে' এই অবচ্ছেদ বা নিরূপকবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ বিশেষদ্বারা বিশেষিত হইয়া 'ঘটজ্ঞান' রূপটি ধারণ করিল। অস্মদাদির ব্যবহার নির্বহণের নিমিত্ত এ ভেদটি আবশ্যক। সাধনেও যে নাদাদি 'অস্তি', তাদের 'ভাতি'রূপে মিলাইতে কত না আয়াস করিতে হয়! ব্যাহৃতির আকৃতিতে 'অস্তি'=ভূঃ হইলে, 'ভাতি'=স্বঃ, এবং যে 'ঋচ্ছতি'র কথা পরে আসিতেছে, সেটি ভুবঃ স্থানীয়। এগুলি চিন্তা করিও। প্রণবে অ=অস্তি; ম=ভাতি, মোদতে; উ=ঋচ্ছতি।

কারিকায় সাধারণ ভেদটিই দেখান হইল।

৩। অস্তিভাত্যর্চ্ছতীতি ত্রিতয়প্রতীতিগোচরতানিধানত্বং
চৈতন্যস্য জ্ঞেয়ত্বম্।।

অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি—এই তিন প্রত্যয়গোচরতার আধাররূপে চৈতন্য বিশেষিত হইলে, সেটি জ্ঞেয়।

প্রণব ব্রহ্মের সাক্ষাদ্ ভানরূপ। কিন্তু বিশ্বব্যবহারে এবং সাধন প্রয়োগে এই ভান আপনাকে চতুষ্পাৎ করিয়া দেখায়। এইগুলি অস্তিপাদ, ঋচ্ছতিপাদ, ভাতিপাদ এবং মোদতেপাদ। সাধারণ ব্যাহরণে অ=অস্তিতাপাদ; কিন্তু পূর্ণ ব্যাহরণে 'অউম' এই তিনে অস্তিতা; নাদে ভাতিতা; বিন্দুতে মোদন বা প্রিয়তা; এবং কলাশক্তি অর্দ্ধমাত্রারূপে নাদ-বিন্দুকাষ্ঠায় ঋধ্যমানা হইলে, ঋধ্যতি বা ঋচ্ছতি পাদ। এখন, ভাবিয়া দেখ, প্রণব, হ্রীঁ আদি বীজ, অথবা কোন ইষ্টনাম 'জ্ঞেয়' রূপটি ধরে কখন, কি হইলে? জপাদি সাধনে এই অত্যাবশ্যক প্রশ্ন। তাছাড়া, সাধারণ ব্যবহারেও (বিজ্ঞানাদিতেও) কখন, কি থাকিলে, বলা যায় যে, এইবার এই পদার্থ, শুধু ভান-জ্ঞান নয়, পরন্তু 'জ্ঞেয়'ও (object of cognition, knowledge ইত্যাদি) হইল? চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, নিখিলের আধার যে চৈতন্য সামগ্রী, সেটি নিজেকে মেয়তা-মাপক আকারে বিশেষিত, 'প্রচোদিত' না করিলে কোন কিছুই 'জ্ঞেয়' রূপটি পায় না। গোড়াতে মূলতত্ত্বের নিজেকে 'অহং-ইদং' আকারে যে বিসর্জন (ঈক্ষণাদি), তাতে এই 'মাপিব' বা 'মাপিয়া দেখিব'—এই ভাবটি নিহিত বুঝিতে হইবে। আর, বিজ্ঞানব্যবহারে আসিয়া, object মানেই whatever is measured or measurable, বস্তুতঃ, পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষভাবে কোন কিছু জ্ঞেয় হওয়া মানে সঠিক পরিমাপে আসা। শুধু গুণবিভাগশঃ (qualitative) যে জ্ঞেয়, সেটি 'বিজ্ঞেয়' হইল না, যতক্ষণ না সেটি 'গুণকর্ম বিভাগশঃ' (both qualitatively and quantitativley) জানা গেল। ফোটোতে কোন সুদূর জ্যোতিষ্কের ছবিটি পাইলেই হইল না; Spectrum analysis ইত্যাদি অনেক রকমে সেটিকে বিজ্ঞেয় করিতে হয়। সব ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ-জ্ঞান তার জ্ঞেয়টিকে এই রকম সব দিক্ দিয়া সূক্ষ্ম করিয়া দেখিতে চায়। মেয়তাই জ্ঞেয়তার মজ্জা। প্রণবাদিকে এত সব পাদে মাত্রায় কলায় কাষ্ঠায় পাওয়ার কি দরকার? তা নহিলে যে, শ্রদ্ধা যে, বিদ্যা এবং উপনিষৎ—এ দুটি পক্ষই তার উদ্ভিন্ন দেখিবে না। এইবার কারিকা—

ভাতি চাস্তীতি রূপে দ্বে ন দত্তো জ্ঞেয়রূপতাম্।
ন তাবজ্ জ্ঞেয়তা গচ্ছেদ্ যাবন্ন মেয়তাং ব্রজেৎ।
ন তাবন্ মেয়তা চাস্তে ন যাবদ্ গতিকর্ম্ম চ॥ ১৭৪

এই তৃতীয় (জ্ঞেয়) ভূমিতে আসিয়া কি পাইতেছি? যেটি 'আছে' এবং 'দেখা বা জানা'ও যাইতেছে, সেটি এখানে আর শুধু তাই নয়, অধিকন্তু 'হইতেছে', 'করিতেছে' (Becoming, Doing or Functioning) আকারেও নিজেকে দেখাইতেছে। এই অভিনবরূপটি ফুটিয়া থাকে যাকে আশ্রয় করিয়া, তাকে কারিকায় বলা হইল—'গতিকর্ম'। সূত্রে 'ঋচ্ছতি'। ইংরাজি এক 'Functioning' শব্দটাকে ব্যাপক করিয়া লইলে চলে। নাদ জ্যোতিঃ হইতেছে, জ্যোতি আবার রস হইতেছে,—এ সবে 'হইতেছে' শব্দটির মধ্যে ক্রিয়া-কারক-ফল, এবং পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা আকৃতিটি ব্যক্ত না হইলেও নিহিত থাকে। যথা, গায়ত্রীতে আদি প্রণবে বীজ, ব্যাহৃতিতে অঙ্কুর, 'তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি প্রথম পাদে প্ররোহ, দ্বিতীয় পাদে পাদপ, তৃতীয় পাদে ফল, এবং অন্তিম প্রণবে আবার বীজ। প্রণবকে গায়ত্রীতে এইভাবে 'গতিকর্ম' আকারে পাই, তাই না তিনি পাদমাত্রাদিরূপে মেয়, সুতরাং জ্ঞেয়! বাহিরে, তড়িৎ তো সর্বত্র অস্তি; কিন্তু গতিকর্ম আকারে না আসিলে মেয় বা জ্ঞেয় হয় না। চিত্তের সুষুপ্তিভূমিতে বিলক্ষণ গতিকর্ম থাকে না বটে, কিন্তু স্বপ্নে বা জাগ্রতে

সেটি নামিয়া আসিলে, 'স্মৃতি'রূপে সেটি জ্ঞেয়ও হয়। 'স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ' ইত্যাদি স্থলেও আত্মা বিজ্ঞেয় হন—আত্মা এটি নয়, উটি নয়, মেয় নয়, ইত্যাদি নেতিকরণে। নচেৎ, আত্মা শুদ্ধ ভান-জ্ঞান স্বরূপ। 'তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি'—এ স্থলে ইতিকরণ। যাই হোক, এ সূত্রে জ্ঞেয়কে মেয়সাপেক্ষ, এবং মেয়কে গতিকর্ম সাপেক্ষ করিয়া দেখাইয়া সর্বব্যবহারে ব্যাপ্তি দেখান হইল। 'অব্যবহার্য্য' স্থলে 'ঋচ্ছতি'টিকে একেবারে নির্দোষ নির্ব্যূঢ় সমতায় লইতে হইবে। তখন, ঋচ্ছতি তার নিখিল গতিকর্ম 'শান্ত আত্মনি' যচ্ছতি। অন্যত্র, এটি 'মাপিয়া' ব্যবহারযোগ্য (object as defined) করিয়া দেয়।

৪। অস্তিভাত্যচ্ছতিমোদত ইতি চতুষ্টয়-প্রতীতিগোচরতানিধানত্বং চৈতন্যস্য জ্ঞাতৃত্বম্।।

অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি, প্রীণাতি (মোদতে)—এই চারিটি ভাবে চৈতন্য প্রতীতিগোচরতার নিধান হইলে, যাহা হয়, সেটি জ্ঞাতা।

'ইদং', 'কথং', 'কিং' ইত্যাদি আকারে জ্ঞেয় পদার্থ সর্ববিধ ব্যবহারে উপস্থিত হইতেছে। সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অনুভবে এই সব আকারেই জ্ঞেয় আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু অতথ অথবা বিতথভাবে জ্ঞেয় হইলে তো লাভ নেই, বরং তাতে হানি আছে। এই নিমিত্ত, জ্ঞেয়কে মেয়, এবং মেয়কে আবার গতিকর্ম বিশেষতঃ পাইতে হয়। কেবল বহির্বিজ্ঞানে নয়, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেও। X-ray vision, inside graph, basic euqation এবং working formula—এই চারিটিই জ্ঞেয় নিরূপণে আবশ্যক হয়। এই চারিটিকে ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ রূপে দেখিতে পার। শুধু মুখে কথাগুলো আওড়াইয়া যাইলে তো হইবে না! জ্ঞেয়টিকে যথার্থ এবং কার্যকরী রূপে জানিতে, ঐ চারিটির সমাশ্রয় ব্যতীত উপায় নেই। কথা তো ঠিক, কিন্তু মূল প্রশ্নটি থাকিয়া যায়—কে জানিবে, কেনই বা জানিবে, জানিতে চাহিবে? জানার ও জানিতে চাওয়ার মূলে আছে এবং সব সময়ই থাকে—রস। ইংরাজিতে সাধারণভাবে Interest। মূলে রস থাকে বলিয়াই কাম, সঙ্কল্প, তপঃ ঈক্ষণ। কথাটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে—রস কোথায় 'আশ্রয়' এবং কোথায় বা 'আশ্রিত' ভাবে পাই? চাঁদের আপন কিরণ নেই, সূর্যের আছে।

যার স্বভাবেই আছে, সেটি আশ্রয়। অবশ্য, রস বা আনন্দ নিখিলেরই আত্মা, হৃৎ ইত্যাদি রূপে সর্বত্রই স্বভাবনিষ্ঠ। তথাপি, অস্মদাদির ব্যবহারে, রস আশ্রয়রূপে 'এখানে' আছে, আর 'ওখানে' (যেমন ঐ ফোটা ফুলটায়) 'যেন' শুধু আশ্রিতরূপেই (as projected, reflected) আছে। এ ভেদ তত্ত্বে না থাকিলেও ব্যবহারে আছে। আর, ঐ ফোটা ফুলটাতেও রস (শুধু মধু নয়, রসসংবিত্তিবীজরূপে) না থাকিলে, রসিক যে মধুপ, তার সঙ্গে ওর এই 'মধুসঙ্গ'ই সম্ভবপর হইত না। তার নিমিত্ত এক basic unison—মৌলিক সামঞ্জস্য—অবশ্যই থাকা চাই।

কিন্তু ব্যবহারতঃ নিখিলে অনুপ্রবিষ্ট যে ব্রহ্মবিন্দু, সেই ব্রহ্মবিন্দু যেস্থলে 'অহং' আকৃতিতে স্ফুটবৃত্তিমান্ (in patent function) সেই স্থলেই রস-সংবিত্তিকে আমরা ঠিক তদ্রূপে (as such) বোধে বা প্রতীতিতে মিলাইতে পারি, অন্যত্র সেভাবে পারি না। যে আত্মা 'প্রিয়ঃ' পুত্রাৎ প্রিয়ো বিত্তাৎ' ইত্যাদি, সেটি ঐ 'অহং' দ্বারে বা 'মুখেই' নিজের এবং নিখিলের প্রিয়তার (Interest) পরিচয় সাক্ষাৎ গোচরভাবে লইতেছেন এবং পাইতেছেন। এই নিমিত্ত, এই 'অহং' মুখেই আশ্রয়-রসের পরিচয় এবং আস্বাদন। রসের স্বলসিত ভূমিতে এই মুখটি যে 'মূক' হইয়া যায়, তাও দেখিয়াছি। তবু, 'মুখর' ভূমিতে রস এই মুখসর্বস্ব! যাই হোক্ 'মোদতে' বা প্রীণাতি প্রতীতির সাক্ষাদ্ গোচরতার নিমিত্ত এই মুখ্যরসিক ('Original Interest')—টিকে না হইলে চলে না। অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি—কিন্তু কার যেন ভেতর থেকে বলা চাই—বেশ! মন্ত্রে—ওম্। ওমের বিন্দুতে 'অহং জনানাং হৃদি' ইত্যাদি রূপে যিনি সন্নিবিষ্ট, অথবা, 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি রূপে যিনি বলেন, আমি 'চরামি', 'কৃণোমি'; সেই 'অহং' হইলেন 'প্রত্যঙ্ মুখ'। অস্মদাদির 'কারবারী আমি' 'পরাঙ্ মুখ'। তথাপি, সেটি 'Origin of Interest'। সুতরাং, সমস্ত কিছুর acceptance and appreciation তাকে কেন্দ্র এবং লক্ষ্য করিয়াই। 'ভাবয়ন্তঃ' 'চেতয়ন্তঃ' 'গময়ন্তঃ', পর্যন্তও 'আমি'টাকে বাদ দিয়া, অথবা আড়ালে রাখিয়া, চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু 'রসয়ন্তঃ'? রসের সঙ্গে সম্বন্ধটি একান্ত সাক্ষাৎ ও নিবিড়; এখানে 'মারফতে' 'বকলমে' কিছু হয় না।

ঘটো ভাতি ঘটশ্চাস্তি ঘটোঽয়ং জ্ঞায়তে পুনঃ।
ইত্থং ত্রিধা বিভেদস্য সূত্রং কিং তদ্ বিভাব্যতাম॥
আধারোঽখণ্ডচৈতন্যং সূত্রঞ্চ গ্রহীতা রসঃ।
সঙ্কল্পতপসী চৈব কামেক্ষণে চ বৃত্তয়ঃ॥ ১৭৫-১৭৬

ঘটটি আছে, ঘটটির বোধ হইতেছে, ঘটটিকে জ্ঞেয়রূপে জানিতেছি—এই তিন রকমের যে বিভেদ, তার মূলে সূত্রটি যে কি, তা ভাবিয়া দেখ। এ তিনেরি আধার যে অখণ্ড চৈতন্য, সে পক্ষে তো সংশয় নেই, কিন্তু সে পরমাধার ভূমি থেকে কে, এবং কেনই বা, ঘটটিকে অমনভাবে গ্রহণ করিল? অখণ্ড একরস, 'গ্রহীতা রস' রূপে এই অঘটনটি ঘটাইয়া স্বলসিত রসকে প্রপঞ্চিত করেন। সুতরাং, সূত্র ঐ গ্রহীতা। এ সূত্রের চারিটি বৃত্তি শ্রুত্যাদিতে নানাভাবে কথিত হইয়াছে—সঙ্কল্প, তপঃ, কাম, ঈক্ষণ।

এই পদের প্রথম চারি সূত্রে প্রতীতিগোচরতাকে (Immediate Experience) চারি-প্রকারে দেখান হইল। Experience as Fact (Given), Experience as Cognition, Experience as Function, Experience as Interest or Appreciation. এ চারিটিকে কেবলমাত্র, আনুতাত্ত্বিক (theoretical) বিশ্লেষণ ভাবিও না। সর্ববিধ ব্যবহারে এবং সাধনে ঐ চারিপাদে অনুধ্যানের আবশ্যকতা রহিয়াছে। সূত্র কয়টির ব্যাখ্যানে তাহা কিঞ্চিৎ প্রদর্শিতও হইয়াছে। এ স্থলে এই কারিকাটিতে উপসংহার করঃ—

অস্ত্যোঙ্কারঃ প্রথয়তু জপং দ্বারি ঢুণ্ঢীশরূপ
ঋচ্ছত্যোং নো গময়তু নমো বিশ্বনাথং শিবায়।
ভাত্যোং দীপো লসয়তু নমো নোঽন্নপূর্ণাং শিবায়ৈ
প্রীণাত্যোং নঃ শময়তু শুচং দ্বারি শান্তঃ পুনশ্চ॥ ১৭৭

কাশীধামে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনে যাইতেছ। তখন এইরূপ ব্যাহরণ এবং অনুধ্যান করিলে কেমনটি হয় বল দেখি? দ্বারে যিনি ঢুণ্ঢিগণেশ মূর্তিতে রহিয়াছেন, তিনি তো ওঙ্কার, এবং তিনি 'অস্তি' ভাবে রহিয়াছেন। সেই অস্তিরূপ ওঙ্কারকে

(তারচক্র নিয়মে) তোমার জপকে বিস্তার করিতে দাও না কেন (প্রথয়তু)! অর্থাৎ, বিন্দুরূপে যে প্রণব অস্তি, তাঁকে নাদরূপে উত্থিত করিলে। তারপর, সেই নাদসহ মাতা অন্নপূর্ণাকে 'দক্ষিণা' রাখিয়া বিশ্বনাথ দর্শনে চলিতেছ। এটি প্রণবের 'ঋচ্ছতি' রূপ। 'নমঃ' এই মন্ত্রদ্বারা এই-পরম মাঙ্গলিক গতি অর্থটি সূচিত। বিশ্বনাথভবনে এবং পীঠে সমুপস্থিত হইয়া এই 'নমঃ' আপনাকে 'ওঁ নমঃ শিবায়' আকৃতিতে পরিপূর্ণ করিয়া লইল। বিশ্বনাথগৃহে যে অখণ্ডদীপ, সেটি ওঙ্কারের 'ভাতি' রূপ। নিত্য অকুণ্ঠিত ভাতি। এই চির-অকুণ্ঠিত ওঙ্কারভাতি এইবার তোমার অন্নপূর্ণা মাকে স্বরূপে দেখায় যে দৃষ্টি, সে দৃষ্টিকে লসিত করুক্! এই দীপ-লসিত দৃশি লইয়া ফের মাকে মায়ের মতন করিয়া দেখিলে! আবার, ঋচ্ছতি—নমঃ। শিবায়ৈ—'ওঁ নমঃ শিবায়ৈ'—এই মন্ত্রে যেটি পরিপূর্ণা, সেটি সম্পূর্ণা হইল। মা অন্নপূর্ণার প্রসাদলাভে প্রণবের প্রীণাতিরূপ (তাই না শিবও স্বয়ং এ ধামে ভিখারী!)। মায়ের প্রসাদলাভে আমাদের শোক প্রশমিত হউক্ (শময়তু শুচং)। দর্শন সমাপনে পুনশ্চ দ্বারে ফিরিলাম—অর্থাৎ, শান্ত, বিন্দুলীন ওঙ্কারে। এই পরম পরিক্রমার মান্ত্রী তনু হইল—'ওঁ নমঃ শিবায় ওঁ নমঃ শিবায়ৈ ওঁ। গায়ত্রী প্রভৃতিরও এবম্বিধ পরিক্রমার সঙ্গে সুসঙ্গতি রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। যথা, গায়ত্রীর শেষপাদে (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ) মাতান্নপূর্ণেশ্বরী সাক্ষাৎ প্রসন্নারূপে ব্যাহৃতা এবং ভাবিতা হইতেছেন। কেবলমাত্র এই এক পরিক্রমায় নয়, অন্তর্বহিঃ সর্বতীর্থ-পরিক্রমাতেই নিজ নিজ ইষ্ট মান্ত্রীতনু এবং ভাবনাতনুটি মিলাইয়া লইবে।

৫। প্রত্যেকং নির্দ্বন্দ্বমিতরদ্ বা।।

পূর্বের প্রত্যেকটি নির্দ্বন্দ্ব (non-polar) অথবা দ্বন্দ্বার্হ, দ্বন্দ্বসহিত (polar) হইতে পারে। 'অস্ত্যেব' 'ভাত্যেব'—আছেই, ভাত হইতেছেই—ইত্যাদি প্রকারে অন্যথাবিকল্পরহিত হইলে নির্দ্বন্দ্ব; আর, আছে কিংবা নাই, ইত্যাদিরূপে বিকল্পিত হইলে দ্বন্দ্বার্হ।

ভাতি কিংবা ন ভাত্যেতদস্তি কিংবা ন বিদ্যতে।
মেয়ং জ্ঞেয়ং ন বা কিঞ্চিদ্ গ্রহীতৃ গ্রাহ্যমেব কিম্।
ইত্থমাধারসামগ্র্যাং দ্বন্দ্বস্য হি বিজৃম্ভণম্॥ ১৭৮

এই তিনটি তো দ্বন্দ্বভাক্ হয় না—(ক) শুদ্ধ অধিষ্ঠান চৈতন্য; (খ) ভানসামগ্রী যেটিকে Fact সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; এবং (গ) ভানসামগ্রীতে কোন কিছু (যেমন, আকাশকুসুম) ঠিক তদ্রূপে, অর্থাৎ নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ ভান, অথবা প্রতীতি-রূপে। দ্বন্দ্বভাক্ হয় গ্রহীতৃ-গ্রাহ্য সূত্র ধরিয়া, অর্থাৎ, গ্রহীতা কোন্ দৃষ্টিতে, কোন্ ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তার উপর নির্ভর করে আকাশকুসুম আছে অথবা নাই, ইত্যাদি।—It depends on the cognitive view-point and appreciative interest. ধর, জপে তুমি কোন ধ্বনি শুনিলে, কোন জ্যোতিঃ বা রূপ দেখিলে। অপরে শুনিয়া বলিল—'মাথার ব্যায়রাম'। তাতে তুমি হয়ত' ঘাবড়াইবে না; কিন্তু, প্রশ্ন— সব্বাইকার মাপকাঠি কি আপন আপন (individualistic view-point and interest) সত্ত্বেই সত্ত্ববান্? আদর্শ কিছু নেই, ব্যবস্থাপক সংস্থাপক কিছু নেই? আছে। সেটি 'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ' এর ভূমি। আগে যে তিন প্রকারের কথা বলা হইল, এটিকে সে তিন থেকে আলাদা করিয়া দেখিতে পার। তা হইলে, এটি হইল (ঘ)। শাস্ত্র এবং আপ্তবাক্য (ঋষি এবং দেবতা)—এই দুই রূপে এটির সঙ্গে আমাদের নিজ নিজ গ্রহীতৃগ্রহণ মিলাইতে চাই। বহির্বিজ্ঞানেও তাই করিতে হয়। মিলাইবার জন্য আত্মপ্রত্যয়টিকে 'যুক্তি' বা মননাদির দ্বারা প্রত্যয়ে যোজনা করিয়া যাইতে হয়। শনৈঃ শনৈঃ—একেবারেই হয়তো হয় না।

৬। সামান্যবিশেষৌ চ তত্র।।

সেথায় সামান্য এবং বিশেষ, এই দুটি আছে।

দূর হইতে দেখিলাম—একটা গাছ; কাছে গিয়া দেখিলাম—বটগাছ। নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা করিবে; দ্বাদশী ইত্যাদিতে সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি ইত্যাদি প্রকারে সামান্য-বিশেষের প্রয়োগ আছে। জপে অগ্নি সোম মাত্রাদ্বয়ের সমতা রাখিয়া যাইবে; কিন্তু কোন কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, মাত্রাবিশেষে বেশী জোর দিবে। জপধ্যান করিতে করিতে ললাটদেশে এক জ্যোতির্মণ্ডল দেখিলে; তাতে একাধিক বর্ণ ফুটিয়া উঠিয়া এক বর্ণালি চিত্র রচিতে লাগিল; শেষে এক অপরূপ নাদবিন্দু আকৃতি দর্শন করিলে। ধ্বনিশ্রবণেও সামান্য-বিশেষ। সূত্রের কারিকায় সাধারণ লক্ষণটি দেওয়া হইতেছে।

ব্যাপিকা চ তথা ব্যাপ্যা দ্বে বৃত্তী ভবতঃ সদা।
একয়া স্যাৎ সমাহারো ব্যবহাররোঽন্যয়া ভবেৎ।
গোচরতাবিনিষ্পত্তৌ দ্বয়োঃ স্যাদ্ যুক্তিরেতয়োঃ॥ ১৭৯

জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি সর্ব-স্থলেই ব্যাপিকা এবং ব্যাপ্যা, এই দুই রকমের বৃত্তি হইয়া থাকে। ভান সম্বন্ধেও এটি খাটে। এক পরম ও পূর্ণ ভানের ব্যাপ্য তোমার আমার ভান। এ ভেদ অবশ্য ব্যবহারিক। ভানকে 'মানে' এবং 'জ্ঞানে' লইয়া তবে এই ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবটি তাতে মিলাইতে হয়। Fact-কে Fact-review আকারে লইতে হয়। জ্ঞাতার বেলাতেও ঐ ভাবটি আছে। ব্যষ্টি-সমষ্টি মানে যাইয়া। ক, খ, গ, ইত্যাদি সকল ব্যষ্টি জ্ঞাতার জ্ঞাতাও কেহ আছেন। শ্রীগুরু শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে সামান্য বা সমাহারে জ্ঞাতা। এক একটি অক্ষরেরও জ্ঞাতৃত্ব আছে; প্রণবাদি ঐ ঐ অক্ষরদৃক্ সকলের সমূহদৃক্। কেবল তাই নয়, সমূহসৃক, সমূহভৃৎও বটে। অর্থাৎ, কেবল দ্রষ্টৃত্ব নয়, স্রষ্টৃত্ব-ভর্তৃত্বও সমাহারে বা সমূহভাবে প্রণবাদিতে রহিয়াছে।

অতএব, যেখানে সমূহ বা সমাহার সাধিত হইল, সেটাকে 'সামান্য', আর, যেখানে ব্যূহ বা ব্যবহার হইতেছে, সেটাকে 'বিশেষ' নাম দাও। গণিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ লক্ষণদ্বয়ের প্রয়োগ দেখিয়া লও। যেটা generic, সেটা particular বা specificএর 'পরিহাণ' (abstraction) মাত্র নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং চিত্তের সংস্কাররাশি জ্ঞান-জ্ঞেয়কে 'ব্যূঢ়' (restrict, canalize ইত্যাদি) করতঃ সাধারণ ব্যবহারযোগ্য করে; অতীন্দ্রিয়, যোগজ জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি তাদের পরিহাণ, কাজেই, 'অবাস্তব' রূপ নয়, ইহা বুঝিতে হইবে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাদিতে যেটি ব্যাপক ও সমাহারক, সেটি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ব্যাপ্য এবং ব্যবহারক হয় মাত্র। Actual যে Fact-Field তার limitation and specification হয় আমাদের চলতি জ্ঞানে। এইজন্য, General and Particular শব্দ দুটি না বলিয়া বলা যাক্—Inclusivity and Exclusivity. সাধারণ জ্ঞানজ্ঞেয়াদি function by exclusion of one another, and the real whole. ভান সামগ্রীকে মর্শপঞ্চক দ্বারা ভাসপঞ্চক করিয়া কারবারে লাগাইতে হয়। ভান সামগ্রীটিকে সমগ্রভাবে 'গ্রহণ' করিতে গ্রহীতা সচরাচর প্রস্তুত নয়। গ্রহীতা তার গ্রহণের উপযোগী 'সার্চ লাইট' বানাইয়া লয়। যাই হোক্, গোচরতা

(actual apprehension and appreciation) কে 'বিনিষ্পাদন' (limitation and specification) করিয়াই ব্যবহার চলে। সেই অভিজিৎ, নক্ষত্রের দৃষ্টান্ত। এই প্রকার বিনিষ্পত্তিতে কিছু যুক্তি (co-ordination ইত্যাদি) থাকা আবশ্যক। কাদের যুক্তি? পূর্বোক্ত সমাহার এবং ব্যবহার, এ দুটির। সমাহার বা সমন্বয় (সঙ্গতি) না রাখিয়া কোন বিশেষ দৃষ্টি বা গ্রহণ কোন ব্যবহারেই ফলপ্রদ ও সিদ্ধিদ হয় না। সমূহকৃৎ না হইলে সন্দোহভুক্ হওয়া যায় না। যেমন, কোন রাগবিস্তারে তান, গমকমূর্চ্ছনাদি, তালে বা ছন্দে অলঙ্কার, ইত্যাদি। সাধনে 'যুক্তি' একান্ত আবশ্যক। আত্মপ্রত্যয়ে এবং শাস্ত্র ও আপ্তপ্রমাণে, ইত্যাদি। আত্মপ্রত্যয়েও সকল অঙ্গা এবং ভাবগুলির যুক্তি বা সঙ্গতি।

৭। ঋচ্ছতের্ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাদুভয়ত্র ক্রমিকত্বেন কাষ্ঠাপ্রসঙ্গঃ।।

পূর্ব দুই সূত্রে যে দুই প্রকারের বিভেদ দেখান হইল, সে উভয় স্থলই (both the cases) 'ঋচ্ছতি' অথবা গতিকর্মের দ্বারা ব্যাপ্যবৃত্তি; অর্থাৎ উভয় স্থলেই গতিকর্মের ব্যাপ্তি (extension of relevancy) আছে, অব্যাপ্তি নেই; সুতরাং উভয় স্থলেই ক্রমিকতা (seriality) আছে, এবং যেহেতু ক্রমিকতা আছে, অতএব কাষ্ঠার (limit) প্রসঙ্গাও আছে।

পঞ্চম সূত্রে নির্দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বার্হ; ষষ্ঠসূত্রে সামান্য এবং বিশেষ। বর্তমান সূত্রে যে গতিকর্মের ব্যাপ্তি প্রসঙ্গা হইতেছে, সে ব্যাপ্তি কি নির্দ্বন্দ্ব এবং সামান্য ভূমি পর্যন্ত; সে ভূমিতেও কি ক্রমিকতা এবং কাষ্ঠার প্রসঙ্গা আছে?—এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে পাঁচটি ভূমি ভাবনা করা যায়—দ্বন্দ্বাতীত, নির্দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বার্হ, দ্বন্দ্বগর্ভ এবং দ্বন্দ্বস্থিত। ধর, একটা চণক বা ছোলার অঙ্কুর। অঙ্কুরে দুটি দল আলাদা দেখিতেছ। ছোলার মধ্যেও দুটি দানা (দ্বন্দ্বগর্ভ)। সূক্ষ্ম পরীক্ষায় বীজের নাভিতে যাও, সেখানে দ্বন্দ্বার্হ। পরীক্ষার গতি এই পর্যন্ত। কিন্তু নাভিরও নাভিতে রহিয়া 'কিছু' কি বলিতেছে না—আমি চণক, অন্য কিছু নই; এবং চণকের জাতি হইয়াও আমার এক নিজস্ব ব্যষ্টিত্ব (uniqueness) আছে? এই যে নিজস্বত্ব (uniqueness), এটি নির্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, অপর কিছুই বলিতে পারে না যে—আমিও তাই। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, ভান সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া একটা

ধূলির জ্ঞান, অথবা যে কোন প্রতীতি, নির্দ্বন্দ্ব (unique)। কোন প্রত্যয়ই অপরের একান্ত 'সম' নয়। এ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বহু হইয়াও সমস্ত কিছুতে 'একই' আছেন। কোন কিছুরই ঠিক 'যমজ' দোসর কেহ নেই। তবে, নির্দ্বন্দ্ব কথাটাকে আমরা ভেদপর্যায়ে (স্বগতাদি) লইয়াই সচরাচর ব্যবহার করি। এভাবে নির্দ্বন্দ্ব হইল সকল দ্বন্দ্বভূমির কাষ্ঠা, আর দ্বন্দ্বাতীত পরা বা পরমা কাষ্ঠা। সামান্য সম্বন্ধেও অনুরূপ বিচার চলিবে। যাহাতে সমাহার হয়, সেটিকে সামান্য বলা হইয়াছে, কিন্তু সমাহার বা integration ক্রমিকতার অপেক্ষা রাখিয়া কাষ্ঠার নির্দেশ করে।

উভয়ত্র ক্রমেণ স্যাৎ প্রসক্তির্গতিকর্ম্মণঃ।
ক্রমাৎ কাষ্ঠাপ্রসঙ্গাঃ স্যাদ্ দ্বে কাষ্ঠে চ পরমাবমে।
একয়া নাদবিশ্রান্তিরন্যয়া বিন্দুসংশ্রয়ঃ॥ ১৮০

কাষ্ঠা চরম ও অবম—এই দুই। অবম ও চরমে 'নীচ উচ্চ' ভেদ করিও না। অবমে ন্যূনতা বা হীনতা স্থলবিশেষে আরোপিত হইতে পারে। বিজ্ঞানগণিতাদির নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কাষ্ঠাদ্বয়কে গ্রহণ করাই উচিত। গণিতের সমাহারে যেমন শূন্য ও অসীম। এইবার ভাবিয়া দেখ যে, চরম কাষ্ঠার বিশ্রান্তি হয় নাদসামান্যে, এবং অবম কাষ্ঠার সংশ্রয় হয় বিন্দুসামান্যে। দুই দিকে 'পরোবরীয়ান্' বা 'ততো ভূয়ঃ' ক্রমে যাইতেছে। একদিকে বিশ্রামভূমি হইল পরম ব্যাপক যে নাদ, তাই; অপরদিকে, পরমসূক্ষ্ম যে বিন্দু, তাতেই কাষ্ঠাসংশ্রয়। 'বিশ্রাম' ও 'সংশ্রয়' শব্দ দুটিতে নাদ ও বিন্দুর সঙ্কেতও ভাবনা করিও। নিখিল ক্রমিকতার (seriality) কাষ্ঠা যে নাদ ও বিন্দু, তাদের সামান্য (ব্যাপক) অর্থেই নিও, কোন সঙ্কীর্ণ বিশেষ অর্থে নয়।

৮। উভয়কাষ্ঠাধীনত্বাদৃচ্ছতেরণুত্বধারাত্বে॥

পূর্বোক্ত নাদ এবং বিন্দু এতদুভয় কাষ্ঠার অনুরোধে ঋচ্ছতি, কিনা, নিখিল গতিকর্মের দুটি মুখ্য আকৃতি হইয়া থাকে—একটি অণু, অপরটি ধারা—Corpuscularity and Continuity.

বিজ্ঞানে সব কিছুর একদিকে যেমন অণু আকৃতি (atomicity, quantum

ইত্যাদি), অন্যদিকে আবার তেমনি ধারা আকৃতি (continuum, wave, flow ইত্যাদি)। আলোকাদি বহির্ব্যবহার পরীক্ষায় এবং অন্বীক্ষায় এই দুই আকৃতিতেই নিরূপিত হইতেছে। প্রাণের অণুত্বের কথা শ্রুতি থেকে পাওয়া যায়; মনের অণুত্ব বৈশেষিকাদি দর্শনের অভীপ্সিত। অথচ, এ দুই স্থলেই ধারাকেও না ধরিয়া উপায় নেই। পরবর্তী কোন কোন পাদে প্রাণ ও মন সবিশেষ বিবেচিত হইবে। বহির্বিজ্ঞানে যেমন Energyকে atomic এবং continuous এই উভয় আকৃতিতে ধরিয়া তবে ব্যবহার নিষ্পত্তি হইতেছে, প্রাণ এবং মনোবিজ্ঞানেও তদ্রূপ এই দুই আকৃতিই পাওয়া চাই। প্রাণ এবং চিত্তের প্রবাহ এবং স্রোতোরূপটি অবশ্যই চাই। কাষ্ঠায় নাদ অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত কিছুতে ধারারূপটির আধার হইয়াছেন (বিশ্রান্তি); এবং অপরকাষ্ঠায় বিন্দু সমস্ত কিছুতে কেন্দ্র, অণুরূপটিও সম্ভাবিত করিয়াছেন (সংশ্রয়)।

নাদকাষ্ঠা বিন্দুকাষ্ঠা গতিকর্ম্মপ্রযোজিকা।
উভয়াপেক্ষবৃত্তিত্বাদ্ যৌগপদ্যেন বৃত্তিমৎ।
একয়া ভজতে ধারামন্যয়া স্যাদণুত্বভাক্॥ ১৮১

নাদ ও বিন্দু এই দুটি কাষ্ঠা সর্ববিধ গতিকর্মের প্রযোজিকা (প্রচোদয়াৎ)। যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি তারচক্র জপে। সকল প্রকার গায়ত্রীতে তাই মূল প্রযোজিকাকে উদ্দেশ করতঃ ব্যাহরণ করিতে হয়—'প্রচোদয়াৎ'। কাষ্ঠারূপে নাদ-বিন্দু; উভয় কাষ্ঠায় এবং তদতীতে পর্যন্ত 'ঋধ্যমানা' কলাশক্তিরূপা অর্দ্ধমাত্রা। জপে দৃষ্টান্ত মিলিতেছে সার্বভূমিক এক ঋতচ্ছন্দের। বিজ্ঞান-গণিতাদি ব্যবহারেও গতিকর্মের প্রচোদয়িতা ঐ দুই কাষ্ঠা। একটা অণুত্বের খোঁজে; অপরটা ধারাত্বের খোঁজে। কোথায় সংশ্রয়, কোথা বিশ্রান্তি?—এই খোঁজ অফুরন্ত চলিয়াছে। দুই দিকে দুই কাষ্ঠার শাসনে ও আকর্ষণে কোন নির্দিষ্ট গতিকর্মই সমাশ্রিত ও বিশ্রান্ত হইতে পারে না। এটম্ ছেড়ে ইলেক্ট্রন, ইলেকট্রন ছেড়ে ওয়েভ্স—ইত্যাদি। লক্ষ্য কর যে, উভয় কাষ্ঠারই অপেক্ষা রাখিতে হয় বলিয়া, সকল গতিকর্মকে যুগপৎ অণু ও ধারা—এই দুইভাবে বৃত্তিমৎ হইতে হয়। দুটি ভাব দুইটি 'পিঠ' (aspect) এর মত সকল গতিকর্ম একসাথেই দেখাইয়া থাকে। বীজমন্ত্রাদিতে নাদবিন্দু সহগ; এবং উকার, ঈকারাদির

উচ্চারণ যুগপৎ এতদুভয়ের 'শাসনেই' করিতে হয়। স্বরকে নাদে অভ্যুত্থান করতঃ বিন্দুতে (সূক্ষ্ম স্বরাণুতে) মিলাইতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে 'স্বরোরু' এবং 'স্বরাণু' শব্দ দুটি মনে রাখিলে ভাল হয়।

৯। ততো হংসত্বমৃচ্ছতেঃ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে অণুত্ব-ধারাত্ব আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া (ততঃ) ঋচ্ছতি হয় হংস। অণু এবং ধারা (উরু), এই দুটি 'পক্ষ' লাভ করিয়া ঋচ্ছতি (গতিকর্মসামান্য) হংসরূপ ধারণ করিল। জপসূত্রমে যে 'প্রাণিক আকৃতি' বার বার কথিত এবং বহুধা উদাহৃত হইয়াছে, বর্তমান সূত্রে তার মৌলিক রূপটি দেখান হইতেছে।

হকারো নাদকাষ্ঠাত্ব মনুস্বারশ্চ বিন্দুতাম্।
সূচয়ন্তি সকারোঽপি কোটিদ্বয়াশ্রয়াংসৃতিম্।
বিসর্গেণ চ সর্ব্বস্যাধারে স্যাত্তু বিসর্জ্জনম্॥ ১৮২

'হ' বর্ণে নাদকাষ্ঠা (শক্তি = গতি = চরম উরুক্রম কাষ্ঠা = as Continuum') সূচিত হয়। অনুস্বার সূচনা করে বিন্দুকাষ্ঠা (শক্তি = গতি = অবম অণুক্রম কাষ্ঠা = as 'Point')। 'স'কার সূচনা করে শক্তি অথবা গতির এতদুভয় কোটির (পক্ষ) আশ্রয় করতঃ যে সৃতি (movement with respect to, and as governed by, the two Dynamic or Functional Limits), তাহাই। গতি সামান্যরূপ; 'সৃতি' বলিলে গতির এই বিশেষ আকৃতি (pattern) বুঝিতে হইবে। যেমন, কোন লৌহখণ্ড; তার গতি নানাকারণে নানাভাবে হইতে পারে; কিন্তু পোলদ্বয় বিশিষ্ট কোন চুম্বক সন্নিধানে তার যে গতি, সেটি ঐ চুম্বকের পোলদ্বয়ের শক্তিবিন্যাস ('field of energy') দ্বারা এক বিশেষভাবে নিরূপিত হয়। জীবের গতিকে সংসৃতি বলা হয়, এই কারণে। এস্থলে, দুইটি 'পোল' হইল কর্ম ও অদৃষ্ট, ইত্যাদি। এসকল পরে বিবেচিত হইয়াছে। 'হংসঃ' এর অন্তে যে বিসর্গ, সেটি সূচনা করে 'বিসর্জ্জনম্'। কোথায়? নিখিল গতিকর্ম বা ঋচ্ছতির সামান্য এবং বিশেষ উভয়ভাবেই এক আধারভূমি থাকে; সেটি স্বয়ং শান্ত (quiescent)। এ আধারভূমি পরমে 'শান্ত আত্মা' বটে, কিন্তু

ব্যবহারেও এটি 'ততোভূয়ঃ' ক্রমে মেলে, এবং মিলাইতে হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, মনে সুখদুঃখাদি বেদনা—ইত্যাদি সকল কোটি বা পক্ষদ্বয় সমাশ্রিত গতিকর্মেই দেখা যায় যে, ঋচ্ছতি এক 'শাম্যতি' ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া সেই শাম্যতিতেই বারংবার প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। ব্যষ্টিতে সুষুপ্তি, সমষ্টিতে প্রলয়, ইত্যাদি। Recurrent relapse into the sustaining background of quiescence or repose. এইটি বিশ্বপ্রাণের মৌলিক ঋতম্। এটম্ থেকে ইউনিভার্স পর্যন্ত সব কিছুই তার গতিকর্মলেখটি এক স্থিতির আধারেই ফুটাইয়া লইতেছে, এবং তার শ্রান্তির 'র'কারটি বারবার কোন এক 'শান্তি'তে লয় করিয়া জিরাইয়া লইতেছে, নবীন হইতেছে, নব আবেগ ('original impetus') লাভ করিতেছে। 'হংস,' কেবলমাত্র মনুষ্যের নয়, নিখিল পদার্থের (অণু কি বিরাট্) অজপা জপ। এসব কথাও পরে বলা হইবে। ২য় খণ্ডে (খ) পরিশিষ্টে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে।

১০। তস্য বামেন দাক্ষিণ্যম্।।

'হংস' বামের দ্বারা 'দক্ষিণ' হয়।

সূত্রের ভাষা ও ভাব রহস্যময়। বাম মানে কি? উল্‌টাইয়া দেখা এবং লওয়া। Reversing the 'sense' of the process. কোন এক মুখে বা ভাবে বা ক্রমে কোন গতিকর্ম চলিতেছে। সেটির 'মোড় ফিরাইয়া লওয়া', 'মুখ ফিরাইয়া দেওয়া', ইত্যাদি হইল 'বাম'। প্রণবে অ উ ম। আদিতে স্বর দুটি যে ক্রমে আছে, সে ক্রম বিপরীত কর। হইল 'উ অ' = ব। পাইলে, 'বম্'। প্রণবের মকারের পর 'অ' স্বরের ধারা; এই ধারা থেকে এক স্বরমাত্রা লইয়া মকারের আগে মিলাও। পাইলে, বাম। এতে উল্টাইয়া লওয়া দুই মুখেই সাধিত হইল। ধর, ক আর খ পরস্পরের পানে 'পিঠ' ফিরাইয়া আছে। উভয়েই পরাগ্‌বৃত্ত। এখন, শুধু যদি ক কে খ এর পানে ফিরাইয়া লও, তাতে তো হইল না। খ কেও ক এর পানে ফিরাইতে হইবে। তবে, তারা পরস্পরের সম্পর্কে প্রত্যগ্‌বৃত্ত বা সম্মুখীন হইবে। 'বাম' শব্দের মধ্যে এই দ্বৈধ (copolar) সম্মুখীকরণ সঙ্কেতটি রহিয়াছে। একতরফা (unilateral) মোড় ফেরানোতেই হয় না। বিশ্বে যেখানে যত সমর্থ সাক্ষাৎ ক্রিয়া (action of direct, immediate efficacy) হইতেছে—জড়ে, প্রাণে, মনে সর্বত্র—তার মূলে এই 'বাম'—bi-polar

অথবা co-polar co-ordination and concordance. এই নিমিত্ত, বাম = বিপরীত বটে, কিন্তু মূলে বাম = সুন্দর, সুষম, শোভন। সমর্থ=দক্ষ (পরে সূত্রিত হইয়াছে)। তার সঙ্গে 'ইণ' থাকিয়া সমর্থকে সাক্ষাৎ, কিনা, রোধবাধাদিরহিত, আকারে উপনীত করে। সুতরাং, সামান্যতঃ বুঝা গেল, কেমন করিয়া 'বাম' করে 'দক্ষিণ'। কালিকার বাম করদ্বয়ে যাহা যাহা, তারাই দক্ষিণ করের ঐ বর এবং অভয়কে 'দক্ষিণ' করে। শব্দদুটি রাহস্যিক মনে রাখিও। সর্বভূমিতেই 'ঋচ্ছতি' বামেই দক্ষিণ হইতেছে। সর্ববিধ সাধনে অদক্ষিণকে দক্ষিণ করার নিমিত্ত 'বামা'কে বিশেষভাবে সমাশ্রয় করিতে হয়। শ্রীগুরু ধ্যানে 'বামে স্বশক্তি' চাই-ই। রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী—যুগল উপাসনায় 'বামে' শ্রীরাধা অথবা গৌরী প্রসাদিতা হওয়াই চাই। কোন স্বরূপই আপন শক্তিকে 'বামা' না রাখিয়া দক্ষিণ হন না। কুণ্ডলিনীর জাগৃতি, মন্ত্রোদ্ধার-মন্ত্রচৈতন্য, ভাবাঙ্কুর উদয়, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শোধন—সবই, তলাইয়া দেখিলে, ঐ একই ব্যাপার। বামেন দাক্ষিণ্যম্। শেষ দৃষ্টান্তে, ত্বং পদার্থ পরাগ্‌বৃত্ত হইয়া অল্পজ্ঞত্বাদিমুখী হইয়া রহিয়াছে; তৎপদার্থও সর্বজ্ঞত্বাদিমুখী। কেহ কাহার সঙ্গে 'মিলে' না। দুয়েরই মুখ ফিরাইয়া লও। পরস্পর পরস্পরকে 'চিনিয়া' লউক। 'অসি' পদ এই 'বাম'টির সঙ্কেত। ভক্ত আপন ভাবে এই 'বাম'টিকে বুঝিয়া যান।

হংসরূপং পরাগ্‌বৃত্তং দক্ষিণং তদদক্ষিণম্।
সোঽহমিতি সমাবৃত্তং বামেন দক্ষিণায়তে।
হৌংস ইতি ত্বনাবৃত্তং পদং নয়তি মন্ত্রভৃৎ॥ ১৮৩

'হংস' রূপে বিশ্বভূতে যে পরাগবৃত্তিতে 'দক্ষিণায়ন' চলিতেছে, সেটি প্রকৃত 'দক্ষিণ' নয়, পরন্ত অদক্ষিণ। এটি চরাচরে যে প্রাণন ব্যাপার পরাগ্‌বৃত্তিতে চলিতেছে, তাহাই। এই পরাগ্‌বৃত্তি অথবা ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি (প্রত্যগ্‌বৃত্তি) কিরূপে সাধিত হইবে? বামেন। ফলে, হংস হইল সোঽহং। এতে অদক্ষিণ যে প্রাণন ব্যাপার, সেটি যথার্থ দক্ষিণ হইল। কিন্তু বাম দক্ষিণ দুটি পক্ষকেই এক মহাসমন্বয় এবং পরম সমতায় আনিতে না পারা পর্যন্ত 'অনাবৃত্ত' যে পদ, সেটি লাভ হয় না। সেই সমন্বয় এবং সমতাটি সাধিত হয় হৌংসঃ এই মন্ত্রে। এটি সর্বমন্ত্রের ভর্তা। মধ্যে ওঙ্কার,

উভয় দিকে হকার এবং সকার। দুইটিই শক্তি এবং মহাপ্রাণতাসূচক। তন্মধ্যে হকার=সঞ্চিত শক্তি (unlimited Reserve Power), আর, সকার=সিঞ্চিত শক্তি (Power as Manifest, as doing work, radiated, canalized etc.)। ওঙ্কার হকারকে সকারে আনিয়া মন্ত্রাদিকে ভরণ করিতেছেন। বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ— প্রণব এই বাচক।

এখন দেখ, হংসরূপে সাধারণতঃ যে ব্যাবৃত্তি (বি+আবৃত্তি) ঘটিতেছে, 'সোঽহং' এই বাম দ্বারা সেটি সমাবৃত্তি আকার লাভ করে। প্রথম স্থলে 'সঃ' এর মুখ্যতা; দ্বিতীয় স্থলে 'হং' এর। সুতরাং, যেটি পরাগ্ বৃত্ত, সেটি প্রত্যগ্‌বৃত্ত হইতেছে। Reversing the sense এর ফলে reversing the current হইতেছে। প্রথমস্থলে, শান্তে স্পর্শ করিয়াই সমস্ত কিছু ফিরিয়া যাইতেছে—centrifugality হইল dominant; দ্বিতীয়স্থলে, শান্তোজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল মধুর ভূমিতে সাক্ষাৎ যোগপ্রবণতা (centripetality) প্রবল হইয়াছে। এখানেও ভক্ত সোঽহং এবং সঃটিকে আপনভাবে বুঝিয়া যান। হোংসঃ হইল অনাবৃত্তি, অথবা অনপায় স্থিতির স্থান। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুর বিভর্তা হইয়াও স্বয়ং অব্যয়, অচ্যুত রহিবার স্থান।

হংস সাধারণ ব্যবহারে ব্যাবৃত্তির স্থল বটে, কিন্তু লক্ষ্য কর যে— 'হংসঃ' এই আকৃতিতে যে চারিটি অবয়ব—হ, ং, স্, ঃ—সেই চারিটিতেই, উপযুক্ত মাত্রাদি ছন্দঃ সহকারে সর্বসাধনী শক্তি দেওয়া আছে। সুতরাং, 'হংসঃ' স্বয়ং এক মহামন্ত্র, এবং হংসযোগ মহাযোগ। অনুস্বার এবং বিসর্গ সমর্থ মাত্রায় ব্যাহরণ হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা পরে যথাস্থানে বিশদ হইতে পারে। এখানে শুধু এইটে লক্ষ্য কর যে, 'হংসঃ' এই স্বাভাবিক অজপার মাঝেই (immanently, intrinsically) নাদবিন্দু যথাযোগ্য 'বামতা' সাধন করিয়া, যে অজপা সাধারণতঃ অদক্ষিণ, সেটিকে দক্ষিণ করিতে পারা যায়। (এই অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সবিশেষ বিবেচিত হইবে।)

১১। ঋচ্ছতের্মাতরিশ্বা॥

(ঋচ্ছতির হংসত্ব যেমন, তেমন আবার) ঋচ্ছতি হইতে মাতরিশ্বা।

প্রাণনরূপে যে মূল গতিকর্ম (Moving as Acting), সেটির হংসরূপে পরিচয় মিলিল। এইবার মাতরিশ্বারূপে পরিচয় লও। মাতরিশ্বা বায়ুর এক প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম।

বলা বাহুল্য, ইহাও এক মূল শক্তি-আকৃতি (Basic Energy Pattern)। মাতরি অথবা মাতৃ শব্দে কোন অখণ্ড আধার যোনি (Primary 'Mother' Plenum) বুঝিতে হইবে। আর, শ্বন্ দ্বারা কি বুঝিব? সারমেয়? হাঁ, তবে সারমেয় (সরমা থেকে) মানে সাধারণ কুকুর বুঝিও না। বেদে সরমা, সারমেয়— এ সবই রাহস্যিক শব্দ। ব্যঞ্জনা গম্ভীর এবং ব্যাপক। পূর্বে, 'হংস'কে তো কৈ হাঁস ভাবা হয় নাই! সরমা=উষা ইত্যাদি অনেক রকমে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু আসল কথাটা? সরমা পশ্চিমে যাইয়া হেলেনাও হইয়াছেন। সোলার মিথ্ ইত্যাদি ব্যাখ্যা তো আছেই। সারমেয়টিও সৌররূপক সহজেই হইতে পারে। তলাইয়া বুঝিলে, সারমেয় অথবা শ্বা ঋতাধ্বগতা অথবা ঋতমের সঙ্কেত। যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণে ধর্ম স্বয়ং এই রূপটি ধারণপূর্বক তাঁর অনুসরণ করিয়াছিলেন। Faithful as a dog—প্রবচন হইয়াছে। সৃ=সরণ, যা থেকে সরণি=পথ। 'সৃ' এর গুণে 'সর্'। তার সঙ্গে 'অ+মা' যোগ করিলে সরমা। অমা=শাশ্বত, নিত্য, অব্যভিচারী। সুতরাং, সরমা শব্দে নিয়ত, অব্যভিচারী যে গতি, তাহাই বুঝাইল। সারমেয়=সরমা হইতে জাত। তৎপরে, স্বন্, শ্বস্, শ্বন্—এই তিনটি আকৃতি পরীক্ষা কর। এখানে বিস্তারে যাইব না, তবে লক্ষ্য কর যে, প্রথম দুটিতে 'স' রহিয়া শব্দ-শক্তি-সামগ্রীকে ছিন্ন (দন্ত্য) এবং সিঞ্চিত করিতেছে। এই নিমিত্ত, এ দুটি, শব্দের এবং প্রাণের, বহির্বৃত্তি এবং খণ্ডবৃত্তি সূচনা করে। কিন্তু শ্বন্ এ দুয়ের অপেক্ষায় আন্তর এবং মৌলিক। 'মাতরি' এইটি মূল ও ঋতশব্দস্পন্দরূপে বিদ্যমান।

এখন, 'মাতরি' বলিতে কি বুঝিব? আকাশ, ব্যোম? হইতে বাধা নেই, কিন্তু, মূল আকৃতিতে লইতে হইবে। সেটি?—অদিতি। বেদমন্ত্রের অনুবৃত্তি করতঃ এই কারিকা ভাবনা কর—

অদিতির্দ্যৌরদিতি রন্তরীক্ষং
বসুধা সা শ্রুতিষু যা প্রসিদ্ধা।
অখিলাত্মাখণ্ড সদেকসত্ত্বঃ
কিমূ যাতীতরনিধিং দিতিত্বম্॥ ১৮৪

শ্রুতিসমূহে প্রসিদ্ধা যে অদিতি, তিনি নিজেই দ্যৌঃ, নিজেই অন্তরীক্ষ, এবং নিজেই বসুধা পৃথিবী। 'মাতরি' পদ সেই আদিম মাতাকেই জানাইতেছে। Primary Being-Power Continuum undifferentiated, non-polarised. এই নিখিল বিশ্ববৈচিত্র্যের আদিম ভাবটি ভাবনা করিতে চেষ্টা কর। কিরূপে তা করিব? আপন অনুভূতিতে এখনও অদিতিরূপাই সেটি রহিয়াছে যে! তুরীয় শুদ্ধ জ্ঞানরূপে? শুধু তাই নয়, অখণ্ডভানসামগ্রী (Fact as Whole) রূপেও। আচ্ছা, কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন—অখণ্ড সদেকসত্ব, অখিলাত্মা যিনি, তিনি, কেনই বা কিরূপেই বা ইতরনিধি (ইতর বা অন্যের বীজ—seed or container of otherness, heterogenity—) যে দিতিরূপ, সেটি ধরিলেন? Undifferentiated Continuum এ differentiation, non-polar evenness এ polar unevenness, উদ্ভব তো হইয়াছে, কিন্তু কেন, কিরূপে? এর উত্তর কি আছে? তাই 'কিমু'। কিন্তু দিতিরূপা হইয়াও অদিতি স্বয়ং ন-স্যাৎ হন না, হনও নাই। অখিল মাতা আপন সত্যং এবং ঋতমে স্থিতাই আছেন। অসত্য, অনৃতের মামলা দিতিতে আসিয়াই। আকাশরূপে, প্রাণরূপে, নাদ ইত্যাদি রূপে অদিতি মাতা সকল অসত্য, অনৃতের মাঝেও আপনাকে স্থিতাই রাখিয়াছেন। সেই নানাদিকে সন্ধান করিয়াই অসত্য, অনৃত থেকে সত্যে এবং ঋতে যাইতে হইবে। যে নিখিল বিরূপ স্পন্দরাশি স্বন্ এবং শ্বস্ আকারে চলিতেছে, তাদের মাতরিশ্বাতে লইতে হইবে।

স্বাহামন্ত্রেণ চোর্দ্ধস্থং মধ্যস্থং সূচ্যতে স্বধা।
বষট্ তথাহি বৌষট্ চ মনূ সূচয়তস্ত্বধঃ॥
অদিতৌ মাতরিশ্বা যো ভবিতা বুদিমূলতঃ
আদিত্যোঽপি ন দৈত্যস্ত্বং রোদী র্মেতি মরুদ্‌গণঃ॥ ১৮৫-১৮৬

অদিতির যে 'দৌঃ' আকৃতিরূপ ঔর্দ্ধভাব, সেটি 'স্বাহা' এই মন্ত্রের দ্বারা গৃহীত হইল; অন্তরীক্ষরূপ মধ্যমভাব 'স্বধা' মন্ত্রে; অধোভাব বষট্ এবং বৌষট্ এই দুটি মন্ত্রে। এই ঊর্দ্ধাদি তিন ভাবকে উচ্চনীচাদি অর্থে লইও না। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে রহেন বলিয়া নীচ বা নিম্ন নন। কেবল শক্তিসংস্থানে (in dynamic set-up of any kind), 'উর্দ্ধ' ইত্যাদি শব্দে পরাবরত্বের (উৎকর্ষ অপকর্ষের) কোন অবকাশ নেই বুঝিতে হইবে। যেমন, পৃথিবী এবং মেঘে তাড়িত শক্তি বিন্যাসে। স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি রহস্য শব্দগুলি পরে সূত্রিত এবং বিবেচিত হইয়াছে। এখানে, কেবল স্বাহা, স্বধা, বষট্ এই তিনটি ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতঃ তিনের প্রাণিক আকৃতি (Energy diagram) লক্ষ্য কর। আপন শরীর যন্ত্রটাকে অধঃ, মধ্য, উর্দ্ধ (যথা, মেরুদণ্ডের মূল, নাভি এবং কণ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ) তিন ভাগ করিয়া, ঐ তিন শব্দের ক্রিয়াভিঘাত (functional impact) লক্ষ্য কর।

এইবার, অদিতিতে যে মাতরিশ্বা (Primordial, Fundamental Creative Pulsation), সেটি আপনাকে 'রুদি' মূল আকৃতিতে বিবর্তিত করিবে। রুদ=রোদন। কিন্তু তলাইয়া লও। রু=শব্দ করা। বিসর্জন ক্রিয়ার সংজ্ঞা এই 'রু' দ্বারা শক্তিক্ষেপ ওষ্ঠসহায়ে পাইয়া থাকি। ওষ্ঠ=valve principle, যেটি কোনও 'মুখীন' নেই, তাকে কোনও মুখীনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করা। সুতরাং, রু=Basic Radiation। দি=ঐ radiation canalized and projected হইতেছে। এবং সেটি 'কোথাও' 'আহত' হইতেছে। পরে 'অনাহত' সূত্রে এটি সবিশেষ বলা হইতেছে। এখানে লক্ষ্য কর যে, এটি—কোনও 'মুখে' শক্তিনিক্ষেপ, এবং কোথাও সেটির আঘাত, সৃষ্টির এক মৌলিক ব্যাপার। Impulsion, Sense, Impact—এই ত্রয়ী। প্রণবের আদিবর্ণ অকার প্রথমটির, উকার দ্বিতীয়টির, এবং অন্তিম স্পর্শবর্ণ মকার শেষেরটির সূচক। কিন্তু আঘাত এবং আহত রূপটি থাকিলে কেবলি ব্যাবৃত্ত হইতে হয়। গতি 'রোধ' প্রাপ্ত হইয়া যেন 'রোদন' করে। বস্তুতঃ, বিশ্বে যাবতীয় ক্লেশের মূল এই 'রুদি'. Pain is impeded movement—কথাটা ঠিক। রুদ্ থেকে রুদ্র ইত্যাদি। 'রুদ্র' যেটি রুদের দকারলক্ষিত আহত বা রুদ্ধ রূপটিকে চূর্ণ করিতে সমর্থ (রকার)। রোধ-নিরোধ আকৃতির কাষ্ঠা হইল রুদ্+র। রুদ্ এবং রুধ্ এ দুয়ের মাঝে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে—দকার এবং ধকারে। পরে সেটি দেখা যাইবে।

অদিতি থেকে 'রুদি' রূপটি না আসিলে তো এই বিশ্বব্যবহারের উপপত্তি হয় না। একটা মূল strain and constraint কোনরূপে আসা চাই। সেইটি হইল মাতরিশ্বার 'মরুৎ' রূপ। এ মরুৎ একা থাকে না, তাই মরুদ্গণ। এটি জাত হইয়া যেন 'রোদন' করিল। কেননা, ইটি আঘাতভাক্ হইবে। কিন্তু অদিতিমাতা এটিকে যেন

সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—'তুমি আমার আত্মজ, আদিত্যই; তুমি দৈত্য নও; সুতরাং রোদন করিও না (মা রোদীঃ)।' তবু মরুৎ কাঁদিয়া বলিল—'ঘাতপ্রতিঘাতে ফেলিয়া তুমি আমায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছ যে! তোমার যে 'পরায়ণ' এবং 'অনাহত' স্বরূপ মাতৃত্ব, তাতেই আমাকে মিলাইয়া লও, মিলাইয়া রাখ।' বিশ্বে যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাতের আন্তরভূমিতে এই অনির্বাণ আকুতি।

১২। আকাশঃ পরায়ণঃ ॥

আকাশ হইল পর, কিংবা আধার এবং অবসান ভূমিরূপ, অয়ন (গতি এবং লক্ষ্য)।

মরুদ্‌গণ রোধপ্রতিযোগী হইয়াও 'দৈবতম্'। বিশ্বব্যবহারে রোধ (Resistance Factor), সর্ববিধ গতিকে বাধা দিতেছে এই পঞ্চ আকৃতিতে—রুদ্, রুধ্, রুজ্ রুচ্, রুষ্। এদের সবিশেষ কথা পরের সূত্রে (অনাহত) হইতেছে। প্রথমটিতে রোধের সম্ভাবনা এবং প্রবণতা (probability and tendency); এটি অব্যক্তভাব। দ্বিতীয়ে, রোধ স্পষ্ট, ব্যক্ত। (এস্থলে অবরোধাদি চতুর্বিধ রোধের কথা আবার চিন্তা কর।) তৃতীয় রোধের ফলে কার্যকরী শক্তি জিহ্মগা হইয়া যে রোধব্যূহ (যথা, অবচেতনায় complex due to fixation) তৈয়ারি করে। ঐ বদ্ধমূল রোধ সংস্কারকে রুজ (রোগ) বলা হইল। তার পর, রুচ্ এবং রুষ্—এ দুটি পূর্বোক্ত তিনের দ্বারা বাধ্য (compelled) যে রাগ ও দ্বেষ। পরের সূত্রে আরও দুচার কথা বলা হইতেছে। এ পঞ্চধা রোধবশতঃ বিশ্ব ব্যবহারে মূল ঋতান্বয়ের, ঋতাধ্বগতার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। 'রু' শব্দে যে Valve Principle (ওষ্ঠ্য বৃত্তি)-এর ইঙ্গিত আছে, তাতে ইহাই সূচিত হয় যে—মূল থেকে যে ঋতমের ধারা নিঃসৃত, যেটি এক রহস্য সন্ধিতে আসিয়া তবে রোধপঞ্চকের কুক্ষিতে পতিত হইতেছে। যেন দুই দিকে দুই মুখ—একটা মুখ 'দৈবী'র দিকে, সেটি ছন্দোবিশাল, জ্যোতির্বিশাল; অপরটি 'আসুরী' মুখে—রোধবহুল বাধসঙ্কুল। Harmony and Disharmony—এই দুটি মুখে সমস্ত কিছু চালিত করার নিমিত্ত বিশ্বের কারবারি বন্দোবস্তে কোথাও এক 'সুইচ্‌বোর্ড' আছে। 'মরুৎ' এই সন্ধিতে অবস্থান করিয়া সব কিছুর গতিকে দৈবী প্রেরণা পাবার সুযোগটি দেন। As inspirer and guide of higher functioning ইনি গতিসন্ধিস্থলে

kind), ‘ঊর্দ্ধ’ ইত্যাদি শব্দে পরাবরত্বের (উৎকর্ষ অপকর্ষের) কোন অবকাশ নেই বুঝিতে হইবে। যেমন, পৃথিবী এবং মেঘে তাড়িত শক্তি বিন্যাসে। স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি রহস্য শব্দগুলি পরে সূত্রিত এবং বিবেচিত হইয়াছে। এখানে, কেবল স্বাহা, স্বধা, বষট্ এই তিনটি ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতঃ তিনের প্রাণিক আকৃতি (Energy diagram) লক্ষ্য কর। আপন শরীর যন্ত্রটাকে অধঃ, মধ্য, ঊর্দ্ধ (যথা, মেরুদণ্ডের মূল, নাভি এবং কণ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ) তিন ভাগ করিয়া, ঐ তিন শব্দের ক্রিয়াভিঘাত (functional impact) লক্ষ্য কর।

এইবার, অদিতিতে যে মাতরিশ্বা (Primordial, Fundamental Creative Pulsation), সেটি আপনাকে ‘রুদি’ মূল আকৃতিতে বিবর্তিত করিবে। রুদ=রোদন। কিন্তু তলাইয়া লও। রু=শব্দ করা। বিসর্জন ক্রিয়ার সংজ্ঞা এই ‘রু’ দ্বারা শক্তিক্ষেপ ওষ্ঠসহায়ে পাইয়া থাকি। ওষ্ঠ=valve principle, যেটি কোনও ‘মুখীন’ নেই, তাকে কোনও মুখীনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করা। সুতরাং, রু=Basic Radiation। দি=ঐ radiation canalized and projected হইতেছে। এবং সেটি ‘কোথাও’ ‘আহত’ হইতেছে। পরে ‘অনাহত’ সূত্রে এটি সবিশেষ বলা হইতেছে। এখানে লক্ষ্য কর যে, এটি—কোনও ‘মুখে’ শক্তিনিক্ষেপ, এবং কোথাও সেটির আঘাত, সৃষ্টির এক মৌলিক ব্যাপার। Impulsion, Sense, Impact—এই ত্রয়ী। প্রণবের আদিবর্ণ অকার প্রথমটির, উকার দ্বিতীয়টির, এবং অন্তিম স্পর্শবর্ণ মকার শেষেরটির সূচক। কিন্তু আঘাত এবং আহত রূপটি থাকিলে কেবলি ব্যাবৃত্ত হইতে হয়। গতি ‘রোধ’ প্রাপ্ত হইয়া যেন ‘রোদন’ করে। বস্তুতঃ, বিশ্বে যাবতীয় ক্লেশের মূল এই ‘রুদি’. Pain is impeded movement—কথাটা ঠিক। রুদ্ থেকে রুদ্র ইত্যাদি। ‘রুদ্র’ যেটি রুদের দকারলক্ষিত আহত বা রুদ্ধ রূপটিকে চূর্ণ করিতে সমর্থ (রকার)। রোধ-নিরোধ আকৃতির কাষ্ঠা হইল রুদ্+র। রুদ্ এবং রুধ্ এ দুয়ের মাঝে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে—দকার এবং ধকারে। পরে সেটি দেখা যাইবে।

অদিতি থেকে ‘রুদি’ রূপটি না আসিলে তো এই বিশ্বব্যবহারের উপপত্তি হয় না। একটা মূল strain and constraint কোনরূপে আসা চাই। সেইটি হইল মাতরিশ্বার ‘মরুৎ’ রূপ। এ মরুৎ একা থাকে না, তাই মরুদ্‌গণ। এটি জাত হইয়া যেন ‘রোদন’ করিল। কেননা, ইটি আঘাতভাক্ হইবে। কিন্তু অদিতিমাতা এটিকে যেন

সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—'তুমি আমার আত্মজ, আদিত্যই; তুমি দৈত্য নও; সুতরাং রোদন করিও না (মা রোদীঃ)।' তবু মরুৎ কাঁদিয়া বলিল—'ঘাতপ্রতিঘাতে ফেলিয়া তুমি আমায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছ যে! তোমার যে 'পরায়ণ' এবং 'অনাহত' স্বরূপ মাতৃত্ব, তাতেই আমাকে মিলাইয়া লও, মিলাইয়া রাখ।' বিশ্বে যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাতের আন্তরভূমিতে এই অনির্বাণ আকুতি।

১২। আকাশঃ পরায়ণঃ ॥

আকাশ হইল পর, কিংবা আধার এবং অবসান ভূমিরূপ, অয়ন (গতি এবং লক্ষ্য)।

মরুদ্‌গণ রোধপ্রতিযোগী হইয়াও 'দৈবতম্'। বিশ্বব্যবহারে রোধ (Resistance Factor), সর্ববিধ গতিকে বাধা দিতেছে এই পঞ্চ আকৃতিতে—রুদ্, রুধ্, রুজ্ রুচ্, রুষ্। এদের সবিশেষ কথা পরের সূত্রে (অনাহত) হইতেছে। প্রথমটিতে রোধের সম্ভাবনা এবং প্রবণতা (probability and tendency); এটি অব্যক্তভাব। দ্বিতীয়ে, রোধ স্পষ্ট, ব্যক্ত। (এস্থলে অবরোধাদি চতুর্বিধ রোধের কথা আবার চিন্তা কর।) তৃতীয় রোধের ফলে কার্যকরী শক্তি জিহ্মগা হইয়া যে রোধব্যূহ (যথা, অবচেতনায় complex due to fixation) তৈয়ারি করে। ঐ বদ্ধমূল রোধ সংস্কারকে রুজ (রোগ) বলা হইল। তার পর, রুচ্ এবং রুষ্—এ দুটি পূর্বোক্ত তিনের দ্বারা বাধ্য (compelled) যে রাগ ও দ্বেষ। পরের সূত্রে আরও দুচার কথা বলা হইতেছে। এ পঞ্চধা রোধবশতঃ বিশ্ব ব্যবহারে মূল ঋতান্বয়ের, ঋতাধ্বগতার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। 'রু' শব্দে যে Valve Principle (ওষ্ঠ্য বৃত্তি)-এর ইঙ্গিত আছে, তাতে ইহাই সূচিত হয় যে—মূল থেকে যে ঋতমের ধারা নিঃসৃত, যেটি এক রহস্য সন্ধিতে আসিয়া তবে রোধপঞ্চকের কুক্ষিতে পতিত হইতেছে। যেন দুই দিকে দুই মুখ—একটা মুখ 'দৈবী'র দিকে, সেটি ছন্দোবিশাল, জ্যোতির্বিশাল; অপরটি 'আসুরী' মুখে—রোধবহুল বাধসঙ্কুল। Harmony and Disharmony—এই দুটি মুখে সমস্ত কিছু চালিত করার নিমিত্ত বিশ্বের কারবারি বন্দোবস্তে কোথাও এক 'সুইচ্‌বোর্ড' আছে। 'মরুৎ' এই সন্ধিতে অবস্থান করিয়া সব কিছুর গতিকে দৈবী প্রেরণা পাবার সুযোগটি দেন। As inspirer and guide of higher functioning ইনি গতিসন্ধিস্থলে

রহিয়াছেন। সকল গতিবর্গের 'মেরু'তে দৈবী অধ্যক্ষতার প্রতিভূ। বিশেষ বিশেষ স্থলে—রুদে মাতরিশ্বা, রুধে ইন্দ্র, রুজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুচে সোম, রুষে অগ্নি বা রুদ্র।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—রোধসমূহের চরম অবসানভূমি কোথায় এবং কি সেটি? রোধপঞ্চকের নিরসনী ক্রিয়া (resolving the resistance factor) চলিতেছে; দৈবীপ্রেরণা এবং চালনা ব্যতীত সেটি অব্যাহত ভাবে শেষ পর্যন্ত চলেও না। 'প্রচোদয়াৎ' মন্ত্রে সেই দৈবী পরমাশক্তির সঙ্গে আপন আপন 'যন্ত্র' (বুদ্ধ্যাদি) সংযুক্ত করিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু কোথায় যাইয়া অবসান? সেটি আকাশ। সেটি 'আ', কিনা, ব্যাপ্তিকে এবং কাষ্ঠায়, সব কিছুকে 'কাশ' (অবকাশ এবং প্রকাশ) দেবার ভূমি। এই আকাশ (ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ), 'জ্যায়ান্', 'গতি', এবং 'পরায়ণ'।

আকাশ যে 'ফাঁকা' (void) নয়, Space নয়, Ether ইত্যাদিও নয়, তা আমরা আগেই দেখিয়াছি। শ্রুতির ঐ আকাশ ('আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ইত্যাদি প্রসঙ্গে) ব্রহ্ম বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আবার, আকাশ 'সম্ভূত' হইলেন, এমনও আছে। আকাশ 'ঈক্ষণ' করিলেন, ইহাও বটে। এ সকলের সমন্বয় রক্ষা করিয়া আকাশকে এইভাবে ভাবনা কর—জগদ্‌দৃষ্টি হইল গতির দৃষ্টি। বাহ্যে পদার্থনিচয় অনেকস্থলে স্থিতিরূপটি দেখায় বটে, কিন্তু সেটা আভাসিক (apparent), এবং আপেক্ষিক (relative), যেমন, ঐ প্রস্তরখণ্ড। আর, প্রতীতি (as perception etc.) রূপে সমস্ত কিছুই নিয়ত পরিণামিনী ধারারূপে আসে, যায়। Stream of Consciousness: you can never bathe twice in the same stream.

আচ্ছা, গতি বা ঋচ্ছতিকে বিশ্লেষ করিয়া এই তিনটি পাই—ক্রম বা ক্রমিকতা; ছন্দঃ বা ছন্দোগতা; উদয় ও বিলয় বা আবৃত্ততা। গতিকে এই তিনরূপেই পাইতেছি বটে, কিন্তু রোধপঞ্চকমুক্ত শুদ্ধ আকারে প্রতীতি এবং ব্যবহারে পাইতেছি না। সুতরাং, অস্মদাদির প্রতীতি ও ব্যবহারে গতি বা ঋচ্ছতি যথার্থ-'ঋতম্' রূপে ফুটিয়া নেই। ক্রম, ছন্দঃ এবং আরম্ভ-অবসান—এ তিন দিক্ দিয়াই অনৃত দ্বারা ঋতস্য মুখং অপিহিত হইতেছে। বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানে সেই অপিধান-নিরাকরণ প্রয়াস। জপাদি সাধন সেই একই উদ্দেশ্যে। ক্রমশুদ্ধি, ছন্দঃশুদ্ধি এবং আরম্ভ-অবসান শুদ্ধি—এ ত্রিবিধ শুদ্ধির সাধনই সাধন. পূর্বে যে অস্তি-ভাতি-ঋচ্ছতি-প্রীণাতি—এই চারিটি ভাবের

বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐ ঋচ্ছতিকে ধরিয়াই 'রোধ' নানারূপে কুণ্ঠিতাদিভাব আনয়ন করে, এবং সেই ঋচ্ছতিকে ধরিয়াই আবার রোধকে 'শোধ' করিতে হয়। রোধকে যদি বল Resistance Factor = R, তবে, প্রশ্ন ওঠে—আচ্ছা, এমন কি কোন ভূমি নেই, যেখানে রোধ (R) কমিতে কমিতে একেবারে নাস্তি (R = 0) হইয়া যায়? সেই ভূমিই হইল অস্তি-ভাতি-ঋচ্ছতি-প্রীণাতির অব্যাহত যে অবকাশ এবং প্রকাশ, তার ভূমি। ইহাই আকাশ। 'এষ আনন্দঃ' ইত্যাদি। লক্ষ্য কর যে, ঋচ্ছতি = ০, এ সমীকরণটি আকাশে করা হইল না। করিলে, আকাশ=নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু প্রাণব্রহ্ম এবং ঋতমের রোধরহিত ভূমিরূপেও আকাশ থাকিতে পারে।

কো জ্যায়ানস্তি সর্ব্বেষাং কা গতিঃ কিং পরায়ণম্।
ইতি কাষ্ঠানুসন্ধানমাকাশং নয়তি ধ্রুবম্॥ ১৮৭

ব্যবহারে ক্রম (series) মাত্রেই এক অবম (minimum) এবং এক চরম (maximum) কাষ্ঠায় উদ্দেশ করে দেখি; কিন্তু কোন্ ভূমিতে ক্রম যাইয়া বলিবে—এই দেখ আমি জ্যায়ান্। গতি বলিতে ছন্দঃ, বিশেষ করিয়া, গতির রূপ (sense) এবং মুখ (direction)। এটি তার 'আদর্শ' (ঋতম্) মিলাইবে কোন্ ভূমিতে? Sense and direction তো বদ্‌লাইয়া চলিতেছে, কিন্তু কোথায় যাইয়া তারা বলিবে—এইবার দেখে নাও ঠিক-ঠিক। পরায়ণ বলিত আরম্ভ ও অবসান, উদয় ও বিলয়—দুইই লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু 'অয়ন'টি (যথা, উত্তরায়ণাদি) কোন্ ভূমিতে তার 'পর' (পরোবরীয়ান্ ক্রমে যেখানে পরত্বের ও বরত্বের বিশ্রাম) ভাবটি দেখাইবে? কোথায় যাইয়া 'অয়ন' বলিবে—এখানে ওখানে যাইয়া আপেক্ষিক এবং আভাসিক আরম্ভ অবসান পাইতে হইবে কেন, এই ভূমিতে দেখ মূলতঃ এবং বস্তুতঃ সমস্ত গতির আরম্ভ এবং অবসান হইতেছে!

আকাশকে যদি এইভাবে অন্বেষণ কর এবং ভাবনা কর, তা হইলে, এ আকাশ নাদরূপে, বিন্দুরূপে এবং নিখিলকলনী শক্তি বা কলারূপে ত্রিধা অভিব্যক্ত দেখিবে। বিন্দুতেও পরমাকাশ। বিন্দুর লক্ষণটি আবার চিন্তা কর—'তত্র শূন্যত্বপূর্ণত্বে একত্র', ইত্যাদি। ঋচ্ছতি সর্ববিধ রোধরহিত যে ভূমিতে, সুতরাং সমস্তকিছুর আদি আরম্ভ

এবং অন্তিম অবসান সেখানে, সেটিকে যদি 'আকাশ' সংজ্ঞা দাও, তবে এ আকাশ Physical Space তো নয়ই (যেটিকে Einstein প্রভৃতি নিরূপিত করিয়াছেন); অপর কোনও বাহ্য বা আন্তর কাঠামোতে পূরিতে গেলে, সে আকাশ মিলিবে না। তবে ঐ খাঁটি সংজ্ঞাটিকে প্রয়োজন মত সাধনাদি অথবা বিজ্ঞানাদি ব্যবহারে আনার গরজে 'উপাধি' (condition; উপহিত = subject to condition) যুক্ত করা যায়। করা হইয়াও থাকে, যথা, ব্যোমাকাশ, দহরাকাশ, ইত্যাদি।

আরও লক্ষ্য কর যে, আকাশ ভূমিতে না পৌছান পর্যন্ত ঋচ্ছতি ঠিক ধ্রুব হয় না। বিশ্বব্যবহারে কর্ম এবং নিয়তি যেরূপ, সেইরূপ ধ্রুব এবং অধ্রুব (constant and variable) পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা রাখিয়াই চলিতেছে। এই জন্য, Nature is a mixture of Law and chance. এই প্রতিযোগিতার ঊর্দ্ধে যাইতে হইলে আকাশ সমাশ্রয় হওয়া চাই। জপাদি সাধনে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে আকাশতত্ত্বে উন্নয়নের ধারাটিও আবার স্মরণ কর। 'হংসঃ' এই মূল প্রাণনবীজ বিসর্গসমেত 'স'কারকে 'হং' এই নাদবিন্দুকলার যুক্তত্রিবেণীতে মিলাইলে, থাকে 'হং' এই আকাশবীজ। বিসর্গসমতে সকার মেলান মানে কি? স = সিঞ্চিত-শক্তি = radiated energy. 'স'এর পর বিসর্গ সূচনা করে এই শক্তির বহিঃ-প্রক্ষেপ। মুখ উল্টাইয়া 'স'কারকে 'হং'কারে বিসর্জন করিয়া রোধরহিত, শান্ত হও। সোঽহম্। 'হং'কারকে অহংকার হইতে দিও না। 'অহং'—একদিকে স্বরব্যঞ্জনমাতৃকারূপ বটে, অন্যভাবে এটি=অ+হংকার-হংকারের অভাব অথবা অন্যথা প্রতীতি। যেটি স্বরূপে রোধরহিত এবং শান্ত, সেটিকে রোধরুদ্ধ (পূর্বোক্ত পঞ্চধা) ভাবে লওয়াই হইল অহঙ্কার।

১৩। আকাশো হ্যনাহতঃ।।

আকাশই (স্বরূপতঃ) অনাহত।

বিশ্বে সর্বত্র (অণু কি মহানে) আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী দুইটি বৃত্তি নিরন্তর চলিতেছে। পরে প্রাণপ্রসঙ্গে এ বৃত্তি সবিশেষ আলোচিত হইবে। 'হংসঃ' এই শাব্দিক আকৃতিতে এই বৃত্তিদ্বয় সক্রিয় এবং ব্যক্ত। বেদ যেমন ব্রহ্মের 'নিঃশ্বসিত', বিসর্গও তদ্রূপ। 'হংসঃ' আকৃতিতে 'সঃ' এই ভাগ দ্বারা বিসর্গ বা প্রক্ষেপ মুখ্যতঃ, এবং 'হং' এই ভাগদ্বারা সংগ্রহ বা সঞ্চয় সূচিত হয়। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ'—বিশ্বে

শক্তিসঞ্চয় এবং শক্তিব্যয়ের সমতা লক্ষিত হইতেছে না। ব্যয়েরই বাহুল্য। ফলে, জগৎ ক্ষয়িষ্ণু, ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে—universal running down. ক্ষয়ের স্থলে ক্ষেম হইতে গেলে কি চাই? 'সঃ'-এর আহুতি 'হং'-এ। 'হং' উর্জিত, 'সঃ' তাতেই বিসৃষ্ট। সকারের এইভাবে হকারে সবনে 'ওম্'কারকে স্রুব স্থানীয় কর। ফলে, সোম, সোঽহং, হোম—এই তিন আকৃতিতে, হং থেকে ব্যাবৃত্ত এবং নিরন্তর প্রক্ষিপ্ত ও 'আহত' যে 'সঃ', সেটির সমাবৃত্তি ঘটিল, এবং যেটি সদা প্রক্ষিপ্ত এবং আহত, সেটি শান্ত এবং অনাহতভূমি লাভ করিল। 'অহং' আর 'সঃ' এই দুটির দ্বন্দ্বস্থ হইয়া আমাদের প্রতীতি (Experience)। এ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি এক বিরাট্ 'অনাত্ম' (Colossal Not-Self) আকারে আমার 'অহং'টিকে 'হং'রূপের অভাব আকারেই দেখাইতেছে; বাহিরের কাছে তাকে 'এতটুকু', বাহিরের সামিল এবং তার বাধ্য করিয়াই দেখাইতেছে। তাই বিশ্ব যেন এক অন্তহীন বন্ধন, এক মহাভয়। কিন্তু, আসলে কি? আত্মৈবেদং সর্ব্বম্। সমগ্র বিশ্বছবিটাই প্রক্ষেপ —porjection. কোথায়, কোন্ আধারে? হং বা আকাশরূপ যে পরায়ণ, তাতেই সন্দেহ নেই; কিন্তু কতকগুলি অন্তরীক্ষ পরম্পরা (media) বা ব্যবধান মাঝে রাখিয়া; সুতরাং, সাক্ষাৎ অব্যবধানে নয়। বর্ণমালায় যেমন, তেমনি 'স' এবং 'হ' (হসৌ) পাশাপাশিই আছে বটে, কিন্তু 'অদক্ষিণ' হইয়া পরস্পরের সম্পর্কে 'পরাক্' হইয়া। যথা, কোন বৃত্তের পরিধিতে পাশাপাশি দুটি বিন্দু। 'খ' বিন্দু যদি সারা পরিধি ঘুরিয়া 'ক' এর মুখোমুখি হইতে চায় তো, সে তো অনেক কথা। পরিধিটিও তো সহজ ও সুষম নয়। ব্যবধান পরম্পরা নিমিত্ত রোধপরম্পরা। রোধকে পঞ্চ আকারে পূর্ব সূত্রে দেখা হইয়াছে। 'সঃ'কে 'হং'এ সবন বা হবন মানে—'বামেন দাক্ষিণ্যম্'। কার্যতঃ এক সীমাহীন পরিধি—অন্তহীন চড়াই-উতরাই—পরিক্রমা করিয়া তবে 'হং'-তে আসিতেই হইবে, এমন ভাবিতেছ কেন? উলট্ যাও—দেখ পরায়ণ যে আকাশ, সেটি তোমার অনন্ত আক্ষেপ-প্রক্ষেপ, ঘাত-প্রতিঘাতের শাশ্বত শান্ত অনাহত ভূমিরূপে তোমার আধার আছেনই। নাদানুসন্ধানাদি সবই তো এই অপরোক্ষ অনুভূতিটি মিলাইবার জন্য। 'সঃ' এই আকৃতিতে সবন বা আহুতির সাক্ষাদ্‌রূপটি আনার নিমিত্ত, প্রণবের মধ্যমবর্ণ 'উ'কারকে আনিয়া বিসর্গস্থলে বসাও। হইল 'সু' (=শোভন, সুষম; আবার, 'সু' ধাতু)। এইবার, এতে যোগ কর আহুতির যে স্বাভাবিক আকৃতি, সেইটি=আহা।

হইল, স্বাহা। পরে স্বাহাসূত্রে সবিশেষ বিবেচিত হইবে। হত, আহত, হতাহত—এই সব থেকে অনাহত ভূমিতে তুলিবার জন্য সমস্ত কিছু কায়িক, বাচিক, মানসিক সাধনেই (এবং বিজ্ঞান-ব্যবহারেও) পূর্বোক্ত ঐ 'হংসঃ' হবনটি 'বামেন' সাধন করিতে হয়। 'বামেন' মানে reversing the sense and direction, মনে থাকে যেন। কায়ে মহামুদ্রা, যোনিমুদ্রাদি সহকৃত প্রাণায়ামে; বাচি যথাযথ তারচক্রাদি ব্যাহরণে; মানসে অনাসক্তি এবং অস্পর্শ ইত্যাদি সাধন দ্বারা, ঐ বামেন হংসহবনটি সাধিত করিতে হয়।

হতং কিঞ্চিদ্ জগদ্‌বৃত্ত মাহতং বা হতাহতম্।
অস্তি হ্যনাহতং কিঞ্চিত্তন্যেবাকাশতা মতা।
সম্যক্তয়াবরোধাদিরোধানাং রোধনং স্বয়ম্॥ ১৮৮

জগতে সমস্ত কিছু বৃত্তিই হত (functionally arrested and stopped) হইতেছে; অথবা, আহত হইতেছে। এই আহতরূপটিকে আবার চারি আকারে পাই —(১) কোন কিছু গতিবর্ত্মে আসিয়া তাকে বাধা দিতে চায়, কিন্তু তার প্রভাব (influence) এখনও স্পষ্টতঃ ও কার্যতঃ বাধা ঘটায় নাই। যেমন, কোনও প্রতিকূল গ্রহের পরোক্ষ দৃষ্টি বা ছায়াপাত মাত্র; কোনও রোগবীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার গোড়ায় প্রচ্ছন্নভাব (incubation etc.)। (২) রোধনিমিত্ত কোন নির্দিষ্ট গতি (অধ্যাত্মসাধন অথবা বহির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) ব্যক্ত এবং প্রকটরূপেই মন্দীভূত (weakened) হইতেছে। এইটি হইল 'slowing down'. প্রথম স্থলে যেটি অপ্রকট বাধামাত্র ছিল, এস্থলে সেটি স্পষ্টতঃ অন্তরায়রূপে দেখা দিয়াছে। এইরূপ ঘটিলে সেটি সম্যক্ বিশ্লেষণযোগ্য (definitely analysable and analytically treatable) হয়। (৩) দ্বিতীয়স্থলে, ধর, গতিবেগের (momentum- এর) মন্দীভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও গতির রূপ ও মুখ (sense and direction) বদল হয় নাই; কিন্তু, ধর, এইবার গতির মুখটি বদ্‌লাইল (diverted)। (৪) কেবল মুখ নয়, রূপ বা আকৃতিটিও বদ্‌লাইল (perverted)। এই চারি প্রকারের আহত রূপের নিমিত্ত 'রোধক'টিকে চারিটি নামে অভিহিত করিতে পারে:—প্রতিবন্ধক, অন্তরায়, পরিপন্থী,

বিরোধী। প্রাকৃত প্রাণনে যে হংসঃ, তাতে এই চতুর্বিধ আহত' ভাব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানে এবং অধ্যাত্মযোগে হংসঃ এরূপ ভাবে বৃত্তিমান্ (সঞ্চরণ বিজ্ঞানে রেডিয়াম্) হওয়া চাই যাতে ঐ চারিটি আঘাতস্থান কাটাইয়া অনাহতভূমিতে আসা যায়।

রেডিও জাতীয় পদার্থ এর দৃষ্টান্ত। ঐ জাতীয় পদার্থে 'সঃ' আকৃতিতে নিরন্তর তেজোবিকিরণ ঘটিতেছে। সে বিকিরণ আল্‌ফা, বিটা, গামা, রেজ্ ইত্যাদি নামে পরিচিত, এবং তারা হত, আহত হইতেছে। কিন্তু পদার্থের কেন্দ্রীণ সত্তায় তেজের অপর এক ভূমি বিদ্যমান, যেটি ওদের তুলনায় অনাহত—বাহ্য তাপচাপাদির 'আঘাতে' সেটি অভেদ্য অথবা দুর্ভেদ্য। বর্তমানে উপায়বিশেষে ('fission') কেন্দ্রীণ সত্তাটিও আহত হইয়া প্রভূত শক্তি প্রক্ষেপ করিতেছে; অর্থাৎ, কেন্দ্রীণ 'হং' নিজের হরণ হইতে দিয়া 'সঃ'এর সমধিক পূরণ ঘটাইতেছে। ফলে আণবিক বোমা। কিন্তু, জড়াণুতে সত্যকার ধ্রুব অনাহতস্থান কোথায় মিলিবে—এ প্রশ্ন উঠিতেছে। বৃক্ষলতাদির হরিৎপত্রে ক্লোরোফিল্ সূর্যকিরণে হংসঃরূপ প্রাণনযাগটি সম্পাদন করে। 'সঃ'রূপে কিছু বিসর্জন করে, হংরূপে কিছু গ্রহণ করে। কিন্তু এখানেও সেই এক প্রশ্ন—প্রাণের দুয়ার দিয়া চলিয়াই বা ধ্রুব অনাহত স্থানটি কোথায় মিলিবে? সে কোন্ প্রাণ যেটি অসুরাদি দ্বারা 'বিন্ধ' হবার নয়? চেতনার দিক্ দিয়াও সন্ধান লাগাও। এসব প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ; এদের অনুসরণ ক্রমশঃ হইতেছে। এখানে এটি লক্ষ্য কর যে—আহত ভূমিপরম্পরা থেকে অনাহতভূমির পানে 'পরোবরীয়ান্' ভাবে অগ্রসর হওয়াই হইল বিজ্ঞানের অনুসন্ধান এবং প্রজ্ঞানের অনুধাবন। এই continual destruction- এর মাঝে একটা নিরাপত্তা এবং বিশ্রান্তির ভূমি কোথায় মিলিবে? বাহিরেও এই খোঁজ চলিতেছে, ভিতরেও তাই। শেষ গন্তব্য—গতি এবং পরায়ণ হইল সকলের চাইতে জ্যেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ যে আকাশ, তাই। আকাশ সেই পরাকাষ্ঠা যেখানে রোধ (R) হ্রাস হইতে হইতে শূন্যে আসিয়া পৌঁছে।

হতাহত বলিয়া আর এক আকৃতিও আছে। এটি হইল—ব্যক্ত বা প্রকট ভূমিতে 'হত' (arrested, stopped) হইয়াও যেটি অপ্রকটভূমিতে সংস্কারাদি আকারে 'আহত' ভাবগুলি প্রাপ্ত হয়। আমাদের মগ্নচেতনায় এই হতাহতের দৃষ্টান্ত সর্বদাই মিলিতেছে। সাধনে এদের সঙ্গেই বিশেষ করিয়া বোঝাপড়া করিতে হয়। জপাদি

ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে অপ্ ইত্যাদি তত্ত্বে উন্নীত হইতে থাকিলে, ক্রমে অনাহতভূমির দিকেই অগ্রসর হওয়া হয়। যেমন ধর, নিত্য জপধ্যানাদি শেষ করিয়া উঠিলে। অপ্‌তত্ত্বে গতি হইলে জপাদি সমাপনের পরও কথঞ্চিৎ অপ্রকটভূমিতে তার ধারা অবিচ্ছেদে চলিবে। জপ সাঙ্গা মানে জপভঙ্গা হইল না। এরূপ অপ্রকটরূপে জপবাহিতার কালে বাক্, প্রাণ, মনের এবং দৃষ্টিরও এক প্রকট ধীর এবং প্রসন্নবৃত্তিতা অনুভবে মিলে। কিন্তু সাবধান হইতে হয়। এই সময় বলাৎ, সহসা ঐ চারিটিকে বাহিরে অথবা অন্তরে কোন আঘাতস্থানে 'আছ্‌ড়াইয়া' ফেলিতে নেই। যেমন, গরম থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় বাহির হওয়ায়, অথবা কোন উচ্চস্থান হইতে হঠাৎ নীচে পড়িয়া যাওয়ায় সমূহ ক্ষতি, এস্থলেও তদ্রূপ। ধীরে সুস্থে, ঐ চারিটিকে যথাসম্ভব প্রসন্নধীর রাখিয়াই 'বাহ্যে' নামিয়া আসিবে (by slow gradient)। কেবল জপাদির মাঝে নয়, আগে এবং পরেও 'বলাৎ' এবং 'হঠাৎ' বিষয়ান্তরে গতি বর্জনীয়। এইটি না পালার দরুণ বহুস্থলে সৌষ্ঠবের সঙ্গো কৃত জপাদি হত, আহতাদি হইয়া দুর্বল ও বিকল হইয়া পড়ে।

১৪। অনাহতেঽব্যাঘাতে হংস ঋতং বৃহৎ।।

অনাহতভূমিতে যে অব্যাঘাত, সেটি হংসের পর অথবা উৎকৃষ্টরূপ। এই ঋতং বৃহৎ।

বাধা যে স্থলে শূন্যে পর্যবসিত হয় ($R = 0$), সেটির অনাহত সংজ্ঞা করা হইয়াছে. রোধ পূর্ব দুই সূত্রে কতিপয় আকৃতিতে বিবেচিত হইল। কিছু পূর্বে আবার অনেক স্থলে রোধকে দেশ, কাল, বস্তু এবং সম্বন্ধ (ছন্দঃ)—এ চারি দিক্ দিয়া অবরোধ, প্রতিরোধ, নিরোধ এবং বিরোধ—এই চারি আকারে দেখা হইয়াছে। অতঃপর, বর্তমান চারিটি সূত্রে এই রোধচতুষ্টয় নিরসন ও অভাব, হংসাদি চারিটি রূপে, কথিত হইতেছে। প্রথমে দেশজন্য যে রোধ, অথবা অবরোধ। কোন দেশেই যে ঋচ্ছতি অবরুদ্ধ হয় না, পরন্তু 'অব্যাহত' থাকে সেটি হংস। হংসবতী ঋকে এই হংস অন্তে 'ঋতং বৃহৎ' রূপে কীর্তিত। এস্থলে দেশ বলিতে কেবল বাহ্য অবকাশ (Physical Space) বুঝিও না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এটি ঠিক খাঁটি অবকাশও (pure, even, open, field) নয়। আণবিক দেশ (field) এবং স্থূল দেশের মধ্যে

বৈলক্ষণ্য। সমন্বয়ের প্রয়াস হইয়াছে ('United Field' ইত্যাদি) এবং হইতেছে। বর্তমানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মনীষাও এ প্রয়াসে অগ্রণী হইয়াছে। কিন্তু বেদমন্ত্রে এবং আগমেও যে হংস ঋতং বৃহৎ রূপে কথিত হইয়াছেন, সে মহাসমন্বয়ী রূপটি কবে মিলিবে?

দেশকালাদি চারি প্রকারের রোধের দিক্ হইতে দেখিয়া বর্তমানে হংস ইত্যাদি চারিটি রহস্য ভাবপদার্থ লক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে, এই চারিটি রোধ এবং তৎতৎ রোধের নিরসন ও নিবৃত্তির স্থলগুলি পরস্পর ব্যাবর্তক নয়। ব্যাবর্তক হইলে মহসমন্বয়ে আসিত না। হংসাদি চারিটি ভাব পরস্পরের সংবাদী। এক পূর্ণ সংবাদে তারা 'পরস্পরং বিবদন্তে' নয়, পরন্তু 'সঙ্গাচ্ছন্তে'। হংসে সর্ববিধ এবং সর্বস্তরে অবরোধ নিরসনের কাষ্ঠা। শ্রীভগবানের অষ্টনামের অন্যতম; হংসগীতায় হংসরূপে অহং পদার্থের শোধন কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন; ইত্যাদি। তান্ত্রিক আচারবিশেষে, অহং অথবা অহমিকার প্রতীক যে প্রাকৃত সুরা, সে সুরাশোধনের মন্ত্ররূপেও স্বয়ং বিহিত অথবা শিবশাসিত হইয়াছেন। 'হং' = সোমার্দ্ধধারী শিব; সঃ=শক্তি। এইভাবে শিবশক্তি তত্ত্ব অনুলোমে হংসঃ। বিলোমে সোঽহম্। এতদুভয়ে মিলিয়া সামরস্য। হংসবতী ঋকে 'ঋতং বৃহৎ' রূপে শ্রুত বটে, কিন্তু বিশ্লেষদৃষ্টিতে দেখিলে ঐ ঋতম্ চতুষ্পাৎ—ঋতং বৃহৎ, ঋতং শশ্বৎ, ঋতং মহৎ, এবং ঋতং তৎসৎ। এইগুলি যথাক্রমে দেশ, কাল, সম্বন্ধ অথবা ছন্দঃ এবং বস্তু—এই চারিটিকে বিশেষভাবে অধিকার করতঃ, এইভাবে দেখিবে। এই চারিটি হংস, তার্ক্ষ্য, সুপর্ণ এবং বিহায়স (বিহগ)—এই রহস্য 'পক্ষিচতুষ্টয়' রূপে ভাবনা করা হইতেছে হংসাদি সূত্রচতুষ্টয়ে। সব কয়টিই বিশ্বানুস্যূত মৌলিক ঋতমের আকৃতি।

এইবার রোধিকাশক্তিকে রাত্রিরূপে ভাবনা কর।

যাঽসৌ রোধিকা রাত্রির্জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।
নিরোধিকা মহারাত্রিঃ কালারাতী প্রবীত্যতঃ॥
যোঽহরাত্র্যাবরুধ্যেতানাহতো যো ন রুধ্যতে।
তত্র দেশেষু যো মুক্তঃ স হংসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
হংসবত্যামৃচীরিতো বরুণং যো বুবুর্ষতে॥ ১৮৯-১৯০

বেদে রাত্রি সূক্তাদিতে যে রাত্রি শ্রুত হইয়াছেন, এবং যিনি এই বর্তমান গ্রন্থেও বহুধা ভাবিত হইয়াছেন, সে রাত্রি রোধিকা হইয়াও জ্যোতীরূপে তমঃকে রোধ (বাধ) করেন। সুতরাং, সে রাত্রিকে প্রাকৃত তামসী মনে করিলে চলিবে না। অপ্রাকৃত শুদ্ধা তামসী এক পরম ভাব আছে। সেটি গুণত্রয়ের প্রসঙ্গে বিবেচিত হইবে। ধর, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটি বৃত্ত (P, M, V)। প্রকৃতির সাধারণ ব্যবহারে (in applied naturalism or behaviourism) ঐ তিনটি বৃত্ত পরস্পর সংযুক্তই রহিয়াছে। তাদের পরস্পর ছেদের মাত্রা এবং অনুপাত নিরন্তর বদ্‌লাইতেছে। সুষুপ্তিতে এবং প্রলয়ে এই পারস্পরিক ছেদমাত্রা এবং অনুপাতের সমতা ঘটে। প্রতিটি বৃত্ত বলে—এই দেখ আমার 'বখরা' তোমাদের সমান। কাজেই, আইস আমরা এক 'যুদ্ধ-বিরতি' পত্রে স্বাক্ষর দিই। কিন্তু পাদমাত্রার এই প্রকার সমতা ও সন্ধি ঘটে কলায় (in respect of partials), কাষ্ঠায় নয় (not in final synthesis or consummation)। কিন্তু ধর, V -বৃত্তটি নিজের মধ্যেই অপর দুটিকে সম্পূর্ণভাবে এবং নির্ব্যূঢ়ভাবে মিলাইয়া লইল। ফলে, P এবং M 'ন স্যাৎ' হইল না, পরন্তু V -এরই ভাবান্তররূপ হইল। V -এর স্বতন্ত্রতা এবং পূর্ণতার ভূমি অপর দুটির নিঃশেষের ভূমি হইল না, পরন্তু তাদেরও স্বতন্ত্রতা ও পূর্ণতার ভূমি হইল। এইটি 'অপ্রাকৃত', শুদ্ধা তামসী।

এখন দেখ, রোধিকার চারিটি ব্যবহারিক ভাব—নিরোধিকা = মহারাত্রি; প্রতিরোধিকা = কালরাত্রি; অবরোধিকা = মোহরাত্রি; বিরোধিকা = অরাতিরাত্রি। তন্মধ্যে অবরোধিকা বিশেষতঃ দেশসম্বন্ধিনী। 'দেশ' অবশ্য Space মাত্র নয়। যেটি অবরোধিকা রাত্রি দ্বারা 'অহঃ' (দিবা) কে অবরোধ করে, কিন্তু স্বয়ং অনাহতভূমিতে থাকিয়া রুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ, কি দিবা কি রাত্রি কোন স্থলে বা দেশেই যেটি অবরুদ্ধ হয় না, পরন্তু সর্বস্থল বা দেশেই যেটি মুক্ত (free) থাকে, সেইটিকে বিশেষতঃ 'হংস' বলা হইতেছে। হংস = আদিত্য = প্রাণ ইত্যাদি সমীকরণ লইয়াও এই দৈশিক অবরোধমুক্ত ভাবটি ভাবনা কর। এগুলি সর্বস্থলে বা দেশে (সর্বত্র) অবাধ, অব্যাহত ঋচ্ছতির অবস্থান বুঝিও। আদিত্য এবং প্রাণ শব্দ দুটিকেও 'অবরুদ্ধ' করিয়া বুঝিও না। বিজ্ঞানে কস্‌মিক্ রে ইত্যাদিকে ঋচ্ছতির বলীয়সী আকৃতিতে দেখিতেছি বটে, কিন্তু হংস সম্পর্কে ন্যূন। অর্থাৎ, জড়বিশ্বেই সর্বত্রগ নয়। প্রাকৃতবিশ্বে সব স্থলেই রোধ মুখ্যতঃ friction (ঘর্ষণ, ঘৃষ্টি) রূপে গতির বাধা দিতেছে। কিন্তু

সলিলবক্ষঃসঞ্চারী হংস আপন অঙ্গে সলিল না মাখিয়াই সঞ্চরণ করে। রোধের অপর এক রূপ সাঙ্কর্য্য, মিশ্রতা (heterogeneity)। কোন কিছুই আপন গতির নিমিত্ত perfectly homogeneous medium or field পাইতেছে না। হংসঃ তাঁর হকার ও সকার, অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুটি অঙ্গ দ্বারা কি করেন? বিষম মিশ্রতাকে ভাঙ্গিয়া (ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্) শুদ্ধতায় এবং সমঞ্জসতায় গ্রহণ করেন। আপন গতির নিমিত্ত এই প্রকার friction-free, homogeneous, pure field মিলাইতে একান্ত সমর্থ বলিয়াই 'হংসঃ সর্ব্বদেশেষু মুক্তঃ'। বিশ্বপ্রাণের অজপারূপে ইনি নিরন্তর ঋচ্ছতি। জপে এঁকে 'ঋতং বৃহৎ' রূপে সমাশ্রয় করিলে সর্বত্র অবরোধরহিত ভূমিতে স্থিত হওয়া যায়। প্রাকৃত অজপায় হংসঃ স্বীয় প্রকৃতিতে বা স্বভাবে নেই, তাই প্রাণাদির শ্রম এবং মৃত্যু। হংসে সঞ্চিত ও সিঞ্চিত, আকর্ষণী (কেন্দ্রীণ) এবং বিকর্ষণী (কেন্দ্রাপসারী)—centripetal and centrifugal– শক্তিদ্বয়ের সুষমানুপাতিত্ব সংসাধনই হইল হংসযোগ।

হংসবতী ঋকে হংস ঋতং বৃহৎরূপে ঈরিত হইয়াছেন; এইটি পূর্বোক্ত বিচার এবং অনুভব সহায়ে বুঝিয়া লও। 'বৃহৎ' শব্দে বিশেষভাবে সর্বগ, সর্বত্র সূচিত হইল। তাই বলা হইতেছে— 'বরুণং যো বুবুর্ষতে'—যিনি বরুণকে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন। বরুণ সলিলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বটে, এবং হংসও সলিলকেই বরণ করিতে ইচ্ছা করে, এও ঠিক; কিন্তু, সলিল = জল নয়, তা তো বারবার বলা হইয়াছে। 'সলিল' পূর্বোক্ত friction-free homogeneous medium এর আকৃতি। বেদমন্ত্রে বরুণ, আকাশ, অদিতি ইত্যাদি রূপেও ভাবিত হইয়াছেন। 'বরুণ' এই আকৃতিতে সকল সীমা বা ছেদের পারে যে অসীম অদিতি, অব্যক্ত অভিব্যক্ত সকল ব্যাপিয়া যে সর্বব্যাপক, সেটি লক্ষিত হয়। সুতরাং, Continuum both as immanent and transcendent মিলে। এই যে বরুণরূপা পরমা কাষ্ঠা, সেটিকে হংস বরণ করিতে ইচ্ছা করেন।

'সর্ব্বত্র' ভাবে দেখা হইল, এইবার 'সর্ব্বদা' ভাবে দেখ—

১৫। অনাহতেঽপ্রতিঘাতে তার্ক্ষ্য ঋতং শশ্বৎ॥

অনাহত স্থলে, যেখানে বিশেষতঃ অপ্রতিঘাত লক্ষিত হয়, সেখানে 'ঋতং শশ্বৎ' রূপী (অরিষ্টনেমি) তার্ক্ষ্য (গরুড়) আকৃতি।

'সর্ব্বদেশেষু (সর্ব্বত্র) মুক্তঃ' রূপে হংসকে দেখিলাম; এইবার, 'সর্ব্বকালেষু (সর্ব্বদা) যুক্তঃ' তার্ক্ষ্যরূপে তাঁকে দর্শন করি। পূর্ব সূত্রে অনাহত স্থলে অব্যাঘাত (অনবরোধ), বর্তমান সূত্রে অনাহত স্থলে অপ্রতিঘাত (অপ্রতিরোধ)। বর্ণমালার আদি অকার এবং অন্ত্য হকার বিসর্গকে লইয়া হইল অহঃ (কালের রূপ, দিন)। এটি কালের বিস্তার (নাদমুখী) রূপ। কিন্তু কালের সূক্ষ্ম (বিন্দুমুখী) রূপও আছে। কালিকাতত্ত্বের প্রসঙ্গে এ দুটি রূপের কথা আগে বলা হইয়াছে। অকার এবং হকারের পর অনুস্বার যোগ করিলে হয় অহং। এটিকে কালের বিন্দুমুখী রূপ জানিবে। এইরূপে মহাকাল যেন নিজেকে 'কেন্দ্রীণ' করিতেছেন। মহাকাল নিজেকে অহঃ এবং অহং—Flux and Nexus– Flow Continuum and Flow Point—এই দুই ভাবেই ব্যাকরণ করিতেছেন। প্রথমটি সংখ্যানরূপ, দ্বিতীয়টি সাংখ্য। অহঃ এবং অহং—এই দুটি মিথুনে মিলিয়া মিলাইতেছে—সংখ্যাকৃতি—Number Pattern. অক্ষমালা বা জপমালা এইটিকে উদ্দেশ করে। অহং থেকে অহঃ ধারারূপে নিঃসৃত হইতেছে; এবং সে ধারা ঘুরিয়া আসিয়া অহং-এ মিলিত হইতেছে। সেই বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু। আপন অনুভবে কাল বা Duration এর এই আকৃতিটি মিলাইয়া লও। তবেই মালাজপ ও সংখ্যাজপ পূরা সার্থক হইবে। হংসঃ অথবা অজপার আলোচনায় দেখিয়াছি যে, অহঃ এবং অহমের প্রাকৃত ঋচ্ছতিটি (natural transaction), সুষমভাবে না চলিয়া বিষমভাবেই বেশী চলিতেছে। Harmony, Rhythmicity– মূলে রহিলেও শাখায় প্রশাখায় ঠিক মেলান যায় না। অনুস্বার-বিসর্গের বিগ্রহটাই তাদের সন্ধির চাইতে স্পষ্ট। জপাদিতে বিগ্রহস্থলে সন্ধিটি সাধন করিতে হয়। মেরু লঙ্ঘনের রহস্যও চিন্তা করিও। অহং যেন একটা ডবল মিরার (concave-convex)—দ্বিপার্শ দর্পণ। এক পার্শ্বে বিকিরণ, অপর পার্শ্বে 'কেন্দ্রীকরণ' (focussing)। অহঃ আকৃতিতে যখন ঋচ্ছতি, তখন বিকিরণের পার্শ্ব, অহমে যখন ঋচ্ছতির প্রত্যাবৃত্তি, তখন অপর পার্শ্ব উপস্থাপিত (presented) হওয়া চাই। এই 'পার্শ্বপরিবর্ত্তন'-এর স্থল হইল মেরু। এটি লঙ্ঘন করিলে ঋচ্ছতির যেটি ঋতম্, সেটির বিপর্যয় ঘটিবে।

বিষম ঋচ্ছতির ফলে বক্রতা-জিহ্মতাপত্তি। অর্থাৎ, অহং এবং অহঃ এর পারস্পরিক ব্যাপার সমঞ্জস (rhythmic) না হইয়া অসমঞ্জস (unrhythmic) হইয়া

পড়ে। কালসম্বন্ধে এই প্রকার। দেশসম্বন্ধে এরূপ ঘটিলে straight হয় crooked, even হয় uneven, ইত্যাদি। বিষম ঋচ্ছতি ঘটিলে সেটি পদে পদে প্রতিঘাতপ্রাপ্ত হয়, প্রতিরুদ্ধ হয়। সেটি 'ঋতং শশ্বৎ' হইতে পারে না। প্রতিরোধের প্রতিঘাতে শ্রম, মৃত্যু—slowing down, running down, ইত্যাদি।

কালসম্বন্ধে যে বিষমতা, সেটিকে বলা যাক্—'ভুজ'। তা হইলে, ঐ প্রকার বিষমতায় বিপর্যস্ত যে ঋচ্ছতি, সেটি হইল—ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম। অ, হ—দুটিতে গত্যর্থ 'ই' যোগ করতঃ 'অহি' হয়। কিন্তু সেটি সাধারণ সংজ্ঞারূপে থাকাই ভাল। এর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 'ভুজগ', 'পন্নগ'—এ শব্দ দুটি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষতঃ উপযোগী। 'পন্নগ' শব্দে 'পত্তিঃ ন গচ্ছতি'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া লও। পদের দ্বারা গমন করে না, তাই ভুজগ। পদ বলিতে পাদমাত্রাদি ঋতমের যে সুষম ক্রম, সেটি বুঝিতে হইবে। এই ভুজগ বা পন্নগ রূপে কালের যে বিষম এবং ভীষণ ঋচ্ছতি, সেটিকে শাসন ও নিরসন করেন যিনি, তিনি গরুড়। ইনি কালের 'ঋতং শশ্বৎ' রূপ। এঁর প্রসাদে জপাদি অভ্যারোহটি প্রতিরুদ্ধ 'সকৃৎ' না হইয়া অপ্রতিরুদ্ধ 'সর্ব্বদা' হইতে পারে। সুদর্শনধারী শ্রীভগবানের বাহনরূপে গরুড় ভাবিত হইয়াছেন। এক মহাপুরাণের বিষয়দৈবতরূপেও বহুধা ভাবিত ও কীর্তিত হইয়াছেন।

কালেষ্বপ্রতিরোধে তু স এব তার্ক্ষ্যতাং ব্রজেৎ।
কালস্য চক্রনেমিত্বাদরিষ্টনেমিতা খগে॥
যুনক্ত্যপ্রতিরোধেনাতো যজুর্বায়ুরেব চ।
গীরপি গীয়তে বেদৈর্মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ১৯১-১৯২

হংস এবং তার্ক্ষ্য মূলতঃ এবং তত্ত্বতঃ অভিন্ন; কিন্তু প্রথমটিতে 'দেশেষ্বনবরোধঃ', আর পরেরটিতে 'কালেস্বপ্রতিরোধঃ' আকৃতিটি মুখ্য। স্বস্তিপাঠ মন্ত্রে তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমিরূপে কথিত; কেন? 'অরিষ্ট' শব্দের আকৃতি বিশ্লেষণ নানাভাবে হইতে পারে। অর্ (ঋ এর গুণ) + ইষ্ট; অ + রিষ্ট; ইত্যাদি। ঋচ্ছতির যেটি ঋকার সেটি ইষ্টের সম্বন্ধে গুণীভাবে নিজেকে লইল। ইষ্ট = সুষম = সুদর্শন। অর্থাৎ, সুদর্শনের যে সুষমাকৃতি এবং অপ্রতিরোধনীয়ত্ব, তার ছন্দে শাসিত যে

ঋচ্ছতি, তাহাই অরিষ্ট। কালচক্রনেমি তো আবর্তিত হইতেছে; কিন্তু সর্বদা এবং সর্বথা সুদর্শনের গুণীভূতভাবে নয় (not in perfect, unfluctuable rhythmicity)। সুতরাং চক্রনেমি পদে পদে প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতেছে; গতি বন্ধুর ও ব্যাহত হইতেছে। কর্ণের রথচক্র পৃথিবী গ্রাস করিল। কোথাও বা বিকল, ভগ্ন, পঙ্গুও হইল। ভুজগ বা পন্নগ আকৃতিতে পড়িলে এই প্রকার অনিষ্ট। এই অনিষ্টিকে রিষ্টিভাবে দেখিতে পারা যায়। যেমন, কোন গ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভুজগত্ব লক্ষিত হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল—অপর কোন জ্যোতিষ্কের 'রিষ্টি' (extra-orbital field 'pull') দ্বারা সেটি ঘটিতেছে। জীবনে 'রিষ্টি' থেকে প্রায় সর্বদাই অনিষ্টি ঘটিতেছে। রিষ্টিপ্রভাবে জীবন-চক্রের নেমি এমনই ভুজগা, পন্নগা। কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মপর্বে পার্থসারথিটি সুদর্শনধারী ছিলেন না, কিন্তু 'রথাঙ্গপানি' হইয়াছিলেন—রিষ্টি নিরসনের নিমিত্ত। ভীষ্মকৃত স্তবেই সেটি বুঝা যাইবে।

জীবনে অবমানসভূমিতে যে সব বিষমচক্র (complex, vicious circle ইত্যাদি), তাদের 'নাগপাশ' কাটাইতে অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্যের কৃপা লাভ করিতে হয়। অর্থাৎ, যেখানেই 'কুটিল জটিলবন্ধ', সেখানেই সেই আকৃতিকে (শক্তি, ছন্দঃ, নাম) ধ্যান করিবে, যেটি সুদর্শন-সুহৃৎ, অরিষ্টনেমি। অবমানসে কুটিল জিহ্ম সংস্কারগ্রন্থি 'বিলেশয়' ভুজগেরই মত। জীবনে, বিশেষতঃ অধ্যাত্মসাধনে, সে সকল আততায়ী আকারে দেখা দেয়।

যেহেতু 'সর্ব্বেষু কালেষু' অপ্রতিরোধে ইনি যোজনা করেন (যুনক্তি), এই নিমিত্ত, ইনি যজুঃ। এতৎপ্রসঙ্গে, হংস = ঋক্, এই সমীকরণটি ভাবনা করিও। পরের সূত্রে সুপর্ণা = সাম। পুনশ্চ, ইনি খগ, বায়ুকে বরণ করেন, এর তাৎপর্যও ধ্যান করিও। বরুণ যেমন unbounded Expansivity, বায়ু সেইরূপ unobstructed Dynamicity. প্রণবের উকার, এবং মধ্যম মহাব্যাহৃতির দেবতা। বায়ু এবং কালের সম্বন্ধটাও পুনশ্চ চিন্তা করিও। প্রথম তিন ব্যঞ্জনবর্ণের (কখগ) আকৃতিটিও এই প্রসঙ্গে আবার ভাবিয়া লইও। ব্যঞ্জনের আদি বা মুখ যেটি (ক), সেটি খ (আকাশ), গ (বায়ু), ঘ (ঘৃণি = তেজঃ)—ইত্যাদি রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। যাহাকে অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য, যজুঃ, বায়ু প্রভৃতিরূপে ভাবিতেছে, সেটি যে গীঃ অথবা বাক্, ইহা সতত স্মরণ রাখিও। 'মধুবাতা' মন্ত্রে এটি 'গো' (গাবঃ) রূপেও শ্রুত। এ

সবের বিস্তার আবশ্যক হইবে না। সাধনসৌকর্যনিমিত্ত নীচের এই কারিকাটি ভাবনা কর—

শুক্লকৃষ্ণে হ্যমী আখূ আয়ুর্মূলানি কৃন্ততঃ।
তৃহ্যমাণৌ ভুজঙ্গেন তার্ক্ষ্যরাতৌ তু গীষ্পতেঃ॥ ১৯৩

শুক্লকৃষ্ণ (দিবা ও রাত্রি) ঐ দুইটি মূষিক (আখূ) কি করিতেছে? নাসাবিবরে শ্বাসরূপে ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে কেবলি প্রবেশ করিতেছে আর বাহির হইতেছে এবং অহরহঃ আয়ুর মূল কর্তন করিতেছে। কিন্তু, কালরূপী ভুজঙ্গ সে দুটিকে হনন করার সুযোগ খুঁজিতেছে। হনন করেও কালপূর্ণ হইলেই। কিন্তু, রক্ষার কি কোন উপায়ই নেই? অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য (সুদর্শন-সুহৃৎ), অমৃত বাক্ এবং মিত্রচ্ছন্দঃ রূপে ঐ কালভয়ে আর্ত মূষিকদ্বয়কে রক্ষা করেন (তার্ক্ষ্যরাতৌ)। কেন করেন? গীষ্পতেঃ—গীঃ বা বাকের যিনি পতি, সেই প্রণবরূপী গণপতির নিমিত্ত। অর্থাৎ, তার্ক্ষ্যরাত মূষিককে গণপতি আপন বাহন করেন। তখন সে হয় স্বয়ং 'ঋতং শশ্বৎ'। মহানামাশ্রিত যে শ্বাস, তার আর ক্রূর কালভয় থাকে না।

অপর একটি—

ক্রূরৌ বিলেশয়ৌ সর্পৌ বর্হিগ্রস্তৌ হি মেরুতঃ।
রাতী যে ছন্দসারাতী মহাশক্তিধরেঽনঘে॥ ১৯৪

দুটি বিলেশয় ক্রূর সর্প (নাসাবিবরে পশুশ্বাস) হিংসাব্রতে নিরন্তর ব্রতী। কিন্তু, মেরুস্থলে সে দুটিকে যে বর্হী (ময়ূর) নিশ্চয়ই গ্রাস করিল! বর্হী সুষম, মিত্রচ্ছন্দের রূপ। কাজেই, বর্হিগ্রস্ত হইয়া যে দুটি অরাতি (অরি) ছিল, তারা হইল রাতি (রক্ষক, মিত্র) এবং সেই সর্পভুক্ বর্হীও কৌমারীশক্তির বাহন বলিয়া, সেই রাতিযুগল অনঘা (দোষরহিতা) এবং মহাশক্তিধরা হইল। বাম ও দক্ষিণ নাসায় ক্রূরচারী যে শ্বাস মহা অরি ছিল, তারা মেরুসংস্থিত (সুষুন্নাপ্রবিষ্ট) হইয়া শক্তিধর, পাবন, পরম সুহৃৎ হইল।

আরও একটি—

অহিংস্রোঽপি বিপক্ষোঽপি হংসোঽমরান্ জিঘাংসতি।
হিংস্ররাজেন সিংহেন জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ॥ ১৯৫

হংস হিংস্রস্বভাব নয়, তার উপর এটি আবার বিপক্ষ, কিনা, স্খলিতপক্ষ; তথাপি এই হংস অমরগণকেও হিংসা করিতে চাহিতেছে। মনুষ্যাদি মরগণের তো কথাই নেই! হংসের হিংসাভয়ে ভীত তুমি কি করিবে বল তো? হিংস্রের রাজা যে সিংহ, সেই সিংহকে সমাশ্রয় করিয়া শতজীবী হইতে ইচ্ছা কর। হংসঃ = অজপারূপে যে প্রাণনবৃত্তি সর্বভূতে নিরন্তর চলিতেছে। কিন্তু জীবনের আধাররূপ এই হংসবৃত্তি বাহ্যতঃ অহিংস্র হইয়াও বিপক্ষতাবশতঃ (হকারাদি চারিটি অবয়বের অনুপাতবৈষম্য, সুতরাং অছন্দোগত্ব. নিবন্ধন), অমরাদিরও মরণের কারণ হইতেছে। এই বিপক্ষবৃত্তিটিকে সপক্ষে পাইতে হইবে। 'সিংহ' আকৃতিটি পূর্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এটি 'হিংস' এর বামেন দাক্ষিণ্যম্। অর্থাৎ, সিংহ হইতেছে সেই মূল সাধারণ আকৃতি (Basic Generic Pattern), যদ্দ্বারা যে কোনও প্রাকৃত বৃত্তির 'হিংস' বা হিংস্রভাবটি বামে (মোড় ফিরিয়া) দক্ষিণ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত শ্রীভগবানের সিংহমূর্তি; মহামায়ার সিংহ বাহন; ইত্যাদি।

পূর্ব দুই সূত্রে আনন্তর্য্য এবং নৈরন্তর্য্য ভাবদ্বয় লক্ষিত হইল।

১৬। অবিঘাতে সুপর্ণ ঋতং মহৎ॥

পূর্বোক্ত অনাহতস্থলে, বিশেষতঃ অবিঘাত (অবিরোধ) হইলে, সুপর্ণ—ঋতং মহৎ।

এইবার বিশেষ করিয়া সম্বন্ধ ও ছন্দোগত রোধের প্রসঙ্গ হইতেছে। এ প্রকার রোধকে বিরোধ বলা হইয়াছে। যেমন, 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' উচ্চারণে শেষেরটি 'শ্বঃ' মতন বলিলে, কেবল যে অর্থহানি ঘটিল এমন নয় (শ্বঃ = আগামী দিবস), পরন্তু শব্দের এবং প্রাণের ব্যাহৃতিরূপা আকৃতিটিরই বিঘাত ঘটিল। এইরূপ, 'বরেণ্যং' পদে 'ণ্যং' টিকে দুটি মাত্রায় লইয়া অগ্নি ও সোম এ দুটিকে পরস্পরে মিলিত করিতে হইবে

('জাতবেদসে সুনবাম সোমং')। প্রকৃত প্রস্তাবে, গায়ত্রীমন্ত্রে মাত্রাসমতা সাধনের স্থল (key position) এই পদ। এই স্থলে বিপক্ষও হইবে সপক্ষ। এইরূপ আবার 'ধিয়ো যো নঃ' স্থলে 'য়' এবং 'ও' এ দুয়ের উচ্চারণ যথাক্রমে আনন্তর্য্যে ও নৈরন্তর্য্যে রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, হংস এবং তার্ক্ষ্যের শাসনে। প্রথমটি বলে—সাবধান, একবার 'য', আর একবার 'জ', করিও না। অপরটি বলে—ওকারের 'লেখ' (curve) টি যেন সুষম এবং অবিচ্ছিন্ন হয়। প্রণবের ওকার ঐ পদত্রয়ে সুষমগতিতে (symmetrically), ক্রমশঃ বিন্দুলীন হইবার মুখে গড়াইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ এরূপভাবে ব্যাহরণ না হইলে, সমগ্রজপে ওঙ্কারেরই অন্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এরূপ হওয়াকে বলে বিঘাত। তানপূরায় সুর বাঁধিয়া আলাপ হইতেছে। সে বাঁধা সুরটির অবিঘাতে অন্বয় থাকা আবশ্যক। অভিঘাত বা অবিরোধে সুপর্ণ। এটিও এক বিশ্বজনীন আকৃতি। সর্বক্ষেত্রেই সুপর্ণকে স্মরণ করিও। শ্রীভগবানের হস্তে সুপর্ণ হইয়াছেন পদ্ম। রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব সঙ্গীতটি 'তোমার নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ!'—স্মরণ কর। সুপর্ণ 'বিদ্রোহী পরমাণু' সুন্দর করিতেছেন, ইত্যাদি। চন্দ্রভানু হইতেছেন 'জ্যোতির মঞ্জীর' নটের চরণে। 'চরণপবনে' আবার করিতেছে কি?

অগ্নি ও সোম—এ যুগ্মরূপকে চরাচরের উপাদানরূপে ভাবনা করা হইয়াছে। বর্তমানে ছান্দস আকৃতিতে তাদের ভাবনা হইতেছে। ধর, শান্ত জলরাশি। কোন স্থলে স্পন্দন ঊর্মি আকারে জাত হইল। জাত হইয়াই সেটি ছড়াইতে চায়; অন্য ঊর্মিকে সম্মুখে পাইলে, তার সাথে বিরোধও করে। তাতে জটলার সৃষ্টি হইতে পারে। এই যে বিস্তার ও বিঘাত, তার আপন ছন্দঃ অবশ্যই আছে। কিন্তু অপর এক ছন্দে তার পরিণয়, অন্বয়, সমন্বয় না ঘটিলে, ঊর্মিসঙ্ঘাত সুষম-সুন্দর রূপটি গ্রহণ করে না; কম্পনের জটলার মাঝ থেকে সঙ্গীতের রূপ ফুটিয়া বাহির হয় না। ঋক্ যজুঃ হইল, কিন্তু সাম হইল না। অ-কার ও উ-কার, ম-কারের সোমে অভিষুত হইল না। সৃষ্টির মূল স্পন্দ থেকে সুরু করিয়া বিশ্বের বর্তমান অভিব্যক্তি পর্যন্ত, অগ্নি ও সোমের ছান্দস-সমঞ্জসতা যার দ্বারা সাধিত, রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়, সেটিকে 'সুপর্ণ' বলা হইল। যদি পক্ষিরূপে ভাবনা কর তো অগ্নিমাত্রা এবং সোমমাত্রা ইহার দুটি পক্ষ। 'সু' শব্দের দ্বারা সৌষ্ঠব, সুষমতাদি লক্ষিত। গায়ত্রীমন্ত্রে 'বরেণ্যং' পদে অগ্নীষোম

সমন্বয়ে মিলিয়াছে। এই নিমিত্ত, গায়ত্রী সুপর্ণা। ইনি দেবতাদের নিমিত্ত (অধ্যাত্ম চক্ষুঃ কর্ণাদির দেবতাও বটে) অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন। মন্ত্রে 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' আছে। এর ভাব নানাভাবে ভাবিত হইয়াছে বা হইতে পারে। তবে, বর্তমান প্রসঙ্গে, যেটি 'অত্তি' সেটি অগ্নি, আর যেটি 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি' সেটি সোম (স ও ম্)।

পরস্পরং বিরুধ্যেতেঽগ্নীষোমৌ সহকারিণৌ।
তয়োর্বিঘাত-সঙ্ঘাত-সঞ্জাতং হি চরাচরম্॥
ক্ষয়পোষণ-ধর্ম্মাভ্যাং ষট্ পরিণামভাগ্ ভৃশম্।
অপ্রাপ্তমন্যয়াঽনৈষীদ্ যা যোনিরেব ছন্দসাম্॥ ১৯৬-১৯৭

অগ্নি ও সোম পরস্পর সহকারী হইয়াছে বটে, কিন্তু তারা চরাচর সর্বত্র বিরোধেও নিরস্ত হয় নাই। বরং 'বিঘাত' (mutual interference, friction, collision) রূপটিই অধিক প্রতিভাত হয়। অন্ততঃ আভাস বা ছায়ার ক্ষেত্রে তো বটেই। অথচ, বিরোধস্থলে পরিণয়াদি ছন্দের আকৃতি রহিয়াছে। শক্তির ক্ষেত্রে ছান্দসরূপই আরও মূর্ত হইয়া উঠে (in dynamical analysis and appreciation)। তাতে যেটি casual রূপে ফলিত, সেটি causal রূপে গৃহীত হয়। জটলাও ভোল ফিরিয়া হয় মঞ্জুলা। সর্পিলা হয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি। পরিণয়াদি ঘটিলে বিঘাতেও সঙ্ঘাত (যথা, স্ত্রীপুং প্রকৃতির) সম্ভাবিত হয়। তার ফলে, সঞ্জাত এই চরাচর। সঞ্জাত চরাচরে ক্ষয় (হরণ) এবং পোষণ (পূরণ) রূপে অগ্নীষোমের বিঘাত কিন্তু চলিতেছে। বিশেষভাবে জীবকোষ লক্ষ্য কর। ফলে, নিরন্তর জায়তে, অস্তি ইত্যাদি রূপ ষট্ পরিণাম সর্বত্র। এই পরিণাম প্রবাহের শেষ দেখা যায়—ম্রিয়তে—মরিয়া যায়। দেবতারাও এতে ভয়ভীত। তাঁরা জগতী, বৃহতী প্রভৃতি ছান্দসী আকৃতিতে একে একে 'অমৃত' আনয়নে বরণ করিলেন। তাঁরা পারিলেন না। কিন্তু ছন্দোমাতা ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন—অনৈষীৎ। এই নিমিত্ত, ইনি সুপর্ণা। যে প্রণব বা ওঙ্কারের কথা পরের সূত্রে আসিতেছে, সে ওঙ্কারের ছন্দঃ গায়ত্রী। অতএব, অনাহতের যে অবিঘাত ভূমি, সেখানে আরূঢ় হবার নিমিত্ত ঐ সুপর্ণাকে আবাহন ও ভজনা করিও। সুপর্ণা প্রাপ্তি ঘটান অপর্ণার। অ + পর্ণা = দ্বন্দ্ব বা পক্ষ রহিত যে পরম তত্ত্ব।

অথবা, 'অপ' (অপগত) 'ঋণ' যাহা হইতে। অর্থাৎ, যে তত্ত্বের আর হান (negation) নেই। অপর্ণাতত্ত্বে স্থিতি হইলে—'সন্ধ্যা ফিরে তার সন্ধানে, সন্ধি খুঁজে নাহি পায়।'

১৭। অনাঘাতে ব্যোম বিহায়স ঋতং সৎ॥

অনাহতের যে চরম ভূমিতে আঘাত আর থাকে না, সেইটি ঋতং সৎরূপ বিহায়স ব্যোম। এইবার রোধের অন্তিমরূপ যে নিরোধ—বস্তুস্বভাব বা প্রকৃতিরই অপমর্দ—তার নিরসনের ভূমি দেখান হইতেছে। মনুষ্যাদি জীব থেকে আরম্ভ করিয়া অণুটি পর্যন্ত, সব কিছুর 'নিজ' ভাব (ownness) কে আশ্রয় করিয়াও রোধ বিদ্যমান থাকে, যেটিকে দেশ-কাল-সম্বন্ধ এ তিনে বিশ্লেষণ করিয়া সম্যক্ এবং সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত করা যায় না। অর্থাৎ, যেটি নিজ, সেটিকে অপর বা ইতরের সঙ্ঘাতফলরূপে দেখিয়া তার পূরা এবং খাঁটি রূপ দেখা হয় না। সাধক তাই না আক্ষেপ করেন—'ইষ্ট, গুরু, মহতের কৃপা মোরে হৈল। একের কৃপা বিনু সব ছারেখারে গেল।' এটির বিস্তার পরে হইবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, নিজগ্রন্থি, আত্মভঙ্গুরতা, আপন আঘাত স্থলটি কাটাইয়া উঠিতে গেলে, ঋতম্‌কে সৎ বা সত্যম্‌রূপে মিলাইতে হইবে। কেননা, এখানে রোধ কেবল পরিপার্শ্বিকে নয়, বীজে; কেবল স্থূলে বা সূক্ষ্মে প্রতিক্রিয়া পরম্পরায় নয়, কারণে, কেন্দ্রে, নাভিতে। আর, বীজে, কারণে, নাভিতে যেটি মলাদিরূপে (যথা, আণবমল) রোধের হেতু হয়, সেটি নিজবোধের রোধ—অজ্ঞান-কল্পিত অভিমান, ইত্যাদি। নিজবোধের রোধ কাটাইতে পারগা যে বৃত্তি সেটি ঋতং সৎ। পূর্ব পূর্ব ভূমিতে 'সত্যস্য মুখং' 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' অপিহিত হওয়া সত্ত্বেও অপাবৃত তো ঠিক হয় নাই; এ ভূমিতে সেই অপাবরণের প্রয়াস। এই নিজবোধরোধরূপ নিরোধের অপাবরণ না হওয়া পর্যন্ত অবরোধাদি দূর করিয়াও সমূলে এবং সর্বথা দূর করা যায় না। আত্মস্থিতিই ধ্রুবা স্থিতি। ঋচ্ছতি বা ঋতম্ যতক্ষণ দেশকালাদিকে লইয়া এই বিশ্বসমীকরণ (Cosmic Equation) সমাধানে প্রবৃত্ত, ততক্ষণ সে সমাধান কখনই নির্ব্যূঢ়রূপে যেটি ধ্রুব, তার নাগাল দেওয়ায় না। সুতরাং হংসাদিকে ব্যোমে ('ওমেব ব্যোম') লইয়া মিলাও। তবেই, সর্বত্র সর্বদা, সর্বধা—এ তিনের মহাসমন্বয় ঘটিবে সর্বথায়, অথবা সর্বেই। পূর্বোক্ত হংসাদিকে

(এবং বেদত্রয়কে) ব্যাহৃতিত্রয়রূপে ভাবনা করতঃ তাদের দ্বারাই পূর্ণাহুতিটি সমাপন কর—ওঙ্কাররূপ ব্যোমে। এ ব্যোম একদিকে যেমন ঋতং সৎ, অন্যদিকে, তেমনি আবার বিহায়স 'বিহায়+সঃ', অর্থাৎ, 'সঃ' আকারে যে পরিচ্ছিন্ন শক্তিপ্রক্ষেপ, সেটি 'বিহায়' ত্যাগ করতঃ, স্পন্দের বা শক্তির যে বিপুল অকুণ্ঠ বিততি, তাতেই সমাপন হইল 'বিহায়সঃ' আকৃতি। অথবা বি = বিয়দি, হা=স্বাহা (আহুতি সমাপন), ষ = 'এই'রূপে নিরূপিত, সঃ = দন্ত্য শক্তি = ছিন্নশক্তি বিসর্গ। এ শব্দটির আকৃতি বিশ্লেষণ আরও মৌলিকভাবে হইতে পারে। এখানে দেখ যে, বিহায়সের 'বি' ওমে মিলিয়া ব্যোম হইয়াছে। অর্দ্ধমাত্রা সম্বন্ধে চণ্ডীস্তবে 'যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ' আছে। এর রাহস্যিক অর্থ এই হইতে পারে—'বি', কিনা, 'বিয়ৎ', 'শেষ' কিনা, শিষ্ট (not embracing) রাখিয়া অর্দ্ধমাত্রা উচ্চারণযোগ্যা হয়েন না। সুতরাং তোমাকে বিহায়স ব্যোম ভূমিটি স্পর্শ করিতেই হইবে। ব্যোমের বীণায় যে অনাহত 'ধুন' শাশ্বত বাজিতেছে, তার সঙ্গে তোমার সুর বাঁধিতেই হইবে। উষায় সন্ধ্যায় পবনে কিরণে সেই ধুনটি সুরধুনীধারার মতোই মর্ত্যে 'অবতরণ' করে, তাই প্রণবাদি সাধনে ধুন সাধিবার ক্ষণ ঐ সব। পূর্বোক্ত সুপর্ণা গায়ত্রীরূপা বটে, কিন্তু তাতে অগ্নি ও সোমমাত্রা, উদয়মেরু (সুমেরু) ও অস্তমেরু (কুমেরু) ইত্যাদি বিষম-দ্বন্দ্বাশ্রিত হইতে পারে, সুষম নয়। সাধারণতঃ এইরূপই হয়। বিষম হইলে মধুকৈটভ।

মূলে এই বিষমদ্বন্দ্বাশ্রিতভাব (basic unharmonic rivalry) অপগত না হওয়া পর্যন্ত প্রণবাদি সবিতা স্বরের সামর্থ্য সার্থক সৃষ্টিকাষ্ঠায় (critical creative momentumএ) পৌঁছায় না। এতৎপ্রসঙ্গে সৃষ্টিসূক্তের 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি পুনশ্চ ধ্যান কর।

আদাবাবী অনন্তিমে ব্যানিতি সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।
ওঙ্কারো ব্যোমরূপেণাতীত্য দ্বন্দ্বাভিঘাতনম্॥
দেশকালাদিসম্বন্ধাভিঘাতজন্যবৃত্তিতাম্।
জহাতি যঃ স বিজ্ঞেয়ো বিশেষেণ বিহায়সঃ॥ ১৯৮-১৯৯

'ওম্'এর আদিতে বি + আ (আবী), এবং অন্তে অন্, এই দুইটিকে পক্ষীভূত করতঃ 'ব্যানিতি'—ব্যান করিতেছেন—এইভাবে নিখিলের (প্রাণনব্যাপারের)

সংশ্রয়স্থল হইয়াছেন; অর্থাৎ, নিখিলের প্রাণনে (Cosmic vital function) ব্যান আকৃতিতে নিখিলের সংশ্রয় এবং সন্ধি হইবার নিমিত্ত, এক পক্ষে বি এবং আ, অপরপক্ষে অন্ (ধাতুর অর্থ প্রাণন), এ দুটিকে লইয়া, ওম্ হইয়াছেন—ব্যান ও ব্যোমন্। এই ব্যোম আকৃতিতে তিনি সর্বদ্বন্দ্বাভিঘাতের অতীত থাকেন। সেই দ্বন্দ্বাভিঘাত বিশেষ আকারে বলা হইতেছেঃ—দেশ, কাল, বস্তু, সম্বন্ধ, এই চারি প্রকারে অভিঘাত জন্য (অবরোধাদিরূপে) যে বৃত্তিতা, সেটিকে বিশেষভাবে (বি) পরিত্যাগ করেন (হা=জহাতি), যঃ স (যিনি তিনি) 'বিহায়সঃ'। যঃ এর বিসর্গ শেষের সকারেই বিসৃষ্ট। অন্যথা, মধ্যে বিসর্গ রাখিলে আকৃতিচ্যুতি। যেমন, গায়ত্রীর ব্যাহরণে 'ধিয়ঃ যঃ নঃ' করিলে ঘটে। এ স্থলে ব্যাকরণ সন্ধিতেই আকৃতি-সুষমতা। প্রকৃতস্থলে, ব্যানসন্ধিতে বিসর্গের বিসর্জন।

১৮। বিন্দুসঙ্ঘাতাদ্রোধস্য ভুবনস্য রেতঃ॥

[অতঃপর, বিন্দু এবং নাদের সম্পর্কে রোধের বা রোধিকাশক্তির সঙ্ঘাত (Resultant Congruent Action) বিবেচিত হইতেছে।] রোধ বা রোধিকার বিন্দু 'অধিকারে' যে সঙ্ঘাত (শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি এবং ক্রিয়া এই চতুষ্টয়ের সম্পাত-সমন্বয়), সেটি হইল ভুবনের 'রেতঃ'।

পূর্ব কতিপয় সূত্রে রোধ বা রোধিকাকে বাধা (অবরোধাদি) রূপে দেখিয়া তাদের ক্রমিক এবং কাষ্ঠায় অপনোদনের (elimination) ভূমিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু রোধিকা কেবল তো হানের বস্তু নয়; উপাদানেরও বস্তু। সৃষ্টিসূক্তে 'ততো রাত্রিঃ' ইত্যাদি স্মরণ কর। রোধিকার একান্ত বাধে সৃষ্টিই হয় না, সাধনাদির অভ্যুদয়ও হয় না। সৃষ্টিব্যবহারে রোধ বা রোধিকাকে চাই-ই। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে সুরু করিয়া, স্মরণমননভাষণাদি, এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি পর্যন্ত, সর্বক্ষেত্রেই রোধ আবশ্যক। রোধক হয় সাধক। অণু-বীজাদিতে রোধিকারই আধিক্য। সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন ওঠে—'ভুবনস্য রেতঃ' বলিয়া বেদাদিতে যে রহস্যের আভাস শ্রুত হয়, সেটির সঙ্গে রোধ বা রোধিকার কোনও সম্বন্ধ নেই কি? ঐ রহস্য শব্দটিকে যদি Cosmic Seed বলিয়া অনুবাদ করি তা হইলে ঐ আভাসের প্রতিকৃতি (mental representation) কি হইবে? 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাক্ষিপৎ';

'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'; 'অহং বীজপ্রদঃ পিতা';—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যগুলিরই বা ভাব কি?

রোধের দুটি আকৃতি—রোধস্ ও রেতস্ ভাবিয়া দেখ। অ + উ = ও, অ + ই = এ। উকারে বেধমুখ্যতা, ইকারে লম্বমুখ্যতা। বীজে (যথা, পুংরেতসে) এই লম্ববৃত্তি শক্তি এবং আকৃতি দ্বিভাবেই স্ফুটরূপ হইয়াছে। পাদপাদির বীজে অঙ্কুর-প্ররোহাদিক্রমে লম্ববৃত্তিতা লক্ষ্য কর। সামান্যভাবে—lifting of energy-level and emergence of the pattern. এক কথায়, বর্তমানের Emergent Evolution এর মূল আকৃতি এই রেতস্। 'তস্' বলিতে তলের প্রক্ষেপ—level or plane projection। এই plane projection -এর সঙ্গে লম্ববৃত্তি (plane of promotion) সংহত হইলে যে শক্তিসঙ্ঘাত আকৃতি মিলে, সেটি বিন্দু-অধিকৃত (centrally designed or nuclearly patterned) হইলে হয় রেতস্। 'ত' কারে তলবৃত্তিতা, 'ধ' কারে স্তব্ধবৃত্তিতার (staticity, rigidity) আকার গ্রহণ করে; কিন্তু, রেতসে তলবৃত্তিতা dynamic and creative. এখানে শক্তিসামগ্রী রুদ্ধ বটে, তথাপি উদ্‌বুদ্ধ, ক্রিয়োন্মুখী, সৃষ্ট্যুন্মুখী। যিনি মহদ্‌ব্রহ্মে বীজপ্রদ পিতা, তাঁতে বীজ অমোঘ ও অনঘ। অন্যত্র রেতসের সঙ্গে রোধস্ মিলিয়া conditional, limited dynamicity র আকৃতি পায়। রবীন্দ্রনাথের গানে—'নদীতট সম প্রবাহ আবরি', রোধস্ সমস্ত কিছুকেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর অভিঘাতের নিমিত্ত অধ্রুব ভঙ্গুর তটদ্বারা ঘিরিয়া রাখে। 'ভুবনস্য রেতঃ' আকৃতিতে এই ভঙ্গুরতট-পরম্পরা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্রমে সাগরবেলা আকারে আসিতে থাকে, এবং অন্তিমে সে বেলায় সাগর উদ্বেল হইয়াও বীচিবুদ্‌বুদাদিরূপে ভঙ্গুর হয় না, আর বেলাকেও ওটি নিরন্তর ঘাতভঙ্গুর করে না।

এ হইল ভাবের ভাষা। বিজ্ঞানের ভাষায় এই 'ভুবনস্য রেতঃ' তত্ত্বটি বুঝিয়া লও। বিশ্বের সব কিছুতে রোধকে যে রোধসের আকারে দেখিতে পাই, সে রোধস্ হইল বিজ্ঞানের ভাষায় Strain. অন্তর্বহিঃ সর্বত্র এই Strain-এর অধিকার। চেতনার 'সমতলে' অপেক্ষা 'অবতলে' (Sub-liminal এ) Strain এর আকৃতিগুলি অধিকতর জটিল এবং দৃঢ়। (যথা, ভূস্তর অপেক্ষা ভূগর্ভে fault ইত্যাদি)। এই রোধস্ আকৃতি থেকে স্বাভাবিক আকৃতি বা প্রকৃতিতে আসার নিমিত্ত সর্বত্র যে এক ব্যক্তাব্যক্ত প্রয়াস রহিয়াছে, সে স্বাভাবিক আকৃতিটি 'স্বধা' এই লক্ষণে আসিবে। স্বধা

'পিতৃগণস্য তৃপ্তিহেতুঃ'। পিতৃগণ, সংক্ষেপতঃ, রেতশ্চেতোবীজ-ক্ষেম (preservation and continuity of the germplasm and psychoplasm) এর নির্বাহয়িতা। আকৃতির চারিটি দিক্—সত্তা, আকৃতি, শক্তি, ছন্দঃ। তন্মধ্যে প্রথম দুটির যোগক্ষেম নির্বহণ করেন পিতৃগণ; আর, বিশেষভাবে, পরের দুটির যোগক্ষেম নির্বহণ করেন দেবগণ। শক্তি ও ছন্দের ঊর্দ্ধস্তরগুলি খুলিয়া দিয়া তাদের জ্যোতির্বিশাল, ছন্দোবিশাল করিতে, অর্থাৎ, 'দৈবীসম্পৎ' লোক অপাবৃত করিতে—দেবগণ স্বাহা মন্ত্রে আহূত এবং আহুত হয়েন। স্বধাতে যোগক্ষেম দুইটি বৃত্তি নিহিত আছে; তন্মধ্যে, ক্ষেমবৃত্তির (unvarying, static continuity র) মুখ্যতা রহিলে, সেটি অব্যয়, এবং পিতৃগণতুষ্টিহেতু মন্ত্র। কিন্তু, পূর্বোক্ত অর্চ্চিরাদি যোগমুখ্যতা থাকিলে, সেটি কেবল অব্যয়রূপেই থাকে না; যথা, 'স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্।'

যাই হোক, স্বধা আকৃতিটি বীজ বা রেতসে নিহিত সন্দেহ নেই। পরে দেখিব যে—স্বধা, স্বাহা এবং বষট্কার, এই 'ত্রয়ী' আকৃতিতে অমোঘ। যথা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়ী। কিন্তু সামান্য বীজ বা রেতঃ আকারে দেশকালাদি-রোধ-সাপেক্ষই থাকে, নিরপেক্ষ থাকে না। মন্ত্রের বীজ আকৃতি সম্বন্ধেও সাধারণতঃ তাই। ধর, এসব সাপেক্ষ স্থলে একটা কাষ্ঠায় যাইতে চাই। প্রশ্ন করি—আচ্ছা, এস্থলে তো বীজ বা রেতস্‌কে কৃপণ-কুণ্ঠিত আকারেই পাইতেছি, কিন্তু, এমন কি কোন ভূমি নেই, যে ভূমিতে সেটি অনঘ এবং অমোঘ? অ+ঘ=যাহা পরিপূর্ণ ঘোষবান্ হইতে ছন্দাদিকে বাধা দেয়, তাহাই অঘ। রেতঃ সম্বন্ধে সেই কাষ্ঠাটি হইল—'ভুবনস্য রেতঃ'। বিজ্ঞানের ভাষায়—যতদিন পর্যন্ত ঈথার নামক কোন পদার্থের দ্বারা মূর্তজগতের আধার ভাবনা করিতে হইত, তখনও সে আধারটিকে perfect fluid, perfect rigid, perfect elastic ইত্যাদি আকৃতিতে ভাবনা হইত। কেবল মাত্র বাহ্য মূর্ত বিশ্ব নয়, প্রাণ এবং চেতনার আধার অন্বেষণ করিতে যাইয়া উক্ত সব বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও ভাবনাকে, এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক সংখ্যায়ন ও রূপায়ণকেও, এক মহা সমন্বয়ে আসিয়া মিলিতে হয়। আর, সেটি নৈকটিক হইবে দুই দিক্ দিয়া—বিন্দুসঙ্ঘাত এবং নাদসঙ্ঘাত—as congruently related to the Perfect Dynamic Point, and as congruently related to the Perfect Dynamic Continuum. রেণু অথবা কণ (as corpuscle) সমস্ত কিছুই পরমা কাষ্ঠারূপে ঐ বিন্দুর দিকেই আপন প্রবর-গোত্র

নির্দেশ করিতেছে; আর, বিপুল বা মহানের দিকে পরম জ্যায়ান্‌রূপে নাদকে মাগিতেছে। অথচ, রেতঃ = বিন্দু নয়; এটি বিন্দু গোত্রীয়। ভুবনস্য রেতঃ আকৃতিতেও বিন্দু নৈকটিকতম (closest approximation to the Perfect Dynamic Point)। সুতরাং, ইহাকে বিন্দুসঙ্ঘাত-গোত্রীয়বর্গের পরমোপকাষ্ঠা বলা যায়। আগে বিজ্ঞানে Kinetic and Potential—এই দুইরূপে শক্তির পরিচয় ছিল; বর্তমানে, Energy and Mass - এর সমীকরণ সূত্র হাতে পাইয়া Energyকে 'massed' or 'massing' আকৃতিতেও দেখিতেছি। প্রশ্ন ওঠে—বিশ্বে ঈদৃশ কোন কেন্দ্রীণভূমি (nuclear position) আছে কি যেখানে ঐ massing of energy (M.E. or N.P.) অণিষ্ঠ আকৃতিতেও গরিষ্ঠ (of maximum magnitude in minimum dimensions)? হোমিওপ্যাথী শক্তিক্রমের কথা তুলনা কর। Dimensions-এর পরিবর্তনঘটনকে যদি বলি Strain, তবে ঐ পরমোপকাষ্ঠাতে (অণিষ্ঠ আকৃতিতে), যেটি ভুবনস্য নাভিঃ, তাতে, Strain ন্যূনতম (minimum); কিন্তু স্বধাশক্তি (Stress) অধিকতম (maximum)।

অথবা, কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্রাপগা, এই দ্বিবিধ বৃত্তি। প্রথমটিকে স্বধা, পরেরটিকে বষট্ সংজ্ঞায় লইলে, রেতঃ বা বীজ যাবৎ কেন্দ্রস্থা বা কেন্দ্রসান্দ্রা আকৃতিতে থাকে, তাবৎ এটি স্বধা, কিন্তু সিঞ্চিত, নিক্ষিপ্ত ইত্যাদি হইলে বষট্। স্বাহা সংজ্ঞাদি পরে বিবেচিত হইবে। বষট্—এতে যে প্রক্ষেপ বৃত্তি, সেটি ঊর্ধ্বপ্রক্ষেপ স্থলে বৌষ্‌ট; অধঃপ্রক্ষেপ স্থলে, বিশেষতঃ অস্ত্র-আকৃতিতে, ফট্। এসব আকৃতিও যথাস্থানে নিরূপিত হইবে। ধর, অণুতে যে রেতঃ শক্তি, সেটি ঊর্ধ্বগা হইয়া সংগঠনী হইলে (as evolving, construction Energy) বৌষট্; কিন্তু বর্তমানে আণবিক বোমাদি আকারে, ফট্। রেতঃ আকৃতিতে বষট্, এই দ্বিবিধ আকৃতিতেই, ব্যাবৃত্ত (recessive); স্বধা সংবৃত্ত (dominant)। সুতরাং স্বধাতে সঞ্চিত শক্তির গাঢ়তা (density) এবং উগ্রতা (intensity) সর্বাধিক। 'হ্‌সৌ'আকৃতিতে সঞ্চিত-সিঞ্চিত এতদুভয় মিথুনরূপে প্রদর্শিত। এটি ঐ দুটির পরিণয় মাত্র। অন্বয়, সমন্বয়, মহাসমন্বয় গ্রামে বিস্তার করার নিমিত্ত স্বাহা।

সম্যক্তয়া ঘনত্বেন শক্তের্যা কেন্দ্ররূপতা।
অনবচ্ছিন্ন মেয়স্যাবচ্ছিন্নমেয়তা যতঃ॥

রোধিকায়াং ততো রাত্রৌ সঙ্ঘাতাদ্ বীজরূপতা
তৎ সৃষ্ট্বা প্রাবিশদ্ ব্রহ্ম চেত্যস্যোপনিষদ্ হি সা॥ ২০০-২০১

সম্যক্‌রূপে শক্তির ঘনীভাব ঘটিলে, শক্তির কেন্দ্ররূপতা লক্ষিত হয়। 'সম্যক্' বলিতে focussing, যথা, অতসী কাচদ্বারা সূর্যরশ্মি ইত্যাদির, বুঝিতে হইবে। লক্ষ্য কর যে, যখন 'অউম' ইত্যাদির ব্যাহরণ হয়, তখন প্রাণ এবং মন এ দুয়ের উক্ত প্রকার সম্যগ্‌ভাব ঘটিয়া থাকে। কেবল 'অম্'তে যেটি নেই, মধ্যে 'উ' আসিয়া সেটি ঘটাইয়া দেয়। যেমন আবার, ধনুতে জ্যা আরোপিত হইল 'অ, ম' এ দুই বর্ণের দ্বারা; কিন্তু 'উ' দ্বারা জ্যা আকর্ষণ হইয়া উক্ত সম্যক্তা সাধিত হয়; এবং সেইরূপ হইলে পর, 'প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।' আচ্ছা, শক্তি কেন্দ্ররূপা হইলে, যেটি অনবচ্ছিন্ন অমেয়, সেটি অবচ্ছিন্ন মেয় আকারে প্রতীত হবার যোগ্য হয়। তত্ত্বতঃ, শক্তি কেন্দ্রস্থা হইয়াও অনবচ্ছিন্না অমেয়াই রহেন, কেন না, উহা শক্তির স্বরূপগত। তবে, অবচ্ছিন্ন মেয়বৎ ব্যবহার সম্ভব হয় উক্তপ্রকার কেন্দ্রীণতার ফলে। বর্ণমালার এক একটি অক্ষর; ঐ একটি ধূলিরেণু; একটা ইলেক্‌ট্রন;—সবই সত্তাশক্তিতে তত্ত্বতঃ এবং সমগ্রতঃ অনবচ্ছিন্ন অমেয়। তত্ত্বতঃ এবং পরিপূর্ণরূপে ঐ অনবচ্ছিন্ন অমেয় আকৃতি থাকে বিন্দুতে। অতঃপর (ততঃ) রাত্রিরূপা যে রোধিকাশক্তি ঐ বিন্দু দ্বারা শাসিত হইয়া, বিন্দু-অধিকরণে (with direct reference to that Perfect Point of Power-focussing), যে সঙ্ঘাত (congruent configuration) রচনা করে, সেটিকে বলা যায় বীজ অথবা রেতঃ। 'তৎ সৃষ্ট্বাতদেবানুপ্রাবিশৎ' ইত্যাদি যে শ্রুতি তার রহস্য উক্ত বিন্দুসঙ্ঘাত দ্বারা ভাবনা করিও। ঐ বিন্দুসঙ্ঘাত এবং পরসূত্রের নাদসঙ্ঘাত (বৃষ), এই দুটি সৃষ্টির মূল আকৃতি প্রদর্শনের নিমিত্ত হ্রীঁ আদি মহাবীজ সমূহে 'চন্দ্রবিন্দু' রহিয়াছে বুঝিও।

১৯। নাদসঙ্ঘাতান্ মহাবৃষঃ॥

নাদ অধিকরণে সঙ্ঘাত হইলে হয় মহাবৃষ।

'ভ' (ব্+হ) এই আকৃতির ব্যঞ্জনা পূর্বখণ্ডে ভূরাদি ব্যাহৃতি প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে শক্তি অব্যক্ত, সেটিও যে সর্বাবস্থায় একাবস্থ রহে, এমন নয়। Potential field- এ ও difference of level, high or low, ভাব অবশ্যই আছে। ধর, কোন একটা বীজ। তাতে সম্পুটিত শক্তিসামগ্রীর 'ব' রূপটি যখন 'ভ'রূপে আসে, তখনই বীজের উচ্ছূনভাব ইত্যাদি সম্ভাবিত হয়। যে বীজাদি জপ করি, তাদেরও এই 'ভ' আকৃতিতে আনার এবং পাবার নিমিত্ত কত না নিষ্ঠাদি সহকারে পুরশ্চরণাদি করিতে হয়. এইটি মনে রাখিয়া ভাবনা কর, বৃষ এবং বৃষভ।

এখন 'সম্যক্তয়া ঘনত্বেন' বিন্দুসঙ্ঘাত হইলে রেতঃ; আর, 'সম্যক্তয়া মহত্ত্বেন' নাদসঙ্ঘাত হইলে মহাবৃষ—সাধিষ্ঠ বর্ষণকৃৎ, ভূয়িষ্ঠ সিঞ্চনকারী। Maximum massed power (M.M.P.) এর খোঁজে, আর, Maximum Expansive or Radiating Power -এর খোঁজে—দুইটি কাষ্ঠা। শক্তি কোন স্থলে যাইয়া বিন্দুনৈকটিক সঙ্ঘাতরূপে (as the nearest approximation to the Point of Perfect Dynamism) বলে—এই দেখ, আমার সর্বোত্তম ঘনীভাব আকৃতি—রেতোধা, রেতোধাত্রী মূর্তি! পক্ষান্তরে, নাদ = Perfect Radiating Power Continuum হইলেও, অনুরূপ এক কাষ্ঠায় যাইতে হয়। বিশ্বভুবন সম্পর্কে, Perfect Condenser- ই বা কোথায়, আর, Perfect Radiator- ই বা কি? Accumulator এবং Radiator, দুই-এর কাষ্ঠা খুঁজিতেছি। বহির্বিজ্ঞানও খুঁজিতেছে; অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও খুঁজিতেছে। বীজ সমাশ্রয়ে জপ করিতেছি তো ঐ নিমিত্তই। জপ দ্বারা বীজমন্ত্রটিকে 'ভুবনস্য রেতঃ' এবং 'মহাবৃষ' এই দুই আকৃতিতে মিলাইবার যত্ন করিতে হয়। বাক্, প্রাণ ও চিত্ত, এ তিনের মধ্যে প্রাণই জপকর্মের মুখ্য নির্বাহয়িতা। জপকে সমর্থ ভূমিতে তুলিতে গেলে, প্রাণকে Perfect Focussing এবং Perfect Radiating—এ দ্বিবিধ শাক্তীতনু পরিগ্রহ করিতে হয়। পরিগ্রহ করিতে রোধিকা শক্তিকে সাধিকা আকারে পাইতে হয়, বাধিকা আকারে নয়। অর্থাৎ, ধনে, ঋণে নয়। শক্তি যে পরমভূমিতে যাইয়া 'ঋণ' ভাবটি সম্পূর্ণ অপগত হইতে দেন, সেটি হইল অপর্ণা (অপ+ঋণ); এর নৈকটিক হইল সুপর্ণা (স+উপ+ঋণ)। পূর্বে যে আবিঃ এবং রাত্রি তত্ত্বতঃ আলোচিত হইয়াছে, সে দুটিকে সঙ্ঘাতে (in sympathy relation) পাইতে হয়, অথবা in congruence. বিঘাতে (in antipathy relation or discordance) পাইলে জপ 'সাধ-বাধ' এর সংঘর্ষেই পতিত রহিবে। যাহা সাধ্য এবং প্রকাশ্য, সেটির সাধন এবং প্রকাশনেই রোধিকাকে বিপক্ষবাধনী, অরিসূদনী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। 'শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধিনী'।

ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধে সমানুপাতিতা যতঃ।
উপক্রমোপসংহারাবধিকৃত্য চ যো বিভুঃ॥
আবীরূপেণ স নাদোঽস্তি রাত্রিরূপা চ বীজতা।
নাদানুরোধবৃত্তেন সঙ্ঘাতেন মহাবৃষঃ॥ ২০২-২০৩

বিশ্বে সর্বত্র ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধ দেখা যায়। ক্ষোভ = state of disturbance. মূলতঃ (basically), এটি স্পন্দ। বিজ্ঞানে অণুপর্বে এবং বিরাট্‌পর্বে যে electro-magnetic disturbance, সেটি মূলস্পন্দগোত্রীয় হইলেও মূল স্পন্দ নয়। প্রাণস্পন্দ, চিত্তস্পন্দ, অহংস্পন্দ—অন্ততঃ এ কয়টি আকৃতির সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় রহিয়াছে। এদের বিরূপতা বিদূরিত করতঃ মূলস্পন্দের সঙ্গে তাদের সুষমতা এবং অভেদ সমীকরণকে শুদ্ধি বলা হইয়াছে। ধর, গানে 'সা' এক শুদ্ধ স্বর। আমি কণ্ঠ অথবা অপর যন্ত্রে সেটি 'তুলিবার' যত্ন করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না। প্রথম প্রথম হয়ত কণ্ঠে যাহা আসিতেছে, সেটা 'সা'র গোত্রই নয়, তার সঙ্গে সুষমসংখ্যানে (in harmonic number relation) সম্বন্ধই নয়। ওস্তাদ বলিতেছেন—না, না, হইল না। প্রণবাদি নাম জপকারীরও গোড়ায় এই অবস্থা। কণ্ঠে বিষম ক্ষোভ ঘটিতেছে, কায়িকাদি অপরাধ নিবন্ধন। ডাকের মতো ডাকটি আসিতেছে না। ক্ষোভবশ (ক্ষোভ্য) মাত্রেরই ক্ষোভক বিদ্যমান থাকে। বিষম ক্ষোভ স্থলে সেটিও বিষম। 'সা' স্বরসাধনে কণ্ঠাদিতে এক সুষম ক্ষোভ্য-ক্ষোভক, বিষমের স্থলে নিজেকে ফুটাইতে চাহিতেছে। গোড়ায় পারিতেছে না। একদিকে বিষম, বিরোধী ক্ষোভ্য-ক্ষোভক; অন্যদিকে সুষম, সংবাদী ক্ষোভ্য-ক্ষোভক—এ দুই বিপরীত বৃত্তিতে সমানানুপাতিতা (balancing) হইলে, উক্ত স্বর সাধকের যে ভূমিটি আয়ত্ত হয়, সেটি হইল—উপক্রম। এইবার ওস্তাদ বলেন—হাঁ, এতক্ষণে আসিতেছে। এটি হইল সুমেরু-কুমেরুর সন্ধি—(confluence of the points of convergence and divergence)। নদীতে ভাটার সময় নীচের দিকে, জোয়ারের সময় উপরের দিকে স্রোত বয়। জোয়ার ভাটার সন্ধিসময়ে নদীর একটা থমথমে ভাব। শক্তির সর্বক্ষেত্রেই গতির মোড় ফেরার জন্য এইটির অপেক্ষা থাকে।

এই সমতা এবং সন্ধির ক্ষেত্র অবর, পরাবর এবং পর ভেদে লওয়া যায়।

স্পন্দের যেটি মূল আকৃতি (সেই 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম'), তাতে চল। যাহা স্পন্দরহিত সেটি কি জানি কেন স্পন্দমান হইল। ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধের সূচনা এখানে। এই আদিম ক্ষোভ্য-ক্ষোভকের যেটি মূলচিত্র (primordial picture), তার আধাররূপে এক সমানুপাতিতা ভূমি (a basic background of equilibrated strain and stress) অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, ক্ষোভ্য-ক্ষোভকের অনুপাতবৈচিত্র্য শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়াত্মক বিশ্বে সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তাদের অনুপাত-সমতার যে মূলভূমি, সেটিকে আধারভাবে পাইয়া এবং রাখিয়াই সে বৈচিত্র্য অশেষরূপে প্রপঞ্চিত হইতেছে—যথা, সাগরে তরঙ্গাদি। একটা ম্যাগ্নেট লও। দুইটা পোলকে সেতুরূপে ধরিয়া আছে, এক সমতার ভূমি। শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ীস্পন্দন—সব কিছুতেই তাই। 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা'—এস্থলে সমতা যে কি বস্তু, তাহা এই ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্পর্কে (in relation to the equalisation of bodily strain and stress) আবার ভাবনা কর। গায়ত্রী, প্রণবাদি জপে অন্তে যেমন বিন্দুলীনতা, উদয়ে এবং মধ্যে সেইরূপ নাদবাহিতা (continuity of a uniform, even flow of sound resonance) থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ, এক আধার স্বর (background note) ঠিক বজায় রাখিয়াই ব্যাহরণ করিতে হয়। ব্যাহরণবৃত্তি 'বহিরক্ষা' হইবে না, 'অন্তরক্ষা' এবং 'ধ্রুবাক্ষা' হইবে। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইতেছে—উপক্রম এবং উপসংহার (নিখিল ক্রিয়ার) অধিকার করতঃ নাদ 'বিভূ' (ব্যাপক—unfailing immanent) রূপে বিরাজ করেন। 'উপ' = সমীপে। তার মানে, ক্রম যেখান থেকে সুরু হয়, সেটি বিন্দু; আবার, সংহার বা লয়ও যেখানে সমাপ্ত হয়, সেটিও বিন্দু। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র ক্রমটাতেই নাদ, বিভুরূপে অধিকারী আছেন; সুতরাং, সমগ্র ক্রমেই নাদবাহিতা অবিচ্ছেদে এবং সুষমভাবে থাকা আবশ্যক। গানে যেমন আস্থায়ী বা ধ্রুব স্বরের আধার। এটি না রহিলে ক্ষোভ্য-ক্ষোভকের অনুপাতবিষমতা নিবন্ধন ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত বৃত্তির (scattering and confounding effects of the propagated wavesystem) আধিক্য ঘটিবে। পূর্বে যে বিন্দুসঙ্ঘাতজন্য রেতঃ কথিত হইয়াছে, নাদরূপ বৃষ সে রেতঃ ধারণে ও সিঞ্চনে অসমর্থ হইবেন। জীবের শরীরে অহরহঃ যে হরণ-পূরণ (metabolic action) চলিতেছে, তাতে নাদরূপ বৃষকে সমর্থ-রেতোধা রূপে রক্ষা করিতে পারিলে, অর্থাৎ ক্ষোভ্য-ক্ষোভকের সমানুপাতিতার এক অজস্র

আকর (unfailing reserve) মিলাইতে পারিলে, জরা ন জিঘাংসতি—জরা হিংসা করিতে চায় না। নাদবাহিতার অবগাহনে এইটি সিদ্ধ হইতে পারে (continued immersion in the basic radiation stream)। বদ্ধপদ্মাসন, যোনিমুদ্রা, মহামুদ্রা, খেচরী প্রভৃতি এই যন্ত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রবাহগুলিকে ঐ মহীয়সী নাদবাহিতায় মিলাইবার নিমিত্তই।

গঙ্গাস্রোতোঽবরুন্ধান ঐরাবতোঽপি দূষণম্।
শম্ভোঃ শিরোজটাগ্রন্থি-বন্ধো ভোগী চ ভূষণম্॥২০৪

মন্দাকিনীর প্রবাহ অবরোধ করিতে স্পর্দ্ধা করিয়া সুরহস্তী ঐরাবত ভাসিয়া গেল, আর অশোভন স্পর্দ্ধার প্রতীকরূপে দূষণভাগ্য লাভ করিল। পক্ষান্তরে, ভোগী বা সর্প খল হিংস্র স্বভাব নিকৃষ্ট জীব বটে, কিন্তু সেও দেখ—শম্ভুর শিরোজটাজালে গ্রন্থিবন্ধনরূপটি ধরিয়া অপূর্ব দিব্য ভূষণই হইয়াছে। এখানে নিগূঢ়ভাবটি কি? মন্দাকিনী প্রবাহ=নাদবাহিতা; ইহা অনাহতা এবং অখণ্ডিতা। ঐরাবত=ইরাবৎ সম্বন্ধীয়। ইরা=ইলা-বেদপ্রসিদ্ধা ভারতী=বাক্। সুতরাং, ইরাবৎ=বাগ্‌বিশিষ্ট, যথা, স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণ। ইহা পূর্বালোচিত ঐন্দ্রী (ঐঁ = বাগ্‌ভব) শক্তির বাহন। ঐরাবত শব্দের আদ্যক্ষরেও এটি সূচিত। এখন, কোন নাম অথবা মন্ত্র ব্যাহরণে বর্ণ যদি অনাহত নাদকে অনুবৃত্তিতে (in congruent affiliation) ভজনা না করিয়া, পরাবৃত্তিতে (in cross-grained antagonism) ভজনা করিতে চায়, তবে সে প্রকার ব্যাহরণ দূষণরূপই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মন্ত্রাদির ব্যাহরণে কৃত্রিম স্বরকম্পনাদি (modulation) বর্জনীয়। নাদবাহিতার স্বচ্ছন্দ অনুবৃত্তিই লক্ষ্য হইবে। পক্ষান্তরে, হরজটাজালে বিন্দুলীনতা। নাদবাহিতারূপ দক্ষিণা গতিটিকে বামাগতিতে লইয়া (by reversing the vital current) এটি সাধিতে হয় বলিয়া, ভোগী হরজটাজালে গ্রন্থিবন্ধরূপে কল্পিত হইয়াছে; এবং সেটি ভুষণই। 'ভোগী' পদটি ব্যাকরণবিধিতে এক প্রকারে পাও; কিন্তু, 'ভোঃ গীঃ' (অয়ি বাক্!)—এভাবে কেহ বলিলেও 'ওরূপ হয় না, ওটা নেহাৎ কষ্টকল্পনা' ইত্যাদি বলিয়া আপন ইষ্টবিয়োজনটি ঘটাইও না। ইষ্টবিয়োজন সম্পর্কে এই কারিকাটিও ভাবনা কর—

সীতারামৌ বিযোজ্যৈব বিভেতি জিতভীষণঃ।
বিভীষণো যথাসন্ধি সংযোজ্য বীতভীষণঃ॥ ২০৫

'সীতারাম' অথবা 'সীয়ারাম' এ যুগ্মনামকে বিয়োজিত করিয়া, ভীষণ, কিনা, যমকেও জয় করিয়াছিলেন যে রাবণ, তিনি ভীত হইতেছেন; আর, বিভীষণ যথাসন্ধি সীতারামের সংযোজন সাধিত করিয়া মৃত্যুরহিত বা অমর হইতেছেন। এ স্থলে, সীতা=বিন্দুলীনতা, রাম=নাদবাহিতা। 'রাধেশ্যাম', 'গৌরীশঙ্কর', 'রাধাস্বামী' ইত্যাদি নামজপে, সঙ্কীর্তনে, ভজনে, আজানে, উক্ত যথাসন্ধি সংযোজনটি ঘটিতেছে কিনা, লক্ষ্য করিও। যুগলোপাসনার এও এক নিগূঢ়ভাব। মুরলীরবনিনাদিত যমুনাপুলিন নাদবাহিতা, এবং রহসি নিরালা নিকুঞ্জমিলনে বিন্দুলীনতা ভাবিয়া দেখিও।

দক্ষিণে ন দক্ষিণেয়মুত্তরস্যাং ন বোত্তরা।
দক্ষিণোত্তরগা সদ্যঃ শিবসাযুজ্যদায়িনী॥ ২০৬

বাক্‌রূপা গঙ্গা দক্ষিণে বহিয়া দক্ষিণা হন নাই, উত্তরেও উত্তরা হন নাই। পরন্তু, যখন দক্ষিণা হইয়া উত্তরগা (উত্তরবাহিনী) হইয়াছেন, তখন তিনি শিবসাযুজ্যমুক্তিপ্রদায়িনী হইয়াছেন। বিন্দু থেকে উদয়ের পর যে নাদবাহিতা, সেটি 'দক্ষিণা' (কুশলা, সমর্থা) হয় কি হইলে? যদি সেটি যথাযথ বিন্দুলীনতায় যায় (উত্তরগা), তাহা হইলেই। উদয়ে যে দক্ষিণাগতি, তার মুখে যে মেরু, তাকে যদি বল দক্ষিণমেরু, তবে বিন্দুলয়ের মেরুকে বল উত্তরমেরু, বা সুমেরু। অপরটি, এ প্রসঙ্গে, কুমেরু (এস্থলে 'কু'=বেদবাক্ ও ছন্দঃ)। অধ্যাত্মসাধনে যে সত্য উদাহৃত, সে সত্য বিশ্বে সার্বভৌমিক। অর্থাৎ, শক্তি-ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রেই নাদতায়ন এবং বিন্দুশায়ন পরস্পর বিযুক্ত হইলে সৃষ্ট্যাদি কোন সমর্থ ব্যাপারই ঘটে না। বৃষ এবং রেতঃ অবিনাভাবে যুক্ত হওয়া চাই। সমুদ্রবারি সূর্যকিরণে বাষ্পীয় বিন্দুরূপ হইবে, এবং সে বিন্দুও আবার তড়িদ্-বিন্দুগর্ভ হইবে, তবে মেঘরূপ বর্ষণকারী বৃষ দেখা দিবে, এবং তার বারিবিন্দু-বর্ষণে প্রাণিসৃষ্টি হইবে। এইরূপ অন্যত্র। এক বিশালপাদপ আপনাকে বীজাকারে সূক্ষ্ম না করা পর্যন্ত তা থেকে কুশল অভিনব সৃষ্টি হয় না।

জড়ের ক্ষেত্রেও অণুতে আসিয়া শক্তি নিজেকে ‘কেন্দ্রীণ’ না করা পর্যন্ত, বিশ্বে শক্তির কারবারে যথার্থ সমর্থ আকৃতিটি মিলে না। মানস শক্তি, বাক্ শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাই।

পূর্বে পর, পরাবর এবং অবর, এই তিনটি পর্বের কথা বলা হইয়াছে। এদের কথা ক্রমশঃ বিশদ হইবে। সংক্ষেপে—নিস্পন্দে মূলস্পন্দ (তপঃ) উদিত হওয়ারূপ আদিম অনির্বাচ্য ক্ষোভ্য-ক্ষোভকভাব, সেটি পরপর্বে আসিবে। তারপর, সে আধারে আবিঃ ও রাত্রি (ব্যক্ত এবং অব্যক্ত)-রূপ যে ভাব, সেটি পরাবর পর্বে; আর, অন্তে যে দ্যাবাপৃথিবী ভাবে ক্ষোভ্য-ক্ষোভকতা, সেটি আসিবে অবরে। যেমন, জপে বৈখরী-মধ্যমার অবর সন্ধিতে নাদমহাবৃষ অবররূপে আসেন; মধ্যমা-পশ্যন্তীর বরসন্ধিতে পরাবররূপে প্রকট হন; এবং পরাভূমিতে পর। নাদবাহিতা প্রদর্শনের নিমিত্ত যে তিনটি কারিকা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইল, তাদের প্রথমটি অবর, মধ্যেরটি পরাবর, এবং অন্তিমটি বর বা পর ভূমির সন্ধান দিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিও। প্রথমটিতে, জপধ্যানে কোন বর্ণ অথবা অর্থ, ঐরাবতের মত শুঁড়টি তুলিয়া নাদধ্যানবাহিতায় বাধা দিবে না; কোন বিষম স্বর অথবা ভাব শেলের মত প্রবিষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দ গতিটিকে ব্যাহত করিবে না। দ্বিতীয়ে, নাদতায়ন এবং বিন্দুশায়ন এ দুটি ‘যথাসন্ধি’ সংযুক্ত রহিবে, বিযুক্ত হইবে না। অর্থাৎ, সুষম চক্রটি পূর্ণ আকৃতিতে আবর্তন করিবে। তৃতীয়ে, পূর্বোক্তরূপে চলিতে চলিতে জপধ্যানধারা উত্তরগা হইবে, অর্থাৎ, শান্ত, অনাহত ভূমিতে যাইয়া, আপন আয়াসরূপ ত্যাগ করতঃ বিশ্রান্ত হইবে। ইহা জপধ্যানের বিরতি নয়, পরা পরিণতি।

২০। রেতসোঽগ্নীষোমত্বম্॥

ভুবনের যেটি রেতঃ, সেটি ‘অগ্নীষোম’—এই দ্বন্দ্বাকৃতি (Polar Pattern) বিশিষ্ট।

প্রাচীনেরা জগৎকে অগ্নি এবং সোম এ দুয়ের সম্মিলিতরূপ (অগ্নীষোমাত্মকং) বলিয়াছেন। এতে কি বুঝিব? বিশ্বে সর্বত্র দহন-পচন হইতেছে, আবার পূরণ-পোষণও হইতেছে, এইটি বলাই কি অভিপ্রায়? এই দুইটি বৃত্তি অবশ্য পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। জীবকোষাদির দৃষ্টান্তে বুঝিয়া লও। জড়ে radiation of Energy

এবং massing of Energy সাপেক্ষভাবে চলিতেছে। মনেও 'বৃত্তিরূপেণ' এবং 'স্মৃতিরূপেণ' এ দুটি ভাব ভাবিয়া দেখ। স্মৃতি বলিতে সংস্কার। ধর, হ্রীঁ বীজ। 'হ'কার মহাশক্তি ভাণ্ডার। 'রী' পূর্বোক্ত অগ্নিকর্মটি বিশেষভাবে সূচিত করিতেছে; আর চন্দ্রবিন্দু সোমকর্ম। গায়ত্রীতে 'বরেণ্যং' পদটিতে কর্মদ্বয়ের সমতা-সমন্বয় সূচিত হইয়াছে। হ্রীঁ বীজটিকে যদি মনে কর 'ভুবনস্য রেতঃ', তবে তাহাতে অগ্নীষোম যে কি আকৃতিতে পরস্পরে অন্বিত, তা দেখা গেল। বিশ্বভুবনে সর্বস্তরে ঐ মহাবীজটিকে অগ্নীষোমাত্মকভাবে চিনিয়া লইবে। অধিভূত স্তরটিকে বাদ দিও না। বর্তমান বিশ্বে যে Entropy বা running down-এর আকৃতি বিজ্ঞান পাইতেছে, সেটি এই নিমিত্ত যে, শক্তিসিঞ্চন এবং বিকিরণের সঙ্গে শক্তি-উন্নয়ন এবং শক্তি-সংগঠনের সমতাটি রক্ষিত হইতেছে না। সমষ্টি-ব্যষ্টি সর্বত্র এই সাধারণ লক্ষণটি (অগ্নীষোমীয় অনুপাত সমন্বয়াভাব) লক্ষিত হইতেছে। সর্বত্র balance sheet-এ deficitএর অঙ্কমুখ্যতা। বীজের ভাষায়—'ঈ'কার যে উন্নয়ন এবং ঊর্দ্ধপাতন কর্মে (বারাহীর দংষ্ট্রারূপে) ব্যাপৃত, সে কর্মে অধোহবরুন্ধানা শক্তির (lower plane co-efficient এ) আধিক্য ঘটিতেছে। Energy যে মাত্রায় low-level bound হইতেছে, সে মাত্রায় low-level free হইতেছে না। অধঃপাতনের আধিক্যে জিহ্ম-বক্রতার (intriguing intricacies) বিবর্দ্ধিষ্ণুতাও (aggravation) লক্ষিত হইতেছে। আপন ব্যক্তিজীবনেও আহারাদি সর্ব ব্যবহারে এটি বুঝিয়া লও। উপায়? গায়ত্রীর 'বরেণ্যম্'কে বিশেষভাবে বরণ করিতে যত্ন কর। হ্রীঁ বীজের যেটা unresolved lower momenta, সেটিতে, আবশ্যক স্থলে, ঐঁ বীজ দ্বারা সম্যক্ ঊর্দ্ধপাতনটি (high-value transformation) সমারম্ভন কর, এবং ক্লীঁ বীজ দ্বারা তার সমতা-পূর্ণতা (perfect sublimation) সমাপন কর। একা হ্রীঁ বীজই সমর্থ সন্দেহ নেই; কিন্তু অগ্নীষোমীয় সমতায় যদি ব্যতিক্রম দেখ, তবে পরের ঐ দুটি বীজের সহায় আবশ্যক হয়। কেবল, মন্ত্রের দিক্ দিয়া নয়, প্রাণ এবং ভাবের দিক্ দিয়াও এই তত্ত্বে ধ্যান দিও।

'ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমং'—এই আত্মরক্ষার যে বৈদিক মন্ত্র, তার তাৎপর্য যে কতখানি ব্যাপক ও নিগূঢ়, তা এ প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিও। যজ্ঞীয় বলি-বিধানে যে 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত', সেখানে 'পশুং' পদের মুখ্য ও গভীর ব্যঞ্জনা কোথায়? যে কোন শক্তিক্ষেত্র (Potential Field) থেকে শক্তিপাতন ও

প্রক্ষেপ হইতে গেলেই তাকে এক অবমপ্রবণতা (অধোগতা, অধোলীনতা ইত্যাদি) কাটাইয়া ঊর্দ্ধগা হইঁতে হয়। মঙ্গলগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এক রকেট্ ছাড়া হইল; কিন্তু আপন আরম্ভভূমির সংস্কার (Earth drag ইত্যাদি) কাটাইয়া তার ঊর্দ্ধগতি অব্যাঘাতে ঘটে না। সকল প্রারম্ভ তাই জড়তাদি দোষবহুল হয়। 'যথাব্রিয়তে বহ্নির্ধূমেন' ইত্যাদি। সমষ্টি-ব্যষ্টি বিশ্বে নিরন্তর যে অগ্নীষোমীয় যজ্ঞ চলিতেছে, তাতে অগ্নি ও সোমকে এক মহা সমন্বয়ে মিলাইয়া একটা perfectly balanced economy reach করার (গায়ত্রীর সেই বরেণ্যম্ যার সূচনা করে) প্রয়াস বিদ্যমান আছে সন্দেহ নেই। হংসবতী ঋকে সদ্ধাতুনিষ্পন্ন পদগুলি এবং জন্ধাতুনিষ্পন্ন পদগুলি মহা সমন্বয়ে সেই 'ঋতম্ বৃহতের' দিকেই দেখাইয়া দেয়। যাহা যাহা রহিয়াছে (সৎ), সোম তাদের পূরক ও পোষক; আর যাহা যাহা জাত হইয়াছে, অগ্নি তাদের প্রক্ষেপক এবং অঙ্কক। সোম রঞ্জক (রাজা); অগ্নি অঙ্ক। এই মৌলিক কথাটি পরে কারিকায় বলা হইতেছে। কিন্তু অঙ্কক-রঞ্জকের বৃত্তিতে একান্ত সৌষ্ঠব থাকা আবশ্যক—যেমন, রেখাচিত্রে এবং বর্ণচিত্রে। অগ্নি দিতেছে সব কিছুর magnitude, measure, form; আর, সোম দিতেছে, substance, quality, colour, অগ্নি নাদবৃষের অনুবৃত্তি করে; সোম করে বিন্দুরূপ রেতসের। এতদুভয়ের, অনুবৃত্তি-সুষমতাস্থলে সমন্বয়,-মহাসমন্বয়মুখী সমাবৃত্তি। বিষমতা স্থলে, ব্যাজ-বিঘ্নবহুল ব্যাবৃত্তি। সেটি পশু। তং পশুমালভেত। তাকে বলি দাও। তোমার শরীর, প্রাণ, মনে সর্বত্র এই ব্যাবৃত্ত পশুটি প্রবল রহিয়াছে। এটিকে জপধ্যানাদি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে বলি দাও—ত্যাগ কর—দূরে লও। 'আ' বা আকরণ দ্বারা সেটিকে লাভ কর (লভেত)। গায়ত্রীর 'প্রচোদয়াৎ' পদ-ব্যাহরণে এই আকরণটি সাধিতে হয়। 'নিরাকরণমস্তু'।

অগ্নীষোমীয়মেতদ্ধি সোমস্য চাধ্বনীনতা।
অধ্বনীনোঽগ্নিরঙ্কেত সোমো রজ্যেত চিত্রিতম্।
পঞ্চধা চাঙ্কনং বহ্নেঃ সপ্তধা সোমরঞ্জনম্॥ ২০৭

এ সমস্তই যে অগ্নীষোমীয়—ইহা তো বারংবার শ্রুত হইয়াছে। এর তাৎপর্য অনুধাবনে এ গ্রন্থে যত্ন হইয়াছে। বিশ্বে দ্বন্দ্বস্থ অগ্নীষোমকে বৃত্তিরূপে কি কি

আকৃতিতে দেখি? মূলতঃ, অগ্নির পরিচয়—'অধ্বনীন' আকৃতিতে। আর, সোম 'আত্মনীন'। এই দুটি পারিভাষিক শব্দে ধ্যান দিও। ঋতমের বা 'হংসের' যেটি অধ্ব, বর্ত্ম, মার্গ সেটিকে অঙ্কন ও বিস্তার করেন যে তত্ত্ব, তিনি অগ্নি—Designer and Tracer of True Power Path. দহনী, পচনী, বহনী, ব্যাপনী, দীপনী—পঞ্চধা আগ্নেয়ী শক্তি বৃত্তিমতী। এই পঞ্চতয়ী অভিব্যক্তির যে ঋতচ্ছন্দঃ তাতে বাধা দেয় যাহা, সমাবৃত্তিতে ব্যাবৃত্তি ঘটায় যাহা, তাকে 'পশু' বলা হইয়াছে। সে পশুকে বলি দাও। গায়ত্রী জপে 'বরেণ্যং' পদটি বলির আদি 'যূপ'। 'ধীমহি' মধ্যম, 'প্রচোদয়াৎ' অন্তিম যূপ। ভূঃ স্থানীয় পশু বলি আদিমে; ভুবঃ স্থানীয় মধ্যমে; স্বঃ স্থানীয় অন্তিমে। এগুলি সর্বক্ষেত্রে তলাইয়া বুঝিয়া লও। এই বলির 'রক্তে'ই অগ্নি ঐগুলি অঙ্কন করেন 'ঋতস্য পন্থাঃ'।

সোম আত্মনীন। শ্রুতি ক্বচিৎ 'আত্মন্বী' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। নিখিলাত্মা বিশ্বের সব কিছুতে বিন্দুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, তাদের নিজ নিজ অন্তরাত্মাও হইয়াছেন। এই অন্তরাত্মার যেটি সত্যচ্ছন্দঃ সেটির পোষণাদি করেন সোম—Nourisher and Developer of Essence or Being Power and Character. অগ্নি ঋতম্, সোম সত্যম্‌কে বিশ্বে সর্বত্র স্ব স্ব ছন্দে রাখিতেছেন। Being and Becoming, Persistence and Change, Rest and Movement—এ দুটিকে সমন্বিত করেন অগ্নীষোম। সোম সপ্তধা বৃত্তিমান্—ভাবনী, পোষণী, বর্দ্ধনী, স্থাপনী, সন্ধিনী, আপ্যায়নী, শমনী। অগ্নীষোমীয় এই ৫ × ৭ সংখ্যা ৩এর সঙ্গে গুণিত, আবার ৩এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া অষ্টোত্তর শত সংখ্যা হইয়াছে, লক্ষ্য করিও। ঐ তিনকে মহাব্যাহৃতিত্রয়, এবং অ, উ, ম এই অক্ষরত্রয়রূপে বুঝিয়া লইতে পার। অবশ্য অন্য ভাবও আছে। ধর, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশরূপ পশু। এ পশুকে কিভাবে 'আলভেত'? অধ্যাত্ম বহ্নিতে সোম সবন করিতেছ। অগ্নির পরমা দীপনী শক্তিতে অবিদ্যাকে বলি দাও; ব্যাপনীতে অস্মিতা (মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্); দহনীতে দ্বেষ, পচনীতে রাগ, এবং বহনীতে অভিনিবেশ। 'দহ দহ পচ পচ'। রাগের 'পাচন' সাধনটি বাউল সহজিয়া প্রভৃতির গানে লক্ষ্য করিও। অবিদ্যাকে 'বলি' দেয় অগ্নির যে দীপনী, সে দীপনী মিলিত হয় সোমের শমনী এবং আপ্যায়নীর সঙ্গে। ফলে জ্যোতীরস। ব্যাপনী মিলিত হয় বিশেষতঃ সন্ধিনী ও স্থাপনীতে, ইত্যাদি।

ধর, যে প্রচণ্ড আণবিক শক্তির বহিষ্কার বর্তমানে সম্ভাবিত হইয়াছে, তার দহনী ও ব্যাপনী রূপ বৈনাশিকী বৃত্তিদ্বয়কে আয়ত্তে আনিবে কি প্রকারে? তাতে সমর্থমাত্রায় সোমস্পন্দ সমন্বিত করা যায় কি উপায়ে, ইহাই সমস্যা। অণুমধ্য হইতে যে দহনী ব্যাপনী মারণস্পন্দসমূহ উৎসারিত হইতেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি (যাদের সাধারণ সংজ্ঞা আসুর দেওয়া যায়), সোমচ্ছন্দে অন্বিত (congruent) হবার মতো নয়। এদের elimination হওয়া চাই। এগুলি ব্যাহৃতি দ্বারা হেয়। অপর স্পন্দজাতিগুলি (wave-systems) উপাদেয়। জীবশরীরে খাদ্যপরিপাকের উদাহরণটিও মিলাইয়া লও। কাম এক মৌলিক আবেগ—Primal Urge and Energy—এতে সন্দেহ নেই। কামাগ্নির দহন, মথনাদি বিপ্লবী (প্রমাথী) ক্রিয়াগুলিকে সোমচ্ছন্দের প্রভাবে ও শাসনে আনা আবশ্যক হয়। অগ্নির পঞ্চধা 'অঙ্কন' এবং সোমের সপ্তধা 'রঞ্জন', এতদুভয়ের ব্যাহৃতি দ্বারা (by selective isolation of allied wave-systems) সমগ্র কামচিত্রকে সত্য, শিব, সুন্দর করিয়া ফোটাইয়া তুলিতে হয়। ফলে পেশীলালসা ঐশী লালসায় বিবর্তিত হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ বিবর্তনে, মূলবিচারে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক 'সহগ' (factor) সমবেতভাবে ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং অতি নিপুণভাবে এই অগ্নীষোমীয় বিবর্তন যাগটি সমাধা করিতে হয়। এও বলা হইয়াছে যে, সোমচ্ছন্দের সমর্থ বীজ ঐঁ, কামাদিকে পেশীমুক্ত করিতে উত্তম; ক্লীঁ বীজদ্বারা পূর্ণ ও শুদ্ধভাবে ঐশীযুক্ত হওয়া যায়। এটি কামবীজ। কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতি ঘটিয়া সুষুম্নামার্গ অপাবৃত না হওয়া পর্যন্ত কামের 'অজরায়ণ' এবং 'অমরায়ণ' প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হয় না। নীচের কারিকাদ্বয় ভাবনা কর।

শাখামৃগঃ শ্রয়ঞ্ছাখে কালব্যালেন মৃগ্যতে।
মূলব্যালং ভজন্ সোঽপি মৃত্যোর্মুচ্যেত মাহমৃতাৎ॥ ২০৮

একটা আজব তরু। তাতে দুটি শাখা। সেই শাখাদ্বয়ে এক শাখামৃগ (মর্কট) আশ্রয় করতঃ একবার এ শাখায়, আবার অন্য শাখায়—এইভাবে নিরন্তর লাফালাফি করিতেছে। আর, এক কালব্যাল তাকে দংশন করার সুযোগ খুঁজিতেছে। ঐ আজব

তরুর মূলদেশেও এক ব্যাল অথবা ব্যালী গুপ্ত বিবরে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। যদি ঐ কালব্যালতাড়িত শাখামৃগ কোন গতিকে কুণ্ডলীকৃতা মূলব্যালীর ভজনা করে, তবে সে মৃত্যু হইতে চিরতরে বিযুক্ত হয়, অমৃত হইতে কদাপি নয়। আজবতরু=দেহ। শাখাদ্বয়=বাম ও দক্ষিণ নাসা। শাখামৃগ=শ্বাসবায়ু। মূল=সুষুম্নামূল। এই মূলব্যালীর ভজনা ও প্রসাদ জাগৃতি না হওয়া পর্যন্ত অগ্নীষোমীয় যাগ সুষ্ঠু শোভনভাবে আরব্ধ হয় না। এ যাগে পশুবলির নিমিত্ত তিনটি মুখ্য যূপ—নাভি, হৃদয় এবং ভ্রূমধ্য। নাভিতে অগ্নির যে দহনী, পচনী এবং ব্যাপনী শিখাত্রয়, তারা ভ্রূ হইতে সোমসবনে পোষণী, ভাবনী, বর্দ্ধনী এবং স্থাপনী হউক্। অগ্নির বহনী এবং ব্যাপনী দ্বারা সোম দীপনী এবং পাবনী হউক্। আর উভয়ের শক্তির সঙ্গমস্থল হউক্—হৃদয়। হৃদয় হউক্—দীপনী, শমনী এবং আপ্যায়নীর সঙ্গমক্ষেত্র। কথা কয়টি এখানে আভাষে বলা হইল।

মৃষামৃগস্য মার্গাদ, বৈ সিন্ধুসন্ধিং সমাগতঃ।
শ্বসিত্যসেতুকো রামঃ সেতু রামেতি মারুতেঃ॥ ২০৯

দণ্ডকারণ্যে মায়ামৃগের মার্গ পরিহার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সমাগত হইলেন সিন্ধুসন্ধিতে—দাক্ষিণাত্য আর লঙ্কার মধ্যে যে প্রণালী তার কূলে। কিন্তু সেখানে তো সিন্ধুপারের সেতু নেই, তাই অসেতুক রাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন! কিন্তু পবনকুমার মারুতির পক্ষে কি হইয়াছিল? 'রাম' এই নামই তার সেতু হইয়াছিল। মায়ামৃগ=মিথ্যা শ্বাসকর্ম। সিন্ধু=নাদধ্বনি। সিন্ধুসন্ধি=অবর'সন্ধি, সুষুম্নার মুখ। মারুতি=নামনিষ্ঠ শ্বাস এবং নামরস-নিষ্ণাত প্রাণ। রাম স্বয়ং যে স্থলে উপনীত হইয়া 'কোথায় পারের সেতু' বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, সেখানে রামনামপরমপরায়ণ হনুমান্ রামনামেই সেতু মিলাইলেন। অকার এবং মকার (অগ্নি ও সোমের) মিলন ঘটাইলেন, নাদকে বিন্দুতে এবং বিন্দুকে নাদে মিলাইলেন; মারুতি=উবর্ণ। হৃদয়ে (অনাহতস্থানে) বায়ুবীজ (যং) রূপে ইনি 'ত' (দন্ত্য, বিচ্ছেদক) বর্ণ, যেন পরস্পর বিয়োগবিধুর 'সীতারাম'কে 'সীয়ারাম' করিয়া পরম সামরস্যে মিলাইলেন। অগ্নীষোমীয় যাগে অগ্নি ও সোম উভয়ের উভয়ে পূর্ণাহুতি সমাপন হইল। 'স' কারও দন্ত্য বটে, কিন্তু ঈকার প্রণবমূর্তি-রাম-

সমরস-সমর্পিত। 'ত'কারে বিচ্ছিন্ন তলবৃত্তিতার ('অপহৃতা' হবার) সম্ভাবনা আছে। শ্রীমদ্ হনুমান্ 'য'কাররূপে এটি পরিহার করিতেছেন।

সীতারামেতি বিদ্বাংসঃ সীয়ারামেতি চেতরে।
ব্রুবন্তীতি ব্রুবাণং মা ব্রবীর্বাঢ়মিতি ক্বচিৎ॥ ২১০

বিদ্বানেরা বলেন, 'সীতারাম', অন্যেরা বলে 'সীয়ারাম'—এরূপ যে জন বলে, তাকে 'হাঁ, ঠিক কথা' ইহা কুত্রাপি বলি ও না (মা ব্রবীঃ)।

২১। বৃষস্য মিত্রাবরুণত্বম্॥

বৃষের মিত্রাবরুণ এই আকৃতি (বিশ্বভুবনে) দৃষ্ট হয়।

বৃষকে নাদাদিভাবে বুঝিতে চেষ্টা হইয়াছে। বর্তমান সূত্রে আরও মৌলিক এবং সার্বভৌম আকৃতিতে বৃষ ভাবিত হইতেছেন। কারিকায় 'সহসোঽম্বুদঃ' এবং 'সহোঘনঃ' ('Dynamic cloud') শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে লক্ষ্য করিও। জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যেমন বর্ষণকারী মেঘ হয, তেমনি বিশ্বশক্তির (Cosmic Dynamism) একটা 'জমাট' আকৃতি পাইয়া তবে অভীষ্টবর্ষণকৃৎ বৃষ হইয়া থাকে। যতক্ষণ একান্ত বিভুপদার্থের (Absolute Continuum এর) একান্ত সমতাবস্থা (perfect homogeneous condition), ততক্ষণ, ঐ রেতোধা বৃষভাবটি সম্ভবে না। সহঃ বা সহস্ শব্দটি বিশ্বে কার্যকরী শক্তি (Energy) রূপে গ্রহণ করিয়া ভাবিয়া দেখ যে, চিত্তে, প্রাণে অথবা বহির্বিশ্বে কোথাও 'সহোঘন' অথবা 'সহোঽম্বুদ' (Energy Compact) —packing together of energy—না ঘটিলে কোন অভীষ্ট ব্যাপারই সংঘটিত হয় না। স্পন্দ অথবা wave pattern যদি মনে কর, তা হইলে স্পন্দের কোনপ্রকার গুচ্ছীকরণ (packing) আবশ্যক হয় বহির্বিশ্বে ইলেকট্রণাদির সম্ভাবনায়। পূর্বে ঈথারেও সেটি আবশ্যক হইত (যথা, 'vortex ring')। প্রাণ ও মনের ভূমিতেও দৃষ্টান্ত লইও। রেতস্‌কে যদি বল—concentrated, focussed Power, তবে এর উদ্ভবের নিমিত্ত দুটি ক্রমের অপেক্ষা থাকে—প্রথম, ঐ সহোঘন (packed) ভাব। যথা, Electric Condenser-এ। দ্বিতীয়, কেন্দ্রানুগ বিন্যাস। অর্থাৎ,

শক্তিরেখাগুলি কেবল যে জড়ো হইয়াছে এমন নয়, তারা সকলে কোন একটা 'মুখে' (sense) ঝুঁকিয়াছে। মনে এইটি একতানতা। একে mass pointedness বলিতে পার। পরিণামে 'ধর্ম্মমেঘ সমাধি'। এটা এক Cosmic Principle, ব্যাহৃতির ভাষায়—রেতঃ=স্বঃ বৃষ=ভূঃ। আর, অগ্নীষোমীয় এবং মিত্রাবরুণ এ দুটি আকৃতি হইল ভুবঃ। এখন, মিত্রাবরুণের কথা বলা হইতেছে। তৎপূর্বে ভূমিকারূপে এই কারিকা কয়টি চিন্তা কর—

অগ্নিরেতা অসৌ সূর্য্যঃ সোমরেতাশ্চ চন্দ্রমাঃ।
বরেণ্যং ধীমহি দ্বন্দ্বে ভর্গো হিরণ্যরেতসঃ॥ ২১১

সূর্য অগ্নিরেতাঃ, চন্দ্র সোমরেতাঃ বলিয়া কথিত হন। অধ্যাত্মাদি সকল দৃষ্টিতে এই অগ্নিরেতাঃ এবং সোমরেতাঃকে চিনিতে যত্ন করিবে। পিঙ্গলা এবং ইড়া নাড়ীদ্বয়ে এ দুয়ের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। বীজাদির জপে এই দ্বন্দ্ব অগ্নিমাত্রা এবং সোমমাত্রার দ্বন্দ্বরূপে উপনীত হয়। প্রাণের ভূমিতে একদিকে প্রাণাপানবৃত্তি, অন্যদিকে সমানব্যানবৃত্তি, এ দুয়ের মাঝে দ্বন্দ্বস্থতা থাকে। চিত্তে বিদ্যা-শ্রদ্ধা একদিকে, আর উপনিষৎ অপরদিকে, (ভাব ও ভাস) এ দুয়েও সেইরূপ। শরীরে যে vital metabolism চলিতেছে, তার anabolism এবং catabolism এই দুই পক্ষে দ্বন্দ্ব। জড়েও আছে, সমাজ, কৃষ্টি, সভ্যতা—এ সবেও সূর্যসোমের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের বিষমতায় (antipathyতে) সর্বত্র বৈরূপ্য-বৈগুণ্য। সুষমতায় আনাই সাধন। সুষমতায় আনয়নের যে ঋতমার্গ তার সাধারণ সংজ্ঞা সুষুম্না। সুষুম্না সমাশ্রয়ে অগ্নীষোম সুষমতায় আসিলে অগ্নিরেতাঃ এবং সোমরেতাঃ-র মহাসমন্বয়ি ছান্দসরূপ—'বরেণ্যম্', এবং তৈজস আকৃতি (ভর্গঃ) হিরণ্যরেতাঃ। 'বরেণ্য' এবং 'হিরণ্য' শব্দ দুইটি লক্ষ্য করিও। পূর্বটিতে 'ব' এবং 'এ', আর, শেষেরটিতে 'হ' ও 'ই' ধ্যান করিও। তাতে ছান্দস এবং তৈজস দ্বিবিধ সম্পদে সম্পন্ন হইবে। স্বাহা স্বধা মিলিত হইবেন। অগ্নিরেতাঃ এবং সোমরেতাঃ—এ দুটিকেই হিরণ্যরেতসে না মিলাইতে পারিলে ভগবান্ সনৎকুমারাদির মত ঊর্ধ্বরেতাঃ হওয়া যায় না। কামজয়ের নিমিত্ত তাই হিরণ্যরেতসের যে ভর্গঃ (জ্যোতীরস), সেটিকে ধ্যান করিতেই হইবে। সহজ পথ নাই। জ্যোতীরস হিরণ্যরেতসের দ্বারা বিশেষভাবে উপলক্ষিত।

মুনিনামপি চেতাংসি বিদাহিনং বিদাহিনে।
নমঃ শান্তায় রুদ্রায় ভালাগ্নীষোমধারিণে॥ ২১২

মুনিজনেরও চিত্তবিদাহী যে মন্মথ, তাকেও বিদহন করেন যিনি, সেই রুদ্র ও শান্ত, ললাটে অগ্নীষোম এতৎ উভয়কে ধারণকারীকে নমস্কার। এখানে ভালে হিরণ্যরেতঃ। কেবলমাত্র অগ্নির দহনে (যথা, 'হুঙ্কারেণৈব ভস্মসাৎ' করতঃ) কামকে জয় করা যায় না। সে কাম আবার রক্তবীজ আকৃতিতে দেখা দিয়া থাকে। তখন তাহাকে জিহ্বায় রাখিয়া (অর্থাৎ নাম-বীজাদি জপে) খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে হয়, এবং তার রক্ত স্বয়ং 'পান' করিয়া ফেলিতে হয়। রসনায় ছেদনের ফলে রক্তবীজ হয় বীজরক্ত। 'রক্ত' শব্দটি 'রন্জ্'ধাতু হইতে; সুতরাং, বীজরক্তে 'রঞ্জক' যে সোমরাজা, পবমান যে অমৃত, সেই প্রাণের রক্তই পান করিতে হয়। যে নাম অথবা বীজ গ্রহণ করিতেছি, তার মধ্য হইতে পরম শমনী ও আপ্যায়নী প্রাণরসধারা যতক্ষণ প্রবাহিত না হইতেছে, এবং সেটি (সোম) আবার যতক্ষণ না খড়্গের (অগ্নি) ব্যাপনী এবং দীপনী ভর্গোদ্যুতিতে সমুজ্জল না হইতেছে, অর্থাৎ যতক্ষণ নামে অগ্নীষোম শোভনসমন্বয়ে মিলিয়া সাক্ষাৎ হিরণ্যরেতস্ না হইতেছে, ততক্ষণ রক্তবীজ (Vital Seed, Basic Biological Urge) কিছুতেই পূর্বকথিত বীজরক্তে বিবর্তিত হইয়া একাধারে ব্যাপনী-দীপনী এবং শমনী-সন্ধিনী-আপ্যায়নী উর্দ্ধগা শক্তি হইতেছে না। রিরংসা ততক্ষণ 'রাম-নাম-অভিলাষা' হইবে না। রিরংসারসকে রক্তবীজের পর্যায়ে ফেলিয়া এটি ভাবনা কর। রসনায় (এবং মনেপ্রাণে) জপাস্ত্রদ্বারা রক্তবীজ বীজরক্ত হইলে, তবে যথার্থ এবং সমর্থভাবে, ক্লীঁ এই কামবীজের উদ্ধারটি হয়। তৎপূর্বে 'ক' ও 'ল' এই বর্ণে কামকেলি বীজই মিলিয়া থাকে; এবং সেটিকে ভোগাদিদ্বারা ছেদনে সে 'শতশোঽথ সহস্রশঃ' বর্দ্ধমানই হইয়া থাকে।

রক্তবীজঃ ক্ষরন্ ব্যাপ্তো বীজরক্তস্তু জিহ্বয়া।
খড়্গেনোৎসারিতং তেজো ভর্গস্তৎ পিবতামৃতম্॥
বিন্দুচ্ছিন্নঃ পতন্ রক্ত-বীজো ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে।
খড়্গচ্ছিন্নঃ স নাদস্তু পীযূষং বিন্দুপায়নাৎ॥ ২১৩-২১৪

রক্তবীজ ক্ষরিত হইয়া (as quantum radiation) সর্বতো ব্যাপ্ত হইল। জলে একবিন্দু তৈল পড়িলে যেরূপ হয়। ফলে, রক্তবীজ=কাম যদি বল, তবে সে কাম সর্বেতোব্যাপি আণবরূপ ধারণ করিল। অর্থাৎ, কেবল স্থূলে নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মেও কাম (as Basic Desire) আপনাকে ব্যাপ্ত করিল। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে পজেটিভ্ নেগেটিভ্ পরস্পরে কামী হইল; সূক্ষ্মে chemical affinity; ইত্যাদি। কিন্তু জিহ্বা দ্বারা, অর্থাৎ, জিহ্বার আধারে, এটি বীজরক্ত হইল। এখানে, জিহ্বা=রসনা=সমস্ত কিছুতে রসচেতনা। সবের বীজে (হৃদি এবং হৃল্লেখায়) যে রস আনন্দরূপে নিগূঢ় বিদ্যমান, তার তল্লাস তো কৈ এ চটুল রসনা দেয় না! নামাদি জপাস্ত্র দ্বারা তাকে ছেদন করতঃ তা থেকে উৎসারিত যে তেজঃ, সে তেজঃকে 'অমৃতং ভর্গঃ' রূপে পান কর (পিবত)। ছেদ=বিষম বিচ্ছিন্ন স্পন্দপ্রতিষেধ পূর্বক সুষমাখণ্ড স্পন্দ বাহিতা (নাদ) সৃষ্টি।

আগের কথাটা আরও খুলিয়া বলা হইতেছে। বিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন যে নাদ (অর্থাৎ, আপন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপের সাথে সংযোগ রাখে না, কেবল ব্যক্ত স্থূলভাবে চলে যে নাদ), সেটি আপন স্থূলতাবশতঃ নিজেই বিচ্ছিন্ন বিন্দু বিন্দু রূপে পতিত হয়। এই জন্য উদিত নাদকে বিন্দুবিলীন করিবার সাধনটি সুষ্ঠুভাবে সাধিতে হয়। ঐরূপ বিন্দুচ্ছিন্ন নাদ (ভোগের দ্বারা কামের মত) 'ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে'। এবং এই প্রকারের নাদ বাহ্যতঃ cosmic quantum radiation-এর রূপ ধরে, ঋণাত্মক হয়, সোমের সাথে আপূরণাদি সঙ্গতি রাখে না। জড়বিশ্বে Cosmic Rays সম্ভবতঃ এবম্বিধ বিন্দুচ্ছিন্ন নাদের প্রকাশ। কিন্তু এটিকে খড়্গচ্ছিন্ন কর—যাতে এর অন্তর্নিগূঢ় সোম (স্বধা) পবমান হয়, সে উপায়টি ধর। তোমার অধ্যাত্মজীবনে কামাদি জয়েও সেটি কর, বহির্বিশ্বেও সেটি ঘটিতে দাও। বিন্দুপায়নে (অর্থাৎ সব কিছুর হৃৎ যে আনন্দ, তাতেই—নিখিলাত্মাতেই—সব কিছুর সবনে) কাম হউক্ নাম, নাম হউক্ নাদ; এবং নাদ হউক্, নাদবিন্দুকলারূপা আনন্দ পীযূষবাহিনী পরমা পাবনী ত্রিবেণী।

নাদবৃষের 'মিত্রাবরুণ' আকৃতি মেলান, যে কেন আবশ্যক, এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত—বোধের ভূমিকারূপে—পূর্বোক্ত রহস্যকারিকাগুলি সন্নিবেশিত ও ব্যাখ্যাত হইল।

'বিন্দুচ্ছিন্ন' কথাটার দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা। (১) বিন্দুবিন্দু আকারে ছিন্ন (corpuscular or quanta dispersion)। (২) বিন্দু—শক্তিঘনকেন্দ্র 'Origin'—হইতে বিচ্ছিন্ন

(unconvergent scattering, unrooted ramification) বিক্ষেপণ। 'খড়্গচ্ছিন্ন' কথাটার দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা। খড়্গ—পশুপাশচ্ছেদক=releaser of intertia bondage or of lower grade momentum, যে কোন শক্তি পূর্বোক্তরূপে বিন্দুচ্ছিন্ন হইলে,—divergent, unrooted and mutually interfering dispersion-এর ফলে—তার inertia (অস্বতোবৃত্তিমত্ত্ব বা জড়ত্ব) বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকে, এবং mass-এর আড়ষ্টতা বাড়ার ফলে তার momentum value (বাস্তব বেগমান) ক্রমশঃ নিম্নগ (lowering) হইতে থাকে। তার ফলে, ব্যষ্টিতে এবং বিশ্বে 'running down'—অপক্ষীয়মাণতা; এইটি সাধারণভাবে শক্তির 'পশুপাশ'। একে কাটাও—পশুপাশ খড়্গচ্ছিন্ন করিয়া লও।

এটি সম্ভাবিত হয় দুই আকৃতিতে—মিত্র এবং বরুণ।

বেদাদিতে 'মিত্র' মুখ্যতঃ আধিদৈবিকভাবে ভাবিত হইয়াছেন বটে, 'বরুণ'ও তাই। মিত্র=সূর্য, বরুণ=আকাশ অথবা সলিল, ইত্যাদি সমীকরণও কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু অগ্নীষোমের মত মিত্রাবরুণকেও সার্বভৌমিক তত্ত্বমিথুন (bi-polar Cosmic Principle) ভাবেই দেখিতে হইবে। 'বিন্দুচ্ছিন্ন' (disaffiliated from the mother stock or origin) হইলে যাহা হয়, তাহা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। সে 'অনর্থ'টি কাটাইতে গেলে, দুইটি প্রতিপ্রয়োগ আবশ্যক হয়। শক্তিস্পন্দসমূহ এলোমেলো তাল-পাকানো (irregular and confused) হইলে, প্রথমে তাদের মাঝে একটা 'বাছাই' ও ছাঁটাই করিতে হয়। পূর্ব শতকে Kinetic Theory & Gases-এর গবেষণায় Maxwell পরিকল্পিত সেই Sorting Demon (বাছাইকারী ভূত)-এর স্মরণ কর। সে কি করে? সমান অথবা সমানুপাতী স্পন্দগুলিকে সে বাছিয়া আলাদা করিয়া দেয় বিষম ও বিসদৃশ স্পন্দসমূহের জটলা থেকে। বিশ্বে সর্ববিধ সংহত ও সমর্থ ক্রিয়ায় এইটি আবশ্যক হয়, নয় কি? জপাদি সাধনে তো বিশেষ করিয়া। যে স্পন্দ শ্রেণিগুলি অভীষ্ট ও অনুকূল (ally=মিত্র), তাদের অরাতি পাশ হইতে মুক্ত করিয়া (খড়্গচ্ছিন্ন করিয়া) আলাদা করিয়া জমাট বাঁধিতে দিতে হয় (প্রত্যাহার-ধারণা)। এইটি বেদমন্ত্রের সেই 'সঙ্গচ্ছধ্বং' ইত্যাদি। যেখানে কোন অণু, স্ফটিক (crystal) অথবা জীবকোষ নির্মিত হইতেছে, সেইখানেই এই 'রাতিরায়ঃ'টি (compact potential field of allied functions) আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্ত লইয়া চিন্তা কর। এইটি

হইল—মিত্র। বহির্বিশ্বে সূর্য, অণুবিশ্বে নিউক্লিয়াস্—এই প্রকার মৈত্র-সম্ভূত, এবং তার প্রতীক। কারিকায় এটিকে 'সহোঘন', 'সহসোঽম্বুদঃ' করিয়া দেখান হইয়াছে। এই হইল একরূপ প্রতিপ্রয়োগ।

অপরটি 'বরুণ'। মূলতঃ বরুণ আকৃতি=free, unbounded, homogeneous field. 'বরুণ' (বর্+উ+ণ) এই শব্দেই যথাক্রমে ঐ তিনটির আকৃতি আছে। শব্দটি উচ্চারণ ও চিন্তন করিয়া দেখ। ধর, কোন শক্তিগুচ্ছকে ঐরূপ মৈত্র আকারেই মিলাইতে পারিয়াছ। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? যে আধারে এবং যে পরিবেশে তোমার মিত্রটি ক্রিয়া করিবে, সে আধার এবং পরিবেশ যদ্যপি মুক্ত না হইয়া রুদ্ধ হয়, উদার ও অসীম না হইয়া সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হয়, সুষম না হইয়া বিষম হয়, তবে? পূরাপূরি এরূপ আধার তোমার মিত্রটির ভাগ্যে মিলে না বটে, কিন্তু তোমার বহমানতা পবমানতার প্রবাহপথটি সিন্ধুগামিনী সরিতের মত ক্রমশঃ উদার, উন্মুক্ত, গভীরের পানেই হইবে তো? বীজটি পুঁতিয়া তাতে জলও দিলে; কিন্তু আকাশে জলীয় বাষ্পের, তাপের, আলোকের যে মহামণ্ডলটি রহিয়াছে, সেটিকে আধাররূপে না পাইলে কি করিবে? আপন জপধ্যানাদিকেও এক পরম করুণাবরুণালয়ের রসে নিয়ত জীয়াইয়া না রাখিতে পারিলে, তোমার সাধনবল্লীটি শুকাইতে কতক্ষণ? অন্য সব ব্যাপারেও এটি চিন্তা করিয়া দেখ। এই নিমিত্ত আবশ্যক—'শং নো মিত্রো বরুণঃ', নয় কি? সুতরাং নাদরূপী বৃষ, বৃষভ এবং মহোক্ষঃ (বা মহোক্ষা)—এই দুই মিথুনাকৃতিতেই বিচরণশীল হওয়া চাই। একদিকে যেমন collected converged compactness চাই, অন্যদিকে তেমনি আবার open unrestricted radiability-ও চাই। স্বচ্ছন্দ, সমর্থ নাদের এই যুগ্ম অভিব্যক্তি সর্বক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক। কেহ ধর একান্তে রহিয়া আপন যন্ত্রটিকে নাদশক্তিতে আপূরিত করিয়া যাইতেছেন; এটি মিত্র। কিন্তু সে সঞ্চিত, সমৃদ্ধ নাদশক্তির বহমান-পবমানতা ব্যাহত, অবরুদ্ধাদি হইলে চলে না। সেটিকে এক অব্যাহত অকুণ্ঠ, সামগ্রিক আধারও মিলাইতে হয় আপন চরিতার্থতার জন্যই। এ ভূমিতে 'শুধু আপন কাজটুকু করিয়া খালাস' বলিয়া কিছু থাকে না। 'মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'। কাজেই, তোমার যন্ত্রটি যাতে আপূরিত, সেটি হয় 'আপূরিতদিগন্তরম্'। 'হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।'

এই মিত্রাবরুণ আকৃতিতে রহিবে বলিয়াই অণু থেকে বিরাট পর্যন্ত সমস্ত কিছুই

সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ—একটিবার নিজেকে যেন জড়ো জমাট করে, আর একবার নিজেকে ছড়াইয়া মেলাইয়া দেয়। কিন্তু ব্যাপারটি প্রাকৃতিক হইলেও, এতে বাধা ও ব্যাঘাত ঘটিতেছেও সর্বত্র। অবাধিত, অব্যাহতে আনার নিমিত্ত—'শং নো মিত্রো বরুণঃ'। তালব্য মহাপ্রাণ 'শ' মূর্দ্ধন্য এবং দন্ত্য (ষ ও স) এই দ্বিবিধ মহাপ্রাণকে অন্যোন্যসম্পর্কে কুশলে রাখিবার নিমিত্ত হয়—শং। শং হইল বিশ্বকুশল মৌলিক শব্দরূপ। ইহা থেকে শান্তি। এই 'শং' বা 'শান্তিঃ' ঠিকভাবে ব্যাহৃত হইলে মহাপ্রাণভূমিতে কুশল ও শান্তির যেটি স্বভাবস্পন্দ সেটি চালু করিয়া দেয়। 'Peace' প্রভৃতি অন্য শব্দের দ্বারা সেটি সেভাবে ঘটে না। মিত্রাবরুণ ঐ দুই স্বাভাবিক শব্দে স্বভাবেই ক্রিয়াশীল হন। 'শমে'র মত গম্ বা গং (এবং তার উর্জিত রূপ ঘং) যে মহাপ্রাণভূমিতে কি সূচনা করে, তা আমরা আগে 'সুগন্ধিং' এবং 'গঙ্গা' এই দুইটি শব্দ লইয়া ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছি। সর্ববাদ্যময়ী যে 'ঘণ্টা' তাতেও 'ঘং' ধ্বনিটি প্রবিষ্ট। পূজারতির সময় ছন্দোবদ্ধ যে ঘণ্টাধ্বনি, তাতে অভিনিবেশ রাখিয়া এই 'গং ঘং' রূপী নাদবৃষের মিত্রাবরুণ আকৃতিটি অনুভবে পাই।

ক থেকে প পর্যন্ত পাঁচটি বর্গ। লক্ষ্য কর যে, প্রতিটি বর্গে আদ্য দুটি বর্ণে বর্ণরেতঃ অগ্নিমুখ্য হইয়াছেন, আর অন্তিমবর্ণে সোমমুখ্য। মাঝের দুটি বর্ণে বর্ণনাদ মিত্রাবরুণ হইয়াছেন। পাঁচটি স্পর্শবর্ণের বর্গ এই ভাবে যেন নাদবিন্দুরূপী ব্রহ্মের নিত্য বাঙ্ময়ী আরতি করিতেছে। তন্মধ্যে, গং ঘং হইল ঘণ্টার অনুদাত্ত ধ্বনি; জং ঝং হইল কাঁসর ধ্বনি; ডং ঢং ঘণ্টার উদাত্তধ্বনি; দং ধং মৃদঙ্গ, এবং বং ভং (বম্‌ভম্) শঙ্খধ্বনি। এই পঞ্চধা মঙ্গল ভৈরবধ্বনি করিতেছেন নাদবৃষ। ইহাতে প্রপন্ন হও। এতদর্থে নীচের কারিকাদ্বয় চিন্তন করিও—

ক্ব বহ্নিঃ ক্ব চ বা সোমো বিদ্ধীত্যক্ষররেতসঃ।
প্রকল্পয় তয়োর্দীপমারত্যৈ মধুনো গিরাম্॥
অনুদাত্তমুদাত্তং বা বর্ণঘণ্টাং ক্ব নাদয়েৎ।
কাংস্যণ্চাপি মৃদঙ্গাঞ্চ শঙ্খং স্পৃঙ্ নাদবর্চ্চসে॥ ২১৫-২১৬

অক্ষররেতঃ কোথায় অগ্নি, কোথায় বা সোম, সেটি অগ্রে জান। প্রণব, হ্রীঁ, ঐঁ ইত্যাদি সর্ববিধ বীজ বা নাম জপেই এটি জানা আবশ্যক। জানিয়া কি করিবে? শ্রুতি

যাঁকে নিখিল বাকের রস বা মধু বলিয়াছেন, তাঁরই আরতি করিবে তোমার শোভন, সুষম অগ্নীষোমীয় দীপে। একি মৌনারতি? না, এ আরতি মঙ্গল ভৈরব নাদমুখর ভারতী আরতি। এ আরতিতে কোথাও মন্ত্রবর্ণকে ঘণ্টারূপে, কখনও উদাত্ত, কখনও বা অনুদাত্ত করিয়া বাজাইবে, তা বুঝিয়া লও। কাংস্য, মৃদঙ্গ, শঙ্খ—এ সবই বা কোথায় মিলাইবে তা ভাবিয়া দেখ। যে নাদবর্চ্চঃ—নাদজ্যোতিঃ অথবা নাদব্রহ্ম—কৃপাকরতঃ তোমার স্পর্শের সন্নিকটে আসিয়াছেন, তাঁরই অভিনন্দনে তোমার আন্তর স্পর্শবীণার এই অপূর্ব ঝঙ্কার মহোৎসব, তা কি জান? কারিকায় 'স্পৃক্' বা স্পর্শকৃৎ শব্দটিতে বিশেষ ধ্যান দিও। ককারাদি স্পর্শবর্ণ স্থূলভাবেও আছে বটে। এইবার, বর্তমান সূত্রের কারিকা—

> বর্ষতি বিশ্বরেতাংসি মহোক্ষঃ সহসোঽম্বুদঃ।
> নাভৌ মিত্রঃ সহো গাঢ়ং ব্যাপকং বরুণং সহঃ॥
> ন্যাসবিন্যাসসম্বন্ধো বীজং বিতনুতে বহিঃ।
> বৃত্রাহী যদি বাধেতে সহঃ সূনুর্বিদারয়েৎ॥ ২১৭-২১৮

মহোক্ষঃ=নাদরূপী মহাবৃষ। সহসোঽম্বুদঃ=এটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দুই দিকে দুই সকার মধ্যে হকার—সহস্ রহস্য শব্দ, বেদে বারবার উক্ত হইয়াছে। আকৃতিটি পরীক্ষা করিও। সিঞ্চিত শক্তি সঞ্চিতে (potential reservoir-এ) প্রবিষ্ট হইয়া পুনশ্চ তাহা হইতে সিঞ্চিত হইতেছে। সর্বস্থলেই বিশ্বশক্তিক্ষেত্রে এই আকৃতিতে ব্যাপারচক্র আবর্তিত হইতেছে। অম্বুদ বা মেঘে এই আকৃতিটি সুস্পষ্ট। কিন্তু এক বিশেষভাবে—সহোঘন। এই বিশেষ রূপটি না হইলে বিশ্বরেতঃ বর্ষিত হয় না। এই জন্য, এটি প্রতীক। কৃপাঘন, করুণাঘন ইত্যাদি রূপে ইনি সাধক শিষ্যের আধারে বীজ বর্ষণ করেন। লব্ধ বীজ অথবা নামেও এই সহোঘনটিকে (নবনীরদবরণী অথবা বরণকে) দেখিতে চাও।

কিন্তু যে শাক্ত বা বৈষ্ণবচক্রের কথা হইল ('সহস্' এই আকৃতিতে। সেটিকে নাভিরূপে ঘনীভাবে এবং অরাদিরূপে বিস্তারে লইবার একটা তপঃ বা মূল প্রেরণা 'সহসে' অভিব্যক্ত হয়। নাভিপ্রবণতায় মিত্র (সহোগাঢ়ং), আর, ব্যাপ্তিপ্রবণতায় বরুণ

(এই শব্দে উরুবৃত্তি লক্ষ্য কর)। এ দুইটি প্রবণতায় সৌষম্য (harmony) থাকা আবশ্যক। সৌষম্যে বৈরী মুখ্যতঃ দুইটি—বৃত্র ও অহি (সাঙ্কেতিক শব্দ, পূর্বে ও পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। এই সৌষম্য-বাধকদ্বয়কে বিদারণের নিমিত্ত চাই সহসের অপর এক নিরতিশয় নিবিড় আকৃতি—বজ্র। (যথা, জড়ে আণবনাভি বিদারণে নিউট্রন বোম্বার্ড্মেন্ট, ইত্যাদি; অধ্যাত্মসাধনেও যথাস্থলে উপযুক্ত বজ্র আবশ্যক)। এই বজ্র ধারণ করেন, যিনি বেদে 'সহসঃ সূনুঃ'—ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। 'সূনু' শব্দটিও ধ্যানযোগ্য। নানা প্রকারে এটি হইতে পারে। সূ+নু—যেটি নিখিলের সবিতা বা প্রসবিতা, সেটিকে যদি বল 'সূ' তবে তাতেই অনুবৃত্তি (নু) করে অথবা তাতেই অনুগত যাহা সেটি সূনু। সূনু=in affiliation to Creative Power. এই affiliation বা কৌলিকত্বটি কুলীনত্বরূপে ধারণ করে 'স্বধা' এই বীজ, 'কৌল'রূপে বিস্তার এবং বিকাশ করে 'স্বাহা'। কাজেই এই বীজদ্বয়ের সঙ্গেই 'সূনু' শব্দটিকে গোড়ায় গিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। অথবা, সূ=প্রজাপতি হইলে, 'নু' প্রজাপতির সর্বাধিপতিত্বের যে প্রশাসন তাতে অন্বিত, অনুগত 'কুলক্রম' বুঝাইবে। এইবার 'সহঃসূনু'=ইন্দ্র, এই সমীকরণটি চিন্তা করিয়া দেখ। ইন্দ্র বলের দেবতা।

আগের সূত্রদ্বয় ব্যাখ্যায় সবিস্তার করা হইল। অগ্নি, সোম; মিত্র, বরুণ;—এই চারটি আকৃতি পরীক্ষা করা হইল। বিশেষভাবে, এ আকৃতি-চতুষ্টয় হইল—দীপনী, শমনী, ঘননী; ব্যাপনী। ভাবান্তরে, প্রথম দুটিকে অঙ্কনী ও রঞ্জনী বল, আর পরের দুটিকে আহরণী ও বিকিরণী বল (অথবা, আকুঞ্চনী ও প্রসারণী)। এগুলি অবশ্য মুখ্যত্বব্যপদেশকরতঃ বলা হইল; অর্থাৎ, অগ্নি বলিতে দীপনী, সোম বলিতে শমনী, ইত্যাদি বিশেষ করিয়া উদিত হয়। অগ্নিতে ব্যাপনী, সোমে পোষণী, ইত্যাদি তো আছেই।

২২। মিত্রাগ্নিসঙ্ঘাতাৎ সূর্য্যঃ॥

(পূর্বালোচিত) মিত্র এবং অগ্নির সংহতির ফলে সূর্য।

সূর্য—The Sun অথবা জড়পিণ্ডরূপে এ প্রসঙ্গে ভাবিত হন না। সূর্যকে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর 'আত্মা' রূপে ধ্যান করা হইয়াছে। 'প্রত্যক্ষ ভগবান্', 'প্রকট ব্রহ্ম', 'হংসঃ শুচিষৎ', ইত্যাদিরূপে সূর্যের মহিমা কীর্তনে বেদবাণী ক্লান্ত হয়েন নাই।

সৌরোপাসক, সৌরমন্ত্রতন্ত্রাদিও বহুমান্য। সূর্য্য=আদিত্য=প্রাণ=ব্রহ্ম, এই সমীকরণটিও প্রসিদ্ধ। আদিত্যহৃদয় এবং অপরাপর স্তবকবচাদিতে সূর্য নানা রহস্য নামে এবং ব্যঞ্জনায় কীর্তিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে 'ত্রেধা নিদধে পদং', 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং', 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং' ইত্যাদি বেদমন্ত্রও অনেক পাশ্চাত্য এবং এদেশী পন্ডিতদের কর্ণে Solar Myth-এর বাণীই শুধু বহন করিয়াছেন।

কিন্তু আসল তত্ত্বটা কি?

'সহস্' এই শাক্তী আকৃতিটিকে অগ্নি ভাবনা কর। সিঞ্চিত শক্তি (radiated energy) সঞ্চিতে 'কুক্ষিস্থ' হইয়া (as static reserve energy), পুনশ্চ নানাভাবে নানাদিকে সিঞ্চিত হইতেছে—ইহাই যে 'সহস্' আকৃতি, তা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সকারের হকারে প্রবেশের মুখে এক মেরু, আবার হকার থেকে সকারের বহিঃক্ষেপে আর এক মেরু। মেরু হইল সেইস্থল, যেখানে কোন ক্রিয়া তার 'মোড়' (sense) বদল করে। এই মেরুদ্বয়ের প্রথমটিকে মিত্রমেরু, আর অপরটিকে অগ্নিমেরু বল। কোন অব্যক্ত মহান্ উৎস হইতে শক্তি সিঞ্চিত হইয়া যেন গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ হইতেছে; প্রসারিত শক্তিলেখ যেন আপনাকে সঙ্কুচিত, সমাহৃত, সংহত করিয়া লইতেছে। এই প্রকার ঘন, গাঢ়, সান্দ্র, নিবিড়, অথচ, সংহত-সুষম রূপটিকে মিত্র বলা হইয়াছে। সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এই চারিভাবেই গাঢ়-সংহত (compact) এবং সুষম (congruent) মিত্র রূপটি পাইবার পর ঐ শক্তিভাণ্ডার (হকার) আপনাকে অগ্নিরূপে সুষম সমর্থ ছন্দে বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কর্মে নিয়োজিত করিতেছে। অগ্নি তাপনী, দীপনী, দহনী, বহনী, ব্যাপনী সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সকল কেবলমাত্র স্থূল ভৌতিকার্থে লইও না। পূর্বোক্তরূপে মিত্রাগ্নি সহযোগে যেটি হইল, তাহাই সূর্য।

যে অব্যক্ত মহান্ উৎসের কথা বলা হইল, সেটিকে বৈদিকভাষায় বল—অদিতি। চৈতন্য, প্রাণ প্রভৃতির অখণ্ড এবং ব্যাপক আধার। মিত্রমেরু এবং অগ্নিমেরু এই দুই মেরু আশ্রয় করতঃ এই অদিতির সূনু (দুটি উকার দুই মেরু) হইল সূর্য=আদিত্য। সূর্যের এই পরিভাষা করিতে যাইয়া 'অগ্নি' শব্দকে বিশেষভাবে 'অঙ্কক' এবং 'অধ্বনীন'ভাবে লওয়া হইতেছে—as Designer of creative patterns and Tracer of cosmic process paths. এটি সম্ভাবিত হইতে গেলে পূর্বোক্ত 'সহোগাঢ়ং' মিত্র আকৃতিটি সর্বক্ষেত্রেই আবশ্যক হয় এবং সেটিরও উৎস এবং

আধাররূপা অদিতি শক্তি (Mother Plenum of Power) আবশ্যক হয়। একটা বীজের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের এই ‘ত্রেধা নিদধে পদং’ রূপটি ধরিতে চেষ্টা কর। ব্রহ্ম ‘বিষ্ণুরুরুক্রমঃ’ রূপে এই ‘ত্রেধা নিদধে পদং’ কর্মটি করিতেছেন। তাঁকে সূর্যই বল, আর ‘সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ’ বল, তাতে তত্ত্বের অপলাপ হয় না। তবে, সূর্যকে Physical Sun মাত্র ভাবিয়া ঐ খণ্ডিত, স্থূল আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই সত্য সমগ্র দৃষ্টির লোপটি করিও না। সূর্য আসলে ব্রহ্মই, তবে অভিব্যক্তিবিশেষ। এই মৌলিক ‘বিশেষ’টি, বর্তমান সূত্রে প্রদর্শিত হইল।

Astral বা Solar Physics-এর পরিভাষার যে সুসঙ্গতিই আছে, তা লক্ষ্য করিও। ভূতবিজ্ঞানের কল্পনায় যে আদিম নীহারিকা মহামেঘ, সেটি কোনও অব্যক্তা অদিতি মায়ের প্রথম ঘনীভাবরূপ (‘মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী’কে ভূতভৌতিক-সৃষ্টির গোড়ায় এই ভাবে ভাবনা কর)। ঘোরা=নিবিড়া, অর্থটিও ভাবিও। উক্ত মহাকালী ধ্যানে ‘চতুর্ভুজা’ পদটিকেও সমঞ্জসভাবে ভাবনা করিতে হইবে। যাই হোক, নীহারিকা মহামেঘরূপে (আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই দেখিতেছ), অদিতিমাতা (Mother Plenum of Power) মিত্রমেরু আশ্রয় করিলেন। তারপর, ‘সহোঘনং’ রূপটি হইল ‘সহোগাঢ়ং’—condensed, concentrated. এইরূপ কোন ব্যাপারের ফলেই সূক্ষ্মের দেশে অণু, আর বিরাটের দেশে সূর্যতারকাদি জ্যোতিষ্কের সম্ভবটি ঘটিয়াছে। অপরিচ্ছিন্ন ঊর্মিবিতান পরিচ্ছিন্ন (as ‘packet’) এবং নিবিড় হইয়াছে। এইভাবে নিবিড়তায় আসিয়াই নাদ পান বিন্দুকে আপন মিত্ররূপে, এবং বিন্দুও পান নাদকে মিত্ররূপে—Expansive হয় Intensive-এর সঙ্গো ছন্দে গ্রথিত, অন্বিত। তলগা এবং ঊর্দ্ধগা বৃত্তিদ্বয় বেধগাকে আপনাদের সঞ্চয়-সিঞ্চন এতদুভয়ের ভাণ্ডার বা Reserve Bank রূপে খুঁজিয়া পায়। অণু এবং জ্যোতিষ্কাদির দৃষ্টান্ত লইয়া কথাগুলি ভাবিয়া দেখ। কেন্দ্রে বিন্দুকে পাইয়া এই ভাণ্ডার আবার নিরন্তর সিঞ্চন (constant draining or drawing) সত্ত্বেও স্বতঃসঞ্চয়ী রূপটি পাইয়া থাকে, সুতরাং খরচের বাহুল্যেও সহজে ‘ফাজিল’ বা ‘দেউলিয়া’ হইয়া যায় না। জপাদি অধ্যাত্মসাধনেও এই স্বতঃসঞ্চয়ী নাদবিন্দু-মৈত্রটি যত্নসহকারে মিলাইতে হয়।

নাদবিন্দু-মৈত্ররূপে উক্তপ্রকার স্বতঃসঞ্চয়ী কেন্দ্রীণতা আসিলে (সূক্ষ্মে এবং বিরাটে), তবে সুষম-কুশলা সৃষ্টিরূপ-অঙ্কন-রঞ্জন-পটীয়সী মহাশক্তি-নির্ঝরিণী

স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইতে পারে (অধ্যাত্ম জীবনেও তাই)। এই স্থলটি হইল সোমমিত্র অগ্নিমেরু। পূর্ব মেরুকে বল বিন্দুমিত্র বা বসুমিত্র মেরু। ইহাতেও সেই আদি পুরুষযজ্ঞের আরম্ভ। এই আদিযজ্ঞের সোমমিত্র অগ্নিকে ভালমতে চিনিয়া লও, কেননা তোমার ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনযাগটিকে এই আদিযজ্ঞের আকৃতিতেই উদ্‌যাপন করিতে হইবে। আকৃতিটিকে বিশ্লেষণে তিনভাগ করিয়া দেখান হইল, কিন্তু বস্তুতঃ আকৃতিটি পৃথক্ পরিচ্ছেদযোগ্য নয়। তথাপি পূর্ণ আকৃতিটির প্রথম ভাগকে যদি বল— আদিত্য; দ্বিতীয় ভাগকে বল—সূর্য; এবং অন্তিমটিকে বল—ঘৃণি, তা হইলে, সূর্যমন্ত্র পাইতেছ—ওঁ হ্রীঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ—বিশেষ করিয়া; কেননা, এ মন্ত্রাশ্রয়ে তোমাকে বিলোমে সেই মূল আধারেই ফিরিতে হইতেছে। বিশেষতঃ প্রাণন-আকৃতি লক্ষ্য করিয়া আদি মেরুকে অর্য্যমা (অর্য্যমন্), আর পরের মেরুটিকে উরুক্রম বলা যায়। Radiation-এর ক্ষেত্রে মিত্রমেরুকে Raman Effect, আর অগ্নিমেরুকে Crompton Effect এর সঙ্গে তুলনা করিতে বলি। নিখিল কলনধারার নাভিস্বরূপ (সূ+র্+যঃ), মিত্রাগ্নিরূপ দুই মেরুক্রান্তিকৃৎ সূর্যনারায়ণকে পূর্বোক্তভাবে ভাবনা করিয়া, তাঁর রহস্য নামগুলিতেও ধ্যান দিও।

আধিভৌতিককে উদাহরণরূপে বিশেষভাবে লওয়া হইল বলিয়া, দৃষ্টিকে তাতেই নিবন্ধ ও কৃপণ হইতে দিও না। সৌরবিজ্ঞান বা Solar Science—Solar Physics মাত্র নয়! আধিভৌতিকাদি তিনটি ব্যতীত আরও দুইটি দৃষ্টি—অধিযজ্ঞ এবং অধ্যক্ষর—ফুটিতে দাও। নতুবা সৌরবিজ্ঞানকে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে অন্বিত করিতে অপারগ হইবে, এবং সেটি হইলে, শ্রুতির বজ্রগর্ভ জলদগম্ভীর ভাষায়—তোমার মূর্দ্ধা বিপাতিত হইবে। বর্তমানে হইয়াছেও তাই—মেদিনীমূর্দ্ধায় আর ধীর, শান্ত প্রজ্ঞাকুশলোজ্জ্বলা মেধাটি তো নাই। ভূতবিজ্ঞানের যথার্থ সৌরবিজ্ঞানে বিবর্তন হওয়া আবশ্যক, কেননা, সৌরবিজ্ঞানই সেই সবিতৃ-বিজ্ঞান—যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমজ্ঞাতং জ্ঞাতং ভবতি; সর্ব্বমকৃতং কৃতং ভবতি; ইত্যাদি। সূর্যকে কেন হিরণ্যরেতাঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তা আভাসে আগে বুঝিতে চেষ্টা হইয়াছে। ইনি 'হিরণ্যকেশ'ও শ্রুত হইয়াছেন। প্রথমটিতে অব্যয় নিধান-শক্তি, আর পরেরটিতে অনন্ত বিতান ও বিন্যাসশক্তি সূচিত হয়। সুতরাং সৃষ্টিতে সর্বত্র অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দের অব্যয় নিধানরূপে এবং প্রপূর্তি-বিভূতি রূপে সূর্যনারায়ণ স্বমহিমায় বিরাজমান।

সবিতাকে 'সবিতা স্বর' (প্রণব) রূপে ভাবনা কর। প্রণবের অ, উ, ম এই তিন মাত্রা এবং অর্দ্ধমাত্রা—এই চারিটি 'মাত্রা' সূর্যের কতিপয় রাহস্যিক নামে এবং সে সকলের অর্থব্যঞ্জনায় উদাহৃত—ইহা চিন্তা কর। অকার (যাহা ব্যাহরণে নাভিস্থল থেকে তুলিতে হইবে—ভগবানের যে নাভিকমলে সৃষ্টিকর্তা সমাসীন) 'অর্ক' এবং 'আদিত্য' এই দুটি নাম এবং তাদের ভাবকে নির্দেশ ও নিরূপণ করে। অর্থাৎ, অর্ক এবং আদিত্য, এই দুই রূপে সূর্যনারায়ণ বিশ্বভুবনের 'নাভি' (আদি স্বর, তৈজসাধার এবং প্রাণকেন্দ্র—এই তিনভাবেই)। মকারে তিনি ভুবনের 'মূর্দ্ধা' (মূর্দ্ধন্য জ্যোতিঃ এবং নিখিল নিয়ন্তা—Cosmic Brain)। 'মিত্র', 'অর্য্যমা', 'মখ', 'ময়ূখী', 'মার্ত্তণ্ড'—এই নাম ও ভাবগুলি এই মূর্দ্ধার নির্দ্দেশ দেয়। আর, ওষ্ঠ্য যে উবর্ণ, সেটি ভুবনের 'হৃদয়' স্থানীয়। ইনি বায়ুদৈবত। নাভি এবং মূর্দ্ধা (Cosmic Energy and Cosmic Control) এ দুয়ের সংযোজক, অন্যোন্যসাপেক্ষতা বিধায়ক হইল হৃদয় (হৃৎ+অয়)। আগে, এ হৃদয়ের লক্ষণ করা হইয়াছে। অন্তঃকরণে এটি আবেগ, আস্পৃহা, ভাবানুভূতি। বহির্বিশ্বে এবং প্রাণে এইটি হইল ছন্দঃ বা সুষমস্পন্দরূপ (Rhythmic 'Beat' and 'Flow')। বিশ্বের গতিস্থিতিতে সূর্য এই ছন্দঃকে সর্বত্র চালিত করেন, এবং স্বয়ংও যেন তার দ্বারা চালিত হন। ছন্দঃ এক মৌলিক হিসাবে সপ্ত। এই নিমিত্ত সূর্য 'সপ্তাশ্ব'। উবর্ণে 'ভানু', 'উরুক্রম', 'বিষ্ণু', 'পূষা', 'সূর্য্য'—এই নাম ও ভাবগুলি বিশেষভাবে নির্দেশিত জানিও। আর, ত্রিমাত্রার পারে যে অর্দ্ধমাত্রা, সেটি 'উত্তমাঃ' (তমসঃ পরস্তাৎ'), 'বরেণ্যং ভর্গঃ' এর সাক্ষাৎ দ্যোতক, পরম জ্যোতিঃ 'ঘৃণি'—এই পরম রাহস্যিক নামের এবং ধামের সন্ধান মিলাইয়া দেয়। অর্থাৎ, ওঙ্কারকে যেমন কেবলমাত্র ক্রিয়াদিরূপে (functionally) দেখিলেই পর্যাপ্তি হয় না, তেমনি সূর্যকেও কেবল 'ভুবনভাবনায়' (cosmically, immanently) দেখিলে শেষ হয় না; তাঁকে স্বরূপে ভুবনাতিগভাবে (acosmically, transcendentally) না দেখা পর্যন্ত পরম পর্যাপ্তি নেই। এই নিমিত্ত অর্চ্চিরাদিমার্গে যে শুক্লা গতি, তাতে 'ভুবনস্য নাভিঃ'-রূপ যে সূর্য-সংস্থা, সেটি ভেদ করতঃ ব্রহ্মপদবীতে পৌঁছিতে হয়।

আগে যে ভাবে ভাবনা করা হইল, তাতে এ নাভিভেদের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। যথা, স্থূল জড়ত্ব (অণুপর্যন্ত) কাটাইয়া যদি সূক্ষ্মশক্তিবস্তুকে (Energy as Mass) পাইতে

হয়, তবে অনুর কেন্দ্রীণ সংস্থা (nucleus) ভেদ করিতে না পারা পর্যন্ত কোনমতেই সেটি সম্ভাবিত হয় না। প্রাণীর উদ্‌বর্তনে কেন্দ্রীণ ক্রোমোজোম-সংখ্যান পর্যন্ত বদল হওয়া চাই। ফলে, কেন্দ্রীণ বিপ্লব এবং বিসৃষ্টি। চেতনার রাজ্যে 'অহং' সেই কেন্দ্রীণগ্রন্থি। এ গ্রন্থিভেদপটিয়সী কোন শক্তি এবং তার শক্যমানতাও মিলাইতে হয়। কিন্তু সকল ব্যস্ত সমাধানের মূল এবং শেষ সমাধান হয় সমস্ত বা সামগ্রিক সমাধানে। সেটি না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যস্ত সমাধানের 'সমীহ' ও সঙ্কোচ কাটে না। অণু থেকে শক্তি বিসর্গে আসিল, কিন্তু বিশ্বসংস্থার নাভিতে যে অর্ক-আদিত্য শক্তি, তিনি যদি তাকে মুক্তি না দেন, আপন ঘৃণি ও ভর্গঃ স্বরূপে তুলিয়া না লন, তবে সে অণু-বিসৃষ্ট শক্তিরাশি আবার ভুবন-জালের গ্রন্থিবিশেষে আবন্ধ হইয়া পড়িবে। সে জালের গ্রন্থি যেমন শক্ত তেমনি ঘনবিন্যস্ত—পাশাইবার যো নেই। সাধন জীবনেও এটি নিত্য অভিজ্ঞতার বস্তু। গ্রন্থি পাশানো তো সম্ভব হয় না; তবে নিখিল বিশ্বগ্রন্থির নাভি-গ্রন্থন যেখানে, সেই ভুবন-নাভিতে, বিশেষতঃ সবিতাস্বর (ওঙ্কার) সমাশ্রয়ে, সমাবৃত্ত হও।

সর্ব্বদেশেষু কেন্দ্রীণো হৃদয়ং সর্ব্বকালতঃ।
সর্ব্বসম্বন্ধনাভির্যঃ স আত্মা সর্ব্ববস্তুষু॥ ২১৯

অণু মহান্ সকল দেশেই যাহা 'কেন্দ্রীণ'; এইরূপ সকল কালেই যাহা 'হৃদয়' বা মৌলিক স্পন্দ ('Basic Beat'); সকল সম্বন্ধে যাহা 'নাভি' (Fundamental Nexus), তাহাই আবার সকল বস্তুর 'আত্মা' ('সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ')। বিশ্বে দেশ, কাল, বস্তু এবং সম্বন্ধ—এই চারিটি মূল অবভাস সম্পর্কে সূর্যতত্ত্বকে ঐ ঐ ভাবে ভাবনা করিও।

সর্ব্বদৃশাং স বৈ মুখ্যঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বরঃ।
সর্ব্বগিরাং স ওঙ্কারঃ সর্ব্বমধুমতাং মধু॥ ২২০

'চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ'—নিখিলভুবননেত্র সূর্য সর্বদর্শীদেরও মুখ্য (অর্থাৎ, সাক্ষাৎ জ্যোতিস্তত্ত্ব); তিনি সকল প্রাণের ভরণকৃৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সাক্ষাৎ

প্রাণব্রহ্মতত্ত্ব); বাঙ্ময় বিশ্বে সকল বাকের প্রভব, প্রলয়, স্থান—ওঙ্কার (সাক্ষাৎ নাদ-ব্রহ্মতত্ত্ব); এবং সকল মধুমৎ-রসের রসয়িতা মধু (সাক্ষাৎ মধুব্রহ্মতত্ত্ব)। জ্যোতিঃ প্রাণ, নাদ এবং মধু—বিশ্বসংবিত্তির এই চারিটি দিক্ দিয়াও সূর্যনারায়ণের স্বায়ংভব মহিমা ধ্যান করিও।

সংখ্যা-সংখ্যান-সাংখ্যেষু প্রসংখ্যানেন নিষ্ঠিতম্।
সংখ্যামূলস্য বিশ্বস্য হ্যাদিত্যং হৃদয়ং বিদুঃ॥ ২২১

সংখ্যা, সংখ্যান ও সাংখ্য (যে ত্রয়ী পূর্বে কথিত হইয়াছে)—এই তিনের মূলে অবস্থিতির ফলে, এই বিশ্ব সংখ্যামূল (Basic Number Pattern) আকৃতি পাইয়াছে। সমস্ত কিছুর মূলে সংখ্যা এবং সংখ্যাবিজ্ঞান—Mathematical Universe. কিন্তু এই সংখ্যেয় বিশ্বকে (জড়, প্রাণ, মন সব লইয়া) কোনও মহা সমন্বয় ছন্দে এখনও আমরা আনিতে পারি নাই। অথচ, সঙ্কেত ক্রমশঃ বেশীই মিলিতেছে—ঐ মহাসমন্বয়ী কোন ছন্দের। সেটি মিলিলে সর্বস্থলেই সংখ্যা-সমীকরণাদির এক প্রকৃষ্ট সামঞ্জস্য মিলিল। সেই প্রকৃষ্ট সংখ্যানের স্থলকে বল 'প্রসংখ্যান'। এখন, সূর্য হইতেছেন সেই তত্ত্ব, যাতে বিশ্বসংখ্যানের প্রসংখ্যান পরিনিষ্ঠিত আছে। সৌরজগতে সূর্য এই প্রসংখ্যান-মূর্তিরূপে বিরাজিত বটে, কিন্তু এখানে কোন বিশেষ ক্ষেত্র (specified field) এর কথা কহিয়া থামিলে চলিবে না। মূল ও ব্যাপক প্রসংখ্যান হইল সার্বভূমিক সূর্যবিজ্ঞান ও সূর্যসিদ্ধান্ত।

সংখ্যা নেমিশ্চ সংখ্যানং হ্যরাঃ সাংখ্যেন নাভিতা।
প্রসংখ্যানধ্রুবাক্ষেণ সংখ্যেয়চক্রমেজতে॥ ২২২

সংখ্যেয় (measurable, calculable) বিশ্বের সর্বত্র কার্যকরী সংখ্যা (operation number, যথা, কোনও এটমে) হইল নেমিস্বরূপ। সংখ্যান (সংহত-আকৃতি—ফরমূলা ইত্যাদি) হইল অরস্থানীয়। সাংখ্য (সংখ্যাবিজ্ঞান বা Theory) হইল তার নাভি। কিন্তু এ সবই সংখ্যেয় বিশ্বকে চক্রগতিতে চালায় কাকে আশ্রয়

করিয়া? সেটি হইল—প্রসংখ্যানরূপ ধ্রুব অক্ষ বা ধূঃ। এই অক্ষটি না পাইলে কোন থিওরিই শেষ পর্যন্ত, সমঞ্জসভাবে, মহাসমন্বয়ে, চলে না। সুতরাং সূর্যতত্ত্বকে ভুবনধুরন্ধররূপেও ধ্যান করিও।

গ্রহাঃ সংখ্যা চ বর্ত্মাণি কালঃ সংখ্যানসাধকঃ।
সাংখ্যঞ্চ ভবপ্রারব্ধং প্রসংখ্যানং তদীক্ষণম্॥ ২২৩

গ্রহনক্ষত্র নীহারিকাদি এবং দেশসংস্থায় তাদের যে সব বর্ত্ম বা মার্গ, তারাই সংখ্যা। দেশসহকারে কাল হইল সংখ্যানকৃৎ। এই ভব বা সৃষ্টির যেটা 'প্রারব্ধ' ('যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ') সেইটি সাংখ্য। আর, স্বয়ং ব্রহ্মের ঈক্ষণই প্রসংখ্যান। সুতরাং, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ঈক্ষণমূর্ত্তি ('দিবীব চক্ষুরাততম্') সূর্যনারায়ণকে 'দিব্যচক্ষুষা' দর্শন কর।

[পরের সূত্রের আলোচনায় দেখিব যে 'চন্দ্রমা' ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সঙ্কল্পমূর্তি। সূর্যতত্ত্ব 'ভর্গস্' আকারে অস্-ভাগান্ত করিয়া, এবং চন্দ্রমাকেও 'চন্দ্রমস্' ভাবে অসন্ত করিয়া, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ তপোমূর্তি 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' এই যুগ্মতত্ত্ব পাই।]

অণৌ সর্গে বিসর্গে চ রেণৌ ধনর্ণতায়নে।
বীচৌ সন্ধৌ চ মেরৌ চ হরিদশ্বো গভস্তিমান্॥ ২২৪

জড়, প্রাণ, মানসাদিতে যে অণুরূপতা (atomicity), সেটির সম্ভব এবং বিলয়, এ দুয়েতেই আধার এবং অধ্যক্ষতা কোথায়?—এ প্রশ্ন বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান দুয়েকেই করিয়া জবাব মিলাইতে হয়। বাস্তবী দৃষ্টিতে এই প্রশ্ন। শাক্তীদৃষ্টিতে—শক্তিবিকিরণে যে রেণুরূপতা (quantum), তার মাত্রা (যথা, Planck's Constant), এবং তার ধন-ঋণ, এই মিথুনরূপে বিস্তার—এরই বা মূলে কি? তারপর, ছান্দসী দৃষ্টিতে—সমস্ত কিছুর বীচি-আকৃতিতে (wave patternএ), সন্ধি (interlinking) এবং মেরু (critical value) কোন্ প্রসংখ্যানবিশারদী সত্তাশক্তিদ্বারা ছন্দোগত্বে (harmonic function-এ) আসিয়া থাকে? বর্তমান সূত্রে আলোচিত সূর্যতত্ত্বে—বিশেষতঃ

'হরিদশ্ব' ও 'গভস্তিমান্' এই দুই রাহস্যিক নামে এবং মূলা বৃত্তিতে। হরিদশ্ব বলিতে 'মিত্র', এবং গভস্তিমান্ বলিতে 'অগ্নি' বিশেষভাবে সূচিত হইবে। পূর্বের আলোচিত সেই 'আত্মনীন' এবং 'অধ্বনীন' এই দুটি মুখ্যাবৃত্তি যথাক্রমে ঐ দুটিতে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

হরিৎ মানে সবুজ? তা যদি হয়, তবুও লক্ষ্য কর যে, সপ্তবর্ণালীর (red থেকে violet) ঠিক মাধ্যমে রহিয়া এটি বর্ণগ্রামের সেতু সন্ধি রক্ষা করিতেছে (মিত্র)। এখানে colour band-এর দুদিকে দুটি পক্ষ (wings) যেন তাদের মৈত্রগ্রন্থি (harmonic 'hinge') পাইয়াছে। 'শ্যামসুন্দর', 'নবদুর্ব্বাদলশ্যাম' ইত্যাদিতে ঐ মূলমৈত্রংটি 'মধুরং' হইয়া ফুটিয়াছে। শ্যামলরূপ বা শ্রী, শুধু নয়নের নয়, পরাণেরও রসায়ন। তারপর, এই শ্যামলরসায়নে অন্তঃশীতল হইয়া 'হরিৎ' এই বর্ণত্রয়ীর একটুখানি 'রসায়ন' করিয়া লও। অর্থাৎ, 'হরিৎ' হোক্ 'হিরৎ'। ফলে, (আরও একটু বর্ণরসায়নে) মিলিল—হিরণ্ময়, হিরণ্য। এইটি হইল নিখিল বর্ণালীর 'আত্মনীন' বর্ণ। সূর্যতত্ত্বে এই মূল আত্মনীন বর্ণকেই স্বরূপে (স্ববর্ণে) রাখা হইয়াছে। 'হরিৎ' এই আত্মনীন বিশ্বমিত্র বর্ণের নির্দেশ দেয়। 'হরিৎ' শব্দের রসায়নে বিশ্লেষণের দিক্টা এখানে দেখান হইল না। এর সঙ্গে যোগ কর, অ+শ্বঃ=যেটি ভাবী অথবা সম্ভাব্য (potential) মাত্র নয়, পরন্তু যেটি সম্ভূতি (kinetic, actual) রূপ। এইটি বিরতি বা নিবৃত্তি (staticityর) রূপ নয়, কিন্তু গতি বা প্রবৃত্তির (dynamicityর) রূপ। সুতরাং, যাহা কিছু অদ্যশ্বীন (আজ কিংবা কাল), অথবা শুধুই অধ্বনীন (path moving), সেটিকে আত্মনীন বিশ্বমিত্র আকৃতিতে মিলাইবে ঐ 'হরিদশ্ব'। হরিদশ্ব ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া সেই আন্তর স্নিগ্ধতায় এবং বিশ্বমিত্রতায় লইবে, যেখানে কেবলমাত্র 'সম্ভব' বলে—এই দেখ, আমি অন্তর্বহিঃ একান্ত বাস্তব (অ+শ্বঃ)। অতএব, 'হরিদশ্বায় তে নমঃ'। এই মহারসায়ন রহস্যটি আবশ্যকমত অপেক্ষাকৃত নিম্নের ব্যবহারভূমিতেও বুঝিয়া লইও। যথা, দৈহিক অনাময়ী স্থিতি ও বাহিতায়—'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ'। আময় অথবা রোগ বলিতে প্রাণের বিরূপ, বিষম স্পন্দন (antipathy wave relation—যেখানে প্রসজ্য wave equation কোন সুসমঞ্জস solution-এ আনিতে পারা যাইতেছে না)। এ দৃষ্টিতে রোগের নিদান মূলতঃ স্পন্দ বিজ্ঞানেরই প্রশ্ন। ভাস্কর বলিতে—the Source of cosmic radiation. হরিদশ্ব=উক্ত

রেডিয়েশন্ সমূহের যেটি সুষম, সুসমঞ্জস আকৃতি (harmonic pattern)—শুধু ব্যক্ত বা 'দৃষ্ট' গ্রামেই নয়, পরন্তু 'অব্যক্ত' গ্রামেও (ultra and infra)। শুধু স্থূল (physical) রেডিয়েশন্‌ও আবার নয়। সেই যে মন্ত্রে আছে—'আদিত্যায় নমোনমঃ'। পরের চরণে 'হরিদশ্বায় তে নমঃ' এর আগে আছে—'জয়ায় জয়ভদ্রায়'। ভাস্কর যে আদিত্য (প্রাণব্রহ্ম=ওঙ্কার), তাঁর 'হরিদশ্ব' কেবলমাত্র যে 'জয়' (triumphant) এমন নয়, পরন্তু এটি বিশ্বে সর্বত্র জয়ের যেটি ভদ্র (সর্বতোভদ্র) রূপ, তাহাই। 'জয়' শব্দটি আরও তলাইয়া লইও।

শ্রুতি বলেন—তিনি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। 'যজ্ঞ' শব্দটি যজ্ ধাতু থেকে। 'য'কার ব্রহ্মের প্রাণরূপে, কালরূপে (Fundamental Dynamicity) অভিব্যক্তির আকৃতি। বায়ুবীজরূপে এটি আমাদের পূর্ব পরিচিত। এই মূল প্রাণ বা বায়ুতত্ত্ব যখন কোন 'জাত' বা ভূত পদার্থ আকারে আপনাকে 'জমাট' করে তখন পাই—'জ' (Staticity)। বিশ্বে 'য' বস্তু আপনাকে 'জ' আকারে আনিয়াছে এবং আনিতেছে। এইটি 'যজ'। এর সঙ্গে কোন ফল অভীষ্টরূপে (as End) থাকিলে 'যজ্' হয় 'যজ্ঞ'। শুধু প্রজ্ঞান কেন, বিজ্ঞানও এই মৌলিক 'ফর্‌মূলা'টিতে পূরা সম্মতি দান করিবেন। যেমন, পূর্বশতকে জড়পদার্থকে (Matter) কতকগুলি মৌলিক 'জ' (Atoms) আকারেই পাইয়াছিলাম। বর্তমানে, 'জড়' হইয়াছে 'যজ' (Basic Energy as Rest Mass)। অন্য অন্য ক্ষেত্রেও দেখ। প্রাণ এবং মনের ভূমিতে এই 'যজ'কে অনুসন্ধান কর। 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'—এ বাক্যের তাৎপর্য গভীরভাবে প্রণিধান কর। এ কথা আবার পরে আসিতেছে। এখন দেখ, 'যজ' এই আকৃতিতে আসিয়া বায়ু বা প্রাণ যে 'জমাট' আকৃতিটি গ্রহণ করে, ভূতভৌতিক সৃষ্টির নিমিত্ত সে 'জমাট' ভাবটি তো চাই-ই। সব কিছুকেই একটা যেন 'গম্ভীর বাঁধনে' আসিতেই হয়। এই যে 'bound', 'congealed' ভাব, সেটা কিন্তু 'স্থাণু' (immovable) হইলে মুস্কিল। এই অবষ্টম্ভ বা স্থাণুত্বই হইল ব্যবহারিক জড়ত্ব (Inertia)। এই জড়ত্বে বিশ্বের অসীম চেতনা এবং প্রাণ যেন সাড়াবিহীন এক মহামূর্চ্ছার মত পড়িয়া আছে। অহল্যা হইয়াছে পাষাণী। এ জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেবার এক অমোঘ উপায়ও চাই। সব কিছুই মুক্তির জন্য এক অন্তহীন প্রয়াস তো করিয়া চলিয়াছে—সেই প্রয়াসই বিশ্বের উদ্‌বর্তন—Evolution. কিন্তু নিরন্তর মোঘাশা মুক্তির আকুতিকে অমোঘ

উপায়টি কে দেখাইবে? সে উপায়—'যজ'কে উল্টাইয়া আপন মূল বা বিন্দুমুখী হইতে দাও। অর্থাৎ, 'যজ' হউক 'জয়'। অধ্যাত্মসাধনে জপ এই প্রত্যগ্‌ধারাটি সমর্থভাবে সূচনা করে।

খাদ্যাদিতে যে পোষণী শক্তি (সোম) 'জ' আকারে স্তব্ধ-অবরুদ্ধ, জঠরে বৈশ্বানর অগ্নি সেটিকে সক্রিয় ('য়') করেন। সুতরাং, আহার 'যথার্থ' হইতে গেলে, সেটি 'যজ্ঞ' হওয়া আবশ্যক, যার ফলে, 'যজ' হইবে 'জয়'। জপযজ্ঞেও মন্ত্রাক্ষরাদির এই বিবর্তন (transformation) হওয়া আবশ্যক। অন্ন, জপ প্রভৃতি সব কিছুই প্রথমতঃ 'মিত্র' আকৃতিতে আহৃত এবং ব্যাহৃত হওয়া চাই; এবং দ্বিতীয়তঃ, 'অগ্নি' আকৃতিতে সক্রিয়, সমর্থ শক্তিরূপতায় আসা চাই 'সমর্থ' কোন অভীষ্ট ফলের (End) উদ্দেশ করে। অন্ন-পানীয়ের স্থলে মন-প্রাণের বর্চ্চঃ এবং ওজঃ এ দুয়ের প্রপূরয়িতা ও সম্বর্দ্ধয়িতা হওয়া আবশ্যক। জপাদি সাধনে জ্যোতির এবং রসের। অগ্নি 'জ' এবং অণিষ্ঠ-তৈজসভাগ 'য'এর ওজঃ প্রভৃতি সমধিক ঊর্জিত আকৃতিতে লইবেন। এই নিমিত্তও গায়ত্রী ব্যাহরণে বরেণ্য ভর্গঃ যে ধীবৃত্তিসমূহকে ('ধিয়ঃ') আপন মহীয়সী ভর্জনী ও দীপনী শক্তিতে 'প্রচোদিত' করিতেছেন, সে 'ধিয়ঃ'কে 'জো নঃ' এইরূপ ব্যাহরণের অযথা অবপাতনে, অধস্তাৎ যে স্তব্ধবৃত্তিতা ('জ'), তাতে নামাইতে নেই। যে মূলযজ্ঞের প্রসঙ্গ হইতেছে ('যজ'কে 'জয়'রূপে পাওয়া), তাতে ক্ষেম বা মিত্রভাগটিকে যদি বল 'স্বধা', তবে পরের যোগ বা অগ্নিভাগকে বল 'স্বাহা'। সামান্যভাবে বলা হইল। মিত্রাগ্নিসঙ্ঘাত, তাহা হইলে, স্বধা এবং স্বাহা, এ দুয়ের মিথুনীভাব। সূর্যনারায়ণ এই মিথুনকে আপন 'আদিত্য' স্বভাব হইতে দ্বন্দ্বস্থ করিয়া প্রকট করেন। তিনি আদি পুরুষের আদি যজ্ঞের মূর্তবিগ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন। তদীয় তেজঃ সবিতৃ-তেজঃ। নিখিল সবন ও পোষণের সত্তা, ছন্দঃ তাঁতে বিদ্যমান। শুধু অতীতে নয়, বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও। কেননা, কালের নিখিলকলন-সমর্থ যে দিব্য অব্যয় 'কলেবর', তাও তিনি।

পুনশ্চ, নমঃ, স্বাহা, বষট্, বৌষট্, হুং ফট্—এই 'অব্যয়' ন্যাসাদি বীজ রূপে উক্ত মিত্রাগ্নিসঙ্ঘাতটি ভাবনা করিও। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে, ঐ বীজগুলি দুইটি দুইটি ক্রমে—মিত্র এবং অগ্নি। মিত্রে আত্মনীন, আর অগ্নিতে অধ্বনীন ভাবের মুখ্যতা, ইহা স্মরণ রাখিও। সুতরাং, সূর্যনারায়ণ নিখিলবিশ্বে যাবতীয় সুষম-সমর্থ ন্যাস-বিন্যাস

কর্মের নির্বাহয়িতা, প্রচোদয়িতা। যথা, জড়ে সবিতৃতেজঃ 'হুম্' বীজে কেন্দ্রীণ; 'ফট্' বীজে বিকীর্ণ। প্রকৃতিতে এ দুয়ের সুষমতা রক্ষা সূর্যনারায়ণ করিতেছেন, কিন্তু মানবের বর্তমান বিজ্ঞানব্যবহারে? সূর্যগায়ত্রী সমাশ্রয় কর। 'ওঁ ভাস্করায় বিদ্মহে মহদ্-দ্যুতিকরায় ধীমহি তন্ন আদিত্য প্রচোদয়াৎ॥' সূর্যের আদিত্য, কিনা, প্রাণব্রহ্মরূপে প্রপন্ন হইতে হইবে। নচেৎ, শক্তিকেন্দ্রসমূহ দৈত্যতেজো-দ্বারা (by mere 'fission action') বিদীর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া প্রাণকে বিশীর্ণ করিবে।

সৌরবিজ্ঞান অসীম, অগাধ রহস্যবারিধি। সে বারিধির বেলাভূমিতে কতিপয় উপলখণ্ড চয়নের প্রয়াস হইল মাত্র। পরবর্তী খণ্ডে, অতঃপর 'চন্দ্রমা' সূত্র আসিবে। তৎপূর্বে, কয়টি রহস্যকারিকাও বিবেচিত হইবে। অত্র উপসংহারে এইটি চিন্তা কর:—

ঈক্ষণস্তপো ভর্গশ্ছন্দো যজ্ঞো জয়ো গভঃ। (ভগঃ)
বেবিষ্টে সপ্তধা ব্রহ্ম ত্রেধা চ নিদধে পদম্॥ ২২৫

সূর্যনারায়ণে ব্রহ্মের সপ্তধা বর্তমানতা এবং ত্রেধা পদ্যমানতা সমন্বিত হইয়াছে। ব্রহ্মের ঈক্ষণ, তপঃ, ভর্গঃ ('সবিতুর্বরেণ্যং'), ছন্দঃ (মিত্র এবং অগ্নির ন্যাস-বিন্যাস-সুষমতা), যজ্ঞ, জয় এবং 'গভস্' (যা থেকে গভস্তিমান্। গ=কালাধ্বাদি গতি; ভ=গূঢ়শক্তির ('ব') সম্যক্ উর্জিতরূপ; অস্=সমর্থ, সুষম, প্রক্ষেপ, বিকিরণ)—এই সাতটি বৃত্তি সূর্যে সমাহৃত। ইনি সর্বব্যাপী বিষ্ণু (বেবিষ্টে)। আর, ইনি নানা মূল আকৃতিতে (অ, উ, ম; ইত্যাদিতে)—'ত্রেধা নিদধে পদম্'। এই সপ্তবিভূতিকা ত্রিপাৎ চরাচর-আত্মবর্য্যা ব্রাহ্মীতনুকে নমস্কার॥

পরিশিষ্ট (ক)

অর্দ্ধোদয়

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.

অর্দ্ধোদিতে সূর্য্যে আহবনীয়মাদধাতি। এতস্মিন্
বৈ লোকে (কালে) প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত।
প্রজা এব তৎ যজমানঃ সৃজতে। অথ ভূতং
চৈব ভবিষ্যৎ চ অবরুন্ধে।

(তৈঃ ব্রাহ্মণ অণু ৪)

আমাদের শাস্ত্রে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের মত কোন এক বিশেষ দিন লইয়া কোন বিষয় হয় নাই, যাহার জন্য বলিতে পারা যায় যে কোন 'তারা'র আবির্ভাব আকস্মিক, যেমন খ্রীষ্ট জন্মের সময় Star of the East আকস্মিক, কারণ, ইহা ভগবানের শুভ জন্ম ঘোষণা করিতেছে। আমাদের কিন্তু এই শুকতারা প্রতিদিনের ব্যাপার, ইহা সনাতন অর্থাৎ চিরকালের জন্য। সেই যে প্রথম ঊষা উঠিয়াছিলেন সেই বিরাটের ব্যাপার, এখন পর্যন্ত সেই ঊষা আবির্ভূত হইতেছেন। যেমন শ্রুতি বলিতেছেন:

ইমা এব তা উষসো যাঃ প্রথমা ব্যৌচ্ছন্।
তা দেব্যঃ কুর্বতে পঞ্চ রূপা। শশ্বতীর্ণাবপৃজ্যন্তি।
ন গমন্ত্যন্তম্।
প্রথমা ঊষা—ইদানীং প্রতিদিনং বর্ত্তমানা এব।
পঞ্চসংখ্যাকানি—বসন্তাদীনি তত্তৎ লিঙ্গানি
কুর্ব্বতে।

শশ্বতী র্নিরন্তরং বর্ত্তমানাঃ তা উষসো
নাবপৃজ্যান্তি কদাচিৎ অপি ন সমাপ্যন্তে।
অন্তং অবসানং ন গমন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি।
(সায়ন)

যেমন Eeinstein বিজ্ঞানে বলে Solar Light এর প্রথম Vibration অবলম্বন করিয়া যদি থাকি তাহা হইলে প্রথমে যে চুরুট ধরাইয়াছিলাম তাহা অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। আরও—

For an ye heard music like enow,
They are building still seeing
The city is built
To Music, therefore never built at all;
And therefore built for ever.

Tennyson, Idylls of the King
(Gareth & Lyneth)

'বেদ' সনাতন ভাব ধরিতে চাহে, সনাতন বলিতে কি বুঝায় পূর্বে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে সত্তা সর্বদা সমান ও বর্তমান, অথচ যাহার মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপার চলিতেছে ও চলিবে, অথচ যাহার জন্য 'সদা সমীপ সমান' এক ভাব সমভাবেই বর্তমান, তাহাই 'সনাতন'। এই ভাবে প্রজাপতির সৃষ্টি সনাতন, ঊষা সনাতন, 'রটন্তী বাক্' সনাতন, ইহাদিগকে সকল দিনে সকল সময়ে অর্চনা করা যায়, কোনরূপ নিয়ম বা কাল নাই ও থাকিতে পারে না। অথচ যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের মত কোন নির্দিষ্ট দিনে আমরা 'রটন্তী' পূজা করি কেন? এই প্রশ্নের সমস্যা এখানে করিবার চেষ্টা করিব।

যাহা 'সদা সমীপ সমান' তাহার ব্যত্যয় কোনকালে হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ইহা হইতে হইলে Eeinstein এর প্রথম Solar Vibration এর তালে থাকা দরকার, যাহা আমাদের ন্যায় খণ্ডজীবের পক্ষে অসম্ভব। যে 'অক্ষরা

চরন্তী' দেবী নিজ নামানুসারে সর্ব সময়ে প্রকাশের যোগ্যা, সেই দেবীকে আমরা রটন্তী পূজার রাত্রিতে 'কালী' বলিয়া পূজা করি কেন? সেই দিন জাগতিক অবস্থার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি যাহাতে মনে হয় এই সময়েই সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি আসিবে। এমনি আমাদের সন্ধিপূজা, ঠিক তেমনটি খুঁজি এই মাঘ-অমাবস্যা সংযুক্ত এই অর্দ্ধোদয় তিথিতে, অর্দ্ধোদয়যোগে। সুতরাং যাহা সনাতন তাহার আকস্মিকতা আমরা খুঁজি নক্ষত্র-বিজ্ঞানে। পুরাণের কথা—অশ্বত্থামা চিরঞ্জীবী, কিন্তু তাঁহার 'জীবোহম্' বাণী শুনা যায় মণিকর্ণিকা তীর্থে, বোধ হয় সময় বিশেষে। এইরূপ খৃষ্টজন্মসূচক ব্রাহ্মমুহূর্তের অমৃত ধারা বা বায়ু ও শুকতারার আবির্ভাব—ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার।

খণ্ডদর্শী আমরা অখণ্ডের ব্রাহ্ম মুহূর্ত ধরিতে পারি না, সেইজন্য 'খণ্ড' ব্যাপারের মধ্যে অখণ্ডের আবির্ভাব যদি কোনরূপে পাই তাহা খুঁজি। এই জন্য 'রটন্তী' কালিকার পূজা এই সময়, ঊষার চিরন্তনী অবস্থিতি এই ভাবে, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করি। মুহূর্তজ্ঞ এটি বাহির করিবার চেষ্টা করেন ও খুব কাছাকাছি পাইবেন এই আশায় আমরা এই মুহূর্তজ্ঞের শরণাপন্ন হই। যদি বাহির হইতে সুখশীতল হাওয়া ঐ সময়ে পাই তো মনে করি ঐ সন্ধি মুহূর্ত ধরিয়াছি। যাহা হউক্ আদৎ ব্যাপার অন্তরাত্মার অন্বেষণ করিতে হইবে যেমন ঋষিগণ ব্রহ্মঘোষে স্বতঃই প্রাপ্ত হইতেন। অন্ততঃ উৎসবের যদি কোন অর্থ থাকে তাহা ইহাই; সব সময় ধরিতে পারি না, সুতরাং মন্দের ভাল, আমরা মোটামুটি ধরিবার চেষ্টা করি। উত্তমভাবে কাজ করিলে দেবত্বপ্রাপ্ত ঋষিগণ সাহায্য করেন—ঋষি বিশ্বামিত্র এ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ও আচার্য সায়ন তাঁহার এক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'অর্দ্ধোদিত' সূর্যের সময়ে হবনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু 'অর্দ্ধোদিত' সূর্য ব্যাপারটি খুব বিজ্ঞান-সম্মত, এটি একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বেদ হইতেই দেখি 'মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম একম্'। এই ঋক্‌গুলি আমরা দেখিয়াছি কি? এগুলি অতি সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থা সদেকং পর্জন্য সূর্যোদয় দ্যাবা-পৃথিবীর উপস্থে মাতাপুত্রীরূপা সয্যায্যা পৃথিবী যিনি বেণু এবং দুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছেন এই সব জিনিষ যাহা আমরা লক্ষ্য করি না, এই সব অনাশ্চর্যের মধ্যে আশ্চর্যত্ব লক্ষ্য করাইতেছেন ঋষি।

বিজ্ঞান এই সব জিনিষ লইয়াই নাড়াচাড়া করে কিন্তু ইহার ভিতর হইতেই রহস্যপূর্ণ ঘটনার জাল বুনিয়া থাকে। বিজ্ঞানের চোখে Electron Proton কাজ করিতেছে কিন্তু এমনই হ্যাঁচ্‌কা টান টানিতেছে যে যাহা মনে করিতেছি ঠিক তেমনটি হইতেছে না। সুতরাং যেমন ভাবিতেছি তাহাই হইতেছে মনে করিবার হেতু কি? হেতু আমাদের 'বুঝ' বা জ্ঞান এসব করিতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া নাগার্জুনের সেই প্রতীত্য সমুৎপাদ নহে কি?

বেদেও একটি মন্ত্র আছে, ইহা আমাদের পূর্ব কথিত Quantum মূলক, আমার ধারণা—

অয়ং স্তুতো রাজা বন্দি বেধা অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ।
স কক্ষীবন্তং রেজয়ৎ সো অগ্নিম্ নেমিম্
ন চক্রমর্বতো রঘুদ্রু। (১০) ৫-১৬

'তরতি স্বসেতু' ইহা অতি মূল্যবান্ কথা। নিজে পবমান হইয়া যে শৃঙ্খল স্থাপন করিতেছেন তাহা নিজেই অতিক্রম করিতেছেন, সুতরাং William James যাহাকে 'closed circle' বলিতেছেন তাহা হইতে দিতেছেন না, বিজ্ঞানের Quantum এর ন্যায় Electron-Proton ঘটিত যে আশানুরূপ কর্ম উপস্থাপিত করিতেছেন তাহা হইতে দিতেছেন না। বৌদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ ও শঙ্করের অনির্বচনীয়বাদ-এর স্থান সম্যক্‌ভাবে রক্ষিত হইতেছে আমাদের বিশ্বাস।

এটি রক্ষা করিবার জন্য আমাদের শ্রুতি 'অর্দ্ধোদিতে' সূর্যে জুহোতি বলিতেছেন। 'অর্দ্ধোদিত' সূর্য 'Process' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, হইয়াছে বলা যায় না অথচ হইতেছে, সেজন্য হয় নাই এই ভাবটি দেখাইতেছে। কবি Tennyson হইতে উদ্ধৃত অংশটুকু লক্ষ্য করুন—built to music therefore not built at all, আমাদের সাধনাটুকুও ঠিক ঐ জাতীয় নহে কি? তাহা হইলে চিরদিনই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে কি? তাহার উত্তর 'therefore built for ever'—Process, Eternal process এর কি সুন্দর উদাহরণ!

'কাল অধুনাত্মক' এখানে ধরিবার জায়গা ব্যক্ত হইতেছে। তথা 'মতঙ্গা পরমেশ্বরে'।

এবং সর্ব্বত্র মন্তব্যঃ স্থির একো অধুনাত্মকঃ।
বর্ত্তমান অতি সূক্ষ্মত্বাৎ কালো নিত্য উপলভ্যতে॥

কালপটল।(১৩)

ইহাই Eternal Now, দার্শনিকপ্রবর Spinoza ইহাকেই বলিয়াছেন To view things Sub-Species Eternitatis–অনন্তের চোখ দিয়া দেখা। আমাদের শাস্ত্রের ইহাই 'সন্ধ্যা' বা 'মধুবিদ্যা'। মধুবিদ্যা হয় কখন? যখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে 'এক' করিয়া দেখা হয়। এ অবস্থাতে বোধহয় 'মুহূর্ত্তজ্ঞ' জিনিষটি বাহির করিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন কিন্তু ভিতরের বা অন্তরাত্মার উপলব্ধি, ইহা 'আত্মার'। বোধ হয় ইহাকে লক্ষ্য করিয়া (করণ) মন্ত্র বলিতেছেন—সেই যে জগতের আদিতে গোলাপী ঊষা প্রথম প্রকট হইয়াছিলেন, সেই ঊষা এখনও আছেন, এজন্য এই Rosy glow which is the spirit of things; আমাদের গায়ত্রী উপাসনার ধ্যাতব্য বরেণ্যং ভর্গ ইহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। মুহূর্তের জন্য বলিলে কি হইবে?

Thy fleetingness is bigger in the Ghost
Than time with all his host!

(Meridith–Hymn to Colour).

সৌন্দর্য বা স্যোনসী সত্তা এই জগতের বহুত্বের কুসঙ্গে পড়িয়া খুব—ক্ষণিকই হইবে। কিন্তু মেঘ নির্মল গগনকে আচ্ছাদন করিলে উক্ত নির্মলতা অবিকৃতই থাকে, তেমনি ঊষার অরুণ সৌন্দর্য অন্যান্য ভাবে তিরস্কৃত হইলেও যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে।

'তরতি স্বসেতু' এটি এইবার একটু দেখিয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি শেষ করিব। সোম সান্তের মধ্যে অনন্ত আনে, অথচ সমতারূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যায়। অন্যান্য দেবগণ অপেক্ষা 'সোম' এ এই 'তরতি স্বসেতু ভাব' সমধিক স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়, ইহাতে পরব্রহ্মের অনন্তত্ব ভাব রক্ষিত হইয়া থাকে। Closed circle এ যে আবন্ধ ভাব থাকে ইহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না। Hegel এর Eternal Progress এর সমালোচনা হইয়াছে, যাহার জন্য Doctrine of Imperfect God ইউরোপীয় দর্শনে

উপন্যস্ত হইয়াছে। বলিতে গেলে পরম ব্রহ্ম অপেক্ষা সবই Imperfect God, কারণ Bradley র ভাষায় These do not give final satisfaction. Hegelian Absolute ও এই প্রকার। অনুভবগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব যাহা অবাঙ্‌মনসোগোচর, তাহাই সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয়। Hegel-এ যেখানে অবস্থান করা যায় সেখানকার ভাবই প্রবল হয়, কিন্তু বেদান্তের নির্গুণভাবে 'বুঝ' বা ভাবের কোন স্থান থাকে না বলিয়া ইহা হয় না, অথচ অনুভূতিগম্য বলিয়া Nihilism বা Nothing এর স্থান নাই। Hegel সগুণ ব্রহ্মবাদী, এজন্য ইহার কাছে ইসলামী ভাব আদরণীয়, শঙ্করের গুণাতীত ভাব নহে, Sufi (Jalaluddin Rumi)। যাহা হউক উপনিষদ্ যে সনাতন ও অমর তত্ত্ব দিয়া গিয়াছেন তাহার মূল এই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ। অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমার' দিকে মমতা থাকিবে ততদিন আত্যান্তিক মোক্ষ নাই এটি বুঝা প্রয়োজন। অথচ 'আমি' লোপ পাইলে যে একবারে সব সঙ্গে সঙ্গে যাইবে ও সর্বনাশ হইবে ইহাও নয়। এটুকু প্রণিধান করাই পরম পুরুষার্থ।

সুতরাং সব কাজই আত্মসংস্কৃতির জন্য, ইহা 'দেশকালে' করিতে হয় এইটি বুঝাইবার জন্য, দেশকালের আপেক্ষিকত্ব বুঝাইবার জন্য 'অর্দ্ধোদয়' তত্ত্ব উপন্যস্ত হইয়াছে।

সব জিনিষেরই 'পূর্ণোদয়' বা apogee ক্ষয়ের লক্ষণ, ইহা art এ খুবই দেখা যায়। Orissa প্রভৃতি স্থানের অনিন্দ্যসুন্দর শিল্প কোণার্কে পূর্ণভাব ধারণ করে কিন্তু তাহার পরেই ঐ শিল্প স্রোতশূন্য জলের মত জীবন শূন্য হইয়া পড়ে। তেমনি যে ব্যক্তি কোন কালে কোন ভুল করে না সে ভীষণ, Les Miserable এ Javert চরিত্র এজন্য ভয়প্রদ। যে ভুল করে সে কোনও না কোন দিন ভাল হইবে, মানব চরিত্রে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার জন্য 'অর্দ্ধোদয় তত্ত্ব' উপন্যস্ত হইয়াছে। Victor Hugo হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা পাই, Hunchback of Notredam -এর Qusimodo চরিত্রে। Qusimodo এক খৃস্টীয় পর্ব, Easter Sunday, ইহা পূর্ণ Easter নহে, কিন্তু প্রায় হইয়াছে, Easter– 'almost' Easter. Qusimodo অসম্পূর্ণ মানুষ, যেমন তাহার শরীর অসম্পূর্ণ তেমনি তাহার নৈতিক চরিত্র অসম্পূর্ণ। কোনও গুণ তাহার নাই, আছে একমাত্র একটি গুণ, তাহর প্রভু ও রক্ষকের প্রতি অসীম ভক্তি ও বিরাট শিল্পগিরি ভজনালয়ের প্রতি প্রেম। এই দুই গুণ তাহাকে একদিন 'ত্রাণ' করিবে।

আমরা সকলেই একপ্রকার Qusimodo,– দেহ আত্মা আমাদের সকলের অসম্পূর্ণ। দৈবী সংস্কৃতি দ্বারা আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়। নিজের শক্তিতে যতদূর কুলায় করিতে হয়, শেষে ভগবতী শক্তির হাতে নিক্ষেপ করা—ইহাকে ভগবান্ কর্মসমর্পণ করা বলিয়াছেন। তবে আমাদের mode or manner, morals প্রভৃতি যাহার দ্বারা আমাদের 'ছাঁচ'টি নিখুঁৎ হয়, 'অখণ্ড' হয় তাহা করিতে হইবে। তবে আমাদের Qusimodo ভাব 'modo' হইবে, কষ্ট কল্পনা হইলেও আমরা মধু বা 'অখণ্ড' হইব, মধু অর্থ 'অখণ্ড', সায়ন বেদভাষ্যে করিয়াছেন। মধু=অখণ্ড(বেদ)।

মানস সরোবরের Fish God 'Modo Gomo' Brazil দেশের প্রাচীন উপাখ্যানের Fish God এর সহিত মিলে—সেই সুদূর Atlantis 'অতল' দেশের ইহা সূচক কি? যাহা হউক 'অতল' কুলকুণ্ডলিনীর মূল পর্যন্ত তলাইতে হইবে তবেই যদি 'রতন' মিলে।

পরিশিষ্ট (খ)

মূলগ্রন্থে ‘তারচক্র সমাচরণম্’ প্রভৃতি প্রসঙ্গে ওঙ্কার-এর ব্যাহরণ এবং অর্থ ভাবনা সম্বন্ধে সবিস্তার বলা হইয়াছে। নীচের কয়েকটি শ্লোকে জ্ঞান, ভাব, যোগ এবং কুলকুণ্ডলিনীলয়—প্রধানতঃ এই চারিটি সাধন উদ্দেশ করিয়া ওঙ্কারকে আন্তর হবনাদি রূপে ভাবনা করা হইতেছে।

ওঙ্কারহবনাদিদশকম্

বিবিদিষব আত্মানং তারজপপরায়ণাঃ।
চিতি বৈ পঞ্চমাত্রাভির্জুহুয়ুঃ কোষপঞ্চকম্।
স আত্মা স চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রপঞ্চোপশমে ততঃ॥ ১
স্থূলাঽপরাঞ্চ সূক্ষ্মাঞ্চাপরাপরাং পরাপরাম্।
পরাং পরমপূর্ণায়াং প্রকৃত্যাং জুহুয়ুর্মুদি॥ ২
স্থূলং সূক্ষ্মং ক্রমাদ্ গুণং প্রধানং শুদ্ধমিজ্যতাম্।
স্বকং রূপমকারাদ্যৈঃ স্বরূপে পরমে সতি॥ ৩
কন্দরে মন্দিরে সানৌ ঝরীমুরজমেঘজাঃ।
স্বনৈঃ প্রতিস্বনৈঃ স্পন্দা গম্ভীরা ব্যাপ্নু বন্ত তে॥ ৪
অস্মিন্ প্রসাদগম্ভীরে ব্যাপিনি প্রথমং হবিঃ।
তস্য বেধঘনীভাবে চোর্জ্জিতে দ্বিতীয়ং ততঃ॥ ৫
সুষুম্নামুখমুদ্দিশ্য তৃতীয়ং স্পর্শমন্তিমম্।
নাদে হ্যনাহতে তুর্য্যং জ্যোতিঃ সত্ত্বোজ্জ্বলে ভুরি॥ ৬
পঞ্চমং পরমে বিন্দৌ জ্যোতির্যত্র রসোঘনঃ।
বাক্প্রাণচিত্তসঙ্ঘাত আত্মা নাত্রাধরারণিঃ।
মাত্রাসঙ্ঘাত উর্দ্ধস্থা বা জ্যোতীরসমন্থনে॥ ৭

অদিতি হ্যপ্রমত্তেনোমেতি বেদ্ধব্যমিত্যপি।
প্রণবধনুযো লক্ষ্যং ব্রহ্ম বিন্দুপলক্ষিতম্।
শরো হ্যাত্মেতি নাদশ্চ বিন্দুলীনঃ স তন্ময়ঃ॥ ৮
সৃষ্টিস্থিতিলয়াংস্ত্রিস্রো নাদো মহাত্মনস্তপঃ।
শক্তিব্রহ্মঘনোবিন্দু স্ত্রীণি তত্ত্বানি জুহ্বতি॥ ৯
একো দেবো ইতিহ্যাদ্যঃ সর্ব্বব্যাপীতি মধ্যমঃ।
অন্তরাত্মেতি চান্ত্যো যোঽর্দ্ধমাত্রা শিষ্টমীহতে॥ ১০

আত্মার স্বরূপ অববোধে, ব্রতী তুমি ওঙ্কার সাধনে।
উদয় বিলয় মেরু ক্রমে, রত আছ তার-ব্যাহরণে॥
সত্য ভাব, হে মহান্ যাজ্ঞিক! শুদ্ধ আত্মসংবিত্তি অনলে।
প্রণবের পঞ্চমাত্রা ল'য়ে, কোষপঞ্চ আহুতি সাধিলে॥
অকারেতে অন্নময় কোষ, 'উ' এ প্রাণ, 'ম' এ মনোময়ে।
বিজ্ঞান-আনন্দ 'কোষ'রূপ, ত্যজি শুদ্ধ নাদবিন্দু লয়ে॥
পঞ্চকোষ বিনির্মুক্ত তুমি, শান্ত প্রপঞ্চের উপশম।
সেই আত্মা জান তারে বলি, শুনিয়াছ যে জ্যোতি পরম॥
ভাবের সরণি ধরি তুমি, রসকণা চল রসতমে।
মহানাম বাণী পঞ্চসখী, দূতী তব হ্লাদিনী সন্ধানে॥
স্থূলপঞ্চ বহি অপরায়, অন্তরের তিনেতে মিলাও।
ক্ষিতি-জল-অনল-অনিল-ব্যোমে নাম-স্বর-মন্ত্র দাও॥
অপরায় মগ্না পরাটির মধ্যমায় করিও উদ্ধার।
অপরার গুণীভূতা পরা, উত্তমায় প্রধানা তোমার॥
নাদরস কালিন্দী সিয়ানে, পরা হোক্ শুদ্ধ নিরমলা।
বিন্দু-অভিলাষা শুদ্ধ রসকণা, রসসিন্ধু পরমে মঞ্জুলা॥
সাংখ্যযোগপরায়ণ তুমি, পঞ্চপর্ব-সন্ধিনী সন্ধানী।
প্রণবের স্বর পঞ্চশর, সন্ধিবেধে অমোঘ অশনি॥
ধী ধনুতে 'জ্যা'টি যুঞ্জানা; আদি স্বরে স্থূল পর্ববিশেষেরে।
সূক্ষ্মে উ, গুণ মহানেতে ম, বিন্দুনাদ শুদ্ধ প্রধানেরে॥

পরম সে বিন্দুশূন্যতায়, উপশমে সর্বপ্রপঞ্চেরে।
পরিপূর্ণ অখণ্ড প্রকাশে, পূর্ণ কর নিখিল দ্বন্দ্বেরে॥
লয়যোগে কুণ্ডলী জাগৃতি, আদিস্বরে পূর্ণ কর কায়।
অন্তঃস্পন্দে, স্বনে প্রতিস্বনে, গভীর প্রসন্ন ব্যাপিতায়॥
কন্দর মন্দির সানুভূমি, নির্ঝর মুরজ মেঘমন্দ্রে।
ব্যাপ্ত যথা গম্ভীর স্পন্দনে, তথা সান্দ্র পূর্ণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে॥
কুণ্ডলী জাগৃতি লয় যাগে, আদি হবিঃ স্পন্দ কায়ব্যাপী।
উকারেতে বেধমুখী কর, ব্যাপিকায় ঊর্জিতৈকমুখী॥
অন্তিম যে স্পর্শবর্ণ তায়, সুষুম্নার মুখেতে হবন।
মূলাধারে অথবা দ্বিদলে, ঊর্জিতার যেথায় ভাবন॥
তুরীয় হবন সমাধান, হোক্ তব অনাহত নাদে।
যে নাদের হৃদয়ে উদ্ভব, ভুরি জ্যোতিঃ সত্ত্বসম্প্রসাদে॥
জ্যোতির পরম রসঘনে, বিন্দু লয়ে অন্তিম হবন।
আমূল এ বল্লী সহস্রার, শক্তিজ্যোতি-সামরস্যঘন॥
বাক্ প্রাণ চিত্তের ত্রিপুটী— 'আত্মা' নয় অধরা অরণি।
কিংবা উত্তরা, মাত্রামেয়া বাক্, পরায় পরম সম্মথনী॥
বর্ণত্রয় প্রণবের ধনু, অ স্বরেতে হও অপ্রমত্ত।
উম স্বরদ্বয়ে সাধ বেধ, লক্ষ্য ব্রহ্ম বিন্দুস্বরূপত॥
অনাহত নাদাত্মার শরে, লক্ষ্য সাধ স্থিতধী তাহায়।
'শরবত্তন্ময়' সিদ্ধি হোক্, নাদাত্মার বিন্দুলীনতায়॥
তিনে সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি, নাদ মহানাত্মা তপোময়।
বিন্দু শক্তিব্রহ্ম ঘনতম, (মহোদয়) আত্মবিদ্যা-শিবতত্ত্ব লয়॥
আদিস্বরে শ্রুত 'একদেব', উকারেতে শ্রুত 'সর্ব্বব্যাপী'।
'ম'এ সর্বভূত অন্তরাত্মা, 'কর্ম্মাধ্যক্ষ' নাদেতে সমাপি॥
সন্ধি 'সর্ব্ব অধিবাস', 'সাক্ষী চেতা' 'কেবল' 'নির্গুণ' বিন্দুলয়।
ক্রমান্বয়ে সমাপনে হও, ব্রহ্মভাব-পঞ্চ-সমন্বয়॥

জপসূত্রম্

(বঙ্গাভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেনসহ)

চতুর্থ খণ্ড

নিবেদন

বিন্দু হইতেই সিন্ধুর সৃষ্টি। জপসূত্র যখন সূত্রাকারে একদিন ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম কলেবর লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তখন সেই সূত্রেরই তায়ন ও বয়নে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সুবিপুল এই মহাগ্রন্থটি অধ্যাত্মশিল্পের এক বিচিত্র নিদর্শনরূপে নিজেকে মেলিয়া ধরিবে, তাহা কেহই কল্পনা করে নাই। দেখিতে দেখিতে শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় ইহার চতুর্থ খণ্ড এবার প্রকাশিত হইল। কোথায় বা কবে ইহার উপসংহার তাহার নির্দেশ বা বিজ্ঞপ্তি দানও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সাধারণ আত্মসচেতন রচনায় যেভাবে পরিসমাপ্তির একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া সকলে অগ্রসর হয়, এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ও অভাব রহিয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামিজী সব সময়ই ইহা অনুভব করেন যে ইহার রচনা তাঁহার কৃতি নয়, যিনি নিখিলের 'দৃষ্টিমতিরতিপ্রদঃ' ইহা তাঁহারই আপন বিচিত্র বিলাস, এক্ষেত্রে তিনি শুধু যন্ত্র মাত্র। সংস্কৃতে লিখিত মূল গ্রন্থখানি—পঞ্চশতাধিক সূত্রে এবং দ্বিসহস্রাধিক কারিকাশ্লোকে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত রহিলেও, সূত্রের ব্যাখ্যান-বিবৃতি-বিস্তারে এবং প্রসঙ্গাতঃ নব নব ছন্দোভাব-বৈভবময়ী শ্লোক-সৃষ্টিতে, গ্রন্থকলেবর অচিন্তিতভাবে বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়াই চলিয়াছে; সুতরাং, জপসূত্রমের প্রতিপাদ্য মূল বস্তুসংস্থা সুনির্দিষ্ট থাকিলেও, তৎসম্বন্ধে ধ্যানমননাদির যে ধারা ক্রমবর্দ্ধমানা হইয়া চলিয়াছে, তাহা যে কবে পরিপূর্যমাণতায় পৌঁছিবে, তাহা একমাত্র সেই সর্বপরিপূর্ণতাধারই জানেন!

অনেকের কাছে এরূপ পরিসমাপ্তি সম্পর্কে পরিকল্পনাহীন রচনা কোথাও কোথাও অসংবন্ধ দুর্বোধ্য ভাব ও ভাষাবিলাস বলিয়াই বোধ হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্ররসিকমাত্রই জানেন যে স্থূলতঃ নানা পরস্পরবিরোধী বিচ্ছিন্ন বাক্যরাশির মধ্যে সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্রটি আবিষ্কার করাই বিশারদী বুদ্ধির যথার্থ কাজ। যাঁহারা এটুকু পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ তাঁহাদের নিকট বেদ উপনিষদ্ গীতাদি সব অধ্যাত্মশাস্ত্রই অনেকস্থলে বিবিধ ব্যামিশ্র বাক্যের জটিলতা বলিয়াই বোধ হইবে। স্তূপীকৃত কাচখণ্ডের মধ্যে দুটি চারিটি মণিখণ্ডও হয়তো বা ছড়াইয়া আছে—তাঁরা ভাবেন।

বেদান্তদর্শন সেইজন্য ব্রহ্ম বা আত্মার প্রমাণ যে একমাত্র শাস্ত্র তাহাই শুধু 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রে বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরের সূত্রেই 'তত্তু সমন্বয়াৎ' বলিয়া এই অমূল্য সমন্বয়তত্ত্বটির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছেন।

জপসূত্রেও সেই মূল রাগিণীটি চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন সর্বাগ্রে। জপসূত্র মুখ্যত মন্ত্রশাস্ত্র, তাই ইহার নানা সুরলহরী ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্বমন্ত্রমূল সেই পরম ওঁকারকেই স্পর্শ করিয়া আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। ওঁকারের দ্বিবিধ প্রকাশ—একটি তার পাদের দিক্, অপরটি মাত্রার দিক্। চেতনার বিভিন্ন পর্ব ব্যাপিয়া যে প্রকাশ তাহা পাদের অভিব্যক্তি, তেমনি ঠিক তদনুরূপ স্পন্দনের উন্মেষ মাত্রা নির্দেশ করে। একদিকে জ্ঞানের ধারা, অপর দিকে ক্রিয়ার ধারা। স্পন্দনের আশ্রয়ে চেতনার উন্মেষই জপাদি সাধনের লক্ষ্য। জপসূত্রেও এই দুইটি দিকের আলোচনা সর্বত্র ছড়াইয়া আছেঃ একটি দুরূহ তত্ত্বালোচনার ধারা, অপরটি মন্ত্রাদি স্পন্দনের নিয়ামক বর্ণরসায়নের নিপুণ বিশ্লেষণ। যেমন এ খণ্ডে 'অক্ষর' প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় স্থান পাইয়াছে, তেমনি ওঁকারের বিভিন্ন বিবর্তনে কেমন করিয়া সাধারণের পক্ষে সুগম 'রাম' বা 'মা' নাম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারও বিচিত্র বিবরণ দেওয়া আছে। আমাদের দেশের অধ্যাত্মশাস্ত্র সর্বত্রই এই দুটি ক্রম অনুসরণ করিয়াছেনঃ পাতঞ্জল যোগদর্শনে সমাধিপাদে সমাধির লক্ষণ প্রভৃতি তত্ত্ববিচার উপন্যস্ত করিয়া সাধনপাদে সেই সমাধিলাভের উপযোগী ক্রিয়ার বর্ণনা করা হইয়াছে। গীতায় প্রথমেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুরূহ সাংখ্যযোগে আত্মতত্ত্বের দুরধিগম্য আলোচনার অবতারণা এবং পরে কর্মযোগাদি প্রসঙ্গে তাহারই সাধন সরণি পর্বে পর্বে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠও 'দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য' বলিয়া এই যুগ্মপক্ষের ইঙ্গিত করিয়াছেন—একটি 'সম্যগবেক্ষণম্' বা জ্ঞানধারা, অপরটি 'প্রাণস্পন্দনিরোধনম্' বা ক্রিয়ার ধারা। এই উভয় ধারার মধ্য দিয়া গুপ্তা সরস্বতীর মত ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিতা এবং এই ত্রিধারার সার্থক সমন্বয়ে মহাত্রিবেণীসঙ্গমে যিনি আপনাকে নিমজ্জিত করিতে পারেন, তাঁহারই সাধনা সিদ্ধির সফলতা ও পূর্ণতার মহিমায় মণ্ডিত হয়।

দুঃখের বিষয় আধুনিক যুগের প্রয়াসবিমুখ জনসাধারণের কোনো ধারাকেই নিষ্ঠার সঙ্গে ধরিবার বা বুঝিবার ধৈর্য নাই, অনুষ্ঠান তো দূরের কথা। কোনো

মহাপুরুষের নিশ্চিন্ত পদাশ্রয় লাভ করিয়া বিনা আয়াসে ভবসিন্ধু উত্তরণেই সকলে ব্যাকুল। কিন্তু যথার্থ 'আশ্রয়' লাভ হইলে যে নিরুদ্বেগ ও নিরাপত্তাবোধ জীবনকে অনাবিল প্রশান্তিতে ভরিয়া তোলে তাহার কোনো লক্ষণই কাহারও চিত্তে ফুটিতে দেখা যায় না। আমরা সকলেই ভুলিয়া বসিয়া আছি যে সংসারে বাসনার ধন বা সাধনার ধন যাহাই কিনিতে চাই তাহা যথার্থ মূল্য বিনা লভ্য নয়। 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ' অতি উপাদেয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু সেজন্য শুধু গদগদ উচ্ছ্বাসে দুই বিন্দু অশ্রুপাতেই কি তাহা মিলিবে? ভক্ত মহাজন তাই সঙ্গে সঙ্গে মূল্যটিও ধার্য করিয়া দিতে ভুলেন নাই— 'তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্' এবং তাহাও আবার 'জন্মকোটিসুকৃতৈ র্ন লভ্যতে'! 'জপসূত্র' আলোচনায় প্রবুদ্ধ করিতে গিয়া আশানুরূপ সাড়া যে মিলে না তাহার কারণই এ যুগের মানুষ মূল্যদানে অসম্মত, তপস্যায় বিমুখ, পরিশ্রমে কাতর। আমার পূজনীয়চরণ আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাই দুঃখ জানাইতেছিলেন যে সকলকেই তিনি এ অপূর্ব গ্রন্থটি পঠনে ও আলোচনে প্রোৎসাহিত করেন কিন্তু সকলেই ইহার দুরূহতার অজুহাতে অগ্রসর হইতে চান না। দুরূহকে বোধগম্য করার জন্য বুদ্ধির যেটুকু প্রয়াস ও সুস্থির বিনিয়োগ অপেক্ষিত সেটুকু তাঁরা করিতে নারাজ। তবে কালও অনন্ত, দেশও অসীম, সুতরাং এ মহাগ্রন্থ যে কোনো দেশে বা কালে নিষ্ঠাবান্ কোনো সাধকের হাতে পড়িলে তাঁকে উৎফুল্ল ও উল্লসিত করিয়া তুলিবেই এবং তাঁর সাধনায় নূতন প্রেরণা ও রস সঞ্চার করিবে—এই উদ্দেশ্যেই আমাদের গ্রন্থ প্রকাশন।

জপসূত্রের আর একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে এবং ইহা হইল এক একটি শব্দ ধরিয়া প্রত্যেকটি বর্ণবিশ্লেষপূর্বক তাহার নিগূঢ় মর্মার্থ ধরিবার প্রয়াস। এক্ষেত্রেও অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে ইহা কেবল যাদৃচ্ছিক কষ্টকল্পনা, কিন্তু ইহা আমাদের সুপ্রাচীন পদ্ধতিরই পুনরুজ্জীবন। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও নিরুক্তকার যাস্ক এবং তাঁহারও পূর্ববর্তী ঔর্ণবাভ, স্থৌলাষ্ঠীবি, শাকপূণি প্রভৃতি আচার্যগণ এই রীতিরই অনুসরণ করিয়া বেদের রহস্যার্থ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি তাহারও পূর্বে স্বয়ং ঋষিবৃন্দ উপনিষদেও বিবিধ বিদ্যার প্রসঙ্গে, যেমন উদ্গীথবিদ্যায় উৎ-গী-থ, প্রত্যেকটি অক্ষরের ব্যঞ্জনা লইয়া এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমাদের আধুনিক মার্জিত (?) ভাষাবিজ্ঞানী বুদ্ধির কাছে

এগুলি এখন হাস্যকর প্রয়াস বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু সাধনরাজ্যের গহনলোকে যিনিই প্রবেশ করিতে চান, তিনিই এগুলির নিগূঢ় সংকেতমূল্য বুঝিয়া ধন্য হন। নিগমে যেমন তেমনি আগমেও এই বর্ণবিশ্লেষণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বীজমন্ত্রাদি সব কিছুই এই স্বরব্যঞ্জনের নানাবিধ সংশ্লেষ-সমন্বয়ের রহস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি সমস্ত সৃষ্টির বিকাশ-রহস্যও এই বর্ণমালার মধ্যেই সংগোপনে সুরক্ষিত আছে। মন্ত্রমহেশ্বর অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রালোক' নামক মহাগ্রন্থে তিনটি মূল স্বর—অ, ই, উ-আশ্রয়েই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যোঽনুত্তরঃ পরঃ স্পন্দো
যশ্চানন্দঃ সমুচ্ছলন্।
তাবিচ্ছোন্মেষসংঘট্টাদ্
গচ্ছতোঽতিবিচিত্রতাম্॥

সকলের মূলে 'অনুত্তর'রূপে পরম পরিসীমায় রহিয়াছেন 'অ'কার; তারপর, নিজেকে একটু দীর্ঘ, বিস্তৃত করিয়া 'আ'কারে উচ্ছল 'আনন্দে'র সমুল্লাস; সেই আনন্দ হইতেই 'ই'কারে সৃষ্টির 'ইচ্ছা' বা কামবীজের উৎপত্তি এবং পরে 'উ'কারে সেই বীজেরই 'উন্মেষ' বা অঙ্কুরোদ্গম। সুতরাং 'অ আ ই উ' এই কয়টি স্বরের সংঘট্ট বা পরস্পর সম্মিলনেই এই অতি বিচিত্র বিশ্বের বিকাশ! সাধকের কাছে এই সংকেতের মূল্য অপরিসীম, কারণ ইহাই তাঁহাকে ধ্যানের নিবিড়তায়, সমাধির গভীর গহনে ডুবাইয়া দেয়। জপসূত্রও এই দিক্ দিয়া কত স্তোত্র-মন্ত্রের উপর যে অভিনব আলোকসম্পাত করিয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। পূজ্যপাদ স্বামিজী এসব ক্ষেত্রে আর্য ঋষিদের সনাতন ধারারই পুনরুজ্জীবন করিয়াছেন এবং সেই ঋষিজুষ্ট পথেই নানা বিলুপ্ত মণিমাণিক্য সমুদ্ধার করিয়া আনিয়া দিয়াছেন এবং ইহা যে তাঁহার কষ্টকল্পনার ব্যর্থ প্রয়াস নয়—ইহা জানাইবার জন্যই এ কথা কয়টির অবতারণা।

জপসূত্রের তৃতীয় খণ্ড পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অমূল্য ভূমিকায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রের দিক্ হইতে জপসাধনার নানা গূঢ় তাৎপর্য ও অজ্ঞাত তথ্য সকলের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এবার আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যবশত আর একজন বিশিষ্ট সাধক ও মনীষী

শ্রীমৎ অনির্বাণ বেদের দৃষ্টিতে জপরহস্য উদ্ঘাটনে অগ্রসর হইয়াছেন এবং একটি বহুমূল্য সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বেদের মধ্যে জপাদি সাধনের যে মূল সুগোপনে সংরক্ষিত আছে তাহার কিছু পরিচয় আপন সাধনলব্ধ প্রজ্ঞার ভাস্বর আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছেন। স্বপ্ন দেখি কবে এই সব মহামনীষী ও সাধকদের সমবেত সার্থক প্রয়াসে আবার আর্ষ সাধন বিজ্ঞান পুনরায় পূর্ণগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিবে! হয়তো আমাদের এই বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তাহারই সূচনা বা পূর্বাভাসমাত্র।

জপ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তত্ত্বের ভারে পীড়িত হইয়া অনেকের মন হয়তো ইহার বাস্তব কার্যকারিতা সম্বন্ধে আস্থা হারাইতে পারে এবং ইহা শুধু সার্থকতাবিধৃত বাক্যবিলাস এবং ভাববিলাস বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলে শ্রীগুরুদত্ত নাম বা মহামন্ত্র যে এখনও সাধককে কিরূপ কৃপা করেন তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সামান্য বিবরণ তাই এবার পরিশিষ্টের সর্ব শেষে গ্রন্থের উপসংহারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলি সাধকের একান্ত গুহ্যাতিগুহ্য অনুভূতির পরম গোপ্য বিবরণ, তাই সাধারণের কাছে প্রকাশে স্বভাবতই কুণ্ঠা আসে। তবে এই মহাসাধক এখন লোকলোচনের অগোচরে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাই ইহার প্রকাশে তাঁহার মহিমা প্রচারের দ্বারা কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বরং নামেরই মহিমা উদ্‌ঘোষণে লাভ আছে এই ভাবিয়াই প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। জপসূত্রের প্রকাশে এই মহাপুরুষের প্রেরণাই ছিল প্রথম ও প্রধান, তিনিই ছিলেন ইহার 'প্রাণ'। জপসূত্রের প্রতিটি কথা তাঁর দিব্য অনুভূতির বীণায় যে ঝঙ্কার তুলিত, তাহারই উল্লাস নিত্য নব রচনায় গ্রন্থকারকে উদ্বুদ্ধ করিত। সে আশ্চর্য আদানপ্রদান, ভাববিনিময় শুধু অন্তরেরই আস্বাদ্য ছিল এবং সে দিব্য আস্বাদনের স্মৃতি আজও হৃদয়কে অমৃতে ভরিয়া রাখিয়াছে। এই অপূর্ব বিবরণীটি পড়িবার সময় দুটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে: প্রথমত, সাধকের মধ্যে নাম যেন আপনি ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে, তিনি শুধু নীরব সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে দেহের বিভিন্ন অবয়ব হইতে তা'র উত্থান ও গতিভঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, শুধুই কেবল ধ্বনির স্পন্দন বা গুঞ্জনকে অনুসরণ করিলে তাহা যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্রে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু নাম যে চৈতন্যশক্তি তাহার পরিচয় তখনই মিলে যখন সংকীর্ণ জৈব চেতনা প্রসারিত হইতে হইতে দিব্য চেতনায় স্থিতি লাভ করে। ক্রিয়ার সার্থকতা যে বোধের উন্মেষে ও

ব্যাপ্তিতে বিবরণীর শেষাংশে ইহারই ইঙ্গিত দেওয়া আছে। 'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—ইহা জপরূপ কর্মে বিশেষভাবে প্রযোজ্য ও সর্বদা স্মর্তব্য।

প্রত্যেকবার পরিশিষ্টে যাঁহার একটি জ্ঞানগর্ভ রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধন করিতাম, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা সেই আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যে আমরা হারাইয়াছি। তিনি পূজ্যপাদ স্বামিজীর অগ্রজ ছিলেন এবং তাই আপন প্রতিভাবান্ সর্বত্যাগী অনুজের এই বিচিত্র রচনার প্রতি শুধু যে তাঁর গভীর মমতাবোধ ছিল তাই নয়, অন্তরের অনুভব দিয়া তিনি ইহা আস্বাদন করিতেন। সদ্‌গুরুর নিকট নাদসাধনায় দীক্ষিত হইয়া সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া গভীর মহানিশার নিথর মৌনতায় তিনি বিশ্বসঙ্গীতের ছন্দে ও সুরে আপন বীণাটি বাঁধিবার নিয়মিত প্রয়াস করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন এবং কৃষ্ণনগর কলেজের উপাধ্যক্ষরূপে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তারপর বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চাণ্ডুলিতে আপন গ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি সকলের অলক্ষ্যে নামসাধনায় ও জ্ঞানানুশীলনে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। দর্শন তাঁর অবসর বিনোদনের বিলাস ছিল না, জীবনের নিয়ামক ছিল। জ্ঞানে এবং রসে উভয়তই তাঁর জীবন সুসমৃদ্ধ ছিল। তাঁর পঠনের বিষয় এত বিস্তৃত ছিল যে তাহা দর্শনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সাহিত্য বিজ্ঞান চারুকলা প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই সমান রস ও প্রেরণা লাভ করিত। আপন গভীর চিন্তারাশিকে তিনি প্রত্যহই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ইদানীং বেদের নানা তত্ত্ব, বিশেষ করিয়া 'সোম', তাঁহার একান্ত ধ্যানের বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার রচনাবলীর অংশবিশেষ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিতে পারিব আশাকরি। জপসূত্রের বিরল বোদ্ধার আর একজনও চলিয়া গেলেন, এ শূন্যতা আর পূর্ণ হইবার নয়।

কলিকাতা
দশহরা
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৩

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
(অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ)

জপসূত্রম্

বিশ্বকল্প-অক্ষমালার মেরু—সূর্যতত্ত্ব

পূর্বখণ্ডে শেষভাগে সূর্যপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু তার সমাপন হয় নাই। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' এক মৌলিক রহস্যগর্ভ যুগ্ম তত্ত্ব। এই নিখিলভুবন এক মূর্ত মহান্ জপ। বহির্বিশ্বে ঐ পরিদৃশ্যমান ছায়াপথ এই বিরাট্ জপের 'আভাসিক' অক্ষমালা। 'আভাসিক' এইজন্য যে, আমাদের এই Galactical system তো সমগ্র বিরাট বিশ্ব নয়; একে যদি এক ব্রহ্মাণ্ড বল, তবে বিশ্বে এরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। ইহা বিজ্ঞানের সম্মত কথা। আমাদের 'এই' ব্রহ্মাণ্ডে 'এই' সূর্যের মত কোটি কোটি সূর্য দেদীপ্যমান, সন্দেহ নাই। কিন্তু 'সূর্য্যতত্ত্ব' বলিতে এদের কোনটিকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া বুঝিলে চলিবে না। এদের কোনটি 'আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' নয়। তবে প্রত্যেকটি স্বাধিকারে পূর্বালোচিত 'মিত্রাগ্নি' সঙ্ঘাতের প্রতীক। প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত 'আত্মনীন' এবং 'অধ্বনীন'—এতদুভয় মৌলিক বৃত্তির (basic function এর) সামঞ্জস্য-সংস্থাপক 'নাভি' আকৃতি—যেখান থেকে শক্তি তেজঃ আকারে (as kinetic energy) 'অর' এবং 'নেমি' (as process paths and as field or sphere) নিজেকে এক বিশিষ্ট সংস্থান দিয়াছে এবং দিতে চাহিতেছে। বিরাটের বার্তা যতদূর আমরা লইতে পারিয়াছি, তাতে সামঞ্জস্য-সংস্থাপন প্রয়াসের কোন 'ধ্রুব' সংস্থা এখন অবধি পাই নাই। সামঞ্জস্য সমীকরণ (Harmony Equation) এখনও কোথাও ধ্রুব এবং পূর্ণ সমাধানে আসে নাই। ওখানেও হিসাবে— Probability and Statistical Calculus। সুতরাং বাহির বিশ্বে কোথাও "খাঁটি" সূর্যতত্ত্বকে আমরা জানি নাই। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে মহাজপরত, সে জপের অক্ষমালা এখনও গণিত বিদ্যার কল্পলোকে। সেই কল্প-অক্ষমালার 'মেরু' হইলেন সূর্যতত্ত্ব। বিশ্ব তাঁতেই বিধৃত; বিশ্ব কখনই তাঁকে লঙ্ঘন করে না।

আণবী অক্ষমালার মেরু—সূর্যতত্ত্ব

অণুর বিশ্বেও nucleus মিলিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছেও। একটা বিন্দুর মত সরল স্বভাবে তার আবির্ভাব ঘটে না; তার বিপ্লব-বিবর্তনাদিও সরল সমীকরণের সহজ নক্সায় পড়িতেছে না। অণুর অভ্যন্তরে সত্যকার 'নাভি' এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—আণবী জপমালার সেই মেরু, যাহাতে ইলেকট্রন, প্রোটনাদির সকল গতি বিধৃত রহিয়াছে, এবং যে মেরুকে, যে মেরুর প্রশাসনকে কাহারও সুষম অথবা বিষম গতি (rhythmic or eccentric motion) লঙ্ঘন করিতে সাহসী নয়, অণুর মধ্যে সেই 'এতসৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে' এর কেন্দ্রটি হইল সূর্য। অত্র ইহা প্রাণ এবং আদিত্যরূপে অণু ও মহান্, ব্রহ্ম এবং দহর, দুইকে এক অদ্ভুত সন্ধি সমন্বয়ে মিলাইয়াছে। শক্তি (Energy) নিজেকে প্রাণ পর্যায়ে তুলিয়া না দেখান' পর্যন্ত এই পরমাশ্চর্য সন্ধি সমন্বয়টি বোধে ও বুদ্ধিতে সম্ভাবিত হয় না। প্রাণই আপনাকে বীজকণিকাটি আকারে ঘনীভূত করিয়া বলে—দেখ, আমি কত বিপুল, কত বিচিত্র, কত অদ্ভুত!! ব্রহ্ম প্রাণরূপেই হইয়া থাকেন সেই আদিজীব—হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্য=পরম সমঞ্জস ঘনীভাবরূপ। এই ঘনীভাব সত্তা শক্তি এবং ছন্দঃ—এ তিনেরি ঘনীভাব। এই পরম সমঞ্জস ঘনীভাবটি 'গর্ভে', কিনা, নাভিতে না থাকিলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এ তিন ব্যাপারই কোথাও সমঞ্জসভাবে, কিনা, ছন্দে সাধিত হয় না, কোন Law, System বা Equation এর অনুবৃত্তিতে আসে না। সূর্য এই 'হিরণ্য'কে বিশেষভাবে 'গর্ভিত' এবং 'ঊর্জ্জিত' করিয়াছেন। এই গর্ভিত এবং ঊর্জিত হিরণ্য বিশ্বে সর্বস্তরে সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ আকৃতি আধান করিতেছে।

বিশ্ববিধানে হিরণ্যরেতাঃ সূর্য

জড়ের দেশে হিরণ্যরেতসের আধান যে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাকে বলে বিধান (Formulation)। Energy as Rest Mass and Energy as Mass in Motion–স্থির জড়ত্ব আর অস্থির জড়ত্বের নিয়ামক বিধানের উদ্ভব এইখানে। হিরণ্যরেতাঃ এই সব ক্ষেত্রে বিধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াও, তাদের স্বয়ং কোন না কোন ধ্রুব সংখ্যানে (Cosmic Constant এ) বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন। Mass এবং Energy র যে সমীকরণ সূত্র, তাতে প্রসংখ্যান মূর্তি হিরণ্যরেতাঃ স্বয়ং 'c' এই আকারে প্রবিষ্ট

হইয়াছেন। ঊর্জিতের স্থলে যে সমস্ত মূল বিধানসূত্র, তাতে তিনি ‘i’ ‘π’ ইত্যাদি আকারে বিশ্বের ‘জগৎ’ এবং ‘প্রসরৎ’ ভাব বিভাবন করিতেছেন।

বিধান ও আধান—জড় ও প্রাণের দেশে

প্রাণের দেশে আসিয়া বিধান হয় আধান। এই আধানই হিরণ্যরেতসের অকুণ্ঠিত, অনবগুণ্ঠিত, অলুণ্ঠিত রূপ। বিধানের যে ‘বি’ তার সঙ্গে আধানের ‘আ’ সংহত হইয়া ‘ব্যাকৃত’ এবং ‘ব্যাকরণ’ আকার পাইল। প্রাণ ব্যাকৃত হইয়া, প্রাণের ব্যাকরণে হইল ছন্দঃ। জড় বিশ্বের বিধান হইল এই প্রাণচ্ছন্দের ছদি এবং ছদ্মরূপ। জড়ের মূল বিধানে যে ‘সম্ভাব্যাসুর’ (Demon of Chance, Probability Function) আপন ‘আমোল’ মাগিয়াছিল, প্রাণের ভূমিতে সে আর ‘অসুর’ রহিল না, হইল ‘সুর’। জড় বিশ্ব যেন কংসকারা; Quantum Statistics ইত্যাদি অসুরমল্ল সে কারার প্রহরী। Schrodinger যে সব সমীকরণের কূলকিনারা পাইলেন না, ভারতের Bose তাদের সমাধান করিয়া, ঐ অসুরমল্লদের অবশ্যই বরখাস্ত পরওয়ানা জারি করিলেন না, তাদের ঘাটতি ‘বল’ পূরণ করিলেন। তাতে হইল ভালই। কেননা, তাদের বল যেখানে ‘পূরা’, সেখানেই (তার আগে নয়), অসুরের ‘অ’-কারটি মোছার সুরু। সেখানেই মধুকৈটভ দৈত্যযুগল লড়াই-এ তুষ্ট হইয়া বলিবে—বর মাগো, আমরা তোমার বধ্য হইব।

কারামল্ল যার সাথে তাদের চরমবল পরীক্ষা দিবে, সে তো দেবকীনন্দন প্রাণগোপাল, ছন্দোদুলাল। প্রাণ জড়ের ক্ষেত্রে আসিয়া যে নিগূঢ় নিপুণ লড়াইটি করে, সে লড়াই এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার। একটা ধূলিরেণু আর একটা বীজকণাকে ক্ষেত্রে পাশাপাশি রাখিয়া লক্ষ্য করিয়া যাও। আমরা বিশেষ করিয়া ‘প্রাণপাদে’ এই বিধান এবং আধানগত বিভেদটি আলোচনা করিব। বিধানের দেশ মুখ্যতঃ বন্ধের দেশ; এই বন্ধের গ্রন্থিগুলি বেধ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের যে স্বভাবচ্ছন্দোমঞ্জীর নৃত্য, তার সাড়া মিলে না। সুতরাং প্রাণের আধাতা যে সূর্য সে সূর্য তোমার বন্ধবিধি, সংখ্যা-সংখ্যান সূত্রের প্রেক্ষাগৃহের পটান্তরালে প্রতীক্ষমাণ। প্রাণ হইল সেই বিশ্বরসায়ন, যাহা বন্ধবিধিকে ছন্দোলাস্যে লীলায়ন করে; সংখ্যা-সংখ্যানকে লইয়া সাংখ্যে পরিণীত এবং প্রসংখ্যানে সমন্বিত করে। সংখ্যাদির পূর্বকথিত লক্ষণগুলি আবার স্মরণ করিয়া লও, তা হইলে কথাগুলি আর প্রহেলিকার মত ঠেকিবে না।

বিশ্ববিধানের নিয়ামক—সংখ্যা-সংখ্যান সাংখ্য অভিমুখে একমুখী

প্রাণবিজ্ঞান না হইলে সৌরবিজ্ঞান হয় না। প্রাণকে কলনী এবং ফলনী দুই আকৃতিতেই চিনিতে হয়। প্রথম আকৃতিতে এক সদা প্রত্যক্ষরূপ-কাল। ফলনী আকৃতিতে ইহা-দেশ। এ কাল অবশ্য শূন্য ধারামাত্র—mere vacuum continuity নয়; আর, এ দেশও Space as vacuity নয়। বর্তমান বিজ্ঞানবিদ্যায় এই দুইকে মিলাইয়া বিশ্ববিধির যে আধার পরিকল্পিত হইয়াছে, সে আধার অবশ্য প্রাণের 'আধান' ক্ষেত্র হয় নাই। কাজেই সে আধারে সূর্য এখনও অনুদিত, তবে বিজ্ঞানের পশ্যন্তী দৃষ্টিতে উদীয়মান। সংখ্যা-সংখ্যানের বিচিত্র বহুমুখী রেখাগুলি আসিয়া সাংখ্যে একমুখী হইতেছে, সন্দেহ নেই। প্রাণ মনের (ইন্দ্রিয়াভাস এবং বিসম্বাদিনী কল্পনার) বিক্ষেপক সমূহ নিরসন করিতে করিতে বিশ্বনাভিতে স্থিতা যে ধী (Cosmic Reason), তাতেই সকল মননের 'অর' সমর্পণ করিতেছে। ইহাই সাংখ্য।

বিশ্বভুবনচক্রনাভি সূর্যে পাঁচটি অর সমর্পিত

আরও গহনে অগ্রসর হবার আগে এই কারিকা দুটি ভাবিয়া রাখ—

কলনী ফলনী সূর্য্যে চলনী রুক্মরেতসি।
সমর্পিতা অরাঃ পঞ্চ চাকর্ষণী বিকর্ষণী॥
প্রত্যেকং দশধা কৢপ্তং পঞ্চাশদিত্যতঃ স্থিতে।
একমাত্রৈকনেমিঃ স একপঞ্চাশদক্ষরঃ॥ ১-২

রুক্মরেতাঃ সূর্য বিশ্বভুবনের নাভিতে। সে নাভিতে পাঁচটি অর সমর্পিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চকের নাম—কলনী, ফলনী, চলনী (চরণী), আকর্ষণী, বিকর্ষণী (অথবা সঙ্কোচনী, প্রসারণী)। এই অর পঞ্চককে প্রণব (সবিতা স্বর) এর পাদ পঞ্চকের সঙ্গে যথাযোগ্য অন্বিত করিয়া ভাবনা করিও। যথা কলনী=অ; চরণী=উ; ফলনী=ম; প্রসারণী=নাদ; সঙ্কোচনী বা আকর্ষণী=বিন্দু। এস্থলে বিকর্ষণী দ্বারা বিতত-ব্যাপিকা শক্তি এবং বৃত্তি বুঝিবে।

ঐ অরপঞ্চকের প্রত্যেকটি আবার দশধা কৢপ্ত বা আবির্ভূত। যথা, দশদিক্।

কাল প্রভৃতিকেও অনুরূপ বিশ্লেষণে বিশ্বব্যাপারে মিলাইতে হইবে। প্রাণপাদে দেখিব যে, প্রাণ স্বয়ং নিজেকে দশধা কল্পপ্ত করিতেছেন—আপন বীজটিকে (হিরণ্যগর্ভকে) দশধা 'জপের' নিমিত্ত। সংখ্যা ব্যবহারের মূল (স্বাভাবিক) এই 'দশ' (Decimal Notation)। বিশেষ বিশেষ স্থলে (অনুবন্ধে) ইহা সপ্তাদিও হইয়া থাকে। সংখ্যাবিজ্ঞান (Theory of Numbers) সংখ্যাকে সংখ্যানের মূলসূত্র অনুসরণ করাইয়া সাংখ্যে উপনীত করার প্রয়াস করিয়াছে। সূর্য প্রসংখ্যান রূপে আদিম শুদ্ধ মূল সংখ্যাটি (Pure Root Prime Number) ব্যাপদেশ করেন (Posits Himself)। কালে এবং দেশে সেই মূলটিকে বহুধা ব্যাকৃত করেন। বিশ্ব তো সংখ্যা-সংখ্যানরূপী এক মহান্ অশ্বত্থ পাদপ। 'ঊর্ধ্বমূলং অধঃশাখম্'। 'ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি'। ছন্দাংসি জড়পরিচ্ছেদের (Physical limitation) ভূমিতে নামিয়া = Theory of Number and Magnitude।

একপঞ্চাশৎ

এ সব প্রসঙ্গের পরে পুনশ্চ অনুসরণ হইবে। এ স্থলে মিলিল ৫ × ১০ = ৫০, পঞ্চাশৎ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি যদৃচ্ছাকল্পিত নয়। তাই কারিকায় 'কল্পপ্ত' বলা হইল। ইট্ বিধানে যে বৈকল্পিকত্ব, সেটি এখানে নেই। এই পঞ্চাশতের সঙ্গে এক যোগ কর। কে সেই এক? সেই এক তত্ত্ব, যিনি পঞ্চাশৎ অর বিস্তার করিয়াও স্বয়ং 'একমাত্র' (একনাভি, একনেমি ইত্যাদি) রূপে অদ্বিতীয় বিরাজমান আছেন।

অতঃপর বিশ্বকে বাঙ্ময় ভাবনা কর। তা হইলে সূর্য=স্বরব্যঞ্জনময়ী মাতৃকা। স্বয়ং একনাভি সবিতাস্বর (প্রণব) রহিয়াও ইনি স্বরব্যঞ্জনাদি আকৃতিতে পঞ্চাশৎ অর বিস্তার করেন; স্বয়ং একনেমিরূপে সে অরসমূহকে একাক্ষ এবং একাধ্বগ করেন (common axis and orbit)। পরে দেখিব যে, এই স্বরব্যঞ্জনময়ী মাতৃকা অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু পরিগ্রহপূর্বক 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' এই রহস্যযুগ্মকের যে চন্দ্রমা, তাঁকে (অর্থাৎ, স্বধা, সোমশক্তিকে) বরণ করেন। বিসর্গযোগে (চন্দ্রমস্) নাদমুখ্যতা (স্বাহা, অগ্নি); অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু যোগে বিন্দুমুখ্যতা। সূর্য, চন্দ্রমা এবং চন্দ্রমস্ এই যুগ্ম 'পক্ষ' বিস্তার করতঃ অণুবিরাট্, অন্তর্বহিঃ বিশ্বে অগ্নীষোমীয় সমতাবিধান করিতেছেন।

স্বরব্যঞ্জনের মাতৃকারূপ

মাতৃকার স্বরব্যঞ্জন এক এক বর্ণ সবিতাস্বর (প্রণবের) নাভিতে সমর্পিত এক একটি অর। এ অরগুলির আধারে কেবল যে বাঙ্ময় জগৎ আবর্তিত হইতেছে, এমন ভাবিও না। আর, জপসূত্রমের আলোচনায় এ কথাটা সম্ভবতঃ সুস্পষ্ট হইয়া থাকিবে যে—অকার-ককারাদি স্বরব্যঞ্জন কতিপয় arbitrary notations নয়। জড় বা স্থূল পরিচ্ছেদে আসিয়া স্বরব্যঞ্জন 'বিখর' বা বৈখরী হইয়াছে বটে, কিন্তু তারা সবিতাস্বর প্রণব এবং প্রাণেরই কুণ্ঠিতাদি রূপ। প্রাণই প্রচোদয়িতা এবং প্রবক্তা। প্রাণভূমিতে (সূর্যতত্ত্বে) বর্ণ নিত্যস্ফোট। এটি মধ্যমার ভূমি। মুখ্য প্রাণবৃত্তিরূপা মধ্যমা—'এষা জাগর্ত্তি'। বাক্ একদিকে বৈখরী, অন্যদিকে পশ্যন্তী থেকে আপনাকে যেন 'সংবৃত' করিয়া এই প্রাণমাতৃকা মধ্যমার কুক্ষিতে বিশ্রান্ত হন। তখন বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই মধ্যমা-মাতৃকা-মাধ্যমে প্রজাপতি ব্রহ্মা পশ্যন্তী ভূমিতে নিরুদ্বেগ অধিকারটি পাইলেন। তুমি আমি জপকর্মে ইহারই মাধ্যমে যেন প্রথমতঃ বৈখরী ভূমিতেই নিরুদ্বেগ, স্বচ্ছন্দ, সমর্থ ব্যাহরণটি লাভ করি! মধ্যমার সঙ্গে অর্দ্ধমাত্রার সম্পর্কটি প্রণিধান করিও যেন।

জপ এবং জপাক্ষরাদি জড় পরিচ্ছেদে এবং তদতীত ভূমিতে কিরূপ?

সংক্ষেপতঃ মধ্যমার প্রসঙ্গ করিয়া এইবার পশ্যন্তীতে সূর্য ব্যপদিষ্ট হইতেছেন নীচের এই কারিকায়—

মিত্রাবরুণয়োশ্চক্ষুশ্চক্ষুরগ্নেশ্চ ভাস্করঃ।
অপরঞ্চ পরং সন্ধিং পশ্যন্তী রাজতে স্বভাঃ॥৩

বেদমন্ত্রে সূর্য, মিত্র, বরুণ অগ্নির চক্ষুঃ শ্রুত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এই তিনকে যথাক্রমে অধ্যাত্ম, অধিদৈবত এবং অধিভূত—এ তিনভাবে বুঝিয়া লইতে পার। বলা বাহুল্য, এরূপ ভাবনায় ধী বা বুদ্ধি এক প্রসজ্যমান অবচ্ছেদকতা মানিয়া লইল। প্রসজ্যমান কোনবিষয় বুঝিতে গেলে বুদ্ধির এরূপ একপ্রকার অবচ্ছেদকতা (relevancy ruling) মানা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শাস্ত্র তাৎপর্য বিনিশ্চয়ে তাই

আচার্যবর্গ ষড়্লিঙ্গাদি (উপক্রম প্রভৃতি) সূত্র ধরিয়া চলেন। কিন্তু তাই বলিয়া মিত্র, বরুণ প্রভৃতি আর্ষবিজ্ঞানের রহস্য পরিভাষাগুলি জড়পরিচ্ছেদে (rigid inelastic sense- এ) আবদ্ধ করা যাতে না হয়, সে পক্ষে সদা সজাগ রহিতে হইবে। তাদের (জপের ভাষায়) বৈখরীতে রাখিলে চলিবে না; মধ্যমায় প্রাণপর্যায়ে তুলিয়া স্বচ্ছন্দ, মুক্ত করিতে হইবে। যেমন, জড়-পরিচ্ছেদে (in the context of physical appreciation and interpretation) অণু-বিরাট্ সর্বত্র যে আবৃত্তি এবং অভ্যারোহ (উদ্‌বর্তন) জপ চলিতেছে, প্রাণভূমিতে সে জপ অপেক্ষাকৃত মুক্ত (free, spontaneous) এবং স্বচ্ছন্দ (selective, creative, purposive) আকৃতি 'আবিষ্কার' করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের 'অজপা' 'শুদ্ধ হংসঃ' (প্রাণ, সূর্য) আকৃতি পাইতে প্রয়াস করে। প্রাণের ভূমিতে এখানেই অভ্যারোহ জপের সূচনা। এর ফলে জড় পরিচ্ছেদের (physical setting- এর) নব রূপায়ণ এবং রসায়ন আরব্ধ হয়। যে সূর্যচন্দ্রমা ইড়াপিঙ্গালা নাড়ীতে 'প্রাকৃত' অজপাজপ নির্বাহ করিতেছেন, তাঁরাই উক্ত রূপায়ণ এবং রসায়নটি ঘটান।

পদার্থের তিন অবস্থান—অপর, পরাপর এবং পর

এখন, কারিকার শেষ ভাগের অর্থ কি দেখ। পদার্থের (কারণ ও কার্য উভয়েরি) তিন অবস্থান—অপর, পরাপর (সন্ধি) এবং পর। অপর অবস্থানে ক্রিয়া-কারক-ফল এ তিন ত্রিভুজের তিন বাহুর মত 'সংহত' হইয়াও 'যেন' স্বতন্ত্র এবং অসমগ্র (specified)। পরাপর বা পরাবরে ক্রিয়াকারক দুয়ে যেন মিলিয়া এক হইল (কারকই ক্রিয়ারূপ হইল)। যেটি ছিল ত্রিভুজ, সেটি হইল রেখা। রেখাকে rigid করিয়া দেখিও না, vector করিয়া দেখ as tracing a path। সুষম ছন্দে আসিলে (in rhythmic relation) একে বলে অধ্বনীন। অধ্বগ হয় অধ্বনীন। তারপর, যেখানে ক্রিয়া-কারক-ফল একত্র হইয়া এক বিন্দুতে (বিন্দুর লক্ষণ ভাবনা কর) সমাপ্ত হয়, তখন হয় পর অবস্থান। বলা বাহুল্য, অখণ্ড, সমগ্র, সমতার স্থান ব্যতীত এই পরাবস্থান সম্ভাবিত হয় না। ক্রিয়াদির বদলে অপর যে কোন ত্রিপুটী লইয়া পরীক্ষা কর। সংক্ষেপে বলা হইল, পরে দৃষ্টান্তস্থলে বিস্তারিত হইবে।

এ সম্বন্ধে দৃষ্টি চতুষ্টয়ী

ভাস্করের যে স্বভাঃ (বরেণ্যং ভর্গঃ), সেটি অপর, পরাপর এবং পর, এ তিন অবস্থান সম্বন্ধেই পশ্যন্তী। 'দিবীব চক্ষুরাততম্' মন্ত্রের মর্ম এই পশ্যন্তীতে। কিন্তু পশ্যন্তীকে যদি পরাবরের প্রান্তে শেষ করিয়া রাখা যায়, তবে, পশ্যন্তীর পারে পরা। অপরা, পরাপরা, পরা এবং পরমা—এই চারিটি 'পাদে' বিশ্বতশ্চক্ষুঃ সূর্যনারায়ণ বিশ্ব ঈক্ষণ করিতেছেন। এই ঈক্ষণ চতুষ্টয়কে নীচের কারিকানুযায়ী ভাবনা করিতে পার—

পরা গৃহ্ণাতি সামগ্রীং সমস্তঞ্চ পরাপরা।
ব্যস্তঞ্চ যাঽপরাদৃষ্টিঃ পরমা ব্রহ্মদৃক্ স্বয়ম্॥ ৪

দেশকালসহকৃত নিখিল কার্যকারণজালকে তার নাভি অথবা বিন্দুস্থিত হইয়া যে দৃষ্টি 'সামগ্রী' ভাবে দেখে (সকল গণ্ডী, অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদের পারে যাইয়া), তাকে বলে পরা দৃষ্টি। সমস্ত (বা integrally) দেখে পরাপরা। সামগ্রীর সঙ্গে সমস্তের ভেদ ভাবনা কর। কোন পদার্থ সংশ্লেষ-বিশ্লেষে (analytically and synthetically) দেখিয়া জানিলাম যে, এটি ঠিক এইভাবে হইয়াছে অথবা হইতেছে। এরূপ দেখাতে তৎসম্পর্কীয় 'গ্রন্থি'টি ভিন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে সংশয়ও ছিন্ন হইল, এবং তদনুরোধে যে কর্ম প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তারও ক্ষয় হইল। কিন্তু নিখিল-তত্তৎ-পরিচ্ছেদাদির পারে, তার অখণ্ড আধারভূত 'সামগ্রী', তাতে পৌঁছিয়া বুদ্ধির যে সমস্তীকরণ (integration), তার বিশ্রান্তি ঘটিল না। বিজ্ঞানের সমস্তীকরণ অনেক কিছু গ্রন্থিভেদ, সংশয় নিরসন, সমীক্ষা-পরীক্ষার উপসংহার করা সত্ত্বেও জড় পরিচ্ছেদে আসিয়া থমকিয়া রহিয়াছে। জড়ের বিধান এখনও তো কৈ প্রাণেরই ছন্দঃরূপে পরিচয়ে ও পরিণয়ে আসিল না। প্রজ্ঞানের সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ—তাই না এখনও প্রহেলিকাময়! তবে ভরসার কথা এই যে, পরাপর দৃষ্টি পরার পরোবরীয়ান্ প্রকাশেই ফুটিতে চায়। পরাই তার আদর্শ, তার লক্ষ্য। অপরা যে দৃষ্টি, সে ভাগ, অংশ, কলা (sections, aspects, partials) লইয়াই ব্যস্ত। শেষকালে, পরমা ব্রহ্মদৃক্ স্বয়ম্। পরার সঙ্গে এই সূক্ষ্ম অথচ মহাশ্চর্য ভেদটি চিন্তা করিও। পরায় দৃষ্টি বিন্দুস্থা বলা হইয়াছে। পরমে বিন্দুর শূন্য এবং

পূর্ণ দুই-ই পারম্যে যাইয়া, পরমশূন্য তথা পরমপূর্ণরূপ পরমাশ্চর্য প্রকাশস্থিতি হয়। সিন্ধুঘন বিন্দু আর বিন্দুঘন সিন্ধু—এ দুয়ের পরম সমীকরণটি পরিনিষ্ঠিত হয়। এ দৃষ্টিচতুষ্পদীর কল্যাণে যে শ্রেয়ঃ ফলচতুষ্টয়, তা পরের কারিকায় বলা হইতেছে—

দৃষ্ট্বা পরাবরং গ্রন্থেঃ পরং দৃষ্ট্বা মূলস্য চ।
দ্বৈতাদ্বৈতস্য পারম্যং ভবেদুপশমঃ ক্রমাৎ॥ ৫

সূর্যনারায়ণের ঈক্ষণের ফলচতুষ্টয়

পরাবরগ্রাহিণী দৃষ্টি কি করে? গ্রন্থিভেদ। জপসূত্রমে হৃদ্দেশ, হৃদয় এবং হৃৎ স্বতন্ত্র করিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অপরাদৃষ্টি পদার্থের হৃদ্দেশগ্রন্থি মোচনে ব্যাপৃত। কথাটা ভাবিয়া দেখ। পরাবরা হৃদয়গ্রন্থিও ভেদে পটীয়সী হয়। তবে, ক্রমান্বয়ে—progressively। শ্রুতির মন্ত্র এই ক্রমান্বয়ের যেটি কাষ্ঠা, সেটি নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, পরাবরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লইয়াছেন। তারপর, 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'—পরবস্তুতে দর্শন করিলে 'মূল', কিনা নিখিলের মূল যে প্রকৃতি তার উপরম হয়। পরবৈরাগ্য এবং প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষ সাক্ষাৎকারের কথা চিন্তা কর। সমানে সমানেই সাধ অথবা বাধ সম্পূর্ণ হয়। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার (realization) না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতিরূপা যে মূল বা পরকারণভূমি, তার 'বাধ' হয় না। সাধ পূরণেই বাধ সম্পূর্ণ। শেষকালে পারম্যটি দর্শন করিলে দ্বৈতাদ্বৈত এতদুভয়ের অতীত যে পরম তূষ্ণীম্ভাব, সেটি অপাবৃত হয়। সেথায় কে কাকেই বলে—দেখ আমি দুই নহি, বহু নহি, এক! সূর্যনারায়ণের এই চতুষ্পাৎ ঈক্ষণ শিবতমং রসতমমস্তু!

ঐ সাগর-সন্ধানে তটিনীর দৃষ্টান্ত

জড় পরিচ্ছেদে অপরাদৃষ্টি আর বৈখরীবাকে ইনি প্রথম পাদটি প্রথমতঃ বিন্যাস করুন। ফলে, জড়ের জড়ত্ব আর বৈখরীর খরত্ব প্রাণের লীলানিপুণ ছন্দে সাগরাভিসারিণী তটিনীর মত আপূর্যমাণ হইয়া চলুক!

তটিনী রোধসা বন্ধমূর্ম্মিরন্যোন্যসঙ্করম্।
উচ্ছ্বাসঃ স্রোতসা ভঙ্গাং সিন্ধৌ জুহোতু ছন্দসা॥
অর্কেণাধানভাবশ্চ সোমেনোচ্ছূনরূপতা।
মহিম্নি ভাবনং ভানোশ্চন্দ্রমসো রসায়নম্॥৬-৭

তোমার অপরা প্রকৃতি এবং দৃষ্টি, তোমার বৈখরী বাক্ আর 'জড়' জপ, ঐ কৃশকায়া তটিনীর মত ক্লিষ্টচরণে চলিয়াছে সাগরেরই অভিসারে, সন্দেহ নেই। সে আকূল অপেক্ষায় চলিয়াছে—কবে তার তটের ভঙ্গুর বন্ধন, তার বক্ষে উচ্ছৃঙ্খল বাতপ্রহত ঊর্মিজটলা, বীচিবিক্ষোভ (অন্যোন্য সঙ্কর), সাগর সন্নিকটে আসিয়াও তার আপন স্রোতোবেগপরবশ হৃদয়োচ্ছ্বাস, সে নিঃশেষে সিন্ধুর মহামহিম ছন্দে সঁপিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে? কিন্তু ওগো তটিনী! বল তুমি কবে জানিবে তোমার তটিনীনাথের ঐ যে সব আপূরিত, পরিপূরিত করিয়া দেয়া মহিমচ্ছন্দঃ, তার আধান এবং স্বরূপভাবন করিতেছেন, অর্ক-ভানু; আর উচ্ছূন-উচ্ছ্বাসে তার 'রসায়ন' করিতেছেন—সোমচন্দ্রমা? কথাগুলির ভাবে কবির ভাবের পরশ, আর ভাষায় তাঁর রঙের তুলির ছোঁয়াচ লাগিল বটে, কিন্তু জড় পরিচ্ছেদ থেকে প্রাণের অনুচ্ছেদে তোমার জীবন ও সাধনকে তুলিয়া নেবার যে ঋত এবং মধুচ্ছন্দঃ তারই বাধ থেকে সাধের সরণিটি এখানে দেখান হইল।

তটিনী দৃষ্টান্তের অনুসরণ—তিন রকমের বাধা

জড় পরিচ্ছেদ থেকে প্রাণ অনুচ্ছেদে যাবার সরণিটি উচ্ছেদ-বিচ্ছেদের ধ্বংস পর্বের মধ্য দিয়া নয়। তাই ঐ সাগরগামিনী তটিনীর উপমা। গিরি তুষার কারার কোন্ নিভৃত কন্দরকক্ষে কোন্ চিররহস্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে তার জনম; সেখান থেকে বন্ধু-বন্ধুর কত না বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়া ঋজু-কুটিল কত না দীঘল বর্ত্ম ধরিয়া, তার এই অবুঝ মরমী অভিসার! রোধঃ বা তটের বন্ধন বিজাতীয়, বাইরের বাধা, পরিচ্ছেদ। ভঙ্গুর, তবু আছেই। বুকে ঊর্মিসংঘর্ষ, বীচিবিক্ষোভ সজাতীয়, ভিতরকার বাধা, তবে প্রকটবাধা, গোপন-গহন নয়। আর, জোয়ারে তার উতল হৃদয়টি যখন উছল, উদ্বেল হইয়া ওঠে—সে যখন বোঝে তার দরদী বিপুল বঁধুয়ার আকুল মরমী টান, তখন যে

তার ঐ গোপনগহন তলটি থেকে কে যেন বলে—আমার কতদিনের, কতযুগের আপন বেগের ঋণ, আমার এতকালের মজুদী চাহিদার দাবী তোমার না মিটিয়ে তো যাওয়া হবে না। এটা হইল অপ্রকট ভূমির সঞ্চিত সংস্কার ব্যূহের বাধা, স্বগত বাধা। এ তিনকে তোমার জীবনে ও সাধনে ঋতচ্ছন্দ আর মধুচ্ছন্দের শাসনে না আনিতে পারিলে, তোমার গতিস্থিতির জড়ত্ব (বন্ধ-সংঘর্ষভঙ্গ) যে কিছুতেই চেতনার ও প্রাণের 'ওর' হীন আলোক-পুলকে ভরিয়া স্বচ্ছন্দ হইবে না।

সূর্য-চন্দ্রমা—এই যুগ্মতত্ত্বের ভজনে ক্রমশঃ তেজস্বী, ওজস্বী, মনস্বী এবং আত্মন্বী হও

স্বভাবের দুটি পক্ষ—স্বরূপ ও স্বরস। সূর্য জ্যোতিঃ দ্বারা স্বরূপ-আবরণ উন্মোচন করতঃ তাকে ফোটাইয়া তোলো—'ওঁ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা'—এই আবরণাহুতি মন্ত্রে। আর, স্বরসের আপ্যায়ন হৌক্ চন্দ্রমায়—'ওঁ সোমোরসো রসঃ সোমঃ স্বধা'। অথবা সোম সম্বন্ধীয় কোন সমর্থ বেদমন্ত্রে। 'হ্সৌং' এবং 'গ্লৌং' এই বীজদ্বয়কে এতৎপ্রসঙ্গে ধ্যান করিবে। সমস্ত কিছু পদার্থে প্রাণ, চেতনা এবং রস জাগৃতি, বিভূতি এবং বিস্তৃতির জন্য এই সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যুগ্মতত্ত্ব ভজনীয়।

বন্ধং জহি সহিষ্ণুঃ সন্ বিক্ষোভঞ্চ তিতিক্ষয়া।
ধীরো ভূত্বা জয়েদ্ ভঙ্গাং সম্প্রসীদার্ণব-সঙ্গমে॥৮

জড়িমার যে তিনটি বাধার প্রসঙ্গ পূর্বে হইল, (তটিনীর দৃষ্টান্তে) সে তিনটিকে জয় কর—প্রথমে সহিষ্ণু, পরে তিতিক্ষু, তার পরে ধীর হবার সাধন করিয়া। এ তিনের সিদ্ধি সমাপনে ঐ তটিনীর মতই সিন্ধুসঙ্গমে সম্প্রসন্ন হও (সম্প্রসীদ)। সূর্যনারায়ণের প্রত্যক্ষ তেজঃ ভজনা করিয়া সহিষ্ণু হও। সে তেজকে যদি বল সহঃ, তবে সেই সহঃ তোমায় সহনশীল করুক। এর দ্বারা তুমি সাহসী এবং তেজস্বী হও। আন্তর তেজঃ—প্রাণভূমিতে সাক্ষাদ্ভাবে যেটি প্রভাব বিন্যাস ও বিস্তার করে, তাকে যদি বল ওজঃ, তবে তুমি তার দ্বারা ওজস্বী এবং তিতিক্ষু হও। আর নাভিনিষ্ঠ তেজঃকে যদি বল ভর্গঃ, তবে সে ভর্গঃ তোমার ধীকে ধীর হবার জন্য 'প্রচোদয়াৎ'।

মনস্বী হও। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এর যে চন্দ্রমাঃ, তার তেজঃকে যদি বল রোচিঃ, তবে সে রোচিষের দ্বারা সবিতার ভর্গঃ হউক 'বরণ্যেং', ধীরের আপ্যায়নে হউক সম্প্রসন্ন। আত্মন্বী হও।

বৈখরী প্রভৃতি বাক্-চতুষ্টয় দ্বারা কিভাবে অমৃতে অভিনিষ্পন্ন হইবে?

চতস্রো হি গিরঃ পাদাঃ সবিতুঃ পুরুষস্য বৈ।
পাদোঽস্য গোচরং বিশ্বং ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৯

বৈখরী প্রভৃতি চারিটি বাক্ সবিতা যে পুরুষ তাঁর চারিটি পাদ। তাঁর একটি পাদ (বৈখরী) এই গোচর বিশ্ব। ইঁহার মধ্যমাদি অপর তিন পাদ 'দিবি'—কিনা, এ গোচরের উর্দ্ধে যে লোক—তাতেই বিদ্যমান। সেই সাধারণ গোচরাতীত 'ত্রিপাৎ' অমৃত জানিবে। অর্থাৎ, অমৃতের পান্থ তুমি, মৃত্যু থেকে অমৃতে সরণি ঐ মধ্যমাপ্রমুখ তিনটি পাদের মাধ্যমেই জানিবে।

নেমিজ্ঞানেন মৃত্যুং বৈ দ্বে যানে চারবিদ্যয়া।
অমৃতং নাভিনিষ্ণাতো বিশ্বচক্রস্য জানত॥ ১০

এই ভুবনচক্রের যেটি নেমি (দেশাবচ্ছিন্ন কালনেমি—The Time path as traced on the board of cosmic configuration), সেটিকে বিশেষভাবে জানিলে মৃত্যুবিজ্ঞান লব্ধ হয়। প্রকারান্তরে সংখ্যাবিজ্ঞানে (জড়ে Quanta ইত্যাদির, প্রাণে অজপা, হংস ইত্যাদির) মৃত্যুবিজ্ঞান। এখানে সংক্ষেপে প্রসঙ্গ করা হইল। অরবিদ্যায় (অর্থাৎ, বিশ্বচক্রবিধারক যে সকল মূল ছন্দঃ তাদের বিজ্ঞানে) দেবযান পিতৃযান, শুক্লা কৃষ্ণা গতি ইত্যাদি অতিক্রান্তি বিজ্ঞান লব্ধ হয়। প্রথমে উৎক্রান্তি, পরে অতিক্রান্তি। এই অরবিদ্যাকে সাংখ্য-প্রত্যক্সংখ্যান বিজ্ঞান বলিয়াও বুঝিবে। শেষকালে, বিশ্বচক্রের যে নাভি (সবিতা) তাতে 'নিষ্ণাত' হইতে পারিলে, অর্থাৎ, সাংখ্য প্রসংখ্যান দুই-তেই নিষ্ঠিত হইলে সাক্ষাৎ অমৃত। নি+স্নাত, এই দুইভাবে

সাংখ্য এবং প্রসংখ্যান এতদুভয়ের গ্রহণ হইবে। প্রসংখ্যানে নাভি বিজ্ঞাতও হয়, আবার চক্রসংস্থাবচ্ছেদক রূপে বিদীর্ণও হয়। জড়ের দেশে Nuclear Physics- এ এটি সম্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যস্ত-বিপ্লবীভাবে; প্রাণের ভূমিতে এটি সহজেই হইতেছে, কিন্তু তবু কিন্তু ব্যষ্টি-সৃষ্টি আকারে। এই নিমিত্ত, বিশ্বের মৃত্যু-নেমিতেই, সংসৃতিতেই, সেটি প্রক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।

ভূর্নেমিং জহি বৈখর্য্যা মধ্যময়া ভুবর্হ্যরম্।
স্বর্নাভিং জহি পশ্যন্ত্যা পরয়া তুর্য্যগো ভব॥ ১১

চক্রের যে গোচর নেমি ('এই'), তাকে যদি বল 'ভূঃ', তবে তার-চক্র-সমাচরণ বিধিতে তোমার বৈখরী জপ সে নেমিকে জয় করুক। এই ভাবে 'ভুবঃ' যে অর, তাকে জয় কর মধ্যমায়। পশ্যন্তী দ্বারা নাভি (স্বঃ), এবং 'ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ স্বাহা' রূপে পাদত্রয়ে তোমার জপহবন আহুতিটি দিয়া, শেষকালে পরায় এ তিনের অতীত, তুর্যগ হও। এই অবয়বত্রয় আবার যথাক্রমে ফল (resultants), ক্রিয়া (lines of operative energy) এবং কারক (origin operative centre) ইত্যাদি রূপ। পশ্যন্তী পর্যন্ত (যে পশ্যন্তী পর ও পরমেও যায়, তাকে না ধরিয়া) ক্রিয়া-কারক-ফল-নিষ্পাদ্যতা বিদ্যমান থাকে। পরা স্বতোনিষ্পন্ন, সেখানে আর নিষ্পাদ্যতা নেই। এ তিনের অতীতা বলিয়াও পরা তুরীয়া বা তুর্যগা।

বাক্-চতুষ্টয়ের দ্বারা সূর্য-নারায়ণের চতুর্ব্যূহ রূপ ধ্যান করতঃ তেজস্বী, ওজস্বী ইত্যাদি হও

প্রদ্যুম্নো বৈখরী গীশ্চানিরুদ্ধো মধ্যমা মতঃ।
সঙ্কর্ষণশ্চ পশ্যন্তী সূর্য্যনারায়ণঃ পরা॥ ১২

এইবার বৈখরী প্রভৃতি চারি বাক্‌কে সূর্যনারায়ণের চতুর্ব্যূহ রূপে ভাবনা কর। বৈখরী প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ মধ্যমা, পশ্যন্তী সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেব সূর্যনারায়ণ স্বয়ং

পরা। 'বাসুদেব' এবং 'নারায়ণ' এই দুই শব্দের যেটি নিগূঢ়ভাব, সেটিও সূর্যতত্ত্বে সুসমঞ্জস হইয়াছে। ধ্যান দিও।

বৈখরী গোচরঃ সূর্য্যো মধ্যমা প্রাণরূপতঃ।
মহাংশ্চৈব পশ্যন্তী প্রধানাধ্যক্ষতা পরা॥
তেজ ওজস্তথা জ্যোতির্ভর্গো লভেত সংবিদি।
জ্যোতীরসো রসজ্যোতিঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিতি॥ ১৩–১৪

প্রত্যক্ষগোচর যে সূর্য, তাঁর সমাশ্রয়ে এবং তাঁর প্রসাদে বৈখরী সিদ্ধি হয়। ফল, তেজঃ। প্রত্যক্ষ বিশ্বে সূর্য (তেজঃ) শক্তি এবং ছন্দঃ এ দুয়েরই বিপুল আধার ও ভাণ্ডার। সুতরাং, সাবিত্রী গায়ত্রী জপাদি কর্মে তোমার ব্যষ্টি আধারটাকে তেজঃ এবং ছন্দে আপূরিত করিয়া লও। সূর্যকে সমাশ্রয় করতঃ বিশেষভাবে 'সন্ধ্যামুপাসীত'। ইহা সূর্যের 'পূর্ব' হিরণ্যগর্ভরূপ। তৎপরে জড় পরিচ্ছেদের বন্ধাদি অপনীত হইয়া যাইতে থাকিলে সূর্যকে প্রাণরূপে সদা স্বচ্ছন্দোগ দেখ মধ্যমায়। তখন হৃদ্দেশ হইয়াছে 'হৃদয়'। ফল, ওজঃ। তারপর, সূর্যকে সাক্ষাদ্ বা 'মধ্যম' হিরণ্যগর্ভ বা 'পূর্বাদুত্তর' হিরণ্যগর্ভরূপে ধ্যানে মিলিলে (ধীমহি), তিনি হন 'মহান'। এ মহানকে দ্বৈতদর্শনের মহদ্‌বুদ্ধির দৃশ্যমাত্র ভাবিও না। এখানে প্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভের পূর্বরূপ, এবং মহান্‌রূপে উত্তররূপ বলা হইল। ইনি দেন জ্যোতিঃ পশ্যন্তী। উত্তর হিরণ্যগর্ভরূপে সূর্যনারায়ণ মহান্ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। সত্ত্ববিশাল যে মহদ্‌বুদ্ধি (Cosmic Reason), তাকে তিনি উপাধি করতঃ দৃগ্-দৃশ্য-উভয়থা আপনাকে 'যেন' অন্যোন্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া সমস্ত কিছু দর্শন করেন। তোমার জপাদি সাধন পশ্যন্তী গ্রামে তুলিয়া লইয়া মনস্বী, জ্যোতিষ্মান্ হও।

হিরণ্যগর্ভরূপে সূর্যনারায়ণের পূর্ব, উত্তর, মহোত্তর, অনুত্তর—চারিটি ভূমি। অপর এবং পরাপর, এ দুয়ের প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টির উন্মেষ হইল। কিন্তু, এখনও অবশেষ—পরভূমি। মহানের পর প্রধান। এই মহা অশ্বত্থ পাদপে সমস্তদৃষ্টি হইলে তাতে অপরাদৃষ্টির শেষ; পাদপের 'উর্দ্ধমূল'টি সমস্তভাবে (comprehensively) দৃষ্টিতে আসিলে, পরাপরা দৃষ্টি। আর, মূলেরও মূল যে পরিণামী অক্ষর বীজ, তাতে

সমগ্র (সর্ব্বতোঽবগাহিনী) দৃষ্টি হইলে, পরা। এখানে সূর্যনারায়ণ প্রধানের অধ্যক্ষতা করেন, কেননা, তিনিই—একাধারে 'নিধানং বীজমব্যয়ং' এবং 'বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ'। যদি হিরণ্যগর্ভ আখ্যাটি রাখ, তবে ইহা তুরীয়। 'সমুত্তর' বা 'মহোত্তর' (মহান থেকেও উত্তর) বলিতে পার। এ ভূমিতে সৌর তেজঃ এবং প্রকাশের যে রূপ, তাকে বল—ভর্গঃ। ছন্দঃকে সন্ধিতে রাখিয়া চন্দ্রমায় ইনি হন রোচিঃ। এরও পারে (তুরীয়াতীত) এক ভূমিও আছে। তাকে বল অনুত্তর। তদুত্তর আর নেই এও বটে, আবার সেখানে কোনও জিজ্ঞাসার উত্তর নেই, কেননা, সকল জিজ্ঞাসা তথায় পরমাবসান। তবে, 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' এই যুগলকে কিছুতেই ছাড়িতে না চাও তো বল—ইহা একাধারে জ্যোতীরস এবং রসজ্যোতির ভূমি। এ কিন্তু একান্ত অভিন্নযুগল। তুমি শুধু একবার সূর্যে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলে—জ্যোতীরস; আর একবার চন্দ্রমায় রাখিয়া বলিলে—রসজ্যোতিঃ। একবার ঋষি, একবার কবি। একবার দ্রষ্টা, একবার রসিক।

এইবার সাধনের দৃষ্টান্ত—অভ্যারোহের সোপান চতুষ্টয়

বাক্‌চতুষ্টয়সম্বন্ধি হ্যভ্যারোহচতুষ্টয়ম্।
বাধাচতুষ্টয়ং তেন জহি গ্রন্থিচতুষ্টয়ম্॥ ১৫

পূর্বোক্ত বৈখরী প্রভৃতি চারিটি বাক্, এবং তত্তন্নিরূপিত চারিটি ভূমি, জপাদি সাধনে অভ্যারোহের সোপান চতুষ্টয়রূপে আশ্রয় করিবে। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ'—এই যুগ্মতত্ত্ব উক্ত অভ্যারোহে প্রচোদয়িতা, নির্বাহয়িতা, বিভর্তা, রসয়িতা এবং আপ্যায়য়িতা। গায়ত্রী এবং মধুমতী ঋক্‌দ্বয়কে ইঁহারা যথাক্রমে 'ভর্গসা' এবং 'মধুনা' (রোচিষা) বিনিয়োগ করেন। ছন্দঃ 'মিত্র'রূপে উভয়ের সন্ধি। এ সন্ধিতে আসিয়া সূর্য (হংস) হন 'ঋতং বৃহৎ', আর চন্দ্রমাঃ হন 'মধুক্ষরৎ'। এখন, এই সন্দীপনী 'অম্' আপ্যায়নী দুটি ধারাকে অবিনাভাবে বহমানা রাখিয়া, অবরোধাদি পূর্বোক্ত বাধা চতুষ্টয়কে এক এক সোপানভূমিতে ক্রমে জয় কর। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিচতুষ্টয়ও বটে।

যথা বৈখরী জপজাত তেজোদ্বারা দেশনিমিত্ত বাধা—অবরোধ—জয় কর। সে

জপে যে রস মিলে, তদ্ দ্বারা হৃদ্দেশ গ্রন্থি (জড়িমা, স্ত্যান, তামসভাব) মোচন কর—যেন বুকের একটা শক্ত গাঁট খুলিয়া গেল; আর, জপ কণ্ঠ থেকে কষ্টে নয়, বক্ষঃ থেকে সহজেই আসিতেছে। তারপর, মধ্যমায় আসিয়া কালজন্য বাধা—প্রতিরোধ—পরিহার কর। তুমি না চালাইলেও সে চলে। তখন, 'জপ হওয়া'। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়গ্রন্থি (রাজস) মোচন হৌক্। শ্রুতি এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদের পরিসীমা বা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জপসূত্রতেও তনু রজাঃ প্রভৃতি রজোমার্জনের ক্রমগুলি বলা হইয়াছে। তারপর, বিরোধ ও নিরোধ রূপ বাধাদ্বয়, এবং দুই প্রকারের হৃদ্গ্রন্থি—হৃল্লেখাকে স্বচ্ছন্দে ফুটিতে দেয় না' যেটি, সেটি ছন্দোগ্রন্থি; আর হৃদ্বিন্দুকে স্বভাবে অপিহিত রাখে যাহা, সেটি বস্তুগ্রন্থি। পশ্যন্তী এবং পরার ভূমিতে যাইয়া এই দুই মর্ম্মৌকঃ গ্রন্থি মোচন কর। বেদের 'জাতবেদসে' মন্ত্রদ্বারা, প্রথম বাধা এবং গ্রন্থি; 'ত্র্যম্বক' মন্ত্র দ্বারা কালবাধা এবং হৃদয়গ্রন্থি; 'মধু বাতা' দ্বারা ছন্দোগ্রন্থি এবং বিরোধ বাধা; আর 'গায়ত্রী' দ্বারা বস্তুগ্রন্থি এবং নিরোধ বাধা পরিহারে অভ্যাস কর। গায়ত্রীর 'বরেণ্যং' পদে সবিশেষ অবহিত হইবে। কেননা, এই স্থলে অগ্নীষোম, মিত্রাবরুণ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাক্ষাৎ সঙ্গত হইয়া এক এক বর্ণ দ্বারা এক এক বাধা ও গ্রন্থি মোচনায় উৎসুক রহিয়াছেন (ব+রে+ণী+য়ম্)। 'জাতবেদসে' মন্ত্রে 'আ' স্বর, 'ত্র্যম্বকে' 'ই' স্বর, 'মধু বাতা'তে 'উ' (মউ) স্বর, আর গায়ত্রীতে স্বয়ং ওঙ্কার (অউম নাদবিন্দু) ব্যাহরণ এবং অনুস্মরণে মুখ্যতায় রহিয়াছেন। দেশনিমিত্ত অবরোধ অপসারণে 'আ'; কালনিমিত্ত প্রতিরোধ নিরসনে 'ই' ও 'ঈ'; ছন্দোগত বিরোধ পরিহারে 'ম' যুক্ত 'উ'; এবং বস্তুগত নিরোধ অপনয়নে নাদবিন্দু-মেরু সমাশ্রিত 'অউম' সবিশেষ সাধিষ্ঠ, ইহা মনে রাখিও। সঙ্গীতে সুষম স্বরবিতানে 'আ', সুস্পন্দ স্বর প্রলম্বনে 'ই', উদারায় সুগম্ভীর বেধনে 'উ', এবং স্বরের স্বালয়ে নাদশয়নে 'অউম' সমাশ্রয় করিতে হয়। রস আবেদনের দিক দিয়াও এ সবের নিজস্ব ব্যঞ্জনা আছে।

পুনশ্চ,: বৈখরী সিদ্ধিতে হঠযোগ, মধ্যমায় লয়যোগ, পশ্যন্তীতে মন্ত্রযোগ, এবং পরায় রাজযোগ সিদ্ধির সীমায় উপনীত হও।

অভ্যারোহ চতুষ্টয়ে সমর্থ বীজচতুষ্টয়

হ্রীমৈমাদীনি চত্বারি বীজানি বৈ যথাক্রমম্।
সপ্রণবানি যুঞ্জীত বৈখর্য্যাদিষু সিদ্ধয়ে॥ ১৬

বৈখরী প্রভৃতি অভ্যারোহের চারিটি ভূমিতে প্রণবসহ হ্রীঁ ঐঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই বীজ চতুষ্টয়কে যথাক্রমে সিদ্ধিকাম সাধক যোগ করিবেন। অর্থাৎ বৈখরীতে ওঁ হ্রীঁ, মধ্যমায় ওঁ ঐঁ, পশ্যন্তীতে ওঁ শ্রীঁ এবং পরায় ওঁ ক্লীঁ—এই মন্ত্র যোগচতুষ্টয় বাধা এবং গ্রন্থি অপনোদন পূর্বক তত্তদ্ভূমির সুষ্ঠুভাবে সাবকাশতাবিধানে সাধিষ্ঠ বুঝিবে। সর্ববিধ জড় পরিচ্ছেদ ছিন্ন করিতে প্রথম বীজটি বজ্র; প্রাণ প্রবাহকে উর্দ্ধগ ও ধামগ করিতে দ্বিতীয়টি; জড়িমমুক্ত, প্রাণসমৃদ্ধ সর্বাবভাসক সত্ত্বের সকল সম্পদ্ পূর্ণাৎ পূর্ণতর করিয়া ফোটাইয়া তুলিতে তৃতীয়টি; আর, স্বধামের যেটি সমগ্রতা এবং পরিপূর্ণতা, তাতে তুলিয়া দিবার নিমিত্ত তুরীয় বীজটি। প্রণব সঙ্গে, অধ্ব এবং ধাম এ দুয়ের আধাররূপে আছেনই। বাকের স্বভাবই হইল প্রণব। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এই স্বভাবের স্বরূপ-স্বরস কলন, ভরণ, পোষণ করেন। স্বয়ং স্বভাবে রহিয়া অক্ষরাদি সমস্ত কিছুতে অগ্নিমাত্রা, সোমমাত্রাদির সন্ধিবন্ধন করেন, এবং 'বরেণ্যং' আকৃতিতে তাদের সমতা-সমন্বয় বিধান করেন।

বাকে যে যুগ্মতত্ত্ব বীজের বীর্যে এবং শ্রীরূপে পাইলে, তোমার বহিঃপ্রকৃতিতে সে যুগ্মতত্ত্বকে মূর্ত বিগ্রহরূপে সন্দর্শন কর—

বহিঃপ্রকৃতিতে যুগ্মতত্ত্বের সন্দর্শন

বনস্পতির্বিবস্বান্ য ওষধিঃ সোমরূপতঃ।
গামাবিশতি যুগ্মং বৈ পয়ঃ সোমো হবী রবিঃ॥ ১৭

ঐ যে অশ্বত্থাদি বনস্পতি দেখিতেছ, উহাকে বিবস্বানের মূর্ত বিগ্রহরূপে দেখিবে। কেন—তা প্রাণপাদে সবিশেষ কথিত হইবে। ওষধি সোমের রূপ। কেবল

'পুষ্ণামি' নয়, সোমই ওষধি আকৃতি ধরিয়াছেন। এও পরে প্রাণপাদে বিবেচিত হইবে। পুনশ্চ, ঐ যুগ্মতত্ত্ব 'গামাবিশতি'—গো, পৃথিবী ইত্যাদিতে ব্যাপ্তিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গাভীরূপা গোতে যে পয়ঃ (রস), তাহা সোম; আর, যে হবিঃ (তেজঃ), তাহা রবি (অর্ক) জানিবে। গো=বাক্ ধরিয়া বিশ্লেষণ পূর্বেই করা হইয়াছে। সূর্য-সোম এইভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন বলিয়া ধাত্রী (আমলকী), বিল্ব, অশ্বত্থাদি বনস্পতি সমাশ্রয়ে জপাদি ফলপ্রদ; বনস্পতির দারু সমিধ্‌রূপে হোমাদিতে প্রশস্ত। তুলসী একাধারে বনস্পতি ওষধির যুগলতনু; সুতরাং, তুলসীর ভজনায় (সোম বা রসের মুখ্যতা নিবন্ধন) রসজ্যোতিঃ (প্রোজ্জ্বল রস) আপনীয়. রুদ্রাক্ষাদিতে জ্যোতীরস।

ওষধি বনস্পতির ফল-পত্র-পুষ্পাদিতে ঐ সূর্য-সোম যুগ্মতত্ত্ব প্রণিধান করিবে। প্রণিধান সূত্রটি এইভাবে বুঝিয়া লইবে—

জড়ে বিধীয়তে বুদ্ধিঃ প্রাণ আধীয়তে হি সা।
শুদ্ধসত্ত্বে সমাধানং সন্ধানমনুচেতসা॥ ১৮

যতক্ষণ জড়-পরিচ্ছেদে রহিয়াছ, ততক্ষণ বুদ্ধি (বোধ, মনন-বিচার) সেই জড়-বিধানেরই বাধ্য হয়; বোধ-বিচারাদি জড়ীয়ই হইয়া থাকে। সূর্যনারায়ণের সাক্ষাৎ প্রভাবমণ্ডলে আসিয়া বিশ্বে ওতপ্রোত যে প্রাণ, তৎপর্যায়ে আসিলে বুদ্ধির 'আধান' হয়, বুদ্ধি 'আহিতা' হয়। তা হইলে, ওষধি, বনস্পতি, গাভী, নক্ত, ঊষা, পার্থিব রজঃ ইত্যাদিকে বদ্ধ সঙ্কীর্ণরূপে দেখিলে না, মুক্ত, উদার, স্বচ্ছন্দরূপে দেখিলে। তারপর, অনুচেতসের দ্বারা অনুসন্ধান ও সন্ধান সুরু হয়—বস্তুর নাভি, হৃৎ, স্বরূপের। এই সন্ধান সমাপন হইয়া সমাধান হয় শুদ্ধ সত্ত্বে। 'অনুচেতস্' শব্দটিতে অবহিত হও। 'নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ'—এই আন্ধ্য, এই জাড্য হইল অচেতসের তমসার দেশ। 'অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ'—এটি প্রত্যক্ বা অনুচেতসের অনুসন্ধিৎসা এবং অনুসন্ধানের সন্ধানী রশ্মিসন্নিপাতের ভূমি। বহিঃক্ষেত্রে দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণাদিতে যেমনটি করিতে হয়। এরপর কয়টি ভূমি পরে অন্তে সেই 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'। এটি পরম ও সমগ্র—এই ভাবে যদি হয় (as Pure

Consciousness and as Perfect Consciousness), তা হইলে পরেরটি সম্পর্কে বলা যায়—প্রচেতসঃ। এই পদটি বহুবচনে প্রয়োগ না করাই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে বল প্রচেতাঃ। ইনি 'চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ' এবং 'আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'। ইনিই একর্ষি। তথা, একসূরি।

ভাবৃত্তি ও মধুবৃত্তির একত্র বিনিয়োগ

ভাবৃত্ত্যা মধুবৃত্ত্যা চ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দ্বয়ম্।
আলোচনে রসাস্বাদে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১৯

বুদ্ধির দুটি মুখ্যা বৃত্তি—একটি আলোচন, অপরটি আস্বাদন। এ দুটিকে ভাবৃত্তি আর মধুবৃত্তি বল। বেদে—ঋচা ও সাম্না। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এতদুভয়কে যুক্ত করিয়া (যজুষা), স্বয়ং যুগ্মতত্ত্বরূপে আমাদের বুদ্ধিসমূহকে (ঋতেন ভর্গসা সত্যেন মধুনা) প্রচোদিত করুন। এ যুগ্মতত্ত্বের যেটি যজুঃ (আহুতি) রূপ, সেটি সাবিত্রী এবং মধুবতী ঋক্ দুটির অন্যোন্য পাদপুটিত মন্ত্রসহকারে হবনে অপূর্ব জ্যোতীরসের নির্ঝর অঝোরে বহাইয়া দিয়াছে।

নিখিল বাচ্যবাচকাদিতে পাদমাত্রা কলাকাষ্ঠার বিনিয়োগ

পাদমাত্রে কলাকাষ্ঠে বীজেষু বৈজিকেষুচ।
বিদধাতে বিবস্বাংশ্চ চন্দ্রমা বেদমাতরি॥ ২০

বাগ্‌বীজে (যথা, প্রণব) অথবা বাচ্যবীজে (যথা, পাদপবীজ), কিংবা বাগ্‌বাচ্যবীজ থেকে যৎকিঞ্চিৎ সমুদ্ভূত (বৈজিক), সে সকলে পাদমাত্রা, কলা-কাষ্ঠা মূল 'অবচ্ছেদক' (categories) অবশ্যই প্রসক্ত (necessarily applicable) হইয়াছে। প্রণব অথবা কোন গাছের বীজ লইয়া এটি বুঝিয়া লইও। বেদমাতা গায়ত্রী স্বয়ং পাদমাত্রাদি বিজ্ঞানের এবং বিনিয়োগের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল। যথা—সপ্রণব ব্যাহৃতিত্রয়সহ গায়ত্রী চতুষ্পদী; অগ্নি ও সোমমাত্রা হিসাবে এতে চতুর্দশমাত্রা, আর,

কালমান (time measure) হিসাবে ষোড়শমাত্রা; এবং উদয় বিলয় দুই প্রণবে চারি চারি মাত্রা ধরিলে চতুর্বিংশতি মাত্রা। মধ্যমার ভূমিতে প্রণবদ্বয়ের উদয় এবং বিলয়বিন্দু। বৈখরীতে আসিয়া (বাচিকাদিরূপে ত্রিধা) চারিটি পাদে বিতান বা বিক্রমণ। উদয় বিলয় দুটিকে পাদদৃষ্টিতে 'সেতু' বল। মধ্যমার সেই আরম্ভ অবসান বিন্দুটিকে বল 'মেরু'। এখানে দুটি পরদায় বা গ্রামে গায়ত্রী লেখাটি দেখান হইল। কিন্তু বৈখরীর নীচে তিন, আর উপরে তিন গ্রাম ধরিয়া 'সপ্তগ্রামে' লেখাটি আলোচিত হইতে পারে। হওয়া উচিতও বটে।

শয়ীথাঃ, মা লজ্ঘীঃ

কলা বলিতে উদয় (প্রাতঃ), বিতান (মধ্যাহ্ন) এবং বিলয় (সায়াহ্ন) এই তিন বুঝিতে পার। অন্যভাবেও হইতে পারে। আর, কাষ্ঠা বা সীমা মধ্যমার ঐ মেরু বিন্দুটি। এখানে শয়ীথাঃ। মা লজ্ঘীঃ।

গায়ত্রীর দৃষ্টান্তে সূর্য চন্দ্রমা,—রাকা ও অমাবস্যা

প্রয়োজনীয় বোধে গায়ত্রীর দৃষ্টান্ত (আদর্শরূপে) বলা হইল। এখন, পাদমাত্রাদি এই আকৃতি চতুষ্টয়কে বিবস্বান্ এবং চন্দ্রমাঃ সহযোগে conjointly 'বিদধাতে'। এর মধ্যে পাদমাত্রায় বিশেষতঃ সৌরমুখ্যতা, কলায় কাষ্ঠায় সোমমুখ্যতা। যেমন, শুক্লা কাষ্ঠা পৌর্ণমাসী, কৃষ্ণা অমাবস্যা।

বরেণ্যমিতি চিদ্ব্যোম্নি সূর্য্যচন্দ্রৌ সহোদিতৌ।
রাকা পূর্ণোদয়ে তত্রামাবস্য বিন্দুশায়নে।
অমেতি নিত্যপূর্ণায়াং কলায়াং বসতস্ততঃ॥ ২১

গায়ত্রী দৃষ্টান্তের অনুসরণ হইতেছে। 'বরেণ্যম্' এই পদে সূর্যচন্দ্রমা স্ব স্ব মহিমায় (ভর্গঃ এবং রোচিঃ) সহোদিত হইয়াছেন। এ এক পরমাশ্চর্য সম্মেলন। তারচক্রে এটি উর্দ্ধশিখর (zenith)। এটি রাকারূপে যুগ্মতত্ত্বের পূর্ণোদয়ের স্থল। এ রাকায় আবিঃ এবং রাত্রি উভয়েরই আপন আপন জ্যোতির সম্পূর্ণতা বুঝিও। ইহা

পূর্বোক্ত যে সপ্তগ্রাম বা ধাম (বৈখরীকে মাঝে রাখিয়া 'ধনে ঋণে' উপরে তিন, নিম্নে তিন), তাদের যে মধ্য নিরূপক বিন্দু ('শূন্য') তার সাথে আসিয়া মিলিতেছে। মধ্য বিন্দুগুলির সংযোজক এক লম্ব রেখা টান, এবং 'লেখ'টি 'অঙ্কন' (সূর্যে) এবং 'রঞ্জন' (সোমে) করিয়া ফোটাইয়া তোল। সাধারণ ভাবে, ঊর্মি-কলাটি চূড়ায় পূর্ণিমা; সানুতল বিন্দুতে অমাবস্যা। শূন্য অমাবস্যার স্বকোটি। সাধারণ জপে, মধ্যমার মেরুবিন্দুতে যথাযথ নাদাবসানটি ঘটিলেই অমাবস্যা। অমাবস্যায় অরূপনাম বিশ্রান্তি করিয়া শান্ত, স্বস্থ হও।

'আধারমানন্দমখণ্ডবোধং
যস্মিল্লঁয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ॥' ২২

রাকা ও অমাবস্যাস্থলে গ্রস্তভয়। তা থেকে মুক্তি কোথায় কিরূপে?

বিন্দুতে শূন্যতা পূর্ণতা একত্র। সুতরাং, এই শূন্যে আসিয়াই পূর্ণকে (পৌর্ণমাসীকে) জ্যোতিতে ও রসে ভরপুর করিয়া মিলাইতে হইবে। ভরপুর বলিতে এক ক্রম ও কাষ্ঠার কথা আসিয়া থাকে। সাধারণতঃ, বিশ্ব ব্যাপারে সর্বত্র, স্থূলে সূক্ষ্মে, ঊর্মিভঙ্গিমায় বৃত্তি ঘটিতেছে। জপে সেই বিশ্ববৃত্তিটিকে উত্তরোত্তর ছন্দোগ, সুষম এবং ধামগ করারই যত্ন করিতে হয়। Partial Pattern থেকে খাঁটি Prototype-এ ফিরিতে হয়। সর্বক্ষেত্রেই ঊর্মির চূড়াবিন্দুকে 'পূর্ণিমা' আর সানুবিন্দুকে 'অমাবস্যা' মনে করা যায় বটে; কিন্তু চিন্তা কর যে, বিশ্বপরিস্থিতিতে সর্বত্র ঐ দুই স্থলেই বিশেষ করিয়া গ্রহণাশঙ্কা (রাহুকেতু ছায়াগ্রস্ত হবার ভয়), উদ্যত আয়ুধের মত শিরে নিপতনের অপেক্ষায় আছে। সুতরাং ঐ সব আভাসিক, প্রতিহন্যমান স্থলে যাইয়া চিদ্‌রশ্মি এবং চিন্মধুর কোন ধ্রুব সংস্থায় স্থিত হইয়া অপেতভীঃ হইলাম, ইহা ভাবা যায় না। চিরপৌর্ণমাসী আর নিত্য অমাকলার ঠাঁইটি কোথায় যেথায় সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ গ্রস্তভয়-ক্ষয়োদয়রহিতরূপে স্ব স্ব জ্যোতিষ্মান, এবং মধুমান্ মহিমায় দেদীপ্যমান? বিজ্ঞানও ঊর্মিবিজ্ঞানে ধ্রুবকোটিটি (সংখ্যা-সংখ্যানের নাভি যে সাংখ্য সেটি) খুঁজিতেছে; এখনও পায় নাই। প্রজ্ঞান সেটি মিলাইয়াছে অধ্যক্ষর লোকসমাশ্রয়ে—যথা, বৈখরী গায়ত্রী জপে ঐ 'বরেণ্যম্' আর মধ্যমায় অলঙ্ঘনীয়

মেরুবিন্দু। লক্ষ্য কর যে, এই দুই অধ্যক্ষর ভূমিতেই পূর্ণিমা অমা (এবং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ) দেশকালাদি দ্বারা ব্যবহিত নয়।

কিন্তু মনে রাখ যে, ইহা কাষ্ঠা বা পরিসীমার সমাচার। তুমি আমি জপে লাগিয়াই —এই পরিসীমার সীমানায় পৌঁছিতে পারি না। বর্ত্ম দীর্ঘ, প্রয়াস-বহুল। অধিভূত ভূমিতে চলিতে সুরু করিয়াছ; নীরস, কৃচ্ছ্র, গুরু জপসাধনায়। এখানে গ্রস্ত-অস্ত-ব্যস্ত অমা-পূর্ণিমার একটি পলকের পরশেই তুমি অচিন্তিত আলোক পুলকের সাড়াটি পাইয়া গেলে! অধিভূত থেকে চল অধিদৈবত—জড় পরিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হইয়া প্রাণের স্বচ্ছন্দানুবন্ধে। সে প্রাণকেও আবার আপন অন্তরাত্মায় সূত্রিত, অন্বিত, সঙ্গত কর—Objective জপে যেটি 'পর' সেটি 'Self' রূপে হউক 'আপন'। এটি অধ্যাত্ম। এইবার পরভাব থেকে স্বভাবের পানে ফিরিলে। তবু দূরে। 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—এই ব্যহৃতিত্রয়কে সম্যক্ প্রসন্ন করতঃ এই তিন ভূমি অতিক্রম করিতে যত্ন কর। 'ভূঃ'কে তুষ্ট কর ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত কর্মের দ্বারা। তদ্‌ব্যতীত তোমার 'এই' কদাপি তোমার অভীষ্টবর্ষী সিদ্ধিদ 'সেই' হইবে না। 'ভুবঃ'কে তোষণ কর ভাব দিয়া। আর, 'স্বঃ'কে বিজ্ঞানে। শ্রুতির সেই—বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ।

জপধ্যানাদি সাধনে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের আশঙ্কা ও তার পরিহার

এ তিনে আরূঢ় হইয়া সত্যকার সমর্থ অধ্যক্ষর ভূমিতে অধিকার জানিবে। অর্থাৎ, তখনই, তার পূর্বে নয়, গায়ত্রীর 'বরেণ্যম্' এবং 'মেরুবিন্দু' এই দুই পরমোন্মেষ (উন্মীলন) এবং পরমোপরম (নিমীলন) এর ঠাঁই তুমি সংবেদনে মিলাইতে সমর্থ হইবে। আর, তখন 'অধিযজ্ঞ' রূপ পরম পুমান্, কি করিবেন? তোমার সমারব্ধ সংবেদনকে সেই নিত্য অমা পূর্ণিমায় মিলিবার নিমিত্ত 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ"।

এইবার গ্রস্ত গ্রহণের কথা। ইহাও এক জাগতিক রহস্য, কেবল solar বা lunar eclipse ভাবিও না। ঊর্মিবিশেষ অথবা উর্মিশ্রেণি, তার ছন্দে সুষম কি বিষম এই প্রশ্ন। ছন্দের বৈরূপ্য—বৈগুণ্যজনককে যদি ব্যাজ-বিঘ্ন বল, তবে কোন ঊর্মিচ্ছন্দঃ এ দুয়ের কোনটি অথবা উভয়ের দ্বারা 'গ্রস্ত' হইতে পারে। গ্রস্তের মুক্ত হওয়া (মোক্ষ) আবশ্যক। বিশেষভাবে পাদমাত্রাসম্বন্ধি যে ছন্দঃ, সেটি গ্রস্ত হইতে পারে, অথবা কলাকাষ্ঠাসম্বন্ধি ছন্দঃ। প্রথমস্থলে সূর্যগ্রহণ, দ্বিতীয়ে চন্দ্রগ্রহণ। ঊর্মি

দৃষ্টান্তে সানুবিন্দু অমার (শূন্য) স্থল। এটি অবসান আরম্ভ, এ দুয়ের সমতার স্থল। এটি বিশেষভাবে সূর্যসংস্থা। সূর্যই অবসিত সমস্ত পদার্থকে পুনশ্চ সমারম্ভণ করেন। এ স্থলে কোন কারণে 'গ্রাস' হইলে বুঝিতে হইবে যে, অবসানও ঠিক হইল না, সমারম্ভও ঠিক হইবে না। প্রণব, গায়ত্র্যাদি জপে এক এক শূন্য স্থলে (সানু বিন্দুতে), এবং বিশেষভাবে, মেরুবিন্দুতে, এই অমাগ্রাসটি কাটাইয়া উঠিতে হয়। মেরুবিন্দুতে নাদের ঠিক ঠিক বিলয় ঘটিল তো, আর তা থেকে পুনশ্চ নাদের ঠিক ঠিক উদয় হইবে তো? ইহাই প্রশ্ন। নাদ এ স্থলে সূর্য। তাঁর গ্রস্ত হওয়া মানে অপিহিত হওয়া। তাই না ছায়ার আপত্তি! গায়ত্রীজপে মেরুবিন্দুরূপা যে অমামুখ্যা, তাতে নাদের 'গ্রস্ত' হবার সম্ভাবনা প্রবল, এবং সেটি আমরা দেখিলাম। ইহা সাবধানে মনে রাখিতে হইবে যে, নাদের বিলয়-উদয়ে মেরুস্থলে 'গ্রস্ত' হওয়া আর স্বচ্ছন্দে বিন্দুলীন হওয়া এক বস্তু নয়। বিন্দুলীন হইলে নাদবিন্দু অথবা সূর্যসোমের পরিপূর্ণ মিলনটি ঘটিল। নাদজ্যোতিঃ আসিয়া বিন্দুসিন্ধুরসে নিষ্ণাত হইল, তুরীয়, এবং তুরীয়ের পর যে শান্ত, শান্তাতীতাদি পরমের 'নৈকটিক' ভূমিগুলি আছে, তাদের 'কোটি'তে আসিয়া উপনীত হইল। এ ভাবে, সচরাচর অপ্রকট ভূমিতে, রসনিষ্ণাত নাদ আবার, ধ্রুবকোটির বা অমার অঙ্কে যেন নবভূমিষ্ঠ হইয়া, নবায়মানতায় সমুদিত হইতেছেন। প্রাকৃতস্থলে, সুষুপ্তিরূপ 'ব্রহ্মপুরে' অভিনিষ্পন্ন হইয়া প্রত্যহ জীব যেরূপ জাগরে ব্যাপারবান্ হয়। প্রণবাদি জপসাধককে এই মেরুবিন্দুনিষ্ণাত অভিন্নজ্যোতীরসে অভিসম্পন্নতাটি যথাসম্ভব মিলাইবার যত্ন করিতে হয়। এই বিন্দুমেরুরূপ 'মহাবিষুব' স্থলে নিষ্ণাতলীন হইতে যাইয়া গ্রস্তভীতি একান্তভাবে কাটাইবে কখন? যখন 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই মহাব্যাহৃতিত্রয়, এবং 'অ-উ-ম' এই মাত্রাত্রয়ের পর তুরীয় (মহঃ) অথবা তুরীয়া (অর্দ্ধমাত্রা), সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিচ্ছিন্ন পাদমাত্রাকলাদিরূপে না বৃত্তিমান্ রাখিয়া চিরকাষ্ঠায় অভেদে মিলাইবেন—যে কাষ্ঠার পরম পরিশুদ্ধিতে সূর্য হন 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ', আর চন্দ্র বা সোম হন 'রসানাং রসতমঃ'। চিদাকাশজ্যোতিঃ এবং চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা পরস্পর অভেদ আলিঙ্গনে মিলিলে—কুতস্তমঃ কুতঃ কষায়ঃ কুতোভয়ম্? সূর্যসোমের বিচ্ছেদে, বিগ্রহেই গ্রস্তভীতি। অধিভূতস্থলে কখনও এই পৃথিবী, কখনও বা ঐ চন্দ্র 'মাঝে' আসিয়া ঐ বিচ্ছেদটি ঘটায়। অধিদৈবতাদি স্থলেও বিচ্ছেদ, তবে অন্য আকৃতিতে।

যথা—অধ্যাত্মস্থলে, জপ যখন চলিতেছে, তখন জপকর্মের মুখ্য নির্বাহয়িতা প্রাণ যদি জপের ঠিক অনুকূল ঋতচ্ছন্দে না চলিয়া অনৃত বিরুদ্ধ ছন্দে চলে, তবে ফলে হইল সূর্যগ্রহণ; আর, মন যদি জপের মরমী রসে নিষ্ণাত না হইয়া দৌর্মনস্য বিকল্পাদি কষায়ক্লিষ্ট থাকে, তবে হয় চন্দ্রগ্রহণ। মন (চন্দ্রমা) আপন বৈমুখ্য-বৈমনস্যে প্রাণ (সূর্য) কে আচ্ছন্ন করিলে প্রথমটি; আর, বাক্, শরীর, পরিবেশ—এদের স্থূল, গুরু সম্বেগ সংস্কারগুলি (পৃথিবী), মনকে চাপিয়া ধরিলে দ্বিতীয়টি।

যে কোন ভবঘটনার ঊর্মিচূড়াবিন্দু আর সানুবিন্দু লইয়া পূর্ণিমা-অমা, আর সেই সেই স্থলে 'গ্রস্ত' হ'বার সম্ভাবনা দেখিতে যাইয়া বিশেষ প্রসঙ্গে গায়ত্রী জপের দৃষ্টান্তে আসিয়াছি। 'প্রচোদয়াৎ' এর পর যে ওঁ, তাঁর বিন্দুতে স্বচ্ছন্দে 'লীন' না হইয়া 'গ্রস্ত' হবার আশঙ্কা খুবই থাকে। গ্রস্ত হইলে বোধ হইবে 'হঠাৎ' (by jerk as it were) থামিয়া গেল (অবরোধ); হঠাৎ যেন লাফাইয়া পড়িয়া (by jump as it were) 'চুরমার' হইয়া গেল (প্রতিরোধ); হঠাৎ আক্ষিপ্ত হইয়া (by spasm as it were), তার সুষমছন্দঃটি (harmonic wave pattern) হারাইল (বিরোধ); অথবা সে আর নাদবস্তুটিই রহিল না (উম্ এর মত কৃত্রিম বহিঃস্বরে পরিণত হইল), এটি নিরোধ। এ চারিটি বাধা কাটাইয়া তাকে বিন্দুশয়ানে উপনীত হইতে হইবে। উদয়ের কালেও অনুরূপ ব্যাজ-বিঘ্ন আছে। 'মূল' থেকে ধীরে ধীরে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ মাধ্যমে উদয়, উত্তম কল্প। নাভি থেকে মধ্যম; হৃদয় থেকে অনুমধ্যম; কণ্ঠ মাত্র থেকে অধম।

সীমা ও পরিসীমা—কলা ও কাষ্ঠা

গ্রস্তোদয়শ্চ গ্রস্তাস্তমুভয়ং মুঞ্চ যত্নতঃ।
পাদমাত্রাকলামৈত্রং বরেণ্যং নয়তূদয়ম্॥ ২৩

পূর্বোক্তক্রমে মেরুবিন্দুতে নাদের অস্ত এবং উদয় যাতে 'গ্রস্ত' না হয়, সে পক্ষে অবহিত এবং যত্নবান্ হইবে। এটি (বিন্দুমেরু) বিশেষভাবে 'অমা'র স্থল বলা হইয়াছে। উর্দ্ধে সমসূত্রে অপর মেরু—নাদমেরু। এটি পূর্ণিমার স্থল। পাদমাত্রাকলা, এ তিনকে মৈত্র সম্বন্ধে রাখিয়া এই স্থলে বরণীয় যে উদয়কাষ্ঠা (পরিসীমা) সেটি প্রাপ্ত হও। বিন্দুমেরুতে লয়কাষ্ঠা হইয়াছে অথবা হবার সযত্ন প্রয়াস হইয়াছে। এই

নিমীলন আর উন্মীলনের পরিসীমা স্থল দুটিতে 'অপাকৃত' হইলে চলিবে না। কাষ্ঠা অপকাষ্ঠায় নিজেকে বিফল, অপহৃত হইতে দিলে হইবে না। গায়ত্রীতে 'বরেণ্যম্' উন্মীলন কাষ্ঠার স্থল। আগে 'সবিতুঃ' পদটি আছে। সবিতা এস্থলে নিজেকে নাদশেখরে সমুদিত করিতেছেন। 'ণ্যম্' ভাগটিকে (কলা) 'ণীঅম্', এইভাবে দীর্ঘ এই স্বরাবলম্বনে পরিপূর্ণতায় ফুটিতে দাও। সেরূপ ফুটিলে কি চরিতার্থতা সাধিত হয়? নাদবাহিতায় বিন্দু মজ্জমান না রহিয়া পূর্ণকলায় বিকশিত হন। ফলে, শেখর স্থলটি (বরেণ্যম্) নাদবিন্দু-শেখর বা সোমার্দ্ধ-শেখর। এস্থলে বিন্দুকে তাঁর পূর্ণ প্রকটন পরিচয়ে সমুদিত দেখিয়া নাদ যেন তাঁকে বলেন—তুমি থাক অভিব্যক্তি কাষ্ঠায় বা পরিসীমায়, আর আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী কলারূপটি ধরি। তুমি হও জ্যোতির্ঘন রস (সোম) অভিব্যক্তির পরিসীমা; আর, আমি হই তোমার পরিপূর্ণ আলোকরসের আধ আধ, নব নব ঋধ্যমানা কলা। এ কলার ভূমিকা সঙ্গে ও পাশে না রহিলে সীমা কোনদিনই জানিবে না যে সে পরিসীমা। কলা আছে তাই না কাষ্ঠা!

সাপেক্ষভাব

যদি বল—এ তো সাপেক্ষ সীমাত্ব। পরস্পরের অপেক্ষায়, তুলনায়, কলা বলে—তুমি আমার কাষ্ঠা, কাষ্ঠা বলে—তুমি আমার কলা। যে কোন উর্ম্মিচূড়া বা শিখরে আরূঢ় হইয়া এই অপেক্ষাটি বুঝিয়া লও। একদিকে—ক্রমোন্নত, অন্যদিকে ক্রমনিম্ন কলাবিন্যাস—আরোহ আর অবরোহ। ভাব আর বোধের ভূমিতেও এটি দেখিয়া লও।

অনপেক্ষভাব এবং সেটি কোথায় কিভাবে মিলাইবে?

কিন্তু অনপেক্ষ ভাবটি? সেটি 'প্রায়িক' (approximate) রূপে মিলে যে কোন সানু বিন্দুতে, শূন্যবিন্দুতে—at the neuter point—অবসান আরম্ভের সন্ধিস্থলে। এখানে তো 'স্থির' হইয়াছি, কিন্তু হয়ত' আবার ওঠানামার নাগর দোলায় পড়িতে হইবে। আর পড়িতে যাতে না হয় তার জন্য খোঁজ ধ্রুবকে। কোথায়? সেই অমাস্থল মেরুবিন্দুতে। এখানে নাদ-কলাসুবলিততনু বিন্দু আর কোন অপেক্ষার পটভূমিতে পূর্ণপ্রকটনে বিরাজমান নন। এখানে, নাদ এবং কলা—দুই-ই বিন্দুর অপর নিরপেক্ষরূপে নিমীলিত। স্বয়ং নির্ব্যূঢ় পরম কাষ্ঠা না হইলেও, তার অব্যবধান

প্রান্তভূমি। মহামায়া বা পরব্রহ্ম এই ‘বিন্দুমায়া’কে সাক্ষাৎ মাধ্যমে রাখিয়াই অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে আসেন। ‘ব্রহ্মাস্মি’ অববোধের কেন্দ্রবিন্দু। রসানুভূতিতেও এই পরম নিমীলন বিন্দুটিকে মিলাও। সেই প্রমুদিত রাসশতদল আবার ভাব। এখানে প্রকাশ এবং রস দুই-ই এক মৌন অব্যক্ত পরমতায় মিশিতে যাইয়া তাদের কলাকলিত, পাদনিষ্পাদিত, মাত্রাসম্মিত রূপটি পরিহার করে।

নাদের গ্রস্তাস্ত এবং গ্রস্তোদয়

অপর সানুবিন্দুর সঙ্গে বিন্দুমেরুর এই অপূর্ব বিশিষ্টতা। নাদমেরুতে অথবা শিখরে (যথা ‘বরেণ্যম্’) বিন্দুরূপ সোমকে নাদকলাসহকারে আপন রস পৌর্ণমাসীতে পূর্ণই ফুটিতে দিতে হইবে। পাদমাত্রাকলাদির বোধভাবাদির বৈরগ্রাসে ‘গ্রস্ত’ হইয়া নিষ্প্রভ বা ‘কুণ্ঠিতপ্রভ’ উদয়ে হইবে না। আর, বিন্দুমেরুতে বিন্দু ‘অমা’ বা নিত্যই আছেন; তাঁর পরম ‘তটস্থ’ অব্যক্ত অভিসম্পন্নার ভূমি মাগিতেছে যে নাদ, সেটির গ্রস্তাস্ত অথবা গ্রস্তোদয় হইলেও চলিবে না।

ধ্রুবকোটি ধ্রুব বলিয়া মিলিবার আগে

এ ধ্রুব বা ‘অমা’ স্থল হইতে আবারও চলিতে হয়—পুনরুদয়ায়? এ ধ্রুবে আসিয়াও পুনরাবর্ততে চক্রম্? না। তবে ‘অমা’র যে ‘মা’ তাঁকে ধ্রুব খাঁটি করিয়া মিলাও। তারপর, ‘ন স পুনরাবর্ত্ততে’। প্রণবাদি সহকারে সাধনা তো ঐ নিমিত্তই। খাঁটি করিয়া ঐ ধ্রুবকোটি (The ‘Point’ that opens into the Absolute) মেলার পরও যদি বা ঘোর, তবে, সে ঘোরা সেই রাসমণ্ডল-বিমণ্ডল দোল! বুঝিলে? না বোঝার সময় হয়তো, জপের মালা প্রাণের হিরণ্ময় সূত্রে গাঁথিয়া মনের মণিমেখলায় ঘুরাইয়া যাও।

গ্রহণে গঙ্গাস্নান পুরশ্চরণাদির অধ্যাত্ম মর্ম

গায়ত্রী জপের দৃষ্টান্ত লইয়া নাদবিন্দুকলার উদয়-বিলয়-অনুদয় অবস্থাগুলি সংক্ষেপে দেখিয়া লইলাম। প্রণব অথবা যে কোন বীজ (যথা, হ্রীঁ), অথবা নামে ঐ অমা-পূর্ণিমার মেরু দুটিতে সবিশেষ অবহিত হইয়া জপ করিতে হইবে। অর্থাৎ, পূর্ণ উন্মীলন আর পূর্ণ নিমীলনের স্থলদুটি। এই দুই স্থলেই গ্রহভীতি

আর গ্রহণ বা গ্রস্তাশঙ্কা বলীয়সী। সচরাচর গ্রস্তাস্ত এবং গ্রস্ত—উদয়ই তো ঘটিতেছে। হইলে, তৎকালে বিশেষ ভাবে গঙ্গাস্নান, পুরশ্চরণাদি কৃত্য। গং+গা=নাদ— বিন্দুর অবিনাভাব বহমানতা। তাতে অবগাহন কর। আর, সংখ্যাদি সঙ্কল্পপূর্বক যথাবিধি পুরশ্চরণে লাগ। জপের গ্রস্তভাব কাটাইতে এ দুটি উপায় উত্তম। প্রথমটি বিশেষ ভাবে প্রাণ এবং রাগমার্গ; দ্বিতীয়টি ক্রিয়া ও বিধিমার্গ। প্রথমটি দ্বারা 'গং' (কিনা, নাদ—বিন্দুরূপ প্রাণব্রহ্ম) 'গচ্ছতি'; দ্বিতীয়ের দ্বারা গ্রস্তাদি বাধা নিরসনপূর্বক 'পুরতশ্চরতি'—সিদ্ধিতে অগ্রসর হয়। (শুভ) সঙ্কল্প দ্বারা বস্তুগত বাধা; তাতে নিতরাং স্থিতিঃ বা নিষ্ঠা দ্বারা দেশবাধা; সংখ্যা পূরণের দ্বারা কালবাধা; জপাদিতে ছন্দোগ হইয়া ছন্দোবাধা; ভগবানে ফলসমর্পণে পাদমাত্রাদিগত বাধা এবং যৎকিঞ্চিৎ কার্পণ্যবাধা পরিহার কর। হবনে জপশক্তিকে সাক্ষাৎ তেজঃ, ওজঃ এবং ভর্গঃ আকারে আহরণ কর; এবং শান্তিবচন, ধ্যান, স্তব কীর্তনাদি দ্বারা তার অমৃতাভিষেকও কর। এই পুরশ্চরণের প্রসঙ্গ পরে আসিবে।

গ্রহণকালে পৃথিবীর সমসূত্রে আসা—এর তাৎপর্য কি?

গ্রস্ত আশঙ্কাবারণের নিমিত্ত সূর্য-চন্দ্রমা (বর্তমান প্রসঙ্গে নাদবিন্দু) কদাপি 'পার্থিব' সমসূত্রে আনিও না। অর্থাৎ, তোমার সাধারণ বৈখরীবাক্, এবং তৎসহ সাধারণ প্রাণন এবং চিন্তন, যে 'level' বা পরদায় রহিয়া তোমার এই মামুলি জীবনযাত্রাটি চালাইতেছে, সাবধান! তোমার বীজনামাদি জপ (বিশেষতঃ নাদবিন্দু) যেন সে পরদায় থাকিয়া যায় না, বা তাতে নামিয়া আসে না। বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের Energy level high হওয়া চাই-ই। জপের potential and kinetic plane দ্বয় তোমার 'পার্থিব' plane এ আসিবে না। আসিলে সঙ্কট। 'পার্থিব' মানে যাতে জড়তা পরিচ্ছেদ (rigidity, mutual exclusion ইত্যাদি) ঘটে। 'পৃথিবী' তত্ত্বের সঙ্গে গুলাইও না। ইনি দ্যৌঃ এবং অন্তরীক্ষ সহকারে ভজনীয় তত্ত্ব। পূর্বখণ্ডে এ সকল সূত্রিত, ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বীজ-নামশক্তি পৃথিবী তত্ত্বে 'ধারণ' করার নিমিত্ত ভগবানের কৌর্ম আকৃতি। উর্দ্ধে উত্তোলনের নিমিত্ত বারাহী; ইত্যাদি।

জপে আন্তর বা অধ্যাত্ম হোম কিভাবে ভাবনা করিবে?

অক্ষরমক্ষরব্রহ্ম চেকারাদ্যগ্নিদীপিতম্।
নাদবিন্দূ রবীন্দূ চ সূর্য্যসোমাগ্নিমূর্ত্তিভৃৎ॥২৪

মন্ত্রে যে অক্ষর (বর্ণ), তাঁকে অক্ষরব্রহ্ম ভাবেই জানিবে। তন্মধ্যে 'ঈ কারাদি' রূপে (যথা হ্রীঁ) তিনি দীপক (উর্জ্জস্বান্) অগ্নি। শীর্ষে নাদবিন্দুকে সূর্যসোম জানিবে। অতএব, অক্ষরব্রহ্ম, মন্ত্রে অগ্নি-সূর্য-সোম এই মূর্তিত্রয় ভরণ করেন। সুতরাং—

হোমে তদক্ষরং বেদীমীকারাদীন্ হুতাশনম্।
নাদাহুতিঞ্চ স্বাহেতি সুতঃ সোমশ্চ বিন্দুনা॥২৫

বীজাদি সহকারে যখন হোম করিবে, তখন ভাবনা কর যে সেই অক্ষরই তোমার বেদী; ঈকারাদি দীপিত, উর্জ্জিত স্বর সে বেদীতে আহিত এবং উদ্দীপিত হুতাশন; 'স্বাহা' বলিয়া তাতে আহুতি দিতেছ—নাদ; আর, সোম (অমৃত), বিন্দুরূপে সেই নাদমহিম্নি সমুজ্জ্বল অগ্নিতে অভিষুত হইতেছে। এটি না হইলে যজ্ঞফল যে অমৃত, সেটি লব্ধ হয় না। এখানেও সূর্যাগ্নিসোম এ ত্রিতত্ত্বের পরস্পর উপকুর্ব্বাণ অবিনাভাবটি বুঝিয়া লও।

বাগগ্নেঽবনাগ্নের্বৈ ফলং দশগুণং ততঃ।
প্রাণে দশগুণং তস্য লক্ষং ভাবেঽমৃতং চিতি॥২৬

যজ্ঞফল যে অমৃত, সেটিকে কাষ্ঠায় দেখাইবার নিমিত্ত বলা হইতেছে—বাকে যে অগ্নি, কেবল অথবা মুখ্যতঃ তাতে জপযাগ করিলে যে ফল, তার দশগুণ ফল হোমাগ্নিতে বীজাদি সহ আহুতি করিলে। (এই জন্য, পুরশ্চরণের সংখ্যার দশমাংশ হোম করার বিধি আছে।) তারপর, বাহ্য অগ্নি স্থলে প্রাণাগ্নিতে (প্রাণায়াম, শ্বাসজপ ইত্যাদি) বীজাদি হবনে আরও দশগুণ ফল। ভাবধ্যানের অগ্নিতে লক্ষগুণ ফল। আর, চিদগ্নি বা ব্রহ্মাগ্নিতে হবনে সাক্ষাৎ অমৃত। শ্রীভগবানে বা ভগবতীকে সর্বসমর্পণে এটি সাধ্য

হয়। এখানে বাক্, এবং হোমাগ্নিকে অগ্নিস্থানীয়, প্রাণকে সূর্য এবং ভাবকে সোমস্থানীয় ভাবনা করিও।

ক্রিয়ামাত্রে চূড়া এবং সানুস্থলে বীর ও ধীর হইতে হইবে

গ্রহণের প্রসঙ্গ অত্র আর অনুসরণ করিব না। তবে, এ সম্বন্ধে আর দুইটি কথায় প্রণিধান কর। প্রথম, পূর্বোক্ত চূড়ামেরু এবং সানুমেরুতে বিশেষতঃ গ্রস্তসঙ্কট সম্ভাবনার কথা। প্রকৃতিতে সর্বত্র জড় প্রাণ, মন—সর্ব স্থলেই এটি পরীক্ষা করিয়া বুঝিও। মৃদু, এমন কি মধ্যস্থলে কোথাও চরম এবং বিপ্লবী সংঘর্ষটি সংঘটিত হয় না। দৃষ্টান্তে যাইলাম না। তবে একটা মাত্র—ঐ বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ, আর এই বিপরীত বিদ্যুদ্‌গর্ভা পৃথিবী। অশনি সম্পাত বিনিময়টি হবে কখন? উভয়কেই 'অধিমাত্র' হইয়া তীব্র সম্বেগসম্পন্ন হইতে হইবে। চূড়ায় উঠিয়া তোমার 'উর্জ্জিত' বা kinetic শক্তিকে যখন সর্বাধিক পাইলে, তখন, তখনই তার নিম্নতলে পড়ার সম্ভাব্য ঝোঁকটি (potential drag) সর্বাধিক। পুনশ্চ, সানুবিন্দুতে স্থির হবার ঝোঁক (rest potential) যেখানে সর্বাধিক, সেখানে তোমাকে ঠেলিয়া সরানর ঝোঁক (moving potential)টিও সর্বাধিক। এই নিমিত্ত চূড়ারূঢ় হইয়া 'বীর', আর সানুপীঠে আসিয়া 'ধীর' হও।

যেটি সাধ্য ও যেটি বাধ্য তাদের চরম সংঘর্ষের স্থল কোথায়?

বাধিকা সাধিকা চাপি চতুর্বৃত্তা হি রোধিকা।
সাধ্যং বাধয়তে সা চ বাধ্যং সাধয়তি ক্রমাৎ।
সাধ্যসাহসকাষ্ঠায়াং ভূয়িষ্ঠো বাধ্যবিক্রমঃ॥ ২৭

রোধিকা শক্তি চারি আকারে বৃত্তিমতী হইয়া থাকে। সাক্ষাদ্‌ভাবে—বাধিকা এবং সাধিকা (যেখানে, যথা চিত্তবৃত্তি, রোধ করতঃ কোন ফল, যথা যোগ, সাধিত হয়)। আবার, অপর দুটি স্থল আছে, যেখানে ঠিক সাক্ষাদ্ ভাবে নয়, কিন্তু ক্রমসম্বন্ধে, রোধিকা কি করে?—যেটি বাধ্য (বাধযোগ্য), তাকে ক্রমশঃ সাধক করিয়া তোলে (যেমন, কোন বিষের অল্পমাত্রায় ক্রমিক 'ভেষজ' প্রয়োগে রোগ বিষ নিবারণ); আবার, যেটি সাধ্য, সাধন যোগ্য, তাকে বাধ্য—বাধিত, বাধযোগ্যও করে। এর

দৃষ্টান্তও চিন্তাকর। এখন, ক্রম বলিতে কাষ্ঠাও আসিয়া থাকে। তাই দেখ—যে স্থলে সাধ্য সাহসের কাষ্ঠা (the top level of success co-effecient or fruition factor), সেখানেই বাধ্য বিক্রমটিও 'ভূয়িষ্ঠ' (at its highest efficiency level)। সেই তো সাধ্য-বাধ্যের উভয়ের 'অধিমাত্র' হইয়া চরম সংঘর্ষ করার স্থল। এখানে বাধা যেরূপ অজেয় দৈত্যমহাবলরূপা, সে বাধা নিরসনেও তদ্রূপ অমোঘ কোন 'আয়ুধ' শক্তি সমাশ্রয় করিতেই হয়। এখন, লক্ষ্য কর যে, গায়ত্রী ব্যাহরণে ছয়টি 'শূন্য' আর ছয়টি 'পূর্ণ' স্থল আছে। বিন্দুমেরু ('Origin') থেকে প্রবৃত্ত-প্রত্যাবৃত্ত ছয়টি ঊর্মিলেখ পরীক্ষা করিয়া এটি বোঝ।

গায়ত্র্যাদি ব্যাহরণে শূন্য ও পূর্ণ স্থল, আর তাতে গ্রস্ত ভয় নিবারণ

গায়ত্র্যাদি ব্যাহরণে উক্ত পূর্ণ শূন্য স্থলগুলি এই ভাবে সমীক্ষণ করিবে—

ষট্ শূন্যানি সুখং স্পৃষ্ট্বা ষট্ পূর্ণানি ক্রমান্বয়ম্।
শূন্য-পূর্ণ স্থলে ব্রহ্ম-সংস্পর্শসুখমশ্নুতে॥
স্পর্শং গ্রসেত ন স্পর্শে পূর্ণং ন নাদশেখরে।
কলাং নাদকলায়াং ন বিন্দুং ন শূন্যপূর্ণতঃ॥
পাদেন পদ্যমানস্য মাত্রায়াং যচ্চ মীয়তে।
নাকলিতং কলায়াং বা কাষ্ঠায়াং যৎ সমাপ্যতে॥ ২৮-৩০

মেরুবিন্দু শূন্য-পূর্ণ উভয়ের একত্র হবার স্থল। সপ্রণব গায়ত্রী ইত্যাদি ব্যাহরণ করার সময় এই মেরুবিন্দুর যে শূন্যকলা (aspect), সেটিকে 'স্পর্শ' করিয়া, অথবা তার তটস্থ হইয়া (as closely as possible to the 'origin') আরম্ভ করিতে হয়। বাক্, প্রাণ এবং চিত্ত-এ ত্রয়ী একটা ধীরতার উপযোগে (requisite level এ) উপনীত হইতে না পারিলে, এরূপ তটস্থ সমারম্ভও সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং এটি সাধন, ভাব এবং বৈরাগ্য, এ তিনেরি কথঞ্চিৎ সৌষ্ঠবের অপেক্ষা রাখে। সঙ্গীতে যেমন কোন রাগ আলাপনে যেটি সে রাগে ধ্রুব বা বাদী স্বর, তাতেই ঠিক আরম্ভন এবং তাতেই আধার রূপে স্থিতিটি সহজে আদায় হয় না। যাই হোক, এটি ধরিয়া ছয়টি 'শূন্য'

স্থান (potential points)। এ ছয়টি স্থলে ব্যাহরণ কালে সুখং (সহজে) স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে। নাদ সম্বেগে (kinetic momentum দ্বারা) এ কয়টি স্পর্শস্থল যেন 'গ্রস্ত' (merged or bypassed) না হয়। একে বল স্পর্শগ্রাস।

তারপর, আদি অন্তে দুটি প্রণবসহ ছয়টি উর্মিচূড়া বা পূর্ণের স্থল। এ স্থলগুলিতে বাক্-প্রাণ-চিত্ত-উর্মি—উন্মেষের এক এক (আপেক্ষিক) কাষ্ঠাস্থানে আসিয়া এক এক বিশেষ সুষম আকৃতি (parabola ইত্যাদি) গ্রহণ করে। এ আকৃতিগুলিকে অব্যাকৃত (unmanifest), অতিব্যাকৃত (over-manifest), অব-বা ন্যূন-ব্যাকৃত (under-toned), এবং বিকৃত (unsymmetrical)—এই চার দোষ থেকে মুক্ত রাখিয়া চলিবে (সঙ্গীতে যেমন)। যদি প্যারাবোলা আকৃতি হয়তো উহার যথার্থ vertexটি প্রদর্শিত হওয়া চাই। এটি সযত্নে সাধিতে হয়। সুষম নাদবাহিতার যে অক্ষ (axis) চলিতেছে, তার সম্পর্কে বিষম, ভগ্ন অনুপাতে (in eccentric relation), উক্ত উর্মি শ্রেণীটি চলিবে না। শেষকালে, শূন্যপূর্ণ একত্র মিলিবার স্থল যে বিন্দু-মেরু, সেখানে সমাপনটি (close up) ঠিক ভাবে হইলে গীতার কথায়—'ব্রহ্ম সংস্পর্শসুখমশ্নুতে।' এটি অভিসম্পন্ন হবার স্থান; এখানে অবশ্যই শান্ত হইবে, এবং ক্রমোপসংহারে আত্যন্তিক সুখী হইবে। তখন অভিনিষ্পন্ন—আর ক্রিয়ানিষ্পাদ্যতা নাই।

ছয়টি শূন্যের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ, নিত্য (অ-মা) আছে, তা দেখিয়াছ। তেমনি আবার ছয়টি পূর্ণ স্থলের মধ্যে একটি সমধিক উৎকর্ষের স্থলও আছে (পূর্ণিমা),—ইহাও দেখিয়াছ। গায়ত্রীতে এটি 'বরেণ্যং'। এটি নাদবিন্দু কলা, এ তিনকেই মহামহিম্নি ফুটাইবার স্থল। একে মহিম কাষ্ঠা বল। আর, মেরুবিন্দু হইল (তাতে অভিনিষ্পন্ন হইলে) পরম কাষ্ঠা। স্পর্শ এস্থলে 'ব্রহ্ম-সংস্পর্শ'। আগেরটি অতিশয়ের উৎকর্ষ; পরেরটি নিরতিশয়। এই বিভেদটি বিভাবনীয়। এই বার সতর্ক রও যাতে ঐ কয়টি স্পর্শ স্থানে স্পর্শগ্রাস না ঘটে; নাদকলা স্থলগুলিতে (up and down wave aspects স্থলে) কলাগ্রাস সংঘটিত না হয়। সে সকল স্থলে bulging in or out- (অযথা অন্তর্বহিঃস্ফীতি) যেন নাদবিতান আকৃতিসৌষ্ঠব (symmetry & curvature) ক্ষুণ্ণ না করে। যথা, 'ধীমহি' স্থলে 'ধী'কে চূড়ায় দেখাইয়া আবার হ্রস্ব 'হি'কে তার স্বচ্ছন্দ সানুস্পর্শী ধ্বনিস্তর থেকে উঠাইয়া লইলে, অথবা

তাতে 'মীড়াদি' কৃন্তন আনিয়া তাকে স্বন্তরেই (horizontally) দোলাইলে। এই নিমিত্ত আরোহ-অবরোহ দুই স্থলেই মধ্যাক্ষ (শুক্লা কৃষ্ণা অষ্টমী), এবং একোনপূর্ণ শূন্য স্থলে (শুক্লা কৃষ্ণা চতুর্দশী), —এই কয়টি স্থলে সবিশেষ সতর্ক হইতে হয়। এগুলি 'পর্ব্ব' তিথি। একাদশী আর সংক্রান্তির প্রসঙ্গ পরে হইবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, অষ্টম্যাদি পর্ব বিশ্বব্যাপারে সংখ্যানিষ্ঠ যে ঊর্মি অথবা স্পন্দবিজ্ঞান তারই আপন 'ঘরওয়া কথা'। সঙ্গীত এই স্পন্দসাংখ্যসংখ্যানের সুষম মনোহারী রূপ। কাজেই, জপে সাংখ্য-সংখ্যানগত সেই সুষমতা সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। তবে, জপবিজ্ঞান=সঙ্গীত বিজ্ঞান নয়; সুতরাং জপ প্রমেয়, গেয় নয়, এই ভেদ মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। গায়ত্রী ত্র্যম্বক, গায়ত্রী মধুমতী ইত্যাদি পুটিত জপে ক্রম, সন্ধি সমূহ ঠিক রাখিয়া পরিণয়, অন্বয়, সমন্বয়াদি ক্রমে সেই পরম সমন্বয়টি মিলাইতে হয়। 'একমাত্র' কোন মন্ত্রকে অপরের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া ব্যাহরণে 'অর্দ্ধমাত্রাকে' প্রসন্ন করিতে হয়। সঙ্গীতে যথা শুদ্ধ রাগদ্বয়ের মিশ্রণে। মিশ্রণে পরিণয়াদি থাকা আবশ্যক। সাম্না উদ্গীত হইলে বেদমন্ত্র উদ্+গী+থ—এই আকৃতিস্থিত (থ) থাকে, সুতরাং তাতে ব্যাহরণের ব্যাভিচরণ ঘটে না।

স্পর্শগ্রাস, কলাগ্রাস, এবং পূর্ণগ্রাস (নাদশেখরে)—এ তিনটি গ্রাস নাদের বহির্ব্যক্তরূপে যে বৈখরী, তাতেই সবিশেষ যত্নসহকারে প্রতিবিধেয়। কিন্তু অন্তর্ব্যক্ত অথচ বহির্ব্যক্ত যে মধ্যমাদি ভূমি তার ঐ শূন্য-পূর্ণ সামানাধিকরণ্য স্থলেও যে চরম গ্রাস, সেটি থেকে স্বচ্ছন্দ মুক্ত না হইতে পারিলে, ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যে আত্যন্তিক সুখ সেই পরম লাভটিই মিলিল না। প্রাণ তার আপন প্রাণের অমৃতপরশ থেকে বঞ্চিত রহিয়া গেল, কাজেই নিরুদ্ধনির্ঝর সরিতের মত তার অফুরান সম্বেগটি যেন ফুরাইয়া নিঃশেষ হইতে দিল!

জপকে পঞ্চমুখে ভজন

বাঙ্মুখঃ প্রথমং প্রাণো মনোমুখস্তদুত্তরম্।
চিত্তচেতোমুখঃ পশ্চাচ্চিতিমুখশ্চ সোঽন্তিমে॥৩১

জপাদি সাধনে চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রাণসরিৎ প্রথমে চলে বাঙ্মুখ হইয়া। মনকে 'ভজাইয়া' একে মনোমুখ হইতে হয়। তখন 'মনরসনায়' নাম চলিতে লাগিল।

কিন্তু, মনের অব্যক্ত সংস্কার ভূমি—চিত্ত? তাকেও এইবারে সঙ্গে লইতে হয়। এটি কিন্তু সহজে হয় না। এখানে আপন ধৃতি-মতির সঙ্গে 'ত্বৎপাদাম্ভোজে রতি' আসিয়া মেলা চাই। তৎপরে রসোজ্জ্বল পন্থাঃ—তাতে চেতোমুখ আর চিতিমুখ—এই দুই তুরীয় এবং অন্তিম 'মুখ' আছে। প্রথমটিতে প্রাণ সরিন্নাথসন্নিধানে সরিদ্‌বরার মত উছল উচ্ছ্বাসগরিমায় রসভুক্। আর, অন্তিমে সরিন্নাথ সম্মিলনে চিতিমুখ। প্রথমটিতে, 'রসিকিনী'; পরেরটিতে 'রসো বৈ সঃ' এবং হ্লাদিনীর সারে মিলিয়া 'একরস'। এ পঞ্চমুখ প্রাণকে জ্যোতিঃ বা প্রকাশের দিক্ দিয়াও শেষ পর্যন্ত চলিতে দাও। 'অস্মি'তেই খতম করিও না। জপে প্রাণকে পঞ্চমুখে ভজনা করিলে জপ হয় পরম শিবায়ন।

'বিন্দুই সকল সন্ধানের সিন্ধু'

এখন দেখ যে, প্রথম চারিটি মুখে সূর্য (জ্যোতিঃ) এবং চন্দ্রমা (রস), যেন পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিতেছেন, যেন পরস্পর লুকোচুরি খেলিতেছেন। ইনি এলেন তো উনি উধাও। কাজেই 'পার্থিব' যে 'সমসূত্র' গ্রহণ-গ্রাসভয় ভীত। শেষেরটিতে সে ভয় কাটিয়া গিয়াছে। গায়ত্রী জপে সপ্রণব ব্যাহৃতিত্রয় সহকারে সাধিষ্ঠ বাঙ্‌মুখ হও। প্রথম পাদে রসোজ্জ্বল (বরেণ্যম্) লোল মনোমুখ হও। দ্বিতীয় পাদে চিত্তকেও ধ্যানে (ধীমহি) রসোজ্জ্বল ভূমির তটস্থ করিয়া লও। তৃতীয় পাদে রসোজ্জ্বল সত্তাভুক্ হবার নিমিত্ত চেতঃ তোমার মধুচ্ছন্দসা প্রচোদিত হউক (চেতঃ শব্দের 'এ' কার এই পরম প্রেরণার দ্যোতক)। আর অন্তিম প্রণব সহকারে বিন্দুলয়ে চিতিমুখ হও। ঐ বিন্দুই তোমার সকল সন্ধানের সিন্ধু, এটি মনে রাখিও।

পদ্যমানতার ষট্‌পদী রূপ, জপধ্যানে ও রসাস্বাদনে

যে স্পর্শগ্রাসাদি নিরূপক কারিকার ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গতঃ ইহা আসিল, তৎপরে কারিকাটিতে পদ্যমানতা, মীয়মানতা, আকল্যমানতা এবং সমাপ্যতা—এই চারিটিকে গ্রস্তমুক্ত করিতে বলা হইতেছে। ঐ চারিটি যথাক্রমে ভূয়ঃ পরিচিত পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা। উৎপন্ন থেকে আরম্ভ করিয়া অভিসম্পন্ন, অভিনিস্পন্ন পর্যন্ত সব কিছুর যে পদ্যমান হবার ঋচ্ছতিরূপ, তার কোন স্থলেই সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যুগলকে গ্রস্ত দেখিলে

চলিবে না। গায়ত্রীতে উদয়-বিলয় প্রণবসহ ছয়টি পাদ। এই ছয়পাদে ব্রহ্মযোনি যে গায়ত্রী তাঁর পদ্যমানতা। উদয়ে উৎপন্ন, ব্যাহৃতিত্রয়ে সমুৎপন্ন, ‘বরেণ্যং’ পর্যন্ত উপপন্ন, ধীমহিতে প্রপন্ন, ‘প্রচোদয়াৎ’ এতে প্রতিপন্ন, এবং বিলয়প্রণবে অভিসম্পন্ন। এটি ঠিক ঠিক হইলে অভিনিষ্পন্ন—নিষ্পাদ্যতার অবসান। বাক্‌কে আশ্রয় করতঃ প্রাণ (সূর্য) এবং মনঃ (চন্দ্রমা)—এ দুয়ের পরমাভিমুখে পদ্যমানতা।

বীজাদি যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে, তাদের এই ষট্‌পদী পদ্যমানতা। অন্তে আবার ‘আধারমানন্দমখণ্ডবোধং’ স্বভাবে সম্পন্ন-নিষ্পন্ন হব বলিয়াই সব কিছু (যথা, বীজ) পাদে পাদে নিজেকে বিস্তার-বিন্যাস করিয়া চলে। রসকণা রসসায়র থেকে ঐ প্রাণ-তপন করে উদিত উৎপন্ন হয়। কিন্তু অদৃশ্য—নিজেকে যেন দেখেও দেখে না। এখনও সে বিমনা, অজাতমনা। মনশশীর সঙ্কল্পহিমে সে হয় সমনা—গাঢ়। আপনাকে ‘এক অবুঝ অপূরণ কামনা’ রূপে বুঝিতে লাগে। তখন কি হয় তার? ‘এই’, ‘সেই’ আর এ দুয়ের ব্যবধান (ভূর্ভুবঃ স্বঃ)—এ তিনের মাঝে অবুঝগমনা কামনালেখা (the unpiloted quest of unillumined yearning), আবার তার সবিতার যে দ্যুলোক, তার কাছেই আপন বর্ত্মরশ্মির বরটি মাগিয়া লয়; বলে—হে মোর সবিতা, তোমার যে বরণীয় ভর্গঃ তাই আমাকে বাঞ্ছিতপদে চলার প্রেরণা এবং ছন্দঃ যোগাইয়া দিক। যে ছিল শুধুই উৎপন্ন, সে ‘এই’, ‘সেই’, আর তাদের অন্তরকে আবিষ্কার করতঃ হইল সমুৎপন্ন। অবুঝ মেলানো কামনা কোনো কেন্দ্রে জড়ো না হওয়া পর্যন্ত এইটি হয় না। যেমন জলীয় বাষ্প, আর ঘনরূপ বারিকণা। এই বারিকণা রূপটি ধরিলে সে হয় শিশিরকণা হইয়া ‘এই’ এখানকার কোন তৃণকুসুমে অরুণরাগে মণির মেলা পাতিয়া বসে; নয়তো ‘ঐ’ উপরের পানে চলিতে চায়—মাঝের অন্তরীক্ষ কোন মতে যদি অতিক্রম করিতে পারে, এই আশায়! উপরে উপনীত হইতে পারিলে সে রচিবে সেই বারিদবরণের রসনিবিড় তনুরুচি! তখন সে হইল—উপপন্ন। তারপর, কোন এক শাওনঘন নিরালা নিঝুম সাঁঝে ‘রিমি ঝিমি বরষায়’ সে যখন আবার ফিরিয়া আসে সেইখানে, যেখানে তার ‘মনকা মোর’ তার পিতমের মঞ্জীর ছন্দে আপন নটন ছন্দ বাঁধিবে বলিয়া তার কামনার সকল পেখম শাওন রসসিয়ানে মেলিয়া ধরিল, সেদিন হইল সে প্রপন্ন। সে ছন্দে তার নিজ ছন্দটি সাধা যেমন যেমন হইবে, সে তেমনি তেমনি হবে প্রতিপন্ন। তারপর শেষের

দুটির—সম্পন্ন আর নিষ্পন্ন—সংবাদ কোন ভাবমৌন মহা আর পরম মগ্নতার অতলে লুকায়।

একটি রসকণাকে পাইলাম সহচরী বিশ্বের প্রতিটি রেণুর আপন রসাভিসার সরণি-অনুসরণে। অসারগর্ভ নিছক রসবিলাস ভাবিয়া যেন, 'এরসে বঞ্চিত' হইও না। মনে রাখিতে হইবে যে রসকে বাদ দিয়া কেবল রাস নয়, পরন্তু সারই হয় না; আর, মধু না রহিলে যে শুধুই 'শুধু'! মধুর ছেড়ে সবই বিধুর! ব্রহ্ম 'অস্তি ভাতি' রূপে তো কখনই অস্তমিত নয়। তবে 'প্রিয়ং' হয় কখন? ব্রহ্ম আত্মাই—এই পরম সমীকরণে! 'আত্মা'ই প্রিয়তার প্রেষ্ঠ-বোধের একান্ত খনি, আর একমাত্র পরশমণি। এই আত্মমধুর 'মাত্রা'য় নিখিল মধুর। এখন, ভাবিয়া দেখ যে 'অস্তি'কে যদি আধাররূপে বিশ্বভুবনে পাতিয়া লও, তবে 'ভাতি'র সাক্ষাৎ রূপটি হইল ভাস্কর আর, 'প্রিয়মের' হইল চন্দ্রমা। কেবল অধিভূতের কথাই ভাবিও না। অধিভূতাদি পঞ্চগ্রামেই সমীক্ষণ করিও।

জপে মাত্রার প্রয়োজনীয়তা—দৃষ্টান্ত

পদ্যমানতার কথা, আর সেই সঙ্গে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এবং পদে পদে অন্যোন্য মিলন পূরণ প্রয়াসকে কথঞ্চিৎ প্রপঞ্চিত করিয়াই, বলা হইল। উৎপন্ন থেকে নিষ্পন্ন পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই এই ভাতি-প্রিয়মের, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের, ছন্দঃসুরের মিলন প্রয়াসটিকে কুণ্ঠায় কুণ্ঠিত হইতে দিতে নাই।

গ্রাসকরী কুণ্ঠা। একে নিরসনের নিমিত্তই না বাক্-প্রাণ চিত্তের ধ্বনিগ, ছন্দোগ, ধামগ হবার সাধন! মীয়মানের স্থলে প্রথমে সমস্ত কিছুকে সংখ্যা-সংখ্যান ছন্দে আনিয়া সংখ্যেয় কর। তৎপরে সংখ্যেয় হোক্ প্রমেয়। এ প্রমেয়তার অবধি প্রসংখ্যান-প্রান্ত পর্যন্ত। তারপর, অপ্রমেয়ের মহান্, এবং পরম ভূমি! স্থূলতঃ, গায়ত্রী-ব্যাহরণে, অগ্নি (বা সূর্য) মাত্রা এবং সোমমাত্রা, সাতটি করিয়া সুষম বিন্যাসে রহিবে। 'বরেণ্যম্' উভয়ের সৌষম্যশেখর স্থল। কালিক মাত্রা হিসাবে, ৪+৪×৪+৪=২৪, এই সংখ্যা ছয় পাদে রহিবে। সঙ্গীতে তাল যেমন। এ দ্বিবিধ মাত্রাকে যদি বল, সুরমাত্রা এবং ছন্দোমাত্রা, তবে এদের বিশেষ অধ্যক্ষতা করেন চন্দ্রমা এবং অর্য্যমা (সূর্য)। কোন স্থলেই মাত্রা ভ্রংশ হইতে দিতে নাই। মাত্রাজ্ঞানহীন হইয়া জপাদি কোন সাধনই চলে না।

কলায় কল্যমানতা—ত্রিসন্ধ্যার দৃষ্টান্ত

তারপর, কলার কথাও অনুরূপ ভাবে বুঝিয়া লও। কলা বিবিধ রীতিতে আকলিত হয় এবং ভাবিত হইতে পারে। অত্র প্রসঙ্গে এইটি ভাবনা কর—

উষসং পশ্য পূর্ব্বাহ্নমহর্মধ্যঞ্চ ভর্গসা।
সায়াহ্নং পশ্য চান্তান্তমপরাহ্নং প্রচোদয়াৎ॥৩২

গায়ত্রী জপে উদয় ওঙ্কারকে সবিতা স্বরের ঊষাকলা অথবা অবস্থারূপে দেখিবে। ব্যাহৃতিত্রয়ে (সমুৎপন্নে) প্রাতঃ বা পূর্বাহ্ন। 'তৎ সবিতুঃ' থেকে 'ধীমহি' অবধি অহর্মধ্য, এবং তাতে 'বরেণ্যং' চূড়া বা শেখর স্থল— ইহাও 'ভর্গসা' দেখিবে। শেষের পাদটি, 'প্রচোদয়াৎ' অবধি—অপরাহ্ন। আর বিলয় প্রণব স্বয়ং সায়াহ্ন—অন্তকলা। এই পঞ্চকলা বা অবস্থানে পঞ্চধা নাদবিন্দুর (সূর্য সোমের) কলারূপে স্বাকলন। বাক্, প্রাণ, মন— কোনটিকেও এ অবস্থানপঞ্চকে অব্যবস্থিত হইতে দিও না। এই অব্যবস্থান বারণের নিমিত্ত কি করিবে? তিন সন্ধিতে বারত্রয় 'সন্ধ্যামূপাসীত'। মধ্যমার মেরুবিন্দু থেকে বৈখরীভূমিতে নাদের উদয়কাল (চারিমাত্রা বা 'দণ্ড') যে ঊষা, তাকে বল ব্রাহ্মমুহূর্ত। এ সময়ে জাগৃতি হওয়া চাই-ই। বৈখরীতে উত্থানের যে সন্ধি, তাতে প্রাতঃসন্ধ্যা। গায়ত্রীতে ব্রাহ্মীতনুতে ধ্যান। অহর্মধ্য যৎকালে 'বরেণ্যম্' শেখরে নাদ আরুরুক্ষু,—তখন উরুক্রম বা বিষ্ণু অধ্যক্ষ, অর্থাৎ অক্ষটি তখন উরুক্রমাধিকরণে। এই সন্ধিতে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। প্রাতরাচমনে 'যদ্, রাত্র্যামকার্যং' সেই মন্যুকৃত 'দুরিতং'-কে নাদজ্যোতিঃ যে সূর্য তা'তে ('সূর্যে জ্যোতিষি') হবন করিও। এস্থলে মন্যু মুখ্যতঃ তামস। সুতরাং, জ্যোতিষা বাধয়স্ব তমঃ —হে নাদরূপী সবিতা! তোমার জ্যোতিতে 'অজাগর্ত্তি' ভূমি থেকে 'জাগর্ত্তি' ভূমিতে স্থূলতঃ উঠিয়াও যে সূক্ষ্ম তমসার গ্রাস, সে গ্রাস থেকে আমায় মুক্ত কর। তৎপরে, বরেণ্যমে উপনীত হইয়া যখন তোমার জ্যোতীরসের মহামহিম্নি নিষ্ণাত হইব, তখন শুধু সূক্ষ্ম নয়, কারণ তমসাকেও যেন তোমার 'ভর্গসা' অপনীত করিয়া 'তমসঃ পরস্তাৎ' তোমার স্বরূপটিও অনপিহিত দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারি,—সেই নিমিত্ত আমার ধীকে প্রচোদিত করিও। মধ্যাহ্ন আচমনে 'বিষ্ণুনা ধৃতা' যে পৃথ্বী, তাঁকে প্রসন্না

পাইতে হয়। পৃথ্বী সাধিকা না হইয়া বাধিকা হইলেই গ্রস্তাশঙ্কা। পৃথ্বী কি হইলে বাধিকা, আর কিসেই বা সাধিকা হন, তাহা অনুধাবন করিবে। সমস্ত কিছু 'পৃথু' ভাবে ধারণ করেন যিনি, তিনি পৃথ্বী। সুতরাং, নাদ মেরুস্থলে আসিলে দেখিতে হইবে—কে বা কি তথায় পৃথুতম হইবে, আর কিই তথায় অণুতম হইবে। 'বরেণ্যম্' স্থলটিতেই অণু-তনু-পৃথুর অন্যোন্য অনুপাত সুসমঞ্জস করার স্থল দেখিবে। যৎকিঞ্চিৎ তামস, তাহা 'ব' কারে অণু হইল; রাজস 'রে' দ্বারা তনু হইল; আর সত্ত্ব স্বয়ং 'ণী+অয়ম্' দ্বারা পৃথূর্জ্জিত হইল। কাজেই, —এটি হইল—উত্তমাঃ তনুরজাঃ সত্ত্ববিশালের স্থল। এতে উপপন্ন হইয়া, 'ধীমহি' দ্বারা এতে প্রপন্ন হও। সায়ং সন্ধ্যাটি কখন? বৈখরী থেকে পুনশ্চ মধ্যমায় ফেরার সন্ধিতে। এটি শৈবমুহূর্ত। এস্থলে নিখিল দুরিত (দুর্+ইত=যাত বা চলিত) 'সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি' হবনের স্থল। এ স্থলে জ্যোতিঃ কে সত্য যে পরমাত্মা, তাঁর সঙ্গে অভেদ ভাবনায় মিলাইতে দিবার চরম হবনটি সুরু করিতে হয়। তার দ্বারা আদৌ অভিসম্পন্ন, পশ্চাৎ অভিনিষ্পন্ন হইবে। দেখিয়াছি যে পরমাত্মায় সকলের স্বাহায়নটি না হওয়া পর্যন্ত জ্যোতিঃ নিজেকে ইতরনিরপেক্ষ 'একরস' ভূমারূপে যেন ঠিক মিলাইতে পারে না। 'ভাতি'তে আর 'প্রিয়মে' যেন একটুখানি অবুঝ-আড়াল রহিয়া যায়। 'সত্যে' মিলিল—অস্তি; 'জ্যোতিষি'=ভাতি, এবং 'পরমাত্মনি'=প্রিয়ম্, প্রেষ্ঠম্। তান্ত্রিক সন্ধ্যায় 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা', 'বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' এবং 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা'— এ তিনটি আচমন অনুরূপভাবে ভাবনা করিও। কেবল বাহ্যতঃ নয়, গায়ত্র্যাদি জপে ঐ সন্ধিত্রয় গ্রহগ্রস্তা শঙ্কাবারণের নিমিত্ত 'সন্ধ্যাত্রয়ীমুপাসীত'। বৈদিক এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যায় জপধ্যানই মুখ্য যাগ; শুদ্ধি, প্রাণায়াম, আচমনাদি তৎসম্পর্কে উপকুর্ব্বাণ। সাধারণ ভাবে, যৎকিঞ্চিৎ মুখ্যকর্ম্মের অপকুর্ব্বাণ অথবা বিকুর্ব্বাণ, তাহাই 'গ্রহণ' (গ্রহের দ্বারা)। এটি সর্বভূমিসংলগ্ন লক্ষণ। ধর, 'ক' নামক কোন পদার্থ আপন অধিকারে, আপন ছন্দে বৃত্তিমান্ রহিয়াছে। 'খ' নামক অপর কোন পদার্থ বেধনৈকটিক (penetrating its own field and sphere) সম্পর্কে আসিয়া 'ক'-কে অপকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিল। (অবশ্য, 'খ' 'ক' এর উপকুর্ব্বাণ হইতেও পারে।) এমত স্থলে, উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাকে বল বিগ্রহ। সেই 'বিগ্রহ' ধারার সঙ্গে এটি গুলাইও না। সেখানে 'বি' মানে অন্য। বিগ্রহে গ্রহের সৃষ্টি। আর গ্রহ কর্তৃক 'গ্রহণ'। এ

সকল সাধারণ পরিভাষা। জাগতিক নানাক্ষেত্রে এদের দৃষ্টান্ত। 'অপকর্ষণ' ইত্যাদি শব্দকে 'হেয়', 'অপকৃষ্ট' ইত্যাদি প্রচলিত অর্থেই নিও না। নিতরাং গ্রহ=নিগ্রহ।

পঞ্চবিধ গ্রহ ত্রিবিধ মণ্ডল ও ত্রিবিধ ছায়া

বিকুর্ব্বাণোঽপকুর্ব্বাণঃ সঙ্কুর্ব্বাণশ্চ বেধতঃ।
প্রত্যুপপূর্ব্বকুর্ব্বাণৌ চেতি পঞ্চবিধো গ্রহঃ॥৩৩

জ্যোতিষ্কজগতে ইউরেণাস্ গ্রহের আপন কক্ষ অপর কোন গ্রহের বেধনৈকটিক প্রভাবে আসিয়া 'বিষম' হইতেছে দেখিয়া জ্যোতির্বিদ্ সেই অজানা অপর গ্রহটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেন। অপকুর্ব্বাণের দৃষ্টান্ত—সূর্য হইতে পৃথিব্যাদি গ্রহগণের উদ্ভব। অন্য কোন জ্যোতিষ্কের অপকর্ষণের ফলে (by tidal action) সৌরসত্তা থেকে এদের আদৌ সম্মিলিত ভাবে, পরে বিচ্ছিন্ন ভাবে সমুদ্ভব। সঙ্কুর্ব্বাণের দৃষ্টান্ত Nebulœ র Spiral আকৃতি ইত্যাদিতে। অথবা পৃথিবীপৃষ্ঠে সাগরে যে জলোচ্ছ্বাস (tides), তাতে সূর্য-চন্দ্র উভয়েই সঙ্কুর্ব্বাণৌ। পৃথিবী এবং চন্দ্র (উপগ্রহ) পরস্পরের উপকুর্ব্বাণ। আর, সামান্যভাবে প্রতিকুর্ব্বাণ তো পরস্পর সকলেই। অণুর রাজ্যে, প্রাণের ক্ষেত্রে এই পঞ্চবিধ 'গ্রহ' দেখিয়া লও। মানসভূমিতে এদের সঠিক সমাচার আরও অন্তরঙ্গ। এটি পরে বলা হইতেছে। তার আগে 'বেধতঃ' যে বস্তু, সেটি চিন্তা কর। কেন না, জপাদি সাধনে এই বেধ-বিচার একান্তই প্রাসঙ্গিক।

মণ্ডলং পারিমাণ্ডল্যমুপমণ্ডলমেবচ।
ছায়া তথা প্রতিচ্ছায়োপচ্ছায়েতি ত্রিধা ত্রিষু॥৩৪

জড় প্রাণাদি সকল পদার্থের আপন আপন 'মণ্ডল' (sphere of substance or being) থাকে। সেই মণ্ডলের 'পরিতঃ' (covering surface) যেটি, সেটিকে বল, পরিমণ্ডল। আর, 'উপ', সমীপে, সেটিকে ঘেরিয়া যে মণ্ডল, সেটিকে বল, উপমণ্ডল। পৃথিবী, সূর্য ইত্যাদির দৃষ্টান্তে এটি বোঝ।

এখন, প্রণিধান করিও যে, যে কোন বস্তুর মণ্ডল, পরিমণ্ডল এবং উপমণ্ডল

বেধসম্ভবসঙ্কুল হইতে পারে। আর, বেধসম্ভবটি—ত্রিবিধ আকৃতি পরিগ্রহ করে—ছায়া, প্রতিচ্ছায়া, উপচ্ছায়া। 'ছায়াকে' 'অবস্তু' (immaterial) মনে করিও না। স্পর্শ, প্রভাব, আবেশ, আক্রমণ, সংক্রমণ—এই সব প্রকারে ঐ বেধসম্ভবটি সম্ভাবিত হইতে পারে। জড়ের ক্ষেত্রে, কস্‌মিক রেজ্—কেবল জড়বস্তু স্পর্শই করে না, পরন্তু গভীর সংক্রমণও করে। প্রাণিদেশে, জার্মপ্ল্যাস্‌ম্ পর্যন্ত সংক্রামিত হয় কিসে ও কখন—এটি জৈব-উদ্‌বর্তনের এক মূল প্রশ্ন। Mutation ঘটে কি হইলে? চাতুর্বর্ণ্যের যে নিজ নিজ বর্ণ, তার 'অব' বা 'উচ্চ' পরিবর্তনটি (বীজগত) কি হইলে হইতে পারে? পাতিত্য অথবা প্রকর্ষ?

জপে মন্ত্র, মন্ত্রী, মন্ত্রদাতা, মন্ত্রের উপযোগ—প্রয়োগ—বিনিয়োগ—এ সব স্থলেই উক্ত মণ্ডলত্রয় এবং ছায়াত্রয়ীর বিচার এবং পরীক্ষা একান্তই প্রাসঙ্গিক বুঝিতে হইবে। উপকুর্ব্বাণ এবং প্রতিকুর্ব্বাণ—এই দুই রকমের ব্যতীত অপকুর্ব্বাণাদি ছায়া-স্পর্শ-প্রভাবাদি থেকে নিজ মন্ত্রাদিকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়। নিজের এবং নিজমণ্ডলাদির প্রতিকূল যে অরিবেধ (মন্যু, এনস্, অসুর, পাপ্মা ইত্যাদি), সেটি সযত্নে পরিহার করিতে হয়। সাধুসঙ্গ, দেবালয়, গঙ্গাদি তীর্থ, শ্রীগুরু সেবা ইত্যাদি একান্ত উপকুর্ব্বাণ এবং প্রতিকুর্ব্বাণ 'মিত্রচ্ছায়া'। এর ফলে পরমপাবন সংক্রমণ, সম্পুটনাদি সংঘটিত হয়। শরীর, বিগ্রহ ইত্যাদির কেবল মণ্ডল নয়, পরিমণ্ডল (কায়চ্ছবি) এবং উপমণ্ডল (কায়রশ্মি—the 'body' radiations, 'aura' ইত্যাদি) সম্বন্ধেও অবহিত হইবে।

জপে মণ্ডল-ভাবনা কিভাবে করিবে?

প্রণবের পঞ্চ অবস্থানরূপে এইরূপ মণ্ডলপঞ্চক ভাবনা করিবে—

অস্তি ভাতি প্রিয়ঞ্চেতি যদৃচ্ছতি চ তিষ্ঠতি।
তদ্‌ব্যোমসুবরোং সোম ভুবর্ভূরোমিতি ক্রমাৎ॥৩৫

ওঙ্কার 'অস্তি'রূপে ব্যোমমণ্ডল (ব্যোম=বহিরাকাশ মাত্র নয়); 'ভাতি' রূপে স্বরোম্ অথবা 'সুবরোম্'। এটি সবিতা স্বর-রূপ সূর্য—ইহা দ্বিতীয় মণ্ডল। 'সবিতা' এবং 'সুবঃ' শব্দদ্বয়ের আকৃতি পরীক্ষা করিও। 'প্রিয়ং' বা প্রীণাতিরূপে ওঙ্কার

সোম। এটি তৃতীয় মণ্ডল। তারপর, ওঙ্কারের ঋচ্ছতিরূপ 'ভুবরোম্'। বহির্দেশে এই 'ভুবরোম'কে ভুবনমণ্ডলরূপে পাইয়া জঙ্গাম জগৎ (অণু-জ্যোতিষ্কাদি) চলিতেছে। প্রাণ এবং মানস দেশেও এই ঋচ্ছতিমণ্ডলেই সব কিছু চঞ্চল্যতে। এটি তুরীয়। শেষে, অক্ষ, ধ্রূঃ, বিন্দুরূপে সমস্ত কিছুকে স্থিতিতে (তিষ্ঠতি) রাখার যে মণ্ডল, তাকে বল— 'ভূরোম্'। গায়ত্রীশিরঃ দৃষ্টি কর। 'এই' (here-now) রূপেই সব কিছু ধ্রুবাক্ষ এবং ধ্রুববিন্দু স্পর্শ করিতেছে। কিন্তু ঋচ্ছতি মণ্ডল কোনও বস্তুর সম্পর্কে বিষমাবেগবিশিষ্ট (conditioning as actual or potential differential field) থাকায়, সে ধ্রুবমণ্ডলে থাকিতে পায় না। The Unbounded Eternal Here and Now তার মিলে না। বাহ্যজপে মালার মেরুতে আসিয়া জপ শেষ হয় না; আবার ঘুরিতে হয়—মেরু লঙ্ঘন না করিয়া। অন্তর্জপে মেরুবিন্দুর কথা বিশদ করিয়াই বলা হইয়াছে। গায়ত্রী দৃষ্টান্তরূপে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' 'ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'; 'ওঁ নমঃ শিবায়'; ইত্যাদি সকল জপেই ছন্দোমাতা গায়ত্রীর ঐ সু-পরীক্ষিত আকৃতিটি মিলাইতে যত্ন করিবে। হ্রীঁ প্রভৃতি একাক্ষর বীজেও তাই। কোথাও গ্রস্তাদি জপ হইতে দিতে নাই।

জগ্মিবাংস্তস্থিবাংশ্চেতি ধ্রুবোপায়ো দ্বিরূপকঃ।
উদয়ে প্রথমং প্রাপ্য বিলয়েঽপরমাপ্নুহি॥৩৬

ধ্রুবের উপায় বা উপায়ন জগ্মিবান্ এবং তস্থিবান্ এই দুই রূপে জপে সাধন করিবে। উদয়ে নাদরূপ ধ্রুবের জগ্মিবান্ ভাবটি যথাযথ পাইয়া, বিন্দুবিলয়ে তস্থিবান্ ভাবটিও ক্রমে প্রাপ্ত হও। 'মেরৌ শেতে বিন্দুলীনঃ'। অভিসম্পন্ন এবং অন্তে অভিনিষ্পন্ন হবার স্থল এটি।

জপে যুযুক্ষু, যুঞ্জান এবং যুক্ত এই তিনভাবের সাধন

আপ ইত্যুদয়ং প্রাপ্য যুযুক্ষু ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
আ ধীমহি রসজ্যোতির্যুঞ্জানশ্চ প্রচোদয়াৎ।
অমৃতং বিলয়ে লব্ধ্বা বিন্দৌ ব্রহ্মেতি শৈরসম্॥৩৭

এইবার গায়ত্রী শিরঃ (শৈরসং)টি ব্যাহরণে মিলাইয়া লও। উদয়ে আপঃ, ব্যাহৃতিত্রয়যোগে উদয়ে জ্যোতীরসধাম আপ্তুকামা, 'শিবতমা রসতমা'-রূপে আপনাকে পবমানা করায় ঊর্দ্ধগা নাদরূপা 'আপঃ'-কে প্রাপ্ত হও। জ্যোতীরসধামের সঙ্গে তোমার নিজ প্রত্যয়ের যে বিপুল ব্যবধান, সেটি উত্তীর্ণ হইবে কিসে? ব্যাহৃতিত্রয়ীকে 'যুযুক্ষু' (যোজিকা) রূপে সমাশ্রয় কর। তারপর, তোমার ধ্যান-মুকুরে পড়িতে দাও সেই 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'। কিন্তু সে মুকুরে রসজ্যোতিঃ বারেক প্রতিফলিত হইয়া আবার অপিহিত হইয়া যায় যে! যুঞ্জান হও—ধী যেন এই যুঞ্জানকেই ভুঞ্জান হয়, জ্যোতির্বিশাল রসভুক্ হয়, সেই নিমিত্ত 'প্রচোদয়াৎ'। যুঞ্জান হইলে অমৃত ঝরীর অপাবরণ—এটি অন্তিম প্রণব দ্বারা সাধিত হোক্। বিন্দুলয়ে 'নিত্যযুক্ত' হবার চরম সাধন

ঋতবঃ ষট্‌চতুর্যুগী তিথির্মাসোহ্যহঃ ক্ষপা।
অয়নং চরণং ক্রান্তীর্বিদধাতে রবিঃ শশী।
দেশকালাদিমানানি জ্যোতিশ্চক্রধুরন্ধরৌ॥৩৮

ঋতু কিভাবে বুঝিতে হইবে—ঋতম্ ও ঋতু

হেমন্তাদি ছয়ঋতু; কৃতাদি যুগ; তিথি, মাস, দিবা, রাত্রি; গ্রহ-নক্ষত্রাদির অয়ন, চরণ, ক্রান্তি;—ইত্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের দেশ-কালাদিগত যাবতীয় 'মান', রবিশশী, এই রাহস্যিক-তত্ত্বযুগল, জ্যোতিশ্চক্রের ধুরন্ধররূপে ধারণ এবং বিধান করিতেছেন (সৃষ্টিসূক্তের এই 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা' পুনশ্চ ভাবনা কর)। ষড়ঋতু ইত্যাদির কথা কেবল যে অধিভূত দৃষ্টিতেই বলা হইল এমন নয়। সূর্য চন্দ্রমাকে অধিভূতমাত্র খ্যাতিতে লইলে তাঁদের যে মহীয়সী খ্যাতি, নিখিল সৃষ্টি রহস্যোদ্‌ভাসিনী খ্যাতি, সে খ্যাতিকে একান্ত খর্ব করা হয়। সূর্য বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জের বিপুলভাস্বর মহাসভায় কোন গতিকে তৃতীয় শ্রেণীতে একটুখানি ঠাঁই পাইয়া, আমাদের ধরিত্রীর কাছেই মহাদেদীপ্যমান ভাস্করটি হইয়াছেন; আর চন্দ্র তো এই ধরিত্রীরই এক নীরস, নিষ্প্রভ উপগ্রহ;—এ দৃষ্টিতে আর্যদৃষ্টির সেই 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা' দেখিতে প্রবৃত্ত হইও না। তবে, 'ঋতং সত্যম্' রূপ স্বয়ংতপঃ ব্রহ্মের আদিম

আবী-রূপতার দর্পণে যে 'আদিবিম্ব', সে আদিবিম্বের প্রতিবিম্বও যথাসম্ভব কুণ্ঠিত গুণ্ঠিতাদি হইয়া পড়িয়াছে আমাদের এই অধিভূত দৃষ্টিদর্পণে। এর সাহায্যে সেই অরুন্ধতী দর্শনটি করিয়া লও। ঐ সূর্য আর ঐ চন্দ্র, 'এই, 'সেই', আর এদের অন্তরীক্ষ, এ তিনেই অস্মদাদির জড়ীয়, কৃপণ দৃষ্টিকে সেই 'দিবীব চক্ষুরাততম্' রূপে ফুটাইয়া তুলুন। তাই না তাঁরা উপাসনীয় পূজনে, স্তবনে জপে, ধ্যানে। উদাহরণরূপে, ঐ ষড়্ঋতু, চতুর্যুগ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই কেবল বাহ্য সৌরমানে (on solar scale) নয়, পরন্তু সর্বজাগতিক (cosmic) পটভূমিকায় বুঝিতে হইবে। সংক্ষেপে ধর 'ঋতু'। ব্রহ্মের আদিম ঋচ্ছতিরূপ যে 'ঋতম্' সেটি যেন আবির্ভাবে আসিয়াও 'ততোভূয়স্ত্বম্'কে সহজে অঙ্গীকার করিতে চায় না। যেন বলে— 'মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্'। প্রজাপতির আদিম যে 'কৌমার সৃষ্টি' (সনৎকুমারাদি) তাতে এইরূপ। ব্রহ্মই প্রণবরূপী (অ উ ম) হইয়া সৃষ্টিতে আসিতেছেন। ঋতমে অন্তে যে 'অম্' সে যেন তার ব্রহ্মবিশ্রান্তি থেকে আর নড়িতে চায় না! উপায়? উপায়—উবর্ণ। এটি প্রাণব্রহ্মের রাত্রির গম্ভীরান্তঃ অবগাহী বায়ুদৈবত রূপ। এটি আসিলে তবে সমস্ত কিছু 'ছন্দসা' আবৃত্তিমান্ হয়—উন্মীলন নিমীলনাদির ছন্দে আপনাদিগকে রূপায়িত করে। ঋতমের অমের স্থলে 'উ'—আসিয়া হইল 'ঋতু'। মানে শুধু 'season' নয়। সর্বজাগতিক ছন্দোগত্ব সংস্থা এই ঋতুতে বর্তিয়াছে বুঝিও। তোমার জপধ্যানাদি সাধনে এই ঋতুচ্ছন্দ অনুসরণ তোমায় ঋতচ্ছন্দের অনুবৃত্তিতে প্রবর্তিত করিবে।

উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন জপের দৃষ্টান্ত

প্রণব, গায়ত্রী, অপর যে কোন জপে যথাযোগ্য ধ্যান দিও। দুইটি অয়ন—দক্ষিণ এবং উত্তর। এ-দুই অয়নের সন্ধিবিধায়ক দুটি 'সংক্রান্তি' আমাদের পূর্বকথিত দুটি 'মেরু'। যেমন, গায়ত্রীজপে উদয়প্রণবে উত্তরায়ন আরব্ধ হইল। একে সৌরায়ন বা স্বাহায়ন বল। দক্ষিণায়নকে চান্দ্রায়ণ বা স্বধায়ন বলিতেও পার। দুইটি মেরুকে 'উ.দ' এবং 'দ. উ' সংক্ষেপে বল। 'উ.দ'তে ('বরেণ্যম্') উদয়ের পূর্ণতা পূর্ণ উন্মীলন। 'দ.উ'তে সেই পূর্ণ-নিমীলন 'অমা'স্থল। যতক্ষণ জপ সাধারণভাবেই চলে, ততক্ষণ 'উ' আর 'দ' এর এবম্প্রকার অনুসরণ। পরে 'বামেন দাক্ষিণ্যম্'। অর্থাৎ, দক্ষিণ হয় উত্তর,

উত্তর হয় দক্ষিণ। তখন, আরম্ভ দক্ষিণে, কিন্তু শেষ উত্তরে। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম শরশয্যায় এই 'উত্তরের' অপেক্ষা করিতেছিলেন, নয়?

জপে দিবা এবং ক্ষপা কিভাবে পালটাইয়া যায়?

উত্তর এবং দক্ষিণ অয়ন দুটিকে পালটাইয়া লইবার সাধনই সাধন। প্রথমতঃ জপে মনে হয় যেন উদয়ে শুক্লা গতি — যেন ইহাই দিবা, অহঃ। এই ভাবনায় তখন চলিতেও হয়, কেননা, বামা-গতি তখন (বৈখরীজপে) স্বচ্ছন্দ প্রবৃত্ত নয়। 'কষ্টকল্পনা' করিয়া, ভাবের উপর জবরদস্তি করিয়া যথার্থ কিছু লাভ হয় না। আবার, তখন বিলয়ে যেন কৃষ্ণা গতি—দেবস্য বরেণ্যং ভর্গঃ যেন কোন্ অব্যক্তের অস্তাচলে গোপন হইতে চলিল। যেন ক্ষপা, নিশা। কিন্তু সংযমীর (বাক্-প্রাণ-চিত্ত এ তিনকে—তেজঃ, ওজ এবং ভাঃ, এ তিনকে মিলাইয়া)। জপ মধ্যমাদির ভূমিতে আরব্ধ হোক্। তখন, 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি। তখন বৃত্তি উলটাইয়া গেল। আর, এই 'বামেন' দাক্ষিণ্যং'—ব্রহ্মে, আত্মায় যথার্থ দক্ষিণভাবটি আসিল। এই উত্তরায়ণে বাক্ প্রাণ চিত্ত তাদের বৈখরী আদি 'তনু' ত্যাগ করতঃ উত্তমাঃ, বিরজাঃ যে বিন্দুধাম তাতে আদৌ সম্পন্ন, পশ্চাৎ তদতীতে নিষ্পন্ন হয়।

অহং এবং অহঃ

মালাজপে মেরুলঙ্ঘন না করতঃ মালা পালটাইয়া যে জপবিধি, সেটি কেন, তা এই সূত্রালোকে দেখিতে যত্ন কর। তবে, যাহা সাধিষ্ঠ-সাধন প্রান্তে আসিবে তাকে প্রথম সাধনারম্ভেই হঠপূর্বক আনিবার অথবা মিলাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। তাই উদয়, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ইত্যাদি কলাক্রান্তিতেই তোমার জপ বিক্রমণটি চালাইতে থাকিবে। তখন, সায়াহ্নের পর যে 'নক্তম্', তাতে 'শয়ীথাঃ'। এ শয়নটি সুস্থির ভাবেই হইয়া চলুক্। প্রথমে যে বিক্রমণ, সে তো 'অহমের' বৃত্তিমান্ হওয়া। বাক্ দেয় আদি স্বর 'অ'; প্রাণ দেয়, 'হ'; আর মন দেয় 'ম'। অহমের এই ক্রমণটি প্রথমে হোক্ বাকের অগ্নিতে বিক্রমী; তারপর, প্রাণের 'ওজসা উরুক্রমী; এবং অন্তে মনের মধুরসে পরিক্রমী। প্রকৃত পরিক্রমা (পূর্বোক্ত নাদমেরু-বিন্দুমেরু তীর্থ পরিক্রমা) চলিতে থাকিলে, অহমের তনুতমসাঘোর কাটিয়া যায়। সে তখন হয় অহঃ।

জপে উদয়, উন্মেষ ও অবসান—প্রতিভাচ্ছটায় এইভাবে ভাবনা কর

ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী এবং রৌদ্রী (শাম্ভবী)—এ তিনের সঙ্গে অন্বয় রাখিয়া নাদপরিক্রমার ঐ তিনটি কলাকে যথাক্রমে উপক্রম, উরুক্রম এবং সংক্রম বলিতে পার। পরিভাষা যাই কর, অহমের অহঃ রূপে সংক্রমণ অনুভূতির দিক থেকে অতীব প্রাসঙ্গিক। অনুস্বারের একটি বিন্দু, বিসর্গের দুই বিন্দুতে অন্বিত হইয়া আদৌ মূল ত্রিকোণাকৃতি হইল। পরে, এ ত্রিকোণ সংবৃত হইয়া শূন্যপূর্ণৈক বিন্দুতে আসিয়া বিশ্রান্ত হইল। বাকের অগ্নি আসিয়া ঐ শাম্ভবী ত্রিকোণীর অগ্নি বিন্দুতে, প্রাণমনের সূর্যসোম অপর বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হইয়া, অন্যোন্য-অভেদ ভাবনা সমাপনে 'একবিন্দু'তেই পরিনিষ্ঠিত হইল। অগ্নির দীপক তেজঃ জানিল —সে সবিতার (প্রাণের) ওজঃ এবং ভর্গঃ। আবার, প্রাণের ওজঃ এবং ভর্গঃ জানিল—সে সোমের রোচিঃ এবং রস। 'বরেণ্যম্' স্থলে এই অভেদ সমীকরণের 'আভাস' মিলিয়াছিল। 'ধীমহি'তে প্রপন্ন হইয়া সেই বরেণ্য চিজ্জ্যোতির আভাসটিকে তোমার ধীমুকুরে 'প্রতিভাস' (প্রতিভাত) করিয়া লও। প্রতিভাস অন্তিম প্রণবের বিনিশ্চয়বৃত্তিতে অবধারিত হইয়া হউক প্রত্যবভাস—প্রতিভা। 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—সেই ভাঃ বা ভর্গঃ যখন শুদ্ধ সত্ত্ব ধীতে প্রতিভাত হইয়া সর্বাবভাসিকা হয়, তখনই তাকে বলে 'প্রতিভা'। এই প্রতিভাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিলয়ে কি হইবে? প্রতিভার ঐ 'প্রতি'কে প্রথম পরিহার করতঃ হও 'ভান', এবং অন্তে শুদ্ধ ভাঃ স্বরূপ। 'বরেণ্যম্' শেখরে যে সূর্যশশীর মিলটি দেখিয়াছিলে, সে মিলনের আর বিচ্ছেদ বা বিরহ ঘটিবে না তোমার এই মহীয়ান্ 'প্রাতিভ' পন্থায়। যে রসঝরী 'বরেণ্য'মে বহিয়াছিল, 'ধীমহি'র ধ্যানরসে সে ঝরী হৌক্ তোমার সরস পবমানা সরিৎ। 'প্রচোদয়াৎ' দ্বারা সে সরিৎ হোক্ ঋজুগমনা, ধ্রুববহনা, সমৃদ্ধবেগা। বিলয় প্রণবে সে হৌক্ আকুলোচ্ছ্বাসা সিন্ধুসকাশা সরিদ্‌বরা। আর, বিন্দুলয়ে? 'ন সো বঁধু সায়র, ন হাম তঁহি তটিনী'! ওগো, গায়ত্রীজাপক! তোমার জীবনে এমন প্রতিভাপেক্ষায় ভাবিলাস, আর মরমীতন্ত্রীতে এমন রসবিলাস কি শুধুই তোমার একটি দীর্ঘশ্বাসে উধাও হওয়া নিছক কল্পনা বিলাসই রহিয়া যাইবে! গায়ত্রীর কথা হইতেছে, কিন্তু হ্রীঁ আদি বীজ মন্ত্র? এদেরও সত্তা (তত্ত্ব), শক্তি (ভাবব্যঞ্জনাদি), ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ চতুষ্পাদেই যে অসামান্য সামর্থ্য,

তাহা এই গ্রন্থে বারবার নানাভাবে বলা হইয়াছে। সূর্যচন্দ্রমার প্রসঙ্গে এইরূপও ভাবনা কর—

হ্রীমাদি বীজ চতুষ্টয়ের কোথায় কি ভাবে উপযোগ?

তামসং হ্রীমিতি দ্বারা তথা চৈমিতি রাজসম্।
জিগীষ সাত্ত্বিকং ক্লীঁ চ শ্রীমিতি যদছান্দসম।
নাদবিন্দূ রবীন্দূ চ ভুঙ্‌ক্তস্তৌ চ দ্বয়ং দ্বয়ম্॥৩৯

তোমার তামস ভাবটি কাটাইয়া মহাশক্তি ভাণ্ডারের অপাবরণ নিমিত্ত কি করিবে? হ্রীঁ এই মহাশক্তি উদ্‌বোধন বীজ দ্বারা 'তামসং জিগীষ'— তামসকে জয় করিতে ইচ্ছা কর। রাজসকে তার বিবিধ অধোগ এবং জিহ্মগ বিক্ষেপমুক্ত করিয়া তাকে ঋজু ঊর্দ্ধ্বগ করিতে কি করিবে? ঐঁ এই বীজ সমাশ্রয় কর। যৎকিঞ্চিৎ (গতি-স্থিতি) অছান্দস, তাতে সুষমাসৌষ্ঠব সাধনে শ্রীঁ বীজ। আর, স্বধামে অভিসম্পন্ন হওয়াতে সত্ত্বের যে অশুদ্ধিগ্রন্থি, তাকে, এবং স্বভাবে (স্বরূপে ও স্বরসে) নিষ্পন্ন হবার জন্য প্রাকৃত গুণত্রয়ের যে সত্ত্ব, তাকেও জয় করিতে ইচ্ছা কর ক্লীঁ বীজ সমাশ্রয়ে। প্রতিটি বীজ-মূর্দ্ধায় সূর্যসোম নাদবিন্দুরূপে রহিয়াছেন, এবং পূর্বের দুটিকে সূর্য বিশেষভাবে, এবং পরের দুটিকে সোম বিশেষভাবে পালন করিতেছেন (ভুঙ্‌ক্তঃ) অর্থাৎ প্রথম দুটির জপে সাধারণতঃ ওজঃ এবং অর্চ্চিঃ এই মাত্রাদ্বয়ের এবং শেষের দুটিতে রোচিঃ এবং শ্রী এই মাত্রাদ্বয়ের মুখ্যতা থাকে। তবে, লক্ষণ বুঝিয়া, অচ্ছন্দোগ স্থলেই শ্রীঁ; অধামগ স্থলে ক্লীঁ, অসমর্থ অজাগৃতি স্থলে হ্রীঁ, আর অধোগ, বিসর্পী, প্রমাথী রাজস স্থলে ঐঁ—এই মহাবীজ চতুষ্টয়কে সমাশ্রয় করিবে। ইহাও লক্ষ্য কর যে—গায়ত্রীজপে উদয় প্রণব থেকে ব্যাহৃতি অন্ত অবধি বিশেষভাবে হ্রীঁ এর অধিকার। 'ধীমহি' পর্যন্ত ঐঁ। 'প্রচোদয়াৎ' পর্যন্ত শ্রীঁ। আর বিন্দুবিলয়ে ক্লীঁ। এই সঙ্গতিটি সর্বতোভাবে সাধিয়া লইও।

জপে অয়ন ও চরণ। পুরশ্চরণের যথার্থ তাৎপর্য

ঋতুর প্রসঙ্গে আসিয়া 'অয়ন' বুঝিতে হইয়াছে। গায়ত্রী এবং অন্য অন্য জপে উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন গোড়ায় কিভাবে চলে, এবং অন্তে, বাক্-প্রাণ চিত্তের

(ধীর) সাধিষ্ঠতায় উপনীত হইলে, কি ভাবে উক্ত অয়নদ্বয় পাল্টাইয়া যায়—তাহা আমরা প্রণিধান করিয়াছি। এই 'পাল্টাইয়াই', গোড়াকার উল্টা হয় সোজা। যাহা 'অয়ন' মাত্র (apparent motion), তাকে 'চরণ' (real motion) এ লইবে যাহা, সেটি 'পুরশ্চরণ'। ক্রমকে সঙ্গে লইয়া এতদুভয় হয় 'ক্রান্তি'। অর্থাৎ, কোন অবচ্ছেদক (point of intersection, node ইত্যাদি) সম্পর্কে আসিয়া। তিনে মিলিয়া আপেক্ষিক গতি (relative motion)। এটিকে 'ই' বা 'গম্' ধাতু দিয়ে বল। আর, ঋতমের স্বয়ং যে ঋচ্ছতি রূপ, তাহাই স্বতন্ত্র গতি (absolute motion)। এ সকল কথা পরেও আসিবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে 'অয়ন' রূপেই চলা সুরু হয়। একে ক্রমে ঋচ্ছতির যে ঋতম্, তাতে তুলিয়া লইতে হয়। সহজে সেটি সাধ্য নয়। কিন্তু ক্রান্তিগুলিতে (যথা, শূন্যস্পর্শাদি) সতর্ক হইয়া পুরতঃ চরণ করিতেই হইবে। তখন, জপের গতি স্বীয় গতি হইল; সে নিজেই পুরতশ্চরতি। স্বীয় গতিকে অন্তে সহজ, স্বতন্ত্র গতিরূপে মিলাইয়া তবে ঋতম্‌কে সত্যমে মিলাইতে হইবে।

জপসূত্রম্

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ

অতঃপর চন্দ্রমাঃ সূত্রিত হইতেছেন—

২৩। চন্দ্রমা বরুণসোমসঙ্ঘাতাৎ॥

বরুণ এবং সোম (পূর্বোক্ত রীতিতে) সংহত হইলে চন্দ্রমাঃ।

সূর্য-সোম ইত্যাদি সকল সমীকরণেই ক্রম ও ক্রমান্বয়

পূর্ব সূত্রে সূর্যকে 'মিত্রাগ্নি' আকৃতিতে দেখান হইয়াছে। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' প্রকরণে সূর্যচন্দ্রমার পরস্পর অন্বয়টি বহুধা (তত্ত্ব এবং চর্যা উভয় ভাবেই) বিস্তারিত হইল। তবু সে প্রয়াস সিন্ধুবেলায় কতিপয় উপলখণ্ড চয়নের প্রয়াসের মত। সে প্রকরণে স্থলে স্থলে চন্দ্রমাঃ = সোম, এই সমীকরণ করাও হইয়াছে। কিন্তু সে সমীকরণ (এবং সকল ব্যূঢ় সমীকরণ) অপেক্ষা রাখে কিসের? ক্রম এবং ক্রমান্বয়ের। ক=খ; কিন্তু ক্রমিক শোধনে 'ক' ঠিক 'ক', আর 'খ' ঠিক 'খ' না হইলে তো বাস্তব সমীকরণ হয় না। 'তৎ' এবং 'ত্বম্' পদার্থের যেমন। জল আর H_2O এ দুয়ের যেমন। শুদ্ধ গণিতে সাঙ্কেতিক (symbolical) সমীকরণাদি। সেখানে 'ক', 'খ' ইত্যাদির শুদ্ধি বা 'তৎ+ত্ব' স্বীকৃত। মিশ্র বা ব্যবহারিক গণিতে সেরূপ নয়। গত শতকে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল আলোক এবং তাড়িতের সমীকরণ সূত্রগুলি 'হাতে হাতেই' পাননি। বর্তমানেও দৃষ্টান্ত ভূরি।

এখন পূর্ব প্রকরণে সূর্যকে সূর্যক্রমের কাষ্ঠায় অথবা তদন্তিকে অনেক স্থলেই লওয়া হইয়াছে, চন্দ্রমাকেও তাই। সূর্য তাই 'সবিতা'—এবং তাঁর তেজঃ সেই আদিদেবের 'বরেণ্যং ভর্গো জ্যোতিঃ' রূপ, ভাবিত হইয়াছেন। সবিতা স্বররূপে কখনও বা নাদ। চন্দ্রমাও অনুরূপভাবে বরেণ্যং রোচিঃ এবং রস রূপে চিন্তিত হইয়াছেন। ইনি সে ভাবে সোম। নাদ সম্পর্কে ইনি বিন্দু। বেদের হংসবতী ঋকে 'হংসঃ' (সূর্য) এবং

'সোম'—দুই-ই 'ঋতম্ সত্যমে' মিলিত তনুতে দেখা দিয়াছেন। গায়ত্রীতে 'বরেণ্যম্' স্থলে হংস—সোমের সম্মিলন অবলোকিত হইয়াছে। এই 'বরেণ্যম্' স্থলে এবং বরুণ এতদুভয়ের সম্বন্ধ অনুধাবন করিও। ইহাও আবার পরে আসিতেছে।

নাদের উদয়ে হ্সৌ এবং হৌংসঃ এই দুটি আকৃতি। অনুস্বার ও বিসর্গ।

এখন এই কারিকাটি ভাবনা কর—

হসৌং হংসো হৌংস আমূর্দ্ধ সোহহংশ্চ সোম আলয়ম্।
ওমিত্যাবর্ত্ততে চক্রং নাদে বরুণসোময়োঃ ॥ ৪০

বিন্দু থেকে নাদের উদয়ে যে আদিমা বৃত্তি, সেটি 'হ্সৌঃ' এই আকৃতিবিশিষ্ট। সঞ্চিতশক্তি (হ্) এবং সিঞ্চিত শক্তি (স্), এ দুটিকে দুইটি পক্ষের মত বিস্তার করতঃ নাদ (ওঁ) যেন খগেন্দ্রের মত বাগর্থপ্রত্যয়ের আকাশে সমুদিত হইতেছেন। তোমার ঘুম থেকে জাগার সময় কি হয়, চিন্তা কর; বীজ যখন অঙ্কুর হয়, তখনই বা কি হয়? এ স্থলে 'সঞ্চিত' আর 'সিঞ্চিত' যেন এখনও পরস্পর 'মুখোমুখি' রহিয়াছে; বীজ বলিতেছে— 'এই আমি অঙ্কুর হইলাম'; আর অঙ্কুর বলে— 'ঐ যে আমার বীজ!' জাগৃতি বলে— 'ঐ সুষুপ্তি থেকে আমি জাগিলাম'; আর, সুষুপ্তি বলে— 'এই তো আমার জাগৃতি'। কোন পক্ষই এখন অবধি 'সংগোপন' হয় নাই। কিন্তু, যেই অঙ্কুরটি চারা গাছটি হইল, অমনি বীজ লুকাইল। মহাপ্রাণবর যে 'হ'কার, তার এই প্রকার সংগোপায়িত ঘনীভাব (hidden mine or reservoir) সূচনা করে 'হং'। বর্ণ (এবং বস্তু) মাত্রেরি প্রসরৎ-সঙ্কুচৎ দুটি বৃত্তি। বিসর্গ দ্বারা প্রথমটি, আর অনুস্বার দ্বারা দ্বিতীয়টি বিশেষিত হয়। সুতরাং 'হংসঃ' এই আকৃতিতে 'হ' আপনাকে সঙ্কোচ-ঘন করিয়া লইল; আর, 'স' নিজেকে প্রসার-প্রবণ। 'হং' যেন হইল 'রেডিয়াম', আর, 'সঃ' হইল তার 'রেডিয়েশন্'। প্রত্যক্ষ সূর্য এর ভাস্বর প্রকট রূপ। সৌরায়ণে বা স্বাহায়নে যৎকিঞ্চিৎ চলিতেছে, তাদেরই এই 'হংসঃ' আকৃতিতে ব্যাকরণ। তৎপরে, পূর্ণতায় আসিয়া (আমূর্দ্ধ) সেটি নিজেকে (গায়ত্রীর ঐ বরেণ্যম্ স্থলে) দেখায় কি ভাবে? 'হৌংসঃ'। এখানে ওঙ্কার নিজেকে সঞ্চিতে সঙ্কুচিত, আর সিঞ্চিতে বিক্ষেপ-প্রসারিত (scattering effect) হইতে 'ছাড়িয়া' দেন নাই।

সঞ্চিত-সিঞ্চিত, উভয়ই মহাসমন্বয় সংগৃহীত। এটি আমাদের পূর্বালোচিত নাদপূর্ণিমা। এই পৌর্ণমাসীতে পূর্ণাস্থিতিটি কবে সম্ভাবিত হইবে?

জপে দক্ষিণাচার, বামাচারঃ অভিষিক্ত, পূর্ণাভিষিক্ত।

সুতরাং, গায়ত্রীজপের অনুবর্তনে, 'ধীমহি' স্থলে ঐ পূর্ণকে 'বামেন', বামাগতিতে মিলাইয়া শূন্যে-পূর্ণে পরম সমীকরণটি সাধিয়া লও। শূন্যকে পুরা না পাইলে (অর্থাৎ নিরঞ্জনী স্থিতি না হইলে) পূর্ণ ধ্রুবপূর্ণ হইবে না; আর, পূর্ণকেও পূরা মিলাইতে না পারা পর্যন্ত, শূন্যও ধ্রুবশূন্য হয় না। Pure কে না পাওয়া পর্যন্ত Perfect এর Perfection নেই, আবার, Perfect না হওয়া পর্যন্ত Pure ও Pure নয়। তাই, 'হংসঃ' রূপে তোমার 'দক্ষিণাচার' 'সোঽহম্' রূপে হোক্ 'বামাচার'। এ আচারে আগে 'অভিষিক্ত', পশ্চাৎ 'পূর্ণাভিষিক্ত' হও। অভিষেক কিসের দ্বারা? সোম। এই সোমরসে বা অমৃতে পূর্ণাভিষেকের নিমিত্ত— 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'। পূর্ণাভিষেকে 'প্রৌঢ়োল্লাসের অবস্থা—'সুরা পান করি না আমি, সুধা খাই জয় তারা বলে।' 'আঁখি ঢুলু ঢুলু সদা রাত্রদিনে, কালী নামামৃত মদিরা পানে।' তারপর বিন্দুব্রহ্মে যুগপৎ 'অনবস্থ' এবং 'পূর্ণাবস্থ', 'অনুত্তর' এবং 'পূর্ণোত্তর' হবার নিমিত্ত,— 'সোম'কে বিলীন করিয়া লও—'বিলয় ওমে' (আলয়ং). 'সোমে' 'হ'কার আপন পূর্ণ রসায়নটি (অমৃতায়ন) হইতে দিবে বলিয়া 'স' এবং 'ওম্', এই দুইতে নিজেকে নিঃশেষ-সমর্পণ করিতেছে। বলিতেছে— গোপায়িত সঞ্চয় আর কিসের জন্য? সারা প্রাণের সাগর নিঃশেষে মথিয়া পূর্ণ কর তোমার অমৃত কুম্ভ! 'ওমে' গিয়া 'স্'টিও আপন অবসান পাইল। আর, প্রসার-সিঞ্চনই বা কেন? অবশেষ, উচ্ছিষ্ট কোথায়? সে তো আর পশ্চাতে কোথাও নেই—সে ঐ পুরোভাগে—পরম শূন্য-পূর্ণতায়। সিন্ধুবেলায় সমাগতা সরিতের মত! আর তার পিছু ফেরার, এদিক-ওদিক্ করার, থমকিবার 'বেলা' নেই। এখানে আসিয়া 'পূর্ণাবধূত' হও।

একমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা। অর্দ্ধ বলিতে শক্তির ছেদ নয়

এখন দেখ যে, বীজ সহকারে বিশ্বের বাগর্থপ্রত্যয়প্রপঞ্চ উদয়ের, পূর্ণোন্মেষের এবং বিলয়ের যে মূল শক্তিলেখা (হৃল্লেখা) উপরে অঙ্কিত হইল, সেটি সপ্তক্রমী—বিন্দুব্রহ্ম

থেকে নাদরূপে উদয়, এবং তাতেই পুনশ্চ বিলয়—এই দুটি আদি এবং অন্তিম ক্রম সহ—সেটি সংখ্যায় সপ্ত। এ কয়টিকে তন্ত্রগোপিত 'সপ্তবিষুবের' সঙ্গে অন্বয়ে-ব্যতিরেকে মিলাইয়া লইও। এ সাতের 'অর্দ্ধ' দুটি 'হৌংসঃ' এই মহামূর্দ্ধনি সম্মিলিত। সমগ্র শক্তিলেখকে (হৃল্লেখাকে) যদি বল—'একমাত্রা', তবে, সেটি দুইটি 'অর্দ্ধমাত্রায়' সম্মিলিত ঐ পূর্ণোদয় স্থলে। অর্দ্ধমাত্রার এই দ্বিভাবকে নাদপ্রভবা, এবং বিন্দুবৈভবা বলিতে পার। তবে মনে রাখিও যে ঋধ্যমানা পূর্ণ এবং পরমাবসানা ঋচ্ছতিরূপে অর্দ্ধমাত্রা 'স্থিতা নিত্যা' এবং অবিভাজনীয়া। সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তিরূপিণী যেটি, সেটিকে কোথাও 'ছেদ' দিয়া রাখা যায় না। কেন না, তাতে আদ্যাশক্তির স্বভাবেই অন্যথাভাব হয়। ছিন্নমস্তারূপে তিনি নিজেকে 'ছিন্ন' করার ছলে সেটি দেখাইয়াছেন। স্থূল ছেদে সূক্ষ্মে অবিচ্ছেদ, সূক্ষ্মচ্ছেদে কারণে, কারণচ্ছেদে তুরীয়ে এবং তদতীতে। তাই:—

অস্তীতি শক্তিসদ্‌ভাবশ্চাসদ্‌ভাবোঽপিনাস্তিতা।
জায়তে সদসদ্‌ভাবে শক্তেরশক্যতা কুতঃ॥ ৪১

শক্তির সদ্‌ভাবই অস্তিতা জানিবে। আর, শক্তির অসদ্‌ভাব নাস্তিতা। অর্থাৎ 'আছে' এবং 'নাই', এ দুই-ই শক্তিরই সদ্ এবং অসদ্‌ভাব। এ অসদ্‌ভাব=শক্তির নাস্তিতা বা শূন্যতা ভাবিও না। তারপর, কিঞ্চিৎ জন্মিল, বাড়িতে লাগিল, কমিতে বা ক্ষীণ হইতে লাগিল, ইত্যাদি বিবিধ বিপরিণাম—এগুলি? এগুলিও শক্তির সদসদ্‌ভাব ভাবিও। কাজেই, এ হেন যে শক্তিব্রহ্ম তার অশক্যতা কোথায়, কিসে হইবে?

বরুণরহস্য

এখন লক্ষ্য কর যে, 'একমাত্রা' ব্রহ্মশক্তির ঐ যে দুটি অচ্ছেদ্যা 'অর্দ্ধ'তনু (প্রতিটি আবার সার্দ্ধ ত্রি=সাড়ে তিন), —যে দুটিকে নাদপ্রভাবা এবং বিন্দুবৈভবা বলা হইয়াছে,—সে দুটি যথাক্রমে, চন্দ্রমাসূত্রের 'বরুণ' এবং 'সোম'। সোম তো পরেরটিতে প্রকট, কিন্তু বরুণ? নাদকে ওঙ্কার, প্রাণ আদিত্য প্রভৃতির সঙ্গেই সমীকরণ করা হইতেছিল। এখানে বরুণ কেনই বা আসিতেছেন? বরুণ, বিশেষতঃ,

অদিতি বা আদিত্য (সবিতা), নাদ (স্বর) এবং প্রাণ—এ তিনের সমানাধিকরণতার স্থল। বরুণ শব্দের ‘ব’কার ‘বেবিষাণ’ (ব্যাপনশীল) যে অদিতি বা অখণ্ড আধার সামগ্রী, তার নির্দেশ দেয়। ‘রু’ দেয় স্বরব্রহ্ম বা নাদের। আর, অন্তে যে ‘ণ’, সেটি প্রাণ। অথবা, যেটি পরম (মূর্দ্ধন্য) ধাম, তাকে যদি ‘ণ’ বর্ণ বল, তবে সে ধাম ‘বিবরিষু’ (বরণ করিতে চায়), কিংবা বরণ করাইয়া দেয় (‘ঋ’ এর গুণে ‘অর্’) যাহা, সেই তত্ত্বকে বল ‘বরুণ’। বরুণ বরেণ্যমে বরিত করার তত্ত্ব। বরুণে বেবিষাণ, অধ্বনীন এবং আপ্যায়ন—এই বৃত্তিধারা উরুক্রমে সংক্রমণ করিয়াছে। ‘আমি সমস্ত কিছুকে পরমব্যাপনে লইব; সব কিছুর অধ্ব বা মার্গ ঋতকুশল করিব; এবং সব কিছুকে আপ্যায়নের পরাকাষ্ঠায় (ব্রহ্মাপ্যায়নে) চরিতার্থ করিব। ‘বৃণু’ এবং ‘বরুণ’ এ দুই আকৃতিও সযত্নে পরীক্ষা করিও। যথার্থ ই, যেটি জ্যোতীরস নিরতিশয়তারূপে পরম বরেণ্য, তাকে ‘বিবরিষু’ হও (বৃণু) বরুণকে সমাশ্রয় করিয়া। এ সব কেবল অধ্যাত্মসাধনারই কথা নয়। সর্বজাগতিক (Cosmic) রহস্য। অধিভূতে (বিজ্ঞান থেকেও) এর দৃষ্টান্ত লও, পরীক্ষা কর। তাড়িতশক্তি জড় পরিচ্ছেদে (এই পরিচ্ছেদকে ‘বিচ্ছেদ’ করিয়া অধিভূতেও দেখিতে নাই) বিশ্বব্যাপিকা—বেবিষাণা। তুমি যদি দৃশ্যাদৃশ্য আলোক তাপাদি আকারে এই ‘বেবিষাণা’কে মিলাইতে চাও, অর্থাৎ, তোমার সম্পর্কে আপ্যায়নীরূপে, তবে কি আবশ্যক হয়? মাঝের ঐ অধ্বনীন (অধ্বনি সাধ্বী) রূপটিও সুকৌশলে মিলাইতে হয়। জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে সর্বব্যাপী। তুমি যদি কারীরী যাগে তাকে বর্ষণকৃৎ পর্জন্যরূপে পাইতে চাও, তা হইলেও ঐ আবশ্যকীয় ‘ব+রু+ণ’ এই আকৃতিটি সমর্থভাবে পাইতে হয়। দুই পাশে ‘ব’ আর ‘ণ’; মধ্যে ‘রু’ থাকিয়া উভয়ের সমর্থ-সার্থক সংযোজনটি সংঘটিত করে। প্রণবের ‘অ উ ম’ এর সঙ্গে কেবল ধ্বনিগত নয়, ব্যাপারগত সঙ্গতি রহিয়াছে, ইহাও দেখ। গত শতকের বিজ্ঞানে ‘ঈথার’ এক বিভু (বেবিষাণ) পদার্থ মানা হইত (as Plenum). ‘Nature abhors vacuum’—এই ছিল সে যুগের চিন্তার এক মূল স্বীকার্য। কিন্তু ঐ অব্যাকৃত বিভুবস্তুটি ব্যাকৃত (differentiated) হইয়া পরমাণু আদি মূলবস্তু, আর আলোক-তাড়িতাদি তাদের মৌলিক ক্রিয়া হয় কি করিয়া? ঐ ‘রু’কে মাঝে রাখিয়া। ‘রু’ ঐ স্থলে সংখ্যা-সংখ্যানের কতিপয় ব্যাস-সমীকরণ (differential equations)। বর্তমানে চিত্র বদল হইয়াছে, কিন্তু ‘বরুণ’ বাহালই আছেন।

'বরুণ' এবং 'বিষ্ণু উরুক্রম'—এ দুটি তুলনা করিয়া বুঝিও। বরুণের বেবিষাণে 'বিষ্' ধাতু; বিষ্ণুতেও তাই। বরুণের 'ণ' বিষ্ণুর 'ষ'-এ যুক্ত। উরুক্রম থেকে 'রু' বরুণের মাঝে প্রবিষ্ট। এ সবের দ্যোতনা কি ভাবনা করিও। উরুক্রমের 'উ' আর 'ক্রম' এ দুই বরুণে 'রু'তে মিলিত। এরই বা ব্যঞ্জনা কি? এ সব হেঁয়ালির কথা বলিবে? বহির্বিজ্ঞানে, গণিতে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে এই 'যাদুকর্ম্ম' (jugglery) না করিয়া উপায় নেই। আচার্যেরা করিতে কসুর করেন নাই। পরিহার, প্রত্যাহার, অধ্যাহার, অন্বাহার, সমাহার—এসব রকমেই শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়ের আবশ্যকীয় 'আহরণ'টি করিতে হয়। পূর্ব ব্যবস্থিত, অথবা অধুনা ব্যবস্থাপিত কোনও 'ফল' (result) কে উত্তর সূত্র-সমীকরণাদিতে পূর্বোক্ত অধ্যাহারাদি না করিলে তো বরুণের ঐ 'রু' বৃত্তিমান্ হয় না। এখানে কথাটা আভাষে বলা হইল। উরুক্রমের চারিটি বর্ণ আপন 'রু'তে সংগৃহীত করিয়া বরুণ বলিতেছেন—আমি বিষ্ণু বেবিষাণ রূপে বিশ্বের নিখিল ক্রমকে 'উরু' (উদার, অবাধ) হবার নিমিত্ত যে আধার পটভূমি, সেটি পাতিয়া রাখিয়াছি। স্বয়ং ক্রমিকতা (differentiated gradedness, seriality ইত্যাদি) বরণ না করিয়া, বিশ্বের যাবতীয় ক্রমকে তার ক্রমিকতা অবাধে মিলাইবার আধার হইয়াছি। যেমন, কোন স্পন্দন, কোন ঊর্মি। ঐ গোচর অসীম মহাকাশ আর অকূল মহাসাগরই তাদের অবাধ ক্রমবিতানের অঙ্গীকার (guarantee) দিতে পারে। স্বয়ং ক্রমবিরহী বলিয়াই 'আকাশ' আর 'আপঃ' স্পন্দ, ঊর্মি—এদের বলিতে পারে—তোমরা স্বচ্ছন্দে আপন-আপন ক্রম আমাতে অনুসরণ কর। অবাধিত ক্রমটি বাধিত যদি হয় তবে সে বাধ আমার জন্য নয়। একান্ত অবাধায় যে আপ্যায়ন, সেই আপ্যায়নেরই স্বভাবস্বরূপ আমি— 'আপঃ'। আকাশ, অদিতি এবং আপঃ—এ তিনটি তত্ত্বকেই আমি আমাতে মিলাইয়াছি।

সুতরাং বরুণে যে 'রু', সেটি স্বয়ং সাক্ষাৎ ক্রমধর্মাবচ্ছিন্ন নয়। সেটি অক্রমী রহিয়া ক্রমমাত্র সম্ভাব্যতাবচ্ছিন্ন। নিখিল ক্রমসম্ভব সে আধারকে আধার পাইয়াই। বরুণের এই unbounded undifferentiated Plenum and Background আকৃতিটি স্মরণযোগ্য। সর্ববিধ সাধনে (বিজ্ঞানেও) এই বেবিষাণ, উরুক্রম আধারটি (অনাহত নাদাদিরূপে) মিলাইতে হয়। নচেৎ নিরাধার জপাদি কর্মক্রম আপন অবাধ ক্রমিকতায় (unrestricted, gradual progression-এর) চলিবার বা দাঁড়াইবার

'ভূমি' পায় না। তার আপ্যায়নও হয় না। মহাকাশের মহামুক্ততা, আর মহাসাগরের মহা সাবলীলতা—এ দুয়ের কুণ্ঠা-কার্পণ্যহীন 'আধার' মিলাইবার জন্য, এ তিনের সম্মিলিতরূপ বরুণে প্রপন্ন হও। 'শং নো মিত্রো বরুণঃ'। 'মিত্র' অন্যভাবে ভাবিত হইলেও, এখানে এইরূপ ভাবনা কর—আমাদের কল্যাণ বিধান (আপ্যায়ন) এর নিমিত্ত বরুণ প্রসন্ন হইয়া আমাদের মিত্র হউন! যেন অসীম নীলাকাশ—নিম্নে প্রশান্ত মহাম্বুধির বেলায় দাঁড়াইয়া যুক্ত করে বলিতেছি—ওগো অকৃপণ প্রসাদ মহান্, অকুণ্ঠ স্নেহবিপুল! তোমরা দুয়ে মিলিয়া আমার এই যাত্রাকে তার পরম-আপ্যায়ন পরিসীমায় মিলাইয়া দাও! বরুণ=আকাশ, অদিতি, আপঃ, এ সমীকরণ বেদেই পাই। জীবনে, সাধনেও এটি পাইতে হইবে।

পূর্বে যে 'নাদ প্রভাবা' অর্দ্ধমাত্রার প্রসঙ্গ হইয়াছিল, সেই অর্দ্ধমাত্রা বরুণকে অপাবরণে দেখাইলেন। বরুণের নামে এঁকে বরুণার্দ্ধমাত্রা বল। বরুণ এ দৃষ্টিতে বেবিষাণ, উরুক্রমের উরুরূপ, এবং আপ্যায়ন ভূয়িষ্ঠ। অবাধ বিপুল অধ্বনীন (অধ্বনি সাধু বা সাধিষ্ঠ)। তবু এ বিপুল বেবিষাণ যেন ঐ আকাশ আর অপের মত 'বাহিরে' (an Immense Plenum of Impartial Objectivity)। পরের অর্দ্ধমাত্রায় ইনি 'আত্মনীন' হইতেছেন—'সোঽহম্' এই আত্মাভিসরণে। ঐ সুবিপুল মহান্ এই আত্মাই—এই পরম অববোধটি আনিয়া দেন—সোমার্দ্ধমাত্রা। যে 'অহং' 'সঃ' কে খুঁজিতেছে, সোম তাকে সন্ধান দেন 'স ওম্'। আর, সে ওম্ বিন্দুতে যাইয়া দেখে—আমাতেই সকল আরম্ভ, সকল স্থিতি, সকল অবসান। আমাতেই শূন্য এবং পূর্ণ উভয়েই নির্ব্যূঢ়ভাবে মিলিল। আমি আত্মা—অস্তি, ভাতি, প্রিয়মের একান্ত অভেদে মিলিবার ঠাঁই। এখানেই পরমাপ্যায়নী স্থিতি। যেটি বিপুল মহান হইয়াও প্রথম প্রতীতিতে 'বাহ্য', সেটি নিখিলান্তরাত্মা হয়, Immense Objective হয় Intimate Subjective এবং পরিশেষে Ultimate Absolute যে দৃষ্টি বা ধী, তার প্রসাদে তাকে 'সোমধী' যদি বল তো, তবে সোমের, এ প্রসঙ্গে আর এক নাম দাও বিবুধ। তা হইলে, পূর্বোক্ত অর্দ্ধ-মাত্রাদ্বয়ের একমাত্রায় মিলন বরুণবিবুধ সম্মিলন। এঁরা গায়ত্রীর 'বরেণীঅম্' তে সমন্বিত সহোদরযুগল। মাতা পরাবাক্—সুভাষিণী।

আগে 'বরেণ্যম্' স্থলে সূর্যসোমকে মিলিতে দেখিয়াছি, তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণ

মহিম্নি। এখানে, বরুণ সোম (বিবুধ)-কেও মিলিতে দেখিয়া 'বিব্রত' না হই। জড় পরিচ্ছেদে অথবা বিচ্ছেদেই তার মামুলি কর্ম করিয়া বুদ্ধি বেজায় বিচ্ছেদ বিলাসিনী হইয়া পড়ে। 'কখ' যেথায় আছে, সেখানে 'খগ' থাকে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে মহামায়া বিন্দুবাসিনী হইয়া সব কিছুতেই ব্রহ্মরূপা অনুপ্রবিষ্টা আছেন। ব্যবহারের প্রয়োজনে সে ব্রহ্মরূপাকে যখন, যেভাবে যতটুকু দেখি না কেন, তাতে ব্রহ্মত্বের অল্পত্বাদি ঘটে না। 'বরেণ্যম্' তো উন্মেষ=উন্মীলনের পৌর্ণমাসী। সেথায় তত্ত্বসামগ্রী অসংখ্যেয় কলায় প্রস্ফুটিতা। কিন্তু এক একটি বর্ণ, অক্ষর? তাতেও ঐ ব্রহ্মরূপা বিন্দুবাসিনীকে অস্বীকার করিবে কে?

ভানে পরম উন্মেষ ও পরম সমাপন

তবে বর্তমান অনুবন্ধের অনুরোধে বরুণ সোম মিলনটি ঐ স্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে। মনে কর এক বিপুল বিতান বা প্রসার যেমন ঐ মহান্ আকাশ আর সমুদ্র। ক্ষোভহীন, সীমাহীন, ছেদহীন 'ভান' রূপে সেটি বিদ্যমান। কিন্তু সে 'ভান' এখনও আপনাতে যেন 'ধ্যান' দেয়নি। সুতরাং এখনও সে ধ্যেয়ও নয় (as Immense Objectivity), ধ্যাতাও নয় (as Fully Awake Intuitional Subjectivity)। 'বরেণ্যম্' স্থলে 'ধ্যেয়-ধ্যাতা' চণকের বীজে দুটি দানার মত পরস্পরে সঙ্গাত, আলিঙ্গিত রহিয়াছে। পরস্পরকে 'সরাইয়া' রাখে নাই। না 'সরিলে' কিন্তু ধ্যেয় এবং ধ্যাতা পরস্পরকে তত্ত্বৎ রূপে জানে না। এই নিমিত্ত পরের পাদে আসিয়া হইল 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি'। এইবার, ভানসামগ্রী যেন 'আত্মনীন' হইল। এতেই ধ্যান মননের জন্ম। 'ধী', এই সাধারণ নামটি ব্যবহার করিলে এতক্ষণ ভানচৈতন্য ছিল, কিন্তু ধীচৈতন্য ছিল না। Alogical ছিল, 'Logical' তাতে 'নিবিষ্ট' ছিল, নিরূপিতরূপে ছিল না। গায়ত্রীর তুরীয় পাদে, ঐ অভিব্যক্ত ধী-চেতনা নিজেকে ধিয়ঃ রূপে বিশ্লিষ্ট (analytically operative) করিয়া লইয়াছে। 'অহং', 'বুদ্ধি', 'মনঃ', 'চিত্ত'—এ সব ধিয়ঃ হইয়া স্ব স্ব অধিকারে বৃত্তিমান্ হইতেছে। এদের নিজ নিজ আকৃতি এবং ছন্দঃ প্রয়োগ বিনিয়োগের ভূমিতে আসিল। আদৌ যে ভান-সামগ্রীতে (Experience as undivided whole) 'অহন্তা-ইদন্তা' অভিব্যক্ত হয় নাই, সেটি প্রথমে অন্যোন্যালিঙ্গিত (locked in each other's embrace), পরে

পরম্পরাভিমুখীন ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া, শেষে 'ইদং' এবং 'অহং' (ধী), দুটিকেও বিশ্লেষ করিতে লাগিল। এই 'কলা' টিকে 'বিজ্ঞান' বলিতে পার। কিন্তু এ বিজ্ঞানে বিভ্রংশ, বিভ্রমের, বিলুপ্তি, বিনষ্টির সম্ভাবনাটিও উন্মুক্ত, উদ্যত, উদ্দাম। ভানের পৌর্ণমাসীতে, পরিপূর্ণভানে যাহা সেই সবিতার বরণীয় ভর্গঃ, সেই পরম জ্যোতীরসকেই ধ্যান করিব—এই অভিসঙ্কল্প সত্ত্বেও, 'ধিয়ো নঃ'—আমাদের বহুশাখা, অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বিসংবাদী বিজ্ঞান বিভ্রমে পাতিত হইতেছে। আত্মনীন হইবে বলিয়া অনাত্মনীন হইতেছে। কাজেই— 'প্রচোদয়াৎ'। অহমাদি ধী সমূহকে তোমার সেই জ্যোতীরসের পরম প্রেরণা দাও। 'অস্তি', 'ভাতি' এ দুয়েরই 'মুখ ফিরাইয়া' নিখিল ব্যবহারিক প্রেয়ঃ আর শ্রেয়ের মূলে যে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ প্রেষ্ঠাদপি প্রিয়ম্ তাতেই সম্মিলিত কর। সত্যস্বরূপ তুমি, আত্মাতেই কর সত্যের সত্যকার প্রতিষ্ঠা; জ্যোতিঃস্বরূপ তুমি আত্মৈকসংবিত্তিতে, তোমার জ্যোতিঃ নিজেকে রসজ্যোতিঃ রূপে প্রত্যক্ষ করুক। যাহা ছিল বিজ্ঞান মাত্র, সে বিজ্ঞান হোক্ প্রজ্ঞান! অন্তে, সেই প্রজ্ঞান, শূন্যপূর্ণের একত্রাবস্থান যে বিন্দু সেই বিন্দু দ্বারা হোক্ পরম চেতনা! গায়ত্রী মন্ত্রে এই একান্ত অসন্দিগ্ধ, নির্বিতর্ক যে ভানচৈতন্য 'বিজয়' সেটি দেখান হইয়াছে। সমস্ত কিছুতে সংশয় করিতে পার, বিতর্ক তুলিতে পার, কিন্তু ভানে সেটি হয় না। এই ভানকে তার পরম উন্মেষ এবং পরম সমাপনে লইয়া যাও।

পরিপূর্ণালোচন কিরূপে সাধিবে?

মনে রাখ যে, এই ভান বিজয়ই পরম বিজয়। আকাশ আপঃ ইত্যাদি যে যে আকারে সেই সমগ্র, অখণ্ড, নির্ব্যূঢ় সামগ্রীকে (তত্ত্বকে) পাইতে চাই না কেন, একমাত্র ভানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সেটি সম্ভাবিত হয় না। ততক্ষণ 'তটস্থ' হইয়াই রহিতে হয়। মর্শপঞ্চক ততক্ষণ হানোপাদানরহিত তত্ত্বকে ভাসপঞ্চক আকারেই মিলাইয়া থাকে। এই অধিভূতাদি সকল আলোচনকে এই নির্ব্যূঢ় পরম ভানচেতনায় সমাপন করিয়া তবে পরিপূর্ণালোচনটি সাধিতে হইবে। এই পরিপূর্ণালোচনের পঞ্চধা আলোচন হয় অধিভূতাদি পঞ্চধা খ্যাতিখ্যাপনে (appreciation of what is presented)।

বিশ্বাঙ্কন ও বিশ্ব-নিরঞ্জন

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামুদয়বিলয়ৌ ক্রমাৎ।
ভানে বিশ্বাঞ্জনং কুর্য্যাদ্ ভানে বিশ্বনিরঞ্জনম্॥ ৪২

উদয়ে অন্বয়, বিলয়ে ব্যতিরেক—এই ক্রমে ভানচৈতন্যের যে অখণ্ড সমগ্র ‘আধার পট’, তাতেই বিশ্বের ‘অঞ্জন’ (রূপবর্ণাদিতে অঙ্কন) করিয়া, আবার সেই ভানেই বিশ্বনিরঞ্জন সমাপন করিবে। প্রণব, গায়ত্রী, বীজ নামাদি জপে ভান চেতনায় প্রথমে সকলাঞ্জনটি সাধিয়া অন্তে নিরঞ্জনী সমাধায় উপনীত হইতে হয়। বিশেষভাবে, গায়ত্রীলেখ আর শক্তিলেখ (‘হসৌং হংসঃ’ ইত্যাদি) লইয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। অধিভূতাদি দৃষ্টিপঞ্চক (fivefold viewpoint) নির্ব্যূঢ় ভানদৃষ্টিতে সম্যক্ গৃহীত না হইলে প্রপঞ্চ আর প্রাপঞ্চিকের ‘মর্শজাল’ থেকে রেহাই মিলে না।

তিনটি ভূমিতে নিরঞ্জন সমাপন

ন ধ্যেয়ং ন চ স ধ্যাতা পূর্ণৌ দ্বাবিতি ধীমহি।
বিজানীতে প্রজানীতে ন জানীতে স চান্তিমে॥ ৪৩

পুনশ্চ, গায়ত্রী অথবা ঐ ‘হৌংসঃ’ লেখ অবলম্বনে এই ‘নিরঞ্জন’ বুঝিতে যত্ন কর। উদয় থেকে ‘বরেণ্যম্’ অবধি ভান চেতনায় ধ্যেয় এবং ধ্যাতা এ দুয়ের কোনটিই ব্যক্ত নয়। ইহা ‘উদাসীন’ অখণ্ড বিপুল ভান মাত্র। সে ভান ‘ধীমহি’ পাদে আসিয়া পূর্ণ ‘ধ্যেয়’ (‘বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য’) এবং সেই পূর্ণ ধ্যেয় বস্তুর সম্পর্কে ধ্যাতা হইল। এ ভূমিঅন্বয়ের পূর্ণতার ভূমি (মহাসমন্বয়)। তারপর ব্যতিরেক। অপূর্ণের কলার, অংশের, পরিচ্ছেদের এক একটি ‘ঊর্ম্মি’কে ডাকিয়া বলা—উদয় তোমার কোথায়, স্থিতিই বা তোমার কোথায়, গতিই বা কোথায়—তা কি তুমি জানিবে না? তা যে জানিতেই হবে—জান, বিজানীত। অশেষ বিশেষের মাঝে, অজানা, অবোঝার মহাকুহেলিকার মাঝেই জান, বোঝ। বাহিরের সকল বিভ্রমকে চেতনার ‘সম্ভ্রমে’ (appreciation এ) আনিয়া, জান বোঝ। সকল বহির্বিভ্রমকে অন্তঃসম্ভ্রমে (যেটি apparent objective মাত্র তাকে positive experience এর

মর্যাদায় আনাতে)—বিজানীত—বিজ্ঞান। এ কর্মে ধীমহির যে ধী, তাকে হইতে হয় 'ধিয়ঃ'। যাহা স্বভাবে ছিল Intuition, তাহা হইল Intellect. কিন্তু বাহ্য বিভ্রমকে আন্তর সম্ভ্রমে আনিতে যাইলেই সে তো সঙ্গে সঙ্গেই 'সংভ্রান্ত' হয় না। ঊর্মি দোসর পাইলে তার সাথে 'জটলা' করিতেও যে ব্যস্ত। এই নিমিত্ত 'বিজানীত' এর পর 'প্রজানীত' প্রজ্ঞান। আর, অন্তিমে? যে পরম চেতনা, সেখানে, 'এই তো এটা জানিতেছি,' এ জানা তো আর থাকে না; তাই 'ন জানীতে'।

এখন, 'ধ্যেয়ও নই, ধ্যাতাও নই' এই নির্দ্বন্দ্বস্থ বিপুল ভানকে যদি বল 'বরুণ', আর প্রজ্ঞান থেকে পরম জ্ঞানে লইয়া যায় যেটি, তাকে যদি বল 'সোম', তবে, লক্ষ্য কর যে এতদুভয়ের সঙ্ঘাত আদি, মধ্য, অন্তিম বা উত্তর—এইভাবে ত্রিধা। আদি, ধীমহি; মধ্য, ধিয়ঃ; উত্তর, 'স ওম্'। এই তিন সঙ্ঘাত বা সংহতিরূপকে যথাক্রমে 'চন্দ্রমস্' 'চন্দ্র' এবং 'চন্দ্রমা' বল। 'বরেণ্যং ভর্গস্' যে 'ধীমহি'তে প্রতিভাত হয়, সেটি 'চন্দ্রমস্'। সোম খ্যাপন করেন চন্দ্রমা (অন্ ভাগান্ত করিয়া লও)। আর চন্দ্র? সেই ঊর্মির উপমায় এটি বুঝিয়া লও—

ঊর্ম্ময়ো যাশ্চ সংচ্ছিন্নাঃ সংকীর্ণাশ্চ পরস্পরম্।
ইন্দূচ্ছ্বাসেন তা যান্তি কামকলাক্রমান্বয়ম্॥
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
মনঃ স্পর্শাংশ্চ মাত্রাণাং ভুঙ্ক্তে কামকলাক্রমৈঃ॥
প্রাণবাচৌ মনোমাত্রে শক্তিস্পর্শৌ কলাক্রমৌ।
সোমবরুণসঙ্ঘাতাদণূন্যপি মহান্তি চ॥ ৪৪-৪৬

চন্দ্র সর্বজাগতিক তত্ত্ব

সমুদ্রবক্ষে যে ঊর্মিভঙ্গসমূহ, তারা বাতাম্বুবেগাদিবশতঃ পরস্পর সংচ্ছিন্ন এবং সংকীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইন্দুর আকর্ষণ জন্য সাগরের যে সমুচ্ছ্বাস তাহা ঐ বিক্ষুব্ধ-বিষমা ঊর্মিমালাকে তাদের স্বচ্ছন্দ (কাম) যে কলা (aspect), তাদের সুষম যে ক্রম (wave-length ইত্যাদি) তাতে তা'দিগকে স্থাপিত করে। ধরিত্রীর সত্তায় এবং সংস্থায় যে স্বচ্ছন্দ কলাক্রম, সেটি ঐ চন্দ্রমণ্ডল স্থাপিত রাখিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল

ঠিক স্বাধিকারে না রহিলে পৃথিবীর সত্তা-শক্তি-ছন্দঃ-আকৃতি—এ সবেরি ব্যতিক্রম ঘটিত। সাগরের উচ্ছ্বাস তার বলবৎ প্রমাণ; কিন্তু পৃথিবীর জড়ীয়, 'প্রাণিক' এবং আধ্যাত্মিক সমগ্র সত্তা এবং সংস্থার উপরই এই চন্দ্রমণ্ডল মহিমা ভাবিয়া দেখিও। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান—উভয় দৃষ্টিতেই। জপাদিতে তিথি তত্ত্বাদির একান্ত প্রসজ্যমানতা প্রণিধান করিও। কারিকায়—'কামকলাক্রমান্বয়ং'—ভাঙ্গিয়া তলাইয়া বুঝিবে। 'ঐ' চন্দ্রমণ্ডলের দৃষ্টান্ত লইলাম; কিন্তু 'চন্দ্র'=ঐ চন্দ্রমণ্ডলমাত্র নয়। ইহা সর্বজাগতিক তত্ত্ব।

মনঃ এবং চন্দ্রতত্ত্বের সাদৃশ্য

তাই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলা হইতেছে—'এতস্মাজ্জায়তে' ইত্যাদি। সেই মূলবস্তু প্রথমতঃ প্রাণরূপে যেন 'জাত' হইলেন। এ প্রাণ যে বায়োলজির প্রাণই নয়, তা তো বারবার বলা হইয়াছে। সেই প্রাণব্রহ্ম একদিকে মনঃ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ; অন্যদিকে, ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ হইলেন। ইন্দ্রিয়=মাত্রা যদি মনে কর, তা হইলে মাত্রাকে 'স্পর্শ' (excite) করিতেছে ঐ ভূত ভৌতিক। অতএব, হইতেছে 'মাত্রাস্পর্শ'। এ সকল, পূর্বোক্ত ঊর্মিদৃষ্টান্তে, পরস্পরকে সংচ্ছিন্ন করিতেছে, 'জটলা' পাকাইতেছে। তবু মাত্রাস্পর্শের দেশে সদাই সংঘর্ষ আর দ্বন্দ্ব কোলাহল। স্পর্শ মূলতঃ ঊর্মি অথবা স্পন্দরূপ। কিন্তু কে তাদের স্বাভীষ্ট কলায়, স্বচ্ছন্দক্রমে বাছিয়া, গোছাইয়া, সাজাইয়া লইবে? বাহিরে (objectively) যাহা স্পন্দ, মাত্রা (ইন্দ্রিয়) সম্পর্কে আসিয়া তা হইল 'স্পর্শ' (sense impact)। স্পর্শ জটলার মাঝ থেকে কাম—কলা—ক্রম—এ তিনের দ্বারা কেবল 'বাছাই-গোছাই' কর্মটি করিলেই তো হয় না। স্পর্শকে নূতন কোন অধ্যাত্মস্পর্শ দিয়া 'মর্শ' করিয়াও লইতে হয়। Sense impact রূপে যেটি objective, তাকে sensation বা feeling রূপে subjective করিয়া লইতে হয়। এ দুই কর্মই করে মনঃ। সুতরাং, মনস্তত্ত্বের আর চন্দ্রতত্ত্বের সাদৃশ্যটা প্রণিধানযোগ্য।

চন্দ্রাদি তত্ত্বকে দেখিবার অধিভূতাদি দৃষ্টিক্রম

যদি বল—মন তো আন্তর পদার্থ এবং ব্যষ্টি পদার্থ (inner and individual), আর চন্দ্র বাহ্য পদার্থ এবং ব্যষ্টি। এ কথা ঠিক নয়। প্রাণের মত মনও কেবল

'আন্তর', কেবল 'ব্যষ্টি' নয়। আন্তর আর ব্যষ্টিরূপ বিরাট্-সমষ্টি মনের এক বিশিষ্ট 'উদ্ভূত' রূপ। আর, চন্দ্র তত্ত্ব হিসাবে= 'ঐ' চন্দ্রমণ্ডল মাত্র নিশ্চয়ই নয়। যেমন, সূর্যতত্ত্ব= 'ঐ' সূর্যমাত্র নয়। আবার সেই অধিভূতাদি দৃষ্টি এবং উপসংহারে, নির্ব্যূঢ় ভানদৃষ্টির কথা ভাবিয়া লও। অধিভূতেও চন্দ্র =the Moon নয়, ইহা স্মরণ রাখিবে। সেখানে, চন্দ্র=বিশ্বোর্মি সমূহকে কামকলাক্রমী করার তত্ত্ব। 'এই' পৃথিবী সম্পর্কে উপকুর্বাণ 'ঐ' উপগ্রহ চন্দ্রটি যেমন। It is only a case in apposition. অধিভূতে আসিয়া সব কিছুই 'জমাট' জড়ীয় আকারে নিজেদিগকে দেখাবার 'বাতিক' যেন পায়। যেমন 'ঐ' চন্দ্র। অধিদেবে সে হয় দ্যোতন-দেবন রূপ। আদিদেব বরুণ আবীরূপে তাকে করুন্ পাশমুক্ত। তারপর, অধ্যাত্ম। ঐ বিপুলবিতান—যাতে কত না মহীয়সী দ্যোতনা দেবনা, তাকে কর আত্মনীন। 'এই তো ভিতরে, অন্তরে, আমারও যে সে'। এখানে বরুণ সোমে মিলিত হইলেন। এর পর্যবসান— 'আত্মাই সব'—এই পরম চেতনায়। কাজেই অধিভূত আর অধ্যাত্ম, এ দুয়ের মাঝে সন্ধিসেতু অধিদেব।

একই তত্ত্ব (Basic Principle) অধিভূতে বেবিষাণ রহিয়াও নিজেকে এক বিশিষ্ট মূর্ত পরিচ্ছেদে যখন দেখাইল, তখন তাকে দেখিলাম 'ঐ চন্দ্র'— the Moon. সত্তাদি চতুষ্টয়ের সঙ্কোচরূপ এটি। এটি দেখিয়া পশ্চাৎ 'অরুন্ধতী' দর্শন কর। অধিদেবে এটি কাম-কলা-ক্রম—এই ত্রিতয়ের বিশ্বতঃ দ্যোতনকরী দেবনীশক্তি (দেবতা) হইল। তখন, প্রশ্ন কে যেন করিল—বিশ্বে নিখিল প্রবৃত্তির মূলে (জড়াণুরও) যে কাম, সকল পরিণতির সঙ্গে জড়িত যে কলা ও ক্রম, তাদের দ্যোতনার এবং দেবনার (manifestation in measures) আধারটি কি বা কে? তাও 'চন্দ্র'। এ চন্দ্রকে 'ঐ' বলিয়া আর এক স্থলে দেখাইয়া চুপ করিও না। অধিভূতেও সেরূপ দেখা সংকীর্ণ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি।

বিশেষতঃ অধ্যাত্মভূমিগুলির উন্মেষ ও বিশ্লেষণ

অধিদেবে 'ইন্দ্রিয়াণি' (=মাত্রা), তাদের মূলাপ্রবৃত্তি (কাম), এবং তাদের অধিকারক্রম, ক্রিয়াক্রম এবং শক্তিক্রম দ্যোতনায় আসিয়াছে। ইন্দ্রিয়=দেবতা হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মে?

আত্মনীনঃ স আত্মন্বী চাত্মারামঃ স আত্মরাট্।
আত্মস্বরূপ ইত্যেবমধ্যাত্মমধিকুর্ব্বতে॥ ৪৭

'অধ্যাত্মং' আত্মাকে অধিকার করে এই কয়ভাবে এবং পাদে—প্রথমে, 'আত্মনীন'। এটি সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই (জড়াণুতেও) 'কাম' (as Basic Urge, Elan Vital) আকৃতিতে বৃত্তিমান্ আছেই। অগ্নীষোমীয় নিখিলের এটি মূল 'সোমমাত্রা'। এটি যখন 'আপনার পানে' ফিরিয়া আপনাকে পায়, তখন সে হয় 'আত্মন্বী' বা আত্মবান্। কাম নিজেকে জানিল কামরূপে। কামরূপে কামের (ক্লীঁ বীজের) স্বরূপ সংবিত্তি হয়। ইনি হন তখন 'কামাখ্যা'। কামব্রহ্মরূপে যাঁর শক্তিখ্যাতি। যাহা ছিল Impulse, তাহা হইল—Desire, Aspiration, Yearning. এইবার, মনঃ বা 'মানস' তত্ত্বকে আবীরূপে দেখিলাম। এই 'মানস' আবার নিজেকে অবমানস, মানস, মহামানস এবং অতিমানস—এই চতুষ্পাদে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। সেরূপ অভিব্যক্তিতে আত্মরাট্, আত্মারাম এবং আত্মস্বরূপ ভাবগুলি অধিকৃত হয়। অধিভূতে যাহা ছিল Inherent Activity or 'Mass Action', সেটি অধিদেবের মাধ্যমে অধ্যাত্মে আসিয়া হইল—Instinct, Intelligence, Intellect, Intuition, Vision. 'ধী' এর 'অতিমানস' রূপকে যদি বল গায়ত্রীর ঐ 'ধীমহি', তবে সে অতিমানসকে অন্বয়ব্যতিরেকে সাধনে মিলাইবার জন্য, ধীকে হইতে হয় 'ধিয়ঃ'। অতিমানসের দেবতা যদি হন সেই সবিতাদেব এবং তাঁর বরণীয় ভর্গঃ, তা হইলে পূর্বোক্ত চন্দ্রমস্, চন্দ্র এবং চন্দ্রমা এ তিনের দৈবতরূপ, মানসের কোন্ কোন্ ভূমিতে, তা চিন্তা করিও। অবমানস (Subconscious Mind) কে অধিকৃত করে যাহা, তাহা চন্দ্রমা, এই সমীকরণটি বিশেষতঃ ভাবিয়া দেখ।

বলাবাহুল্য, মানসাদি কোন পাদকেই কেবল ব্যষ্টিপরিচ্ছেদে (in individual cross-section) লইবে না। প্রতিটিকে সোম যেমনধারা ঐ আত্মনীনাদিভাব (Introspective Attitude etc.) দিয়াছেন, তেমনি আবার প্রতিটিকে- ('Normal Mind' কেও) বরুণ দিয়াছেন—বেবিষাণ, অধ্বনীন রূপ। প্রতিটিই ব্যাপক এবং ব্যাপনধর্মী। বিশেষ বিশেষ ভাব 'কেন্দ্রীণ' হইয়াও তারা এক অখণ্ড বরুণ-মানসে (Mind Plenum or Continuum এ) শক্তি ও ব্যাপারের 'লেন-দেন' করিতেছে।

তাই না— 'প্রচোদয়াৎ'! অতিমানসকে চন্দ্রদৈবতভাব থেকে উর্দ্ধে রাখিলেই ঠিক হয়। কেন না, এই ভূমিতে কামতঃ, কিনা, সঙ্কল্পপূর্বক কলা-ক্রমান্বয়ের অপেক্ষা চরিতার্থতায় আসিয়াছে; আপূর্যমাণতা হইয়াছে পরিপূর্ণতা। মহামানসভূমিরই এই পূর্ণতা। মহানেও কলাক্রমের উদ্দেশ থাকে। মহামানসকে 'অতিক্রম' করিয়া (টপ্‌কাইয়া) অতিমানস হয় না। সুতরাং 'চন্দ্রমস্' হইলেন মহামানস এবং অতিমানসের 'সন্ধি' দেবতা। 'ভর্গস্' থেকে 'চন্দ্রমস্' যেন নিঃসৃত হইতেছেন—দৈবতরূপে মানসের আর তিনটি পাদ বিন্যাস করার নিমিত্ত। অন্তে বিন্দুলীনতায় যে পরমচেতনা, তাকে পরিসীমায় অতিমানসও না বলিয়া 'উন্মনী' বল। 'ধীমহি'তে বরেণ্যং ভর্গঃ পাইলাম। প্রচোদিত 'ধিয়ঃ' দ্বারা সাধিয়া সেই ভর্গঃ-কে অতিমানসে পর্যন্ত অন্বয়ে মিলাইয়া, অন্তিমে ব্যতিরেক বা 'নিরঞ্জনে' তাকে উন্মনীতে পরম-উপরমটি পাইতে দিতে হয়।

তামসং রাজসং বীজে ভূজ্যেতে ভর্গসা যদি।
সগুণং সাত্ত্বিকঞ্চাপি নিস্ত্রৈগুণ্যং নিরঞ্জনে॥ ৪৮

ভর্গঃ যদি তামস সংস্কার বীজ, রাজস সংস্কার বীজ, এবং ত্রিগুণের একগুণ যে সত্ত্ব, তারও বীজকে 'ভাজিয়া' ফেলে, তবে জানিও যে, পরম নিরঞ্জনে ত্রৈগুণ্যের অধিকারে যে গুণত্রয়, তাদের নিরঞ্জন করিয়া তবে তত্ত্বতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে হইবে।

বরুণ সোমের সঙ্গো মিলিতে যাইয়া তিনটি 'চন্দ্রমা' এবং সন্ধিকে ধরিয়া চারি 'মানস' হইলেন। কিন্তু পরম নিরঞ্জনে আসিয়া কি হইল? বরুণ সোম (বিবুধ) একান্ত অভেদ-সমন্বয়ে আসিলেন; আর সঙ্গো সঙ্গো ঐ চন্দ্রমাত্রিতয়ও (অধিভূতাদি সকল গ্রামেই) সূর্যাগ্নির সঙ্গো অভিন্ন জ্যোতীরসে অভিনিষ্পন্ন হইলেন।

ইহাও অনুধাবন কর যে—

অণুক্রমেণ সোমত্বং বরুণত্বমুরুক্রমাৎ।
তনুক্রমেণ চন্দ্রত্বং নাদবিন্দূ তনোতি তৎ॥ ৪৯

সোম অণুক্রমে (সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর, এইভাবে) বিন্দুকেই চাহিতেছেন। বরুণ উরুক্রম (বেবিষাণ, বিষ্ণু) হইয়া চাহিতেছেন কি?—নাদ। আর, চন্দ্র তনুক্রমে (তন্, বিস্তারে) নাদবিন্দু উভয়কেই। সুতরাং হ্রীঁ আদি কোন বীজমন্ত্রের শীর্ষে যে 'চন্দ্র', সেটি বিন্দুধারণ করতঃ বীজশক্তিকে সাক্ষাৎ বিন্দু অবধি বিতান করিবেন—ইহার আশ্বাস দিতেছেন। আর, 'ঈকারাদি' যে স্বর সে চন্দ্রবিন্দুকে মূর্দ্ধায় লইয়াছে, তাকেও নাদের উরুক্রমে সম্বর্দ্ধিত করিয়াও লইতেছেন। প্রণবাদি ব্যাহরণ করতঃ চন্দ্রের 'তনু' বা তনোতি ক্রমটি বুঝিয়া লও। বীজে চন্দ্র সেই অর্দ্ধমাত্রার 'তনু'।

তনু শব্দের ব্যঞ্জনা—'চন্দ্র'শব্দের বিশ্লেষণ

বলা বাহুল্য 'তনু' বলিতে হ্রস্ব, ক্ষুদ্র এসব ভাবিও না। তনু=সূক্ষ্ম তনোতি রূপ। চন্দ্র=মনঃকে এই তনুরূপেই দেখিবে। তনু শব্দে সূক্ষ্ম ধরিলাম বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঐ 'তন্' কর্মটি সূক্ষ্ম হইয়াও দুইমুখে দুই প্রকারের—অণুতনুতে আর উরুতনোতি। 'পরস্মৈ' এবং 'আত্মনে' পদ দুটিতে ভাবনা দিও। বীজের দৃষ্টান্ত, কিন্ত মনন মাত্রেই এইভাবে দ্বিমুখে 'তনুতে' এবং 'তনোতি' আকারদ্বয় প্রাপ্ত হয়। একটা সমস্ত কিছুতে 'অণু'কে (last limit or term) অন্বেষণ করে; অপর, 'বিভু'কে (final summing up)। 'চন্দ্র' শব্দের আকৃতিতেও সেই কথা। 'চং' (চঞ্চল্যতে—যেটি চলিতেছে—as event) তাকে একবার 'দ' রূপে কোনও দেশকালাদি সংস্থা বিন্দুতে 'দাঁড়' করাইয়া দেখা হইল; আবার, তাকে 'র', কিন্তু চলিষ্ণু, বেবিষাণ রূপেও দেখা হইল। As a point or centre of 'rest' energy—intensification; and, as a field or frame of expansive movement. এ দুয়ের কোনটিকে মনন পরিহার করিতে পারে না, চায়ও না। সাগরের সাধ—আমি ঝরী হব; ঝরীর সাধ আমি সাগর হব। ব্রহ্মেই এই নাদবিন্দু মিথুনটি আছে, তাই।

অন্ন, মনঃ এবং চন্দ্রমা

আর তনু=কায় যদি বল, তা হইলে দেখ যে, বরুণ এবং সোম দুয়েই স্বয়ং কায়পরিগ্রহে যেন 'কুণ্ঠিত'। তাঁদের সঙ্ঘাতে যে চন্দ্রমা, তাতে 'কায়' বিশিষ্ট হইতেছেন। চন্দ্রমা থেকেই নিখিল কায়কান্তি। চন্দ্রমায় 'কামকলা', তাই কান্তি। ভানু

সব কিছুতে দেন ভাতি, ছটা, দীপ্তি। মনঃ চন্দ্র; কাজেই, মনঃ সূক্ষ্ম কায়বিশিষ্ট।। তনুতে আর তনোতি দুই রূপেই। মনঃকায় পৃথুতায় আসিলে চাক্ষুষও হইতে পারে। অন্নের অণিষ্ঠ অংশে মনঃকায়ের পোষণও হয়। কাজেই সত্তা-শক্তি-ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ চারিটি সম্বন্ধে অন্ন আর মনের মধ্যে কোন একান্ত বৈজাত্য-পরিচ্ছেদ (যেমন, ওদেশে Cartesian Philosophy করিত) টানিলে চলিবে না। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। অন্ন-মনঃ ইত্যাদি সম্পর্ক আবার পরে বিবেচিত হইবে।

কামকলা অনুক্রমে ও ব্যতিক্রমে কিরূপ? ব্যতিক্রম-স্থলে কি করিতে হইবে? সর্ববিধ কায়ের (মনঃ কায়েরও) রূপ এবং আকার দেন অগ্নিতত্ত্ব; তেজঃ, ওজঃ, দীপ্তি—এ সব দেন সূর্যতত্ত্ব; আর কাম, কান্তি, ভাব, রস—এ সব দেন সোমতত্ত্ব (চন্দ্র, চন্দ্রমা, ইত্যাদি রূপে)। সোম আর সৌম্য। মনঃ কায়েরও ঐ ত্রিতত্ত্ব দ্বারা ত্রিধা সংগঠন এবং ভরণ অবশ্যই আছে। ব্যষ্টি মনঃকায় (individual 'mind body') তার প্রারব্ধবাসনা এবং জাতিকাম (basic desire to be incarnated into a particular type 'or kind of being') দ্বারা 'নির্ম্মিত' হয় বটে, কিন্তু সমষ্টিমনঃ (হিরণ্যগর্ভ) আধার বিভর্ত্তা এবং নিয়ন্তা থাকেনই। সুতরাং, মনঃকায় পুরুরূপ এবং বহুশীলবৃত্ত হইলেও, ঐ আধার বিভর্ত্তা এবং নিয়ন্তা হিরণ্যপ্রপন্ন হইয়া নিজেকে দিব্য হিরণ্যকলায় ফুটাইয়া তুলিতে পারে। অন্নকাম, ভোগলোলুপ যেন মনঃ, সে হোক্ হিরণ্য বা ওজঃকাম, এবং পরিণামে বরেণ্য-বিবরিষু জ্যোতীরসকাম। মনঃ এবং চন্দ্রমা যে 'কামকলা' তাদের মূল উৎস এবং 'প্রবৃত্তিঃ পুরাণী' রূপে পাইয়াছে, সাধারণ জাতিকাম অন্নকাম যে মনঃ, সে ঐ কামকলাকে পায় কি ভাবে? মনোজ, মনসিজ কামরূপে। চন্দ্রমাও এই মনসিজের তরে কন্দর্পধনুঃ আর পঞ্চশর যোগাইয়া দেন। তাই না 'পিয়ামুখ চন্দা' তাই 'কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী হীন হিমধামা'। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'—এতেই জগৎপ্রবৃত্তি। সনৎকুমারাদি এ জগৎপ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। হিরণ্য-বরেণ্যকেই বরণ করিলেন। কিন্তু এই কামকামী মনঃ? কামকলা প্রসক্ত যে মনঃ, তাকে সাধাও—কামকলাক্রমান্বয়ম্। সৃষ্টিস্থিতির আদিম শক্তিকলাই কামকলা। ইনি কামাখ্যা। এঁকে নস্যাৎ করিবে কে? সিসৃক্ষা-রিরংসাদিরূপে ইনি স্বয়ং ব্রহ্মময়ী। তবে, এ কামকলা যদি বিশ্বের এবং তোমার বাসনায় আর এষণায়

হইয়া থাকে ‘কামকেলি’, তবে ক্লীঁ বীজের যথার্থ সমাশ্রয়ে ‘কেলি’ হৌক্ ‘কালা’ (কৃষ্ণ) বা ‘কালী’। তোমার কামকলাকে বরেণ্য-ব্যতিক্রমে ফুটিতে দিও না; সেই হিরণ্য-বরেণ্য-অনুক্রমে ফুটিতে দাও। রিরংসালোলুপকে কর রাস-রস-লোল। লোলুপতাকে কর ‘লৌল্য’ (রসিক ভাগবতে যেটি সহজধর্ম)। মনের এখন যে তনুক্রম, তাকে অণুক্রম এবং উরুক্রমে (রস ও রাসে) লইয়া চল। রস অণু? রসকে ‘ভূমা’, সিন্ধু-সায়র এ সব বলিবে বল, কিন্তু বিন্দুবিধুরা সিন্ধুপরাণীও যে ‘তাতলসৈকত’! জ্ঞানী, যোগী এঁরাও আপন আপন ভাবে কামকলাক্রমটি বুঝিয়া এবং সাধিয়া লইবেন। যথা— ‘তৎ’ পদার্থ আপ্তকাম, পূর্ণকাম; ‘ত্বং’ পদার্থ কলাকাম। ‘অসি’ পদের দ্বারা (শোধনক্রম দ্বারা) এদের অভেদ সমীকরণ কর। যোগে, ‘যুযুক্ষু’ কলা তুমি (মনঃ); যুক্ততম কলা ‘সেই’। তুমি ‘যুঞ্জান’ হও। এই ক্রমবিক্রমই জপাদি সকল সাধনা। জপে এই বিক্রম ‘অভ্যারোহ’। বিজ্ঞানেও তাই। যে কোন ঊর্মি বা ঊর্মিশ্রেণীকে কোন অভীষ্ট (কাম) wavelength, frequency তে ঠিক্-ঠিক্ মেলান যায় কি করিয়া? —এই তো মূল সমস্যা। মনোদৈবত চন্দ্রমাকে কর গুরু। কাম-কলা-ক্রমের সৌম্যকান্তি ফুটাইতে চন্দ্রমার ‘জুড়ি’ আর কে আছে? তাই ‘একে চন্দ্র’। বারবার বলা হইতেছে যে চন্দ্রমাকে— ‘ঐ চাঁদ’—মনে করিয়া বিমনাঃ হইও না। চন্দ্রমাকে তার আপন মানে=মর্যাদায় না লইলে, মনঃ তার সহজ কামকলাক্রম থেকে বিচ্যুত হইয়া যায়। বৈমনস্য—পাগল হওয়া dementia ইত্যাদি। মনের সাক্ষাৎ করণ স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চন্দ্রমার বিশেষ আধিপত্য (‘lunar influence’)। চন্দ্রকে চন্দ্রমায় লইয়া বৈমনস্য কাটাও, ‘সুমনাঃ’=সৌম্যমনাঃ হও।

প্রাকৃতকামের উদ্‌বর্তনে (Sublimation) জপশক্তির প্রভাব। জপের দৃষ্টান্ত ক্লীঁ, ক্রী এই দুটি বীজে বিশেষ করিয়া কামকলা আপনাকে ক্রমপরিণয়ী সীমায় লইয়াছেন। ওজঃ প্রভৃতি দিব্যশক্তির মহা সঞ্চয়ের যে ভাণ্ডার, তার অপাবরণ (direct availability) -কে যদি বল ‘হিরণ্য’ (এর পূর্ব পরিচয় স্মরণ কর), তবে হিরণ্যবীজকে হ্রীঁ ভাবনা কর। এই বীজকে আধার করিয়া, উক্ত পরিসীমাটি পাইতে, অনুবন্ধানুরোধে, অপর তিনটি বীজকে সাধিয়া লইতেও হয়—ঐঁ (অধ্বন্য), শ্রীঁ (শর্ম্মণ্য), ক্লীঁ (ধামন্য বা আত্মন্য)। এ হিরণ্যাদি চতুষ্টয় যেটি ‘বরেণ্যম্’,

তাহারই পাদ চতুষ্টয়। ওঙ্কার স্বয়ং এই বরেণ্যম্‌কে বরণ করেন। প্রতিটিতেই চন্দ্রমা একদিকে (উদয়ে) নাদকে উরুক্রমে, অন্যদিকে বিন্দুকে অণুক্রমে (বিলয়ে) সৌম্যমানে রাখিতেছেন। কাম যদি সৌম্যমানে না রহিয়া যৌনরিরংসাদি মানে যাইতে চায়, তবে শশিশেখর শিবকে কৃশানুকপাল রুদ্ররূপেও পাইতে হইবে। তাই এই কথা কয়টি—

হিরণ্যং গর্ভিতং হ্রীঁ বৈ তালব্যাধ্বন্যমৈমিতি।
শ্রীঁ শর্ম্মণ্যং বরেণ্যণ্টৌ ক্রমেত সোমশেখরঃ॥
অসৌম্যং মা ক্রমীরধ্ব ততঃ সোমঃ কৃশানুদৃক্।
(সোমঃ কালাগ্নি দৃক্ ততঃ)
মা দহীন্মাঽপি কামাগ্নিঃ সোমাগ্নির্মাঽপি মা মুচৎ॥ ৫০-৫১

গর্ভিত যে হিরণ্য, সে হিরণ্যকে হিরণ্যরেতস্ করিয়া, অধোঽধ্বগ যে প্রাণন, তাকে ঊর্দ্ধাধ্বগ (অধ্বন্য) করিয়া, ছন্দঃ শ্রীহীন যে বৃত্তি, তাকে শর্ম্মণ্য করিয়া, এবং প্রাণের নিখিল প্রবৃত্তি বরেণ্যবিবরিষু করিয়া, সোমশেখর শঙ্কর হ্রীঁ, ঐঁ, শ্রীঁ, ওঁ—এ বীজ চতুষ্টয়রূপ চতুষ্পাদে 'ক্রমবিক্রম' করিতেছেন। [এখানে ক্লীঁ—এই পঞ্চমপাদটি উহ্য রহিল। সে পাদ পূর্ব পাদচতুষ্টয়ের সমাহার—আত্মন্য, ধামন্য।] তাঁর তো ক্রমবিক্রম। কিন্তু তোমার? ক্রমাণুক্রম। তোমার ক্রমানুক্রমে অসৌম্যে তোমার ক্রমটি যাতে না হয়, সে নিমিত্ত সোমশেখরের সোম ('স ও ম') কালাগ্নিদৃক্‌ও হন। ওমের অকারে যে অগ্নিমাত্রা তাতে তাঁর 'অভিনিবেশ' হইলেই সোম হন কালাগ্নি। বহ্নিসখ উকার সে কালাগ্নিকে সমন্তাৎ বিচ্ছুরিত করেন। সুতরাং, অসৌম্য পরিস্থিতিতে কি করিবে? তুষাগ্নিকে বজ্রাগ্নি দ্বারা পরিহার কর। কাম বা মদনাগ্নি তোমাকে দহন না করুক, এই নিমিত্ত ঐ সোমশেখরের যে সোমাগ্নি, তাতে প্রপন্ন হইয়া বল—'জাতবেদসে সুনবাব সোমম্'—হে জাতবেদাঃ অগ্নি (বেদসার ওঙ্কার থেকে জাত যে দিব্য অগ্নি), তুমি আমাকেও যেন ত্যাগ করিও না (মাঽপি মা মুচৎ)। কামাগ্নি দহনে যে অগ্নি, সে অগ্নি কৃষ্ণবর্ত্মা, ধূমযানচারী—এই 'চল্‌তি চাক্কী' থেকে সে মুক্তি দেয় না। কিন্তু হে সোমরেতাঃ অগ্নি, তুমি পরমদ্যোতনী যে ইষ্টিযাগ তার 'পুরোহিত',

এবং 'রত্নধাতম'। হিরণ্যাদি 'রত্ন' আধানকারীদের মধ্যে তুমিও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তোমাকেই 'ঈলে' (বরণ করি)।

বলা বাহুল্য, কেবল ভাবানুগা প্রার্থনায় নয়, তোমার প্রণবাদি জপকর্মেও, কোন প্রকার মৃদু, অথচ, ক্রূর বিসর্পী, বিদাহী অগ্নির (যথা, কামের) উপসর্গ বুঝিলে, সোমশায়িত যে দিব্য অগ্নি, সে অগ্নিকে উদ্‌বুদ্ধ-উচ্ছ্বসিত করিবে (যথা, অ উ মাত্রাদ্বয় দ্বারা)। এই সৌম্য অথচ মহোগ্র অগ্নিতে প্রথমতঃ তোমার অসৌম্য মনসিজাগ্নিকে স্বাহায়ন, আবার অন্তে, সেই 'জাতবেদসে' সোম (বিন্দুবিলয়ী নাদকে) সবন করিবে। এটি 'স্বধা ধ্রুবা'তে অয়ন বা গতি। জাতবেদাঃ উক্ত অগ্নি আর কৃষ্ণবর্ত্মা নন, তাঁর গতিও আর ধূমযানে নয়। তিনি হন শুক্লবর্ত্মা, আর ধূমযান হয় অর্চিরাদি মার্গ। তখন আর দেবগণ 'স্বাহা' মুখে 'হব্য', এবং পিতৃগণ 'স্বধা' মুখে 'কব্য' পাইয়াই তৃপ্ত হন না। বিভেদ সমীকরণ হইয়া যায়। তাই—

জপে বেদ বর্ত্মনী দ্বে অহঃ ক্ষপেতি ভাবনে।
একায়নে স্বধাস্বাহা পিতৃদেবৌ সহাশনৌ॥ ৫২

জপেই কৃষ্ণা, এবং শুক্লা গতি এবং বর্ত্মদ্বয় জান। জপেই জান—অহঃ এবং ক্ষপা (রাত্রি), এ দুই 'ভাবন'। জপেই জান যে, স্বাহা এবং স্বধা, এ দুটি 'অয়ন' অন্তে মিলিয়া একই। আর, জপেই জান যে, দেব ও পিতৃগণ পৃথক পৃথক নয়, পরন্তু সহযোগেই তাঁদের 'অশন' (অন্ন) পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হন।

অকারাগ্নির্মকারেণ কৃষ্ণং ধূমায়তে মৃদু।
উর্জ্জিতঃ সন্নু কারেণ স ধূমো হ্যর্চ্চিরায়তে॥ ৫৩

ওম্ (অমের মত) করিয়া জপ করিতেছ। অকারাগ্নি কৃষ্ণবর্ত্মা হইয়া মৃদু ধূমসমাকুল হইতেছে। 'উ'কার এ অগ্নিকে উর্জ্জিত কর; তা হইলে দেখিবে—কৃষ্ণ হবে শুক্ল, আর ধূম হবে অর্চ্চিঃ। 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম'—ব্যাহরণ অনুস্মরণেই কৃষ্ণ-ধূমাদির রূপ-বর্ণ গতিচ্ছন্দঃ আদি সবই বদলাইয়া লও, এবং অন্তে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ কর। এখন থেকে 'বামেন' অনুক্রমী না হইতে পারিলে শেষ নিঃশ্বাসে (উৎক্রমণে)

ব্যতিক্রমকে 'তদ্ধামপরমং' পরিক্রমায় পাইবে কি প্রকারে? তাই—'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, নিষ্ঠা করি ভজ।' নিষ্ঠা বলিতে কতদূর অবধি? ঐ 'কৃষ্ণ' নাম তোমাতে, আর তুমি 'কৃষ্ণ' নামে কবে নিতরাং স্থিত হইবে? 'যিন্‌কা মনমে রাম বসে'—ইত্যাদি ভজনটি ভাবনা করিও।

ওঙ্কারাদি জপে গতি কতদূর অবধি হওয়া উচিত?

ত্রীনগ্নীং ত্র্যক্ষরে বিদ্ধি স্বরে সৌরে চ সোমতঃ।
মেরৌ বিদ্ধি নাচিকেতং যমঃ সংযম্যতে যতঃ॥ ৫৪

তিনটি অগ্নিকে প্রণবাদি বীজের ত্র্যক্ষরে যথাক্রমে স্বরাগ্নি, সৌরাগ্নি এবং সোমাগ্নি রূপে প্রথমতঃ জান। পরে এই অগ্নিত্রয়ে সমাহিত হইয়া মেরুতে অর্থাৎ যেখানে সোমার্দ্ধ—অর্দ্ধমাত্রা নাদবিন্দুকে, এবং পূর্বোক্ত তিন অগ্নিকেই সন্ধি সমন্বয়ে আনিয়াছেন—সেইখানে শ্রুতিবিশ্রুত সেই 'নাচিকেত অগ্নি'ও লাভ কর, যে অগ্নি দ্বারা স্বয়ং যমেরও সংযমন হইয়া থাকে। সুতরাং, ভুবন চক্রের নাভিভেদ হইয়া পরম অনপায় যে পদবী তাতেও পদ্যমানতা সম্ভাবিত হয়। এই পরমে পদ্যমানতা ব্যাহরণ-অনুস্মরণেই সাধিয়া শুক্লা বিরজাঃ যে উৎক্রান্তি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

প্রভবতি ন চেন্নাদঃ পরায় সোমবিন্দবে।
ধূমেন পুনরাবৃত্তির্গত্বা গত্বা স্পৃগন্তিমম্॥ ৫৫

ওঙ্কার তো জপ করিতেছ। স্পৃগন্তিম যে 'ম'কার, তাতে যাইয়া নাদকে যদি সমুদিত না পাও, আর সমুদিত নাদ যদি আবার বরেণ্য (পরায়) যে সোমবিন্দু, তাতে লয়-সম্মিলনে পারগ না হয় (ন চেৎ প্রভবতি), তবে বারংবার 'ম' কারে (রজোস্তমো দ্বারা গ্রস্ত সোমমাত্রায়) যাইয়া শুধুই 'ধূমযানে' পুনরাবৃত্তির চাক্কিতেই ঘুরিতেছ, জানিবে। আর, তাতেই যদি উৎক্রান্তি ঘটে, তবে অপুনর্ভব কোথায়? যদি বল—অপুনর্ভব না হৌক্, ত্বৎপাদাম্ভোজে মতিরতি রহুক— 'মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে'। তাও মিলিবে ঐ পরম বিন্দুবাসিনী মহামায়া যোগমায়ার কৃপাতেই।

স্পৃগন্তিমের স্পর্শপারে যাইতেই হইবে।

স্পৃগন্তিমে জপান্তশ্চেদজপান্তেহন্তকং ব্রজ।
হংসে হৌংস ইতি ধ্মাতে সোমোহন্তকান্তকঃ স্বয়ম্॥৫৬

প্রণবাদি যাহাই ব্যাহরণ অনুস্মরণ করিতেছ তাতে যদি অন্তিম স্পর্শবর্ণে ('ম'তে) তোমার জপান্ত হয়, আর, কেবল মাত্রাস্পর্শাদিতেই তোমার ভাবনান্ত হয়, তা হইলে, যখন তোমার অজপান্ত (অজপাশেষ) হইবে, তখন কোথায় যাইবে? 'অন্তকম্'—যমালয়। তথায় পাপপুণ্য বিচার—ফল, সুখ দুঃখাদি ভোগ। এইরূপ বারংবার। কিন্তু অজপায় যে 'হংসঃ' সেটিকে যদি সমর্থভাবে ও ছন্দে ওঙ্কার গর্ভিত 'হৌংসঃ'—এইভাবে তোমার এই ত্রিপুর শঙ্খটিতে (বাক্-প্রাণ-মনঃ ত্রিপুটীতে) ধ্বনিয়া বাহির করিতে পার তো, সেই 'সোম' (স ওম্) স্বয়ং অন্তকেরও অন্তক হইবেন, জানিও। প্রয়াণকালে বিলম্বিত কৃচ্ছ্রছন্দে যে অজপা (শ্বাস) চলে, 'হ্' এবং 'স্' পরস্পর থেকে যেন বিদায় লয় (এই কায় সম্পর্কে)। 'হ্' তৎকায়বীজ বিন্দু থেকে, 'স' তৎকায়ব্যাপার নাদ (বিসর্গ) থেকে (অর্থাৎ, আপন আপন অনুস্বার-বিসর্গের নিরূপিত তৎ কায়ানুপাত থেকে— from the basic fund and function body-ratio থেকে) চ্যুত হইয়া আসিতে চায়। 'হ্' বিশেষটি যায় সজাতীয় শক্তিসঞ্চয় সামান্যে; 'স'-বিশেষটি সজাতীয় শক্তিসিঞ্চন সামান্যে। বিশ্বে সমস্ত কিছুরই অজপা শেষ হওয়া মানে এই। দৃষ্টান্ত সর্বক্ষেত্রেই। ঐ শিশিরকণা, ঐ পুষ্প কলিকা এদের কথা ভাবিও। উৎক্রান্তি মানে—কোন নিরূপিত কায়সম্বন্ধী ঐ মূল 'হ্সৌ' অনুপাতটির মেরুক্রান্তি—crossing the 'point' of the critical stability or status quo ratio. জল বরফ বা বাষ্প হয় কখন? হংস সূত্রে দেখিয়াছি যে, 'হংসঃ' (অজপা)এক মূল সর্ব-জাগতিক বৃত্তি আকৃতি (Basic Function Pattern) অণু, বিরাট্ কোথাও হংসের ঋচ্ছতির নিষেধ নাই। অনুস্বার বিসর্গের 'ব্যাপারিক' অশেষ অনুপাত বৈচিত্র্য থেকেই সর্বত্র গতি স্থিতি পরিণতি বৈচিত্র্য। অস্মদ্ বাপারে বাক্, প্রাণ, মনঃ—এ তিনই স্বভাব-পরবশভাবে এই 'অজপা' জপিয়া যাইতেছে। অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা যথাক্রমে। বাকের বিশেষতঃ 'হংসঃ' ধ্বন্যাকৃতি; প্রাণের বিশেষ করিয়া প্রাণাপানৌ; আর, মনের যোগাযোগ (যুক্ত-অযুক্ত)। এ তিনটি যুগ্মকের অনুপাত (functional ratio) ধ্রুব নয়, পরিণামী (accelerating, variable); সুতরাং, ব্যাস-সংখ্যানে (Differential Calculus ইত্যাদিতে) আসে। সমাস-সংখ্যানেও বটে। অনুপাতক্রমান্বয়ে (Ratio Series এ), এমন কতকগুলি 'স্থল' আসে, যেগুলিকে 'মেরু' বলা যায়। মেরুতে আসিয়া অনুপাতের যে বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটে, তাকে Mutation, Emergence ইত্যাদি বলা যায়—প্রাণের ক্ষেত্রে।

মেরুবিপ্লব

মেরুবিপ্লব মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র আকারে হইয়া থাকে। কয়লা হীরা হইলে তাকে অধিমাত্র আকারে মনে করা যায়; কিন্তু জল বরফ হওয়া মৃদু বিপ্লব। অধ্যাত্মভূমিতে 'দীক্ষায়' দীক্ষিতের জীবনে ঐ ত্রিবিধ মেরুক্রান্তি নিমিত্ত বিপ্লব দেখা দিতে পারে। সাধারণ জীবনে কৌমার, যৌবন, জরা—এগুলি মৃদু-মধ্য এই দুই রকমের মেরুক্রান্তি। কিন্তু উৎক্রান্তি, —এদের তুলনায় অধিমাত্র। এখন, কৌমারাদি স্থলে 'হ্সৌ'—এই মূল শাক্ত মিথুনটি (the basic vital economy factors) তাদের অনুস্বার-বিসর্গ-অনুপাত (basic functional ratio) এক এক মেরুতে উপনীত দেখে বটে; কিন্তু তার ফলে তাদের তৎকায়াদিসঙ্ঘাত সম্বন্ধের (a given organism relation এর) অপ্রতিযোগিতা বা বিশেষ বিপর্যয় ঘটে না। কিন্তু মৃত্যুতে এই অপ্রতিযোগিতা (তত্তৎসঙ্ঘাতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের), উক্ত সঙ্ঘাতানুক্রমের ব্যতিক্রম, ঘটিয়া থাকে। সঙ্ঘাতের 'স্থূল' ভাগটি ত্যক্তও হয়। এ প্রয়োজনীয় কথাগুলি পরে আবার বিবেচিত হইবে। এখানে প্রশ্ন এই— 'হ্সৌ' যুগল যৎকালে তাদের কোন নির্দিষ্ট সংহতি-সাধক অজপা-অনুপাত (অনুস্বার-বিসর্গ) থেকে চ্যুত হইতেছে, তখন তাদের আবার পরম অভ্যুদয় এবং উপরমের 'বরেণ্যং' যে ছন্দঃ, তাতে গ্রথিত করিয়া লওয়া যায় কি উপায়ে? 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'—সাধিত হয় কিরূপে? উপায় এক—"হ্সৌ" কে ওঙ্কারেই সমুদ্ধৃত ও সমাহৃত করিয়া লও— 'হৌংসঃ'। ক্লীঁ আদি বীজ, কালী, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রাম, এ সবই ঐ 'হ্সৌ'কে 'হৌংসঃ' এর মৃত্যুঞ্জয় সত্য-শিব-সুন্দর-ধামে সমুন্নীত করার জন্য। জীবনে যত কিছু সাধনা, তাতো এই 'হ্সৌ' এর চরম মেরুক্রান্তিকে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি নিমিত্ত করার জন্যই। আগে—গায়ত্রী আদর্শে যে শক্তিলেখ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাতে আমাদের যে সাধারণ

জপবিমুখ অজপা, সেটির মৃত্যুক্রান্তিকুশল উত্তরণের যে 'সৌম্য' ছন্দঃ, সেটি দেখান হইয়াছে। এই ছন্দেই ছন্দোমাতা স্বয়ং স্বধামে অমৃতধারা যেটি, সেটি দোহন করিয়াছিলেন—দেবতাদের জন্য। দেবতারা (যথা, অধ্যাত্মের ধিয়োনঃ) অজপার পূর্বোক্ত অনুপাত-বিপাকে পতিত হইয়া আর মৃত্যুক্রান্তি সম্পর্কে অতিক্রান্তকৃৎ এবং অতিক্রান্তদৃক্ ছিলেন না।

অজপায় মৃত্যুযান ও অমৃতযান—ডমরু, বিষাণ

অজপায়া জীবদ্দুঃখং প্রয়াণে যমযাতনা।
ত্র্যম্বকং পরিণীতা চেন্ মৃতৌ সা ন মুমুর্ষতি॥৫৭

সোমার্দ্ধশেখর ত্র্যম্বক (ত্র্যক্ষর ওঙ্কার) সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ, মৃত্যুঞ্জয়। তাঁকে ভজনা না করিয়া জীবের (এবং সর্বভূতের) যে অজপা, সে জীবদ্দশায় দুঃখ (তাপত্রয়), আর প্রয়াণে (মৃত্যুকালে) যমযাতনাই দিতেছে। কিন্তু এ হেন অজপা যদি ত্র্যম্বকের সাথে পরিণীতা হয়, তবে সে সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া মৃত্যুতেও মরিতে ইচ্ছা করে না। সে তখন আপন অমৃত স্বরূপেই আহুতি দিয়া বলে— 'ওঁ বিশোকো বিমৃত্যুর্ভূয়াসং স্বাহা'।

হমিতি ডমরুঃ পাণৌ স ইতি বিষানকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ং মহাকালং মুমূর্ষুঃ কিং দিদৃক্ষসে॥৫৮

মহাকাল অণুমহান্ বিশ্বভুবনে সর্বত্র নটরাজ নৃত্যপর রহিয়াছেন। এ নটনের বিরাম নাই। তাই সর্বভূতেই অজপায় কালজপ চলিতেছে। Death's eternal ring-dance in all creation. মহানটরাজের দুই করে ডমরু আর বিষাণ, সে দুটি কি জান? বিশ্বভূতে অহরহঃ যে অজপা চলিতেছে, সে অজপার 'হং' = ডমরু, আর, 'সঃ' = বিষাণ। 'সর্ব্বলোকক্ষয়কৃত্ প্রবৃদ্ধ' যে কাল, সে কালের তাল মান নিরন্তর ভরণ এবং প্রপূরণ করিতেছে—ডমরু-বিষাণ। ওগো মরণ মহাগ্রাসপান্থ মুমূর্ষু! তুমি কি ইচ্ছা করিবে না দেখিতে (দিদৃক্ষসে), সেই ডমরু-বিষাণপাণি মহাকাল নটরাজকে

মহামৃত্যুঞ্জয় ত্র্যম্বক (ওঙ্কার) রূপে? তোমার অজপা যে 'হংসঃ' 'হংসঃ', তার মৃত্যুচ্ছন্দকে কি 'হৌংসঃ' এই অমৃতচ্ছন্দে অভ্যারোহণ করাইবে না?

অজপায় 'হংসঃ' এবং 'হৌংসঃ' আকৃতি—অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের উপমা

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
ক্ষুধাতুরা ব্যালভিয়ার্ত্তমানসাঃ।
ভজেম মাতুর্নিজপক্ষধূননৈঃ
পরাং গিরং তাং দিবমারুরুক্ষবঃ॥ ৫৯
ন পেপীয়সে চেন্ মহোৎসবাসবং
মরীমৃজ্যসে নো মলং মদালসম্।
নরীনৃত্যসে নো জয়ে তমোনুদাং
পনীপত্যসে তর্হি ভূবিলুণ্ঠিতঃ॥ ৬০
(পনীপত্যসে মা চ ভূরলুণ্ঠিতঃ॥)

প্রাকৃত অজপায় যে জীবন ধারণ, সে জীবন যে কেমন তা ভাগবতের একটি মরমী উপমা লইয়া বলা হইতেছে (শ্লোকের প্রথম চরণটি ভাগবতের)। অজাতপক্ষ বিহগশাবকের মাকে ডাকে কিসের জন্য? ক্ষুধা এবং ব্যালভয়ে আর্ত হইয়া, তাই নয় কি? ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো মা কুলায়ে রাখিয়াই মিটাইয়া দেন। কিন্তু ব্যালভয়? শাবকের তো এখনও আপন সমর্থ পক্ষোদ্‌ভেদটি হয় নাই। তাই মা তাকে নিজপক্ষধূননেই আকাশে তুলিয়া কোন নিরাপদ অভিনব নীড়ে লইয়া রাখেন। প্রাকৃত অজপায় পাতিত জীবও নিরন্তর ক্ষুধাতুর এবং কালব্যালভয়ে ভীত। অসহায় নিরুপায় সে তো কেবলি চাহিতেছে ঐ ঊর্দ্ধ উদার শঙ্কাহীন অজানা বিপুলের অভিমুখে (দিবমারুরুক্ষবঃ)! ঐ অজানা বিপুলে কি তার নিশ্চিন্ত বিরাম আশ্রয় আর অদীন অকুণ্ঠ অন্নরস মিলিবে? কে জানে? প্রাকৃত অজপার যে পক্ষপুট (হংসঃ), তা তো 'অজাত', অনুদ্‌ভিন্ন। কেননা, সে তো ক্ষুধাতৃষ্ণা-ব্যাল-সমাকুল এই ভঙ্গুর কুলায়টিতেই নিরুপায় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! উপায়? পরাবাক্ যে ওঙ্কার, মহানাম শক্তি, তাঁকেই মাতার মত ভজনা কর। প্রাকৃত অজপাকে কর ওঙ্কার, মহানাম পুটিত। 'হংসঃ' হৌক্

‘হৌংসঃ’। এর মানে এ নয় যে তোমাকে ‘হৌংসঃ’ জপিতেই হইবে। তোমার সাধারণ অজপার যে ‘অজাতপক্ষাকৃতি’, তাকে ‘দিবমারুরুক্ষু’ দ্যুদীপ্তিময়ী ‘হৌংসঃ’ আকৃতিতে তুলিয়া লইতে হইবে। নিষ্ঠাপ্রপন্ন হইয়া যদি সেটি সাধিয়া লও, তা হইলে অজাতপক্ষ বিহগশাবকের মাতার মত, সেই মহানাম শক্তিই তোমাকে ‘তমসঃ পরস্তাৎ’ জ্যোতির্ধামের দীপ্তিতে এবং রোচিষে তোমায় নিশ্চিত অভিসম্পন্ন করিবেন। তোমার অজাতপক্ষপুটের অসহায় আর্ত ব্যর্থপ্রয়াসে কেবল হয়রাণই তো হইতেছ; কিন্তু মাতা (পরাবাক্, মহানাম) প্রপন্না এবং প্রসন্না হইয়া তোমার এই মর্ম্মন্তুদ অন্ধ বিফল প্রয়াসকে ‘নিজপক্ষধূননৈঃ’ পরমরসোজ্জ্বল সফলতায় লইয়া যাইবেন।

তোমার মহাত্রাসরূপ এই যে প্রাকৃত অজপা, তাকে কি মহানামরসনিবিড় মহোৎসবরূপে জীবনে মিলাইবে না? আর সে মহোৎসবে ‘আসব’ পরিবেশন, তাও কি বারংবার পান করিবে না (ন পেপীয়সে চেৎ)? এ আসব কি? নিখিল ‘অসবঃ’, কিনা, প্রাণসাগর মন্থন করতঃ যে সোম, যে সুধাকর-সুধা সমুদিত হন, তাই। ‘হৌং সঃ’ আকৃতিতে এবং ছন্দে জপ কর; এই পরম আসব পুনঃ পুনঃ পান কর। প্রাকৃত আসব পানে মদালস যে মল, সে মল বাড়িতে থাকে। কিন্তু এ আসব পানে প্রাকৃত যে মদ-মোহনিমিত্ত অলসিত মল, তাকে বারংবার ক্ষালন মার্জন করিতে থাক। মলের ক্ষালন হইতে থাকিলে, একদিকে যেমন মদালস মল অপনীত হইতে থাকিবে, এবং জীবনের অলসিতভাব স্থলে উল্লসিতাদি ভাব আসিবে, তেমনি আবার অন্যদিকে জ্যোতির্ধামের অর্গল হইবে অপাবৃত; এবং যাঁরা জ্যোতির্বিশাল তমোপহারী (তমোনুদাং) বৈজয়ন্তীবিজয়ও তাঁদের সমারব্ধ হইবে। তখন তোমার মহোৎসবের আসবটি তোমায় লইয়া চলিল এই অলসিত তমসার পারে ‘আলোক-পুলক-বৈজয়ন্তী উৎসবে।’ সে পরমবিজয় উৎসবে তুমি কি বারংবার রাসভাসানুগ নৃত্যটি করিবে না? (নৃত্যটি কোন্ আসবপায়ীর কোন্ ছন্দে কেমন নৃত্য তা ভাবিয়া দেখিও। রাজযোগী, লয়যোগী প্রভৃতি আপন আপন ভাবে বুঝিয়া লইবে।) কিন্তু তোমার প্রাকৃত অজপামদিরা যদি মহানামাশ্রয়ে ঐ সকল দিব্য ভূমিতে তোমায় না লইয়া যায়, তা হইলে? তা হইলে, প্রাকৃত সুরাপায়ীর মত ভূবিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেই থাক বারংবার (পনীপত্যসে তর্হি)। এই ‘ভূবিলুণ্ঠিত’ কথাটাকেও ভাবিয়া বুঝিও। ‘ভূ’ রজাত বিসর্গযুক্ত হইলে আদিম ব্যাহৃতি। কিন্তু বিসর্গবিহীন হইলে শুধু ‘হওয়া’, অথবা এই

ভূমণ্ডল। এতে কি বুঝায়? পুনর্ভব—আবার জন্ম, আর, সে জন্ম এই ভূতভৌতিক মণ্ডলেই। এই ভূতভৌতিকে 'ভূতগ্রস্ত' হইয়াই হিরণ্যগর্ভা রাজহংসী হইয়াছে বুনো মাদী হাঁস! সে প্রসব করে কি? প্রাকৃত অজপার সেই ক্লেশ কর্ম বিপাক আশয়। 'লুণ্ঠিত'ও শুধু 'লুটিয়ে পড়া' নয়। আর যদি সে পাদপঙ্কজপরাগরজে লুটাইয়া রহিতে চাও, তা হইলে কি করিবে? ঐ অজপাযন্ত্রে যে নামাসবামৃত পরিস্রুত হইতেছে, সেই অমৃতপানোল্লাস-পরিসীমায় যাও—আর, সে পরিসীমায় 'পনীপত্যসে মা চ ভূরলুণ্ঠিতঃ'—পুনঃ পুনঃ তোমার পরম বঁধুয়ার চরণরজে পতিত হও, এবং দেখিও যেন তাতে তোমার সমগ্র সত্তা উজাড় করিয়া লুটাইতেই পার (মা চ ভূরলুণ্ঠিতঃ)। তোমার সর্বস্ব যেন তাঁতে লুঠিতই হয়, অলুঠিত না থাকে।

লয় সাধকের 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা' ইত্যাদিও সমন্বয়ে বুঝিয়া লইও। শ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুর যুদ্ধে 'মধু যাবৎ পিবাম্যহম্', এবং 'পপৌ চ পানমুত্তমম্' বর্তমান অজপানুবন্ধেও সন্ধান করিও। অজপাই দেখি অসুরবিদ্ধ, অসুরায়ত্ত হয়। অজপা, অস্মদাদিতে, বাক্, প্রাণ ও ধী, এ তিনের সঙ্ঘাত-স্বভাবটি স্বচ্ছন্দে অথবা তদন্যথাভাবে নিরূপিত করিয়া দেখাইতেছে। অজপাই বলিয়া দেয়—তুমি 'সুরে' কি 'অসুরে'। সুতরাং, সুরাসুর সমর অজপায় বুঝিতেও হয়। সে ভাবে বুঝিলে দেবীমাহাত্ম্য যথার্থ অপগত-দৌরাত্ম্য হইবে। যথা ব্রহ্মার যোগনিদ্রাস্তবে 'আ' করণটি ঠিক ভাবে করিয়া অজপাদির 'নাদাদি সম্পর্কে 'অপাস্ত' ভাবটি অপনীত করিতে হইবে। 'নমো দেব্যৈ ইত্যাদি নারায়ণী সূক্তে 'ঐঁ' বীজটিকে অজপার সমুদ্ধারে সচেতন হইয়া 'জপিয়া' ('নমস্তস্যৈ' ইত্যাদি রূপে) যাইতে হইবে।

দেবীর মাহাত্ম্যত্রয়

অজপাপক্ষে, দেবীর তিন মাহাত্ম্য হইল অজপার (হং আর সঃ এ দুয়ের) অনুস্বার বিসর্গ অনুপাতগত ত্রিবিধ আসুর দৌরাত্ম্য অমোঘ নিবারণের তিন পরম কৌশল। বিশ্বে (বাহ্য এবং আন্তর) সঞ্চিত-সিঞ্চিত সুষম সম্পর্ক (Harmonic relation) হইল অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স এতদুভয়ের যে স্বচ্ছন্দ অধ্বক্রম, তার সংস্থাপক। সঞ্চিত সিঞ্চিতের ঐ সুষম সম্পর্কটির ব্যতিক্রম ঘটিলেই পূর্বোক্ত স্বচ্ছন্দ অধ্বক্রমের ক্রমণে আসুর দৌরাত্ম্য। আপন শরীরের Vital metabolism; thyroid ইত্যাদি gland secretion; heart, liver, kidney ইত্যাদি vital organ দের ক্রিয়াক্রম; এ সব তাতেই অজপাকে 'প্রকৃতের্ব্বশাৎ' 'জপিতে' দেখিও। প্রকৃতি=স্বভাব-স্বচ্ছন্দ। আর, সে সবে আসুর দৌরাত্ম্য বুঝিলেই ত্রৈলোক্যস্যাখিলস্য ঈশ্বরী যিনি, তাঁর মাহাত্ম্য-প্রপন্ন হইও। সে প্রপত্তির সাধারণ আকৃতি 'হৌংসঃ' (মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রাদিতে যেটিকে ব্যক্ত স্ফোটরূপে পাই)। প্রণব, গুরুদত্তবীজ, মহানাম এদের সম্পুটে আনিয়া তোমার যে প্রাকৃত অজপা, তাকে যথার্থ অজপা কর। পরে অজপাসূত্রে সবিশেষ দেখিব যে 'অজ' কিনা, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে 'পালন' করেন, তাই অজপা; অথবা, স্বয়ং 'অজ', জন্মরহিত, হইয়াও সেই সৃষ্টির আদি থেকে নিখিল 'জাত'কে পালন করেন, তাই ইনি অজপা। যাহা কিছু জন্মিল, তার আপন অজপাতেই স্থিতি; তার অজপা ফুরাইল তো, সেও ফুরাইল। অজপার অনুপাতটি অগ্নীষোমীয় অনুপাত আগে বলা হইয়াছে। এ অনুপাতের অধিকার সৃষ্টির সর্বত্র। ভূত বিজ্ঞানও তার স্বাধিকারে এই অজপানুপাত (Basic energy economy) লইয়াই মহাব্যাপৃত। তার এই বিজ্ঞান ব্যাপার আসে 'হ্রীঁ' বীজের প্রশাসনে। প্রাণবিদ্যা আসে বিশেষ করিয়া 'ঐঁ' বীজের, আর, অধ্যাত্ম বিদ্যা বিশেষত 'ক্লীঁ' বীজের প্রশাসনে। 'শ্রীঁ' শর্ম্মণ্যা রূপে সর্বত্র শর্ম্মসৌষ্ঠব রক্ষা করেন। 'প্রশাসন' মানে বিশ্বব্যাপিকা অজপাকে প্রাকৃত আসুর শাসন থেকে প্রকৃত সুরশাসনে প্রবর্তিত করা ও রাখা— 'যদা যদা মহাবাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।'

সাম্য, সৌম্য, সৌষম্য—তিলক

সোমাৎ সাম্যঞ্চ সৌম্যঞ্চ সৌষম্যঞ্চাপি সর্ব্বতঃ।
প্রসীদতি ন বৈ সোম ঋতে তিলকধারণাৎ॥৬১

সোম থেকেই বিশ্বে সর্বত্র সাম্য, সৌম্য এবং সৌষম্য এ তিন মিত্রছান্দসী আকৃতি আসিয়া থাকে। এ তিনকে প্রাণ, মনঃ এবং বাক্ এই তিন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখিবে। অর্থাৎ, প্রাণবৃত্তি সমূহকে (যথা, প্রাণ ও অপান) সাম্যে, চিত্তবৃত্তিগুলিকে সৌম্যে, এবং বাগ্‌বৃত্তিগুলিকে সৌষম্যে আনিবে, সোমপ্রসাদতঃ। তোমার এই বাক্ মনঃ প্রাণময় যে সঙ্ঘাত কলেবর, তাকে অজপা-আয়তনরূপে ভাবনা করতঃ সেই

কলেবরে 'তিলকধারণ' না করিলে তো সোম প্রসন্ন হন না। (অজপা শব্দের অকারে বাক্, জকারে মনঃ, এবং পকারে প্রাণ গ্রহণ করিও।) কলেবরে তিলকধারণ সম্প্রদায়গত সাধনাঙ্গ রূপে ব্যবস্থিত আছে। সে ব্যবস্থায় নিষ্ঠাপূর্বক স্থিতই থাকিবে। কিন্তু প্রণব, গুরুদত্তবীজ বা নাম ঐ 'অজপায়' জপিতে হইবে তো। সে অজপায় 'তিলকধারণ' কাকে বলে ভাবিয়া দেখিও। প্রথমতঃ, বাক্-মনঃ-প্রাণ সঙ্ঘাত বৃত্তিকে (resultant congruent-functioning কে) অজপার সঙ্গে অভেদ ভাবনা করিলে। তারপর, সেই অজপাকে আবার আপন ইষ্টনাম বা বীজের অক্ষর তনুর সঙ্গে অভেদে মিশাইলে। শেষে, বীজাক্ষর তনুতে 'চন্দ্রবিন্দু' সমারোপণ করতঃ (অর্দ্ধমাত্রাকে জাগরিতা করিয়া) তিলকধারণ করিলে। বর্ণরূপে যাহা চন্দ্রবিন্দু, স্ফোট বাকে যাহা নাদ বিন্দু, প্রাণে যাহা সার্দ্ধত্রিমাত্রা, মনে তাহাই সেই পূর্ব কথিতা পৌর্ণমাসী আর অমা, পূর্ণ উন্মীলন-নিমীলন। এই সকল কলায় তোমার তিলককে জ্যোতীরসশৃঙ্গারসমুজ্জ্বল করিয়া ফুটিতে দিও।

চন্দ্রমাস্তে শিখাসূত্রে চন্দ্রস্তেঽম্লানমালিকাম্।।
চন্দ্রমা তিলকং তুভ্যং সোমো দধাতু রঞ্জনম্॥ ৬২

সোমরাজা (রঞ্জক) কে তিন আকৃতিতে চন্দ্রমস্, চন্দ্র এবং চন্দ্রমা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে, চন্দ্রমস্ তোমার অজপা তনুতে শিখাসূত্রসংস্কাররূপ রঞ্জনটি সর্বাগ্রে বিধান করুন। চন্দ্রমসে বরুণ সোম সম্মিলিতভাবে সবিতার হিরণ্যরেতস্ এবং ভর্গস্—এতদুভয় 'দুহানৌ'। মান্ত্রী দীক্ষার মাধ্যমে অস্মদাদির অজপাতনুতে এই অসাধারণী বৃত্তিটি ঘটিয়া থাকে। শিখা এবং সূত্রে এই অসাধারণীর গোচরবৃত্তিতা। দীক্ষার পর চর্যা বা চরণ। চন্দ্র এই জপচর্যাকে অম্লানমালিকারূপে গ্রথিত করুন। তোমার জপোল্লাসবিলাসবল্লী থেকে এক একটি জপাক্ষর পারিজাত চয়ন করিয়া তোমার মন-মালাকর মরমী সূতায় গ্রথিত করিয়া অজপাতনুটি জ্যোতীরসশৃঙ্গারসমুজ্জ্বল করুক। চরিষ্ণু-আচরিষ্ণু, পুরশ্চরিষ্ণু মনই চন্দ্র। তারপর, চন্দ্রমা পূর্বোক্ত তিলকটিও অনবদ্য সুন্দর করিয়া পরাইয়া দিন। এই ব্যাপারকে সাক্ষাৎ 'যোগিনীহৃদয়' বলিয়া জানিবে। এ হৃদয়ের উদয়ে—অর্দ্ধমাত্রা, যোগমায়া ইত্যাদিরূপে

মহাযোগিনীর নিখিল যোগদাশক্তি প্রসন্না হইয়া থাকেন। সোমরাজা এই তিনভাবেই—দীক্ষা, চর্যা এবং যোগ— তোমার এই সর্বতোভদ্রভঞ্জন অজপা তনুটিকে সর্বতঃ শ্রীরঞ্জনরাগে অনুরঞ্জিত করুন। 'অজপা' শব্দটিকে এতৎপ্রসঙ্গে (সোমরঞ্জনে) এইভাবে লইও— 'অ' (দীক্ষা) শিখাসূত্র; 'জপ' (চর্যা)=মালা; 'আ' (যোগ বা চর্যাপরিসীমা) = তিলক (বিজয়মঙ্গল) ধারণ। এ হেন ভদ্রভঞ্জনের যিনি শ্রীরঞ্জন, সেই ত্রিচন্দ্রমামূর্তি সোম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ত্রিবিধ রঞ্জন

ইহাও ভাবিয়া দেখিও যে, শিখাদি ঐ তিনটি রঞ্জন দ্বারা অজপা তনুতে মন্ত্রশক্তিসম্পাত, মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্য এ তিনও সূচিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, 'শিখা' বিশেষ করিয়া 'মূর্দ্ধন্যধাম' (মূর্দ্ধজ্যোতিঃ—দ্যোতনীশক্তি), এবং 'সূত্র' বিশেষ করিয়া কুশলাধ্বক্রমে অন্বয় (সুপথা এবং ক্ষেমঙ্করীশক্তি), সূচনা করে। একটির দ্বিদল এবং তদূর্দ্ধ প্রভাব; অপরটি সুষুম্নামার্গ প্রভাবিত করে। স্থূলদেহে Brain Centres, Spinal Column এবং Nervous system, যথাক্রমে শিখাসূত্রের অধিকারে আসে। মালা Association System এবং তিলক Control System এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ সমস্ত কেবলি 'বাহ্যিক' করিয়া রাখিও না।

ইড়ানাড়ী যদীড্যা তে জপাদিস্বস্তিকর্মসু।
বিদধাতু মৃড়ানী তে প্রকামং বামতশ্চরম্॥ ৬৩

ইড়া বা সোমনাড়ীতে জপাদি স্বস্তিকর্ম (অভিচারাদি ক্রূর কর্ম নয়) করিতে হইবে বলিয়া যদি সেই সোমনাড়ীই (বামা) তোমার ভজনীয়া (ঈড্যা) হয়, তবে নিখিল অজপাযন্ত্রমন্ত্রেশ্বরী যে মৃড়ানী, তাঁতে প্রপন্ন হও, যেন তিনি প্রসন্না হইয়া (পিঙ্গলায় বহমান কালেও) তোমায় অভিলাষানুরূপ (প্রকামং) ঐ 'বামা'কেই মিলাইয়া দেন। মৃড়ানী তোমায় প্রকামং 'বামতশ্চরণে' সিদ্ধমনোরথ করুন! এই প্রকার 'বামেন' স্বস্তি-শান্তি কর্মে যথার্থ দাক্ষিণ্য আসিয়া থাকে।

মাস ও তিথি

বরেণ্যং বিবরিষোর্মশ্চ ভর্গো বিবরিষোশ্চ সঃ।
সোমশ্চ পূর্ণিমা মাহ্মা চন্দ্রমাশ্চাপি চন্দ্রমা।
মাসতিথী চ কল্প্যেতে তাভ্যাং চন্দ্রশ্চ কল্পনম্॥৬৪

গায়ত্রী মন্ত্রের 'বরেণ্যম্'কে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বরুণ তাহা হইতে 'ম'কার আহরণ করিলেন; এবং 'ভর্গস্'কে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহা হইতে আহরণ করিলেন কি? 'স্' এইবর্ণ। সমাহৃত এই বর্ণদ্বয় লইয়া বরুণ সোমে সমন্বিত হইলেন। ফলে, চন্দ্রমস্, চন্দ্রমাঃ। আচ্ছা, বরুণ সোম-সমন্বিত হইয়াই কি পরিতৃপ্ত হইলেন? না, তিনি 'সোমপা' হইলেন। (এ সবের অধ্যাত্মাদি অনুবন্ধে ব্যঞ্জনা পূর্ব-প্রদর্শিত সূত্রাবলম্বনে বুঝিয়া লও।) সোম বরুণকে যেন বলিলেন— 'আমার এক পূর্ণ উন্মীলন এবং পূর্ণ নিমীলনের স্থল (মেরু) আছে। সেই পূর্ণিমা এবং অমা—মেরুদ্বয়ে তুমি আমাকে পরিপূর্ণ-মানে পাইবে। অন্যত্র কলায়।' বরুণ বলিলেন— 'তাহাই হউক্'। সোমপা বরুণ পূর্ণিমা আর অমার 'মা' আহরণ করিলেন। ফলে, চন্দ্রমা। কিন্তু, উদয় বিলয় কলাক্রম তো রহিবে। সুতরাং, বরুণ সোম উভয়ে মিলিয়া যথোপযোগ কলাক্রমও 'কল্পনা' করিলেন। ফলে, চন্দ্রমস্ থেকে 'মাস' (চান্দ্রমাস), এবং চন্দ্রমা থেকে 'তিথি' কল্পিত হইল। এবম্বিধ যে কল্পন, তাকেই 'চন্দ্র' বলিয়া জানিবে। পুরাণী কথার প্রহেলিকা ভঙ্গিমায় তত্ত্বগুলি বলা হইল। কিন্তু অধ্যাত্মাদি দৃষ্টিতে এই সব প্রহেলিকায় আন্তর আলোকরশ্মি আগেই কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টি, প্রকারান্তরে, চতুর্বিধ—তাত্ত্বিকী, শাক্তী, ছান্দসী এবং প্রাপঞ্চিকী। এ সকল দৃষ্টিতেই বর্তমান সূত্র-কারিকা-নিরূপিত বরুণ-যোম-সঙ্ঘাতটি চন্দ্রমাঃ ইত্যাদিরূপে, এবং মাস তিথ্যাদিরূপে অনুধাবন করতঃ তাদের তোমার সাধনে পরম উপযোগটি সাধিয়া লইবে।

মাসতত্ত্বে, বিশেষ করিয়া, বেবিষাণ এবং অধ্বনীনরূপে বরুণকে, আর, তিথিতত্ত্বে সোমকে রঞ্জন এবং আত্মনীনরূপে সমাশ্রয় করিবে। 'মাসে' বিশেষ করিয়া ধ্যান রাখিবে, যাতে এই বরেণ্যমের 'ম' আর ভর্গসের 'স' তোমার অগ্রগতিকে বেবিষাণ যে অধ্ব (broadening-widening path of Light and

Joy) তা থেকে বিক্ষিপ্ত না করে (মা+অস্ বিক্ষেপে)। জড়ের ক্ষেত্রে orbital motion ইত্যাদি স্থলে eccentric angular momentum ইত্যাদি না হওয়া এই মা+অস্ আকৃতিতে পড়ে। আর, তিথিতত্ত্বে দেখিও যেন—যে 'তল' বা কলাক্রমে তুমি চলিতেছ ('তি'), সেটি যেন শুধু তদ্রূপে 'গড়াইয়া' না যায় (a passing phase মাত্র না হয়); তাকে স্থির কর ('থি'), দৃঢ় কর, আবিষ্ট কর। যাহা আসিতেছে, তাকে শুধুই fluid, কেবলি discursive রাখিয়া গেলে, সে নিরন্তর ভাঙ্গানবিলাসে কোন্ সত্যপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিবে? তাই 'তি+থি' এই আকৃতিতে অবহিত হও। 'ত'কে যাহা স্থির করে, consolidate করে, এবং পরে অগ্রগা হয়, তাহাই 'থি'। 'থ' যেন বলে— 'অমন করে ভেসেই যেও না, থাম'। স্থির হও, শক্ত হও, সমৃদ্ধ হও, আর, হও (সোম) অমৃতের অভিযানে অদীন, পরাজয়হীন পান্থ। এইভাবে গভীরে যাইয়া মাস তিথি বিচারপূর্বক তোমার পরমশ্রেয়ঃ পন্থায় অধ্বন্বী এবং আত্মন্বী হইবে।

দৃষ্টান্ত—একাদশী

ধর, একাদশী তিথি। আবার সেই গায়ত্রী ব্যাহরণ-অনুস্মরণের দৃষ্টান্ত লও। এই দৃষ্টান্তেই সমস্ত কিছুরই 'অন্ত' দৃষ্ট হয় বুঝিও। ক্রান্তদর্শী কবি হও এই 'দৃষ্টান্তে'। গায়ত্রীর উদয় প্রণব চারিমাত্রা, ব্যাহৃতিত্রয় চারিমাত্রা—এই আটমাত্রা। 'তৎসবিতুঃ' দুইমাত্রা। হইল দশ। একাদশ কি? 'বরেণ্যম্' এর 'বরে'। বরণ করি— 'বিবরিষু'। এই বরেণ্যম্—বিবরিষুভাবেই একাদশীকে মিলাইতে হয়। এটি শুক্লা একাদশী। কৃষ্ণা একাদশী মিলে বিলয়প্রণব দ্বিমাত্রা বিন্দুমেরু অভিমুখে চলিলে। এই স্থলে নাদের 'উরু' রূপকে বিশেষ করিয়া 'তনু' রূপে পাইতে হয়। বিন্দুলয়ে 'অণু'। যদি পূর্বালোচনার দৃষ্টিতে 'বরেণ্যম্'-এর 'ণী-অম্' স্থলে পূর্ণিমা পাইতে চাও, তা হইলে, সমগ্র শক্তিলেখটিকে ত্রিংশৎ মাত্রায় লইবে। যথা উদয়=৬, ব্যাহৃতিত্রয়=৪। তা হইলে 'তৎ সবিতুঃ' পাদের সম্মুখীন হইতেছে—একাদশীতে, ইহা ভাবনা করিও। বিন্দুমেরুতে দুই মাত্রা। ৩০ সর্বসমেত।

মাস-তিথি, রাশি-নক্ষত্রাদির কি এইভাবে শুধু প্রণব, গায়ত্রী ইত্যাদিতেই ব্যঞ্জনা ও বিনিয়োগ মিলাইতে হইবে? না, শুধু সে ভাবে নয়। অন্য ব্যঞ্জনাদিও অবশ্য

আছে। তবে, জপাদি সাধনের 'স্বগত' বা আন্তর অনুবন্ধে তাদের না মিলাইয়া লওয়া পর্যন্ত, তারা যেন 'বাহ্য-বিজাতীয়' রহিয়া যায়। সব কিছু যেন পর, অনাত্মীয় গোষ্ঠীতে রহিয়া আমার পরবশ পরিবেশটি রচিয়া দেয়—কখনও হয় সাধক, কখনও বা বাধক। তাদের 'বাহ্য' পরিতুষ্টি করিয়া (স্বস্ত্যয়ন, গ্রহশান্তি ইত্যাদি দ্বারা) কবে আমার সর্বতোভদ্রস্ববশ—পরিবেশটি জীবনে মিলাইতে পারিব? আত্মনিরত, আত্মন্বী হইয়া সমস্ত কিছুকে আত্মবশ্য, আত্মনীন না করিতে পারা পর্যন্ত তো 'নিহিতমচলং নিশ্চিতপদম্' মিলে না!

তাই নিখিল 'বাহ্য'কে আন্তর উদ্দীপন-আপ্যায়নে সমাহৃত কর; এবং নিখিল ভবপ্রত্যয় 'আত্মপ্রত্যয়ৈকসারম্'—এ পূর্ণাহুতি দিয়া নিশ্চিন্ত হও।

"সংখ্যানিগড়"

দেখিও যেন, গায়ত্রী ইত্যাদিতে মাত্রাদি সংখ্যানে সংখ্যাশঙ্কায় 'আড়ষ্ট' হইও না। প্রাণব্রহ্ম (সেই হিরণ্যগর্ভা রাজহংসী) স্বয়ং অকুণ্ঠ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় পাদ-মাত্রা-কলা বিন্যাস করিয়া চলিয়াছেন। তুমি তাঁকে সংখ্যা-সংখ্যানে অবশ্যই মিলাইবে। কিন্তু তাঁর স্বচ্ছন্দবিলাসবিদগ্ধ চরণে কোন আড়ষ্ট সংখ্যার নিগড় পরাইও না। অর্থাৎ, উদয়-বিলয় একবার চারি চারি মাত্রা হইল, আর একবার ছয় বা আট হইল—এ কেমন ব্যবস্থা, ভাবিয়া অব্যবস্থিত হইও না।

ব্যাহরণের ছান্দসী মাত্রার সঙ্গে সঙ্গীতের তাল-মাত্রার তুলনা করিয়া বুঝিয়া দেখিলে ভাল হয়। যেমন, আটমাত্রার কোনও তালকে দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত, সব রকমে লওয়া যায়। সাতমাত্রা, দশমাত্রা, বারমাত্রা ইত্যাদি করিয়া ছন্দঃ বদল করিয়াও লওয়া যায়। ব্যাহরণে বিন্দুমেরু স্থলে দুইমাত্রা কাল 'শয়ীথাঃ' প্রথম প্রথম করিতে হয় বটে, কিন্তু বিন্দুলীনতা যত না গাঢ় হইতে থাকিবে, ততই ঐ দুই মাত্রা বাড়িয়া চারি, ছয়, আট ইত্যাদি হইতে থাকিবে। কিন্তু ব্যাহরণের সমগ্র লেখটি কোন ক্রমেই কুলেখা হইবে না, সর্বক্ষেত্রেই 'সুলেখা' রহিবে (unharmonic হইবে না)। সুলেখা হইল কি কুলেখা, সেটি গায়ত্রীতে মুখ্যতঃ চারিটি সন্ধিস্থল এবং ছয়টি পূর্ণশূন্যস্থল সম্বন্ধী যে 'সৌম্য' ভাব, তদ্দ্বারা নিরূপণ করিবে।

সৌম্য—কোথায়, কি ভাবে?

সৌম্যং স্যান্ নাদবাহিত্বং সৌম্যা স্যাদ্ বিন্দুলীনতা।
সৌম্যঃ স্পর্শঃ স্থলেষু স্যাৎ সৌম্যং সংখ্যানজীবনম্॥ ৬৫

বরুণ দেশ-কাল-উপাদান ইত্যাদির যে আধারপট বিছাইয়া দেন, সে বিততপটে 'রঞ্জন' করেন সোম। সোম রাজার এই 'রঞ্জন' কর্মটি সুষ্ঠুভাবে হইলে হয়—সোমে 'ভাব'-সৌম্য। গায়ত্রী ইত্যাদি জপে নাদবাহিতা, বিন্দুলীনতা, শূন্য-পূর্ণাদিস্থলে স্পর্শ, এবং মাত্রাদির সংখ্যা—এসবই সৌম্য হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, 'চন্দ্রমা' তত্ত্বটি তার আপন 'মানে' থাকা আবশ্যক। কেননা, সৌম্য যে মান, তাহাই সংখ্যানের প্রাণ। যথা—গায়ত্রীতে কোথায় কয়টি প্রণব দিতে হইবে, পাদমাত্রা সংখ্যা কত হইবে; এসবই ঐ সৌম্য সূত্রে নিরূপণ করিয়া লইবে। সবকিছু আঁটিয়া সাটিয়া, পুরিয়া রাখার কোনও 'আড়ষ্ট কাঠামো' কোথাও নেই জানিবে। চবর্গের আদিবর্ণ—যাহা মাতৃকা ন্যাসে 'চং', সেটিকে স্বয়ং ব্রহ্ম সিসৃক্ষায় কাম বা সঙ্কল্পরূপ হইয়া স্বীয় 'বাক্' রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাই চং—চঞ্চল্যতে। মূল থেকে সমস্ত কিছু প্রসূত হইয়াই চং চঞ্চল্যতে-রূপা মাতৃকাকে ভজনা করে। তাই মূল থেকে একদিকে বিশ্ব এবং বিশ্বদেবাঃ, অন্যদিকে পরা-পশ্যন্তী প্রভৃতি বাকের পুরাণী প্রবৃত্তি। 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ!' —ইহা 'চং চঞ্চল্যতে' মাতৃকার প্রসবসম্ভূতিবিভূতি। আদিতে যে 'কং' মাতৃকা, সেটি নিজেকে (ভূমসুখস্বরূপকে) 'আবিঃ' আকারে, কিনা, আদিম ব্যঞ্জনরূপে, 'যেন' আবিষ্কার করিলেন। 'খং' রূপে সিসৃক্ষু হইয়া নিজেকে মহাব্যোম (আকাশ) রূপে আদিতে ঈক্ষণ করিলেন। 'গং' রূপে প্রাণ বা মূলপ্রাণনপ্রবণতারূপটি পাইলেন; মূলপ্রাণনপ্রবণতা— "একোঽহং বহু স্যাম্"; কিন্তু এই বহুর মাঝে এক নিজেকে নিরস্ত করিলেন না; সূত্রাত্মারূপে, ছন্দোভিঃ সমন্বয়কৃৎরূপে রহিলেন; ইহাতেই নাদের অভিব্যক্তি। 'গং ঘং' দুয়ে মিলিয়া ব্রহ্মের তপোমূর্তি। 'গং' দেয় নিখিলে পাদমাত্রা; 'ঘং' নিখিলকে কাষ্ঠায় (limiting value তে) অগ্রসর করে। 'তপসা'র বেবিষাণ—অধ্বনীনভাব, তার কাষ্ঠা 'ঘং' মাতৃকায়। 'ঘৃণি' সবিতার এতদর্থে রহস্য সংজ্ঞা। তৎপরে, আদিম 'কং' রূপে যে কাম ঈক্ষণাদিক্রমে সৃষ্টিকাম হইয়াছিল, সে কাম এইবার যেন আত্মনীন (আত্মকাম)

হইল। 'কং' বিন্দু থেকে বিশ্বতঃ সমুত্থিত নাদ, আবার বিন্দুতেই স্বতঃ সমাবৃত্ত হইতে চাহিল। 'ঘং' এর 'ঙং'তে এই স্বতঃ সমাবৃত্তিসূচনা। এই মূল রাহস্যিক ব্যাপারটি গায়ত্রী, প্রণব বা অপর কোনও বীজাদি জপে আবার সাধনে 'যাচাই' করিয়া মিলাইয়া লইতে হয়। তাই জপে বিন্দু থেকে উদয়, মধ্যে পূর্ণোদয়, অন্তে বিন্দুবিলয়। যে ক্রমে সব কিছু আসিয়াছে, সেই ক্রমেরই বিলোমে ('বামেন') তাদের আপন আলয়ে ফিরিতে হইবে।

'চং' আদি মাতৃকা

'চং চঞ্চল্যতে' ইত্যাদি, সৃষ্টির ঐ আদিমবর্গকে 'ভাঙ্গিয়া' দ্বিতীয়বর্গ আকৃতিতে দেখাইতেছে। প্রথম বর্গটি যেন ব্রহ্মবীজের আন্তরব্যাকরণ; সৃষ্টির যে প্রেক্ষায়তন, তার অন্তরালে যেন বিশ্বসিসৃক্ষু আত্মরূপটি অবলোকন। এখনও যেন প্রেক্ষাগৃহের যবনিকা উত্তোলিত হয় নাই। বিশ্বসূত্রধার যেন বিশ্বাবির্ভাবের পূর্বে আপন সৃষ্টিসূত্রটি সূক্তরূপে ধ্যান করিয়া লইতেছেন। আমাদেরও তাই করিতে হয়। অস্মদাদির অনুভবে (Experience এ) এটি ধ্যাননৈকটিক (intuitional) ভূমি। মন তার মনন লইয়া 'পরে' আসিতেছে। আসিয়া দেখে— 'চং' চঞ্চল্যতে'। 'চং' চঞ্চল, কিন্তু তাতে মিলে ছন্দঃ (order, law, uniformity)। 'চং' হয় 'ছং'। ছন্দসা চঞ্চল্যতে। তারপর, বিচিত্ররূপে (অণু—বিরাট, বাহ্য, আন্তর ইত্যাদি) জাত হইব, —এক এক বিশিষ্ট সঙ্ঘাতরূপ পরিগ্রহ করিব। এটি কি? —'জং'। 'ঝং'—ঝঙ্কার (in unison, in accordance or conformity)। জাতমাত্রকেই এই 'ঝং'এর বিশ্বজনীন ঝঙ্কারে ঝঙ্কার দিতে হয়। 'ঞং'তে সব কিছু আত্মনীন হইয়া তার তৃপ্তিরূপ 'ফল'টি (বোধে অথবা অন্যথা) মিলায়। কাজেই, 'ঞং' হইল Cosmic resultant satisfaction - এর মাতৃকা। পরে, মাতৃকার বিস্তার বিবৃত হইবে। এখানে প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য কর যে— 'চং চঞ্চল্যতে' মাতৃকা থেকেই 'চন্দ্র' এবং 'মনস্'। 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ'। এই চন্দ্রকে একদিকে চন্দ্রমস্ (ভর্গস্) অন্যদিকে চন্দ্রমা (রোচিঃ)—এদুয়ের মাঝখানে রাখিয়া প্রবৃত্তি দিতে হয়। অন্যথা, মনঃ 'প্রমাথিবলবদ্দৃঢ়ম্'; আর চন্দ্রও কামকামী, ক্ষয়িষ্ণু, কলঙ্কী—generator of lunar affections, or lunacy. 'জং জঞ্জন্যতে'—জাজায়মান ভূতবর্গের পূর্বোক্ত যে 'ঝঙ্কার' (ঝঙ্কৃতি), সে

রসাকৃতিময়ী ছন্দোমঞ্জুলা ঝঙ্কৃতি যে বিশ্বে সর্বত্র অবাধ রিরংসাব্যাকুল আর্ত অসুর-শৃঙ্গারেই পর্যবসিত হইতেছে, ঐ সোম-সৌম্যবিধুর নষ্টচন্দ্রের (লেশাবগুণ্ঠিতা) সর্বসম্মোহন গ্লানিমায় এবং ম্লানিমায়! বিশ্বে সর্বত্র তাই রিরংসায় এক উৎকট লেশানবগুণ্ঠিতা 'নষ্টচন্দ্র' প্রবণতা! কে কবে এই বিশ্বগ্রাসী নষ্টচন্দ্রকে 'শারদোৎফুল্লমল্লিকার' মরমী করিয়া তাকে মহারাসরন্তুকামের এবং রন্তুকামকামার একান্ত অনুগ করিবে? মহামায়া কবে তাঁর নিজ মায়াকে যোগমায়ার ভূমিকায় পাঠাইবেন?

এ তো সাধ্যশিরোমণি! আদৌ চন্দ্র আর সোমের সমীকরণটি সাধন কর। চন্দ্রমসের ভার্গো ভাঃ তাতে পড়িতে দাও, আর সঙ্গে সেই পরিণয়ি-আদি পঞ্চ ছন্দে মিলাও চন্দ্রমার মান-মাধুরী। সমন্বয়ে আসিলে চন্দ্র (সঙ্গে মনঃও) হবে সোম (মনঃ হবে সৌম্য); মহাসমন্বয়ে সোম হবে ওম্। আর, পরমে? শুদ্ধ নিরঞ্জন, অথবা চাও তো, ঐ মহারাসরসাঞ্জন।

বরেণ্য ও সৌম্য

বৃণোতু বরুণঃ সোমং সোমশ্চাভিষুণোতু তম্।
যদ্ বরেণ্যং হি তৎ সৌম্যমেকত্র চ হঠৌ ঘঠৌ॥ ৬৬

বরুণ সোমকে বরণ করুন। ফলে, বরেণ্যম্। সোম আপন অমৃতে বিবরিষু বরুণকে অভিষুত করুন। ফলে, বরেণ্য এবং সৌম্য পরস্পরে মিলিত হইল। বরেণ্য=সৌম্য, এই অভেদ সমীকরণ হইল। ভর্গঃ সুমহান্ তেজোরূপে পঞ্চক্লেশের মূল যে অবিদ্যা, তার বীজটি ও 'ভর্জ্জন' করিতেছে বটে, কিন্তু সোমের সাক্ষাৎ অমৃত সত্তায় অভিষুত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ অস্তি-ভাতিও 'যেন' আপনাকে 'আনন্দমেবাস্তি, আনন্দমেব ভাতি' রূপে সাক্ষাৎকারে পায় না। সুতরাং খাঁটি শুদ্ধও হয় না। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব 'যেন' ভূমার ভূমত্বে একান্ত 'তটস্থ' হইয়াও একান্ত পরিনিষ্ঠিত হয় নাই। ব্রহ্মানুভূতির চরম ভূমিকার ঠিক 'মুখেই' এই 'একান্ত তটস্থ' ভাব। 'একান্ত' বলিতে—অন্তে বা পরমে যে 'এক' তার সঙ্গে ব্যবধান আর নেই। 'যেন' দিয়া বলা ছাড়া উপায় নেই।

রসিকও এই 'যেন'টি আপন রসাস্বাদানুবন্ধে বুঝিয়া লইবেন। একান্ত ভরপূর মিলনের ঠিক 'মুখেই' এক একান্ত অ-ভরা অবুঝ বিরহ-বিধুরতা। 'লাখ লাখ যুগ

হিয়া হিয়াপর রাখনু' ইত্যাদি। আবার, সেই শূন্য-পূর্ণ একত্র। বিন্দুপ্রমুখা পরমা গতি। তাই প্রণবাদি যাই জপ করা হয়, তাতে 'একান্ত' বিন্দুলীনতা ভূমিতে আসার নিমিত্ত এত প্রযত্ন-প্রয়াস, এত প্রসাদ-প্রপত্তি!

সাধনের উত্তম ভূমিকার কথা শুনিয়া রাখা চাই। যেমন বদ্রী-কেদার-মানস কৈলাস যাত্রীর। সাধন সুরু হয় প্রথম ভূমিকাতেই উপযুক্ত ধৃত্যুৎসাহসের, আর বরেণ্য-শরণ্য যে পরম প্রসাদ, তাতে প্রপত্তির সম্বলটি লইয়াই। মনটি তখন ঐ চন্দ্রের মত চলিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু, ম্লালিমা-গ্লানিমা মাখা। বরুণ এবং সোম তোমার সে চন্দ্রকে ভর্গস্তেজসা (ব্রহ্মবর্চ্চসা) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত করুণ; সে চন্দ্র হউক্ চন্দ্রমস্। আর, সোম তাকে প্রসাদ-প্রপত্তিরসে অভিসিঞ্চিত করুন; অগ্নির দেদীপ্যমান বর্চ্চঃ সোমের পবমান স্নেহশীকরে অভিযুত হইয়া হউক সৌম্য। ছান্দোগ্যের সেই 'কথং সৌম্য ব্রহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্' আবার মনে কর। উপকোসল অগ্নিপরিচর্যা করতঃ ব্রহ্মবিৎ সৌম্য হইয়াছিলেন। তোমারও সাধনের প্রথম ভূমিকা নিষ্ঠাপূর্বক অগ্নিপরিচর্যা। নাম যদি জপ, তবে সে জপনরূপ ভজনই তোমার অগ্নিপরিচর্যা। এ পরিচর্যায় সৌম্য হইতে হইবে। 'প্রসাদ মধিগচ্ছতি'।

'হঠৌ ঘঠৌ'

এইবার শেষের কারিকায় শেষের চরণটি বুঝিয়া দেখ। 'একত্র চ হঠৌ ঘটৌ'॥ এর মানে? মহাশক্তি সঞ্চয়রূপে 'হ' কার আদিত্য। মহান্ বেবিষাণ—আপ্যায়নরূপে ইহাই বরুণ। ঠং চন্দ্রমার বীজ মনে কর। কেন? তা পরে আসিতেছে। এখন দেখ যে, সৃষ্টির যে আভাসিক চিত্র আমাদের মিলিতেছে, তাতে আদিত্য-চন্দ্রমা স্বচ্ছন্দ-সহোদিতৌ নেই। আদিত্যতেজে চন্দ্রমা নির্বাণপ্রভ, লুণ্ঠিতস্নেহ। আর চন্দ্রমার উদয়ে আদিত্য নেপথ্যগামী। এ তো বাহিরের কথা। স্থূলে-সূক্ষ্মে, বাহ্য-আভ্যন্তর সকল রকমেই আদিত্য চন্দ্রমার (হঠৌ) ঐ আভাসিক দ্বন্দ্বস্থতা বুঝিয়া লইও। ধর, কোথাও শক্তি সঞ্চয় রহিয়াছে ('হ'), কিন্তু চন্দ্রমায় ('ঠ')—সোমমানে, সৌম্যচ্ছন্দে, সেটির সিঞ্চন-বিনিয়োগ ঘটিতেছে তো? হিসাবে আধ্যাত্মিক শক্তি, সমাজ-রাষ্ট্রশক্তি, আণবশক্তি ইত্যাদি কোনওটিকে বাদ দিও না। 'হঠ' এর আহুতি যথার্থ সৌম্যচ্ছন্দে আনার নিমিত্ত 'স্বাহা' এবং 'স্বধা'। প্রথমটি স্বচ্ছন্দে বেবিষাণ—অধ্বনীন করার জন্য;

দ্বিতীয়টি, আপ্যায়ন—আত্মনীন করার নিমিত্ত বিশেষতঃ। নৃসিংহ, কামদেবাদি গায়ত্রীতে 'বিদ্মহে', 'ধীমহি' এবং 'প্রচোদয়াৎ'—এই তিন রাহস্যিক পদে সবিশেষ অবহিত হইবে। প্রথমপদে আদিত্য, দ্বিতীয়ে চন্দ্রমা, স্বানুগ্রহ সমপাত করিতেছেন। প্রথমটিতে বস্তু এবং বোধের ব্যাপক, বেবিষাণ ভান (Experience as continuum or expansivity); দ্বিতীয়টিতে কেন্দ্রীণ, সংহতভাবে ভান (Experience as condensing to a point); একটি নাদের অনুবন্ধে, অপরটি বিন্দুর। বস্তু এবং বোধ মাত্রই এই দুই অনুবন্ধে প্রতিভাত হয়। যেমন, ঐ সূর্য, ঐ চন্দ্র, এই ভাব। একটা খুলিয়া মেলিয়া, যথাসম্ভব সমগ্র করিয়া দেখার দৃষ্টি। অপরটা জড়ো জমাট করিয়া, যথাসম্ভব 'একাগ্র' করিয়া দেখার দৃষ্টি। বিচার মননে—synthesis, analysis—সংশ্লেষ-বিশ্লেষ। এ দুয়ের যাতে সৌম্যচ্ছন্দঃ থাকে, সেই নিমিত্ত— 'প্রচোদয়াৎ'।

বিদ্মহে' ও 'ধীমহি'

জপে হকারাদি, ককারাদি প্রতিটি বর্ণের ঐ দ্বিবিধ বৃত্তি আছে, এতে সন্দেহ নেই। 'হ' বিপুল, অখণ্ড 'প্রাণেশ' রূপে আছেনই। তিনি তো প্রাণব্রহ্মের অখণ্ড ভাণ্ডার বা সঞ্চয়রূপ। তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হকার মাত্র ভাবিও না। কিন্তু তাঁকে তো বোধে মিলাইতে পারি না। তাই বিদ্মহে। সে অখণ্ড মহাভাণ্ডারকে আমার 'আপন' ভাণ্ডার করিয়াও মিলাইতে হয়। তাই ধীমহি। বিশ্বের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমার আপন 'একাউন্ট' খোলা হইল। অথবা, তাড়িত শক্তির কোনো বিরাট পাওয়ার হাউসের সঙ্গে আমার আপন ঘরের 'কনেকশন'টি ঘটিল। কিন্তু 'মিটার' ইত্যাদি বসাইতে হয়। কেন? সেই সৌম্যচ্ছন্দঃ রক্ষার নিমিত্ত। অন্যথা, ফেলিওর, ফিউজ ইত্যাদির ভয়। তাই—প্রচোদয়াৎ। হকারাদি বিশ্বপ্রাণশক্তির এক এক আকৃতিতে তাই এই তিন রূপেই সাধিতে হয়।

এইবার দেখ, একবার 'হঠৌ' আর একবার 'ঘঠৌ'। 'বিদ্মহে' অধিকারে যিনি 'হ', তিনিই 'ধীমহি' অনুরোধে হইলেন 'ঘ'। Cosmic Continuum of basic radiant energy যেন আদিম সিসৃক্ষায় বা স্রষ্টুকামে ঘনীভূত এবং উর্জিত হইয়া হইল 'ঘ'—ঘৃণি। ভর্গস্বরূপে যাহা বিভু, এই 'ঘ' রূপে সেটি হইল ঘৃণি ও ঘর্ম। বিষ্ণু ভগবানের 'ঘর্ম্ম' থেকে কার উৎপত্তি, তা স্মরণ কর। ঘর্ম মানে শুধু 'ঘাম' (বাংলা)

বুঝিও না। যাই হোক্, বেশী 'ঘামিলে' তো বলহানি, নাড়ীও ছাড়িতে পারে; তাই 'ঘ' এবং 'ঠ' (সোমবীজ) মধু বা সৌম্যচ্ছন্দে মিলাও। যেমন, জপে অগ্নিমাত্রার আধিক্য হইলে 'ঘ' যেন ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে; তখন সোম মাত্রায় তাকে সৌম্যে আন। ইহা 'ঘঠৌ' আকৃতি (formula) তে আসে।

দৃষ্টান্ত সকল ক্ষেত্র হইতে লইয়া এই 'হঠৌ' 'ঘঠৌ' আকৃতিদ্বয় বুঝিয়া লইবে। প্রাণব্রহ্মের বিভুরূপ (নাদ) এবং কেন্দ্রীণরূপ (বিন্দু)—দুটিকেই তুষ্টি-প্রসাদে মিলাইতে হয়। তুমি নিজে 'দেউলিয়া' হইবে না, অথবা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কও তোমার সম্পর্কে 'ফেল' হইবে না। 'যোগ'টি ঠিক 'ক্ষেমে' থাকা চাই। 'ঠ' বিশ্বে সর্বত্র ক্ষেমঙ্কর রহিয়াছেন। যোগের দিক্ থেকে, হঠৌ থেকে সামান্যতঃ হঠযোগ। এতে কতিপয় আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম মাত্র বুঝিও না। কলেবরে আদিত্য-সোম সম্বন্ধটি ক্ষেমঙ্কর হইয়া নাই (যথা, vital metabolism, hormonal balance এ)। হঠযোগ তাকে ক্ষেমঙ্কর করে। তজ্জন্য আবশ্যকমত 'বামেন দাক্ষিণ্যং'ও সাধিতে হয়। অর্থাৎ, reversing the 'sense' or orientation. 'কঠ' এবং 'খঠ'—এই দুই আকৃতিতে রাজযোগের যথাক্রমে সানন্দ ও সাস্মিত সমাধিদ্বয় সাধিয়া নির্বিকল্পে যাইতে হয়। প্রথমটিতে আনন্দ-সম্প্রসাদ, দ্বিতীয়টিতে ব্যোম-সম্প্রসাদ; বিন্দু এবং নাদ। 'গঠ' দ্বারা বিশেষতঃ কুণ্ডলিনী বা লয়যোগ; আর, 'ঘঠ' দ্বারা মন্ত্রযোগ সাধিবে। 'ঘ' আদি ব্যঞ্জন বা সিসৃক্ষা বর্গের তুরীয় বর্ণ। বাকের দিক্ থেকে 'ক'কে পরা ধরিয়া, 'ঘ' হইল বৈখরীর স্থল। এই বৈখরীকে সমর্থ করিয়া এবং 'সৌম্য' করিয়া (অর্থাৎ 'ঘঠৌ' আকৃতিতে লইয়া) মন্ত্রযোগ সাধিতে হয়। লয়যোগে মধ্যমামুখ্যতা; 'ঘঠে' এবং 'কঠে' যথাক্রমে পশ্যন্তী এবং পরা। তবে, কোনও যোগেই এই চতুরঙ্গার পরস্পর বিয়োগে যোগ সাধিত হয় না।

ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ

পরে মাতৃকাবিচারে দেখিব যে, ব্যঞ্জনবর্ণগুলি প্রাণব্রহ্মের সিসৃক্ষা বা স্রষ্টুকামাদিক্রমে অভিব্যক্তির এক এক মূল আকৃতি (Prototype or basic Pattern)। আর স্বরবর্ণগুলি কি করে? 'ব' অথবা 'অব্যক্ত ভাণ্ডারে' খনি থেকে প্রত্যেকটিকে উত্তোলনপূর্বক তাকে অভিব্যক্ত প্রাণবৃত্তিরূপে 'প্রসৃত' করে। 'স্বর' এই শব্দটিতে এই

ব্যঞ্জনা নিহিত আছে দেখিও। স্বরসহায়েই কাদি হাদি নিখিল বাক্ 'প্রসৃতা পুরাণী'। স্বরবৃত্তিগুলি কতিপয় মূল আকৃতিবিশিষ্ট। ব্যঞ্জনবর্ণগুলিও তদ্রূপ। আদিবর্গকে সিসৃক্ষাকৃতি বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়বর্গ (তালব্য) ছান্দসাকৃতি—সৃষ্টিতে সর্বত্র ছান্দসী আকৃতি বিধানে ও রক্ষায় নিযুক্ত। অপরাপর বর্গের কথা পরে হইবে।

এখানে লক্ষ্য কর যে, 'চং' ইত্যাদি কোনও ব্যঞ্জনাকৃতিকেই 'স্থূল-ব্যবহারের সঙ্কীর্ণতায় লইও না। যথা, 'চং চঞ্চল্যতে' বটে, কিন্তু এ চাঞ্চল্য স্থূলের (জড়ে, প্রাণে বা মনে) চাপল্য করিয়াই লইও না। স্বলসিত আনন্দ (কং ব্রহ্ম) যখন স্রষ্টুকাম হইয়া উল্লসিত বিলসিত হন, তখন পাই 'চং চঞ্চল্যতে' এর আদিম পরমমঞ্জুল রূপটি। অর্জুন কৃষ্ণকে বলিতেছেন— 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ'। কিন্তু, কেন বলিলেন না যে—হে কৃষ্ণ! তুমিই সেই আদিম পরম-মধুমঞ্জুলা চঞ্চলতা, তুমি চিরলোল, নওল চঞ্চল! আমার এই চটুল-চপলা চঞ্চলতাকে তোমার সেই আপন রসরাসচঞ্চলতায় মিলাইয়া লইবে না কি? কিন্তু সে তো গোড়ায় হবার নয়। তাই, প্রথমে অভ্যাস আর বৈরাগ্য। তাই, 'আগে কহ আর।'

সুতরাং 'চং চাঞ্চল্যতে' প্রভৃতি প্রতিটি তোমার 'বিখরা' মাতৃকাকে মধ্যমাদিক্রমে পরার প্রাণপারম্যে এবং শুদ্ধিপরিসীমায় লইয়া চল। ন্যাসের লক্ষ্য ইহাই। তোমার সাধারণবোধের চন্দ্র এবং মনঃ এবং প্রকার অস্তি-ভাতি ন্যাস এবং মোদমাতি ন্যাসের প্রসাদে হউক—চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা (সূরিসুমনাঃ এবং সৌম্যমনাঃ)। আবার উপনিষদের সেই 'ব্রহ্মবিদিব ভাসতে সৌম্য'। যৎ কিঞ্চিৎ অপিহিত (তিরস্কৃত) এবং বিকৃত, তাকে পুরস্কৃত এবং সংস্কৃত করিয়া তার শুদ্ধিপরিসীমা যে প্রকৃতি, তাতেই তাকে ন্যস্ত করাই ন্যাস। এটি সম্যক্ হইলে সন্ন্যাস। তাতে 'জ্যোতিরহং বিরজাঃ' ইত্যাদিরূপে পরম অবরোধ।

সৌম্যের প্রসঙ্গে এই সবিস্তার আলোচনা। সৌম্যপ্রসঙ্গের প্রয়োজনীয়তার অবধি নাই। বিশ্বব্যবহারে সর্বক্ষেত্রেই যোগক্ষেমের নিমিত্ত সৌম্যসংস্থা আবশ্যক। আণবিক শক্তিরাশিকে ভূতবিজ্ঞান যেদিন সৌম্যসংস্থায় আনিতে পারিবে, সেদিন বর্তমান মহতী বিনষ্টির আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া মহতী বিসৃষ্টির সম্ভাবনা হইবে। সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বমানবতার কলাকৃষ্টি—সব ক্ষেত্রেই তাই। অধ্যাত্মজীবনে তো সৌম্যই সেই রূপকথার 'সোণার কাঠি'। জপাদি সাধনে ব্যাহরণ এবং অনুধাবন

উভয়স্থলেই সৌম্যপ্রসাদে প্রসন্ন থাকিতে হইবে। শশিশেখর, সোমার্দ্ধধারী শিবগুরুকে 'প্রসীদ মে' বলিয়া নিরন্তর ভজনা করিতে হইবে। ব্যাহরণে বিশেষ করিয়া পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠায় চতুরঙ্গ সৌম্যচ্ছন্দঃ যোগক্ষেমঙ্কর হওয়া চাই। যথা গায়ত্রী ব্যাহরণে যদি উদয়-বিলয় ওঙ্কার সমেত ছয়টি পাদ কর, এবং প্রতিপাদে চারিটি করিয়া মাত্রা, তবে এদের সৌম্যে অবহিত হইবে (যেমন সঙ্গীতালাপে)। পূর্বনির্দেশ মত ছয়টি পূর্ণ এবং ছয়টি শূন্য কলা আছে। সে সবেও সৌম্য। আর, নাদমেরু এবং বিন্দুমেরু—এই দুটি কাষ্ঠা। এ দুটিতেও সৌম্য। 'সৌম্য' শব্দের আকৃতিতেই পরম সঙ্কেতটি দেওয়া আছে। স+ওম্+ই+অ ('ই' এবং 'অয়্' থেকে 'অ')। যে বর্ণ ই ব্যাহরণে যে পাদাদিতে উদিত হইতেছে, ('স') তাকে কি করিবে বলত' পরম যোগক্ষেমায়? মূলা পরাবাক্ যে ওঙ্কার, তাতেই, এবং তার অনুবৃত্তিতেই, তার গতি হৌক্। ওঙ্কারের পরম যোগক্ষেম নির্বাহয়িতা নাদ-বিন্দু। সুতরাং, কোন বর্ণ উচ্চারণই কোনও পাদাদিতেই ঐ পরমনির্বাহয়িতৃ যুগলের বিষমবৃত্তিতে পাতিত হইবে না। নাদ বরুণের আকার, সোম বিন্দুর। সুতরাং, ব্যাহরণাদিতে বরুণ-সোম-সাহিত্য (যোগ), এবং সংহতি (ক্ষেম) যথাযথ রহিলে সৌম্য, এবং নিষ্কর্ষ চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা। প্রত্যক্ষজগতে সূর্যকে রৌদ্র, আর চন্দ্রমাকে সৌম্যে প্রতিভাত হইতে দেখি।

সৌম্য ও রৌদ্র

বিশ্বে সৌম্য এবং রৌদ্র দুটিভাব যেন পরস্পরবিমুখীনতায় (antipathyতে) রহিয়াছে। দুটি ভাবের 'অতি'র দিকে প্রবণতাও আছে। 'অতি সৌম্য' এবং অতি রৌদ্র' দুটি দুদিকে কাষ্ঠা। কাষ্ঠাদ্বয় কোথাও না মিলিলে তো ধ্রুব এবং পরম যোগক্ষেমটি সম্ভাবিত হয় না। তাই জপেও মিলাইতে হয় 'অতিসৌম্যাতি-রৌদ্রায়ৈ'। মিলিলে নিখিল-কল্পিতপ্রপঞ্চমূল যে অবিদ্যা, সে অবিদ্যাকে দাহকারী অতিরৌদ্র যে ভর্গঃ, সে ভর্গঃ সম্মিলিত হন নিখিলসঞ্জীবন, অখিলরসায়ন যে সোমরোচিঃ, তাতে অথবা অমৃতে। এই নিমিত্ত উদিত নাদকে বারংবার বিন্দু-শয়ানতায় লইয়া অমৃতাভিষিক্ত করিতে হয়।

অমৃতাভিসিঞ্চনকে 'চং' আকৃতিতে আনিলে, তাদৃশ 'চং' দান করে যে ক্রিয়া, সে ক্রিয়া সূচিত হইবে কোন ধাতু দ্বারা? চন্দ্। এ থেকে চন্দন, চন্দ্র, চন্দ্রমা

ইত্যাদি। অবশ্য, শুদ্ধচন্দ্রের কথা হইতেছে, 'নষ্ট' চন্দ্রের নয়। এ চন্দ্রে বরুণের আপ্যায়নী এবং সোমের রঞ্জনী বৃত্তি মিলিয়াছে। বরুণসোমের সঙ্ঘাত বা সংহতি সম্ভাবিত এবং ফলিত হয়, এই 'চন্দ্' ধাতুর ক্রিয়মাণতায় এবং সম্পদ্যমানতায়। ছেদনাদি অর্থে এক 'দো' আছে। 'চন্দ্' এ ঐ 'দো' প্রবিষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে তন্নিমিত্ত অভীস্ট যে বরুণসোমসংহতি, তার সম্পদ্যমানতার বিঘাত ঘটিতেছে। যেমন, নাদ শ্রবণ করিব, কিন্তু শুনিতেছি 'চং চং চং . . .' ইত্যাকার কাটাকাটা ঝিল্লীরব। মনও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত ভাবে স্পন্দমান। 'দো' ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে বেবিষাণ এবং আপ্যায়ন যে বরুণ, তিনি অন্তর্হিত হইলেন; সোমও 'মিত্রাবরুণ' বিরহী হইয়া যেন ম্লানিমা-গ্লানিমার অবগুণ্ঠন পরিলেন! সুধা হইল প্রাকৃত সুরা। সুতরাং, 'চং' মাতৃকাকে এবং 'চন্দ্' ধাতুকে অভ্যারোহক্রমে তাদের স্বভাবে, প্রকৃতিতে 'ন্যাস' কর।—By a process of gradual sublimation মন-চকোরকে পরমমোহনিয়া রসরাজ চাঁদেরই চিরপিয়াসী কর।

'চন্দ্' আকৃতি-বিকৃতি

পক্ষান্তরে, 'চন্দ্' আকৃতিতে যদি (বাক্ প্রাণ মনঃ—এ তিনের সমন্বয়ে) বরুণকে সোমমিত্রভাবে না মিলাইতে পার, অর্থাৎ তোমার সমগ্র বিপুল অনুভূতি (Experience) কে আত্মনীন করিয়া আত্মারই নিজ নির্ব্যূঢ় অস্তিতা ভাতিতা-প্রিয়তায় উপসংহৃত না করিতে পার (যেমন বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এবং কোন কোন দার্শনিক প্রস্থানে), তা হইলেও 'অসতো মা' ইত্যাদি তোমার অভ্যারোহটি পরম অমৃতে সমাপন হইল না, পরন্তু সোমাভিষববিহীন 'বারুণী' মহামদিরাই হইয়া পড়িল। এই বারুণীপানে দৈত্যপুঙ্গবেরাও উন্মত্ত হইয়াছিল; আমরাও হইতেছি— The fatal intoxication of colossal objective knowledge divorced from the inspiring, leading light of the supreme ultimate Quest. চন্দ্র বিশ্বনরকে চন্দ্রমাবিধুর গ্লানিমায় (global lunacy) টানিয়া লইতেছে।

বর্তমান যুগে সারা ধরিত্রী এই বারুণীপানোন্মত্তা। অধ্বনীন বরুণের আপ্যায়ন আত্মনীন সোমের রঞ্জনে মিলিলে হয় 'সৌম্য'। তাতে, অধ্ব-কুশল হোক্ অন্ধা-(নিশ্চিত) কুশল। যে আপ্যায়নমন্ত্র (শান্তিপাঠ) পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাতে

অঙ্গাদি সকল বহিরঙ্গাকে আদৌ আত্মনিরত (অন্তরঙ্গা) করিয়া, অন্তে অনিরাকৃত ঔপনিষদ ব্রহ্মেই তাদের নিঃশেষ সমর্পণ। সুতরাং, যথার্থ সৌম্যসাধনের মন্ত্র এটি। অগ্নীষোমীয় সমতা ব্যতিক্রমস্থলে যেমন— 'ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমম্।' 'ঐঁ' এই বাগ্‌ভবটিও বিশেষভাবে সৌম্যসমর্থ।

বারংবার উক্ত হইয়াছে যে, দেবতারাও মৃত্যুভয় ভীত হইয়া গায়ত্রীচ্ছন্দঃকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাঁদের নিমিত্ত 'দুহানা অমৃতস্য ধারাম্' হন। বারুণীপানোন্মত্ত হইয়া যদুকুল আত্মঘাতী হইয়াছিল। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি জীবনে এইটি নিয়ত স্মরণ রাখিতে হইবে। যেখানে 'বিদ্মহে' রহিয়াছে, কিন্তু 'ধীমহি' নেই—জ্ঞান আছে, কিন্তু ধ্যান নেই—শক্তিসঞ্চয়ন আছে, কিন্তু সংযমন নেই; অর্থাৎ এক কথায়, মেধস্ এবং তপস্, এ দুয়ের অসদ্‌ভাব ঘটিলে, চাই গায়ত্রীচ্ছন্দের সেই 'বরেণ্যম্' বিবরিষু সৌম্য প্রচোদনা, যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানবিততি, প্রয়োগ-বিদ্যাবিভূতি, কারু-চারুকলা সজ্ঘতি সবই অমৃতাধ্বধাম-কুশলিনীই হয়, অনৃতাধ্বধ্বান্ত-কুহকিনী কদাপি নয়।

নাভিং বিভর্ত্তি বৈ সূর্য্যো বরুণস্তনুতে হ্যরান্।
মিমীতে চন্দ্রমা নেমিমাবরীবৃত্যতে জগৎ॥ ৬৭

ভুবনচক্রের যেটি নাভি (স্থূলে সূক্ষ্মে সর্বত্র), তাকে সূর্য পূর্বোক্তরূপে ভরণ করেন। অরসমূহকে বেবিষাণ-অধ্বনীনরূপে বিস্তার করেন বরুণ। চন্দ্রমা ভুবনচক্রের নেমিটিকে (স্থূল-সূক্ষ্মাদি সর্বক্ষেত্রেই) 'মান' দেন। সে মান সৌম্যমান। সে মানে বর্তিলে সবই স্বচ্ছন্দে বর্তিয়া থাকে। ঋতাধ্বগ যে জগৎ, সে জগৎ এবম্বিধ চক্রনেমিতেই বারম্বার আবর্তিত হইতেছে। এবম্বিধ সৌম্যমানেই (অণু বিরাট সব কিছুরই) স্থিতি-সংস্থা। অণু-জ্যোতিষ্কাদির কক্ষাবর্তন লইয়া এটি ভাবিয়া দেখ। 'নেমি'র সৌম্যমান রক্ষিত হওয়া চাই। চন্দ্রমা সেই ক্ষেম দৈবত।

জগৎ-স্বাস্থ্য—স্বস্তি-শান্তি

বরুণ কোন নাভি থেকে যখন অরসমূহ (Lines of Radiated Energy) বিস্তার করিতেছেন, ব্রহ্মের এক পরম মহীয়ান্ ছন্দঃ সেই সমন্তাৎ বিতত অরসমূহকে এক 'নেমি' নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। নাভিটিকে বলিতেছেন— 'তুমি তোমার অরগুলিকে

লইয়া এই নেমিতেই সংহত হও, আর এই নেমিতেই তোমার ব্যাপার চক্র আবর্ত্তমান হউক।' ব্রহ্মের ঐ পরম ছন্দঃটি সোম ('স ওম্')। সেই সোম নেমি-ক্ষেমঙ্করররূপে চন্দ্রমা। বরুণসোমসঙ্ঘাত এইভাবেও বুঝিও। হেঁয়ালির ভাষা নয়; ভূত-প্রাণ অধ্যাত্মাদি বিজ্ঞানের মূল কথাটিই উপরে বলা হইল। বাহিরে ভিতরে দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিও। নেমিক্ষেমকে নাভি সম্পর্কে (with reference to the Source) দেখিলে, চন্দ্রমস্; অরপরিবেশ অথবা বহিঃসংস্থা সম্পর্কে (with reference to the Enveloping order) দেখিলে, চন্দ্রমা। 'কলায়' (in phases) দেখিলে, চন্দ্র। পাদদৃষ্টিতে বরুণ, মাত্রাদৃষ্টিতে চন্দ্রমা, কলাদৃষ্টিতে চন্দ্র, এবং কাষ্ঠাদৃষ্টিতে (দুই দিকে) সূর্য-সোম। এ কথাগুলিও সর্বক্ষেত্রে ভাবিয়া দেখ। চন্দ্রমা যে স্বচ্ছন্দ মান দিতেছেন, তাতে জিহ্মগত্ব (unharmonic eccentricity) পরিহার করতঃ অনুবর্তন করিতে হইবে। সেরূপ অনুবর্তনই (সমষ্টি-ব্যষ্টি) জগৎ স্বাস্থ্য। জপে তার চক্রাদি সমাচরণ, আদৌ এই জগৎ-স্বাস্থ্যে সংস্থাপিত হওয়ার নিমিত্তই। অতএব 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। সংস্থাপিত হইলে স্বস্তি। স্বস্তির পর শান্তি। যে চক্র স্বস্তিতে আবর্তমান, সে চক্র শঙ্খাবৃত্তে পরমবিন্দু অভিমুখীনতায় চলিলে 'শান্তিপাঠ' সুরু হয়। যথা, প্রণব, গায়ত্রী, অথবা কোন বীজ বা নাম জপে ঠিক স্বস্তিতে বিন্দুলীনতায় আসিতে পারিলে হয়। আত্মনীন হইয়া বিন্দুতে 'ব্রহ্মসংস্পর্শ' অনুভব না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ শান্তি নেই। 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম জপে বা কীর্তনেও এই আত্মনীনক্রমে রসোজ্জল, অথচ পরম নিবিড় বিন্দুচেতনায় 'ডুবিতে' হয়। ভাবনিষ্ঠা সহকারে কিয়ৎকাল জপকীর্তনাদি চলিলে বহিরাপ্যায়ন (objective attuning) আন্তরাপ্যায়নে (inner attuning) সম্মিলিত হয়, এবং পরস্পরকে ভূয়োভূয়ঃ উপচিত করিয়া তোলে। এক্ষেত্রে ইহাই বরুণ-সোম সংহতি। এ সংহতির প্রসাদে উদিত হন এক অনির্বচনীয় সৌম্যরসসমুজ্জ্বল মনোগগন চন্দ্রমা। তিনি রসকে এবং ভাসকে তাদের 'মান' দান করেন। রসাভাস, মলিনরস ইত্যাদি এ মানে মর্যাদাহীন হইয়া নিরস্ত হয়. যথার্থ মানের পর সাত্ত্বিক বিকারাদি। (চন্দ্রমা বৈমুখ্যে রস-ভাসাদিতে গ্লানিমা-ম্লানিমা সম্ভাবিত হইতে পারে।) তারপরে, আরও গভীরে—আরও। শেষে, পরম-বিন্দুতে যুগপৎ পরম লসন এবং পরমা শান্তি। এসব তো 'আগে কহ'র কথন। গোড়ায় 'স্বস্তিবাচনটি' ঠিক ঠিক ভাবে-বোধে-নিষ্ঠায় করিয়া লইতে হয়।

নেমিবৃত্তা যথা পৃথ্বীং সৌম্যাং ধত্তে হি চন্দ্রমা।
বাক্‌প্রাণচিত্তসঙ্ঘাতাংস্তথৈব সন্ধধীত সঃ॥ ৬৮

সৌম্য-সাধন

ঐ পরিদৃশ্যমান চন্দ্রমা—দৈবতানুগৃহীত চন্দ্র যেমন নেমিবৃত্তিতে রহিয়া এই পৃথ্বীকে সতত সৃষ্টি-পুষ্টি সৌম্যে রাখিয়াছেন, তেমনই বিশ্বজনীন যে চন্দ্রমাতত্ত্ব, সেটি বিশ্বে বাক্-প্রাণ-চিত্তের নিখিল-সঙ্ঘাতকে সৌম্যেই সম্যক্ বর্তমান রাখুক! এতদুদ্দেশ্যে সমর্থ বৈদিক (যথা, 'ওঁ জাতবেদসে') এবং তান্ত্রিক (যথা, শ্রীঁ) এবং পৌরাণিক (যথা, 'এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্'—ইত্যাদি) মন্ত্র-যন্ত্রাদি সমাশ্রয়নীয়। [যন্ত্রে বৃত্তস্থলে বিশেষতঃ চন্দ্রমাদৈবত ভাবনা করিবে।] যদি বল—অত মন্ত্রে-যন্ত্রে কি কাজ, এক ভাবেই সকল অভাবে সদ্ভাব হইবে—তা হইলে জানিও যে চন্দ্রমাদৈবত প্রসন্নই আছেন, যদি 'ভাব'টি খাঁটি করিয়া তোমার মিলিয়া থাকে। তবে লক্ষ্য রাখিও—তোমার ভাবভাগ্যে 'লক্ষ্মী' কে—চন্দ্র, না চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা? এইটি যথার্থ নিরূপণের নিমিত্ত সেই 'পদনখ দশ ইন্দু'তে মনঃ সংলগ্ন করিবে। তিনিই তোমার ভাবাদিকে যমনস্থলে যমন (যন্ত্র), মনন স্থলে মনন (মন্ত্র), এবং তায়ন স্থলে তায়ন (তন্ত্র), এসবেই প্রচোদিত করিবেন। যদি আবার বল—এই তো উত্তম প্রস্থান, সহজ পন্থাঃ। উত্তম প্রস্থান—সন্দেহ নাই। কিন্তু সহজ পন্থা তো নয়। 'অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ' এই নামোচ্চারণভেষজে সর্বরোগ শান্তি—এতে সংশয় নাই বলিয়াও বিশাল, অতি দুরবগাহ বৈদ্যকশাস্ত্র রচিতে কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন চরক-সুশ্রুতাদি ঋষিবর্গ? ভাগবতাদি ভক্তিপীযূষ বারিধি, বাশিষ্ঠাদি-জ্ঞানবিচার মণিমঞ্জুষা—এত অপরূপ বৈচিত্র্য-বৈভব-বিপুল (সাক্ষাৎ মহারত্নাকর সদৃশ) হইলই বা কেন? 'শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি'—তবে গ্রন্থকোটি কি অকারণ প্রপঞ্চিত হইল! শ্রীমদ্ হনুমান্ 'রাম' নাম লন, তিথিবারের ধার ধারেন না; কিন্তু তবু তো তোমার—আমার জন্য 'হরিভক্তি-বিলাস!' মন্ত্র (আর সেই সঙ্গে যথোপযোগ যন্ত্র এবং তন্ত্রও) কোনও ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয় নাই। হবার নয়-ও। ভক্তির সার 'আত্মনিবেদন', কিন্তু নবধা সাধন করতঃ সে 'সার' মিলাইতে হয়। কলৌ নাম যজ্ঞাদি পরমশ্রেয়স্করূপে বিহিত; কিন্তু সে

যজ্ঞাদির মূলে যে শ্রদ্ধা-ভাব, সেটি যেমন ধারা চাই-ই, তেমনি সে যজ্ঞের মহাজনজুষ্ট 'বিদ্যা' (বিধি), এবং যেটি 'উপনিষৎ' (সিদ্ধান্ত-সাধিষ্ট আধার), সে দুটিও অনাদরণীয় নয়—একান্ত উপাদেয়। মনে রাখিতে হইবে যে—যে মনঃ কেবল আপন 'কলায়' দেখে, সুতরাং অন্যমত ও পথকে কেবল হেয়তার ম্লানিমা ও গ্লানিমায় ফেলিয়াই দেখে, সে মনঃ চন্দ্রমাদৈবতবিধুর 'চন্দ্রের' অধিকারে। চন্দ্রমা 'নিজ' এবং 'অন্য' দুয়েকেই স্ব স্ব পূর্ণমানে এবং মর্যাদায় ফুটাইবার তত্ত্ব। 'অমানী মানদ' জনকেই চন্দ্রমা দেন পূর্ণমান। সুতরাং 'জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ' চন্দ্রমাধিষ্ঠাত্রী যোগমায়াকে ভজনা কর। ['জ্যোতিঃ' শব্দের 'ইঃ' সরাইয়া 'জ্যোৎ'। ভাস্করে ঐ 'ইঃ' আকৃতি প্রকট বিষয়ে 'সূর্যো জ্যোতিঃ'। এই জ্যোতির আধার (base) 'জ্যোৎ'। এই আধার-জ্যোতিতে (basic illumination এ) যেটি 'স্নাত', সেটি 'জ্যোৎস্না'। ঐ চাঁদের মত 'ধারকরা' (borrowed) ছটা যথার্থ জ্যোৎস্না নয়।]

এই নিমিত্ত 'মাবর্জ্জং চন্দ্রমাবহ'—মা বর্জিত যে চন্দ্র, সে চন্দ্র অমানি-মর্যাদায় (আ) বহন করিও না। 'মা' এই নিষেধ আগের চরণে— 'চন্দ্রমাঃ বহতু ত্বা মা'। চন্দ্রমা তোমার শোভন-সৌম্যমানে মর্যাদায় 'আবহতু'।

সৌম্যমান ও রৌদ্রমান

সৌম্য মানে চন্দ্র, রৌদ্র মানে 'চণ্ড'। আপন অতিরৌদ্রবীর্য দ্বারা এই চণ্ড (এবং মুণ্ড) কে সংহৃত করতঃ দেবী হইলেন চামুণ্ডা। চণ্ডী, চণ্ডিকা—ব্রহ্মময়ী মহামায়ারূপেই ভাবিতা হইয়াছেন। সেভাবে তাঁতে অতিসৌম্য এবং অতিরৌদ্র—এ দুই সম্মিলিত। ইনি জগৎ-প্রতিষ্ঠা এবং জগৎকৃতি। শ্রীচণ্ডীতে যে নারায়ণীসূক্ত তাতে ইনি ব্রহ্মাণী ইত্যাদিরূপে নবধা-নমস্কৃতা। তন্মধ্যে বারাহীকে সন্ধিস্থলে রাখিয়া বিশেষতঃ সৌম্যা চতুষ্টয়ী এবং রৌদ্রী চতুষ্টয়ী বিরাজিতা। জপসাধনের দিক থেকে দেবীর সমর নাদবিজয়। মহিষাসুর যুদ্ধে এই নাদবিজয়ের নিমিত্তই দেবী বলিতেছেন— 'গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্'। মধু?—সোম বা চন্দ্রবিন্দু। ব্যাহরণে বিন্দুলীনতায় এই 'মধু' মিলাইতে হয়। ধ্যানে ইষ্টনিবিষ্টতায়। এখন, নারায়ণীসূক্তের ঐ নবধাশক্তি নমস্করণে নাদব্রহ্ম নবধা অভিবন্দিত হইয়াছেন,

ইহা ভাবিয়া দেখিও। বারাহীতে নাদের সৌম্য এবং রৌদ্র (চন্দ্র এবং চণ্ড) দুটি ভাবের সন্ধিস্থল। বারাহীতে দীর্ঘ ইকারাদি স্বরদংষ্ট্রা দ্বারা নাদ শক্তিরূপা বসুন্ধরার ভদ্র এবং উগ্র দ্বিবিধ বিজয়শৌর্য সমুদ্ধৃত হইয়াছে। বারহী-নমস্কৃতিতে 'উগ্র' এবং 'শিবে' দুটি শব্দই আছে। সাধকের নিজ নাদ অভিজ্ঞতায় 'হংস' থেকে 'শঙ্খ' পর্যন্ত ভদ্রগ্রামে, আর, সিংহনাদ থেকে চামুণ্ডার অট্ট অট্ট করালহাস্য পর্যন্ত উগ্রগ্রামে নবধা নাদ-বিজয় মিলিয়াও থাকে। পরে এ প্রসঙ্গের পুনশ্চ অনুসরণ হইবে। ফল কথা, নাদাদি সকল সাধ্যকেই কখনও 'চন্দ্র', কখনও বা 'চণ্ড' আকৃতিতে পাইতে হয়। 'দ'কার আর 'ড'কার। একটি দন্ত্যবর্গের তৃতীয়, অপরটি মূর্দ্ধন্যবর্গের। 'দন্ত' শব্দে এই তার্ত্তীয়দ্বয়ের মিলন। 'ত'বর্গে সামান্যতঃ তলবৃত্তিতা। দন্ত্যে পরিচ্ছিন্নতা। এক এক বিশেষ আকৃতিতে তলবৃত্তি পরিচ্ছিন্ন হইতেছে। 'দধ' এ দুটি বর্ণে latitude, সেটি নিজেকে longitudinally 'তুলিয়া' দেখিতে চায়। কোনও ম্যাপ যেন নিজেকে ঘুরাইয়া দেখিল। 'দধ' এতে তলের এবম্প্রকার 'দ্রাঘিম' বৃত্তিতা হইয়া থাকে। মাটিতে বীজ পুঁতিলে। সে তলবৃত্তিতায় যতক্ষণ, ততক্ষণ 'তথ'। (উচ্ছুনতার সূচনায় 'থ')। অঙ্কুরাদি উদ্‌গমে দ্রাঘিমবৃত্তিতা ('দধ')। সর্বক্ষেত্রেই এই আকৃতিদ্বয় পরীক্ষা করিও। মূর্দ্ধন্য দ্যু-দৈবত, দ্যৌস্তত্ব মূর্দ্ধায় মুখ্য। এটি ('ললাট') ধাম-মহিম্নি মিলাইবার এবং দেখাইবার স্থল। সে ধাম-মহিমা অতি-সৌম্যসুন্দর এবং অতি-রৌদ্রভয়ঙ্কর, দুইরূপেই প্রতিভাত হইতে পারে। মহাদেবের এবং মহাদেবীর 'ললাটনেত্র' ভাবনা কর।

টকারাদি মূর্দ্ধন্যবর্গের 'টং ঠং' (চন্দ্রমাবীজ) এ দুটিতে বিশেষ করিয়া সৌম্য, আর 'ডং ঢং' (ঘণ্টানাদ), এ দুয়ে রৌদ্রভাব সংস্থিত। 'ণ' বর্ণে উভয়ের মহামহিম্নি সমন্বয়। ঋ, র, য—এ তিনের পূর্বোক্ত তিনে 'সাহিত্য' অনুধাবনীয়। এতদনুসারে 'কৃষ্ণ' মহানামটি চিন্তা কর। 'দণ্ড' এই আকৃতিটিও পরীক্ষা করিও। এই এক আকৃতিতে শৌর্য, ঐশ্বর্য, প্রশাসন, সংযমন সমাহারে আসে কিনা, তা মৌলিক বিশ্লেষদৃষ্টিতে, 'মাতৃকামানে' বুঝিয়া লইও। 'দং' তলবৃত্তিতায় যে দ্রাঘিমা আনিল, 'ডং' তাকে ধামমহিমার যে অনঘ অমোঘ ঐশ্বর্য, সেই অধৃষ্য-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিল। 'দণ্ডো দময়তামহম্'। বাগ্‌দণ্ড, কায়দণ্ড এবং মনোদণ্ড—এইভাবে ত্রিদণ্ডী সাধকমাত্রকেই হইতে হয়।

চণ্ড ও মুণ্ড আকৃতি

‘চন্দ্র’ এবং ‘চণ্ড’ এ দুটি আকৃতির পরীক্ষাব্যপদেশে এই ‘মূর্দ্ধন্যধাম’ এবং ‘দণ্ড’ এর প্রসঙ্গা হইল। চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা—এ দুই তত্ত্ব (সোমরাজারূপে) যথাক্রমে চন্দ্রকে চণ্ডমানে শাসন এবং সাম বা সৌম্যমানে পালন করেন। চন্দ্র দণ্ডভয়ে উদিত, কলায় কলায় বিকশিত, অস্তমিত ইত্যাদি হইতেছে; আর, সোম রঞ্জনে স্বাধিকারে সমস্ত কিছুতে সৌম্যভাব আনিতেছে এবং রক্ষা করিতেছে। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে, চন্দ্র=মনঃ এই সমীকরণ মনে রাখিয়া মনের ‘দণ্ডমান’ কিসে, আর, সৌম্যমানই বা কিসে, তা ভালমতে প্রণিধান কর। এ দুটি মানের (Rule and Rhyme; অথবা পাল্টাইয়া—Rhyme and Reason) সমতাটিও রক্ষিত হওয়া চাই, Control and Satisfaction, এ দুয়ের। যথা, রাজনীতিতে Repression and Conciliation। সমতার ব্যতিক্রমে, মানসে অসুর-উপদ্রব। ‘দণ্ড’ অসুর-আকৃতিতে চণ্ডাসুর, আর, ‘সাম’ আসুরাকৃতিতে ‘মুণ্ড’। এই প্রকারে, অত্র প্রসঙ্গাতঃ, দৃষ্টি। প্রসঙ্গান্তরে অন্যরূপ হইতে বাধা নাই। তবে, সমস্তরূপই, সর্বপ্রসঙ্গে, তলাইয়া বুঝিতে হইবে, মাতৃকামান এবং প্রাণরসায়নে। অন্যথা যদৃচ্ছাকল্পিতার্থবশতঃ অসঙ্গাতি এবং বিসম্বাদের আশঙ্কাও আছে। অর্থাদিকল্পনাকে যথাসম্ভব মূলাশ্রয়িণী হইতে হয়, শাখা-প্রশাখা-পল্লবাশ্রয়িণী হইলে সাধিষ্ঠাশ্রয়তা নেই। [যথা, ‘মুণ্ড’ আকৃতি; ‘ম্’ অন্তিম স্পর্শবর্ণ (ওষ্ঠ্য)। প্রণবাদিতে যেমন, ‘ম্’ সোমানুগৃহীত, সৌম্য। ‘উ’ ওষ্ঠ্যস্বর, বেধমুখ্য। অনুস্বার সংযোগে, যেমন ‘হং’ ইত্যাদি বীজে, বেধের উগ্র-ঘনীভাব। —Intensification of piercing potency. ‘হুঙ্কারেণৈব ভস্মসাৎ’। বর্তমানে Atomic Bomb প্রভৃতি এই ‘হুং’ বীজের আকৃতিবিশিষ্ট। সুতরাং, ‘ম্+উং’ মূর্দ্ধন্য-তার্ত্তীয় (‘ড’) এর শাসনে যাইয়া কি বুঝাইল? যে সাম বা সৌম্যমানে (even, rhythmic measure- এ) বৃত্তি চলিতেছিল সে বৃত্তি নিজেকে অপর্যাপ্ত-বেধ-ঘনীভাবে লইয়া এক ‘সমুগ্র-যোগ’ (crisis or critical condition) সৃষ্টি করিল। এটি সাধারণ আকৃতি (Common Pranik Formula)। সুরে বা অসুরে যাইতে পারে। কালিকার মুণ্ডমালা ভাবনা করিও। এক এক মাতৃকা, অনুস্বারের সমর্থ সংযোগে ঐ মুণ্ডমালার এক এক ‘মুণ্ড’ হইবে কিনা, তাও ভাবিও। এই সূত্র স্মরণ রাখিয়া চণ্ড-মুণ্ড অসুরযুগলকে পরিচয়ে পাইতে হয়।]

শাব্দিক ও রৈখিক আকৃতি

ইহাও দেখিবে যে, দণ্ডমুণ্ডাদি প্রতিটি শাব্দিক আকৃতির নিজ নিজ 'লেখ' বা রৈখিক আকৃতি (natural graph) অবশ্য আছে। ঐ সব স্বাভাবিক লেখ বস্তুর যেটি 'হৃল্লেখা', সেটিকে 'মর্ম্মৌকঃ' স্থলে রাখিয়াই ব্যক্তিমাপন্ন হইয়া থাকে। হৃল্লেখা কালসম্বন্ধে আসিয়া হৃদয়লেখা, এবং বিশেষতঃ দেশ-সম্বন্ধে আসিয়া রূপ-বর্ণ-লেখা হয়। এ পর্যন্ত লেখের স্বাভাবিকতার ব্যত্যয় ঘটে না। তারপর, যত্তন্নিমিত্তাবচ্ছিন্ন হইয়া ব্যূঢ়ভাবে (subject to conditionality) কায়চিত্র, ছায়াচিত্র, মায়াচিত্রাদি স্বভাবচ্যুতি-বিজৃম্ভিততায় পতিত হয়। এ সব বিকৃতিস্থলে আপতিত লেখটিকে স্বভাবশুদ্ধিতে বা প্রকৃতিতে লইতে হয়। বাক্‌শুদ্ধি, ভাবশুদ্ধি এবম্বিধ লেখশুদ্ধির উপেক্ষায় সম্ভাবিত হয় না। পূর্বে গায়ত্রীর লেখটি শুদ্ধ আকৃতিতে পাইতে যত্ন হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য কর যে—ওঙ্কার, 'কখ' ইত্যাদি বর্ণমালার যে লেখরূপ আমরা পাইতেছি, তাদের হৃল্লেখানুরূপা শুদ্ধ আকৃতি কোথায়, কিভাবে মিলাইবে? পশ্যন্তী দৃষ্টিতে না যাইলে যথার্থতঃ মিলিবে না। সুরভাষা এবং সুরলিপি সেই পশ্যন্তী-আদর্শে বাকের ও লিপির যথাসম্ভব নৈকটিক 'অনুবাদ' এবং 'অনুকৃতি'। ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির ঐতিহ্য এবং বিবর্তন—এ দুয়ের অনুসরণ ঐ পশ্যন্তী-প্রদীপচ্ছটায় না করিতে পারিলে মূলের এবং কাণ্ডের সন্ধানাবরোধিকা 'তমসা', গহনতরাই হইতে থাকিবে। মানবের বিভিন্ন বাণী বিশ্লেষে ঐ তমসাকে মায়াবিনী হইতে দেখা গিয়াছে। বিচিত্রলিপি পরিচয়েও সে কম বিভ্রম কুশলিনী হয় নাই। প্রস্তর যুগের মানবেরও লেখচিত্র মিলিয়াছে। কিন্তু এ সবের মূল কোথায়, আদর্শ-আকৃতিটি কি? এসবের যথার্থ উত্তর কি শুধুই পতিত, বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত শুষ্ক পল্লবগ্রাহিণী-তুলনায় মিলিবে (by merely collecting and comparing dead, broken bits)?

যথার্থটি কিরূপে মিলিবে?

চন্দ্রমাই প্রতিটি বস্তুকে তার হৃল্লেখা অথবা 'নাভি', তার আপন শক্তিবিন্যাস-লেখ অথবা 'অর'-এ দুয়েরই সম্পর্কে সমগ্র, স্বাভাবিক 'নেমি' মানে দেখাইতে সমর্থ। এ 'চন্দ্রমা' ভাষা-লেখাদি বিজ্ঞানে কবে সমুদিত হইবেন? নরের বুদ্ধি 'বরেণ্যং ভর্গসে'র ধ্যানে প্রচোদিত হইয়া একাধারে সর্ববিতানব্যাপিনী এবং সর্বগূহনগামিনী না

হওয়া পর্যন্ত চন্দ্রমস্ এবং চন্দ্রমাতত্ত্বযুগল স্বচ্ছন্দ-সমুদিত হইবেন না। অর্থাৎ, বরুণসোম সংহতি না হওয়া পর্যন্ত। গায়ত্রীব্যাহরণ (এবং অনুধ্যান) লেখে এটি নাদ-বিন্দু-মর্যাদায় সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উদয় থেকে 'বরেণ্যম্' অবধি নাদব্রহ্মের অনুলোমাবৃত্তি (অপান); শেষের তিন পাদে বিলোমা (প্রাণ)। বিন্দু থেকে 'অপৈতি', এবং বিন্দুতেই পুনশ্চ 'প্রাণিতি'। 'অন' এবং 'অণ' দুটি ধাতু চিন্তনীয়। এ দুয়ের সমতায় সাধনে বুদ্ধির জ্যোতিঃ এবং রস এতদুভয়েই সৌম্যমানে 'প্রচোদন'। তদ্রূপে প্রচোদিত হইলে মানববমনঃ (চন্দ্র) 'মাবর্জ্জং' (সৌম্যমানবর্জিত) হইয়া রহিবে না। বরুণ-সোম-সংহতিতে বাক্-প্রাণ-চিত্ত সঙ্ঘাতটি সংস্থিত রহিবে। এটি পূর্বেই বহুধা ভাবিত হইয়াছে। প্রাণপাদে প্রাণাপানাদি সার্বভূমিক প্রেক্ষাধারে বিবেচিত হইয়াছে।

মণি-কাঞ্চন-সংযোগ

প্রাণাপানাদিবৃত্তীনামরা বিন্দৌ সমর্পিতাঃ।
রসে শূন্যে চ পূর্ণে চ চন্দ্রমা পারদস্ততঃ॥ ৬৯
হিরণ্যমুদয়ে রেতো মাণিক্যং পরমং লয়ে।
মণিকাঞ্চনলৌল্যং চেন্মণৌ যোজয় কাঞ্চনম্॥ ৭০

বিন্দু স্বয়ং রস, এবং একাধারে শূন্য এবং পূর্ণ। (পূর্ণ থেকে 'প', শূন্য থেকে 'অ', এবং রস থেকে 'র' আহরণ করিলে হয় 'পার'। নাদাদি নিখিল সন্ধানের 'পার' বিন্দু।) আবার, প্রাণাপানাদি সকল বৃত্তির 'অর'-সমূহ কোথায় শেষ-সমর্পিত? বিন্দুতে। কাজেই, সে ভাবেও বিন্দু—পার। সৌম্যমানসহকারে চন্দ্রমা তত্ত্বকে সমাশ্রয় করিলে ঐ 'পারে' যাওয়া যায়; অতএব চন্দ্রমা=পার-দ। এখন, চন্দ্রমারূপী পারদ, যদি হিরণ্যরেতাঃ নাদ-সবিতা আকারে সমুদিত হন, তবেই পারদ হইলেন যথার্থ হিরণ্য। আর, সেই পারদ যদি বিলোমে বা লয়ে, বিন্দুব্রহ্মে বা রসেশ্বরে যে পার, সেই পার তত্ত্বতঃ মিলাইয়া দেন, তবে কি হয়? সে হিরণ্য (ভাস্কর) এবং পারদ (চন্দ্রমা) উভয়ে মিলিত হইয়া হন—পরম-মাণিক্য। অতএব, হে সাধক! তোমার যদি মণিকাঞ্চনলৌল্য থাকে ত', বিন্দুরূপ মধ্যমণিতে নাদরূপ হিরণ্যসূত্র সযত্নে যোজনা কর।

চন্দ্রমাদিকতত্ত্বানি স্বানুবন্ধেন যোজয়।
স্বস্মিন্ যচ্চ তদন্যত্র ন স্বস্মিংশ্চেন্ ন তৎ ক্বচিৎ॥৭১

পারদ-চন্দ্রমাদি সর্ব তত্ত্বই স্বীয় অনুবন্ধে যোজনা কর। এবং প্রকারে স্বযোজনাতেই সর্বযোজনা। 'স্ব' এই পরমরহস্যে যাহা আছে, তাহাই অন্যত্র আছে; এবং 'স্ব' তে যদি কোন কিছু না থাকে ত', তাহা অপর কোথাও নাই। এই নিমিত্ত, চন্দ্র-সূর্য, বরুণ-সোম, গ্রহ-নক্ষত্র, অয়ন-চরণ, তিথি-বার-যোগাদি সমস্ত কিছুই 'স্ব'তে যোজনা করতঃ স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত হও। সূর্য এবং চন্দ্রমা সম্পর্কে প্রসজ্যমান বিষয়বস্তুগুলি যথাসম্ভব অধ্যাত্মসাধনানুবন্ধে সবিস্তার আলোচিত হইল। আশা করা যায়—সাধনসৌকর্যসরণিতে এতদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ সহায়ক রশ্মিসম্পাত হইবে।

মনের ব্যবহারদৃষ্টি। চন্দ্র ও মনঃ

মনে রাখিতে হইবে যে, তত্ত্ব স্বরূপতঃ সমগ্র এবং অবিভাজ্য। তত্ত্বের ভানও তদ্রূপ। পূর্বোক্ত মর্শপঞ্চকনিবন্ধন তত্ত্বসম্বন্ধে ভাসপঞ্চক হইয়া থাকে। তত্ত্ব সম্বন্ধে physical or metaphysical, positive or mystic-এ সমস্ত বিভেদ তত্ত্বভানে নাই, ভাসপঞ্চকে আসিয়া আছে। যথা, বাহ্য ('out-door') এবং আন্তর ('in-door') দৃষ্টি ভেদ। বহিঃ-অন্তঃ উভয়ক্ষেত্রেই সমগ্রভানকে (given whole of experience-কে) অংশতঃ, খণ্ডশঃ (টুকরা করিয়া) ব্যবহারে পাইতে হয়। এটি বিশেষ করিয়া মনের কাজ। মনের যে ব্যবহার দৃষ্টি, সে দৃষ্টি অংশ-কলা-খণ্ড-দৃষ্টি। এ মনস্তত্ত্ব কেবল নরে আছে, এমন নয়। ইহা সৃষ্টির সর্বভূমিতে প্রসজ্যমান তত্ত্ব—cosmically relevant principle। সঙ্কল্প এবং মানসসৃষ্টিই সৃষ্টির আদিম পর্যায়। সৃষ্টজীবেও তাই। জীবের 'আপন' জগৎ তার 'আপন' চিত্ত-স্পন্দ। বিরাট জগৎও বিরাট চিত্ত-স্পন্দ। সুতরাং ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্র অথবা এই নগণ্য ধূলিরেণু—এ দু'য়ের কোনটাই চিত্ত-স্পন্দ নিরপেক্ষ 'অ-মানস' পদার্থ নয়। এখন, সমগ্রভানকে অংশে, খণ্ডে, কলায় ব্যবহারে লওয়ার তত্ত্ব যেমন মনঃ, তেমনি সেটি, রহস্যভাষায়, চন্দ্র। 'ঐ' চন্দ্র থেকে এ তত্ত্বের আভাসমাত্র পাও,

কিন্তু তার সঙ্গে সমীকরণ করিয়া 'বাস্' বলিও না। কিন্তু 'নাল্পে সুখম্'। মনের যেটা মামুলি কর্ম, সে কর্মটি সেভাবে চলিলে তো বিশ্বই 'চুরমার' হইয়া থাকে, তার অংশতঃ, খণ্ডশঃ গ্রহণ এবং বোধও সম্ভাবিত হয় না। বিশ্ব এবং তার বোধ, এ দুয়ের নিমিত্তই কি আবশ্যক হয়? কোন এক অখণ্ড সামান্যাধার 'পাতিয়া' দিতে হয়, আর বলিতে হয়—'তোমার সব খণ্ড খণ্ড 'লেখ' এতেই স্বচ্ছন্দে ছকিয়া যাও। তোমায় যে আধারপট মেলিয়া দিয়াছি, সেটি ঐ মহাকাশের মতই বেবিষাণ এবং অধ্বনীন (অর্থাৎ, সমস্ত কিছুকেই স্বচ্ছন্দে আপন অধ্বগামী হবার পক্ষে সাধিষ্ঠ)।' এরূপ এক আধার অবশ্যই চাই (যেমন ঐ অগণিত জ্যোতিষ্কপুঞ্জের, অথবা অণু-পরমাণুর) কি বহিঃ কি অন্তঃ সকল স্বল্প, সকল পরিচ্ছিন্ন, সকল খণ্ডিতেরই। ভাবিয়া দেখ—বহির্বিজ্ঞানে এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে, সর্বত্র। এই গেল এক। অপর একটিরও প্রয়োজন হয়। ছন্দোবিধায়ক, ছন্দোগ কোন তত্ত্ব। যেটি সব কিছুকে পাদে মাত্রায়, কলায় কাষ্ঠায় লইবে—A principle of co-ordination, synthesis, unification. এর কাষ্ঠা বা পরিসীমা কোথায়? সেই মহাসমন্বয়ী এবং পরম সমন্বয়ী ছন্দঃসৌষ্ঠবে। এক কথায়, মহা এবং পরম সৌম্যে। পরমে অখণ্ড-পূর্ণ-জ্যোতীরস।

পুনশ্চ বরুণ ও সোম পরিচয়

এই তত্ত্বদুটিকে বরুণ এবং সোম—এ দুই রহস্য পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে, তা আর বলিতে হইবে কি? এ তত্ত্বযুগলের 'সংহতি' হইলে কি হয়? চন্দ্র বা সাধারণ মনঃ আর শুধু তাই থাকে না, হয়—চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা। এক জ্যোতির্বিশাল অধ্বগ (নাদমুখীন) মানস; আর এক রসনিবিড় ছন্দোগ (বিন্দুমুখীন) মানস। দুয়ে সাধনে যথাযথ মিলিলে, ধামগ। (শক্তিলেখ, গায়ত্রীলেখাদি কতিপয় মূললেখ, বিশ্বহৃল্লেখ-প্রতিকৃতি পরীক্ষা করতঃ এই ধামগামিত্ব সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে।) এটি লক্ষ্য কর যে, চন্দ্রমাদি ত্রিবর্গের যে চন্দ্র, তাতে স্বতঃ কোনরূপ 'কলঙ্ক' বা অপকর্ষ কালিমা নেই। অংশে, খণ্ডে, ভাগে, কলায় না দেখিলে তো পূরা দেখাও হয় না, কোনরূপ ব্যবহার নিষ্পত্তিও হয় না। চন্দ্রকলার নিমেষ-উন্মেষের মত মনঃ-মননেরও সমস্ত কিছুকেই 'ভাঁজ খুলিয়া, আর ভাঁজ করিয়া' আপন পরিচয়ের রঙে রঞ্জিত করা চাই,

আপন ব্যবহারের চিহ্নে 'চিহ্নিত' করা চাই। সোম (চন্দ্র) এভাবে রঞ্জক ও রজক দুই-ই। ডাইং, ক্লিনিং, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাতে আপন মার্কা মারা. এ তিন কর্মের মধ্যে ক্লিনিংটি আসল; কিন্তু সেটি সুষ্ঠুভাবে হইবে কিসে? 'চন্দ্রমস্' যে ভর্গো-রশ্মি, তদ্দ্বারা। আর রঞ্জনটিও শোভনভাবে হইতে চাই—চন্দ্রমা (পারদ)। এতে মনন দিয়া দেখ। প্রাণরসায়নশালায় বিশ্লেষণ-বিভাজন বিশারদ এই মনস্তত্ত্ব। একে 'বিদায়' দিলে তো রসায়নশালার দ্বারই রুদ্ধ। কিন্তু মনোযোগকে বুদ্ধিযোগে না তুলিয়া লওয়া পর্যন্ত 'সত্যস্য মুখং' অপাবৃত হয় না। অখণ্ড জ্যোতীরস বা ভূমার আভাস অবভাসাদি মেলে না। এই নিমিত্ত, চন্দ্রমাকে 'ত্রিদেব' আকৃতিতেই ভজনা করিতে হইবে। 'মস্' (বরুণবর্চ্চস্) এবং 'মা' (সোমমান), এ দুয়ের সঙ্গে 'অসংহত' (বিযুক্ত-বিমুখীন) যে চন্দ্র, সে চন্দ্র ভজনীয় নয়। কিন্তু ভজনীয় না হইলেও ভাবনীয় তত্ত্ব।

ভজনীয় ও ভাবনীয় তত্ত্ব

দিগম্বরঃ স্বভাসা যঃ সিতাম্বরঃ স ভর্গসা।
পীতাম্বরস্ত্বিষা সৌম্যঃ কলঙ্ককালিমা কুতঃ॥ ৭২

কেন যে ভাবনীয়, তা এইভাবে ভাবিয়া দেখ। যিনি স্বরূপ-জ্যোতিতে (স্বভাসা) নির্লেপ, শুদ্ধ, নিরঞ্জন (দিগম্বরঃ), তিনি অবিদ্যা-মলশুদ্ধিকৃৎ ভর্গঃকে আশ্রয় করতঃ শুক্লাম্বর (সিতাম্বর) হইলেন। আপন ভর্গসা (ভর্গরশ্মিতে) নিখিল-মল ক্ষালন করিয়া তিনি সর্বসত্ত্বাদি শুচিশুভ্রতায় ফুটাইয়া লন। ভর্গসের 'অস্' ভাগান্ত ইনি চন্দ্রমস্। আর, যদি ভাবানুরাগের শোভন, সৌম্যরাগে পীতাম্বর পরাইবে আপন নিতুই রস-উদাসী মনুয়ারে, তবে রাকা-চন্দ্রমা তিলক ভালে যোগমায়াকে ভজনা কর। তিনি 'জগদ্বীজাঙ্কুরাকৃতি' যে ঐন্দবীকলা, সে কলাকে 'অমা' (বীজরূপ বিন্দুগাঢ়তায়) এবং 'পূর্ণিমা' (শারদোৎফুল্লমল্লিকা রূপ নাদপূর্ণতায়)—এই দুই পরিসীমাতেই ফুটাইয়া লইবেন। রসপক্ষে 'অমা'কে প্রমুদিত-রাস কমলরূপেও চিন্তা করিবে। ব্যাহরণে বিন্দুমেরু এবং নাদমেরু। জ্ঞানকর্মাদিতে পূর্ণোদয় বা পূর্ণ খ্যাতি, এবং পূর্ণ বিলয় বা উপরম ভাবনা করিও। এবম্ভূত উদীয়মানা এবং বিলীয়মানা যে ঐন্দবীকলা, তাতে 'কলঙ্ককালিমা কুতঃ'?

ক্ষয়িষ্ণবঃ কলা যাশ্চ যাশ্চ গ্রস্তাঃ কলঙ্কিতাঃ।
বিপর্য্যস্তা বিলুপ্তা বা চান্দ্র্যস্তা নৈন্দবী কলা॥ ৭৩

ভিতরে অথবা বাহিরে যে সমস্ত কলা (aspects, partials) ক্ষয়িষ্ণু, গ্রস্ত, কলঙ্কিত, বিপর্যস্ত অথবা বিলুপ্ত হইয়া থাকে বা হইতে পারে, সে সব কলাকে 'চান্দ্রী'কলা বলিতে পার, কিন্তু উক্ত পঞ্চ-অপহ্নুতিবিরহিতা যে ঐন্দ্রবীকলা, তার সঙ্গে 'এক' মনে করিও না। (ঐন্দবীকলা একবচনে বলা হইল কেন, তাও চিন্তা করিও)। ঐ যে পঞ্চ অপহ্নবের কথা বলা হইল, লক্ষ্য কর যে—কেবল ঐ চাঁদে নয়, সচরাচর ব্যাপারী যে মনঃ, তাতেও ঐগুলি সম্ভাবিত। জপসাধনে প্রণবাদির 'পঞ্চমাত্রা' দ্বারা ঐ পঞ্চ অপহ্নব যথাক্রমে পরিহার কর। যথা—অকারে ক্ষয়িষ্ণু, উকারে গ্রস্ত, মকারে কলঙ্কিত, নাদে বিপর্যস্ত এবং বিন্দুতে বিলুপ্ত—এসবের আশঙ্কা নিবারিত কর।

চন্দ্র (মনঃ) যা কিছু রঞ্জিত-রূপায়িত করে, সে সবেই ঐ গ্রস্ত বিপর্যস্তাদির সম্ভাবনা থাকেই। কিন্তু ঐন্দবীকলার যে ভাস—রাগকুশলিনী 'চন্দ্রিকা', সে তো অঘটনঘটন পটীয়সী! তাই—

দধতি মধুলিহশ্চেৎ পুষ্পকোষে পরাগান্
জহতি কিমুত কার্ষ্ণ্যং রেণুরাগানুলিপ্তাঃ।
দদতি কিমুপলং বাহপ্যুৎপলত্বং ময়ূখা
অঘটনঘটনীয়ং চন্দ্রিমা চৈন্দবী যা॥ ৭৪

মধুকরনিকর মধুলোভে পুষ্পকোষে প্রবেশ করিয়া শ্বেতপীতরক্তাদি পরাগ-রেণুরাগে যৎকালে অনুলিপ্ত হয়, তখন তারা আপন 'মিশকালো' যে রূপ (কার্ষ্ণ্যং), সে রূপ কি ত্যাগ করে? সংশয়ে, প্রশ্নে 'কিমুত'। আবার, সৈকততটে পতিত যে স্ফটিক উপল, তাকে বালারুণাদির ময়ূখ কি সত্যই পদ্ম (উৎপল) অথবা পদ্মরাগ-মণির যে নিজস্ব মঞ্জুশ্রী, সেটি দান করে? এ সকল আধ্যাসিক, আভাসিক ইত্যাদি উপমায় মনে হয় যেন—এ সবই তো অঘটন! অঘটন ঘটে কি প্রকারে? কিন্তু জানিও যে—অঘটনঘটনী কোন পরমাশ্চর্যশক্তি (যোগমায়া) আছেন, যিনি আপন ঐন্দবী

কলার যে চমৎকারিণী চারুচন্দ্রিকা, তার পরম বিস্ময়কর কুহকে সব কিছুর শুভ্রভাস্বর মহিম্নি নিরঞ্জন, এবং মঞ্জুলোজ্জ্বলরাগে রঞ্জন-এ দুটি অঘটনই সংঘটন করেন। অতএব, ঐন্দবীকলায় প্রপন্ন হও।

আবার 'চন্দ্র' থেকে 'চ' আহরণ করিয়া 'চকোর' এবং 'চাতক'—মনের দুটি ভাব ভাবনা কর। এ দুটি ভাবেও অঘটন ঘটনাটি মিলাইতে হইবে—ঐন্দবীকলাপীযূষপ্লাবনে নিষ্ণাত হইয়া।

নভসি জলমুচা চেৎ পৌর্ণমাসী পরাস্তা
স্পৃশতি কিমু চকোরং সোমপীযূষলেশঃ
বিলসতি বিধুবিম্বে চাতকঃ ক্বাতিতৃষ্ণঃ
পিবতু বিগলদিন্দৌ চাতকো বা চকোরঃ॥ ৭৫

গগনে ঘোরঘনঘটায় যদি শারদপৌর্ণমাসীও অপাস্তা আর পরাস্তা হয়, তবে বল দেখি— সুধাপিয়াসী যে চকোর, তাকে কে সোমপীযূষরাশিপরশলেশটুকুও দিয়া যায়? ওদিকে আবার, বিমল অম্বরে বিধুবিম্ব স্নিগ্ধপেলব বিলাসে বিকশিত হইলে অতিতৃষ্ণাতুর (কাজেই, দিবসযামিনীর বিচার নেই) যে চাতক, সে থাকে কোন দশায় (ক্ব)? কাজেই চকোর-চাতকের একসাথে তৃষ্ণাতর্পণ ঘটে কিরূপে? এক উপায়—ঐ যে ঐন্দবী কলা, তাকে বিগলিত পীযুষ-ঘন আকারে সমুদিত হইতে দাও। সে বিগলিত অমিয়জলধর একসঙ্গেই চাতক-চকোরের পিয়াস জুড়াইবে।

ব্যাপ্তি ও অবাপ্তি

হেঁয়ালিরা ভাষা? কিন্তু অনেক অনুবন্ধে বুঝিয়া লইবে।—যেমন চাতকের জলধর=নাদ; চকোরের পূর্ণেন্দু=বিন্দু। মন-চাতক তাতল দীঘল নিদাঘে তার বুক-ফাটা 'ফটীক জল' ডাকে চায় সেই বিপুল ঘন বরষায়, যাকে কবি এই সেদিনও এমন অপরূপ রূপায়িত সুরায়িত করিয়া গেলেন! মন-চকোর কার পিয়াসী? রস-মাধুরী নিবিড় যে অমিয়বন্দু, যে নিগূঢ়নিহিত পীযূষকণা, তারই একান্ত মরমী (যেমন, কুসুমকোরককে মধুপ) আস্বাদনে। মনের এই চাতকানুগা এবং চকোরানুগা বৃত্তি দুটিকে কেবল রসের ভূমিতেই নয়, পরন্তু জ্ঞানাদি সকল ভূমিতেই অনুসরণ

করিবে। নাদের সীমাহীন ব্যাপ্তি, বিন্দুর অবশেষহীন অবাপ্তি—এই দুই কাষ্ঠার মাঝেই বিশ্বের যাবতীয় 'ব্যস্তের' সমস্তীকরণ ঘটিতেছে। ব্যাপ্তি আর অব্যাপ্তি, এ দুয়ে মিলিবে বলিয়াই না সকল প্রেরণা, সকল প্রবৃত্তি, সকল প্রয়াস! বীজ বীজরূপেই চুপ করিয়া থাকে না কেন? কেনই বা অঙ্কুর, কেনই বা প্ররোহাদিক্রমে তার বিরামহীন ব্যাপ্তি? সে পুষ্পিত, ফলিত হইয়া আবার অভিনব বীজটি হইবে—এই অবাপ্তির নিমিত্ত? কিন্তু এ অবাপ্তিতেও যে অব্যাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি দুই-ই রহিয়া যায়! তাই আবারও বীজাঙ্কুরাকৃতিতে জগৎ চলিতে থাকে। ব্যাপ্তি কোথায় যাইয়া বলিবে—'এই তো আমার সমগ্র ব্যাপ্তি হইল (পূর্ণ), অবশেষ আর একটুকুও নাই (শূন্য)?' সেই পূর্ণ-শূন্যের একত্র হবার ঠাঁই—বিন্দু। সুতরাং তোমার জীবনে-সাধনে 'নাদ'কে লইয়া 'বিন্দু'তে মিলাও। বিপুলে-নিবিড়ে, মহানে-ঘনে, প্রচুরে-নিগূঢ়ে সম্মিলন হোক! চাতক চায় মেঘ=নাদ; চকোর চায় সোম=বিন্দু। এ-দুটিকে সেই বেদমন্ত্রের—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' করিতে হইবে। ঐ মন্ত্রের শেষের চরণটিও নাদ-বিন্দুপক্ষে বুঝিয়া লইবে। নাদ যখন বিন্দুমুখীন হয়, তখনই "স্বাদ্বত্তি"—সে হয় স্বাদু-ভুঞ্জান। আর বিন্দুলীন হইলে 'অনশ্নন্' ইত্যাদি। 'সাটে' কথাটা বলা হইল। গায়ত্রীতে (ত্রিপদী) প্রথমপাদে 'ভূঃ', শেষ পাদে 'স্বঃ', এবং মধ্য পাদে 'ভুবঃ' 'অধিকারে' বিদ্যমান। ভাবিয়া দেখ। 'বরেণ্যম্' বলেন—'এই', 'যো নঃ' বলেন—'সেই'। আর, 'ধীমহি' কি বলেন? ভুবঃ বায়ুদৈবত।—Dynamic, Functional, অন্তিম-পাদের (ঐ ত্রিপদীর) যে স্বঃ, তিনি সূর্যদৈবত বটে, কিন্তু সোম সম্মুখীন হইয়া 'স্বাদু'। 'ভূঃ' তে অগ্নিদৈবত, তিনি 'স্বাহা'রূপে এস্থলে আসিয়া অতঃপর 'স্বধা'তে মিলিতেছেন। এই 'স্বধা'র 'স্ব'কে অদন করেন, তাই 'স্বঃ' হন 'স্বাদু'। স্বয়ং আস্বাদ্য-আস্বাদক, তাই 'স্বাদ্বত্তি'; এ কথাগুলোও 'সাটে' হইল। এও লক্ষ্য কর যে, বেদমন্ত্র 'স্বাদু'ই বলিয়াছেন, কটু-তিক্ত-কষায়াদির প্রসঙ্গ লক্ষণায় পাইয়া অপর অর্থ করিবে কর, কিন্তু সাধনরহস্যের স্বানুবন্ধ্যোপযোগী অর্থে অবহিত হইতে হইবে।

ধত্তে স্বমিতি সর্ব্বস্বং বিন্দুশক্তিঃ স্বধা ততঃ।
স্বাদুদেতি স্বরব্রহ্ম স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ৭৬

'স্বং' কিনা, সব কিছুর সার সর্বস্ব আপন (একত্র শূন্য-পূর্ণতায়) ধারণ করেন, তাই বিন্দুশক্তিই তত্ত্বতঃ স্বধা। এই বিন্দুরূপ পরম 'স্ব' থেকে স্বর-ব্রহ্ম (নাদ) উদিত হইয়া পদে পদে স্বাদু হইয়া আবার বিন্দুতেই মগ্নলীন হন। (সঙ্গীতের অনুবন্ধেও এই তত্ত্ব ভাবনা করিবে। মধ্যমার 'অব্যক্ত' স্ফোট থেকে (অর্থাৎ, 'স্ব') স্বরব্রহ্ম আদৌ 'সা'রূপে সমুদিত হইতেছেন, ইত্যাদি।)

এই যে 'স্বাদু' তাতে তোমার চাতক-চকোররূপ 'দ্বা সুপর্ণা' কে 'সযুজা সখায়া' করিয়া লইতে হইবে। কিরূপে?

বরুণস্তর্পয়ত্যেকং সোমশ্চাপরমিত্যতঃ
বরুণসোমসংহত্যা তৃপ্যতঃ সযুজৌ হি তৌ॥ ৭৭

বরুণ চাতকের আর সোম চকোরের তৃপ্তি-বিধান করেন; এই নিমিত্ত বরুণসোমসংহতি যে চন্দ্রমা (অস্‌ভাগান্ত অনভাগান্ত এবং আকারান্ত), তিনি ঐ সংযুক্ত যুগলেরই তর্পণ করেন।

রেণু ও বিন্দু

ধর, কোন ফুল বা ফসলের (ওষধি) বীজ পুঁতিলে। বরুণ জলদাদির অপ্ রূপে এবং সোম শিশিরাদিরূপে সে বীজটিকে লালন ও পোষণ করা চাই 'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ')। স্থূল দৃষ্টান্ত, কিন্তু সূক্ষ্ম ও ব্যাপক করিয়া বুঝিবে। ওষধিতে বরুণ সোমসংহতিটি বিস্পষ্ট আকৃতিতে ফুটিয়াছে। এই নিমিত্ত ওষধি চন্দ্রমাবর্গীয়া। স্বধা ওষধিতে, কেবল সত্তাশক্তিতে নয়, পরন্তু স্বরাকৃতিতেও প্রবিষ্ট. 'ব' 'ও' হইয়া আদিতে; 'স' মুর্দ্ধন্য; আর, 'ধা' গতি বা ঋচ্ছতিরূপ পাইয়া হইল 'ধি'। স্বধার এবম্প্রকার ওষধিরূপে যে বিবর্তন, তাতে বরুণসোমসংহতি নিষ্পন্ন যে চন্দ্রমা, তার সমাচারটি দেওয়া আছে। 'স্ব'তে সোমবরুণ অন্যোন্য সম্পুটে সম্মিলিত। 'ব' প্রথমে 'উ' পরে (প্রণবের) আদি স্বর যে 'অ', তাতে মিলিয়া হইল 'ও' (যথা প্রণবে)। আদি স্বর আধার স্বর। তাকে ছাড়িয়া কেহই নেই। 'ও' অগ্রে আসাতে 'স' গেল মূর্দ্ধায় ('উষস্' আকৃতিটিও এই প্রসঙ্গে পরীক্ষণীয়)। 'ও'তে শক্তি ব্যাপিকা (as continuum); সে শক্তিতে সমস্ত কিছুর 'লালন' হয় (যথা, বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত জলীয় বাষ্প, ইত্যাদি)। কিন্তু শক্তিকে 'রেণু' রূপে (as quantum বা corpuscle) পাওয়া চাই পোষণের জন্য। (ঐ দৃষ্টান্তে ইহা মিলে moisture, dew ইত্যাদি রূপে।) 'মূর্দ্ধন্য' হইয়া 'প্রপাতন' (incidence) আবশ্যক করে শক্তিকে রেণুরূপে আসিতে। সমন্তাৎ সিঞ্চিত শক্তি ('স'কার) এমন কোন 'ধাম'এ উৎসারিত হইবে, যেখান হইতে সে রেণু বিকিরণ রূপে ফিরিয়া আসিতে পারে। বিশ্বে নানা স্তরে এই রেণুকরণ এবং বিকিরণ 'ধাম'টি বিন্যস্ত আছে। সে ধাম সমূহের সাধারণ সংজ্ঞা 'ষ'। এই 'ষ'কে মূর্দ্ধন্য করিয়াই উচ্চারণ করা আবশ্যক। যথা কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, ঋষভ, বৃষভ উষস্, ওষধি, ঔষধ, ভেষজ—ইত্যাদি শব্দে পরাবরভাবে যে মূর্দ্ধন্যধামের শাক্তী আকৃতি রহিয়াছে, তাদের শক্তিমান যথাযথ রক্ষা করিয়াই উচ্চারণাদি করা উচিত। প্রথম নামটিতে মূর্দ্ধন্যধামের পরিসীমা (তিন মূর্দ্ধন্য সম্মিলন)। ঐ পর বা পরমভূমি থেকে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধন্য ধাম পরম্পরাক্রমে অবরতায় অবতরণ করিয়াছে। অবর কোন মূর্দ্ধন্যস্তরে সিঞ্চিত শক্তি প্রপাতন (incidence) ঘটিলে যে রেণুরূপ প্রতিফলন (reflection) হয়, তাতে অবক্ষেপণাদি (refraction ইত্যাদি) ন্যূনাধিক সম্ভাবিত হয়ই। কিন্তু পরম মূর্দ্ধন্য এই 'অব' বা 'অপ' সম্ভাবনা 'শূন্য'; সুতরাং, সেখানে যাহা যাইবে তাহা পুরা (পূর্ণ)-ই যাইবে, আর সেখান থেকে যাহা আসিবে তাহা পুরাই আসিবে। অন্যত্র 'রেণু', এখানে, বিন্দু—শূন্য পূর্ণ একত্র। এই বিন্দু পর্যন্ত না গেলে কোন তত্ত্বকেই যথার্থ 'তত্ত্বে' (হানোপাদানশূন্য এবং পূর্ণ) রূপে মেলাবার সম্ভাবনা হয় না।

দৃষ্টান্ত

বাহিরের জল, বায়ু ইত্যাদি, অথবা মনের কোন ভাব ইত্যাদিকে তত্ত্বতঃ জানিতে ও পাইতে কেবল রেণুরূপতায় যাইলেই হইবে না। আধুনিক বিজ্ঞান রেণুধারা ক্রমে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বিন্দু বহুদূর। রেণুকে ঊর্মি, ঊর্মিকে আবার রেণু—এইভাবে পরোবরীয়ান্ ক্রমে বিন্দুধামের খোঁজ হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ রীতিতে যে খোঁজ (theoretical investigation), তাতে অব্যবস্থার (regressus ad infinitum) আশঙ্কা কাটে কি করিয়া? আবশ্যক—তোমার বাহ্য অথবা আন্তর ঊর্মিকে

(স্পন্দকে) এমন কোন ‘ধামে’ স্পর্শ দাও, যেখানে সে তার বিক্ষিপ্ত রেণু-বিকিরণরূপতা পরিহার-পূর্বক স্বচ্ছন্দে সংক্ষিপ্ত বিন্দুপূর্ণতায় সমাহৃত হইতে পারে। এক কথায়, ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি—সেই জপের লক্ষণ। ধর, ‘ও’ = কোন উর্মি বা স্পন্দবিতান। এটিকে ‘ম’তে এক অন্তিম স্পর্শ দেবার সাধন কর। কার স্পর্শ? নাদের। ভাল, কিন্তু নাদ স্ফুরণ হইলেও নানান গ্রামে হইয়া থাকে যে! তাই ‘ওম্’ জপ করিতে করিতে নাদের সেই একান্ত সমর্থ গ্রামটি পাইতে যত্ন কর। সহজে হয় না, তবে ভাবনিষ্ঠা লইয়া লাগিয়া থাক। ঠিক সমর্থ গ্রাম (অর্থাৎ, মূর্দ্ধন্য ধাম) মিলিলে তবে যথার্থ বিন্দুমিলন। প্রণবাদি সকল জপেই এইটি লক্ষ্য। বৈন্দবীকে মিলাইতে ঐন্দবীকে (চন্দ্রবিন্দু) ভজনা কর। কৃষ্ণ নামে যে ‘য’, সেটি পরমাকর্ষক। সাক্ষাদ্ ভাবেই। অন্য অন্য মহানামে (যথা, ‘হরে-রাম’, ‘রাধেশ্যাম’, ‘কালীতারা’, ‘উমাশঙ্কর’), ঐ পরমাকর্ষক ‘বিন্দুটি’ অবশ্যই অন্য আকৃতিতে রহিয়াছে। জপ গোড়ায় হয় স্পন্দ সাধন (ভাব এবং ছন্দঃ সহকৃত); পরে হয়—নাদ সাধন; তদন্তে বিন্দুসাধন। চূড়ান্তে পরম যে ‘ইষ্ট’, তাতে অভিনিষ্পন্নতা। ‘স্পন্দসাধন কালে চিত্ত চালিত হয় চান্দ্রী শক্তিতে। পঞ্চ অপহ্নুতির আশঙ্কা। নাদ সাধনে চন্দ্রমাঃ; এবং বিন্দু সাধনে চন্দ্রমা বিশেষতঃ চিত্তের অধ্যক্ষতা করেন। স্পন্দ সাধনে চারিটি নাদে নয়টি এবং বিন্দুতে তিনটি—সর্বসমেত ষোড়শটি ‘পাদে’ জপাদি সাধন সমাপন করিতে হইবে। পরে এ প্রসঙ্গ আসিবে। তবে গোড়াতে যে শব্দসাধন, তাতে পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা—এই চারিটির দ্বারা পূর্বোক্ত অপহ্নবাশঙ্কা পরিহার করিবে।

স্পন্দ সাধনে চারিটি লক্ষ্য

বর্দ্ধতে পদ্যমানং যন্ মীয়মানঞ্চ মুচ্যতে।
ক্লিদ্যতে কল্যমানং ন পূর্য্যমাণং ন লুপ্যতে॥ ৭৮

যেটি ছন্দোগ পাদে পাদে পদ্যমান, সম্পদ্যমান ইত্যাদি হইয়া চলে, সেটি তো বাড়িয়াই চলে, ক্ষয়িষ্ণু হয় না। যেটি সুষম মাত্রায় নিজেকে ‘মিত’, ‘সম্মিত’ ইত্যাদি করিয়া যায়, সেটি গ্রাসাদি থেকে মুক্তই হয়। যেটি আপনাকে (পূর্বোক্ত ঐন্দবী) কলায় কলায় সৌম্য-শোভন আকলন করিয়া ফুটিতে থাকে, তার ক্লিন্ন (কলঙ্কিত,

বিপর্যস্ত ইত্যাদি) হবার শঙ্কা কোথায়? আর, শেষকালে যেটি পূর্য্যমাণ হইয়া আপন-পূর্ণতা পরিসীমায় উপনীত হইল, তার আর অবলুপ্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই।

স্পন্দবিজ্ঞানের দিক থেকে এই চারিটিকে চিন্তা কর, এবং আপন বাক্-প্রাণ চিত্তাদির স্পন্দসাধনে সচেতন হও। স্পন্দ কোন 'অবর' শাক্তক্ষেত্রে জন্মিলে, তাকে বাধপ্রতিযোগী (conditioned by retarding factor) হইতে হয়। তাই গত শতকে অবিনশ্বর পরমাণু ব্যাখ্যায় লর্ড কেলভিন প্রভৃতিকে ঈথারের perfect fluidity স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ঐ রোধ প্রতিযোগিতা নানা আকারে আসিয়া থাকে। যন্ত্র অথবা কণ্ঠসঙ্গীতে যেমন, তেমনি সর্বস্থলেই সুষম স্পন্দবিতান এবং সংহতি সমূচ্চয়ের নিমিত্ত স্পন্দের যে সমস্ত অবষ্টম্ভক, বিক্ষেপকাদি প্রতিক্রিয়া সম্ভাবিত (possible damping, scattering reactions), তাদের সর্বাধিক ন্যূনতায় (minimumএ) আনিতে হয়। ঠিক পাদে পাদে পদ্যমান হইলে ঐভাবে ক্ষয়িষ্ণু হবার সম্ভাবনা বিদূরিত হইতে থাকে। বীজ থেকে অঙ্কুর, তা থেকে প্ররোহ ইত্যাদি ঠিক পাদে পাদে বীজটিকে তার আপন সাফল্য চরিতার্থতায় পদ্যমান হইতে দাও। সঙ্গীতে যেমন আস্থায়ী থেকে আভোগ পর্যন্ত। গায়ত্রীজপে যদি ষট্ পাদিকা আকৃতি সমাশ্রয় কর, তবে ঐ পাদগুলির পদ্যমানতা ঠিক রাখিতে হইবে। পদ্যমান রহিলে সে বলিবে—আমি আর ক্ষয়িষ্ণু নই, বিবর্দ্ধিষ্ণু, সংবর্দ্ধিষ্ণু। পাদঃ সংবর্দ্ধয়িতা প্রাণানাম্।

পদ্যমান হইয়া চলিতেও (যথা, কোন ঊর্মিবিতানের) সাঙ্কর্যাদি কারণ বশতঃ (due to interference etc.) স্পন্দের গ্রস্ত এবং বিকৃত দশাটি ঘটিতে পারে। এ থেকে মুক্তি দিতে মাত্রা (measure, rhythm) সমাশ্রয় কর। সব কিছুকে বল—তোমার ঠিক তালে চলিতে হইবে। যথা, গায়ত্রীতে প্রতিটি পাদের চারিটি করিয়া মাত্রা দাও, অথবা, অনুরূপ কোনও সুষমমান। Rhythmicity ঠিক বজায় থাকা চাই। 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নামেও তাই। এইরূপ বিপর্যস্ত (যেমন, গায়ত্রীতে ছয়টি পূর্ণ এবং ছয়টি শূন্য কলায়, অথবা স্ফীতি ও স্থিতি) ভাব পরিহার করিতে কলাক্রমে (phase appearance) চন্দ্রমাকে দৈবতরূপে রাখিবে। পূর্ণ-শূন্যাদি কলা যেন ঠিক ঠিক তোমার বাক্-প্রাণ-চিত্ত, এই ত্রিলেখায় ফুটিয়া যায়। তোমার ব্যাহরণ-অনুপ্রাণন-অনুধ্যানের যদি 'ছবি' লও তো, সে ছবি সুষম, symmetrical, হইবে।

সমগ্র Graphটি অনবদ্য মনোজ্ঞ, সুলেখাই হইবে, অন্যথা নয়। আর, শেষকালে স্পন্দের অবলুপ্তি বারণের জন্য তাকে কাষ্ঠায় (যথা, বিন্দুতে) লইয়া চল। বিশ্বে যেখানে যত স্পন্দ, তাদের ঊর্মিদৃষ্টিতে যদি বল 'ও', তবে, সে ঊর্মির সর্ব্বতোঽনবদ্যা যে আকৃতি, সেটি 'ওম্'। কেবল নাম জপে নয়, তোমার অন্তর বাহিরে যতকিছু স্পন্দ, তোমার সরসী-সরিৎ-সাগরে যত না ঊর্মি তাদের 'ওমে' অন্বয় করিতে না পারা পর্যন্ত তারা বারবার 'আক্রম্য' আঘাত রূপটি ছাড়ে না; তাদের অবিশ্রান্ত তোলা-পাড়া কোন তুঙ্গাগরিমায় নিশ্চিন্ত তুলিয়াই রাখে না, অথবা কোন সানুলঘিমায় স্বচ্ছন্দে লঘুভার হইতেও দেয় না। তাদের ঐ অফুরন্ত তোলা-পাড়ার নির্মম 'তাগিদ'টি কোথায় দেবে তোমায় রেহাই?—ওমে। তাই না সেই 'সিন্ধৌ বিন্দুদশকম্'! সুতরাং, সর্ব বিসম্বাদিনী স্পন্দ-বিততি স্থলেই ওমের 'অ'কারে পদ্যমানতার অবিচ্ছেদ রাখ; 'উ'কারে স্পন্দমানকে সৌম্যমানে উদার উন্মুক্ত রাখ; 'ম'কারে তার কলাক্রম 'বিপর্য্যাস' প্রভৃতিকে অন্তিম স্পর্শে (vanishing point or evanascenceএ) আন। আর, অন্তে নিত্য নাদ সংগৃহীত হইয়া পরম বিন্দু সম্মিলনে মরস্পন্দকে অমর পরম খ্যাতিতে নিষ্পন্ন কর।

পূর্বোক্ত চর্যাক্রম

রেণু-অটন প্রভৃতি পূর্বে কোন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। এখানে, নিখিল স্পন্দকে চন্দ্রবিন্দু (প্রণবের নাদ বিন্দুতে) মিলাইবার যে চর্যাক্রম, সেটি এইভাবে দেখিয়া লও—

রেণোরটনমাদৌ যৎ তদ্রেণোরটনং ত্বিষা।
ছন্দসা রণনং রেণো রেণো রমণমন্তিমে॥ ৭৯

গোড়ায় স্পন্দের যে সব সূক্ষ্ম অবয়ব (elements or quanta), তাদের 'অটন' মাত্র (irregular motion) বুঝিতে পারা যায়। যেমন, সূর্যকিরণে ধূলিকণার ইতস্ততঃ ধাবন। আরম্ভে জপস্পন্দ সমূহ এইরূপই মনে হয়। যন্ত্রে সুর বাঁধা নেই। তারপর, অটন হয় 'রটন' যখন 'অ' (অগ্নি) নিজেকে (যেন অরণিদ্বয় ঘর্ষণে) সাক্ষাৎ

তেজোরূপ (ত্বিষা) 'র'কার করিয়া লয়। তখন আর সূর্যকিরণে ধূলিরেণুদের মত বিক্ষেপণ নয়; এক এক রেণু এক একটি তেজঃকণা (dynamic particle)। যেমন, রেডিয়ামের অণু। স্পন্দ এইবার হইল রেডিয়েশন্। তখন মন্ত্রের শাক্তী সংস্থা (dynamic chargeability) সুরু হয়। এটি কুণ্ডলিনী জাগৃতির প্রথম বহিঃসূচনা। উক্ত সূচনা সূচক লিঙ্গগুলি বহিরাদি ভেদে তিন প্রকারের।

'রটন্তী' শক্তি

যাই হোক্, ঐ শাক্তী সংস্থায় আসিলে এঞ্জিনের বয়লার অথবা ব্যাটারীর মত অবষ্টম্ভক এবং পরিচালক 'গ্রন্থি' (valve) গুলিতে শক্তি 'রটন্তী' হইতে থাকে। Centres of inhibition and commutation become 'energy co-efficients.' ফলে, অনেক কেন্দ্র, মর্মস্থল ইত্যাদি যারা এযাবৎ 'বিমুখ', পরাঙ্‌মুখ ছিল, তারা হইল উন্মুখ, সম্মুখীন। যেমন, স্পন্দসমূহকে সংহত কেন্দ্রীণ করার যে সব উপযুক্ত 'প্রতিফলক' (condensing mirror ইত্যাদি), তারা এইবার 'খুলিয়া' যাইতে থাকে. ফলে রটন হয় 'রণন'। (reasonance)। বহিঃ প্রক্ষেপের ন্যূনতায় এবং অন্তঃসংক্ষেপের আধিক্যে এই রণন গায়ত্রী প্রভৃতি 'স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্' রূপ 'ছন্দাংসি' (consummating harmony) আকৃতি পরিগ্রহ করে।

'রণনী'

এই রণনী সংস্থায় নামাদির স্পন্দ আসিলে সাধকের সমগ্র সত্তা ছন্দোব্রহ্মের রেণুমঞ্জীর রূপে আপনাকে 'ঢালিয়া সাজাইয়া' লয়। রণন গোড়ায় অন্তক্রিয় হইলেও অচিরে বহিঃক্রিয়ও হয়—যে যন্ত্রে ঐ নাম মঞ্জীর নিক্কণটি চলিতেছে, তুমি তার ধারে বসিয়াও সেটি আপনাতে বুঝিতে পারিবে। সেটি তোমার পক্ষেও অঙ্গা প্রাণমনের রসায়ন হইবে, 'কর্ণ' কিছু না শুনিলেও 'হৃৎকর্ণরসায়নম্'—এখানে হৃৎ এবং কর্ণ এই চলতি মানে আছে, তা থাকুক। কিন্তু 'হৃদের কর্ণ, 'হৃদিস্থিত যে কর্ণ, ইত্যাদি গভীরে যাইতেও সঙ্কোচ করিও না। মধ্যমা বাক্ হৃদয়ে। এ হৃদয় কিন্তু শব্দের আড়ষ্ট শুক্তিকোষে (কেবল আভিধানিকে) প্রাণস্পন্দের সাড়াটি দেয় না; শুক্তির আবরণে যে মরমমুকুতা, তাতেই তাকে নিধিসন্ধানী দৃষ্টিতে মিলাইবে।

রেণুরণনে আসিয়া প্রতিফলন, প্রতিপূরণ এবং প্রতিকলন—এই তিনটিকে অকুণ্ঠায় ঘটিতে দিবে। শেষেরটি হইল স্পন্দরেণু সমূহের প্রণবাদি নাম সম্বন্ধে অভিনব কলন—আকলন, সঙ্কলন ইত্যাদি। যেমন, কোন গুণী দক্ষ বেহালাবাদকের পুনঃ পুনঃ বাজাইবার ফলে যন্ত্রের রেণুপুঞ্জের অভিনব এক 'প্রারব্ধ' সঙ্কলন হইতে থাকে। —An harmonic molecular transformation and vibratory predisposition. ব্যস্ত বহির্বিক্ষেপণ কমাইয়া আর মৈত্র রণন সংস্কার সমূহ 'সমাস' করিয়া (by accumulation of positive alliances), সমগ্র যন্ত্রের এই প্রতিকলনটিকে এমন এক সাধিষ্ঠ যুঞ্জানতায় আনিতে হয়, যাতে সে হয় শ্রীনারদের হাতে বীণা। অথবা, সাধ হয়তো, ব্রজবঁধুয়ার চরণমঞ্জীররণনমধুলালসা, কালিন্দী-তটবিপিনসঙ্গীতকরবশিহরিতা কেলিকদম্বরেণুরচিতশৃঙ্গারা কোন এক অতরপিতহিয়া রেণুকা!

'রমণী'

রেণুরণনে আপন সত্তার প্রতিটি রেণুকে পাইতে হয় যুঞ্জানা সাধিকা রূপে। রবীন্দ্রের সেই গাথাটি—'তব আকাশে যত তারা' এখানে স্মরণ কর। যত 'নিকুঞ্জ মঞ্জরী' সব নিজ অঙ্গেই ফুটে যাচ্ছে, ইত্যাদি। তারপর অন্তে যে রেণুরমণ, তার কথা সকল দেশের মিষ্টিক্‌রাই বলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেহই 'মুখ ফুটিয়া' বলিতে পারেন নাই। প্রতিটি রেণুতে রমণ। এই 'রমণীরমণে' আসিলেই রামানন্দরায়ের মুখ তিনি স্বয়ং চাপিয়া ধরিলেন যে। তবে, আপন সত্তায় প্রতিটি প্রতিটি অধোমুখ রেণুকমল কোন্‌ রমণে ঊর্দ্ধমুখে ফুটিতেছে—প্রস্ফুটিত, প্রমোদিত এবং শেষে প্রমুদিত হইতেছে—তা পরমাস্বাদে মিলাইবার সেই শারদোৎফুল্লমল্লিকা রন্তুমনা মাধবের মধুযামিনী যোগমায়া যে কবে যোগাইবেন তা তিনিই জানেন!

এই পরমাস্বাদনের কথঞ্চিৎ তটস্থ ভাবে—'মোর হৃদি বৃন্দাবনে মন প্রাণ ল'য়ে বিহর,' অথবা, 'পদ্মবনে হংসীরূপে হংসসনে করে রমণ';—এসবও ঐ রেণুরমণের পর্যায়ে পড়িবে। সর্বস্থলেই ঐ রেণুরমণকে তরুণোল্লাস থেকে প্রৌঢ়োল্লাস, উল্লাস থেকে বিলাস, এবং অন্তে স্বলসিতে মিলাইতে হয়। যোগে সবিকল্প সমাধিতে স্পন্দ সর্বথা নিরোধ পরিণামে এখনও আসে নাই; এই সমাধির 'সানন্দে' চেতোরেণুরমণী বৃত্তিটি বিশেষ গম্ভীরান্তঃঘনতায় অনুভবে মিলে; 'সাস্মিতে' প্রশান্ত বিপুল

ব্যোমব্যাপিতায়। জ্ঞানে ‘ভূমৈব সুখম্’ উপলব্ধির উপক্রমে। ব্রহ্ম এবং আত্মা—এ দুয়ের অভেদ সমীকরণ সাধিত হয় এই চরম উপক্রমের সম্মুখীন হইয়াই। ‘আত্মন্’ই ‘ব্রহ্মন্’ আর ‘ভূমন্’ এ দুইকে আপন মন্ দিয়া এক করিয়া লন। ‘মন্’ এটি আত্মনীনতার লিঙ্গ। ‘চন্দ্রমন্’ শব্দটিকে তাই আত্মনীন করিয়া দেখান’ হইয়াছে।

প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত

অপেক্ষাকৃত অধস্তন ভূমিতেও প্রাণ মনের যে ‘অটন’ স্পন্দ, তাকে রটন-রণনের মাধ্যমে যথাসম্ভব রমণরূপতায় আনিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, পরম রমণ যে রসবস্তু, তাহাই ‘প্রাকৃতে’ সর্বত্র ‘যেন’ কুণ্ঠিত-লুণ্ঠিত-গুণ্ঠিত হইয়া ‘নামিয়া’ আসিতেছে। প্রাকৃত সব কিছুতে তদ্রূপে সেটি হইয়াছে রেণুরিরংসা। বিশ্বের প্রতিটি রেণুতে রহিয়াছে এক চির-অবুঝ চির-অতৃপ্ত আসঙ্গ-তৃষা। প্রাণিবর্গে আসিয়া এটি হয়—‘আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা’। অপ্রাকৃত যে রেণুরমণ তাতেই এই প্রাকৃত রেণুরিরংসাকে শুদ্ধি সমর্পণ করিতে হইবে। কুণ্ঠিত-লুণ্ঠিতাদিরূপ ত্যাগ করতঃ তত্ত্বতঃ অবস্থিতিই রেণুরিরংসাশুদ্ধি। চন্দ্রমস্ (চন্দ্রমাঃ) এবং চন্দ্রমন্ (চন্দ্রমা)—এ দুয়ে মিশিয়া এই শুদ্ধি সংবিভর্ত্তা। এ দুয়ের সংস্কৃতি-সংভূতিবিরহী যে চন্দ্র, সে চন্দ্র রিরংসাবিধুর বিধু, কলঙ্কী শশাঙ্ক। মনচকোরকে ‘মধুলুভা’ শুধুই বৃথা সে বিধুকে ভজিষ্ণু করিও না।

বীজ-সমাশ্রয়ে

ক্লীমিতি কামবীজং যৎ কৃষ্ণায়েতি রসঃ স বৈ।
গোবিন্দায়েতি মাত্রাঃ স্বা বল্লভায়েতি হূয়তাম্॥৮০

ভজিষ্ণু নয়, কিন্তু যজিষ্ণু হইতে হইবে। ক্লীঁ এই কামবীজ সমাশ্রয়ে। হ্রীঁ এই বীজদ্বারা পূর্বোক্ত রেণু অটনকে পাইতে হয় রেণু রটন রূপে। ঐঁ বীজ দ্বারা রেণুরণন জ্যোতিষ্মৎ ছন্দে, আর শ্রীঁ বীজ দ্বারা রোচিষ্মৎ ছন্দে। অন্তে যে রেণু রমণ, তন্নিমিত্ত সমাশ্রয় কর—ক্লীঁ (এবং ক্রীঁ)। ঐ কামবীজে যে চন্দ্রবিন্দু তাকে চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা—এই দুইরূপে যথাক্রমে জ্যোতির্যজিষ্ণু এবং রোচির্যজিষ্ণু হোতৃযুগল ভাবনা কর। তোমার আপন যে ধী, তারই এই দ্বিবিধ এষণা—ভাসৈষণা

এবং রসৈষণা। এ দুয়ের মৈত্র এবং সাহিত্য চাই। কেন? এ দুই এষণাই মূলে এক। আনন্দ বা রসই অস্তি, ভাতি। সুতরাং কামবীজ দ্বারা যজিষ্ণু হইয়া যিনি 'রসো বৈ সঃ' রূপে রসের স্বরূপ, আশ্রয় এবং বিভর্ত্তা, সেই নিখিল হৃদ্‌যাজিত যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণে তোমার প্রথম এবং চরম আহুতি ভাবনা করিবে। তোমার রিরংসারসকে পরমরমণ যে রস পরিসীমা, তার পানেই ফিরাইতে হইবে। সঙ্গো সঙ্গো একান্ত তা পারি কৈ? সে পরমরসের আপন মাত্রা (গো=বাক্, ইন্দ্রিয়াদিতে) রস বা মধুরূপে প্রবিষ্ট রহিয়া, সমস্ত কিছুকে তাদের ব্যভিচারিণী প্রবৃত্তি সত্ত্বেও, আপন করিয়াই 'লাভ' করিতেছেন (বিন্দতি); সুতরাং সেই গোবিন্দ-ভজিষ্ণু-যজিষ্ণু হও। 'কুর্য্যা গোবিন্দনাথাচ্যুত-চরণদৃশো নো ধিয়ন্ত্বাং প্রপন্নাঃ'—সেই আগেকার শ্লোকচরণটি পুনশ্চ স্মরণ কর। পরমরসের ভজনা তাই তার স্বীয় 'মাত্রা' ভজনা ব্যতীত হয় না। মৃষারসলোলুপ আপন মাত্রাসমূহকে সেই পরমের আপন মাত্রা করিয়াই মিলাইতে হয়। মাত্রাকে সরাসরি মিথ্যা ভাবিয়াও তো সহজ হয় না। মনন বোঝে তো মন বোঝে না। মন মানে তো তন মানে না। তন চায় তো ধন জন চায় না। বিচারে দৃঢ় কিন্তু সঞ্চারে শিথিল। মনঃপ্রাণ সর্বেন্দ্রিয়, এবং সর্ববিষয় যদি সেই রসভূমার আপন মাত্রায় 'মান' না পায়, তবে তারা আগমাপায়ী প্রাকৃত যে মাত্রাস্পর্শ, তার পারে যাবার পথ খুলিতে দেয় না. 'গোবিন্দ' নামেই মাত্রাস্পর্শের পারে নাদবিন্দুর যে অপগতকুণ্ঠা, নিত্যা বৈকুণ্ঠসরণী, সে সরণী উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া আছে। শৈব-শাক্ত আপন 'গৌরশঙ্কর' বা 'উমাশঙ্কর' নামটি কৈলাসলসন্তী দৃষ্টিতে নাদবিন্দু প্রত্যভিজ্ঞায় দেখিয়া লইবেন।

অঙ্গার ও হীরক

আচ্ছা, আমার সব কিছুতে রসভূমার পরশমণির পরশটি দিয়া তাদের তুচ্ছ ধূলিমান কাটাইয়া অমূল্য রতনমানে আনিতে হইবে বটে, কয়লা আর কয়লা না রহিয়া হীরাই হইবে বটে—কিন্তু রসভূমাকে পরম রসঘন আমার আপন নাথ, বল্লভ রূপে না মিলাইলে তো সেটি হয় না। যে ছিল 'বন্ধ', সে হবে 'বন্ধু', কিন্তু কখন? যখন 'মোর বঁধুয়া আইল ঘরে', তখন, তার আগে নয়। রসভূমা বা অখণ্ড রসবস্তু রসরাজ, রসিকেন্দ্র চূড়ামণিরূপে 'মম বল্লভ' না হওয়া পর্যন্ত এই অঘটন সংঘটনটি হয় না।

হৃদয়ং রসশালা মে রসরাজঃ স বল্লভঃ।
নির্ম্মিতোহঙ্গারকাৎ সদ্যো হীরকো নূপুরায় কিম্॥৮১

এ হৃদয় করি রসশালা,
রসরাজ হে আমার হৃদয় বল্লভ!
এ হেন অঙ্গারে করি হীরে
করিলে কি ও চরণ নূপুর সুলভ!

অঙ্গারকোঽবরন্যস্তো বরন্যস্তস্তু হীরকঃ।
অপাস্তং নাবরং যাবৎ তাবন্ন ন্যস্যতে বরম্॥৮২

অঙ্গার আর হীরকের এই মহান্ বিভেদটি কি নিমিত্ত? অঙ্গারক রেণু অবরন্যস্ত, আর হীরক রেণু বরন্যস্ত। রেণুন্যাসই বিভেদের কারণ। সুতরাং যাবৎ অঙ্গারের অবরন্যাস অপাস্ত না হইতেছে, তাবৎ হীরকের বরন্যাস হইবে না। যে ন্যাসতত্ত্বের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সে ন্যাসও মূলতঃ এই দৃষ্টান্তে বুঝিবে। চিতায় দগ্ধ হইয়া যাহা অঙ্গার হইবে, তাহা জীবদ্দশাতেও বস্তুতঃ অঙ্গার। এই অঙ্গারের অবরন্যাস ('প্রাপ্য বরান্') বরন্যাসে বিবর্তিত হয় কিরূপে? তাহাই তো রেণুরটনাদি সাধন!

শক্তি-ন্যাস ও শুদ্ধিন্যাস

ভর্গসা ভৃজ্যতে হেয়ং সৃজ্যতে রোচিষোত্তমম্।
ভালে তদ্ রাজতে ভাসা হৃদয়ে রোচতে মুদা।
ললাটচন্দ্রমাঃ খ্যাত্যৈ কান্ত্যৈ হৃদয়চন্দ্রমা॥৮৩

তোমার ভালে এবং হৃদয়ে দুটি চন্দ্রমা যুগপৎ সমুদিত দেখিও। একটি তাঁর শুভ্র, সুবিমল ভাতিতে (ভাসা) বিরাজমান; তাঁহা হইতে দুই প্রকারের দীপ্তি (ভাঃ) বিচ্ছুরিত হইতেছে। একটিতে তোমার সঙ্ঘাতে এবং পরিবেশে যৎকিঞ্চিৎ হেয় (অবরন্যস্ত, যথা অঙ্গারে), সেগুলি ভৃষ্ট (penetrated and treated by intensive, powerful radiations) হইতেছে; অপরটিতে, তাদের অবর শক্তিন্যাস

(lower-level energy disposition) বরন্যাসে (higher-level disposition-এ) উন্নীত হইতেছে। একেই তো বলে, শক্তিন্যাস ও শুদ্ধিন্যাস। ভালচন্দ্রমার এই দুই রশ্মিকে ভর্গোরশ্মি এবং খ্যাতিরশ্মি বলা যায়। ললাটে ‘দ্বিদলে’ এই রশ্মিযুগল অন্যোন্য সাহিত্য-সমন্বয়ে রহিয়াছে। চন্দ্রবিন্দু ইহার আকৃতিলেখ। পক্ষান্তরে, হৃদয়চন্দ্রমা হৃল্লেখাকে প্রসাদিত করেন। তাই, আপন ‘রোচিঃ’ (হৃল্লেখানুগৃহীত রশ্মি অথবা সোম রশ্মি) দ্বারা অবরন্যাসমুক্ত ভর্গস্থান্ খ্যাতিমান্ যে ‘অঙ্গার’, তাকে পরম কান্তোজ্জ্বল ‘হীরক’ করিয়া লন। পূর্বোক্ত ভর্গরশ্মি আর খ্যাতিরশ্মি, এ দুয়ের নিরপেক্ষভাবে, এই ‘কান্ত্যৈ’ এবং ‘রুচ্যৈ’ সোমসৃষ্টি কর্মটি হয় না। ভাস (খ্যাতি)-কে সাথে (সাহিত্যে) এবং সমন্বয়ে পাইয়াই ভাব (কান্তি, রুচি) আপন স্বভাব শোভনভাবে মিলাইতে পারে, অন্যথা নয়।

‘বন্ধ’ হোক্ ‘বন্ধু’

যে মনঃ চন্দ্রকে ‘বন্ধু’ (যাহা বন্ধন করে এই অর্থে) করিয়া দৌর্মনস্যভাক্, তাকে ‘চন্দ্রবিন্দু’ ভজনা করতঃ সৌমনস্যভাক্ হইতে দাও।

দৌর্মনস্যবিষোদ্ভিজ্জচ্ছায়ালেশো বিষায়তে। (ছায়াঽপি চেদ্)
সৌমনস্য-সুধাবল্লী পুষ্পকণোঽমৃতায়তে॥ ৮৪ (বাতঃ কিং নামৃতায়তে)
দৌর্মনস্য বিষতরু, ছায়ালেশ তার বিষময়।
সৌমনস্য সুধাবল্লী, সুধা তার পুষ্পকণিকায়॥

(দুর্মনাঃ বিষের বৃক্ষ, ছায়ার পরশ তার যদি বিষময়। সুমনাঃ সুধার বল্লী, তার পুষ্প গন্ধবহ অমৃত কি নয়?)

পঞ্চশাখো বিষোদ্ভিজ্জস্তৃণেঢ়ি কোষপঞ্চকম্।
পঞ্চশাখা সুধাবল্লী যয়াঽমৃতত্বমশ্নুতে॥ ৮৫
পঞ্চশাখ বিষের পাদপ, তার হিংসাহত যদি পঞ্চকোষ তব।
পঞ্চশাখা অমৃতবল্লরী, অমৃতে করিবে তায় সঞ্জীবিত নব॥

প্রণব ও পঞ্চীকরণ

সৃষ্টির মূলাধার যে প্রণব, তাঁরই পঞ্চ মাত্রার (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু) মূল অনুরোধে নিখিল জাত পদার্থ হইয়াছে পঞ্চীকৃত পঞ্চকোষাত্মক। এ পঞ্চকোষ মূলতঃ আনন্দেরই পঞ্চমাত্রা। আনন্দই আপন স্বরূপ ভূমত্বকে এই পঞ্চধায় বহুত্বে প্রপঞ্চিত করিয়াছে। 'একোঽহং বহু স্যাম্'—ইহা ভূমত্বের বহুত্বে সঙ্কল্পন এবং সঙ্কলন। মূলসৃষ্টিধারা তপসে ভাব, প্রাণে অথবা আকাশাদিতে ভাব, প্রণবকে এবং প্রণবের পঞ্চীভাবকে সর্বভাবনাতেই ভাবিয়া মিলাইতে হইবে।

আকাশাদির পঞ্চীকরণ (অথবা ত্রিবৃৎকরণ) সামান্য ভাবে পরিচয়ে আছে বটে, কিন্তু পঞ্চীকরণের মূল হেতু সন্ধিটি কোথায়, তা বিশেষ করিয়া, প্রণব পরীক্ষা প্রদীপে পরীক্ষিত না হইলে তো 'প্রবচনেন' এবং 'শ্রুতেন' বহুধা 'ভাষ্য' হইলেও, বোধে এবং প্রত্যয়ে সর্বধা 'ভাস্য' হইবে না। যথা— ছান্দোগ্যাদির 'ব্যান' কে আধার এবং সন্ধিরূপে না পাইলে প্রাণের পঞ্চীভাব ব্যবহারে আসিয়াও বোধে আসে না। প্রণব, গায়ত্রী ইত্যাদির ব্যাহরণে নাদমেরু স্থলে এবং বিন্দুমেরু স্থলে 'ব্যান'কে বিতান এবং সন্ধি দুই আকৃতিতেই পাই। অনুলোমে এবং বিলোমে প্রাণাপানাদির ব্যানবিন্যাসটি সাধিতে হয়। অনুলোম পর্বে শুধু মন্ত্রের নয়, নিখিল পঞ্চীকৃত বিশ্বের উদয়; বিলোম পর্বে নিখিল বিলয়। সুতরাং এই প্রপঞ্চিত ভবপ্রত্যয়কে জপধ্যানে ভাবপ্রত্যয়ে আকারিত করতঃ স্বভাবপ্রত্যয়ে লইয়া মিলাইতে হয়। সূক্ষ্ম বিরাটাদি সর্বস্তরে মূলে 'আকারিকা' যে প্রণবাকৃতি, তার অধ্যক্ষতায় পঞ্চীভাব ঘটিয়াছে। অণু নক্ষত্রাদিতেও এটি অবশ্যই আছে। অস্মদাদির ক্ষেত্রে এটি 'পঞ্চকোষ' আকারে পরিচিত। অন্যত্র আকৃতি-সামান্যে বিশেষাপত্তি। প্রাণপাদে এটি বিবেচিত হইবে।

জপধ্যান কেন ?

এখন, ভাবিয়া দেখ, জপধ্যানাদি করিতেছ কেন, কোন্ লক্ষ্যে? আর, উদয় বিলয় চক্রটিই কেন সমাচরণ করিতেছ? ভাবনিষ্ঠাসহ যদি দশধা চক্রটি সমাচরণ কর, তবে 'ভগবান্' আর তো 'ভূত' রহেন না! পাঁচ আর পাঁচে দশ। অনুলোমে অথবা সর্গে প্রণব পঞ্চমাত্রায় বিন্দুগর্ভিত (তদেবাধিকৃত্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ) নাদ; বিলোমে অথবা বিসর্গে নাদগর্ভিত বিন্দু। সৃষ্টিতে চন্দ্রবিন্দুর যাদৃশী আকৃতি, বিলয়ে তার বিপ্রতীপা

আকৃতি। সুতরাং, জপধ্যানাদি সকল সাধনেই নাদকে (ব্যানবিতান অথবা বরুণকে) বিন্দুলীন (ব্যানসন্ধি বিন্দুতে অথবা সোমসীমায়) করাই হইল প্রতিপ্রসব-ভববিমুক্ত স্বরূপাবস্থানের অপরিহরণীয় উপায়।

গোড়ায় স্পন্দসাধন। এটা মুখ্যতঃ 'যান্ত্রিক' কর্ম নয়। কেননা, সাধন যন্ত্রটাই তো মুখ্যতঃ এই স্থূল যন্ত্র নয়। তন, মন, ধন, জন—এই চারিটি 'ন' লইয়া 'নস্যাৎ' হইয়া আছি। এ সব কয়টিই 'সুরেলায়' যদি বা মিলাইতে না পারি তো, প্রথম দুটিকে ধরিয়াই সযত্নে সুর বাঁধিতে হইবে। এ দুয়ের সাহিত্য এবং সঙ্গতি কিসে হয়, তাই গোড়ায় লক্ষ্য। গানে যেমন গান আর বাজনার। তন রাখিবে 'তাল', মন ধরিবে 'সুর'। তনকে, বিশেষতঃ, বরুণ করিবেন আপ্যায়ন, যাতে ব্যানবিতান অব্যাহত হয়; মনকে, বিশেষতঃ, সোম, যাতে ব্যানসন্ধির সৌম্য সন্ধানটি হইতে পারে। তনমন, এই দুয়ের সৌম্যসঙ্গতি (concordance) হইলে চন্দ্রমা। চন্দ্রমা তনমন দুটিকেই আপন আপন নেমি মর্যাদায় (each in its own field friendliness) সৌম্যমানে রাখেন। তন, মনের ওপর বেপরওয়া তম্বি তাগিদ তদ্‌বির করে না; মনও তনের কাছে মরজি মেজাজ গরজের বায়না চালায় না। তনও তার সব তাতে 'তালিম' আর, মনও তার সব তাতে 'মরমী' হইতে থাকে। তনের 'তালিম' বলিতে শ্বাস-নাড়ীস্পন্দ এদের ছন্দোগত্ব, ব্লাড্‌প্রেসার, ব্লাড্‌সুগার ইত্যাদির সৌম্য—এসব অবশ্যই ধরিতে হইবে। চন্দ্রমাদৈবত তনমনের স্পন্দ স্বাধিকারে লইলে এ সবই হওয়া স্বাভাবিক। আবার, তন তালে (ছন্দে) আসিলে, মনকেও সে ছন্দঃ ছাঁদিয়া লয়।

'তন' ও 'মন'

তনের বিষম স্পন্দনে (ইন্দ্রিয়, স্নায়ু, মস্তিষ্কাদির) মন তো কেবলি স্পন্দিত হয়, তনের সুষম স্পন্দনে, মন সাড়া দিবে না, এও কি হয়? যেমন গানে বাজনায় ইত্যাদিতে কর না, তেমনি জপাদিতে ব্যাহরণকে বাহ্য (mechanical) বলিয়া কদাপি অনাদর করিও না। ভাবের 'তন' না হইলে ভাবের 'মন' মেলে না। তাই রহস্য কারিকাটি—

ত্রিবেণীসঙ্গমে লব্ধ্বা গঞ্জিকাসেবিনং গুরুম্।
পূর্ণকুম্ভে কুরু স্নানং বগাহ্যামূর্দ্ধ চাম্ভসি॥৮৬

মকরে পূর্ণিমায়াং বা মাঘামায়াং বিশেষতঃ।
ধূমঃ সদ্যো ভবেদর্চ্চিঃ সদ্যোর্চ্চি র্ব্রহ্মবর্চ্চসে॥৮৭

ত্রিবেণী সঙ্গমে যাইয়া প্রথমে কোন প্রগাঢ় গঞ্জিকাসেবী গুরুলাভ কর। সে গুরুর অন্তেবাসী হইয়া গঞ্জিকামর্দনে, সেবনে এবং ধূমধারণে দক্ষ হও। তারপর, যখন বুঝিবে এইবার গঞ্জিকাধূম মূর্দ্ধায় (মাথায়) উঠিয়াছে, তখন 'অম্ভসি' (জলে) অবগাহন করতঃ মূর্দ্ধা পর্যন্ত নিমজ্জিত হও। মকর সংক্রান্তি, পূর্ণিমা এবং মাঘী অমা—বিশেষ করিয়া এই তিন পর্ব দিনে। ঐ সকল পর্বে, হে গঞ্জিকাধূমপায়ী, তোমার স্নানাবগাহনটি যদি ভালমতে হয়, তবে কি ফল তার, তা কি জান? তোমার সেবিত ধূম সদ্যঃ অর্চ্চিঃ হইবে এবং সে অর্চ্চিঃ সদ্যঃ ব্রহ্মবর্চ্চঃ অধিগমের হেতু হইবে। অতএব, প্রগাঢ় গঞ্জিকাধূমপায়ী হইয়াই পূর্ণকুম্ভে নিষ্নাত হও।

এখানে ত্রিবেণী সঙ্গম=প্রণবের অ, উ, ম, অথবা ব্যাহৃতিত্রয়, 'তৎ-সবিতুর্বরেণ্যম্' ইত্যাদি তিন সঙ্গম। প্রগাঢ় গঞ্জিকাধূম=সমুদিত নাদস্পন্দকে বহির্বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া আপন দেহাদি 'কুম্ভে' ধারণ এবং তার পূরণ (পূর্ণকুম্ভ)। মূর্দ্ধা=নাদমেরু=নাদোর্মি মূর্দ্ধা। এখানে আসিয়া চন্দ্রমা সমাশ্রয়ে বিন্দুলীনতায় ক্রমে অবগাহন ও নিমজ্জন। মকরক্রান্তি=উদয়মেরু; পূর্ণিমা=বিন্দু অভিমুখীনা নাদপরিসীমা 'নাদশিখর'। 'তৎসবিতুর্বরেণ্যমের' ভর্গোমুখীনতায় পৌর্ণমাসী; আর 'ধীমহি' রসমধুরিমায় পূর্ণিমা। মাঘী অমা=বিন্দুমেরু। মাঘ='ম+অঘ'=অঘরাহিত্য। অথবা, 'মা+ঘ'। ঘ=ঘোষবান্ (ব্যক্ত), তার লীনতা। 'ধূম' এবং 'অর্চ্চি' দুইটি 'মার্গ'। অর্চ্চিঃ সদ্যঃ আবির্ভূত হইয়া সদ্যঃ (বিলম্বিত ক্রমে নয়) ব্রহ্মজ্যোতিতে অভিনিষ্পন্ন হবার দ্বার অবারিত করে।

প্রাণ ও অপান

প্রাণাপানৌ প্রবর্ত্তেতে ধূমমার্গ-প্রবর্ত্তকৌ।
প্রবর্ত্তেতার্চ্চিরাদিশ্চ ব্যানসন্ধৌ প্রবর্ত্তিতে॥৮৮

ইড়া পিঙ্গলায় প্রাণাপান (অনুদান-অসমান) প্রবর্তিত হইয়া ধূম-মার্গেরই প্রবর্তক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু (সমানোদানকে সাধক করিয়া) যদি ব্যান সন্ধি সন্ধানে

(সুষুম্নামার্গে) প্রবর্তিত হয়, তবে অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রবর্তিত হয়। এর রহস্য সাধক ভালেন্দু ঐন্দবী ছটায় প্রণিধান করিবেন। যথা—গায়ত্রীতে আদি ওঙ্কারে অগ্নি (সধূম); ব্যাহৃতিতে (বায়ুদৈবতে) অগ্নি উদ্দীপিত; 'বরেণ্যম্' পাদে অর্চ্চিঃ হইলেন; তিনি 'ধীমহি'তে ভর্গোরূপ হইয়া জ্যোতীরসে 'ধিয়ঃ'কে 'প্রচোদিত' করতঃ ব্রহ্মাববোধে অভিনিষ্পন্ন হইতে প্রবর্তিত হইলেন। উদান-সমানকে 'সাধক'রূপে পাবার কথা বলা হইয়াছে। গায়ত্রীতে 'বরেণ্যম্' অবধি উদান, তৎপরে সমান ব্যানসন্ধি (বিন্দুমেরু) মিলাইতে সাধক হওয়া আবশ্যক। কথাগুলি ব্যাহরণ এবং অনুধ্যানে 'যাচাই' করিয়া লইতে হইবে। উল্লসন্তী-বিলসন্তী 'ঐন্দবী ছটা' আগে অলসিত, ধূমে নিমীলিতবৎ থাকে। তাবৎ জপাদির স্পন্দে (সমর্থস্থলে) ভ্রূমধ্য জ্যোতিঃকণ সহকারে স্পন্দিত হয় বটে, কিন্তু সুষুম্নোন্মেষে অর্চ্চিরাদি প্রবর্তিত হইতে থাকিলে, তদূর্দ্ধে (অর্থাৎ ভ্রূমধ্যের) 'উন্মীলন' (অজস্র-প্রোজ্জ্বল-জ্যোতিঃ ইত্যাদি 'জ্যোৎস্না' আকারে) ঘটে। তখন অধোমুখ 'চন্দ্রবিন্দু' উর্দ্ধমুখ হইয়া দ্বিদলকে প্রসন্ন-প্রোজ্জ্বল প্রস্ফুটিত করিল।

কুম্ভ ও কুম্ভক

পূর্বোক্ত কারিকায় 'কুম্ভ' (কুং=বেদং=ব্রহ্ম, ভাতি) এবং 'অম্ভস্' (অম্+ভস্—এ দুটি প্রাণরসায়নে পরীক্ষা করিও)। এই শব্দ দুইটি রহস্যের সূত্র সঙ্কেত দিতেছে।

কুম্ভকে 'অম্ভসা' পূর্ণ করতঃ তাতে আমূর্দ্ধনিষ্ণাত হইয়া 'ধূম'কে 'অর্চ্চিরাদি' রূপে মিলাইতে, জপাদি-জন্য এবং জপান্তে যে স্পন্দবিতান, তাকে পূর্বোক্ত পঞ্চ অপহ্নুতি পরিহার করাইতে হয়। জলে ঢিল ফেলিলে স্পন্দন (বীচি) হয়, কিন্তু সেটি ক্ষয়িষ্ণু (diminishing); তাকে বর্দ্ধিষ্ণু (augmenting, amplifying—intensively & extensively) করা যায় কি উপায়ে, সেটি দেখিতে হয়। এর নিমিত্ত ঐ গঞ্জিকাসেবীর দৃষ্টান্তে আদৌ কুম্ভ বা কুম্ভক সাধনা; নাক টিপিয়াই শুধু সেটি হয় না। স্পন্দকে অন্তষ্ক্রিয় হইয়া রটন, রণনাদি আকৃতিতে মিলানই প্রকৃত কুম্ভক। এটি সাধারণ সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ব্যবহারেও উদাহৃত। কয়লা, পেট্রল থেকে যে স্পন্দ সঞ্জাত, তাকে ঐ কুম্ভকাকৃতিতে লওয়াই এঞ্জিনাদি যন্ত্রের প্রাথমিক মুখ্য কর্ম। Conservation Effect এর ফলে 'অটন' হয় 'রটন'; আর Resonance Effect দ্বারা হয় 'রণন'।

ঐ দুটি কর্ম যে বহিষ্ক্রিয়াদির ফলে ব্যাহত হয়, তাকে বলে Leakage, Drain, Dissipation ইত্যাদি।

স্পন্দের মিত্র ও বৈরী

তারপর ধর, কোনও স্পন্দ জাত হইয়া 'গ্রস্ত' (absorbed ইত্যাদি) হইয়া পড়িল। যথা—ক্যামেরার প্লেটে ছবি উঠিবে; কিন্তু মধ্যে যদি দৃশ্য, অদৃশ্য কোনও পরদা (screen) থাকিয়া রশ্মিগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তবে? আমাদের এই যন্ত্রে (ভিতরে এবং বাহিরে) ঐরূপ স্পন্দগ্রাসক পরম্পরা বিদ্যমান; কতকগুলি মিত্র, কতকগুলি বৈরী। ভিতরে এদের বৈরী-রূপটির সাধারণ নাম 'পাপ্মা'। লাইকোপোডিয়াম ডাস্ট ছড়ানো কোন কাচ ফলকের নিকটে বেহালা বাজিতেছে, বিষমবিন্যস্ত রেণুপুঞ্জে কোনও সুষমাকৃতি ফুটিবার কথা, যদি মাঝে কোন damping, screening, scattering পরদা না থাকে। গায়ত্রী প্রভৃতিতে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই ব্যাহৃতিত্রয় ঐ ত্রিবিধ পাপ্মা পরিহার করে। 'ভূঃ' ('এই') দ্বারা প্রথম 'গ্রাস' (absorbing, damping); 'ভুবঃ' দ্বারা দ্বিতীয় (scattering, refracting etc.); এবং 'স্বঃ' ('সেই') দ্বারা তৃতীয় (screening, bounding) পরিহার কর। যথাক্রমে, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য দেবতা।

পাপ্মা, এনস্ ও মন্যু

তারপর, 'কলঙ্কিত' (distorted, deformed) সুষম বীচিগুচ্ছ তটবাতাদি-প্রহত অথবা পরস্পর প্রহত হইলে তাহাদের সৌম্যমান হারায়। বিশেষতঃ ভিতরে এ সব বাধার সাধারণ নাম 'এনস্'। যথা, ক্যামেরার প্লেটে বিজাতীয় রশ্মি (স্পন্দ) পড়িয়া ছবিটি বিকৃত করিল। এই বিরুদ্ধ স্পন্দগুলি মিত্র গ্রাসে পাতিত করা হইল 'ভূতাপসারণ'।

দুইটি বিজাতীয় স্পন্দের সংঘর্ষের ফলে যে অবশ্যম্ভাবী বিকৃতি, সে বিকৃতিতে যদি গুরু প্রকৃতিবিপর্যয় ঘটে (যথা, ক্যামেরার একটা ছবিতে অপর একটা ছবি পড়িলে হয়), তবে হয় বিপর্যস্ত। এটি গুরুবিকৃতি। জপাদিতে কায়াদির যে অভীষ্ট স্পন্দ, সেটিকে লঘু-গুরু দ্বিবিধ বিজাতীয়-স্পর্শ-সংঘর্ষ নিমিত্ত বিকৃতি থেকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। জপকালেও বটে, জপান্তেও বটে। জপান্তে যে সুষম-শান্ত স্পন্দবাহিতা সুরু হয়, সেটিকে সাগ্নিকের অগ্নির মত রক্ষা করাই প্রশস্ত। ডাক্তার

কোনও তেজী ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়া রোগীকে যেমন কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতে বলেন, তেমনি, অন্ততঃ কিছু সময়, জপ ধ্যানাদির মিত্রস্পন্দগুলিকে আপন প্রকৃতির সংস্কার-নাড়ীসমূহে 'শোষিত' (assimilated) হইতে দেওয়া আবশ্যক। সহসা এই সোম (পোষণী) ধারাকে ভ্রষ্ট, বিপর্যস্ত, পরাস্ত হইতে দিতে নাই। যে মহাভেষজ ভিতরে গেল, তাকে সঙ্গে সঙ্গে উগ্‌লাইয়া ফেলিয়া কি হবে? অথবা, সঙ্গে সঙ্গে কোনও antidote দ্বারা তাকে পরাস্ত করিয়া? বিপর্যস্ত করে যে সব বাধা, তাদের নাম দাও—'মন্যু'। 'মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্'।

'মৃত্যু'

শেষকালে, তোমার অভীষ্ট স্পন্দের বা স্পন্দধারার অবলুপ্তি-বিলুপ্তি যাতে না হয়, সেটি দেখ। 'অনিরাকরণং মেহস্তু'। নামাদিকে নাদাদি ধ্রুবকোটিতে তুলিয়া না দিতে পারিলে, এই অবলুপ্তি পরিণাম অপরিহার্য। তোমার কূপের জল কখনও শুখাইবে না, যদি তাকে চিরবহমানা কোন অন্তঃসলিলায় সংযুক্ত রাখিতে পার। সমর্পণ-যোগ বিশেষ করিয়া সমাশ্রয়ণীয়, এই চির-চাওয়া চির-পাওয়ার মিলন-নাড়ীটি বাহাল রাখার নিমিত্ত। 'আমার' কাটা কূপ, 'তোমার' দেওয়া অফুরান স্বাদুসলিলে (এবং অন্তে, অমৃতে) ভরিয়াই রাখ,' হে আমার একান্ত-শরণ স্বামী! অবলুপ্তি ইত্যাদি যেটি ঘটায়, তার সাধারণ নাম 'মৃত্যু'। তাই 'মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাহমৃতাৎ'।

সমর্পণ যোগ

পূর্বোক্ত অপহ্নবগুলি স্পন্দবিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে মুখ্যতঃ বিবেচিত হইল। এরা সার্বভূমিক, এবং এদের প্রতিবিধানও তদ্রূপ। সাধনে এরা সবিশেষ উদাহৃত। এর মধ্যে তামস-রাজস ভেদটিও সযত্নে লক্ষ্য করিও। তামস পরিহারের নিমিত্ত চন্দ্রমাঃ, আর রাজস নিবারণের জন্য চন্দ্রমা ভজনীয় তত্ত্ব। অর্থাৎ যথাক্রমে, জ্যোতিঃ এবং জ্যোৎস্না। উভয়েই 'জ্যোৎ' এই রহস্যমূল (base) টি আছে, তা বলা হইয়াছে। পূর্ব পরিভাষায় সেই ভর্গস্ এবং রোচিস্। সমর্পণ-যোগটি এইরূপে ভাবনা কর—

ক্ষয়িষ্ণুং মে দীপং প্রথয়তি পুনর্ভালকিরণৈঃ।
পুনর্ভাবং গ্রস্তং লসয়তি মুদা চেন্দুলসিতৈঃ। (দধতু বিমলং চেন্দুনখরাঃ)

কলঙ্কং মার্ষ্টীয়ং মুখশশিরুচিশ্চাঙ্করহিতা
বিপর্যস্তং স্বস্থং স্থিতমপি গতং নামকথনাৎ॥ ৮৯ (ভাতি হৃদি চেৎ॥)

প্রদীপ আমার নির্বাণ-উন্মুখ তব ভালরশ্মি নাথ করুক উজ্জ্বল। (করে সমুজ্জ্বল)
তোমা পানে 'গ্রস্ত' ভাব মোর, বিলসিত নখরেন্দু করুক বিমল॥ (করে সুবিমল)
বিন্ধ যত মোর কলঙ্ককালিমা, নিষ্কলঙ্ক মুখশশিরুচি মুছে লয়।
স্বস্থ, যাহা বিপর্যস্ত, যাহা গেছে, তাও রয়, যদি হৃদে আন নাহি ভায়॥
(প্রাণ যদি 'নাথ' নাম গায়)
(যদি দাও 'নাথ' নামে জয়॥)

এইরূপ সমর্পণেই পূর্বকথিত (প্রথম খণ্ডে) পঞ্চশুদ্ধির মূল যে সঞ্চারশুদ্ধি, সেটি সাধিত হয়। আর, মূলে রসসঞ্চার শুদ্ধ হইলে, বিষগুল্ম অমৃতবল্লী হইতে কতক্ষণ! তাই, পূর্ব এক কারিকায় যে পঞ্চশাখ বিষোদ্ভিজ্জের কথা হইয়াছে, সেটিকে পঞ্চশাখা সুধাবল্লীতে পরিণত করার নিমিত্ত, সমর্পণযোগে মূলে সঞ্চার শুদ্ধি হইতে দাও। দুটির মূলেই 'অহমে'র গ্রন্থি আছে বটে, তবে, একে সে গ্রন্থি 'নিরাকরণ' গ্রন্থি, অন্যে সেটি 'অনিরাকরণ'। ব্রহ্ম অথবা ভগবত্তা নিরতিশয় শুদ্ধ রসসামগ্রী। যদি তোমার 'অহং' গ্রন্থি, তাকে 'নিরাকৃত' করে, তবেই রস হয় অপরস, বিরস ইত্যাদি। যেমন, কূপের জলের আপন যোগানটি যদি রুদ্ধ হয় তবে সে দূষিত, ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি; অতএব, 'যোগ' ঠিক রাখ।

শাখা পঞ্চ পঞ্চ

বিষগুল্মটিকে সাধারণভাবে 'দুর্মনাঃ' বলা হইয়াছে। এর পঞ্চশাখা— অপমনাঃ, অবমনাঃ, বিমনাঃ, অন্যমনাঃ, অমনাঃ। পক্ষান্তরে, সুমনাঃ সুধাবল্লীর পঞ্চশাখা—অনুমনাঃ, প্রতিমনাঃ, যতমনাঃ, মিতমনাঃ এবং স্থিতমনাঃ। এই যে দশটি মনঃসংস্থা (mind attitude), এতেই সমগ্র মনোবিজ্ঞান 'সংক্ষিপ্ত' জানিবে। অর্থাৎ, এ দশের বাহিরে মনের ব্যাপার (সমনাঃ ভাব) নেই, বুঝিতে হইবে। Psychic and parapsychic (subconscious ইত্যাদি)—এ দুই-ই এই 'দশধা'তে আসে। প্রাণে

এবং বাকেও এই দশধাত্ব নিহিত (যথা, বাকে—বাচিক, উপাংশু, মানস, এই তিন বৈখরী; অবর-বর সন্ধি সহ সেতু, এই তিন মধ্যমা; সকৃৎ পশ্যন্তী, সদা বা সনাৎ পশ্যন্তী এবং 'দিবীব' বা শুদ্ধা এবং অনন্তা পশ্যন্তী, এই তিন পশ্যন্তী; এবং, শেষে, পরা;—এই দশ)। এই দশধাকে 'মনোদোহা' ইত্যাদি করার নিমিত্ত দশধা জপ।

প্রণবের পঞ্চমাত্রায় অন্বয়

আবার, প্রণবের অকারাদি পঞ্চমাত্রা দ্বারা যথাক্রমে অপমনাঃ ইত্যাদি পাঁচটি দৌর্মনস্য পরিহার কর; এবং অনুমনাঃ ইত্যাদি পাঁচটি সৌমনস্য অধিগত কর। এক একটি লইয়া ভাবিয়া দেখ। প্রণবের অকারে চিত্ত-প্রাণাদির স্পন্দের অপক্ষীয়মাণতা (অপমনাঃ) পরিহার করতঃ অনুবৃত্তি (অনুমনাঃ) আরব্ধ কর। উকারে 'অব' কে কর 'প্রতি'। যেটি তলাইয়া যাইতেছে তাকে কর প্রতিমুখীন। মকারে বিমনাঃ হৌক যতমনাঃ (divergent হৌক convergent)। নাদ মিতমনাঃ এবং বিন্দু স্থিতমনাঃ হবার স্থান। 'মিত' মানে সৌম্যমানে আসা—সুষমবিতানে, শান্তবাহিতায়।

ষট্ পূর্ণানি চ শূন্যানি চত্বারি বিন্দুবর্জ্জনে।
তেষু দশাননং জেতুং রামো দশরথাত্মজঃ॥ ৯০

পূর্বোক্ত গায়ত্রী লেখাদিতে ছয়টি পূর্ণ এবং ছয়টি শূন্যস্থল দেখান' হইয়াছে। এখন, ছয়টি পূর্ণের সংখ্যা ঠিকই রহিল। বিন্দুতে যে স্থিতি বা লয় শূন্য স্থল, সেটিকে বাদে শূন্যের সংখ্যা হয় পাঁচ। এ গুলি স্পর্শশূন্যের স্থল। এর মধ্যে, ব্যাহৃতির আগে এবং 'প্রচোদয়াৎ' এর অন্তে স্পর্শদ্বয়কে 'অর্দ্ধস্পর্শ' ভাবে লইলে, শূন্যের সংখ্যা হয় চারিটি। এটি ব্যাহরণে বুঝিয়া লইতে হইবে। এখন, ছয় আর চারে দশটিতে দশানন (রাবণ) আততায়ী হইতে পারে। কেমন করিয়া? উদয়ে যে বিন্দুশক্তি নাদরূপে উৎসারিত হইলেন, তাঁকে বল— 'স্'। এই 'স্'কে পূর্ণস্থলে পূর্ণমানে দেখায় যেটি, সেটিকে বল 'সী'। আর শূন্যস্পর্শস্থলে ঠিক তলমানে দেখায় যাহা, তাহাকে বল 'ত'! এবং পূর্ণ-শূন্য উভয়কেই শেষ পর্যন্ত বিন্দুলীনতায় (পূর্ণ-শূন্যের একত্রাবস্থানে) লইয়া যায় যাহা, তাকে বল—'আ'। পাইলে—'সীতা'। ইনি প্রণবাদি

মহানামের সাক্ষাৎ স্বরূপ-শক্তিরূপা। সীতাকে 'হরণ' করে দশানন রাবণ। রাবণ=রৌ+অণ (বা অন)। রু=শব্দ করা, উকারের বৃদ্ধিতে 'ঔ'। অণ্ বা অন্ গতি এবং প্রাণন বৃত্তি বুঝায়। এটি দশধা। 'রু', কিনা, ব্যাহরণাদির শব্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে, ভাবাদি, চন্দ্রমাঃ, এবং চন্দ্রমা, এই দুইতত্ত্বের দ্বারা নিরূপিত যে সৌম্য-মান, সেটিকে 'অতিক্রম' করিয়া, 'ব্যভিচারে' বৃত্তিমান্ হইলে হয় 'রাবণ'। প্রণবাদি যে কোন মহানাম জপধ্যানে স্বচ্ছন্দা, সুষমা, শোভনা যে 'সীতা' (স্বরূপশক্তি এবং বৃত্তি)কে ঐ রাবণ যাতে না হরণ করে, সে পক্ষে অবহিত রহিতে হইবে। দণ্ডকারণ্য কুটীরে লক্ষ্মণের 'গণ্ডী' টানা কেন, তা ভাবিয়া দেখ। গণ্ডী=সৌম্যমান মর্যাদা।

যদি সীতা অপহৃতা হন, তবে তাঁকে, রাবণসংহারকরতঃ সমুদ্ধারকারী প্রণবের যে পরমরমণ, পরমপ্রতাপী রূপ, তিনি হইলেন 'রাম'। পূর্বোক্ত রেণু-অটনাদি স্থলেও অটন থেকে রমণ পর্যন্ত, এই চারিটিকেই, স্বীয় পরম প্রতাপে, আপন পরম রমণে সংগৃহীত এবং সমাপ্ত করেন। তখন, এ চারি হয় রাম লক্ষ্মণাদি পরম-চতুষ্টয়। 'দশরথাত্মজ' পদেও ভাবনা দিও। 'দশরথ' শব্দেও 'দশ', কিন্তু 'রথ' শব্দে 'রথী'র ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। সুতরাং যিনি সর্বাধ্যক্ষ, তাঁর অধ্যক্ষতা, এখানে 'অস্বীকৃত' নয়। সর্বাধ্যক্ষ যে প্রণব বা মহানাম (রাম), তাঁর স্বরূপ শুদ্ধ মানদা সীতা। দশরথাত্মা সে অধ্যক্ষতার স্বীকার বা অঙ্গীকার ভূমি। মন্থরা-মন্ত্রণায় এর সাময়িক ব্যতিক্রমও ভাবিয়া দেখিও। গায়ত্রী প্রভৃতি জপে, সীতারাম, রাধে শ্যাম, গৌরী বা উমা শঙ্কর, ইত্যাদি ইষ্টবীজ এবং মহানামের মানদা যে অধ্যক্ষতা, সেটি রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্তরূপে, 'সীতারাম' শব্দ লইয়া কিছু বলা হইল।

মকর-সংক্রান্তি, ইত্যাদি অধ্যাত্মে

সুতরাং, ওঙ্কাররূপী 'রাম' এবং স্বরূপশক্তি এবং আকৃতিরূপা 'সীতা' মিলনেই রহিবেন। পুনশ্চ, ত্রিবেণীতে পূর্ণকুম্ভ স্নানটি এইভাবে সমাপন করিয়া ইষ্ট-জপ-ধ্যানে প্রবৃত্ত হও—

> ত্রিবেণীং মকরে গচ্ছেৎ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ মুণ্ডয়েৎ।
> অমায়ামম্ভসি স্নায়াদ্ বিন্দেত বিন্দুমাধবম্॥ ৯১

মকরযোগে ত্রিবেণী যাও, পৌর্ণমাসীতে মুণ্ডন কর; অমাবস্যায় সঙ্গমজলে স্নান কর। এই তিন কর্ম করিলে কি হয়? বিন্দুমাধব লাভ হয়।

মকরযোগ বাক্, প্রাণ, চিত্ত—এ তিনেই বুঝিয়া লইও। এ তিনে ‘শুক্লাগতি’ (অর্চ্চিরাদির) উপক্রম হইলেই মকর-সংক্রমণ। যেমন, শ্বাস দক্ষিণ নাসা থেকে বামে (চন্দ্রে) যাইতেছে। দক্ষিণে বহিয়া শ্বাস যদি থাকে ‘বাম’, তবে ‘বামেন দাক্ষিণ্যং’ এবং তদ্রূপ বাম শ্বাসনাড়ীতে সংক্রমণ হইল ‘মকর’। তোমার অভীষ্ট ‘অধ্বে’ বায়ু সংক্রমণ হইলে এই মকরযোগ মিলিল, বুঝিবে। সুষুম্নাবর্ত্মে হৃদয়-ভ্রূমধ্যাদি অভীপ্সিত স্থলে, এই যোগটি মিলিয়া যাইতে পারে—A decisive switch over, a pointed re-orientation. বাহ্যপ্রকৃতির মত অন্তঃপ্রকৃতিও কোনরূপ অভিনব উন্মেষ বিকাশাদির নিমিত্ত এই মকরযোগের ‘প্রতীক্ষা’ করে। পতন, ধ্বংসাদির স্থলেও ব্যতীপাত যোগাদি আছে। সে সব স্থলে সতর্ক হইতে হয়। শরীরের ব্যাধি, মনের আধি, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি জীবনে, এই দ্বিবিধ যোগ সবিশেষ লক্ষণীয়। বাকের দিক্ থেকেও ‘মকর’কে উপেক্ষা করিবে না। যথা, বৈখরী জপ যদি কোন স্থলে মধ্যমায় আসিয়া পড়ে, এবং তার ফলে জপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত যে নাদ, সেই নাদধারায় পতিত হয়। পক্ষান্তরে, ব্যতীপাতাদিও আছে। ধর, অউম। ‘ম’তে অন্তিম স্পর্শ দিয়া থামিয়া যাইতেছে (by jerk)। কিন্তু যদি দেখ, ‘ম’ নিজেকে শেষ হইতে না দিয়া নাদ-বিন্দু কলা এই ‘ত্রিবেণী’ আকৃতিতে ‘গুণিত’ করিয়া (evolve, work out) লইতেছে, তবে হইল—ম+কৃ (গুণ)= ‘মকর’। ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে ‘কলিতা’, হরজটাজালে বিন্দুলীনা, এবং নাদবাহিনী গঙ্গা এই ‘মকরাসনা’, ভাবিয়া দেখিও। ‘ম’তে লইয়া (ওম্, রাম, হ্রীম্ ইত্যাদিতে) তাকে বল— ‘তুমি শেষ হইয়া যাইও না’; নিজেকে গুণিত কর (‘কৃ’ এর গুণে ‘কর’)। চিত্তেও ধ্যানলোক, ভাব রস ইত্যাদিরূপে, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্তাদি চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যাহার করতঃ ‘সংযমে’ লইতে হয়। এটি পূর্বোক্ত মকর-আকৃতি। ‘ম’ যেখানে বলিতেছে,— ‘এই শেষ’, ‘ক’ সেখানে অভিনব ব্যঞ্জনমুখ ফুটিতে দিলঃ ‘ঋ’ তাকে উর্দ্ধ বা মূর্দ্ধন্য সম্বেগটি দিল, এবং বলিল— ‘উপরে ওঠ’, আর ‘ঋ’ গুণিত হইয়া বলিল— ‘আরও আরও উপরে ওঠ, যে পর্যন্ত মূর্দ্ধন্যধাম অধিগত না হইতেছে।’ মকরযোগে এই শুক্লা, উর্দ্ধগা ‘মাঘী’ আকৃতিটি অবশ্যই মিলাইবে।

বিন্দু-মাধব

মকরের 'কৃ' (অভিনব ঊর্দ্ধগা শুক্লা অভিব্যক্তি) যদি যথাক্রমে গুণিত হইয়া চলে তো, প্রথমে মিলে 'পৌর্ণমাসী' অন্তে 'অমা'। এ দুটি আগে বিবেচিত হইয়াছে, বিশেষতঃ গায়ত্রীর দৃষ্টান্তে। যেমন, একটা বীজ। যখন সেটি অঙ্কুরায়িত হইল, তখন 'মকর যোগ' (যথা, উদয় প্রণবে)। যখন সেটি পাদপরূপে পুষ্পিত হইল, তখন তার 'পৌর্ণমাসী'। আর, ফলে আবার বীজাকারে তার 'অমা'। এই পরিণতি চক্রটি ভাবনা করিও। মকরাদি একবার মাত্র নয়, বারংবার আসে। যেমন, শিশিরান্তে বসন্তানিলে পাদপে মুকুলোদ্গমে আবার 'মকর'। কিন্তু এই পরিণতিচক্রের পরমবিরামটি কোন্ স্থলে? তাই, কারিকায় শেষে— 'বিন্দুতে বিন্দুমাধবম্'। বারবার বিন্দুস্পর্শ অথবা বিন্দুবিশ্রাম, আর সাক্ষাৎ বিন্দুমাধব সমাশ্রয়, এ দুয়ে ভেদ আছে। শেষেরটিতে তোমার আচরিত জপচক্র লীন হয় বিন্দুমাধবকরে 'সুদর্শনে'। 'সুদর্শনের' সুদর্শন নিমিত্ত ঐ তিন যোগে পূর্ণকুম্ভে নিষ্ণাত হও। 'মাধব' শব্দে 'মা'+'ধব' বিভাজন করিলে, যেটি কখনই ত্যাগ করে না ('ধু'), এই অর্থ আসে। 'মা' নিষেধে। অথবা, 'মা'=আমাকে, যিনি 'ধব' স্বামী হইয়া গ্রহণ করেন, অনাথ বা অনাথা রাখেন না।

বর্ণরসায়ন ও রূপরসায়ন

আচ্ছা, 'মকর', 'মাধব' ইত্যাদি বহু শব্দ লইয়া 'প্রাণরসায়ণ' প্রভৃতির অজুহাতে ব্যাকরণ অভিধানের সকল 'ছাড়পত্র' সময় সময় ছিঁড়িয়া ফেলা কি চলে? এ আপত্তির উত্তর আগে দেওয়া হইয়াছে। প্রাণের গতি এবং ভাবের গতি এবং বাকের গতি—এ তিন গতিকে সমর্থ সঙ্গমে মিলাইবার নিমিত্তই শব্দ। সাধারণ ব্যাকরণবিধি এবং কোষ, এই সমর্থ সঙ্গমে তত্ত্বতঃ এবং পূর্ণতঃ সচরাচর লইয়া যায় না; তাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য ততদূর অবধি নয়। বিজ্ঞানে আভিধানিক ভাষার তো অপ্রতুলতা নেই; তবে রহস্য পরিভাষা, নাম, ফরমূলা, এগুলি কেন? সাধারণ লবণকে লবণ না বলিয়া NaCl বলা হবে কেন? প্রাণ, ভাব এবং বাক্—এ তিনকেই পরিপূর্ণ সমর্থ ব্যঞ্জনায় আনে যাহা, তাহাই শব্দের যথার্থ 'বর্ণরসায়ন'। বেদতন্ত্রাদি সকল রহস্য বিজ্ঞানেই এরূপ রসায়ন তত্ত্বতঃ এবং কার্যতঃ অঙ্গীকৃত

ও অনুসৃত। ওম্, হ্রীঁ ইত্যাদি কোন্ সাধারণী ব্যাকরণ বিধিতে পড়িবে? বর্ণ সম্বন্ধে যেমন, রূপাদি সম্বন্ধেও তেমন। রূপাদিকেও সমর্থসঙ্গমে নিষ্ণাত হইতে দিলে তারা আর সাধারণ সঙ্কেত (sign or symbol) থাকে না। তারা হয় প্রতীক্, বিগ্রহ, যন্ত্র, ইত্যাদি। সঙ্গীতে তাল, সুর আর ভাব-রস—এ তিনই সমর্থসঙ্গমে মিলে কিসে?—আলাপে। আলাপে তালাদি আর আলাদা করিয়া থাকে না। অথচ, শুদ্ধ আলাপেই রাগ যথার্থতঃ রূপায়িত। কেন না, গায়ত্রী ইত্যাদিতে যেমন, তেমনি আলাপেও স্বরত্রয় যে ওঙ্কার, 'তাকে নাদ-বিন্দু-কলা—এই ত্রিবেণীরূপে 'যুক্ত' এবং 'মুক্ত' করিয়া দেখাইতে হয়। মুমুচান ও মুক্ত, এবং যুঞ্জান ও যুক্ত—নাদবিন্দুকে এই 'চারিপাদে' যাহা কলয়ন করে; নিত্যযুক্ত যে নাদবিন্দু—সামরস্য, তাকে পরস্পর মুমুচান অথচ পরস্পর যুঞ্জান এক মিথুনরূপে ছন্দে, স্বরে, ভাবে, রসে, যাহা লীলায়িত করে, তাকে বল 'কলা'। ধ্রুপদ সঙ্গীতে আস্থায়ি প্রভৃতি চারিপাদে মুমুচানাদি ঐ চারিটি পাদ উদাহৃত হওয়া আবশ্যক। ব্যাহরণেও এই চারিকে মিলাও। যেমন, গায়ত্রী ব্যাহরণকে যদি মৃদঙ্গবাদনের সঙ্গে তুলনা কর, তবে 'বরেণ্যম্' স্থলে মৃদঙ্গের 'দক্ষিণে' পূর্ণ মুক্ত আঘাত (চাঁটি), আর, 'প্রচোদয়াৎ' স্থলে 'বামে' পূর্ণ যুক্ত আঘাত। এই আঘাতে বিলয় ওঙ্কার গভীর স্পন্দনে অন্তর্মুখ এবং সূক্ষ্ম হইতে হইতে বিন্দুতে লীন বা যুক্ত হইবেন। বীণাদি আলাপনেও নাদ-বিন্দু-কলাকে ঐ চারিভাগে দেখাইলে আলাপন পূর্ণ এবং সমর্থ হয়। মধ্যে মধ্যে 'আ' 'ঈ' 'ঋ' ইত্যাদি এক এক দীর্ঘ স্বরকে এমন এক সুষমা রণণী (in harmonic resonance) স্পন্দবিতানে আনিতে হয়, যাতে মুমুচান-যুঞ্জান দুটি 'কলাই' সহযোগে (in unison) চলিতে থাকে। ঈ প্রভৃতি দীর্ঘস্বরের এবম্বিধ সহযোগী স্পন্দ-বিতানকে বল— 'সেতু'। নাদবিন্দুর সেতু।

মূল-মাতৃকা

'মার্গ' সঙ্গীতের সাধনা এবং সিদ্ধির সঙ্গে গায়ত্রী প্রভৃতি ব্যাহরণের যে সাধনা ও সিদ্ধি, তার সাজাত্য (close affinity) আছে। উভয়েরই মাতৃকা-আকৃতি (Mother Pattern or Matrix) ওঙ্কার। সমগ্র নিসর্গ তার উদয়, স্থিতি, বিচিত্র উন্মেষ এবং বিলয়—এসব কয়টিতেই ঐ মাতৃকা-আকৃতিতে 'আহিত' (laid—as differentiated and integrated) রহিয়াছে। প্রণবই সব কিছুকে (পাদমাত্রাদিতে) বিন্দু-অণিমায় এবং নাদ-মহিমায় আকলিত-সঙ্কলিত করিয়া বিদ্যমান। সুতরাং ওঙ্কার সাধনই মূল এবং পরম সাধন। ওঙ্কাররূপা বাক্ 'সাম্না' উদ্গীথ হইয়া থাকে; যেমন সঙ্গীতে কোনও রাগের যেটি শুদ্ধ আকৃতি সেটি আলাপে আততা এবং উর্জ্জিতা হয়। শুদ্ধ আকৃতির 'ব্যত্যয়ে' (পূর্বোক্ত পঞ্চ অপহ্নবে) সেটি হয় না। ওঙ্কারের যে স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতঃশুদ্ধ পরমাকৃতি, তাতে অপূর্ব অধ্বগত্ব, ছন্দোগত্ব এবং ধামগত্ব বিদ্যমান, সেটি আদি-মধ্য-অন্ত সর্বত্রগ বলিয়া তুলনারহিত। এই অতুলনীয় 'স্বে মহিম্নি' থেকে চ্যুতি (অপহ্নব) কি উদ্গীথে, কি রাগালাপে একান্ত বারণীয়। উদ্গীথ কদাপি উদ্গীত মাত্র হইবে না; আলাপও কদাপি নিত্য স্ফোটস্বরূপ যেটি তার 'অপলাপে' পতিত হইবে না।

চারি 'রসায়ন'

এখন রাগ আলাপকে স্বরে এবং রেখায় (স্বরলিপিতে) যেমন দেখান' হয়, তেমনি মৌলিক ওঙ্কার প্রভৃতিতেও দেখান' হইতে পারে। এতেই প্রাণরসায়নের উদ্ভব। 'প্রাণ' শব্দকে মুখ্য অর্থে ('এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ') লইলে, প্রাণরসায়ন চতুর্বিধঃ বর্ণরসায়ন, রূপরসায়ন, ছন্দোরসায়ন এবং ভাবরসায়ন। এগুলি কিছুটা বিবেচিত হইয়াছে, এবং অতঃপর অন্যত্র হইবে। প্রথমটি Basic Sound-element Picture. যেমন, পূর্বোক্ত 'মকর' ইত্যাদি। তারপর, Basic Graph (যার নিমিত্ত উপযুক্ত Co-ordinates ভাবিয়া লইতে হয়)। যেমন, গায়ত্রী লেখাদি। তৃতীয়টি, Representation of relevant Basic Harmony Function. যেমন, সুষম উর্মিগুচ্ছ ইত্যাদি। চতুর্থটি মূল-ব্যঞ্জনাকৃতি ('রহস্য' বা 'উপনিষৎ')—Basic Significance Picture. যেমন, উদয়াদি স্থলে মূলসম্বন্ধী ভাবের গতি, পরিণতি। গায়ত্রীর ঐ ছয়টি কলায় এক একটিতে কি নিগূঢ় ভাব 'স্বতঃ' অভিব্যক্ত হইতেছে? কল্পিত জল্পিত ভাব 'চাপাইলে' কুলাইবে না। এ চারিটি ছাড়া সোমরসায়ন নাম দিয়া আরও একটি লওয়া যায়। পঞ্চ 'বাতিকগ্রস্ত' আমাদের তাহা হইলে পঞ্চ-রসায়ন মিলিয়া গেল। ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ—ভামতী ও মধুমতী। তাৎপর্য, বোধে কি ভাবে মহিমায় ফুটিল, আর আস্বাদে কতখানি মাধুর্য মিলিল—এই দুইদিক দিয়া দেখিয়া লইতে হয়।

ভামতী মধুমতী

ভামতী এবং মধুমতী এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনাই যাতে সত্য এবং সুন্দর হইয়া ফলিত হয়, তার নিমিত্ত চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা আমাদের ব্যবহারিক পঞ্চ রসায়নকে পঞ্চ অপহ্নব মুক্ত করুন!

ভামত্যৈ চন্দ্রমা ভাতু মধুমত্যৈ চ চন্দ্রমা।
ভালে চ হৃদয়ে মুঞ্চ মৃষাহন্ধশুষ্ককল্পনম্॥ ৯২

ব্যঞ্জনার যে ভামতী ছটা, তার নিমিত্ত 'চন্দ্রমাঃ' 'ভালে' তাঁর ভাতি স্বচ্ছোজ্জ্বল করিয়া রাখুন! আর, মধুমতী, রসসন্দোহরূপা যে আস্বাদনী বৃত্তি, তার নিমিত্ত 'হৃদয়ে' তাঁর বিমল কৌমুদীমাধুরী বিকিরণ করুন! একদিকে অন্ধ, মূঢ় কল্পনা, অন্যদিকে শুষ্কবিতর্ক-মরুমরীচিকাতুল্যা যে কল্পনা,—এ দুটিকেই 'মৃষা', কিনা, মিথ্যা জ্ঞানে পরিহার কর (মুঞ্চ)।

পূর্বোক্ত পঞ্চ রসায়নে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমার রসশালায় যেন এই দ্বিবিধা মিথ্যা কল্পনাকে ঢুকিতে দিও না! মৃষাকল্পনা বিসম্বাদিনী, সত্যের সংবাদ দেয় না; নিজেরা আপোশে বিসম্বাদ, কোন্দল করে। সত্যসম্বাদিনী যে কল্পনা, সে কল্পনাও, যোগমায়ার সহচরী। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগেও বটে। তত্ত্ববিজ্ঞান এবং প্রয়োগবিজ্ঞান, দুয়েকেই জিজ্ঞাসা কর—কল্পনা ছাড়া তাদের চলে কি? কিন্তু কল্পনা ভামতী এবং মধুমতী (যথা, গায়ত্রী এবং মধুমতী ঋক্)—এ দুয়ের আনুগত্য-পরিচর্যায় নিযুক্ত রহিবে।

'ভাল' 'হৃদয়' প্রভৃতির ব্যঞ্জনা

'ভাল' এবং 'হৃদয়' শব্দ দুটিকে শুধু 'স্থানিক' (local, regional) করিয়া বুঝিও না। 'ভাঃ+ল' আকৃতিটি পরীক্ষা করিও। ভাঃ=ভাতি, জ্যোতিঃ। 'ল'=লীন হবার স্থল। 'লীন' মানে লোপ পাওয়া নয় (যথা, বিন্দুলীনে)। কেন্দ্রস্থিত, ঘনীভূত হওয়া এস্থলে 'ল'এর মানে। অথবা, 'ল'=পৃথিবীতত্ত্ব। যাহা সুষুম্নাবর্ত্মের ঊর্দ্ধ সন্ধিতে বা মেরুতে (ভালে) থাকিয়া, 'অধস্তন' যে পৃথিবীতত্ত্ব, তাকে আপন রশ্মিদ্বারা আপূরণাদি করে, তাহাই 'ভাল'। গুরুধাম এস্থলে। সুষুম্না যখন জপাদি ক্রিয়ার ফলে

'শক্ত্যাহিত' (charged) হইতে থাকে, তখন সে 'চার্জ'কে জ্যোতিঃতে (প্রকাশাদিতে) 'সমৃদ্ধ' করে 'ভাল'; বাণী বা বাক্ সমৃদ্ধ করে 'বিশুদ্ধ'; রস-সমৃদ্ধ করে 'হৃদয়'; তেজঃ সমৃদ্ধ করে 'নাভি'; সাবলীলতা সমৃদ্ধ করে 'স্বাধিষ্ঠান'; আর সাধিষ্ঠ-স্থাপিত করে 'পৃথিবী'। সাধিষ্ঠ-স্থাপনাটি 'লং' বা পৃথ্বীতত্ত্বেই হইবে বটে, কিন্তু সুষুম্না-উন্মেষের উপক্রমে 'মূলে' যে 'ভূ', সে 'ভূ', 'ভূকম্পন' আকারে দেখা দেয়। A sudden surcharge of 'released' energy. উপরিকেন্দ্র সমূহের অধ্যক্ষতা বিশেষতঃ আবশ্যক হয়—'ভাল' এবং 'হৃদয়', এ দুয়ের অধ্যক্ষতা সমধিক বিশেষ করিয়া। ঐ 'ভূকম্পন' স্বাধিষ্ঠান শক্তিতে 'সাবলীল' হইয়া গোড়াকার কৃচ্ছ (spasmodic ইত্যাদি) রূপটি ছাড়ে। 'নাভি'তে 'কেন্দ্রস্থ' (অর-নেমিসহ) হয়। কিন্তু 'উপরি' হইতে 'প্রাণ', 'বাক্' এবং 'ধী'—এই ত্রিতয়ের (অর্থাৎ, হৃদয়, কণ্ঠ এবং ভাল এ তিনের) পরিভাবন, পরিভাষণ এবং পর্যবেক্ষণ না মিলিলে, নাভিস্থিতা যে তেজঃ শক্তি, তার রস, স্বর এবং জ্যোতিঃ আকারে উদ্‌বর্তন (sublimation) ঘটে না। সুষুম্নায় যে, 'চার্জিং', সেটিকে চারি প্রকারে ভাবিয়া লইবেঃ—

সুষুম্নায় 'চার্জিং

Top charge, Bottom charge, Central charge, Peripheral charge. শেষেরটিতে কোন 'কেন্দ্র' এখনও সজাগ-সক্রিয় হয় নাই; শুধু, কোন কোন স্থলে কখনও কম্পনাদির অনুভব হইতেছে। এই কয়টি ব্যতীত অপর এক 'অসাধারণ' শক্তি-পাতন বা জাগৃতি আছে। তাকে বল—Super charging. এতে সমগ্র সুষুম্না উদ্‌বুদ্ধ-উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এর উপক্রম মূলাধারে অথবা দ্বিদলে, অথবা উভয়ত্র যুগপৎ, হইতে পারে। জপে উদয়ে বিলয়ে, এই দুই স্থলেই বিশেষ করিয়া উক্ত 'উপক্রম'টি মিলাইতে হয়। শঙ্খাবৃত্তির আকৃতি লইলে, উদয়ে বিন্দু (বা Basic Point of the Spiral Axis) থেকে শঙ্খাবৃত্ত গতি সুরু হইয়া সেটি দক্ষিণ থেকে বামে ক্রমে উপরে আতত (expanded) এবং উর্জ্জিত (uplifted) হইয়া চলে। এমন যদি কোন 'ভূমি' ভাবনা করা যায়, সেখানে যাইয়া গতি-অক্ষের (axis of movement এর) দ্রাঘিমা সর্বাধিক, এবং তার সঙ্গে গতির আততি (extensivity)-ও সর্বাধিক, তবে সেই ভূমিই হইল পূর্ণোদয় বা গরিষ্ঠোদয় (maximum manifestation) -এর ভূমি।

উদয় সে পর্যন্ত চলিয়া 'মেরু' প্রাপ্ত হইবে। তখন হয় বিলয়ের 'পালা'। সে পালা চলিলে উর্জ্জিত এবং আতত শঙ্খাবৃত্তটি (Spiral as fully evolved and manifested) সেটি ক্রমে বৈপরীত্যে (in the opposite 'sense') অক্ষের দ্রাঘিমা এবং ব্যাপ্তির আততি হ্রস্ব করিতে করিতে সম্পুটিত হইয়া (as enfolded, involved) বিন্দুতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এ দুটিই ওঙ্কারের দুটি রূপ। সমষ্টি ব্যষ্টি সব কিছু উদয় বিলয় ওঙ্কারের এই দুটি রূপকে ধরিয়াই চলিতেছে। বিশ্বের সৃষ্টি এবং প্রলয়েও তাই। সুতরাং যে পরমমূল থেকে উদ্ভব, সে পরমমূলে সমাবৃত্ত হবার নিমিত্ত, প্রণবের শুদ্ধ আকৃতি সমাশ্রয় করা চাই। করিলে কি হয়? ভুবন বা সংসৃতিচক্রের গতির যে সম্বেগ (momentum) তাকে কাটাইয়া সহজে এবং অচিরে পরমমূলটি মিলাইতে পারা যায়। যেমন কোন equation বা system of equations কোনও কোনও Family of curves-এর নিরূপক। এখন, উক্ত equation-এর terms গুলিকে যদি কোনও কোনও 'শুদ্ধ' valuesতে লওয়া যায়, তবে curves গুলিও সঙ্গে সঙ্গে সরল, সুষম, সুগম ইত্যাদি হইয়া যায়। উদয়-বিলয় ক্রমে ওঙ্কার সাধন হইল সংসৃতি-চক্রের নিয়ামক equations গুলিকে যথার্থ শুদ্ধি সাম্যে আনয়নসাধন। এর ফলে, অবাঞ্ছিত এবং জটিল-কুটিল eccentricities গুলির পরিহার ঘটে। প্রতিটি curve কে বলা যায়—'এই তোমার শুদ্ধ-সুষম-সরল আকৃতি; এতেই তুমি থাক, চ্যুত হইও না। চ্যুত হইলে 'স্বভাবে' সহজে ফেরা যায় না।'

'কেন্দ্রীণ' হওয়া—বিন্দুধারণম্

সমষ্টি-ব্যষ্টি, অণু-মহান্ নিখিল বিশ্ব যদি এইভাবেই ওঙ্কারে সমুদ্ভূত, সমাশ্রিত এবং সমাহৃত হইয়া বিদ্যমান, তবে সে মূল মাতৃকাকৃতি (প্রাণব্রহ্মরূপী বাক্), অস্মদাদির প্রত্যয়ে সদাপ্রকট এবং শুদ্ধপ্রকট হইয়া নেই কেন? ওঙ্কাররূপে যাহা পরাবাক্, সেটি মাঝখানে পশ্যন্তী এবং মধ্যমার দুস্তর ব্যবধান রাখিয়া আমাদের বৈখরীকণ্ঠে এবং কর্ণে এমন কুণ্ঠিতাদি আকারে আসিতেছে কেন? পরায় যাহা নিরতিশয়, পশ্যন্তীতে যাহা শুদ্ধ সমর্থ, মধ্যমায় নিত্যস্ফোটরূপ হইয়াও 'অব্যক্ত', সেটি বৈখরীর 'কণ্ঠে' এমন কুণ্ঠাকৃপণ হয় কেন? আর সে কুণ্ঠাদি কাটাই বা কি করিয়া?

ধর, আমাদের এই চক্ষু। আলোকরশ্মি এর রেটিনাতে পড়িলে রূপবর্ণাদির প্রত্যয় হয়। কিন্তু দৃষ্টিযন্ত্রে কোথাও রশ্মিস্পন্দ সমূহের 'কেন্দ্রীণ' (focussed) হবার 'উপযোগটি' থাকা চাই। নচেৎ, এলোমেলো ছড়ানো (irregularly scattered) স্পন্দগুলি জটলা করিয়া 'chaos' সৃষ্টি করিবে, কোন বিস্পষ্ট রূপজ্ঞান দিবে না। তাড়িতাদি অন্য অন্য স্পন্দের বেলায়ও তাই। শব্দের বেলাতেও তাই। প্রাণ চিত্তাদির স্পন্দেও ঐ কেন্দ্রীণতায় আসা চাই। নইলে, জটলা আর হট্টগোল। ঝড়ের সময় সাগর বক্ষে উন্মত্ত ঊর্মিসঙ্ঘাতে যেমন। অণু-বিরাট বিশ্বে, অন্তরেও, এই বিক্ষুব্ধ বারিধি-মত্ত-কল্লোলই যেন বেশী শুনিতেছি! কেন্দ্রীণতার বিন্দুতে অবস্থান প্রায়শঃ হয় না, তাই। পরম কেন্দ্রীণতার ঠাঁই হইল, ওঙ্কারের সেই 'বিন্দু'—the metaphysical Perfect Point. প্রণবাদি জপে সর্বত্র, সর্বাবস্থাতেই ঐ পরমকেন্দ্রীণ ঠাঁই (the Point of perfect focussing) মিলাইবার নিমিত্ত 'বিন্দু ধারণ' অভ্যাস কর।

যথা রূপে তথা শব্দে স্পন্দে কেন্দ্রীণতাং গতে।
অব্যাজবিঘ্নসংস্থানমথাতো বিন্দুধারণম্॥ ৯৩

কেন্দ্রীণসংস্থান হইলে স্পন্দের ব্যাজ (বৈরূপ্য) এবং বিঘ্ন (বৈগুণ্য) হইতে পারে না। তা হইলে, উন্মত্ত-ঊর্মি-মহাকল্লোল হইবে— 'ওম্'। (যেমন, সিন্ধৌ বিন্দুদশকমে।) অতএব, উদয়-বিলয়-ক্রমে বিন্দুধারণে সযত্নে প্রবৃত্ত হও। Chaos of discordanceকে 'Music of celestial spheres' এ আনিতে একমাত্র বিন্দুই সমর্থ। অধ্যাত্মক্ষেত্রেও ভাবিয়া দেখ। বিন্দু ছাড়া আর কেই বা রেণু-অটন-রটন-রণন এই তিনকে 'রেণুরমণ' করিয়া লইবে! তাই দেবতা ভালে শশিকলায় বিন্দুধারণ করিয়াছেন।

ওঙ্কার ও রামনাম

কিন্তু এইরূপ শুদ্ধ সমর্থভাবে ওঙ্কার-সাধন তো মহাবীরের সাধন। মহাবীর বায়ুনন্দন হনুমান। 'উ'কার বায়ুদৈবত। সুতরাং, প্রণবের 'উ'কে সমাশ্রয় করতঃ বিন্দুমেরুতে যে উদয়বিলয় সাধন, সে সাধন শুদ্ধ সমর্থ আকৃতিতে করিতে যে আদর্শ উপযোগ সেটি বায়ুনন্দন হনুমানেই রহিয়াছে। তিনি 'উ'কে লইয়া উল্লঙ্ঘনেই সমুদ্র তরিতে

সমর্থ। উদয়মেরু থেকে বিলয়মেরু পর্যন্ত বিস্তারিত সমুদ্র। অধম-মধ্যমাদি সাধারণ সাধকের উত্তরণের জন্য কি চাই? সেতুবন্ধন। সেটিও শ্রীমদ্ হনুমান গুরুরূপে কর্ণে 'রাম' নাম শুনাইয়া করিয়াছেন। কি ভাবে? 'অউম' এর 'উ'কে 'আ' করিয়া। 'উ' উর্জ্জিত রূপ; 'আ' আততরূপ। 'উ'তে সাগর অথবা গিরি লঙ্ঘন। আর 'আ' উত্তুঙ্গ যে গিরি অথবা দুস্তর যে সাগর, তাকে তোমার সাধ্যসাধনার 'তলে'ই আতত করিয়া পাতিয়া ধরে। কাজেই 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়েদ্ গিরিম্'। ওঙ্কার সাধনের 'বিকল্প' এটি নয়; 'অনুকল্প'। 'অনু' শুনিয়া নিষ্ঠা হারাইও না। মধুর অভাবে গুড় নয়। খাঁটি মধু যদি না সয়, মধুকে লও 'মধুর' করিয়া। তাতে খাঁটিও মিলিবে এবং সহ্য হইবে। 'অউম' যদি হন 'র+আ+ম', তবে, তোমার আমার জন্য কি হয়? সেতুবন্ধনাদি হইয়া সীতামায়ীর উদ্ধারটি হয়। এই শ্লোক দুটি ভাবনা কর—

অরণ্যোর্মথিতং হ্যগ্নিং রক্ষোভ্যো রক্ষতি স্বরাৎ।
মারুতেরূর্জিতং মার্গমাতম্ভনোতি সেতুনা॥৯৪
অন্তকস্য স্পৃশে রাতি সোমার্দ্ধধারিণো মুখাৎ।
লোকাভিরাম ওঙ্কার-স্তারকো রামনামতঃ॥৯৫

'অ' এবং 'র'

ওঙ্কারে আদিবর্ণ যে 'অ', সেটি অগ্নি বটে, কিন্তু অরণীদ্বয়ে আহিত অগ্নির মত সে অগ্নি অব্যক্ত (unmanifest)। বাকের দৈবত অগ্নি; বাকে আদি এবং সর্বব্যঞ্জনাশ্রয় যে অকার তাতে অগ্নি অবশ্যই অধিষ্ঠিত। অরণীদ্বয়কে 'মন্থন' করতঃ সে অগ্নিকে অভিব্যক্ত করিতে হয়। বাহ্য যাগের মত আন্তর যাগেও অরণীদ্বয়কে উপযুক্তরূপে ভাবনা করিতে হয় (যথা, 'আত্মানমরণিং কৃত্বা' ইত্যাদি স্থলে)। মন্থনে সমুদ্ভূত অগ্নি বিশেষতঃ 'র' বর্ণের দ্বারা প্রাণনে ব্যক্ত। অর্থাৎ, মন্থনে 'অ' হইল 'র'। এইবার তাতে বাহ্য অথবা জপ-ধ্যানাদি আন্তর যাগ হইবে। কিন্তু বাধা অন্তরায় সৃষ্টি করে 'রাক্ষস' (রক্ষস্ থেকে জাত)। এই রাক্ষস থেকে রক্ষা করেন কে? রাম—আপন আদিবর্ণ যে 'র' তদ্দ্বারা (স্ব-রাৎ)। প্রণবের 'অ' মন্থনে 'র' হইল বটে; কিন্তু সে 'র'কে রাক্ষস থেকে রক্ষা করেন 'রাম' এই নামের 'র'-কার। ইহাই প্রণবের অকারের রাম নামে 'র'কারে রক্ষা-রসায়ন।

মারুতি মার্গ

তারপর 'উ'। ওঙ্কারের ইহা মধ্যে রহিয়া বায়ুকুমার যে মারুতি তাঁরই উর্জ্জিত যে (ব্যোম) মার্গ সেটির নির্দেশ করে। মারুতি সাগর উল্লঙ্ঘন করতঃ এই উর্জ্জিত মার্গ দেখাইলেন। এ তো মহাবীর সাধন। প্রণবাদি জপে 'উ'কে সমর্থ শুদ্ধ উর্জ্জিতরূপে ফুটাইয়া তোলা যে গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইবার মতোই সাধন। পঙ্গুর কি উপায়? কাজেই 'উ'কে 'আ' করিয়া সাধনের ব্যাপ্তি বিতান সাধিত হইল। 'উ' এবং 'আ' স্বর দুটি উচ্চারণ করিয়া এই সুগমতা সাধনটি পরীক্ষা কর। ঐ সঙ্গে 'ঈ' 'ঋ' স্বর দুটিকেও প্রাণন-আকৃতিতে পরীক্ষা করিও। 'উ' আর 'ই' (বা 'ঈ')-এর মধ্যে প্রথমটিতে বেধমুখ্যতা, দ্বিতীয়টিতে লম্বমুখ্যতা রহিয়াছে। Vertically উঠিতে বা নামিতে 'ই', আর parabola ইত্যাদি curve আকৃতিতে 'উ'। Wavepattern এ তাই 'উ' মুখ্যতা। এদের তুলনায় 'আ' 'planar' function; অথচ উহা সুগম-বিতানে সীমা পর্যন্ত লইতে পারে—যদি ব্রহ্ম 'অনিরাকৃত' রহেন; যদি ব্রহ্মকৃপা বা ব্রহ্মময়ীর দয়া তাঁদের 'আ' দিয়া আমার প্রাণের 'আকরণ'কে আপূরণাদি করেন। এই নিমিত্ত 'আ' স্বরে সাধনে অনিরাকৃত-ইষ্টব্রহ্মে সমর্পণ যোগটি রাখা চাই। 'পারের কর্তা তুমি পার কর'—এই ভাব। এইটি হইলে, দুস্তর সাগর উত্তরণের যে মারুতি মার্গ, সে হইল—সুগম সেতু। কেবল অগণিত বানরচমূ কেন, ঐ তুচ্ছ কাঠবিড়ালীটিও এইবার সেতু সমাশ্রয়ে পারে যাইতে বাদ পড়িবে না!

অন্তকের অন্তিম স্পর্শ

শেষকালে 'ম' এই অন্তিম স্পর্শ বর্ণ। এ অন্তিম স্পর্শ তো অন্তকের (যমের) স্পর্শেরই কথা শোনায়। কিন্তু অন্তকেরও যে অন্তিম স্পর্শ তার, কথা? প্রণবের 'ম'তে সোম। নাদবিন্দুকলা অর্থাৎ 'সোমার্দ্ধ' (সোমের নাদকলায় এবং বিন্দুকলায় 'ঋধ্যমান' মাত্রা) ভালে ধারণ করতঃ ত্র্যম্বক হইলেন মহামৃত্যুঞ্জয়—যিনি মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন আর অমৃতে যুক্ত রাখেন। কাশীধামে সোমার্দ্ধধারীর মুখে তারকব্রহ্ম যে 'রাম' নাম তাহা শুনিয়া অন্তকের যে স্পর্শ তার অন্ত হইয়া যায়। তোমার ভিতরেও নিত্যকাশীধাম বিরাজমান। কোথায়, তা বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধে ভাবিয়া লও। যথা,

'হংস' যোগে 'হ' এবং 'স', এ দুটি বরুণা-অসি নাদ বা ওঙ্কাররূপা গঙ্গায় যেথায় মিশিতেছে, এবং নাদগঙ্গাও প্রবাহিতা হইয়া যেখানে বিন্দু অভিমুখে উত্তরবাহিনী হইতেছেন, সেখানেই কাশী। নাদ যদি কেবল বহিয়াই চলে তবে তার গতি 'দক্ষিণা' গতি; আর যে বিন্দুতে উদিত সেই বিন্দুতেই যদি ফিরিয়া চলে তবে গতি 'উত্তরা'। যেমন একটা curve. যে point of origin থেকে উদ্ভব তাকে যদি শুধু ছাড়িয়াই চলিতে থাকে তবে, এই পরিভাষা মত তার গতি 'দক্ষিণা'; কিন্তু Origin এ ফিরিলে 'উত্তরা'। এইরূপ আবার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি লইয়াও কাশীধামের সন্ধান কর। 'ত্বং' আর 'অসি' এ দুইএ বরুণা-অসি যদি বল তবে 'তৎ' রূপ পরমে যে সাধিষ্ঠা লক্ষণা তাহাই উত্তরবাহিনী গঙ্গা। লক্ষণা (তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্) অন্যমুখে যাইলে তা হয় না। এইরূপ নানা অনুবন্ধে কাশীধাম আপনাতে ভাবিও। জপধ্যানে 'রাম রাম' 'ওঁ রামঃ', 'জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম' ইত্যাদি মন্ত্রে কাশীশ্বর সোমার্দ্ধধারী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ঐ মন্ত্রকে তারকব্রহ্ম নাম রূপে তোমায় শোনান, এবং সে শ্রবণে কি হয়? 'শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম। শমন ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম॥' অন্তকের স্পর্শ অন্তিম স্পর্শই (অমৃতমকার) হইয়া যায়। সুতরাং 'অউম' এর শেষ বর্ণটিও 'রাম নামে' সাক্ষাৎ অমৃত স্পর্শ হইয়া যায়। এইভাবে মহাবীর-সাধন যে ওঙ্কার সাধন সেটি 'রাম নাম' রূপে 'লোকাভিরাম' হইয়াছে। অর্থাৎ সকল লোকের, সর্বাবস্থায় অতীব অভিরাম পরম রসায়ন। 'লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্।"

'অ'রূপেতে অগ্নি অরণীতে,
যাগ তরে 'র'রূপেতে করিলে মন্থন।
রাক্ষসেতে আসে যাগ কলুষিতে,
'র'কারের ব্রহ্মশরে করিলে বারণ॥
উচ্ছ্বসিত এ ভীষণ পারাবার,
মহাবীর 'উ'কারেতে করে উল্লঙ্ঘন।
ব্যোমমার্গ মারুতির উরজিত,
('আ'কারেতে) আতত সুগম করে সেতুর বন্ধন॥

অন্তকের নিজ অন্তিম পরশ,
ত্রিয়ম্বক মুখে 'ম' এ কর দান।
লোক অভিরাম করিলে ওঙ্কার,
সর্বপ্রাণরসায়ন 'রাম রাম' নাম॥

'রাম' নাম

ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে— 'রাম' নামে আলোচ্য চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা, এ দুটি তত্ত্ব কি ভাবে নিষেবন-নিরত রহিয়াছে। 'র' রূপে জাতবেদাঃ এবং রক্ষোঘ্ন যে অগ্নি, তাঁর পরিচর্যায় প্রথমতত্ত্ব (সুতরাং, এতদুদ্দেশ্যে 'ওঁ রামঃ' মন্ত্রটি বিশেষভাবে সমাশ্রয়ণীয়।) এবং মৃত্যুর পারে যে অমৃত, সে অমৃতে নিষ্ণাত হবার নিমিত্ত (অর্থাৎ রেণুরমণ লোকাভিরাম রূপে মিলাইবার জন্য), চন্দ্রমা। 'নমো রামায় রামচন্দ্রায়।' এতদুদ্দেশ্যে 'সীতারাম', 'সীয়ারাম', এই মহানাম দুটি লইও। মন্ত্র, ন্যাস, গায়ত্রী, কবচ—সবই অনুবন্ধানুরোধে আবশ্যক হয়। মহানামেরই এগুলি আপন 'আকলন'। কল্পিত, আরোপিত, সুতরাং পরিহরণীয় ভাবিয়া বসিও না। কূর্মের মত নাম বা বীজই এসব 'অঙ্গ' আপনা থেকে 'আকলন' করেন; এবং অনুবন্ধের উপসংহারে, আপনাতেই আবার 'সঙ্কলন' বা 'সংগ্রহ' করেন। উপসংহারের আগেই সংহার হইতে নাই। যেমন 'ওঙ্কার'। ব্রহ্মের আদিমা বাক্ (পরা)। ব্রহ্ম স্বয়ংই এর ঋষি, 'অগ্নি', রূপে দেবতা, গায়ত্রীরূপে ছন্দঃ এবং কর্মরূপে বিনিয়োগ। ব্রহ্ম স্বয়ংই এই চতুষ্টয়রূপে আকলন করেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত কি বা কে তাহা করিবে?

'সীতারাম'

প্রসঙ্গতঃ, 'সীতারাম' 'সীয়ারাম' নাম দুটি পূর্ব খণ্ডে কথঞ্চিৎ 'অবলোকিত' হইয়াছেন। 'ত'কার এবং 'য়' এই বর্ণদুটিতে ধ্যান দিও। প্রথমটিতে 'সেতু' পাতিয়েছেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ভক্তাবতার মহাবীর ('য' বা বায়ুবীজ রূপে) সাক্ষাৎ সহায় হইতেছেন জীবকে ভবসমুদ্র তরাইতে। পুনশ্চ, 'সীয়ারাম' এই নামে 'সীতারাম' 'হৃদয়ে' ('য' এর স্থান) যাইয়া বসেন ('জিন্ কা হৃদি মে রাম বসে')। আবার 'সীতারাম' নামে অযোনিসম্ভবা সীতা পৃথিবীদুহিতারূপে আবির্ভূতা হইয়া লীলা

অন্তে আবার পাতাল প্রবেশ করিতেছেন। কিন্তু 'য়' এ তিনি উদয়-বিলয়-রহিতা চিরপূর্ণা বিন্দুরূপা। সুতরাং বিন্দুলীনতার যে সাধন, তার নিমিত্ত 'সীয়ারাম' নামটির অপূর্ব উপযোগ বিদ্যমান। জপিয়া দেখ। প্রণবের আকৃতি এতে একান্ত অবারিত, অনিরাকৃত। এইরূপ অন্য অন্য ভাবেও 'ভাব-রসায়ন' করিয়া কৃতার্থ হও।

তারপর, 'মা' নাম লও।

'ম' ইতি সর্ব্বস্পর্শানা'ম' ইতি চ স্বরান্ত্যয়োঃ।
'আ' ইতি চালয়ো ব্যাপ্তিঃ সীমা ব্রহ্মময়ীতি 'মা'॥ ৯৬

'ম' এই অক্ষরে সর্বস্পর্শ (যাহা কিছু স্পর্শ করে বা স্পৃষ্ট হয়) লও। 'অ' এই অক্ষরে 'স্বর' এবং 'অন্ত্য', এ দুটিকে লও। কেবল বর্ণের দিক দিয়া নয়। এ দুটিতে, লক্ষণায়, সব কিছুর উদয় এবং বিলয় বুঝিবে। যেমন, কোনও স্পন্দ, ঊর্মি। এর সম্বন্ধে তিনটি মূল প্রশ্ন—উদয় বা আরম্ভ; স্পর্শ (পূর্ণের পানে এবং শূন্যের পানে) বা বিকাশ; এবং, বিলয় বা অন্ত। এ তিনের 'আলয়'—কি বস্তু? এ তিনের ব্যাপ্তি কোথায়? আর, এ তিনের পরিসীমাই বা কোথায়? সমষ্টি-ব্যষ্টি-নিখিল-বিশ্ব সম্বন্ধে এ তিনের উত্তর—'মা' ব্রহ্মময়ী।

ষড়ূর্মি

বাক্, প্রাণ, মন—এ তিন মিলাইয়া ওঙ্কারের, আপন সাধিষ্ঠরূপে 'মা' বলিয়া ডাকিলে, 'মা, মা, মা', নাম জপ করিলে সন্তানের ঐ আকুতিত্রয় (কোথায় আলয়? ইত্যাদি) 'মা' ই আপনি পরম অঙ্কে টানিয়া লইয়া মিটাইয়া দেন। আকুতিত্রয় সংক্ষেপে এই—কোন্ বা কার নিজ আলয়ে আছি? কোথায়, কতদূর যাইতে হইবে? কোন্ অবধি যাইয়া আবার আপন আলয়ে ফিরিব? স্পন্দ বা ঊর্মি মাত্রেরই এই তিন প্রশ্ন। জীব ষড়ূর্মিতে পতিত। এই ষড়ূর্মি কাটানোর নিমিত্ত 'একোর্মি' রূপ ওঙ্কার, 'মা', 'রাম', 'হরি'—এসব সমাশ্রয়। গায়ত্রী ছন্দে কি হইয়াছে? বাধক এবং ঘাতক যে ষড়ূর্মি, সেটি 'অমৃতায়' 'জ্যোতীরসায়' ষড়ূর্মি হইয়াছে—যাতে ছয়টি পূর্ণ, ছয়টি শূন্য স্থল। বিন্দুতে (সংস্পর্শস্থলে) পূর্ণশূন্য একত্র। ভূতের আর কালের 'ছক্কা' কাটাইবার জন্য অমৃতস্য

ধারাং দুহানা'—এই অপূর্ব অমৃতায়ন 'ছক্কা'! ষড়ূর্মিকে যদি প্রকারান্তরে 'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে' ইত্যাদি ষট্‌পরিণাম মনে কর, তবে গায়ত্রীর ছয়টি অমৃতোর্মি দ্বারা ঐ ছয়ের যথাক্রমে আপ্যায়ন, অমৃতায়ন কর। অর্থাৎ উদয় ওঙ্কারে 'জায়তে', ব্যাহৃতিত্রয়ে 'অস্তি' ইত্যাদি; শেষে, 'ম্রিয়তে' রাবণের নিমিত্ত—বিলয় ওঙ্কারে বিন্দুসমাশ্রয়। ঊর্মিসমূহের 'মারণ' স্পর্শকে 'জীওন' স্পর্শে লইবে কি করিয়া—ইহাই সমস্যা।

এতদর্থে নীচের কারিকাটি অবহিতচিত্তে ভাবনা কর—

পূর্ণে শূন্যে হ্যভয়ত ইহ স্পর্শমাত্রং দধানৌ
কান্তিং শান্তিং কিমুদয়লয়াবূর্ম্মিপাকে দধাতে।
আলীয়েরন্ যদি জনিলয়স্থানসিন্ধৌ লহর্য্যো।
বিন্দৌ সিন্ধুর্ভবতি যুগপচ্ছূন্যপূর্ণঃ সমাপ্তঃ॥ ৯৭

বিশ্ব ঊর্মিপাকে অসহায় পতিত তোমার,
অবিশ্রান্ত চলে তোলাপাড়া।
জীবনের শূন্যে পূর্ণে শুধু চকিত পরশে
কোন্ কান্তি কোন্ শান্তি দিল সাড়া?
জীবনমরণ, দিবাযাম, নিদ্রাজাগরণে,
কেবা পূর্ণ বল, কেবা তরপিত?
লহর চূড়ায় উঠিতে না উঠিতে পতন,
সানুকোলে শোয়ামাত্র বিতাড়িত!
এ অশেষ লহরীর দোলা যদি হয় শেষ
উদয়-বিলয়-আলয় সাগরে।
যত অল্প, যতেক ভঙ্গুর, যদি হয় স্থির,
অখণ্ড বিপুল আপন আধারে॥
তবে জেনো, সেই স্থির শান্তভূমি সবাকার,
একাধারে চির পূর্ণশূন্য হয়।
পূর্ণ ও পরম, শেষটি নিঃশেষ একঠাঁই,
বিন্দুতেই যদি সিন্ধু সমাপয়॥

খণ্ডোর্মি ও ঘাতোর্মি

জপধ্যানাদি সাধনে এক এক বর্ণ, রূপ, ভাবাদিকে এক এক খণ্ডোর্মি এবং ঘাতোর্মি থাকিতে দিলে তো হয় না। প্রথমে তাদের এক অখণ্ড নাদসিন্ধুতে সুষম লহরীভঙ্গিমায় মিলাইতে হইবে; এবং অন্তে, সে নাদসিন্ধুকেও বিন্দুতে লইয়া শূন্যপূর্ণ সমাপন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রণবাদর্শে (এবং গায়ত্রী ছন্দে) 'মা' এই একাক্ষর মহামন্ত্র সাধন কর। 'গায়ত্রী ছন্দঃ' বলিতে বিন্দু থেকে সুষম-সমর্থ আকৃতিতে যাদের উদয় এবং তাতেই সুষম-সমাপ্ত আকৃতিতে বিলয়। যথাক্রমে, চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা। ঐ আকৃতিতে কয়টি পাদমাত্রাদি রহিবে, সেটি 'সামান্য' প্রশ্ন নয়, 'বিশেষ' প্রশ্ন।

'মা' নাম এবং গায়ত্রী

'মহামায়া'সূত্রে বলা হইয়াছে যে, 'মা' এই নামে প্রণবের সর্বমাত্রাই সমাহৃত।

অকারোকারমকারাশ্চ নাদবিন্দুকলা অপি।
ষড়ূর্ম্মিশমনে ষণ্নাং 'মা' ইতি নামভাবনম্॥ ৯৮

অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা—এ ছয়টির 'ভাবনী' যে মহামায়া, তাঁর সাক্ষাৎ নাম যে 'মা', সে নাম কি করে? পূর্বোক্ত ষড়ূর্মিকে নাদে সুষমবিতান করিয়া পুনশ্চ বিন্দুতে সুষম সমাপনে লইয়া যায়; সুতরাং, ষড়ূর্মি শমন হয়। ব্রহ্মের স্বাভাবিক নাম 'ওম্'। ব্রহ্মময়ীর স্বাভাবিক নাম 'মা'। এই একাক্ষর মহামন্ত্রের ঋষি স্বয়ং মহামায়া; দেবতা, পরমাম্বিকা; ছন্দঃ, গায়ত্রী; বিনিয়োগ —সর্বশমন, সর্বসম্পূরণ। এই মন্ত্রের গায়ত্রী এই আকৃতিতে ভাবনা করিতে পার—

ওঁ মা মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে বিন্দুবাসিন্যৈ ধীমহি
তন্নঃ পরমাম্বিকা প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ ॥ ৯৯

এবম্বিধ গায়ত্রীজপে 'বিদ্মহে' স্থলে 'চন্দ্রমাঃ' এবং 'ধীমহি' স্থলে চন্দ্রমা প্রসন্ন হউন। 'ভাতি' স্বচ্ছ—সমুজ্জ্বল না হইলে 'বিদ্মহে' হয় না; আর 'ভাবরস' শান্ত প্রগাঢ় না হইলে 'ধীমহি' হয় না।

পুনশ্চ, প্রাণের দিক থেকে এইভাবে সাধন করঃ—

উদরং নান্নপানে বা নাসিক্যৌ বিভৃতোঽনিলৌ।
ব্যান এব বিভর্ত্ত্যেকঃ সমানোদানসঙ্গতৌ॥ ১০০

এই যে উদর, ইহাকে অন্নপান 'ভর্ত্তি' করে না; নাসিক্য যে প্রাণাপান বায়ুদ্বয় (অনিলৌ) তারাও 'ভর্ত্তি' করে না। এখানে 'ভর্ত্তি' মানে 'পূর্ত্তি'। তবে কিসে ভর্তি-পূর্তি হয়? সমান এবং উদান এ দুইএর সঙ্গতিতে, বিতান এবং সন্ধি (মেরু), এতদুভয়রূপ যে ব্যান, সেই ব্যানই একা এটি ভর্তি করিতে পারে। জপে, ব্যানের দুটি আকৃতি—নাদ এবং বিন্দু। দুয়েরি মেরুসংস্থা রহিয়াছে। উদয়ে এবং বিলয়ে পূর্ণ স্থলে উদান, আর শূন্য স্থানে সমান ঠিক সঙ্গতিতে থাকা আবশ্যক। উদান নাদের 'চূড়া'গুলিতে পূর্ণ স্পর্শ ঠিক দেখাইয়া যাইবে; আর সমান 'সানু'গুলিতে শূন্যস্পর্শ। দুইয়ের কর্মসমাপনে বিন্দুসংস্পর্শ।

প্রাণ ব্রহ্মের আদিম ব্যাকরণ

শ্রুতি ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া 'প্রাণস্য প্রাণঃ' বলিয়াছেন। সেই ব্রহ্মরূপ প্রাণ, আপনাকে পঞ্চধা, দশধা ইত্যাদি আকৃতিতে ব্যাকরণ করিয়াছেন। প্রাণের আদিম ব্যাকরণ প্রণব, এবং সে প্রণবের ছন্দঃ গায়ত্রী। পঞ্চধা, দশধা ইত্যাদি রূপে বহু হইবার নিমিত্ত 'ছন্দসাং মাতা' গায়ত্রীও ছন্দাংসি হইয়াছেন। কিন্তু, ব্রহ্ম-ব্যাকরণের মূল সূত্র ঠিকই থাকে—অর্থাৎ যারা ব্যাকৃত হয়, তারা ব্রহ্মকে 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্' রূপে রাখিয়াই থাকে; 'অচ্যুত' 'অব্যয়' 'অক্ষর' রূপেই পাইয়া থাকে। প্রাণের পঞ্চধা ব্যাকৃতিতে ব্রহ্ম 'ব্যান' রূপে তদ্ভাবে রহিয়াছেন। তাই নিখিল প্রাণনবৃত্তিতে ব্যানের বিতান (নাদ) এবং সন্ধি (বিন্দু)—এ দুটি ভাবের অভাব ঘটে না। এইবার এটি স্মরণ রাখিয়া 'মা' এই ব্রহ্মময়ী নামটি ভাবনা এবং সাধনা কর। 'মা' নামে 'ম' এবং 'আ' এই দুটি অক্ষরকে আশ্রয় কর এই ভাবনার নিমিত্ত।

প্রশ্ন এবং উত্তর

যেমন, গীতায় অষ্টমাধ্যায়ে অর্জুন যে কয়টি প্রশ্ন (সাতটি) করিতেছেন, শ্রীভগবান্ তিনটি শ্লোকে তাদের উত্তর দিতেছেন। উত্তর ব্যৌৎপত্তিক, ঔপপত্তিক এবং

সাংসিদ্ধিক—এই তিন প্রকারের হয়। শ্রীভগবান্ প্রথমে ব্যোৎপত্তিক (ঐ তিন শ্লোকে) উত্তর দিয়া, পরে 'ওমেকাক্ষরং ব্রহ্ম' বলিয়া ঔপপত্তিক উত্তরও দিয়াছেন। 'ঔপপত্তিক' মানে যেটিতে 'উপপত্তি' কিনা প্রমাণ (actual verification হয়)। সাংসিদ্ধিকটি আত্মপ্রত্যয়ে নিজেই মিলাইতে হয়। যথা, ব্রহ্মসংস্পর্শ সুখটি বিন্দুলীনতায়। সেখানে বিন্দু='পর' যদি বল, তবে উদয়-বিলয় সমস্ত লেখটি 'অবর'। এই 'পরাবর' দৃষ্ট হইলে তবে শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ ফলশ্রুতি—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' ইত্যাদি। 'মা' নামটিকেও ঐ তিন দৃষ্টিতে দেখিবে।

মাতুর্মেতি ক্ষরিতমনিশং ভালসোমামৃতং য-
দাতঃ সান্দ্রোরসি সমুদিতা স্নেহবৃণ্ মেঘমালা।
আধ্যে শশ্বচ্চিরমরুভূবি প্রোষিতাভ্যাং যুবাভ্যাং
কা ভীর্মেত্যক্ষরকরুণয়া চাতকাহে চকোর॥ ১০১

আগে যে ব্যোৎপত্তিকাদি তিন প্রকারের অর্থভাবনা বলা হইয়াছে, তার মধ্যে প্রথমটিতে যৌগিকরূঢ়াদি অর্থবিচার করিতে হয়। এ বিচারে শ্রবণ-মনন-মুখ্যতা। বিসম্বাদ, সুতরাং, সংশয় এতে দূর হয় না। অতএব, এরূপ বিচারকে 'প্রাণ-রসায়নে', শাখাপল্লব-পরিহারী করতঃ মূলাশ্রয়ী কর। মূলের পানে গতি হইতে থাকিলে, ভাবনা হয় ঔপপত্তিকী। এতে নিদিধ্যাসন-মুখ্যতা। অ, উ, ম লইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি কত না বিকল্পনায় বিব্রত ছিলে। এইবার অকারাদি বাক্‌ত্রিবেণী কোন্ নির্বিকল্পক স্ব-ভাবে লইয়া যাইয়া সম্মিলিত, সমন্বিত হইতেছে, তার অনুকরণ কর। শেষকালে, সাংসিদ্ধিকীতে সাক্ষাৎকারমুখ্যতা। এইবার 'মা' নামে এই তিন ভাবনাকেই নিত্য ভাবনা কর। মায়ের (মাতুঃ) 'মা' এই মহানাম পূর্বে 'মহামায়া' সূত্রাদিতে কথিত এবং বন্দিত হইয়াছেন। এখানে এইভাবে দেখ—'মা'='ম' এবং 'আ'—এই দুটি অক্ষর। 'ম' কি দেয়? সদাক্ষরিত যে ভালসোমামৃত তাই। এ অমৃতের ক্ষয় নাই, তাই অক্ষর। আর 'আ' অক্ষরে কি পাই ('আতঃ')? মায়ের আমার হৃদয়ে নিত্য-সমুদিতা স্নেহবৃট্ যে সান্দ্রমেঘমালা, সেই চিরস্নেহ-রস-সম্ভারা মেঘমালা। 'সান্দ্রা' শব্দটিতেও ধ্যান দিও।

ভাল ও হৃদয়

আচ্ছা, এই সদাক্ষরিত ভালসোমামৃত, এবং এই চিরবর্ষী হৃদয়মেঘের কি প্রয়োজন হইল? সেই চকোর আর চাতকের কথা মনে আছে তো? চকোর নির্বাসিত (প্রোষিত) এক চিরতমসার দেশে, যেথায় একটিবারও একটি খণ্ড শশিকলা তার ভাগ্যে সমুদিত হয় না। আর চাতক প্রবাসী এমন এক চির-মরুভূমি-মাঝে, যেখানে কোনওদিন ভুলিয়াও 'তাতল সৈকতে' বারিবিন্দুটিও পতিত হয় না। কিন্তু, অহে চির-প্রাণরস-বিধুর চকোর-চাতক! তোমাদের (যুবাভ্যাং) কি ভয়—যতক্ষণ 'মা' এই নামের মহাক্ষরযুগল করুণায় বিগলিত হইয়া যুগপৎ ঐ 'ক্ষরিতমনিশং' সোমামৃত এবং সান্দ্র-সমুদিতা স্নেহবৃট্ মেঘমালা হইতেছেন? এখানেও 'ভাল' এবং 'উরসি' শব্দ দুটিতে ধ্যান দিও। ললাটরশ্মি অথবা প্রতিভা ব্যোৎপত্তিকাদি অর্থবিচারে বিশারদী হইবে বটে; কিন্তু পরাবাকের মধ্যে নিগূঢ় যে জ্যোতীরস তাকে সাক্ষাৎকারে মিলাইতে বাকের 'অক্ষর-করুণা' ভালসোমামৃত এবং হৃদয়-মেঘমালা—এই দুই আকারে বিগলিত হইবেন। নতুবা, যে চকোর চায় 'স্নিগ্ধকিরণ' তার ভাগ্যে মেলে 'শুষ্কদহন'; আর যে চাতক চায় 'শাওনের অঝোর বরিষণ', তার ভাগ্যে ঘটে শুধু 'ভাদরের গুরু গরজন!' তাই, নামের 'অক্ষর-করুণা' না বিগলিত হইলে কি চলে?

চন্দ্রমাঃ চন্দ্রমা আদিত্য

ন হি পশ্যতি পশ্যন্তীং চন্দ্রমসোঽ প্রসাদতঃ।
ন মধ্যমা মধ্যমেতি চন্দ্রমা নোদিতো যদি।
ন পরাপারীণঃ কশ্চিদাদিত্যহৃদয়ং বিনা॥ ১০২

জ্যোতিষ্মতী বৃত্তিতে চন্দ্রমাঃ প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত 'পশ্যন্তী' দৃষ্টিতে আসে না। চন্দ্রমাঃ-প্রসাদের উপক্রমে ললাটাদিস্থলে তারকাদিরূপে যে জ্যোতিঃ দেখা যায়, সেটি হয়তো প্রথমে তত শুভ্রোজ্জ্বল নয়, স্থির (steady) ও নয়; হয়তো কিছু রক্ত-পীতাভ এবং বিকম্পিত (twinkling)। এতে বোঝা যায় যে তমসার আবরণ এবং রজসার বিক্ষেপণ (screening and scattering momenta) এখনও অল্পাধিক প্রচুর। এস্থলে কণ্ঠেও এবং শ্রবণেও ধ্বনি যেন আবৃত (গুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত),

এবং বিক্ষিপ্ত (লুণ্ঠিত, distracted) প্রকাশ পায়। ধ্বনি 'কাটাকাটা' (as jerking) এবং 'অসম' (uneven) ভাবে মেলে। এসব কাটাইয়া ওঠার নিমিত্ত ভালে চান্দ্রমসী কলায় প্রপন্ন হইতে হইবে।

যে মধ্যমা নিত্য স্ফোট বা অনাহতা বাণীর স্থান, সুতরাং, স্বয়ং সেতুরূপা হইয়া বৈখরী ভূমি থেকে পশ্যন্তী-পরায় লইয়া যায়, সে মধ্যমায় গতিটি হয় না, তোমার 'হৃদয়ে' চন্দ্রমা (রোচিষ্মতী বৃত্তিতে) উদিত না হওয়া পর্যন্ত। জপাদি সাধনে রুচিরস গ্রন্থিটি না খোলা পর্যন্ত মধ্যমার যে অভাবনীয় সেতু, তার সন্ধান হয় না। অতএব, জপধ্যানে হৃদয়চন্দ্রমা উদিত হইতে দাও। গুরু রহুন ভালে; ইষ্ট রহুন হৃদয়ে। দুইয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদ।

শেষকালে, মনে রাখিতে হইবে যে, চন্দ্রমাঃ যে সুদর্শনচক্রের 'অর' এবং চন্দ্রমা যার 'নেমি', আদিত্য সে চক্রের 'নাভি'। আদিত্য-হৃদয়যোগে এই নিখিলনাভি 'ভেদ' করিয়া তবে পরায় পারীণ হইতে হইবে।

পরিদৃশ্যমান ঐ যে চন্দ্র, সেটি আমাদের এই সাধারণ মামুলি মনের প্রতীক। ঐ চন্দ্রের মত এই মামুলি মনেরও 'চক্র' আবর্তিত হইতেছে—বিষয় থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে আবার বিষয়, ইত্যাকাররূপে। সনৎকুমারাদি এই 'চক্র' 'অতিতিতীর্ষবঃ' হইয়া ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম তখন স্বয়ং 'কর্ম্মধীঃ' (সুতরাং, চক্রে 'পাতিত') থাকায় উত্তর দিতে অপারগ হইলেন। অর্থাৎ পরাপারীণ হইলেন না। তাই শ্রীভগবানের 'হংস'রূপে আবির্ভাব, এবং ফলে, অপূর্ব হংসগীতা।

গুরুধাম ইষ্টধাম

পূর্বে যে গুরুধাম এবং ইষ্টধামকে আলাদা করিয়া বলা হইল এবং তাদের অচিন্ত্যভেদাভেদের ইঙ্গিত করা হইল, সে ধাম এবং তত্ত্ব দুটিকে অভেদসমীকরণে দেখাইবার স্থল—'আদিত্যহৃদয়'—'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্' উপলব্ধি।

ওঙ্কার ও 'মা'—মধ্যমা ধ্রুঃ

মহামায়া পরমাবাক্‌রূপে ওঙ্কার এবং 'মা' এই একাক্ষর মহানাম হইয়াছেন। তিনিই আবার বৈখরী প্রভৃতি চতুষ্পাৎ বাকের মধ্যগা এবং মধ্যমাত্রী (মধ্য+মা)

হইয়া 'মধ্যমা' হইয়াছেন। তাই ইনি সর্ববাকের হৃদিস্থিতা এবং অক্ষরূপা। বৈখরী ইত্যাদি বাক্‌কে পটলেখা ভাবনা কর। এই সমগ্র পট বা চিত্রলেখা মধ্যমারূপ ধুরে (Axis এ) জড়ান' আছে। রীলের অক্ষে যেমনধারা ছবি জড়ানো থাকে। ধূঃ বা অক্ষটিকে দুই প্রকারে ঘোরানো যায়। এক প্রকারে ঘুরাইলে এই স্থূল বৈখরী চিত্রলেখা ('টকি') বৈখরী দৃষ্টি এবং শ্রুতিতে ভাসিয়া ওঠে (ব্যক্তা)। এদিকে গুটাইয়া ('আবৃত্য চক্ষুঃ') অপর আবর্তে ঘুরাইতে পারিলে পশ্যন্তী ('পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ')। পশ্যন্তী দৃষ্টি এবং শ্রুতি প্রভৃতির উন্মেষে এই 'পরিপশ্যন্তি' ভূমিটি মিলাইতে হয়। কিন্তু মধ্যমাই রহে ধূঃ বা মধ্য অক্ষ। আর, বৈখরীতে স্থূল ব্যক্ত, মধ্যমায় সূক্ষ্ম-সম্পুটিত, পশ্যন্তীতে 'পরিপ্রদর্শিত' যে বিচিত্র পট, তার আধাররূপে কি বর্তমান? —পরা। পরার আধারে, মধ্যমার ধুরাশ্রয়ে, স্থূল-সূক্ষ্মাদি নিখিল চিত্রই কখনও 'উদিত', কখনও 'অস্তমিত' হইতেছে। এই পরাপারীণ হইয়া তবে পারমার্থিক সত্য মেলে। পশ্যন্তীতে ব্যবহারিকের চরম প্রান্ত পর্যন্ত। বৈখরীতে যে ছবি মেলে, সেটি এদের তুলনায় প্রাতিভাসিক (apparent)। ব্যবহার্য (pragmatic) এবং অব্যবহার্যের (absolute এর) ভেদটি পশ্যন্তী-পরায় যাইয়া তবে ঠিক বুঝিতে ধরিতে পারা যায়। পশ্যন্তীতেও অনু, বি, পরি এই উপসর্গসহ মুখ্যতঃ তিন ভূমি।

এইবার আগের এই কথাগুলি নীচের দুটি শ্লোকে ভাবিয়া মনে রাখিও—

মধ্যমায়াং ধুরি ব্যক্তা পটলেখেব বৈখরী।
ধুরি চাবর্ত্তমানায়াং পশ্যন্তীং পরিপশ্যত॥
আবৃত্য বৈখরীচক্ষুঃ পশ্যন্তীদৃক্ প্রপশ্যতি।
সর্ব্বত্র সর্ব্বলেখানামাধারশ্চালয়ঃ পরা॥ ১০৩-১০৪

শ্লোক কয়টির ভাব আগেই কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অলমতি-বিস্তরেণ। মন্ত্রের সহজ এবং সহগ যন্ত্র। বিশেষ করিয়া যন্ত্রের দিক দিয়া পরা পারীণাদি এইভাবে ভাবনা করিও।

'যন্ত্রম্'

মহামায়া পরব্রহ্মপারীণা যা পরাৎপরা।
তুর্য্যা স্বকলনী শক্তিঃ সা পরা বিন্দুবাসিনী॥
বিন্দুনাদকলাভিশ্চ ত্রিকোণাবর্ত্তসম্ভবৈঃ।
ঋজ্বী চ সুষমা ব্যক্ত্যৈ পশ্যন্তী পরিপশ্যতি॥
মধ্যমা ধৃন্তথাক্ষশ্চ সর্ব্বেষু হৃদয়স্থিতা।
ঋজু সর্ব্বমৃজুত্বেঽস্যাঃ সর্ব্বং সমং সমত্বে চ॥
কালাদিকঞ্চুকৈরস্যা বৈষম্যং প্রতিভাসতে।
বিখরা জায়তে বাক্ চ যন্ত্রাদি চৈতি জিহ্মতাম্॥ ১০৫-১০৮

সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম যিনি মহামায়া, তিনি সর্বস্বরূপা, সর্বেশী এবং সর্বশক্তি-সমন্বিতা হইয়াও সর্বপারীণা, সুতরাং তাঁহাকে বলি পরাৎপরা। ইনি তুর্যাতীতা। ইনি অচিন্ত্যা স্বকলনী শক্তিরূপা (আদ্যা কলা) হইয়া বিন্দুতে বিন্দুবাসিনী হইলে হন—পরা। এইরূপে তিনি তুর্যাতীতা এবং পরাপারীণা হইয়াও হন তুর্যা ও পরা।

ঋজু ও সুষম

অখণ্ডাব্যয় আধাররূপা ভাগবতী শক্তি—আত্মকলনদ্বারা বিন্দু এবং বিন্দুবাসিনী না হইলে, কি মন্ত্র, কি যন্ত্র, কি তন্ত্র কিছুরই সূচনা সম্ভাবনা হয় না। বিশ্ব অভিব্যক্তির বীজই বিন্দু। অভিব্যক্তির মৌলিক এবং 'অকালিক' দুটি ক্রম—ঋজু এবং সুষম। একের পর অপরটি নয়; কিন্তু একের সম্পূরণ অপরটি। যেমন, কোন শোভন চিত্রের ঋজুরেখায় মৌলিক নক্সা (basic or ground plan); কিন্তু চিত্রটিতে পূর্ণাঙ্গ করিয়া ফুটাইতে হইলে সুষম বক্ররেখা (symmetry curves) এবং বর্ণরঞ্জনও করিতে হয়। সঙ্গীতে কোন রাগের শুদ্ধ আকৃতিটি দেখাইতে কতিপয় স্বরবিন্যাস ঋজুরেখা সঙ্কেতে দেখানোই প্রশস্ত; কিন্তু আলাপনে মূর্ছনাদি প্রকটনে সুষম বক্ররেখা বিন্যাস আবশ্যক। সুরচ্ছন্দের যেটি 'কাঠামো' সেটি মৌলিক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অঙ্গসৌষ্ঠব এবং প্রাণরসায়নের নিমিত্ত কি আবশ্যক তাও মনে রাখিতে হইবে। এইজন্য সৃষ্টিতে কল্যাণশোভনা অভিব্যক্তির নিমিত্ত ঋজু সুষমের; সরল বঙ্কিমের

হার্দ মিলনটি ঘটা চাই। এইটি ঘটানোর নিমিত্ত পরা হন পশ্যন্তী। মৌলিক বিন্দু নিজেকে বিন্দুনাদকলায় কলন করতঃ যেমন ঋজু গোষ্ঠীতে ত্রিভুজাদি যন্ত্ররূপ ধরেন, তেমনি তিনি আবার বঙ্কিম গোষ্ঠীতে আবর্ত (rotation, circling dance) অঙ্গীকার করতঃ, ঊর্মিবৃত্তাদি সুষম আকৃতি ধারণ করেন। নিখিল সৃষ্টি সুরচ্ছন্দে এক মহামহিমময় সঙ্গীত অথবা রেখাবর্ণালীতে এক মহামনোজ্ঞ অনবদ্য চিত্তরূপ ধরিয়াছে। মহামায়া পশ্যন্তীরূপে এই পরিপূর্ণ অনবদ্য বিমোহন সুন্দরকে নিত্য পৌর্ণমাসীতে 'পরিপশ্যতি'।

ধ্রুবাক্ষ

কিন্তু ধ্রুবাক্ষ অথবা ধূঃ তো চাই-ই। যে কোন ঋজু অথবা সুষমবঙ্কিম নিজেকে ফুটাইয়া দেখাইতে গেলে এই ধুরের সমাশ্রয় চাই। ত্রিভুজ, বৃত্ত—যাই চাও না কেন, তাতে এটি চাই। এই ধুর রূপে তিনি মধ্যমা। আগে মধ্যমাকে সেতুরূপে ভাবিয়াছ; এইবার আরও তলাইয়া যাও। এই মধ্যমা সব কিছুর 'হৃদয়স্থিতা'। 'হৃদয়' এর লক্ষণ পুনশ্চ স্মরণ কর। যাহা অকালিক নিত্য, তাহা গতিরূপ পাইয়া কালে নামিয়া আসে কাকে আশ্রয় করিয়া তা চিন্তা কর। ঐ ধূঃ। সুতরাং মধ্যমার মাধ্যমেই আবার সেই অকালিক নিত্যে ফিরিতে হইবে। জপধ্যানাদির লক্ষ্যই তাই। যেমন চক্রের গতির ঋজুতা এবং সমতা ধুরের ঋজুতা এবং সমতা আশ্রয়ে, তেমনি বিশ্বে সর্বসংস্থাতেই জানিবে।

'কঞ্চুক'

কিন্তু অস্মদাদির গোচরে বৈষম্য তো প্রতিভাসিত হইতেছে। ইহা প্রতিভাস বা appearance মাত্র, তবু তো হইয়াছে। আর, এতেই সমস্ত কিছু পাতিত। ধূঃ বা অক্ষকে যাহা অনৃজু ও বিষম করে, তার সাধারণ নাম দাও কঞ্চুক। কঞ্চুকের মূল সমাচার . . . ন জানাতি কশ্চিৎ। কিন্তু মূলের নিদান কেহ না জানিলেও এই কঞ্চুকের কারসাজিতে পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমারূপ যে শুদ্ধা নিত্যা বাক্, সে বাক্ বিষমের বিপাকে পড়িয়া হন বিখরা, আর, শুদ্ধ অনবদ্য যন্ত্রাদিও জিহ্মতা, আবিলতা এবং পঙ্গুতা প্রাপ্ত হয়। এই বিষম পরিণতিটি আভাসিক। ঋজ্বী এবং সুষমাকে নাকচ করিয়া বিষমা ও জিহ্মগা নয়। যেন তিমিরাদি রোগ অথবা বক্র কাচাদি দৃষ্টিকে ঠিক মত

দেখিতে দিতেছে না। অথচ, এ দেখার আছে বাস্তবতার বেজায় অভিমান। বিজ্ঞান প্রজ্ঞান পদে পদে দোষ ধরাইয়া দিলেও এ বিষম বিভ্রমবিলাস অপগত হয় কৈ! মন্ত্রসাধনের দিক থেকে এইরূপ উপায়—

লক্ষ্মীবীজেন সৌষম্যং বাগ্‌ভবেন চার্জ্জবম্।
ধ্রৌব্যঞ্চ ধামগামিত্বং পালয় চার্দ্ধমাত্রয়া॥ ১০৯

সুষমতার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ), ঋজুতার (আর্জ্জবের) নিমিত্ত বাগ্‌ভব (ঐঁ) সমাশ্রয় করিও। আর, সকল বীজেই অর্দ্ধমাত্রার জাগৃতি সাধন করতঃ পরাপারীণা যে গতি, সে গতির ধ্রুবত্ব এবং ধামগত্ব পরিপালন করিও। অর্দ্ধমাত্রা প্রসাদিতা না হইলে কোন গতিই, সাময়িকভাবে কালানুকূল্যে ঋজু ও সুষম হইলেও, ধ্রুব এবং ধামগ হয় না; কঞ্চুক কবল থেকে মুক্তি পায় না। মন্ত্রের সঙ্গে উপযোগী যন্ত্র এবং তন্ত্রও সাধন করিতে হইবে। ত্রিবজ্র বা ত্রিশূল সংহতি ব্যতীত ত্রিপুর-মথনী শক্তি ঠিক সঞ্জাত হয় না। যন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে, বিশেষভাবে, এই খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রদত্ত একটি ইংরাজি নিবন্ধ (Notes) কথঞ্চিৎ দুরূহ হইলেও সযত্নে আলোচনাযোগ্য।

কঞ্চুকবিমোচন

পরায়ৈ সবিতুর্ভর্গঃ পশ্যন্ত্যৈ পূর্ণচন্দ্রমাঃ।
চন্দ্রমা মধ্যমায়ৈ চ বৈখর্য্যৈ চন্দ্র ঋচ্ছতু॥ ১১০

পরায় যাহাতে গতি হয় সে নিমিত্ত সবিতার সেই বরণীর ভর্গঃ স্বয়ং প্রবর্তিত হউন। পশ্যন্তীর নিমিত্ত সেই জ্যোতিঃ পরিপূর্ণা চান্দ্রমসী প্রভা (সম্মিলিত ভর্গঃ এবং রোচিষে) রূপে প্রকাশিত হউন। যেমন প্রখর তপন কিরণে ধরিত্রীর নিখিলবস্তুজাত প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু বিরাট বিশ্ব (নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জ) অপ্রকাশিত থাকে; বিমল পৌর্ণমাসী ছটায় সে বিরাট বিশ্বও প্রকাশিত হয়। স্থূলভাবে বলা হইল, কিন্তু বেশ তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নাভিনিষ্ঠ কেন্দ্রীণ জ্যোতিঃ আর বিচিত্র আধার সমূহে প্রতিফলিত জ্যোতিঃ—the fact of nuclear radiation and the fact of reflection and resonance— এ দুয়ের ভেদ এবং ব্যঞ্জনা মনে রাখিতে হইবে। বিশ্বের নিখিল আধারে কেন্দ্রীণ জ্যোতির পূর্ণপ্রতিফলন এবং অনুরণন দেখাইতে না পারিলে পশ্যন্তী সম্ভাবিত হয় না।

উদাহরণে ধুরতত্ত্ব

ধর, ক, খ দুটি পদার্থ। 'ক' কে দেখিতেছি সবুজ, 'খ' কে লাল। বস্তু দুটি হইতে আলোক কি ভাবে প্রতিফলিত হইতেছে, তার উপর নির্ভর করে তাদের রং। তাদের অপরাপর ধর্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা—প্রতিরণন বৈশিষ্ট্য। কোন স্পন্দক্রিয়া তাদের প্রভাবিত করিলে কি ভাবে তারা সাড়া দেয় না দেয়। সাড়া স্থূল সূক্ষ্ম নানান পর্যায়ে। আমার সাধারণ বোধে যেখানে সাড়া নেই, বিজ্ঞানে এবং যোগজ জ্ঞানে সেখানে সাড়া আছে। বিশেষ সাড়া যেখানে নেই, বিশেষ বোধও সেখানে নেই। কিন্তু প্রশ্ন—পূর্ণ এবং যথার্থ সাড়ার 'স্থল' কি কোথাও আছে? বরুণ এবং সোমের 'সঙ্ঘাত' বলিয়া 'চন্দ্রমস্' হইল সেই আদর্শ স্থল বা সংস্থা। 'মস্' এই অক্ষরদ্বয়ে অনুরূপ ব্যঞ্জনা আছে। সুতরাং, চান্দ্রমসী দৃষ্টিই পশ্যন্তী। নিখিল পদার্থের নাভিসংস্থানবিশারদী হইলে ইহাই 'সাবিত্রী' বা সৌরী দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে ভুবনচক্রের নেমি এবং অরসমূহ নাভিতেই 'সমর্পিতা'—প্রতিরণন প্রতিচ্ছবি হইতে দৃষ্টি আপনাকে গুটাইয়া 'সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী' হইয়াছে। পশ্যন্তীর বিলোপ নয়, পরন্তু পরাকাষ্ঠা এই 'পরায়'। তদগ্রে পরাপারীণ। অগ্রে=পরে।

বিসর্গ বিহীন চন্দ্রমা অথবা চন্দ্রমন্, —ধূর বা অক্ষ সূচক। সুতরাং, মধ্যমা। এই ধুর তত্ত্ব বিশেষভাবে তলাইয়া বোঝার বস্তু। তবে, স্থূলভাবে গোড়ায় বুঝিয়া লও। আমাদের ধরিত্রী নিজ অক্ষে আবর্তন করে; সে অক্ষও আবার তার গতিবর্ত্মের (orbit) হিসাবে কিঞ্চিৎ কোণাকুণি ন্যস্ত। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সংস্থার (natural economy) নিমিত্ত এটি আবশ্যক। এই বিশেষ ধূর্-সংস্থা (orientation of axis) সংরক্ষণে 'উপগ্রহ' চন্দ্রের কতখানি প্রভাব আছে না আছে সেটি চিন্তনীয়। Dynamics এর Problem মাত্র নয়। অণুর বিশ্বে একটা ইলেক্ট্রন সরিয়া যাইলে অথবা জুটিয়া গেলে কি বিপ্লব ঘটে, তাও ভাবনীয়। এ বিপ্লব ঘটে কেন? অণুর আভ্যন্তরীণ সংস্থায় যেটি 'ধুরন্ধর', সেটি তার ধুর্ কে কিছুটা কৌণিকাদি সম্বন্ধে পাল্টাইয়া লয় (effective reorientation of the axis position)। প্রাণিজগতে এবং মনোজগতেও এটি প্রণিধানযোগ্য। 'দৃষ্টিকোণ বদ্‌লান' ইত্যাদি তলাইয়া বুঝিও। দীক্ষা কি নিমিত্ত তা চিন্তা করিও। জপসূত্রে লক্ষণ আছে 'মুখ্যপ্রাণ-দ্বারেণ পঞ্চত্বপ্রাপ্তিঃ'। ইহা বুঝিতে ইইবে। এখন প্রশ্ন—নানান্ ক্ষেত্রে বিচিত্র ব্যবহার প্রয়োজনে ধুরের অদলবদল তো ঘটিতেছে; কিন্তু সমস্ত কিছুর যাহা মূল ধৃঃ, তাকে ঋজ্বী এবং সুষমা করিয়া মিলাই কি প্রকারে? ইহাই সাধন। কাজেই, সর্ববিধ সাধনই মধ্যমার মাধ্যমে। 'মধ্যমা' এই মৌলিক অর্থে এক সাধারণ সংজ্ঞা। কেবল বাকেরি এক বিভাগ নয়। মধ্যং মাতি এইভাবে ব্যুৎপত্তি করিলে যাহা সমস্ত কিছুর মধ্যমান বিধান এবং ধারণ করিয়া থাকে, তাহাই মধ্যমা—what assigns the constant mean measure. এইভাবে ইহা সমস্তের 'হৃদয়স্থিতা'। 'হৃদয়'কে dynamical radix, functional core ভাবিতে পার। গায়ত্রী ইত্যাদি জপে যে functional momenta—বিন্দু থেকে অর্দ্ধ মাত্রা রূপ সেতু সমাশ্রয়ে নাদকলার যে ব্যাপারবত্তা বা অভিব্যক্তি, সেটি মধ্যমার মধ্যমানেই আদ্যন্ত বিধৃত থাকা আবশ্যক। সেরূপ থাকিলেই জপের আর্জ্জব, সৌষ্ঠব এবং সৌষম্য।

অমাত্রা, এক মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা

পরব্রহ্ম স্বয়ং 'অমাত্র' বা মাত্রাতীত। 'একোহহম্'—এইরূপে তিনি হন বিন্দুরূপা 'একমাত্রা'। বিশ্ববীজকণিকার মত এই একমাত্রা একাধারে পূর্ণধারে পূর্ণমাত্রা এবং শূন্যমাত্রা। সৃষ্টি, বিন্দুর নাদকলা ক্রম, ধারারূপ পরিগ্রহণে—as continuum, as progression, as series, as order in time, space and causality. মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ 'অকালিক', ব্যবহারতঃ এবং গৌণতঃ 'কালিক' ও বটে। 'মূলবিন্দু' স্বয়ং অব্যক্ত পর; অব্যক্ত পরমের—নিখিল ব্যক্তের (manifest এর) সঙ্গে সংযোগ এই পরবিন্দু দ্বারাই। পর অব্যক্ত যে বিন্দু, তার নাদকলাদি ক্রমে 'উদয়' এবং 'বিলয়'—এই দুটি গতিমুখ ('sense')। দুটিকে ধন-ঋণ (+ -) সংজ্ঞা দিতে পার। এখন, দুই মুখেই (উদয় বিলয়) সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা রহিয়াছেন—'স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ'। পরাব্যক্ত থেকে ব্যক্তে এবং ব্যক্ত থেকে পরাব্যক্তে চলিতে এই সেতু-সমাশ্রয় করিতেই হয়। যথা গায়ত্রী জপে আদ্য ওঙ্কার অথবা শেষ ওঙ্কার, কেহই হঠপূর্বক (abruptly) বৈখরীতে উদিত বা লীন হইবেন না।

হইলে, সেতুসন্ধান, সুতরাং অর্দ্ধমাত্রা প্রসাদন ঘটিল না। 'তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত' হইল না। বাক্, প্রাণ, চিত্ত—কেহই শান্ত পর-অব্যক্ত স্থলের বিরাম স্পর্শ এবং আনন্দ অভিষেক পাইল না। নিখিলে মধ্যমানদাত্রী নিত্যা স্ফোটরূপা মধ্যমাই—বিন্দুর উভয় দিকে অর্দ্ধমাত্রা হন। আর সেভাবে বিন্দুবাসিনী শক্তিকে করেন ঋধ্যমানা, সমৃদ্ধমানা।

পরাব্যক্ত এবং পরমাব্যক্ত

পরাব্যক্ত থেকে পরমাব্যক্তে লইতেও অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয়ণীয়া। সৃষ্টি অনুলোমে বিন্দুনাদকলা; বিলোমে—কলানাদ-বিন্দু। বিন্দুতে ধারা বিশ্রান্ত হইলে সৃষ্টিমহামহীরুহ তার মূলবীজে বিশ্রান্ত হইল। তখন যে আদ্যাকলনী শক্তি বিন্দুরূপা হইয়াছেন, তাঁকে 'প্রসন্না' পাইতে হয়। প্রসন্না হইলে পরাব্যক্ত থেকে পরমাব্যক্তে যাইবার সেতুরূপা তিনিই হন। সেতুরূপা হইয়া নাদবিন্দু-কলাতীত যে পরম, তাতে লইয়া যান। তখন একান্ত প্রপঞ্চোপশম। শ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকে তাই আগেই বলা হইয়াছে—

> 'সেতুর্যাপ্যর্দ্ধমাত্রা নয়তি চ পরমং ব্যক্তমব্যক্তভাবং।'

চন্দ্রের কথা

শেষে চন্দ্রের কথা। সৃষ্টিতে এবং জীবনে যাহা কিছু 'বিখর' (কিনা) বিশেষভাবে ঘর্ষণাদি অভিঘাত জন্য ক্রিয়ায় ফলে উপদ্রুত—(particularly susceptible to outside stress and strain reactions), তাদের উপশমের নিমিত্ত কি করিবে? অন্তরীক্ষ তত্ত্বের মূর্তপ্রতীক যে চন্দ্র, সেই চন্দ্রের ছন্দোগ যে 'ঋচ্ছতি' রূপ, সেটিকে প্রসন্ন করিবে। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' এই যুগ্মরূপের মধ্যে, পৃথিবী সম্পর্কে, সূর্য স্বঃ এবং চন্দ্রমাঃ অন্তরীক্ষশক্তি—'original' and 'intervening' forces—এ দুটিকে মূর্ত করিয়াছেন। ধর, 'পৃথিবী' বলিতে যদি বুঝি শক্তিসম্পাতের এবং ধারণের কোন নিরূপিত 'স্থির' (stable) স্থল (a relatively stable plane of incidence), তবে সূর্য, সে সম্পর্কে, source (উৎস), এবং চন্দ্রমাত্রয় (চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমা এবং চন্দ্র) সে সম্পর্কে মাধ্যমিকী সংস্থা—system of intervening media. বলা বাহুল্য এই 'মাধ্যম' ফাঁকা (void) নয়। কোন আধারে উৎস শক্তিসম্পাত (incidence) যে কিভাবে হইবে, এবং তাতে প্রতিফলনাদি প্রতিক্রিয়াও যে কি ভাবে হইবে, তার নিয়ন্ত্রণে এক মুখ্য অংশ ঐ মাধ্যমটি (medium) গ্রহণ করে। দীক্ষাদি স্থলে উৎস, মাধ্যম এবং ক্ষেত্র—এ তিনটিকে এই সূত্রনির্দেশে ভাবনা কর।

চন্দ্রমাত্রয় সাধারণভাবে অন্তরীক্ষশক্তিরূপ 'মাধ্যম' বটে, কিন্তু ত্রয়ের বিভেদও মনে রাখিতে হইবে। বীজমন্ত্রের ভাষায় উৎসশক্তিকে যদি বল হ্রীঁ, তবে চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমা এবং চন্দ্র যথাক্রমে ঐঁ শ্রীঁ গ্লৌঁ। কেন তা চিন্তা করিয়া দেখ। এদের লক্ষণ এবং আলোচন অনুধ্যান করিলে সেটি হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'মস্', 'মা' বা 'মন্', এবং 'অ'—এই তিন আকৃতিতেও সূত্র নিহিত রহিয়াছে।

যে কোন ক্ষেত্র (field of action) ঐ তিন দিক দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। কোন উৎস (source or origin of influence) ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করিবে ঐ তিন 'আন্তরীক্ষবৃত্তিতায়'। সরণী (বা সরণি), পন্থাঃ এবং মার্গ—এই তিন নাম ঐ তিন প্রকার ভেদ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনটি প্রশ্ন দ্বারা ইহা বুঝিয়া লও। উৎসের উৎসরণ অন্তরীক্ষে কিভাবে (পাদমাত্রাদিতে) ঘটিল? সে উৎসরণ উক্ত অন্তরীক্ষে (medium এ) কিভাবে তার পথ পাইল? শেষকালে, ক্ষেত্রে তার আপতন, প্রতিফলন, প্রতিরণনাদি ক্রিয়া কোন্ প্রণালীতে কিভাবে হইল? শক্তিপাতন কি শুধুই ত্বক্‌ক্রিয় (peripheral) হইল, না, মর্ম্মক্রিয় (central and nuclear)? ক্ষেত্র সম্বন্ধে দেশ-কাল-ছন্দঃ এ তিনেই কি হইল? অন্তরীক্ষের নিজস্ব শক্তিলেখ (intrinsic power structure) আছে; তার মধ্য দিয়া কোন শক্তিকে কাজ করিতে গেলে আপন গতিবর্ত্মটি পাইতে হয়। তার সাধারণ নাম যদি দাও 'অধ্ব', তবে সে অধ্বের ঐ তিন বিশেষ সংস্থা—সরণি, পন্থাঃ, মার্গ। শক্তিসম্পাত ঋতাব্বগ হইতে গেলে সরণি প্রভৃতি যোগদা, সুপথা এবং ক্ষেমঙ্করী এই তিন কল্যাণী শক্তির সমাশ্রিত হওয়া আবশ্যক। 'পন্থানং সুপথা রক্ষেন্ মার্গং ক্ষেমঙ্করী তথা।' স্বাহা, স্বধা এবং বৌষট্ (ও বষট্) এই আকৃতির ঐ তিন স্থলে সবিশেষ উপযোগ। তন্মধ্যে আবার 'স্বধা' মুখ্যা এবং মধ্যমা। চন্দ্রের তত্ত্বে এইভাবে ত্রিধা ভাবনা করিবে।

‘মৃগাঙ্ক’

চন্দ্রের নাম ‘মৃগাঙ্ক’। ‘মৃগ্’ থেকে ‘মার্গ’। সুতরাং, পৃথিবীতে মার্গবিতানে মৃগাঙ্কের আধিপত্য। বামা বৃত্তিতে অগ্রে চন্দ্র, মধ্যে চন্দ্রমা, অন্তে চন্দ্রমস্ মনে করিলে, এ তিনকে যথাক্রমে ওঙ্কারের ‘অউম’ ভাবনা করিও, এবং

আদ্যেঽবতু মহাকালী মহালক্ষ্মীশ্চ মধ্যমে।
মহাসরস্বতী চান্তে সর্ব্বমোঙ্কার উর্জ্জিতঃ॥ ১১১

ঊর্দ্ধধাম থেকে আমাদের আধারে যে বরণীয় জ্যোতীরসের অবতরণ হইতেছে, তার যেটি ‘মার্গ’ (পূর্বপ্রদর্শিত), সেটি মহাকালী রক্ষা করুন. ‘মৃগ্’ মানে অন্বেষণ—aspiration, quest. যে স্পর্শটি মিলিল, এখানে তার অন্বেষণ,— অনুবৃত্তি ঠিক ঠিক হওয়া চাই। ‘এ’ যদি না চায়, না খোঁজে, তবে ‘সে’ এসেও তো সরিয়া যায়! ভাবিয়া দেখ—শ্রীকৃষ্ণের মূরলী সম্মোহনে গাভী অদূরে ‘নিথর’, ময়ূর-ময়ূরী অন্তিকে নৃত্যপর, কিন্তু অপলকমঞ্জুলচাহনী হরিণী যে তাদের ঐ অদূর-অন্তিকের ব্যবধান রত্তিও সহিবে না! পরমবঁধুয়ার মুরলীধুনে সম্মুগ্ধা, নওল কিশোরের নীলোৎপল-মৃগমদজিনি অঙ্গাবাসে পাগলিনী সে কোথায় বলত? হরিণী তটিনীর মত তার সমগ্রসত্তা অব্যবধানে কোন্ রসসায়রে কেমনে উজাড় করিয়া দিল, তা কি দেখেছ তুমি? না দেখে থাক তো তোমার রস মার্গ এখনও যে কার্পণ্যবিধুর, কুণ্ঠাকাতর!

তারপর—অথবা তদগ্রে পন্থাকে মহালক্ষ্মী এবং সরণিকে মহাসরস্বতী রক্ষা করুন। ঐ মোহনছবিতে ‘গো’ সরস্বতী এবং ‘ময়ূরী’ লক্ষ্মীর ব্যঞ্জনা সূচনা করিতেছে, নয় কি? ভাবিয়া দেখ। ওঙ্কার উর্জ্জিত হইয়া সমস্ত কিছুই পালন করুন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষাদির দিক থেকেও চন্দ্রের প্রভাব অস্মদাদির ‘এই’ আধারে বিচার করিও। জপাদিতে তিথি নক্ষত্রাদি প্রভাবরূপে অন্তরীক্ষ-শক্তি মৃগাঙ্কতে ঘনমূর্ত হইয়া আমাদের মনে ও বাহিরে যে ‘মার্গ’, তাকে নিয়মন করিতেছেন।

সূর্যচন্দ্রমা—এই যুগ্মতত্ত্বের আলোচনা ভূয়সী করা হইল। কোন মূলতত্ত্বকে মর্মধ্যানে রাখিয়া আলোচনা যদি ভূয়সী করা হয়, তবে সে আলোচনা শ্রেয়সী ও প্রেয়সীও হইয়া থাকে। কোন এককে আদৌ বহুরূপে জানো; তারপর, ‘ততোভূয়ঃ’

('আগে কহ আর') ভাবে; অন্তে সেটিকে জান— 'ভূমন্' বা ভূমা। সনৎকুমার নারদকে এই ক্রমেই দেখাইয়াছিলেন, নয় কি? এ ভাবে জানিলে ঐ 'এক' জানায় 'সব' জানা। ধান ভানিতে যতক্ষণ 'শিবের গাজন' না শুনিতেছি, ততক্ষণ শুধুই 'কঁ্যাচর কঁ্যাচর' বই আর কিছুই শুনিতেছি না। 'হ্রীঁ' প্রভৃতি বীজ ততক্ষণ 'হিং টিং ছট্'। বিশ্বরাস অথবা জ্যোতির্মণ্ডলের যেখানটাতেই সুরু কর না কেন, সেটি কি তার হৃৎকর্ণিকা কেন্দ্রে চলার পথে প্রথমে তার খণ্ডখণ্ড বহুরূপ; পরে তার 'সূত্রে মণিগণা ইব' বিশ্বরূপ; তদন্তে তার গর্ভিত 'হিরণ্য' রূপ; এবং চূড়ান্তে তার অখণ্ডাভিন্ন জ্যোতীরস রূপটি দেখাইল অথবা দেখাইল না—ইহাই মরমী প্রশ্ন। বিজ্ঞানের গবেষণা অগ্রগা হইয়া বহুর মধ্যে অন্বিত সূত্রগুচ্ছ ক্রমেই জড়ো করিয়া লইতেছে, কিন্তু 'সূত্রাত্মা'? নিখিল ভূতজাতের মাঝে গর্ভিত বস্তুটিকে তৈজসীতনুতে প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্তু প্রাণরস আর চৈতন্যজ্যোতির অপূর্বমিলনরূপ যে 'হিরণ্য', তার সন্ধান কতদূরে?

হিরণ্য-সন্ধান

জপাদি সাধন এই সন্ধানেরই পরিপূর্তির নিমিত্তই। ওঙ্কারাদি ব্যাহরণ করতঃ প্রথমে নিখিল পদার্থের যে স্পন্দাত্মক রূপ, সেটি ঐ বিজ্ঞানের মতই প্রত্যক্ষ করিলে; কিন্তু সে স্পন্দ যে মূলতঃ প্রাণস্পন্দ, তাও অনুভবে পাইলে। প্রাণ বলে—'আমি জড়ের বাঁধনপাশ খুলিব; স্বচ্ছন্দ হইব; যাহা সুন্দর, মধুর, সমুজ্জ্বল, তাকে চাহিব, খুঁজিব; তার জন্য নিজেকে বার বার নব নব উন্মেষে ফুটাইয়া তুলিব।' কাজেই, জপে যাই প্রাণস্পন্দের সুষম স্বচ্ছন্দ সাড়াটি মিলে, তখনই সেই 'হিরণ্ময় পাত্রের' পরশ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা কেবল 'সত্য' নয়, পরন্তু 'সত্য শিব সুন্দরের' মুখ অপিহিত আছে। আমাদের সবারই কাছে তো সে পরমভদ্র মুখটি 'ঢাকা'; কিন্তু 'হিরণ্ময় পাত্রেণ' তো নয়; আর 'অপিহিতং' যাকে বলে তাও নয় (অপিহিতং কিনা 'আবৃতং' হইয়াও— 'অপি'—'হিতম্')।

'অপিহিতং'-'অপাবৃণু'

'অপিহিতং' ঐভাবে হইলে তবে না 'অপাবৃণু'! এ দুটিকে রাহস্যিক রূপেই ধ্যানে ও সাধনায় আনিবে। 'হিরণ্ময়', 'সত্যধর্ম্মায়' প্রভৃতি শব্দদিশারী সঙ্গে লইয়া রহস্যগহনে

প্রবিষ্ট হও। ব্যষ্টির দিক থেকে 'অপাবৃণু' কতদূর অবধি ব্যাপ্তিমান্ হইবে? বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, কূটস্থ অবধি। সমষ্টির দিক থেকে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং পরব্রহ্ম। শব্দযোগী বৈখরী থেকে পরা; যোগী ও ভক্তরসিকও আপন আপন অনুবন্ধে এই 'অপাবৃণু' সাধিয়া লইবেন। গোড়ায় দৃষ্টি, তুষ্টি ও মার্গ ভেদ। কিন্তু 'অপাবৃণু'র 'আ' আসিলে যে দৃষ্টি ফুটিতে থাকে, সে দৃষ্টি 'সত্যধর্ম্মায়', এবং কাজেই, ভেদপরামৃষ্টা নয়। 'সত্যধর্ম্মায়'—সত্যকে ধারণে ও রক্ষণে দৃষ্টি উপযোগিনী হয়, এই নিমিত্ত।

'অপিহিতং' শব্দের চারিটি অক্ষরে যদি স্বর (বাক্), মাত্রাস্পর্শ (ইন্দ্রিয়), প্রাণ এবং চিত্ত—এই চতুষ্টয়ে (অ+পি+হি+তং) আবরণ (অবশ্য 'হিরণ্ময়') বুঝিয়া লও তো, 'অপাবৃণু' পদে ঐ চারিটির যথাক্রমে অপাবরণ বুঝিবে। যেমন, গায়ত্রীজপে (অথবা ওঙ্কারাদিতে) অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয়ে নাদের উদয়ে প্রথম (বাক্) আবরণ, ব্যাহৃতিত্রয়ে দ্বিতীয়, 'বরেণ্যং' অবধিতে তৃতীয়, এবং তদুত্তর 'প্রচোদয়াৎ' অবধি তুরীয় আবরণও নিরাকৃত হওয়া চাই। এবং নিরাবরণ ওঙ্কাররূপে, পুনশ্চ অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয়ে, আদৌ পরাব্যক্তে (বিন্দুতে) অভিসম্পন্ন, আর, চরমে পরমাব্যক্তে অভিনিষ্পন্ন হইতে হয়। জপে এবংপ্রকার 'অপাবৃণু' সাধন জানিও।

সাধনসুকরতাবিধায়ক তত্ত্ব হইতেছে—দ্যৌঃ। ইনি একাধারে পিতা ('মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা') এবং মাতা। 'অপাবৃণু' পদ দ্বারাই সম্পদ্যমানতা লাভ কর—'দ্যৌঃ' এই মহামহিম তত্ত্বে। অগ্নির (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—তিনভাবেই) অনুকম্পানুপ্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত কোন পাত্রই 'হিরণ্ময়' হয় না; আর, বরুণের সুভদ্রবরণটি না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই আবরণমুক্ত, নিরাবরণ হয় না। এই পরম কর্মটি সাধনের নিমিত্ত 'বরেণ্যং' পদে শুধু বরুণ-সোম নন, পরন্তু বরুণ-অগ্নিও সংহতিতে রহিয়াছেন। 'দিব্' শব্দ থেকে 'দ্যৌঃ'। 'দিব্' শব্দে 'ই' কারে অগ্নি, আর, 'ব' কারে বরুণ বর্তমান। 'ত' বর্গের তৃতীয় বর্ণ 'দ' বরুণাগ্নির সংহতি নির্দেশ করে।

সামান্যভাবে কোন তলে থাকায় 'ত' বর্ণ; তাতে স্থির হওয়ায় 'থ'; তাতে উর্দ্ধগ হওয়ায় 'দ'; ইত্যাদি। 'থ'তে যে 'tie' বা 'balance' ছিল, সেটি 'দ'তে একটা vertical rise বা ascent রূপ পাইল। এটি মহাপ্রাণময় হইলে 'ধ'। সম্পন্নতায়

আসিলে, 'ন'। 'ত' বর্গের শেষবর্ণদ্বয় 'ধন'; ইহা লক্ষ্য করিও। 'ঋণ' বর্ণদ্বয়ে এর শাক্ত বিভেদটিও ধ্যান-যোগ্য।

দিব্ ও দ্যৌঃ

'দিব্' শব্দের প্রাণরসায়নটি আরও একটুখানি প্রণিধান কর। 'ই'কার 'য'কার হইল; 'ব'কার হইল 'উ'কার। ফলে, 'দিব্' হইল 'দ্যু'। অতঃপর উকারের বৃদ্ধি কর, এবং 'বিসর্গ' যোগ কর। হইল দ্যৌঃ। এগুলি কেবল সাধারণ ব্যাকরণের মামুলি কাজ ভাবিও না; প্রাণ ব্যাকরণ যে ছন্দঃ, সেই ছন্দঃ এর মাঝে অনুধাবন করিও।

অগ্নিতে যে 'ই'কার, তিনি যেন বরুণ (বেবিষাণ) কে বলিতেছেন— 'আমি তোমাতে সংহত হইব; তুমি আমাতে তোমার বেবিষাণ, আত্মনীন রূপটি দাও'। বরুণ বলিলেন— 'তথাস্তু। তুমি হও—য—(বায়ুবীজ)।' 'ই' আর 'য' দুটিকে উচ্চারণ করতঃ এই রসায়নটি বুঝিয়া লও। পক্ষান্তরে, 'ব'কার রূপ যে বরুণ, তিনি অগ্নিকে বলিতেছেন— 'আমিও তোমাতে মিলিত হইব।' অগ্নি বলিলেন— 'বেশ তো! তুমি হও উকার।' বকারে যে নিগূঢ় বেবিষাণ, আত্মনীন রূপ, সেটি অধ্বকুশল, অঙ্কক-রঞ্জক রূপটি পাইবে না, যদি সে না হয় 'উ'। 'ব' আকারে যাহা ছিল যেন এক ত্রিভুজ (dynamic triangle) সেটি 'উ' রূপে হইল যেন এক spiral. অগ্নি আর বরুণের এইপ্রকার পরস্পরের প্রার্থনা পূরণের ফলে, তাঁদের যেন ঠাঁই বিনিময় ঘটিল, অগ্নি হইলেন বরুণভাবাপন্ন ('য'), আর, বরুণ হইলেন অগ্নি ভাবাপন্ন ('উ')। একে বলা হইল—বরুণাগ্নি-সংঘাত। বেবিষাণ বরুণ ও বায়ুরূপ অগ্নির মন্থনে 'দ' হইল অক্ষদণ্ড। মথনী ক্রিয়াটি='উ'. যদি এই ক্রিয়াসম্ভাবনাটি শূন্য এবং পূর্ণ এতদুভয়ের পরিসীমা পর্যন্ত অকুণ্ঠ প্রসার লাভ করে, তা হইলে, 'উ' হইল 'ঔ' এবং তার ফলে, নির্বাধ মধুজ্যোতির যে ক্ষরণ, সেটি হইল—বিসর্গ। মিলিল পূর্ণ আকৃতি, দ্যৌঃ (দেব, দৈব, দেবতা, দৈবত, দিবৌকসঃ—প্রভৃতি শব্দগুলি এই সঙ্গে পরীক্ষণীয়)।

'দৈবী আকৃতি'

যথা দিব্ থেকে দেব—দেবনশীল। এই 'দেবন'-এর দ্যোতনা ভাবিয়া লইও। পূর্বে যে দ্যৌঃ ব্যাখ্যাত হইল, তার আধারে এবং তার সত্তাশক্তিতে দেবন ও দেব সম্ভাবিত

হয়, অন্যথা নয়। দ্যুলোক ও দেব অবিনাভাবেই রহে, বিনাভাবে নয়। দেবগণের মুখস্বরূপ, পুরোধা এবং রত্নধাতম যে অগ্নি, সে অগ্নি বিশ্বানুস্যূত শক্তিসামগ্রীকে (cosmic energy as a whole) প্রকাশনী (দীপনী), অঙ্কনী, রঞ্জনী ঋদ্ধিতে ফোটাইয়া লইবেন; আর বরুণ কি করিবেন? যে শক্তিনিচয় দীপনী, অঙ্কনী, রঞ্জনী ঋদ্ধিকল্পে সঞ্জাত, তাদের কোনমতে খণ্ডধর্মী, চণ্ডধর্মী এবং বিরুদ্ধধর্মী বা বিধর্মী হইতে দিবেন না। সত্তায়, শক্তিতে, ছন্দে বরুণ তাদের সমানাধিকরণতা রক্ষা করিবেন (community in spirit and in pursuit)। শ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুরবধকল্পে সকল দেবতাদের আয়ুধাদিসহ, একমাত্র দেবীশরীরে অন্তর্ভাব তাই সম্ভাবিত হইয়াছিল; শুম্ভাসুর বধে 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' স্মরণ কর। কেনোপনিষদে ইন্দ্রাদি দেবগণের 'উমা হৈমবতী' সন্দর্শনও চিন্তা কর। দেব হইতে গেলে ঐ দীপনী ইত্যাদি সত্তাশক্তি উন্মেষটি যেমনধারা চাই, তেমনি চাই ঐ বেবিষাণ অথচ আত্মনীন ভাবটি। কোন নাভি বা কেন্দ্র হইতে অরসমূহ ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া তাদের নেমি (sphere or field) প্রসারিত করিতেছে; কিন্তু নাভি বা কেন্দ্র ঐ একই রাখিতেছে, আধারও এক রাখিতেছে; তাই অর-সঙ্কর এবং নেমি-সংঘর্ষ দুইই নিবারিত হইতেছে। জলে একই স্থল থেকে যদি ঊর্মি সৃষ্টি ও বিস্তার কর, তা হইলে যেমনটি হয়। A system of non-interfering but co-operating rhythms.

'দেব' শব্দে 'এ'কার এই এককেন্দ্রিণী অনুবৃত্তি (compliance to one central theme of harmony) সূচনা করে বুঝিতে হইবে। 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'— 'বরেণ্যং পদের 'এ'কারে এই পরমাভিমুখীনা অনুবৃত্তিটি কাষ্ঠায় প্রদর্শিত। অতএব সেটি সর্বতোভাবে 'শরণ্যম্'। জপে ঐ স্থলে বিশেষ করিয়া তোমার অনুবৃত্তিকে সীমায় ফুটাইয়া তুলিবে। বর্তমান বিজ্ঞান জড় নিগড়বন্ধ শক্তিকে (energy as material mass) 'মুক্ত' করিতেছে বটে, এবং এ কর্মে অগ্নি ও বরুণের 'ভাগ' রহিয়াছেও বটে, কিন্তু তাঁদের পূর্বোক্ত প্রকারে 'দৈবী সংহতি' নেই; সুতরাং, দ্যৌঃ, দ্যুলোক ও দেবতা এ কর্মে সমাহূত ও সমাহৃত হন নাই। প্রাণ এবং অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও এঁদের পরম শ্রেয়সী অনুবৃত্তি সাধন যে কিভাবে হইবে, তাহা বুঝিয়া স্বভাবে ফিরিয়া আইস। ইন্দ্রিয়াদি সব কিছুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় যজনশীল হও—অগ্নিবরুণ সাহিত্যে তোমার সে যজন পরম আপ্যায়নে লইয়া চল। এই সুদর্শনানুগ যে চক্র, অগ্নি তার অর-নেমি

উত্তরোত্তর ঋদ্ধিতে বিস্তার করিয়া চলুন, আর বরুণ এ চক্রের একনাভি এবং অখণ্ডধারাটি অব্যাহত রাখুন। এই শেষের কর্মটি না হইলে তোমার সকল শাক্তী সৃষ্টি যেন ফাটিয়া খণ্ড খণ্ডশঃ হইয়া পড়িবে; এবং খণ্ড থেকে জাত হইবে— 'চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ'। আসুরী যে বিনষ্টি শক্তি—তার ঘোর এবং মূঢ় এই দুই রূপ জানিও। এক যেন উত্তুঙ্গা তুষার আততায়ী (an avalanche of crushing destruction); অপরটি যেন জ্বালাকরাল ব্যাদিত, অতল গহ্বর (a bottomless pit of fire and brimstone)।

ব্যাষ্টি ও সমষ্টিতে, সূক্ষ্মে ও মহানে যাবতীয় সৃষ্টি ও বিকাশ এক উদারমুক্ত (unlimited, free) 'হিরণ্য' আধারের অপেক্ষা রাখে, যেখানে আদ্যা কলনী শক্তি বিন্দু, অক্ষ, তল, রেখা, কোণাদি উদ্‌বর্তনে তাঁর সৃজনী পালনী যন্ত্রপরম্পরা 'ছকিয়া' লইবেন। জড়ীয়, প্রাণিক, মানস—কোন প্রকার সৃষ্টিতেই এর অন্যথা নেই। এই আদিম অসর্ত-শৃঙ্খলিত হিরণ্য আধার দ্যৌঃ।

'অসর্ত-শৃঙ্খলিত' আধার; দেবযান

সমস্ত কিছুই সর্তশৃঙ্খলিত (subject to conditionality or determination) ভাবে চলিতেছে। যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্রও তাই। কিন্তু বস্তুতঃ এমন এক আধারে রহিয়াছে, এবং কার্যতঃ এমন এক আধার তাদের মেলান চাই, যে আধার অন্ততঃ তাদের অপেক্ষায়, সর্তশৃঙ্খলিত নয়; এবং যেটি, তাদের তুলনায়, 'হিরণ্য' (pregnant with shining richness of super potency)। যেমন, 'অউম' ইত্যাদি ব্যক্ত কলায় জপ চলিতেছে; এসব ব্যক্ত কলার আকৃতি, ধর্ম, স্পন্দবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দ্বারা সে জপ 'শৃঙ্খলিত', বাধ্য। জপকারীর আপন যন্ত্রাদির দ্বারাও বটে। এবম্বিধ যে 'বাধ্য' জপ, সেটিকে পূর্বোক্ত অশৃঙ্খলিত হিরণ্য আধারে তুলিয়া 'মুক্ত', স্বচ্ছন্দ, ধামগ করি কি করিয়া? যে জপ মর্ত্য, তাকে দিব্য করিব কি উপায়ে? দ্যৌঃ প্রসাদিত না হইলে কোন কিছুই 'দিব্য' হয় না। জপে উদয় ও বিলয় উভয় স্থলে যদি স্বর, প্রাণ এবং মন—এ তিনের গতিতে হঠপূর্বকত্বাদি লক্ষিত হয়, সুতরাং জপচক্রের যে সৌদর্শনী পরিক্রমা সেটি না ঘটে, তবে বুঝিলে তোমার জপ এখনও দ্যৌঃ এবং দিব্যের যে হিরণ্যসরণি, তাতে পৌঁছায় নাই; এখনও সে 'মর্ত্ত্যস্য ধূর্ত্তিঃ'র কবলে রহিয়াছে। দ্যৌঃ রূপে নিখিলের যে মুক্ত, উদার হিরণ্য আধার, তাতে তুলিয়া দেবার যে হিরণ্যসরণি, তাকে বল—

'দেবযান', এবং তৎ-তৎ অনুবন্ধে যে অনুবৃত্তি ও অনুভূতি, তাকে বল— 'দিব্য'। জপে অর্দ্ধমাত্রার সেতু ধরাইয়া দেয়—দেবযান।

পিতৃযান

হিরণ্যসরণি ধরিয়া নিখিলের হিরণ্যাধার পর্যন্ত গতি হইতেছে না বটে, কিন্তু গতিচক্রের আবৃত্তি হঠাৎ খণ্ডিতবৎ না হইয়া যদি কোন অব্যক্ত (সুতরাং অ-হিরণ্য) আধান ও মেরুর সঙ্গে আপন অবিচ্ছেদটি রক্ষা করিয়া চলে, তবে সেক্ষেত্রে হইল 'পিতৃযান'। ঐ অব্যক্তে আপন আধানটি হইল 'স্বধা'। দেবযানের মত পিতৃযানও সার্বভূমিক তত্ত্ব; জপাদিতে এদের প্রয়োগ বুঝিয়া লইও। হিরণ্যসরণিটি ধরিয়া চলিতে পারিলে—স্বাহা এবং হব্য; পিতৃযানে স্বধা এবং কব্য। তোমার জপপরিক্রমাটি যদি এখনও অবিচ্ছেদে অব্যক্তাদি ও অব্যক্তান্ত মাত্র হইয়া চলিতেছে মনে কর, তবে তোমার গতি পিতৃযানে, এবং তোমার জপ কব্যভুক্।

হব্য ও কব্য

হব্য এবং কব্য শব্দ দুটিতে 'ব্য' সাধারণ, কিন্তু কব্যে ব্যঞ্জনের আদি বর্ণ, আর, হব্যে ব্যঞ্জনের অন্তিম বর্ণ। এতে কি বুঝিবে? হব্য বলে—'আমি শেষ পর্যন্ত গিয়াছি, অথবা চলিতেছি'। কব্য বলে—'আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম; জানি না, কবে, কোথায়, কিভাবে আমার শেষ!' ব্যঞ্জনমুখ যে 'ক' বর্ণ, তার উদয় বুঝায় যদি 'কু', তবে, এটি গুণিত হয় 'কো'। এই 'কো' কে যদি শেষ পর্যন্ত গতিমান্ করিতে পার তো, কো+ই (গত্যর্থ)=কবি=ক্রান্তদর্শী। কিন্তু 'ই' যদি সম্ভাব্য মাত্র হয় (indeterminate possibility of a process to be completed) তবে, 'ই' পরে 'য' আসিল। ফলে, কো+ইয়=কব্য। (ধ্বনিসূত্রে)

'ভূর্ভুবঃ সুবরোম্'

শুক্লা ও কৃষ্ণা গতি সম্বন্ধে সার্বভূমিকত্ব এবং জপাদিতে তার সবিশেষ প্রয়োগ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, দ্যৌঃ—এই ভূমিতে হিরণ্যবর্ত্মনা আহিত না হইলে কোন কিছুই 'সার্ব্বভৌম' রূপে প্রতিভাত হয় না। এই নিমিত্ত সূত্রের কারিকায় দ্যৌঃকে

'ব্রহ্মসুবঃ' বলা হইয়াছে; এবং এও বলা হইয়াছে যে 'নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ'। 'ব্রহ্মসুবঃ' গায়ত্রী শিরঃ হইতে সংগ্রহ কর। তথায় 'ব্রহ্মভূঃ' এবং 'ব্রহ্মভুবঃ' শব্দদ্বয়ও রহিয়াছে। 'ব্রহ্মণি সূয়তে সনা'—ব্রহ্মে যে নিত্য 'সূত' (eternally born) ভাব; সেটি ব্রহ্মসুবঃ সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সবিতা (cternally creating) এবং নিত্য সবন (eternal creation) ভাব দুটি আছে। যথা, প্রণবে অ=সুত, উ=সবন, ম এবং তদন্তে অর্দ্ধমাত্রা=সবিতা। ('সু' ধাতু লওয়া হইল।)

প্রণবের ঐ বর্ণত্রয়কে যথাক্রমে আন্তর-ভাবোজ্জ্বল প্রকাশের তিনটি ভূমিরূপে ধ্যান করিবে। ঐ ভূমিত্রয়ের রহস্য নাম—হিরণ্য, রুক্ম, হিরন্ময়। প্রণবের 'ম'কারে যাইয়া 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' রূপটি বুঝিতে হইবে। তদ্দ্বারা যে সত্যের মুখ 'অপিহিত' সে সত্য হইলেন অর্দ্ধমাত্রা, নাদবিন্দুকলাত্মিকা এবং তদতীতা; একাধারে অপরাব্যক্তা, পরাব্যক্তা এবং পরমাব্যক্তা। 'অ' কারেই হিরণ্যসরণি (হিরণ্যরেতাঃ অগ্নিদ্বারা সমুদ্ভাসিত) অনুসৃত হইল—ইহা ধ্যান করিবে। যেখানে আন্তর ভাববর্চ্চঃ বা রহস্য রশ্মি (the gleam of hidden power, rhythm and significance) ফুটিবার নিমিত্ত উন্মুখ হয় নাই, সেখানে হিরণ্যসরণি এখনও সুরু হয় নাই।

মধ্যমার মাধ্যমে

জপে ও ধ্যানে বাক্ ও ভাব মধ্যমারূপী ধুরে সাক্ষাদ্ ভাবে না আসা পর্যন্ত হিরণ্যধাম অন্তিকে নয়, দূরে। বৈখরী বাক্ ও ভাব স্থূল ব্যক্ত; কিন্তু স্থূল বলিয়াই তমসা ও রজসা 'পিহিত' (veiled, vitiated, distorted by the conditions of sense-reaction)। মধ্যমায় এসব নিজ নিজ যথার্থ এবং নিত্য যে আকৃতি এবং ছন্দঃ, তাদের 'শাসনে' আসিয়া 'সত্যানুগ' এবং 'ঋতাধ্বগ' হয় (become corrected and standardized as regards their form and function)। এইখান থেকেই দ্যৌঃ বরুণাগ্নি সঙ্ঘাতরূপে নিজেকে এক অকুণ্ঠ-উদার, মহাসমন্বয়ী হিরণ্য আধার করিয়া মেলিয়া দেয়। সেই 'আধারে সুরু হয়—পশ্যন্তীর মহাসূক্ষ্মাবভাসিকা এবং পরার নিগূঢ় কারণাবভাসিকা দৃষ্টি। পশ্যন্তীতে সব কিছুর তমসা ও রজসা যে আবরণবিক্ষেপ, তার গ্রন্থি খুলিতে থাকে; কিন্তু একেবারেই নয়; কাজেই, পশ্যন্তীর গ্রাম-পরম্পরা আছে। পরায় সত্ত্ব আপন এবং রজস্তমঃ, এই তিন গ্রন্থি মোচনের নিমিত্ত ঐকান্তিক যে মূল

(কারণ) তার সন্ধান করে; এবং পরাপারীণ হইয়া পরমে স্থিত হয়। বারবার বলা হইয়াছে যে, এই হিরণ্যবর্ত্মক্রমটি সাধিবার নিমিত্তই ওঙ্কার, গায়ত্রী প্রভৃতি জপসাধনা। সুতরাং পরম বরিষ্ঠ যার বরেণ্য, তার এই পরমাশ্চর্য 'হিরণ্য' ব্যতীত আর কি শরণ্য আছে বল? নাম জপে বসিয়া যদি বোঝ তোমার সব এই কনকরসে, হেমবরণে ভরিয়া উঠিতেছে, তবেই বুঝিলে দ্যৌঃ তাঁর হিরণ্যঅঞ্চলটি পাতিলেন তোমার তরে।

হাঁ—নামে মজিয়া যদি না বোঝ তোমার অঙ্গের প্রতি রেণুটি ফাটিয়া এক অত্যদ্ভুত কনক রাগ রস প্লাবনে 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী ভাসিয়া যায়' ভাবটি সত্যই হইতেছে, তবে শুধুই মুখে, কি ও আওড়াইতেছ—'রাধারাণী—দয়াল-লহরী', 'গৌরসুন্দর-কৃপা-কণমাধুরী!' সকল দেশের এবং যুগের মরমী মিষ্টিকেরা এই কান্তোজ্জ্বল কনকরসের কথা বলেন যে! সেই কান্ত-সমুজ্জ্বল, শান্ত সুমধুর দ্যুলোক-হিরণ্যপটেই দিব্য দর্শনের এবং আস্বাদনের সমস্ত কিছু রূপ বর্ণালীর ঝরী আর অপরূপ ছন্দোলাস্য ফুটিয়া থাকে।

২৪। বরুণাগ্নি-সঙ্ঘাতাদ্ দ্যৌঃ ॥

বরুণ এবং অগ্নির সংহতি দ্যৌঃ ॥

সূত্রে 'বরুণ' এবং 'অগ্নি' তত্ত্ব দুটিকে পূর্ব নির্দেশ মত ভাবনা কর।

সূত্রে দ্যৌঃ যেভাবে লক্ষিত হইল, তাতে ইহা 'ঐ উর্দ্ধ জ্যোতির্ধাম'—শুধু এ ভাবে দেখিলে চলিবে না। ইহা 'লোক', এমন কি, 'আধার' মাত্র নয়। দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন তত্ত্বও ইহা নয়। কারণ—নিখিলের আদিম সবিতৃত্ব— যে এতে আছে, তা কারিকায় 'ব্রহ্মসুবঃ' পদে এবং তার পরের অংশে বলা হইয়াছে। প্রসব দ্বিবিধ—নিত্য ও নশ্বর। দ্যৌঃ রূপে ব্রহ্ম আপনাকে যে আদিম নিত্য 'সুবঃ' করেন—যাতে বিশ্বের যাবতীয় ঋতচ্ছন্দঃ এবং সত্য আকৃতি আবির্ভূত, বিধৃত, সংগৃহীত—সে দ্যৌঃকে নিত্য নশ্বর দ্বিবিধ সৃষ্টি সম্বন্ধে 'পিতা' এবং, 'মাতা' দুই-ই ভাবনা করা হইয়াছে। 'দ্যৌস্' প্রাচীন গ্রীকদের Zeus, আর 'দ্যৌঃ পিতর্' প্রাচীন লাটিনদের Jupiter রূপে আসিয়াছেন। 'Dei', 'Divine' ইত্যাদিও লক্ষ্য করিও।

নিত্য ও নশ্বর

আমরা যে ক্ষর, নশ্বর সৃষ্টিতে পতিত, তা থেকে আমাদের সাধন—বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান দুদিক দিয়েই—অক্ষর ও নিত্যের দিকে চলিয়াছে। ইহাই 'ঋতস্য পন্থাঃ' এবং 'সত্যস্য মুখমের' অপাবরণ। যাত্রা চলিয়াছে, পাদে, মাত্রায়, কলায়, কাষ্ঠায়। কাষ্ঠা বা পরিসীমার প্রশ্ন তো না তুলিয়া বা খুঁজিয়া উপায় নেই! কেননা, তাই থেকেই সব, এবং তাতেই সব। 'দ্যৌঃ এর সন্ধান এবং তাতে দৃষ্টি এই পরিসীমার সন্ধান ও দৃষ্টি। কিন্তু সর্বভাবনা, শেষ পর্যন্ত, ব্রহ্মভাবনা না হওয়া পর্যন্ত তো ছুটি নেই। তাই কারিকায় দুটি বেদসূক্ত (পুরুষ এবং অদিতি) উদ্দেশ করতঃ 'দ্যৌঃ' তত্ত্বকে ব্রহ্মভাবনার চারিটি ক্রমপর্যায়ে দেখান হইয়াছেঃ—(১) 'ব্রহ্মণি সূয়তে সনা'; (২) 'এতাবানস্য মহিমা'; (৩) 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'; (৪) 'অদিতির্দ্যৌঃ'। ব্রহ্ম নিত্য, আদিম 'সুবঃ' রূপে দেখাইলেন; আদিম পিতা অথবা মাতার মহিমা 'এতাবান্'; কিন্তু মর বা নশ্বরে তার এক পাদ মাত্র; এবং তিনি সেই নিরতিশয় অখণ্ড সামগ্রী ভূমা—অদিতি—সুতরাং 'এতাবত্তা' (কোন মানাদি দ্বারা নিরূপ্যমাণতা) তাঁকে স্পর্শ করে না। যথা, ওঙ্কার জপে— 'অউ'=ব্রহ্মসুবঃ; ম=এতাবান্ মহিমা; নাদ-কলা-বিন্দু=ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি; এবং তদতীত=ব্রহ্ম স্বয়ম্।

কারিকাঃ—

দ্যৌরিতি বেবিষাণস্য যাজ্ঞকমানেন সংহতি।
র্ব্রহ্মসুবরিতি জ্ঞেয়ং ব্রহ্মণি সূয়তে সনা॥ ১১২
অমৃতং দিবি সূক্তেন ত্রেধা নিদধ ইত্যতঃ।
অদিতির্দ্যৌরিতি শ্রুত্যা নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ॥ ১১৩

২৫। সোমমিত্রসঙ্ঘাতাৎ পৃথিবী॥

সোম এবং মিত্র—এতদুভয় সঙ্ঘাতে পৃথিবী॥

এতাবত্তা এবং নৈতাবত্তা

ধর, 'অউম' ভাবে ওঙ্কার ব্যাহরণ করিতেছ। এ ভাবে ব্যাহরণ হইল—এতাবত্তা (এ ভাবে, এতটা, এতদূর অবধি)। যৎকিঞ্চিৎ পাদমাত্রাদিতে রহিয়াছে বা চলিয়াছে,

তাহাই 'এতাবৎ'। কিন্তু ওঙ্কারাদি জপে যেমনধারা, তেমনিধারা সব কিছুকেই (বিজ্ঞানে এবং প্রজ্ঞানে) তার নির্দিষ্ট দেশ-কালাদির গণ্ডীর (কঞ্চুক) পারে লইতে হয়। সেটিকে সূক্ষ্মে, কারণে বুঝিবার নিমিত্তও বটে, এবং তার মধ্যে যাহা 'কলা' মাত্র, সেটিকে 'কাষ্ঠায়' মিলাইবার জন্যও বটে। তাই এতাবত্তা থেকে নৈতাবত্তার দিকে গতি। এবং প্রকার গতির সম্ভাবনা হয় যাহা থেকে, সেটিকে দ্যৌঃ রূপে চিনিতে যত্ন হইল।

কিন্তু এতাবত্তা নৈতাবত্তার আধারে রহিয়াও, এবং নৈতাবত্তাকে কাষ্ঠায় পাইব এই আকুতিতে চলিয়াও, কৈ নিজে তো বিলোপ পাইতেছে না; আপন মান ও সম্বন্ধ বদলাইয়া যাইতেছে। জলকণা হইতেছে নির্ঝর, নির্ঝর তটিনী, তটিনী সরিদ্‌বরা, সরিৎ সরিন্নাথ, সরিন্নাথ মহাবাষ্পমণ্ডল; কিন্তু এ যাত্রার কোথা অবধি কে বলিবে? ভিতর বাহির সব কিছু লইয়া এ ভাবে নৈতাবত্তার অন্বেষণ কর। জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে, যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ ও সাধন করিতেছ, সেটি, অণুই হোক্ আর বিরাটই হোক্, এতাবত্তাধর্মাবচ্ছিন্ন। যথা, জড়বিজ্ঞানে একদিকে 'কোয়ান্‌টাম ফিজিক্স', অন্য দিকে 'এস্ট্রাল'। প্রাণ ও মনের রাজ্যেও অন্যথা নয়। সর্বস্থলেই কিন্তু এতাবত্তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে নৈতাবত্তা—an unspecified margin of indeterminacy; গণিতাদির সর্ববিধ বিশ্লেষণ বিবৃতিতেও তাই। গণিতে টেলারস্ থিওরেমে মিলিল এক ভূয়সী ব্যাপিকা এতাবত্তা; কিন্তু পরবর্তী গবেষকরা সেটিকে নিরঙ্কুশ নিরবধি হইতে দিলেন কৈ? ব্রহ্ম সমস্ত কিছুতেই অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া ভেতরের কোন ভাব, অথবা বাইরের একটা ধূলির কাছেও কি হইতেছে?— 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।

এতাবত্তা হইল মান, অবধি, সীমার প্রশ্ন। ভাবিয়া দেখ—এতাবত্তায় দুটি মূল প্রশ্ন দেওয়া থাকে। একটাকে বলিতে পার—নিরূপক বা সম্বন্ধী বিন্দু (the point of reference or centre of relevancy); অপরটি নিরূপিকা বা সম্বন্ধিনী মাত্রা (what assigns the conditions and limits of a given frame or context of relevancy)। 'এইটা' সম্বন্ধে, আর 'এভাবে এই অবধি'—এই দুই মূল কথা।

সোম ও মিত্র

এখন সমস্ত কিছুকে যেটি তার মূল নিরূপক বিন্দুটি, তার সম্বন্ধে কেন্দ্রটি ধরাইয়া দেয়, সেটিকে এই গ্রন্থের পরিভাষায় বলা হইয়াছে 'সোম'। আর, যেটি, কোন

স্থলে, অথবা সর্বস্থলেই, ঠিক ঠিক অনুবন্ধ (relevancy) এবং যোগ্যতা (competency) র মান, মাত্রা এবং মর্যাদাটি নির্দেশ করিয়া দেয়, সেটি 'মিত্র'। গীতায় অর্জুনের বিষাদ যোগ। শ্রীকৃষ্ণ (সখা) মিত্ররূপে অর্জুনের উক্ত সঙ্কটে স্বধর্ম মর্যাদাটি দেখাইলেন। কোন সুদূর তারকার আলোক রশ্মিরেখা সূর্যসান্নিধ্যে আসিতে বক্র হইবে কিনা, সেটি পরীক্ষায় নিমিত্ত 'মিত্র' নির্দেশ করিবেন—অনুকূল ও আবশ্যক অবস্থাপুঞ্জ, এবং তাদের 'মর্যাদা'। সামান্যতঃ, কোন মান বা মাত্রাকে তার যথার্থ যোগ্য ও আবশ্যক মর্যাদা যেটি দেয়, সেটি হইল 'মিত্র'। ('মাত্রা' এবং 'মিত্র' শব্দ দুটি ভাবিয়া দেখিও)। সাধন, কোন না কোন ভাবে তো সকলেই করিতেছি; কিন্তু গুরু, আচার্য কেন আবশ্যক হয়? ঐ দুটি কর্ম করিবার জন্য—সোমকর্ম আর মিত্রকর্ম। লক্ষণ লইয়া ভাবিয়া দেখ।

সোম এবং মিত্রসঙ্ঘাতকে সূত্রে বলা হইল 'পৃথিবী'। এখন দেখ, পৃথিবীর আলোচনায় 'এতাবত্তা' গোড়ায় আসিল কেন? কারিকায় দেখ—'এতাবতীতি' আছে। যেমন তেমন এতাবত্তাকে পৃথিবী বলে না। সোম-মিত্রসংহতি তাতে থাকা আবশ্যক।

পৃথিবীতে সংহতি

সোম ওঙ্কারের সম্পুটিত, 'বৈন্দব' রূপ। সুতরাং ওঙ্কারপ্রভব যে সৃষ্টি—জড়ে, প্রাণে, মনে তার নাভিকেন্দ্রে সোমকে থাকিতেই হয়। সুষম সৃষ্টি-দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই সোমনাভ—সোম নাভিতে রহিয়া মধুক্ষরণে সব কিছু সোমাভিষুত রাখিয়াছেন, তাই না সব—শুধু ঐ ফুটন্ত পুষ্পকলিকা নয়—মধুমর্মী, আর, সব কিছুর—কেবল লাস্য বা সঙ্গীতের নয়—গতি মধুচ্ছন্দাঃ! আমাদের কারবারী দৃষ্টিতে সৃষ্টির যে বিষমাভাস, বিরূপবিভ্রম, তাতে সোম আপন 'ছন্দসা' মন্থন-সবন রূপটি সংগোপন করিয়াছেন; 'রভসা' যে উপমর্দ-বিমর্দ রূপ, সেইটেই দেখাইতেছেন। সোমের 'ছন্দসা' মন্থন-সবনটি ঘটান কে? —মিত্র; মনে রাখ যে, মিত্র=সবকিছুতে মান মাত্রাদির মর্যাদা-সংরক্ষক। যেমন, আমাদের এই সৌরমণ্ডলে ঐ সূর্য=মিত্র। আর, ঐ চন্দ্র=সোম বলিবে কি? না, তা সোজাসুজি বলিও না। 'চন্দ্রমা' সূত্রটি পুনশ্চ প্রণিধান কর। করিলে বুঝিবে যে, যাকে ঐ ভাস্বর জ্যোতিষ্ক ভাস্কর ভাবিতেছ, সেটিও আসলে 'সোমনাভ'। নচেৎ, এত প্রাণ, এত চেতনা, এত ছন্দঃ, এত সুষমা তা থেকে

উৎসারিত হইত না। সূর্য=Physical Mass মাত্র নয়; একটা ধূলিও তা নয়; সূর্য আপন নাভিতে সোম ধারণ করেন; একটা ধূলিও তাই। তবে, আপন সৌরমণ্ডল এবং জগতের মানমর্যাদা বিধাতা হিসাবে ঐ সূর্যকে বিশেষ করিয়া মিত্র বলা হয়। আর, ঐ চন্দ্রকেও অনুরূপ হেতুতে, বিশেষ করিয়া, সোমও বলা যায়। চন্দ্র এই পৃথিবীর নিকটবর্তী জ্যোতিষ্ক। এই নৈকট্য-নিবন্ধন পৃথিবীর সামগ্রিক রসসংস্থা এবং রস সঞ্চার (entire fluid economy)-এর উপর ঐ চন্দ্রের প্রভাব সমধিক। 'রস' শব্দকে প্রাণ-মানসাদি পর্যায়েও তুলিয়া লইও। এখন, সোম যদি সর্বত্র রসসংস্থা সংস্থাপক বস্তুটি হন, তবে ঐ চন্দ্রকে সোমমূর্তি ভাবা ঠিকই হয়। আর, এভাবে ঐ সূর্য, আর ঐ চন্দ্রকে, মিত্র আর সোমের প্রতীক, প্রতিনিধি করিয়া দেখিয়াও বোঝ—কেন, কিভাবে আমাদের এই পৃথিবী তার পার্থিবত্বে সংরক্ষিত রহিয়াছে। স্থূল প্রতীক দৃষ্টিতেও এই পৃথিবী সোমমিত্র সংহতিতেই তার বিধৃতি লাভ করিয়াছে। Earth এর আপন statics and dynamics, বিশেষ করিয়া, ঐ solar and lunar power *ensemble* দ্বারাই সংগৃহীত রহিয়াছে। পৃথিবীর আপন শক্তিকূটকে যদি বল ভৌম অগ্নি, তবে, দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষের অপর ঐ দুই অগ্নি (রবি ও সোম), তাকে স্বভাবে, স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে এ ভাবের বায়ুমণ্ডল থাকিবে কিনা, জলস্থলের এভাবের সংস্থা, এ-ভাবের স্তরবিন্যাস, এভাবের আভ্যন্তরীণ তাপচৌম্বকাদি শক্তিসংস্থা—ইত্যাদি ভূবিদ্যার যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান, ঐ দ্যুলোক-অন্তরীক্ষ আলোকদিশারীদ্বয় করিয়া দিবে।

পৃথিবীর 'জন্ম'

এই পৃথিবীর জন্মরহস্য বুঝিতে বিজ্ঞানের তরফ থেকেও, সোমমিত্রকে অনুবন্ধানুরোধে বুঝিয়া লইও। Tidal Theory যদি গ্রহণ কর, তবে ঐ সূর্য, আর সুদূর অতীতে সূর্য সন্নিধানে আগন্তুক অপর কোন মহাজ্যোতিষ্ক—এ দুটিকে সরাসরি মিত্র, আর সোম ধরিয়া লইও না। মুখ্যতঃ, স্থূলবস্তু সংস্থান (configuration) নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শক্তিসংস্থা (power *ensemble*) লক্ষ্য করিয়া তবে বুঝিতে হইবে কে বা মিত্র, কে বা সোম। কোন এক শক্তিক্ষেত্রে (অণুতে অথবা বিরাটে) দুইটি প্রশ্ন তুলিয়া তাদের জবাব পাইতে চেষ্টা কর। প্রথম—ছড়ানো মেলানো যে শক্তিক্ষেত্র, তাতে কোন

ধ্রুব-একান্ত না হইলেও আপেক্ষিক—কেন্দ্র বা নাভি গড়িয়া ওঠার প্রবণতা আছে অথবা নাই? যদি থাকে তো সোম সাড়া দিতেছেন। আপন জপধ্যানাদিতে এভাবে সোমের অভিষব (সাড়া) মিলাইতে যত্ন কর। 'সোম' মানে—যে ওঁ সঞ্চিত বা সম্পুটিত, সেটি সিঞ্চিত বা সঞ্চারীও বটে—('স'কারের এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা, অনুলোমে ও বিলোমে)। দ্বিতীয়—কেন্দ্র বা নাভি সমুদ্দেশে শক্তিপুঞ্জের এক সুষম সমন্বয়িনী ছন্দঃসংস্থা (যথা, এটমে, সৌরজগতে, প্রাণিকোষে, অহং-কেন্দ্রীণ অন্তঃকরণে) গড়িয়া উঠিতেছে, অথবা, না? যদি হয় তো—মিত্র (covering formula, governing equation ইত্যাদি আকারে) ছন্দোবন্ধন কর্মটি করিতেছেন। ভূয়সী ব্যাপিকা এ জিজ্ঞাসা; কাটিয়া টুকরা, আড়ষ্ট করিয়া সোমমিত্রাদি রহস্য বুঝিও না। প্রাচীন বিশাল আর্য সংস্কৃতির ভাস্বর প্রজ্ঞানগগনে সোমমিত্র চন্দ্রসূর্যের মতোই অনবগুণ্ঠিত রহস্যচ্ছটায় দেদীপ্যমান ছিলেন।

এই পৃথিবীর জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুতিতেও ঐ পুরাণী অথচ সনাতনী মরমী রহস্যচ্ছটায় তোমার লেখপত্র বিছাইয়া লও। প্রশ্ন কর—আচ্ছা, সূর্য আর সেই অজানা আগন্তুক জ্যোতিষ্কের সান্নিধ্যের ফলে সূর্যমণ্ডলের মহাবিপুল জলদ্-বাষ্প-সাগরে যে জোয়ার উঠিয়াছিল, সে জোয়ার তো অনেক রকমেই উঠিতে, ছড়াইতে, ছট্‌কাইতে পারিত; কিন্তু এক নির্দিষ্ট ফল (end or result) কেন্দ্রে রাখিয়া তার বিপরিণামগুলি ঘটিয়া গেল কেন? সম্ভাব্যতা বা Probability যদি প্রশ্ন হয় তো—সে তো ও ক্ষেত্রে নানা; সে নানা সম্ভাবনার মধ্যে কে বা কি 'না, না' করিয়া আর সব বাদ দিয়া একটাই অঙ্গীকার করিল? যদি বল—আকস্মিক, তবে সে আকস্মিককেও 'নিরূপিত' করেন সোমমিত্র। যদি বল—বাধ্যতাবশতঃ, তবে বাধ্যতার বন্ধ এবং ছন্দঃ—দুইই সোমমিত্র থেকে।

আকস্মিক ও বাধ্য

বন্ধদৃষ্টিতে আকস্মিক আর অবশ্যম্ভাবীর দ্বন্দ্ব। ছন্দোদৃষ্টিতে এ দ্বন্দ্বের পরিণয়, সমন্বয় চলিয়াছে। ক্রান্ত দৃষ্টিতে মহাসমন্বয়, শান্তদৃষ্টিতে পরম সমন্বয়। ব্যাহৃতি ত্রয়ের মধ্যে 'ভূঃ' সমস্ত কিছুকে 'এই' বলিয়া এক নিরূপ্যতা (determinateness) দিতেছে; 'স্বঃ' সমস্ত কিছুকে সৃষ্টির মূলে যে প্রাণ, আনন্দ এবং লীলাকৈবল্য, সেটিকে 'সেই'

বলিয়া দেখাইতেছে; সুতরাং, সে আনন্দ কেন্দ্র সম্পর্কে সবই স্বাধীন লীলা-সহযোগী। আর, 'ভুবঃ' ব্যবধানে থাকিয়া সমস্ত কিছুকে বলিতেছে—'তুমি যে না-এই, না-সেই ত্রিশঙ্কু হ'য়ে রয়েছ! তোমার এই-কে সেই-তে মিশাইবার যেটি সমর্থ ছন্দঃ, সেটি সাধিয়া লও।'

আনন্দহৃৎ এবং মর্যাদাভৃৎ

সব কিছুতে আনন্দহৃৎ রূপে রহিয়াছেন সোম। আর, সব কিছুর 'এই' বা 'এতাবৎ' রূপে যে স্ব-প্রতীতি, তাকে ঐ নিখিলকেন্দ্রীণ আনন্দহৃদের মানে মর্যাদায় যুড়িয়া দেন যিনি, তিনি মিত্র। নিজের এই রকম মর্যাদাপন্ন 'এই' ভাব, আর মর্যাদারহিত 'এই'—এ দুয়ের তুলনা করিয়া তোমাতে এই অপূর্ব সোমমিত্র সংহতিটি ধারণা কর। মর্যাদাবিরহী, মৈত্রবিধুর যে 'এই', 'এতাবৎ', তাকে অদিতি মাতার প্রত্যক্ষ তনু যে 'পৃথিবী', দ্যৌঃ-এর সম্মিলিতা যে 'পৃথিবী', তাঁর সঙ্গে এক করিয়া গুলাইও না। পৃথিবী মহীয়সী অদিতিদৈবতা এবং দ্যু-দ্যোতনীয়া তনু। 'এই পৃথিবী' রূপে স্থূলখণ্ড দৃষ্টিতে পৃথিবীকে, পূর্বোক্তরীতিতে, সোমমিত্র সংহতিতে দেখার প্রয়াসে কার্পণ্যদোষ হয়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। যেটি ব্যূঢ় দৃষ্টান্ত মাত্র, সেটিকে নির্ব্যূঢ় যে দার্ষ্টান্তিক, তার সঙ্গে 'এক' ভাবিয়া বসিতে নাই। বটের বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে বিশ্ববীজাঙ্কুর যে অর্দ্ধমাত্রা, তাকে বোঝা যেমন ধারা।

মিত্রকে সমস্ত কিছুর মর্যাদাকুশলী ছন্দোবিধাতারূপে ভাবনা করা হইয়াছে। এই 'মিত্র' শব্দের 'ম' কারে 'মধু' বা 'অমৃত'; 'র' কারে 'ঋতম্'; 'ত'কারে 'সত্যম্'; এবং মধ্যে 'ই'কারে ঐ ত্রয়ের সন্ধি সূচিত হইয়াছে। 'মিত্র' বা মৈত্রের অভাবে অরি ও বৈর। 'সোম'কেও সর্বসঞ্চয়ী ওমের সর্বসিঞ্চনকারী (স্) 'অব্যয়, নিধান, প্রভব' রূপে ধ্যানে রাখিও।

অমৃৎপাৎ ও স্বচ্ছন্দমাত্র

এই পৃথিবী গ্রহটি এক সাপেক্ষ দৃষ্টান্তরূপে এ সূত্রালোচনায় আসিলেও, লক্ষণমত সোমমিত্রসঙ্ঘাতাবচ্ছিন্ন যে এতাবত্তা,—'এতাবৎরূপে' প্রতীতি এবং ব্যবহারবিষয়তা,—তাকেই 'পৃথিবী' বলা হইয়াছে। সুতরাং, পৃথিবী অন্তর্বহিঃ, স্থূলসূক্ষ্ম সর্বভূমিতেই

লক্ষিতা এবং উপাসনীয়া এক রহস্যনিবিড় তত্ত্ব। মিত্র মানের মর্যাদা (সীমা) এবং অভিবিধি (ব্যাপ্তি), এ দুই-ই বিধান করতঃ হন—স্বচ্ছন্দমাত্রা। সর্ববিধ জপধ্যানাদিতে এই স্বচ্ছন্দমাত্রাটি মিলাইতে এত যত্ন করিতে হয়! 'এই তো—এতাবতী এই জপক্রিয়া—কিন্তু সোমমিত্রের অনুকম্পায় অমৃতপাৎ, স্বচ্ছন্দমাত্র হইয়া স্থিরা এবং পৃথ্বী হইতেছে কৈ!'

পৃথিবী বীজ—লং

যত কিছু 'এই' বা এতাবৎরূপে প্রতীত (given), তার মধ্যে 'এই তোমার অমৃত নাভি, এই তোমার স্বচ্ছন্দ পাদমানের অরাবলী, আর, এই তোমার সুষম শোভন কলার নেমি, এবং এই তোমার পূর্ণ পরিক্রমারূপ পরিসীমা'—এভাবে এতাবতের মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র দীক্ষাটি হইলে, তবে (অন্যথা নহে) এতাবতী (given as mere such) হয়—পৃথ্বী এবং পৃথিবী। এই প্রকার সোমনাভি আর মৈত্রমাতা পাইয়াছেন, তাই পৃথিবী মাতা আদিমা। পৃথিবী তত্ত্বের বীজ— 'লং'। এই বীজ জপে (বিশেষতঃ প্রণবসহ) যৎকিঞ্চিৎ 'এই' বা 'এতাবৎ' মাত্র, সেটি হয় সোমনাভ, অমৃতপাৎ এবং মৈত্রমাত্র। এ শব্দগুলির ব্যঞ্জনা আগে দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, সব কিছুকে concentrate, congruent, consolidate করার সাধন এই পৃথ্বীবীজের সাধন। Geocentric Hypothesis Astronomyতে বহুদিন ত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু পৃথ্বীমাতা যে সর্ব এতাবানের নাভি, এবং যে নাভি সংযোগটি রাখিয়াই সর্ব এতাবান্ স্বধর্মে ও স্বচ্ছন্দে সুস্থিরে বর্তমান এবং নিরুদ্বেগে বৃত্তিমান্ হইতে পারে—প্রজ্ঞানের এ মূল বাণীটি কোন্ বিজ্ঞানবাদ আজ অস্বীকার করিবে?

বেণ আখ্যায়িকা

বেণ এবং পৃথুর যে পুরাণী আখ্যায়িকা, তার মর্ম এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করিও। এতাবতী পূর্বোক্ত সোমমিত্র সংহতি থেকে চ্যুত হইয়া বিষমক্রূরাদি ছন্দে পতিত হইলে, বেণের অধিকার। সকল কালে, সর্বক্ষেত্রেই এটি ঘটিতেছে, অথবা ঘটিতে চলিয়াছে। বিষম ক্রুরাদির দৌরাত্ম্য প্রকাশ পায় সব কিছুকে গাঁঠ বাঁধিয়া, জট পাকাইয়া। শক্তিক্ষেত্র, বিশেষ করিয়া মানসক্ষেত্র, মাত্রেই এই 'বেণ'টিকে চিনিয়া লও। 'ব'=যে

কোন শক্তিব্যূহ; ‘এ’ সেটিকে এক ‘তল’ দেখাইয়া বলিতেছে—‘তুমি ঐ তল পানে গড়াইয়া চল’। ‘ণ’=মূর্দ্ধন্য শক্তিসম্পাত, এটি ‘এ’কারের যে তলমুখী বৃত্তি, সে বৃত্তির ফলকে পড়িয়া যেন ঠিক্‌রাইয়া যাইতেছে, তাকে ‘প্রভাবিত’ করিতেছে না। ‘ব’এর কোন তলাভিমুখী প্রবণতা যেন ‘dead’ and not ‘alive’ with respect to the incidence of Divine Influence. ভগবদ্‌বিমুখ যে জীবত্ব, তাতে (জীবে) এই ‘বে’ রূপটি বিস্পষ্ট। আচ্ছা ‘ণ’ এ যোগ কর ‘উ’। কি হইল? বেণু। জীবে পরম-মরম-রসবৈমুখ্য বিন্ধ করিতে (‘উ’ বর্ণে), এবং তাকে রসমুখীন করিতে বেণুর মত আর কি আছে বল ত’? উপরের যে পরশ আসিয়া সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া গেল, বেণুর ‘উ’ ছাড়া কে তাকে বলিবে তুমি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণটিকে মোর আকুল করিবে না? আর ‘বেন’ যদি ‘ন’ হয়, তা হইলেই বা ঐ আকৃতি (ফরমূলা) কি বুঝাইবে? কোন শক্তিব্যূহ (ব) যদি নিজেকে কোন তলে (plane) নামাইয়া এমন করিয়া রাখে, যাতে তৎসংস্থাবাধ্যসম্পন্নতার বাহিরে আর সে যাইতে অসমর্থ হয় (is incapable of breaking the drag momentum of its own involved complex), তবে পাইলাম ঐ ‘বেন’ ফরমূলা। এবম্বিধ complex এর morbid এবং malignant দুটি রূপ (জিহ্ম ও ক্রূর বলিতে পার)। অন্যভাবে, উৎকট ও নেপথ্য। ‘ত’ বর্গের শেষবর্ণে দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা—যেটি সম্পন্ন, সেটি যেন একটা দাঁড়ি টানিয়া বলে—‘এই যে আমি আছি, এর বাইরে অন্য কিছু আমাকে লইবে না, অথবা অন্য কিছু এর মধ্যে আসিবে না’। এ হেন যে ‘ন’, তার তো পরম মিত্র হইতে বাধা নাই, তবে ঐ ‘বে’ এর সাথে ক্রূর জিহ্মাদি সর্তে জোট পাকাইলে অনর্থ। ‘বেন’ সুন্দর হইতেও বাধা নেই।

‘ত’ বর্গ

‘ত’ বর্গের কথা অনেকবার হইয়াছে। সোজাসুজি ঐভাবে লও। কোন ভূমিতে (plane or position) আসিলাম=ত; তাতে থামিলাম=থ; সেখানে দাঁড়াইলাম=দ; চেষ্টা করিয়া কোন কিছু ধরিলাম (যেমন গাছের ফল)=ধ; এই তো কোন ফলে সম্পন্ন হইলাম=ন। আর কিছু চাই না=ন, এও বটে। ফলটি যদি পরম ফল হয় তো ঐ ‘না’ উত্তম। যদি পরম না হইয়াও শ্রেয়ঃ হয় তবে মধ্যম। আর যদি প্রেয়োমাত্র হয়

তো, অধম। আর, সে অধম যদি আবার জিহ্মক্রূর, উৎকট নেপথ্যাদিরূপে দুঃখভয়াবহ হয়, তবে তাকে কি বলিবে?

পৃথিবীর ইতিবৃত্তে বেণ ও পৃথু

পৃথিবীর পরিস্থিতিতে ও ইতিহাসে, জড়ীয় ও মানস, সমষ্টি ও ব্যষ্টি,—দুদিক দিয়াই এই 'বেন' আকৃতিটি ভাবিও। জড়ীয় দৃষ্টিতে (physically or geologically speaking) পৃথিবীতে আদৌ এক অত্যুগ্র (turbulent) অবস্থা। তার মধ্য হইতে ধরণীর এই যে ক্রমবিকাশের ধারা, সেটি কি আপন প্রণালীটি পাইল শুধু লটারি খেলিয়া? ছন্দঃটি বাঁধিয়া দিতে, প্রণালীটি ধরাইয়া দিতে, কোন লোকোত্তর (supra) ছন্দঃকুশল দিশারীর দরকার হয় নাই? সে লোকোত্তর শক্তিকে কোন লোকোত্তর পুরুষ ভাবিবে কিনা, সে পরের কথা। কিন্তু তাকে 'কর্ম্মাধ্যক্ষ' প্রশাসয়িত্ব ছন্দঃ (ঋতম্ মিত্রম্) না ভাবিয়া কোনক্রমে এই অপূর্ব বিকাশধারার উপপত্তি হইবে কি? সেদিনকার 'fortuitous conglomeration' এর সঙ্গে বর্তমানের creative evolution আর emergent evolution এর তুলনা কর। 'পাশার দান' এখনও বিজ্ঞানে চলিতেছে—কিন্তু নিছক তাই কি? পাশার ভেতর কে যেন চাপিয়া বসে—বলে 'দেখ না, কোন দিকে ঝুঁকি, কোন্ কাতে পড়ি!' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেই ঘটোৎকচ যেমন! কিন্তু ঘটোৎকচের আত্মকুল চাপিয়া পড়ার মরজি হওয়া তো বিচিত্র নয়! পাশার দানে যদি 'দানা' পাইয়া বসে তবে? 'বিপর্য্যয়' কথাটা চল আছে; এর যেটি অন্যথা তাকে যদি বল 'সুপর্য্যায়', তবে বিকাশপরিণতির সকল ক্রমান্বয়কে বিপর্যয় কাটাইয়া সুপর্যায়ে আনার নিমিত্ত কোন না কোন সঙ্কট (crisis) এবং সেতুর (pass over) সম্মুখীন হইতে হয়, এবং গতিলেখের মুখ ফিরাইয়া দিতে হয়। বিপর্যয়—সঙ্কটকে, সর্বস্থলে সাধারণভাবে যদি বল 'বেন', তবে, সুপর্যায়-সরণি-সারথি যেটি, তাকে, সাধারণভাবে, বল 'পৃথু'।

এই পৃথিবীর যেটি বর্তমান আকৃতিপ্রকৃতি সংস্থান (configuration of form and forces), জীবাভিব্যক্তির যে বিশিষ্ট ধারা (the curve of accomplished biological evolution), কৃষ্টি এবং অধ্যাত্ম বিকাশের যে ব্যবস্থিত ক্রম,—এ সবকেই বহু বিপর্যয় সঙ্কটের 'ফাঁড়া' কাটাইয়া বারবার তার সুপর্যায় সরণিটি ধরিয়া চলিতে

হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই, 'বেন' আর 'পৃথু'কে পৌরাণিকী গাথায় গাঁথিয়া রাখিও না। 'এই' পৃথিবীও উদাহরণ স্থলেই আসিতেছে, ইহা মনে রাখিও। এ তত্ত্বসূত্রের প্রয়োগ বিনিয়োগ সর্বত্র। তোমার শারীর ও মানস (অধ্যাত্ম) ক্ষেত্রে, জপধ্যানাদি সাধনে, বিশেষতঃ। 'বেণ' অথবা 'বেন' শব্দের 'ফরমূলা' যেভাবে ভাঙ্গিয়া দেখান হইয়াছে, সেটি চিন্তাকেন্দ্রে রাখিও।

সঙ্কট ও সম্পৎ

সর্বক্ষেত্রেই বিপর্যস্ত গতি বা বিপর্যয় আনে সঙ্কট। সে সঙ্কট ক্রূরজিহ্মাদি-রূপে গোচরে আসে। সঙ্কটে সর্ববিধ 'সম্পৎ' বিপর্যস্ত হয়। এখানে, 'সম্পৎ' বলিতে 'দৈবী' বুঝিতে হইবে। পৃথু কি করেন? যেখানে কোনপ্রকার 'এতাবতী সংস্থা' পূর্বোক্ত সঙ্কটাপন্ন বিপর্যয়ে শৃঙ্খলিত (যথা, বর্তমানে প্রয়োগবিজ্ঞান, অধ্যাত্মসংহতি সহযোগ, এতদুভয় ক্ষেত্রেই), সেখানে সঙ্কটমোচন পূর্বক নিমজ্জিত ও বিপর্যস্ত সম্পৎ (submerged and subverted values) পুনশ্চ 'দোহন' করতঃ যোগক্ষেম বিধান করেন। ফলে, যাহা বিপর্যস্ত, তাহা হয় সুপর্যস্ত; সঙ্কট হয় সম্পৎ; কর্ম হয় যজ্ঞ; শৃঙ্খল হয় শৃঙ্খলা; অর্থকামপ্রবৃত্তি হয় ধর্মানুশাসন বিধিনিষেধ; যদৃচ্ছা কামাচার হয় শাস্ত্র; প্রেয়ঃ হয় শ্রেয়ঃ ইত্যাদি। পৃথু শ্রীভগবানের অবতার। তিনি নিখিল শ্রেয়ঃ সম্পৎ দোহন করতঃ পৃথ্বী বা পৃথিবীকে সার্থকনাম্নী করিয়াছেন। সর্বত্র, সদাক্ষণ করিতেছেন। ধর, তোমার শ্বাস বিপর্যস্ত ভাবে চলিতেছে। ইহা বেনের অধিকার। যদি প্রণবাদি জপের ফলে সুপর্যস্ত, স্বচ্ছন্দ হয়তো পৃথু। এইভাবে সর্ব এতাবতী সংস্থায় মিলাইয়া লও।

পৃথু পরিচয়

পৃথু হইতেছেন সেই দৈবী সংযুক্তি যদ্দ্বারা এতাবতী মাত্রে পূর্বোক্ত সোমমিত্র সংহতিটি নিরুপদ্রব প্রবর্তিত হয়। যাতে—বাতসিন্ধু, ঊষানক্ত, ওষধি বনস্পতি, পার্থিব রজঃ গাভী—ইত্যাদি সমস্ত কিছু উদ্ভব মধু, মাধ্বী, মধুমান্ হয়। মধুমতী ঋকে পৃথ্বীকে মাধ্বী সম্পর্কে ওতপ্রোতারূপে কীর্তন করা হইয়াছে। সোমমিত্র সংহতিটি সঙ্গাতির পরিসীমায় আসিলে, তবে পৃথ্বীকে (অর্থাৎ, সোমমিত্রছন্দে গ্রথিত কোন এতাবতী প্রতীতি এবং সংস্থাকে) ঐ মধু পরিসীমায় ভরপূর, কাজেই মৌনগভীর এক

অনুভূতিতে মিলাইতে পারা যায়। এবম্প্রকার অনুভূতির যে মগ্নগভীরতা, সেটি 'মধু' শব্দের 'উ' বর্ণে দেওয়া আছে। 'ম'=সোম; 'ধ'=সমর্থ মিত্রচ্ছন্দে ধারণ; 'উ'=শুধু বাহ্য মাত্রাস্পর্শে নয়, পরন্তু সমস্ত কিছুর হৃৎ-সংবেদনে। বিশেষভাবে, ওষধি=সোম, বনস্পতি=মিত্র, ইত্যাদি ভাবে ধ্যানে মিলাইয়া লইও।

বাম উরু

পৃথু থেকে পৃথ্বী, পৃথিবী। বেনের 'বাম উরু' মন্থনে পৃথুর আবির্ভাব। 'বাম' শব্দে সুন্দরও বটে, উল্টাও বটে। বেনে momentum (কার্যকরী শক্তি) এর যে 'sense' (মুখ), সেটি না উল্টাইলে (reverse), যাহা বিপর্যয় ও বিপর্যস্ত (আগেকার বিবৃতিমত), তাহা সৌষ্ঠবে ও সৌষম্যে আসিবে না। যেমন, সাধারণ অজপায় (হংসযোগে নয়) যে 'হংসঃ', তাতে এ সবই 'ক্ষয়িষ্ণু'—running down এর দিকে। বর্ণদ্বয় উল্টাইয়া, এবং মধ্যে ঊর্দ্ধগ (elevating) 'ই' স্বর বসাইলে কি হয়?—'সিংহঃ'=মহাশক্তিধর, সাধিষ্ঠ সমর্থ ভাগবতী শক্তির বাহন।

দৃষ্টান্ত—সিংহ

বর্তমানে অণুর আভ্যন্তরীণ শক্তির ধর্ষণ ঘটিয়াছে, 'দোহন' হয় নাই। যে বাম-বিক্রম-পরিসীমা 'সিংহ', সে সিংহ নয়, পরন্তু প্রচণ্ড জড়িমার পরাকাষ্ঠা যে মদোদ্ধত 'কৃষ্ণ মাতঙ্গা' তাহাই মহা-আতঙ্ক আকারে আততায়ী হইয়াছে। জগদ্ধাত্রী ধ্যানে এই কৃষ্ণ মাতঙ্গা সিংহবীর্য দ্বারা নিপাতিত ও নিবারিত। জগতের (সেই সঙ্গে 'এই পৃথিবীর') উদ্ভবে, উদ্‌বর্তনে এবং সংরক্ষণে, প্রতি সঙ্কট সন্ধিতেই, এই প্রকার কৃষ্ণ মাতঙ্গা বিমথন আবশ্যক হইয়াছে, আর আজও হইতেছে। ব্যক্তির জীবনেও বটে। মাতঙ্গের কত না রূপ!—দুর্বার রিপু, দুর্জয় সংস্কার ও অভ্যাস, দুর্লঙ্ঘ্য পরিবেশ। এসবতাতেই এক একটা সঙ্কট সন্ধি (critical juncture) আসিলে তবে, 'বেন' হয় বাম (the 'opportune' redirection, reversal, re-valuation of what is critically contra-indicated)।

বাম 'উরু' কখন?

এই 'বাম' আবার 'উরু' হওয়া আবশ্যক। 'উরু' মানে thigh বুঝিবে? 'বাম উরু' এমন এক সমর্থ শাক্তী তনু, যা থেকে পৃথিবী-দোহনকারী 'পৃথু' আবির্ভূত

হইবেন। কাজেই 'left thigh' মাত্র হইলে হয় কৈ? মাঝখানে 'র' কে রাখিয়া দুই পাশে দুই 'উ' বর্ণ। 'র'=অগ্নি, তেজঃ, রবি, ভামতী—সম্পৎ। উ=বেধমুখ্যা প্রাণশক্তি। ধর, এক বীজ। তাতে যে নিগূঢ় শক্তিরাশি, এবং তার নিজস্ব 'লেখ' এবং 'ছন্দঃ' (the entire economy of intrinsic power deposit), সেটিকে সমর্থভাবে উন্মুখ ও উদিত করার নিমিত্ত যে আদিম প্রাণসেতু, সেটি আগের 'উ'; আর সমগ্র পরিবেশ (environment)— মৃত্তিকা, তাপ, বায়ু, আলোকাদি থেকে শক্তি সামগ্রীকে 'উপকুর্ব্বাণ' করার নিমিত্ত পরের 'উ'। এই দুটি (সেতু ও সহায়) ব্যতিরেকে বীজ অঙ্কুরাদি ক্রম পায় না— 'উরুক্রম' হয় না। অধ্যাত্মাদি সকল ক্ষেত্রেই ইহা পরীক্ষা করিও। 'উরু' এবং 'বরুণ'—শেষেরটিতে 'উ' স্থলে 'ব' কেন, এবং অন্তে এক 'ণ'ই কেন, এই দুটি আকৃতির সাদৃশ্য এবং অন্যথায় ধ্যান দিও।

বেনস্পন্দ ও পার্থস্পন্দ

পৃথু আসিলেন বেনের 'বাম উরু' মন্থনে। বর্তমানে ধর্ষণজাত (provoked by rupture method) যে আণবিক শক্তি, সেটিকে 'বাম উরু' মন্থনে 'পৃথু' না করিতে পারিলে, পৃথ্বীর নিখিল সম্পৎ দোহন-ক্ষম কোন উপায়ক (সেতু ও সহায় দুই ভাবে) মিলিবে না নিশ্চয়। [আণবিক বিস্ফোরণ জাত তৈজস-ঊর্মি radiations-সমূহ হইতে যেগুলি 'পৃথু' সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া অন্যগুলি পরিহার করা আবশ্যক।] যম নিয়ম, জপ ধ্যান, প্রাণায়াম ইত্যাদি ব্যক্তি সাধনেও এই পৃথু রূপটি সযত্নে সাধিতে হয়। আমার এই যে স্থূল সূক্ষ্ম যন্ত্র, এর স্থিতি ও গতি উভয়ের মূলে স্পন্দ। তার 'বেন' স্পন্দন নিরাকরণ পূর্বক, তাতে 'পার্থ' স্পন্দন কিসে আনা যায়—ইহাই তো প্রশ্ন। ওঙ্কারাদি মহানাম ভাব ও ছন্দঃ সহকারে জপে এটি সাধিত হইয়া থাকে সহজে, আর সেটি হইলে, পার্থ—পার্থসারথি সহায় হইয়া নিখিল দৈবীসম্পৎ দোহনে সাধিষ্ঠ সমর্থ, এতে 'কঃ সংশয়ঃ'? যুদ্ধক্ষেত্রে পার্থসারথি পার্থকে দেখাইলেন বিশ্বরূপ; তুমি যদি তোমার জীবনে ও কর্মে পার্থের বিশ্বরূপটি দেখিতে পাও, তবে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিও।

‘পৃথু’ শব্দ

‘প’ কারে ধর যে কোন স্পন্দ। ‘ঋ’ কারে তাকে ‘উর্দ্ধে ধান্নি’ উদ্ধৃত করিলে। ‘থ’ কারে তাকে তত্র ‘স্থির’ করিলে (অর্থাৎ, ক্ষণিকের এক পরশটুকু হইতে দিলে না)। শেষে, ‘উ’ কারে নিখিল অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স দোহনক্ষম করিলে। ‘দুহ্’ এর ‘উ’কার ‘পৃথু’ শব্দে লক্ষ্য করিও। ‘ঋ’ তে কৃতি এবং কৃপা—এ দুটিকে অন্বয়ে পাইতে হয়। Aspiration এবং Grace এ দুটি যেমন মেলা চাই, তেমনি অপর দুটিও একসাথ হওয়া চাই—‘থ’ এবং ‘উ’ যে দুটি নির্দেশ করে। কি সে দুটি? হে পার্থ! অগ্রে তুমি হও ধীর, তারপর?

বীর, ধীর, শূরভাব

ভাগবতী শক্তির ‘স্বধান্না’ সমুদ্ধৃত, সমাকৃষ্ট এবং পরিণামে সমাবৃত্ত যে (সর্বএতাবত্তাবচ্ছিন্ন) বীর, ধীর এবং শূরভাব, তাকে পৃথুর শব্দার্থ রাহস্যিক লক্ষণ বলিয়া জানিবে। শূর হবে সূরি—‘সদা পশ্যন্তী সূরয়ঃ’। এই পৃথু ব্যতীত যে পৃথ্বী বা পৃথিবী হয়ই না তা বলা হইয়াছে। পৃথু এবং পৃথ্বীতে মধ্যে যে ‘থ’ বর্ণ, তার মাধ্যমিকতা এবং মুখ্যতা নিবন্ধন, ধীর, স্থির ভাবটি সমধিকতায় বিদ্যমান। এই নিমিত্ত পৃথ্বী কৌর্মশক্তির অধিষ্ঠান; ‘স্থিরং সুখং’ যে আসন, সেটি পৃথ্বী তত্ত্বেই আধেয়—‘পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ’ ইত্যাদি। ‘ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং—ইহাও স্মরণ কর।

জপধ্যানাদি সমস্ত কিছুর ধৃতি, স্থিরতার জন্য পৃথ্বীমাতার অনুকম্পা এবং আপন অঙ্ক পাতিয়া দেয়া আবশ্যক। তবে স্থিরতা যাতে জড়িমা না হয়, সেইজন্য আগে ও অন্তে স্বরদ্বয়কে (ঋ এবং উ বা ঈ কে) সদা সজাগ রহিতে হইবে। নচেৎ, Entropy বা Cosmic running down এর বিশ্বব্যাপী জড়িমা থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। ‘পৃথ্বী’ এবং ‘পৃথিবী’ শব্দ দুটিতে ‘ব’ কারে এক রোধিকা বৃত্তি (storing, massing) থাকা বশতঃ সব কিছু জড় আর স্থির হবার এক সম্বেগ (drag) ওখানে পায়। ‘ঋ’ এবং ‘ই’ বর্ণ—এরা ‘ব’ এর সেই বন্ধ সম্বেগকে (inertia) যেন সৌষ্ঠব বিশ্লেষণ (symmetry analysis) এর নিমিত্ত সদা উন্মুখ ও প্রস্তুত রাখে—ইহা দেখিতে হইবে। ঋকারে সব কিছুর স্বধায়ন (homeward trans-formation), এবং ‘ই’ বর্ণে সব কিছুর ‘স্বাহায়ন’ (home-line progression) হবার সম্ভাব্যতা ও প্রস্তুতি দেওয়া আছে জানিবে।

পৃথিবীর কয়েক রহস্য নাম। 'ক্ষিতি' ও 'ক্ষতি'

পৃথিবীর কয়েকটি রহস্য নামে 'ক্ষ' অক্ষরটি রহিয়াছে; যথা—ক্ষ্মা, ক্ষৌণী, ক্ষিতি। 'ক্ষ' বর্ণটি অক্ষ বা ধূর সূচক। এই নিমিত্ত ক্ষ্মা হইতেছে সেই তত্ত্ব, যাতে সর্বতত্ত্বের সঙ্ঘাতের (co-ordination) যেটি অক্ষ, সেটি স্থাপিত; সুতরাং, 'স্থাং স্থীং স্থিরো ভব' বলিয়া সমস্ত কিছুকে এই অক্ষাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। সমুদ্রমন্থনে কৌর্মশক্তি তাই অক্ষপীঠ। সুষুম্নার অক্ষ মূলাধারে এই তত্ত্বেই প্রতিষ্ঠা। ক্ষ্মা ব্যতিরিকে অক্ষপ্রতিষ্ঠা পীঠ আর কোথায়? সর্বভূমিতে এটি বুঝিবে। অণুতে, জীবকোষে, অহঙ্কারে। সবাই তার পরিণামচক্রের একটা অক্ষপীঠ দেখাইয়া বলিতেছে—এইখানে তোমার সকল আবেগ সম্বেগের 'খুঁটি' গাড়িয়া তুমি বৃত্তি ও ব্যাপারবান্ হও। একটা লতার মূলদাঁড়া, এই দেহের শিরদাঁড়া, ইত্যাদি তাই বলে। 'ক্ষ্মা'তে কূর্ম, 'ক্ষৌণী'তে বারাহী শক্তি, 'ক্ষিতি'তে সুতল-মেরুপৃষ্ঠ শক্তির মুখ্যতা। শেষের এই কথা দুটি ভাবিয়া দেখিও—'তল' এবং 'মেরু' এ দুটিকে স্মরণ করতঃ। ধর, এক প্যারাবোলা আঁকিবে। কোন Directrix এবং কোন Axis (ক্ষ), দুয়ে মিশিয়া তার 'তল' ('ত') নির্দেশ করিল। অক্ষে কোন স্থিরবিন্দু (Focus) ধরিয়া লও। এখন, এই স্থিরবিন্দু আর ঐ স্থির নিরূপক রেখা (Directrix), এ দুয়ের সঙ্গে দূরত্ব সমান রাখিয়া যাইব, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া কোন অপর এক বিন্দু যদি চলিতে যায় ('ই'), তবে তার গতিপথ (curve) অক্ষকে যেখানে পাইল, সেটি হইল 'মেরু'। এই মেরুর দুইদিকে (ঊর্ধ্ব এবং অধঃ, +, -) সুষমভাবে (symmetrically) যে গতিবর্ত্ম রচিত হইল, সেটি 'সুতল', এবং তার মেরু 'সংস্থানটি' 'মেরুপৃষ্ঠ'। 'ক্ষিতি' শব্দে এই ভাবনাটি রহিয়াছে। কিন্তু, দৃষ্টান্তটি লইয়া দেখ যে, 'ক্ষ' 'ত' এবং তৎতৎ সম্পর্কে 'ই' দ্বয়ের সংহতি যথাযথ রক্ষিত হওয়া চাই। উক্ত যোগ্য সংহতি-ধারণী ও রক্ষণী শক্তি ঠিক রহিলে— 'ধরা', 'ধরণী', 'ধরিত্রী'। কিন্তু ধারণী ও রক্ষণী বৃত্তিদ্বয় সুষ্ঠুভাবে না হইলে, ক্ষিতি বিপর্যয় ঘটিয়া 'ক্ষতি' এবং 'ক্ষৎ'—এই প্রকার বিপরিণাম হয়।

'ক্ষৌণী' ও 'ক্ষুণ্ণ'

এই প্রকার 'ক্ষৌণী'র 'ক্ষুণ্ণ' হইলে চলিবে না। জপাদি সর্ববিধ সাধন যে পৃথ্বীতত্ত্বের স্থৈর্যে প্রতিষ্ঠিত, এবং পৃথিবী যে 'ক্ষিতি' আকৃতি, তাতে স্থিত হইয়া অনুলোম-

বিলোম, উদয়-বিলয় উভয় দিকে উপকুর্ব্বাণ গতিরূপটি (যথা, ওঙ্কারাদি জপে) রক্ষা করিবে ('ক্ষিতি' শব্দে 'ই'দ্বয় যার নির্দেশ দেয়)—এ কথা ক্ষিতি-তত্ত্বাশ্রিত জপে ও ধ্যানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ব্যতিক্রমে, জড়িমা, স্ত্যান, দৌর্মনস্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাইলে সযত্নে প্রতিবিধেয়। যেমন, 'ক্ষৎ' রূপে leakage সহ exhaust ভাবটি জপাদিতে থাকিলে 'ক্ষত্র' (শৌর্য) ভাব দ্বারা তার প্রতিকার অতি কর্তব্য। বাক্, প্রাণ, চিত্ত—যেখানেই 'ক্ষৎ' (leak and drain) সৃষ্টি হইবে, সেখানেই আত্ম-গুরু-কৃপালব্ধ রক্ষাশৌর্য (brake ইত্যাদি রূপে) প্রয়োগ করিতেই হইবে। 'ওঁ ঐঁ', 'ওঁ সোঽহম্'—ইত্যাদি এতে সমর্থ সহায়।

স্থির ও ধ্রুব

অণুতে বিরাটে (যথা, সৌরজগতে), বাহিরে অন্তরে—সর্বত্র পৃথ্বীকে ক্ষ্মা, ক্ষৌণী, ক্ষিতি—এই তিন আকৃতিতে পাইয়া তবে সবকিছু যথাক্রমে তাদের নাভি, অর এবং নেমি সম্বন্ধে এক এক স্থির (অথচ, অবষ্টম্ভক নয়) পীঠ, আধার ও আসন পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। Atomic অথবা Cosmic configuration-এর stability, Continuity of the germplasm, সংস্কার এবং সংসৃতি ধারা, যে কোন শক্তিলেখের নিজস্ব আকৃতি ও ছন্দঃটি পীঠাদিরূপে ধারণ করেন— 'পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী'। দেখ যে—এক স্থির 'এতাবান্' (here, now, this) অনুভবের উপরই নিখিল চরাচর প্রতিষ্ঠিত। শোধনে ও বোধনে এই আপেক্ষিককে পরমধ্রুবে লইতে পারিলেই আত্মা বা ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি।

জপে বিশেষতঃ বিন্দুমেরুতে ক্ষ্মা, নাদমেরুতে (যথা 'বরেণ্যং') ক্ষৌণী এবং অকারাদি অথবা ভূরাদি কলাবিতানে ক্ষিতি সুষ্ঠুভাবে সমাশ্রয়ণীয়া। 'ক্ষ্মা'র সঙ্গে 'ক্ষম', 'ক্ষমতা', 'ক্ষমা', 'ক্ষেম' আকৃতিগুলি মিলাইয়া লইবে; ক্ষ্মা প্রসন্না না হইলে ক্ষম হওয়া যায় না; ক্ষমা ও ক্ষেম কোন স্থলেই সম্ভাবিত হয় না।

'বাসুকি'

কিন্তু স্থিরত্ব তো বিশ্বব্যবহারে আপেক্ষিক, এমন কি আভাসিক। এটিকে অনপেক্ষ ধ্রুব করিয়া মিলাইবার নিমিত্তই জীবনে জপাদি সর্ব অনুবন্ধেই অফুরন্ত পরিক্রমা। সেই

চল্‌তি চাক্কির কীলটি ধরার যত্ন। কীলটি ধরিলে চাক্কি যদি ঘোরে তো তাও উত্তম। সর্বাবস্থায় ক্ষমা, ক্ষেম, ক্ষান্তি, ক্ষমতা—এ চারিটির নিমিত্ত ক্ষ্মা; সহনশীলতা এবং তিতিক্ষা—এই দুই প্রথম ভূমিকার নিমিত্ত ক্ষিতি; এবং ধীরতার জন্য ক্ষৌণী; এই তিনে প্রতিষ্ঠিত হও। গায়ত্রী প্রভৃতি জপে, বিন্দুমেরুতে ক্ষ্মা; নাদমেরুতে (যথা 'বরেণ্যং') ক্ষৌণী; এবং সুষম কলা-বিতানে ক্ষিতি প্রসন্ন থাকা চাই, বলা হইয়াছে। বিন্দুমেরু (পরাব্যক্তের) দুইধারে অর্দ্ধ-মাত্রারূপ সেতুদ্বয় ক্ষ্মার ক্ষম (উদয়ে) এবং ক্ষেম (বিলয়ে) রূপ জানিও। উদয়ে মূলাধারে অগ্নি উদ্দীপিত নাদরূপে প্রকট হইবেন; এটি ক্ষম। আর, বিলয় অন্তে ললাটমধ্যে আজ্ঞাস্থলে সোম অভিষব; এটি ক্ষেম। এই ক্ষমা ও ক্ষেম দুটিকে সমর্থ এবং স্বচ্ছন্দভাবে জপে মিলাইতে না পারিলে অগ্নীষোমীয় সমঞ্জসতা সাধিত হয় না; সুষুম্নার প্রাণজাগৃতিও ঘটে না। জপে নাদমেরু পর্যন্ত (যেমন 'বরেণ্যং') ক্ষমতা (কর্ম এবং বুদ্ধিপ্রয়াস); তৎপরে ক্ষান্তি (প্রপত্তি); এবং অন্তিমে, বিন্দুবিলয়ে, শান্তি। ক্ষম এবং ক্ষেম পক্ষদ্বয় যথাযথ সমাশ্রিত না হইলে, উদয়-প্রয়াস ক্রমশঃ আনে শ্রান্তি; আর, বিলয় বিলুণ্ঠন ক্রমে আনে ক্লান্তি। চড়াই ভাঙ্গিয়া শ্রান্তি, উতরাইতে ক্লান্তি। স্থিরত্ব, ধীরত্ব—সবই তো আপেক্ষিক কোটিতেই (in the frame of relativity) হইতেছে; অনপেক্ষ ধ্রুব কোটি—যার কথা গীতা উর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের উপমা দিয়া বলিয়াছেন—মিলাইবার জন্য আপেক্ষিককে বলিতে হয়— 'তুমি অপেক্ষা কর; আমি পরীক্ষা করি।' অনুপাত যতক্ষণ, ততক্ষণ অপেক্ষা। 'ক' নামক বস্তুর আপেক্ষিক গতিস্থিতি নির্ভর করে তৎসম্পর্কে 'খ' ও 'গ' এর অনুপাতের উপর। যেমন, এই পৃথিবীর আপন কক্ষে ও অক্ষে স্থিতি এবং আবর্তন। অণুতে বিরাটে, ভূতে অধ্যাত্মে, সর্বত্র তত্তৎ-দেশ-কাল-কারণাবচ্ছিন্ন সংস্থানের (situation) সংস্থাপক যে শক্তি অনুপাত (ratio of constituent forces), তাকে যদি বল—'বাসুকি', তবে এই বাসুকির ফণার উপরই পৃথিবী (যাবতীয় এতাবতী সংস্থা) রহিয়াছে, আর, সে ফণাটি হেলিলে দুলিলে, সব কিছু হেলিয়া দুলিয়া উঠে। অণুও বটে, বিরাট্ও বটে; মনও বটে; প্রাণও বটে। ব=গচ্ছিত শক্তি (potential); কি=কার্যকরী শক্তি (kinetic); মধ্যে, অসু=প্রাণ=সেতু=উভয়ের সাহিত্য অনুপাত। বাসুকির ফণা ঐ 'কি'। নাগরাজ কেন ভেবে দেখ। ন+অ+গ=অপ্রতিবুদ্ধগতি (unobstructed motion, self-initiated self-maintained)= কাল। এ কাল দেশসম্বন্ধে আসিয়া বক্রতাসম্পন্ন হয়; সমস্ত কিছুর যাহা 'হৃদয়' সেটি তার 'হৃদ্দেশের' অপেক্ষায় হয় 'কুটিল', আর, হৃদ্দেশটি হয় 'জটিল'। কোন সুদূর নক্ষত্র হইতে ধরিত্রীর বুকে রশ্মিরেখা ঋজুপথে আসিতে তার দেশমার্গে সৌরাদি জ্যোতিষ্কের সান্নিধ্যস্থলে বাঁকিয়া যাইবে। জপ-ধ্যানাদিতেও তাই। ধর, ওঙ্কার—কণ্ঠদেশে বৈখরীজপ হইতেছে। কণ্ঠে কোন বাধা থাকিলে, নাদ কম্পিত হইবে, খণ্ডিত হইবে, ইত্যাদি। স্নায়ু-শ্বাসাদি বাধার জন্য প্রাণায়াম; কণ্ঠ, মেরুদণ্ডাদির জন্য পদ্মসিদ্ধাদি আসন এবং জালন্ধর, খেচরী প্রভৃতি মুদ্রা সহায়ক। সর্পিল, সরীসৃপ, সর্প—এসব সতর্ক হবার স্থল।

জপে উদাহৃত

কুণ্ডলিনী প্রসঙ্গে নাগরহস্য আরও বিস্তারিত হইবে; এখন বুঝিয়া লও বাসুকি কিভাবে পৃথ্বীকে নিজ ফণায় ধারণ করেন। বাসুকিনাথের অনুকম্পায় তোমার জপাদি সাধন বাসুকি ফণা পীঠে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত রহুক। জপের বেলা নাদ এবং ভাব বাসুকির ফণা। নাদ এবং ভাব, এ দুয়ের ছন্দোগত্ব সংস্থাপক রূপে বাসুকিকে ভাবনা করিও। কেবল, এই পৃথিবীর যেটি স্থূল সংস্থা (physical configuration), তার জন্যই বাসুকির ফণাকে 'ভার' দিও না। যেমন, পৃথিবীর বর্তমান তাপ, ব্যয় এবং আয়ের ব্যালান্স ঠিক রাখিয়া, 'স্বচ্ছন্দে' রাখিতে বাসুকির ফণাকে (average kinetic energy as heat) ভূগর্ভে এক নিরন্তর 'যজ্ঞ' (radium-এর emanation ইত্যাদি)—চালাইতে হইতেছে। এ দেহ অথবা অন্য প্রাণিদেহ সম্বন্ধেও অনুরূপ ক্রিয়াকারকতা আছে। এ পৃথিবী তো এক বিরাট্ electro-magnetic যন্ত্রভাণ্ডার। কাজেই, এর আপন electro-magnetic field আছে, এবং তাহা যোগ্যাকৃতি 'line of force' দ্বারা সূচিত ও নিরূপিত। এখন, বিরাট্ শক্তিব্যূহকে যদি বলি (তদনুবন্ধে) 'বাসুকির ফণা', তবে অণু এবং বিরাটে অহরহঃ এবম্বিধ প্রতীকে—কল্পনাকুশলী বিজ্ঞান হাসিবে কেন? Kinetic Theory of Gases-এর ব্যাখ্যায় ম্যাক্স-ওয়েলের সেই 'Sorting Demon' বিদ্রূপের বস্তু হয়নি নিশ্চয়। 'বাসুকি' আরও গভীর এবং সার্বভূমিক রহস্য। একটা লাটিম ঘোরা অথবা সাবানের বুদ্‌বুদ থেকে সুরু করিয়া স্বপ্নসুষুপ্তি ধারণাদি সমাধি কোথাও বাসুকির ফণা ছাড়িয়া তুমি নেই। যতক্ষণ

আপেক্ষিক (relative), ততক্ষণ 'আনুপাতিক' (ratio-proportional)। যতক্ষণ ভূঃ স্বঃ-সম্বন্ধী, ততক্ষণ ভুবঃ সে সম্বন্ধের ঘটকালি করিবেই।

পুনশ্চ সোম ও মিত্র

আগে, সর্বক্ষেত্রেই সর্ববস্তুর যাহা অভীষ্ট মানমর্যাদার 'মাতা', তাকে 'মিত্র' বলা হইয়াছে। মিত্র সমস্ত কিছুকে তার অভীষ্ট 'tune'টি দেন; আর, সোম দেন 'tone'। মিত্র দেন ছন্দঃ, সোম সুর; সোম ভাব, মিত্র ব্যঞ্জনা; সোম রস, মিত্র অয়ন। সোম Nature, মিত্র Culture। যাহা কিছু 'এতাবৎ' বা 'এতাবতী' রূপে প্রতীতিতে আসিতেছে, তাতে এই সোম-মিত্র সঙ্ঘাতটি থাকিলে, তাকে পৃথ্বী বা পৃথিবী বলে—এই লক্ষণ আবারও স্মরণ করাইতেছি। ইহা 'ভূঃ'-এর সহিত একান্ত মিলাইও না। ('ভূঃ'এর লক্ষণ ভাবনা করিও, বিসর্গটি রহিলে এবং 'অব্যয়' হইলে, তবে এই আদি ব্যাহৃতি রূপ)। এখন, সোমমিত্র সঙ্ঘাতকে সংক্ষেপে যদি বল 'পাত' (সহপাত বা সম্পাত উদ্দেশ করতঃ), তবে, এই 'পাত'কে 'বি' না করিয়া 'অনু' (অনুপাত) করিয়া রাখে যাহা, তাহা 'বাসুকি'। পৃথিবী সব কিছুর স্থির-প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বটে, কিন্তু অব্যয় অক্ষর যে ধ্রুবত্ব, সেটি হয় কাষ্ঠায়; 'ধাম্নি', 'অধ্বনি' নয়।

'ভূভার'

কতকটা বিস্তারিত ভাবেই পৃথিবী সূত্রের আলোচনা হইল। পৃথিবীকে ব্যাপিকা করিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-আধ্যাত্মিকাদি সকল ভূমিতেই বোঝার প্রয়াসে। 'পৃথিবীভার', 'ভারকেন্দ্র'—এসবও অনুরূপভাবে বিশ্বব্যবহারে মিলাইয়া লইবে। যথা, এই Earth-এর যেটা physical mass, সেটিই কেবল তার 'ভার' নয়, আর, centre of gravity-ই কেন্দ্র নয়। এসব জড় পরিচ্ছেদে খণ্ডশো বার্তা। আসলে ভরণ এবং পোষণ করেন বলিয়া সোম রক্ষা করেন ভারসাম্য; আর, মিত্র মর্যাদায় রহেন বলিয়া কেন্দ্রস্থ, কেন্দ্রবশ, কেন্দ্রীণ রাখার কর্মটি করেন।

এই কর্মটি সাধারণ এবং বাহ্যমাত্র নয়। Physical mass=Energy, আর, Energy=Power as unrestricted, undiminished Whole (সমগ্র সত্তাশক্তি), এই সমীকরণ দুটি মনে রাখিলে, 'ভূভার' কথাটাকে কেবল, অথবা মুখ্যতঃ,

জড়তাজন্য 'চাপ' ইত্যাদি ভাবিব না। ধরাপৃষ্ঠে প্রাণ এবং চেতনার 'গৌরব' অথবা 'লাঘব' বিশেষভাবে হিসাবে ধরিতে হইবে। কৃতাদি চারিটি যুগ, এবং তত্তৎ যুগের লক্ষণ, ঐ সামগ্রিক ভারসাম্য সূত্রেই পরীক্ষা করিতে হইবে।

"ভারকেন্দ্র"

সৃষ্ট অথবা ভূত পদার্থ মাত্রেরি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, এই ত্রিবিধ, এবং প্রকারান্তরে পঞ্চবিধ বা সপ্তাদিবিধ সংস্থা (constitutional scheme) আছে। যেমন, আমাদের এই শরীরের। কাজেই, স্থূলের পরিচ্ছেদে যেটি ভার এবং ভারকেন্দ্র, সূক্ষ্মাদি ও সমগ্রের অনুবন্ধে সেটি নয়। যেমন, এই স্থূল শরীরের যেটা হৃদয় বা নাভি, সেটা সূক্ষ্মের বা সমগ্রের নয়। অণুর নিউক্লিয়াসে অণুর 'নাভি', 'হৃদয়', 'হৃল্লেখা' মিলে নাই। প্রথমটির সন্ধানে গতি কথঞ্চিৎ জিহ্মগাও হইয়াছে, মনে হয়; যথার্থ ঋজুগা হয় নাই। অর্থাৎ, শক্তি সম্বন্ধে 'পেশী'টি দেখাইয়া তেজঃ বা বল খুবই বাড়াইয়াছে, কিন্তু প্রাণ এবং তার মহীয়সী ওজঃ শক্তিকে বঞ্চিত ও কুণ্ঠিত করিয়াছে। 'ঐশী'র কোন পাত্তাই নেই।

এই স্থূল পৃথিবী সমগ্র পৃথিবী নয়; এমন কি, তার মুখ্য পৃথুরূপতার প্রতিষ্ঠাও নয়। এই জন্য, এই পৃথিবী, অথবা অপর যে কোন এতাবত্তাবচ্ছিন্ন পদার্থের 'ভার', 'ভারকেন্দ্র' এবং 'ভারসাম্য' বিচারে, centre of gravity ইত্যাদি স্থূল কেন্দ্রাদিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে চলিবে না। স্থৌল্য সমগ্র সত্তাশক্তির 'বাহ্য' অবক্ষেপ (throw or let down) মাত্র। যে শক্তি নিজেকে অবক্ষেপণ করিল, সেটি তদূর্ধ্বে তন্নিয়ামিকারূপে (ত্রিপাৎ হইয়া) বিরাজ করে। এবং তাহা প্রাণ এবং চেতনার ক্রমোন্নত স্তরেই। সুতরাং, তার 'কেন্দ্র' (নাভি, হৃল্লেখা ও বিন্দু) স্থূলের সম্বন্ধী হইয়াও, তাতেই স্থিত নয়। অবক্ষেপাদি শক্তি এবং তার অবক্ষিপ্ত স্থৌল্যাদি আকৃতিতে সোমমিত্র সংহতিটি রক্ষা হইলে ধর্ম। অন্যথায় 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ'। ধর্ম বৃষরূপে এবং পৃথিবী গো রূপে কল্পিতা হইয়াছেন। কাম ক্রোধাদি (বিশেষতঃ, হিংসা) ভূয়িষ্ঠ প্রাবল্য পাইলে, ভূভার যে কেন, কিভাবে, বৃদ্ধি পায়, তা ভাবিয়া দেখ। আণবিক—মারণাস্ত্রাদির ফলেও। Mass=Energy=Power unlimited সর্বদা মনে রাখিবে।

ভুভারহরণ

জপযজ্ঞ, নাম যজ্ঞাদি, সত্য-সুন্দর-শিবধ্যান, শান্তিবচন, স্বস্তিবাচন—ভূভার লাঘবে একান্ত সহায়ক; এবং, ভাগবতী শক্তির উদ্‌বোধনে ও অবতরণেও বটে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উভয়স্থলেই। 'ওঁ স্বস্তি', 'ওঁ শান্তিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র বারত্রয় করিয়া বাচিক ব্যাহরণ ভারের (সর্ববিধ tense পরিস্থিতির) লাঘবে এবং সমতাবিধানে প্রভাবশালী। এই সূত্র সদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ওঙ্কারই নিখিলের বিন্দুস্থলে স্থিত রহিয়া তাদের উদয়, বিলয় এবং সেতু (সন্ধি)—এই প্রকার ত্রিধা ব্যাপারবান্ রহিয়াছেন— 'ত্রেধা নিদধে পদম্'। সুতরাং, নামযজ্ঞাদি সকল মাঙ্গলিক কর্মেই ওঙ্কারের অনুবৃত্তি ছন্দোগা হওয়া চাই। ওঙ্কারের ছন্দঃ গায়ত্রী, যিনি ছন্দোমাতা, 'অমৃতস্য দুহানা'।

ওঙ্কারের চাক্ষুষী আকৃতি

ওঙ্কারের চাক্ষুষী আকৃতি (পশ্যন্তী পর্যায়ে) চতুর্বিধা। সর্বক্ষেত্রেই উক্ত চতুরাকৃতির ভাব এইভাবে ভাবনা করিও—

> ঊর্দ্ধশুণ্ডমধঃশুণ্ডং দ্বিধাব্যাবৃত্তশুণ্ডকম্।
> সর্গবিসর্গসন্ধীশং নৌম্যোঙ্কার-বিনায়কম্॥ ১১৪

ঊর্দ্ধশুণ্ড আকৃতি সর্গ বা উদয়ের দ্যোতক। অধঃশুণ্ড বিসর্গ বা বিলয়ের (অর্থাৎ, কারণলয়ের)। এবং ঊর্দ্ধ এবং অধঃ (ধনমুখী এবং ঋণমুখী) দ্বিধা ব্যাবৃত্ত (গুটান) শুণ্ড উদয়সন্ধি এবং বিলয়সন্ধি, এতদুভয়ের। এই দুইটি সেতু (উপক্রম) রূপ; সুতরাং এই সেতুদ্বয়েই বিশ্বব্যাপার বিধৃত। এই ত্রিতয় বা চতুষ্টয়ের অধীশ ওঙ্কাররূপী বিনায়ককে সর্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রণাম করি। গায়ত্রী, ওঙ্কার ইত্যাদি জপে ওঙ্কারেশ্বর বিনায়কের এই রূপগুলি ধ্যান করিবে এবং নিজ ব্যাহরণে মিলাইয়া লইবে। সেতু=অর্দ্ধমাত্রা।

'ভূভার' (আপনাতে এবং অন্যত্র, সর্বত্র) লাঘব ও হরণের নিমিত্ত ওঙ্কার বিনায়কের এই বিগ্রহচতুষ্টয়ী যথোপযোগ সমাশ্রয় করিবে। বাচিক জপে ও কীর্তনে উদয়মুখ্যতা; মানস জপে ও ধ্যানে বিলয়মুখ্যতা; প্রবোধন, জাগৃতি-স্থলে, এবং

নিবেদন সমর্পণ স্থলেও, উর্দ্ধাধো দ্বিধা ব্যাবৃত্তশুণ্ডরূপা যে সেতু, সেই সেতুর মুখ্যতা। ভারহরণ কর্মে 'হরি ওঁ' বা 'হরিবোল' অসামান্য জানিবে।

'স্বস্তি' ও 'শান্তি'

জপাদি সাধনের উদ্দেশ্যই হইল—আপনাতে এবং সমস্ত কিছুতে যে অপকেন্দ্রীণাদি (eccentricities) আসিয়া, তত্তৎস্থলে, পৃথিব্যাদি তত্ত্বকে 'বিলক্ষণ'—বিরুদ্ধ-লক্ষণ—করিয়া স্থিতি বিপর্যয় এবং গতি বিপর্যয় (maladjusted and perverted) ঘটাইতেছে, তাদিগকে ক্রমশঃ সুকেন্দ্রীণতায় লওয়া। সুকেন্দ্রীণ হওয়ার জন্য দ্বিবিধ অভিনিবেশ আবশ্যক—যথার্থ ছন্দোগ হবার দিকে, আর, ঠিক ধামগ হবার দিকে। প্রথমটি, 'স্বস্তি', অপরটি, 'শান্তিঃ'।

[দেবনাগরাক্ষরে ওঙ্কার সাধারণতঃ যে আকারে লিখিত হয়, তাতে দেবনাগর 'ওঁ' কারের পর, মাত্রাস্থলে '৩' এবং তদন্তে ক্ষুদ্রাকারে 'ম্' লিখিত হয়। এতে ব্যাহরণের স্থূল সঙ্কেতটি দেয়া আছেঃ— 'ও' স্বর তিনমাত্রায়, অর্থাৎ প্লুত, উচ্চারণ করতঃ বিন্দুগামী, সূক্ষ্মভাবে 'ম্' উচ্চারণ করিতে হইবে। 'ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা'। স্থূলতঃ, 'ও' তে তিন, আর, 'ম' এ এক—এইরূপ চারি মাত্রায় ওঙ্কার উচ্চারণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই চারিটি স্থূলতঃ ব্যক্ত, বৈখরী মাত্রা। অপর চারিটি সূক্ষ্মমাত্রা সঙ্গে না থাকিলে, 'তারচক্র' বা সবিতাস্বর অর্দ্ধগ্রস্ত রহেন।]

সর্বপদার্থের যাহা নাভি ইত্যাদিরূপে মর্মস্থল, তাকে যদি বল (তত্তৎ সম্বন্ধে) 'স্বঃ', তবে সেই 'তলে' অথবা, তল্লক্ষ্যে যে গতি-স্থিতি, তাকে বলিবে কি? 'স্বস্তি'। সুতরাং, সব কিছু তাদের 'হৃদিস্থিতের' সাক্ষাৎ সংযোগে স্থিত হইয়া, নাভিকেন্দ্রীণরূপে চলিতে থাকিলে 'স্বস্তি'তে থাকিল। স্বস্তির সঙ্গে পৃথ্বীর সম্বন্ধ (সোমমিত্র সূত্রে) আবারও ভাবনা করিও। ওঙ্কার বিনায়কের যে শুণ্ডবিন্যাস চতুষ্টয় দেখান হইয়াছে, তাদের প্রতিটি স্ব স্ব অনুবন্ধে 'স্বস্থ' রহিলে, 'স্বস্তি'; শুণ্ডাধান এবং সন্ধি যে বিন্দু, তাতে সৌম্যসমর্পণে— 'শান্তি', ইহাও মনে রাখিবে। যন্ত্রে, কিনা, সমর্থ শক্তিলেখ-আকৃতিতে, স্বস্তি আর স্বস্তিকের সম্বন্ধ চিন্তা করিও। স্বস্তিক ছাড়া পৃথিবী, অথবা কোন 'এতাবতী' প্রতিষ্ঠা, স্বস্তিতে থাকে না। হিট্‌লারের জর্মাণি স্বস্তিক রূপটি লইয়াছিল, কিন্তু সৌম্যসমর্পণের স্থল যে বিন্দু,

তাতে আপনাকে স্থিত না করিয়াই; কাজেই ফল শান্তি হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, ওঙ্কার আপনাকে মুক্ত-বিন্যাসবিশেষে 'স্বস্ত্যয়নে' ও 'শিবায়নে' আনিলে, তবে হয় 'স্বস্তিক'।

স্বস্তি, স্বস্তিক, স্বস্ত্যয়ন

'স্বস্তি' মন্ত্র, 'স্বস্তিক' যন্ত্র, 'স্বস্ত্যয়ন' তন্ত্র। সর্ববিধ মন্ত্রকে স্বস্থ রাখিতে ও পাইতে স্বস্তি, সর্ববিধ যন্ত্র (এবং আসন) কে 'স্থিত' রাখিতে স্বস্তিক; আর, সর্বতন্ত্রকে কুশল করিতে স্বস্ত্যয়ন। সোমনাভ না হইলে স্বস্তি হয় না; কোন মন্ত্র অথবা মন্ত্রজপে (যথা, প্রণবাদিতে বিন্দুদিততা, বিন্দুলীনতা) পৃথ্বী প্রসাদিতা না হইলে কোন যন্ত্রাসন (apparatus or power posture) কোন ক্ষেত্রেই (যেমন, সামাজিক, অর্থনৈতিকাদি পরিস্থিতিতে) 'স্বস্তিক' হয় না; আর, মিত্রকে মৈত্রে না মিলাইলে, কোন গতি (কর্ম বা অনুষ্ঠান) 'স্বস্ত্যয়ন' হয় না।

পৃথিবীর 'গুণ'

পৃথিবীতে আকাশাদি সকল ভূতের গুণ রহিয়াছে; বিশেষভাবে, গন্ধ। গন্ধ=smell সোজাসুজি বুঝিও না; যেমন, 'সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনম্' স্থলে নয়। 'গংগা' শব্দটিও পুনশ্চ ধ্যান কর। ভূতযোনি 'রাম নামে' ভয়ে পালায়, 'গঙ্গা' নামেও বটে। কেন? ঐ 'গং' বীজটি তাতে রহিয়াছে বলিয়া। 'গন্ধ' শব্দেও তাই।

ব্রহ্মের যে আদিম স্বতঃ এবং শাশ্বত গতিরূপ, তাকে যদি বল 'প্রাণ', তবে সে প্রাণ=মহাকাল=মহা-নাদ। এটি ব্যঞ্জনবর্ণের তৃতীয় মাতৃকা, 'গং'। ব্রহ্মের এই স্বতশ্চলিত 'গচ্ছতি' বা 'ঋচ্ছতি' রূপে যে বিশ্বতঃ প্রাণন, কলন ও 'নদন', একে স্থূলে, সূক্ষ্মে, অণুবিরাটে—বিবিধ বিচিত্রভাবে কেন্দ্রপীঠাদি সংস্থায় 'ধারণ' (আপেক্ষিক স্থির) না করিলে তো সৃষ্টির উপপত্তি হয় না; কেহই তো বলে না 'এই দেখ, চলিতেছি, তবু আছি'। আর, চলা দেখিতে গেলেও যে 'কোথাও' স্থির হইতে হয়। 'গং' কে কোনভাবে ধারণ এবং আধান করাটি হইল 'গন্ধ'। ইহা সুস্পষ্ট যে, গন্ধ পৃথ্বীরই স্বাভাবিক গুণ, স্বভাববৈশিষ্ট্য।

মনুষ্য ব্যবহারে রূপশব্দাদির তুলনায় গন্ধের গৌরব নেই বটে, কিন্তু অস্মদাদির

ধাতু, প্রকৃতি, সংস্কারাদিরূপে যে গভীর আধানভূমি ('basic being'), তার সঙ্গে গন্ধের (smell অর্থেও) অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই, সে আধান ও আকর ভূমি থেকে কোন (শ্রেয়ঃ বা বিপরীত) বৃত্তিতে জাগরিত অথবা অন্যভাবে প্রভাবিত করিতে গন্ধশক্তি মুখ্যস্থানীয়া। গন্ধবিজ্ঞান (তত্ত্ব এবং প্রয়োগে) প্রয়োজনীয়তায় কারও চাইতে ন্যূন নয়। 'অগ্নীষোমীয়ং জগৎ', কাজেই গন্ধেও অগ্নিমাত্রা ও সোমমাত্রা বিচার করিবে (যথা, কমল, শেফালী ইত্যাদি পুষ্পে, চন্দনে সোমমুখ্যতা; ধূনায় অগ্নি, গুগ্‌গুলে সোম; ইত্যাদি; গন্ধ প্রয়োগে দেখিও মিত্র যেন অগ্নি ও সোমের সমতা রক্ষা করেন)।

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাহিত্যানুপাতও গন্ধে বিচার্য। প্রত্যেক পদার্থের যাহা সত্তা (substance or essence), সেটি তার নিজস্ব গন্ধকেই বিশেষভাবে এবং নিয়তভাবে তার 'প্রতিভূ' করিয়াছে, জানিও। যেমন, তোমার চেহারাদি একান্ত বদলাইলেও, তোমার যে 'আপন' গন্ধ, সেটি তোমার ভক্ত কুকুরটি ঠিকই ধরিবে ও বুঝিবে। তবে, শব্দরূপাদির যেমন, গন্ধেরও তেমনি 'অতি' এবং 'অব' (supra ও infra) গ্রাম আছে। আর, সেইগুলোই বলিতে গেলে আসল।

স্বাভাবিক শব্দ ও রূপের কথা পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে বহুশঃ আলোচিত হইয়াছে। গন্ধকেও স্বভাবে লইয়া বুঝিলে পৃথ্বীতত্ত্ব বুঝা যাইবে। 'স্বভাবে লওয়া' সেই পূর্বরীতিতেই বুঝিতে হইবে। কোন বস্তু ঠিক তাই (স্ব) থাকিলে, তাতে, তদধিষ্ঠানে যাহা থাকে (ভাব), তাই তার 'স্বভাব'—এই সাধারণ কথাটি মনে রাখা চাই। এই ভাবকে ব্যবস্থিত করিয়া রাখে যেটি, সেটি 'ভূ'=পৃথিবীর 'ধাতব' সংজ্ঞা।

তাই, প্রতিটি বস্তু তার 'গন্ধরেণু'তে আহিত। 'প্রাণাণু', 'মানসাণু' ইত্যাদিরও স্বগন্ধ আছে, সুতরাং, পার্থিবত্বও আছে; জপাদি ক্রিয়ারও আছে। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, সবই 'পাঞ্চভৌতিক'। সর্বভূতে, সর্বস্তরে, সর্বগন্ধের যিনি অধীশ্বরী, তাঁকে বলে 'গন্ধেশ্বরী মাতা'। ইনি প্রসন্না না রহিলে, বিশ্বে, অন্তর্বহিঃ সর্বত্র, এক পচন বিক্রিয়া (universal rot and decay) সুরু হয়। পৃথিবী মাটি রূপে সকল গলিতদুর্গন্ধাদি জারণ শোধন করিতেছেন; এটি ক্ষ্মার 'ক্ষমা'রূপ। সুগন্ধি পুষ্পাদির গন্ধ ভরণ পোষণও করেন, ক্ষেমদা তিনি।

গন্ধসৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সৌষ্ঠবের যাহা কাষ্ঠা, সেটিকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা

হয় 'সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্', তবে আপনাতে, বন্ধনমুক্ত উর্ব্বারুকের মত, সাক্ষাদমৃতগন্ধি সেই কাষ্ঠা মিলাইবার নিমিত্ত পৃথ্বীকে ক্ষমা ও ক্ষেমদা, দুইরূপেই সাধিবে। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা (বিশেষতঃ গঙ্গাদি পুণ্যনদীর) অঙ্গে মার্জন ইত্যাদি প্রথম কর্ম্মে (ক্ষমা) অতীব প্রশস্ত। জপাদিতে যন্ত্রশুদ্ধির জন্য, বহিরঙ্গ হইলেও, এটি উত্তম সাধন। পূর্ব্বে ভৌমস্নান কথিত হইয়াছে। কেবল 'ক্ষমা' রূপে নয়, পরন্তু ক্ষেমদা, যোগদা ও মোক্ষদা রূপেও পৃথ্বীমায়ের নীরব নিবিড় করুণারসে নিখিল প্রাণীর সর্বসত্তা ওতপ্রোত অভিসিঞ্চিত করে। দীঘল সন্তাপ অন্তে ধরার বরিষণ-স্নান সুরভি, তৃণশস্প-ওষধিসমূহের মৃদুল স্নিগ্ধ গন্ধ, বিশেষ করিয়া ঊষায় সন্ধ্যায় ওষধি-বনস্পতি-পত্রপুষ্প-সম্ভারের কখন নিথর, কখন বাতহিল্লোলমুখর মঙ্গল গন্ধারতি বিশ্বদেবতার উদ্দেশে;—সবই তোমার কেবল বাহ্য নয়, পরন্তু সর্বাঙ্গীণ যোগক্ষেমের নিমিত্ত, প্রপন্ন প্রসন্ন অন্তরে, ধাতুচ্ছন্দে ঋতুচ্ছন্দে, মধুচ্ছন্দে বরণ করিবে। প্রভাতে দেবোদ্দেশে পুষ্প-পত্রাদির চয়নের ফল তো তাই।

গন্ধ এবং 'গং' বীজ

গন্ধনিষেবণে গন্ধের মূল যে 'গং' রূপ মাতৃকাবীজ সেটি নিয়ত ধ্যানে রাখিবে। প্রাণ বা নাদের যে নিরন্তর কুশল বহমানা ধারারূপ, সেটিকে, এক এক কেন্দ্র দেখাইয়া, তত্তৎসম্বন্ধে ঐ প্রাণাদির গতিকে 'যেন' জড়ো করিয়া স্থৈর্যে আনে গন্ধ; সুতরাং গন্ধে আকর্ষণী, কেন্দ্রমুখীনা শক্তির মুখ্যতা থাকা চাই। কেন্দ্র সম্পর্কে যে সব অর-নেম্যাদি বিন্যাস হইবে, তারা সুষম (concentric, symmetrical) হইলে, 'সুগন্ধ'। বিষমাদি স্থলে (eccentric ইত্যাদিতে), 'গন্ধাসুর'। উক্ত সৌষম্যটি আপেক্ষিক; কাজেই, তার এক পরাকাষ্ঠা আছে। সেই পরাকাষ্ঠায় নৈষ্ঠিক সাধন— 'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্'। যজনে বিল্বযজ্ঞডম্বুরাদি ইন্ধনগন্ধে অন্তর্বহিঃ (স্থূলতঃ) গন্ধের সৌগন্ধবন্ধমোচন হয়; আজ্যসহিত পত্রপুষ্পাদিতে, 'স্বাহা' মন্ত্রে, স্থূলের সংস্কার সূক্ষ্মের পর্যায়েও সম্প্রসারী হয়; আর, ওঙ্কারাদি বীজমন্ত্রের, অথবা যে কোন মহানামের বিন্দুলীনতায় যে 'সোমসবন', তাতে গন্ধের কারণ-ভূমিতেও সংস্কার হয় ইহা জানিবে। নামযজ্ঞ, স্তব-কীর্তনাদি, ধ্যান, ভাব—এ সবেও অনুরূপ রীতিতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ভূমিতে 'সংস্কার' পৌঁছান আবশ্যক।

‘ধূপধুনা’

জপ ধ্যানাদি সাধনে আপন যন্ত্র এবং বহিঃ-সংস্থা, এতদুভয় সংস্কারের নিমিত্ত, ‘গন্ধাসুর’ পরিহারপূর্বক, ‘সুর’গন্ধ সহায় করিবে। তবে ভিতরে ভাব-যোজনা ঠিকমত হইলে সোমামৃতগন্ধি যে পরমফল, সেটি মিলিবে। যেমন, ধূপে—

অগ্র্যচিত্তশলাকায়াং সুগিরাং গন্ধলেপনম্।
বিদ্যানুরাগদীপেন গন্ধস্যাপ্যায়নং কুরু॥ ১১৫

শাস্ত্র, গুরু, সন্তের যে সব সুবচন (সুগিরঃ) সে সব গন্ধপ্রলেপের মত তোমার অগ্র্যা—সূক্ষ্মাবগাহনক্ষমা—যে চিত্তশলাকা, তাতে জড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু বিদ্যা এবং অনুরাগ, এ দুয়ের সংযোগে যে দীপাগ্নি, তাতে দীপিত করতঃ তোমার ঐ চিত্তধূপশলাকা বিমলজ্ঞান আর দিব্য ভাবের যে পরম স্নিগ্ধমধুর গন্ধ, তার মঙ্গলমধুর আপ্যায়নটি করুক!

পুনশ্চ—

গন্ধগর্ভিতবিন্দুং বৈ নাদেন কুরু দীপিতম্।
আমোদিতং কলাভিস্তং ব্রহ্মবিন্দৌ নিবেশয়॥ ১১৬

জপারম্ভে বিন্দুকে ভাবনা কর গন্ধগর্ভিত যেন কস্তুরী-রেণু; নাদদীপে সেটি আদৌ দীপিত কর। কলাবিতানপূর্বক সেটি তোমার সমগ্র সত্তা আমোদিত করুক। অন্তে, সেটিকে ব্রহ্মবিন্দুতেই নিবিষ্ট কর। ওঁ শান্তিঃ॥

যখন জপাদিকালে মাটির অথবা ধাতুর ধূপদানে ধূপ ধূনা দিয়া অনুকূল, মিত্র গন্ধপরিবেশ সৃষ্টি করিতেছ, তখন এইরূপ ভাবনা করিও—

শরীরধূপপাত্রকং চিতেন্ধনাসিতং মনো
বিমুক্তজাড্য-পাংশুকং বিশুষ্কসঙ্গাহৃদ্রসম্।
জ্বলন্নিগূঢ়পাবকং স্ফুরৎ সিতেন্দুসুন্দরং
কৃপাসমীরদীপিতং সনাৎ-স্বভাবহীরকম্॥ ১১৭

মাটীর অথবা ধাতুর যে ধূপদানী হাতে তুলিলে, ভাব সেটা তোমার শরীর; ধুনুচি বা ধূপচিতে যে কালো কয়লা সাজাইলে, সে তোমার মন; সে মন সচরাচর আবার চিতার পোড়া কাঠের মতই কালো (চিতেন্ধনাসিতং)। চিতার পোড়া কাঠ কেন বলিলে, তা "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী"—এই কথায় বুঝিয়া লও। মনের কালিমা শতবার ধুইলেও যায় না যে! তার পরশে সে সবই কালো করে যে! উপায়? অগ্রে তার জড়িমারূপ যে 'পাংশু' (ছাই ভস্মের আবরণ), সেটি থেকে তাকে মুক্ত কর; পরে বিষয়সঙ্গে তার যে 'হৃদ্রস' (তৃষ্ণা), সেটি যথাশক্তি বিশুষ্ক কর। এ দুটি কর্ম না করিলে সে ময়লা ভিজে কয়লায় আগুন ধরিবে না। তৎপরে সে কয়লা সাজাইয়া (ছড়াইয়া রহিলে হইবে না), তার অন্তঃস্থলে (এক পাশে নয়) সন্ত সদ্‌গুরুর দীক্ষারূপ ওঙ্কারাদি পাবককে ধারণ কর এবং জ্বলিতে দাও। ফলে কালো কয়লার মত মনটি হোক্ 'স্ফুরৎ সিতেন্দুসুন্দরং'—শুভ্র চন্দ্রমার মত উজল সুন্দর! (এর পূর্বে তোমার ধূপদানী আন্দোলন আর তাতে বায়ুবীজন সারিয়া লইবে—এটি অভ্যাস ও প্রয়াস যোগ।) কিন্তু কৃপা সমীরের অপেক্ষায় এ সব কর্ম জানিবে। কৃপা সমীরে দীপিত হইলে কি হয়? যে কালো অঙ্গার তোমার রাকাশশাঙ্কসুন্দর রূপটি ধরিল, সে আর তো নিভিয়া যায় না; সে হয় চিরতরে স্বভাবস্নিগ্ধোজ্জ্বল যে হীরা, তাই। (মনে রাখ যে, কাঠকয়লা আর হীরা বস্তুতঃ একই)।

ধূপাদি সকল সাধনসহায়, এই ভাবে অধ্যাত্মযোগযুঞ্জান ভাবিত করিয়া না লইলে, তাদের মধ্যে নিগূঢ় সুভদ্র গন্ধরূপা পৃথ্বীমাতা সারাৎসার-কামদুঘা তো হন না!

পৃথ্বীস্নেহ-সমাশ্রয়

তারপর, ধ্যানে শান্তসমাহিত হইবে, অথবা ভাবে রসপুলকবিভোর হইবে, অথবা জপে, ভজনে, অর্চনে প্রাণে আনন্দাভিষিঞ্চন করিবে,—সকল কর্মেই সদা ভবমঙ্গল পৃথ্বীমানের অঞ্চল—তাঁর চিরস্নেহ, অভয়, অমৃতের আস্তরণ সমাশ্রয় কর:—

দধামি সত্যসুন্দরং শিবং প্রশান্ত আত্মনি
পিবামি কৃষ্ণমাধুরীং প্রফুল্লহৃৎসরোরুহে।

জপামি রামনাম বা ভজে নগেন্দ্রনন্দিনীং
শ্রয়ামি মাতুরঞ্চলং ভুবো ভবায় মঙ্গলম্॥ ১১৮

প্রশান্ত আত্মায় সত্যশিব সুন্দর পরব্রহ্মকে 'আধান' করি; অথবা, আমার প্রফুল্ল হৃৎসরোজ কৃষ্ণরূপ-লীলামাধুরী স্মরণপুলক-মকরন্দে পূরিত করি; অথবা, তারকব্রহ্ম যে রাম নাম, তার জপে এবং ভবসন্তাপহারিণী নগেন্দ্রনন্দিনীর ভজনে অনন্যমানস হই; যাহাই করি না কেন, সবই করি যেন আমার পৃথ্বীমায়ের (ভুবো মাতুঃ) যে নিখিল ভবমঙ্গাল স্নেহাঞ্চল, তাতে সমাশ্রিত হইয়াই। অর্থাৎ, সে অঞ্চল সমাশ্রয় ব্যতীত এ সব অভীষ্টের কোনটিই প্রতিষ্ঠা পাইবে না, এবং কোন 'ভব' (উদ্ভব) সুমঙ্গাল হইবে না।

'সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা' জগদ্ধাত্রীরূপিণী পৃথ্বীমায়ের এইভাবে স্মরণ, ধ্যান ও বন্দন, আত্ম-আধারে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, সন্তোষ, ক্ষেম এবং স্নেহনিবিড় ভাবটি বজায় রাখিতে একান্ত সহায়ক জানিবেঃ

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা"

শয়ে গিরীন্দ্রকন্দরেঽথবা বনে মঠে গৃহে
কদা বিলিপ্তচন্দনঃ কদাপি ধূলিধূসরঃ।
কদা কদন্নকাতরঃ কদা পলান্নমোদিতো
জহামি নৈব ধাত্রি! তেঽঙ্কনাকতঃ স্তনামৃতম্॥ ১১৯

হিমাচলে গুহাকন্দরশায়ীই হই, আর, বনে, মঠে অথবা গৃহেই শয়ন করি; কখনও অঙ্গে চন্দন লেপিয়াই থাকি, আবার কখনও, ধূলিধূসর হইয়াই রহি; কখনও বা কদন্নভোজনে কাতর হই, কখনও আবার পলান্নে প্রমোদিত হই;— যখন, যেভাবে, যে ভোগে থাকি না কেন—হে জগদ্ধাত্রি! হে পৃথ্বীমাতঃ! তোমার স্বর্গসম যে অঙ্ক (কোল), তাতেই রহিয়া (অঙ্কনাকতঃ) তোমার অকুণ্ঠ স্নেহনিবিড় স্তনামৃত, কৈ কখনও তো ছাড়িতে পারি না, সে তো কদাপি আমায় বঞ্চিত করে না!

মাটীর অথবা ধাতুর যে ধূপদানী হাতে তুলিলে, ভাব সেটা তোমার শরীর; ধুনুচি বা ধূপচিতে যে কালো কয়লা সাজাইলে, সে তোমার মন; সে মন সচরাচর আবার চিতার পোড়া কাঠের মতই কালো (চিতেন্ধনাসিতং)। চিতার পোড়া কাঠ কেন বলিলে, তা "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী"—এই কথায় বুঝিয়া লও। মনের কালিমা শতবার ধুইলেও যায় না যে! তার পরশে সে সবই কালো করে যে! উপায়? অগ্রে তার জড়িমারূপ যে 'পাংশু' (ছাই ভস্মের আবরণ), সেটি থেকে তাকে মুক্ত কর; পরে বিষয়সঙ্গে তার যে 'হৃদ্রস' (তৃষ্ণা), সেটি যথাশক্তি বিশুষ্ক কর। এ দুটি কর্ম না করিলে সে ময়লা ভিজে কয়লায় আগুন ধরিবে না। তৎপরে সে কয়লা সাজাইয়া (ছড়াইয়া রহিলে হইবে না), তার অন্তঃস্থলে (এক পাশে নয়) সন্ত সদ্গুরুর দীক্ষারূপ ওঙ্কারাদি পাবককে ধারণ কর এবং জ্বলিতে দাও। ফলে কালো কয়লার মত মনটি হোক্ 'স্ফুরৎ সিতেন্দুসুন্দরং'—শুভ্র চন্দ্রমার মত উজল সুন্দর! (এর পূর্বে তোমার ধূপদানী আন্দোলন আর তাতে বায়ুবীজন সারিয়া লইবে—এটি অভ্যাস ও প্রয়াস যোগ।) কিন্তু কৃপা সমীরের অপেক্ষায় এ সব কর্ম জানিবে। কৃপা সমীরে দীপিত হইলে কি হয়? যে কালো অঙ্গার তোমার রাকাশশাঙ্কসুন্দর রূপটি ধরিল, সে আর তো নিভিয়া যায় না; সে হয় চিরতরে স্বভাবস্নিগ্ধোজ্জ্বল যে হীরা, তাই। (মনে রাখ যে, কাঠকয়লা আর হীরা বস্তুতঃ একই)।

ধূপাদি সকল সাধনসহায়, এই ভাবে অধ্যাত্মযোগযুঞ্জান ভাবিত করিয়া না লইলে, তাদের মধ্যে নিগূঢ় সুভদ্র গন্ধরূপা পৃথ্বীমাতা সারাৎসার-কামদুঘা তো হন না!

পৃথ্বীস্নেহ-সমাশ্রয়

তারপর, ধ্যানে শান্তসমাহিত হইবে, অথবা ভাবে রসপুলকবিভোর হইবে, অথবা জপে, ভজনে, অর্চনে প্রাণে আনন্দাভিষিঞ্চন করিবে,—সকল কর্মেই সদা ভবমঙ্গল পৃথ্বীমানের অঞ্চল—তাঁর চিরস্নেহ, অভয়, অমৃতের আস্তরণ সমাশ্রয় কর:—

দধামি সত্যসুন্দরং শিবং প্রশান্ত আত্মনি
পিবামি কৃষ্ণমাধুরীং প্রফুল্লহৃৎসরোরুহে।

জপামি রামনাম বা ভজে নগেন্দ্রনন্দিনীং
শ্রয়ামি মাতুরঞ্চলং ভুবো ভবায় মঙ্গলম্॥ ১১৮

প্রশান্ত আত্মায় সত্যশিব সুন্দর পরব্রহ্মকে 'আধান' করি; অথবা, আমার প্রফুল্ল হৃৎসরোজ কৃষ্ণরূপ-লীলামাধুরী স্মরণপুলক-মকরন্দে পূরিত করি; অথবা, তারকব্রহ্ম যে রাম নাম, তার জপে এবং ভবসন্তাপহারিণী নগেন্দ্রনন্দিনীর ভজনে অনন্যমানস হই; যাহাই করি না কেন, সবই করি যেন আমার পৃথ্বীমায়ের (ভুবো মাতুঃ) যে নিখিল ভবমঙ্গল স্নেহাঞ্চল, তাতে সমাশ্রিত হইয়াই। অর্থাৎ, সে অঞ্চল সমাশ্রয় ব্যতীত এ সব অভীষ্টের কোনটিই প্রতিষ্ঠা পাইবে না, এবং কোন 'ভব' (উদ্ভব) সুমঙ্গল হইবে না।

'সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা' জগদ্ধাত্রীরূপিণী পৃথ্বীমায়ের এইভাবে স্মরণ, ধ্যান ও বন্দন, আত্ম-আধারে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, সন্তোষ, ক্ষেম এবং স্নেহনিবিড় ভাবটি বজায় রাখিতে একান্ত সহায়ক জানিবেঃ

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা"

শয়ে গিরীন্দ্রকন্দরেঽথবা বনে মঠে গৃহে
কদা বিলিপ্তচন্দনঃ কদাপি ধূলিধূসরঃ।
কদা কদন্নকাতরঃ কদা পলান্নমোদিতো
জহামি নৈব ধাত্রি! তেঽঙ্কনাকতঃ স্তনামৃতম্॥ ১১৯

হিমাচলে গুহাকন্দরশায়ীই হই, আর, বনে, মঠে অথবা গৃহেই শয়ন করি; কখনও অঙ্গে চন্দন লেপিয়াই থাকি, আবার কখনও, ধূলিধূসর হইয়াই রহি; কখনও বা কদন্নভোজনে কাতর হই, কখনও আবার পলান্নে প্রমোদিত হই;—যখন, যেভাবে, যে ভোগে থাকি না কেন—হে জগদ্ধাত্রি! হে পৃথ্বীমাতঃ! তোমার স্বর্গসম যে অঙ্ক (কোল), তাতেই রহিয়া (অঙ্কনাকতঃ) তোমার অকুণ্ঠ স্নেহনিবিড় স্তনামৃত, কৈ কখনও তো ছাড়িতে পারি না, সে তো কদাপি আমায় বঞ্চিত করে না!

পুনশ্চ,—

ক্বচিৎ প্রসূনবল্লরীপরাগরাগরঞ্জিতঃ
ক্বচিৎ প্রসক্তগৈরিকৈর্জটাকলাপপিঙ্গালঃ।
ক্বচিদ্ হিরণ্যলালসোঽথবাপ্যরণ্যনির্ভরো
লভেত কিং ধরিত্রি! চেন্ ন ভোগ-যোগ-মোক্ষদা॥ ১২০

তুমি ভোগলোলুপ, মধুলুব্ধ মধুকরের মত বিলাসনিকুঞ্জ-কুসুমের পরাগরাগে আপন তনমন অনুদিন রঞ্জিত করিতেছ। তুমি আবার সমাধিযোগসাধক মোক্ষাভিলাষী; তুমি কি হইয়াছ? গিরিগুহাদিতে নিরন্তর গৈরিকসঙ্গবশতঃ, শুধু তোমার বহির্বাস এবং অঙ্গ নয়, পরন্তু তোমার জটাকলাপও পিঙ্গল করিয়াছ। কোথাও আবার তুমি হিরণ্যলালসায়—অর্থকামের অন্বেষণে—ঘুরিতেছ। আবার দেখি তুমি বিরক্ত, বিবিক্ত তপস্বী হইয়া অরণ্যমাত্রনির্ভর হইয়াছ। কিন্তু ভোগী, যোগী, কামী, ত্যাগী—যাই হও তুমি, বল দেখি, কোথায় কি তোমার লাভ হইবে, যদি কামদুঘা ধরিত্রী মাতা একাধারে ভোগ-যোগ-মোক্ষদা না হয়েন!

গোচর সম্পৎ এবং অগোচর

সমুদ্ধরেন্ মহানিধিং যথাকরেষু গোপিতং
তথা বসূত্তমায় বৈ প্রপদ্যতাং বসুন্ধরা।
শুচিপ্রদেশপাদুকং শুচিপ্রবাহমালিকং
সুমঙ্গলায় সাগ্রহং শ্রয়ে প্রপন্ন-দৈবতম্॥ ১২১

পৃথ্বীমাতার ভুক্তিমুক্তিপ্রদা সম্পৎ গোচর এবং অগোচর দুই ভাবেই চিনিয়া সযত্নে আহরণ করিবে। আকরে—গভীর ভূস্তরে—লুকান মূল্যবান্ খনিজ, মহানিধিও যেমনধারা প্রথমে গূঢ়াবগাহিনী দৃষ্টিতে আবিষ্কার করিতে হয়, পরে প্রযত্নকৌশলী উপায়ে বহিষ্কার করিতে হয়, তেমনি ধারা অন্তর্বহিঃ তোমার যাহা কিছু পরমকাম্যধন (বসূত্তম), তার নিমিত্ত উপযুক্ত দীক্ষাশিক্ষা—উপায় সহকারে বসুন্ধরা মাতায় তোমায় অবশ্যই প্রপন্ন হইতে হইবে। বলিতে হইবে— 'মাগো! তপস্যা, জপধ্যানাদি যাহা

যাহা সাধন করিব, সে সবেরই জন্য দেখাইয়া দেও যোগ্য, মিত্র পরিবেশ, ক্ষেত্র, পীঠ, আসন। নিধিজ্ঞ পুরুষ যেমন জানিতে পারে, কোনখানে তার নিধি আছে গর্ভিত, গোপিত, আমিও যেন ত্বৎপ্রসাদে জানিতে পারি, চিনিতে পারি, আমার অনুকূল আসন পাতিবার ঠাঁই, আমার সিদ্ধিদ ক্ষেত্র ও পীঠ।' বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত জপাদি সাধন প্রয়াসে মিত্র পরিবেশ, আসন ও পীঠ (অর্থাৎ, যোগ্য দেশসংস্থা) একান্ত আবশ্যক বুঝিতে হইবে। আর, পৃথ্বীপ্রসাদ ব্যতীত এই যোগ্য-সংস্থা লাভ হয় না। পৃথ্বী প্রসন্না হইয়া আমায় দিব্যগন্ধাদির সূক্ষ্মচেতনাটি দিবেন, তবে আমি বুঝিব—এ ঠাঁই কি আমার মিত্র, সহায়! একটা occult sense-perception এর অপেক্ষা আছে ক্ষেত্র আসনাদির নির্বাচনে। দিব্য-জ্যোতিঃ, দিব্যধ্বনি—এসবও লক্ষণায় আসে। আদৌ শাস্ত্র, মহাজন, সন্ত সদ্গুরু—এঁরাই ও সব দেখাইয়া দেন। ক্রমে নিজেকেই দেখিতে, চিনিতে হয়।

এসব কিঞ্চিৎ অগোচর ভূমির কথা। গোচরে দেখ—পৃথ্বীরূপ যে প্রত্যক্ষ দৈবত, তিনি শুচিপ্রদেশ (তীর্থাদি) কে করিয়াছেন আপন 'পাদুকা'; শুচিপ্রবাহ (গঙ্গাদি) কে আপন 'মালিকা'; চিরসুমঙ্গল বিধানে তিনি 'সদাজাগ্রৎ'। এ হেন পুণ্য-পাদুকা যাঁর চরণে, এমন পূতমালিকা যাঁর বক্ষে, যিনি আমার যোগক্ষেমের তরে চিরজাগ্রত, সেই প্রপন্নের দেবতাকে আমি ভজনা করি।

গন্ধাদির সূক্ষ্ম চেতনা

ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) বিশেষভাবে গন্ধতত্ত্বের দৈবতপীঠস্থল; সুতরাং, জপধ্যানাদিতে নাসাগ্রে প্রাণসংযম (সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ও মনের) করিলে দিব্য গন্ধ অনুভবের সূক্ষ্ম পরদাগুলি খুলিতে থাকে। এইরূপ ভ্রূমধ্যে সংযমে জ্যোতিঃ, জিহ্বাস্পৃষ্ট তালুতে রস ইত্যাদি বুঝিও। কণ্ঠসহ এক উত্তমাঙ্গে সুষুম্নার সকল চক্র ও তত্ত্বগুলিও 'উন্নীত' (promoted) রহিয়াছে। অর্থাৎ, হৃদয়কে যদি মনে কর 'ধ্রুঃ' (Axis), তবে, এই ধ্রুবাশ্রয়ে নিম্নে এবং ঊর্দ্ধে সকল তত্ত্ব এবং চর্যার মিথুনভাব (duplication) রহিয়াছে, যার ফলে, যাহা কিছু ঊর্দ্ধক্রিয়, তারই এক অধঃক্রিয় 'দোসর'ও আছে। শারীর বিজ্ঞানে Brain এবং Spinal cord, Pituitary and Adrenal glands-এর সম্পর্ক, দৃষ্টান্তরূপে, তুলনা করিবে। মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব

এবং 'লং' বীজ তাঁদের মূল 'ঘাটি' পাতিলেন বটে, কিন্তু বিশেষভাবে চেতন ব্যবহারে তাঁদের 'স্বাধিকার' (গন্ধ সম্বন্ধে যোগক্ষেম) রক্ষার নিমিত্ত নাসিকা, গন্ধস্নায়ু এবং গন্ধকেন্দ্রে (অর্থাৎ, উত্তমাঙ্গে) তাঁদের প্রতিভূ (Deputy) রাখিলেন। পক্ষান্তরে, উপরকার সব প্রতিরূপকেই, সর্ববিষয়ে 'মূলে'র অপেক্ষা রাখিয়া চলিতে হয়। Reserve power ঐখানেই। তবে 'মূল' আর 'প্রতিরূপ' সম্পর্কেও রহস্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

মূল ও প্রতিভু

'মূল' আর 'প্রতিভূ', 'ঊর্দ্ধ' আর 'অধঃ'—এ সবকে উৎকর্ষাপকর্ষের তর-তমতায় লইবে না। আলোকশব্দাদি স্পন্দনের ক্ষেত্রে 'infra', 'ultra'–এসব যেমন। সামান্যতঃ, সকল পদার্থের যেটি 'হৃদয়' তাকে 'ধৃঃ' করিয়া, ব্যক্তাব্যক্ত (kinetic-potential), 'সচেতন', 'অবচেতন', ইত্যাদিরূপে, পদার্থের পূর্ণ শক্তিলেখ আপনাকে দ্বিধা বিন্যাস করিয়া লয়। কোথাও একটা রূপ 'মুখ্য' (dominant), অপরটি, তদপেক্ষায় মনে হয় 'গৌণ' (recessive)। কিন্তু পূর্ণ–শক্তিলেখ নিজেকে ঊর্দ্ধাধঃ সকল গ্রামেই পূর্ণ করিয়াই জানে। Power picture as a whole and a pragmatic appreciation of that picture in a given context এক বস্তু নয়। এইজন্য, ষট্চক্রের ঊর্দ্ধে যেমন 'সহস্রার', মূলাধারের নীচেও তেমনি। 'সহস্রার' = পূর্ণোন্মেষাকৃতি। যাহা অল্পবিস্তর পুটিত, তাকে পূরা খুলিয়া মেলিয়া পাইলে হয় 'সহস্রার'। সম্ভাব্যরূপে ইহা সর্বত্র আছে।

মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব, অথচ নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি, নাভিতে তেজস্তত্ত্ব, অথচ ভ্রূমধ্যে, বিশেষভাবে, জ্যোতিঃ প্রভৃতির দর্শন—এসব সূক্ষ্ম সূত্রের অনুসরণেই বুঝিতে হইবে।

'দেশবন্ধু'

পৃথ্বী সমস্তকে সর্বক্ষেত্রেই তার আপন 'প্রদেশ' (appropriate sphere and field) পাইতে দেন। কিন্তু প্রদেশ মাত্রের এক 'প্রাদেশিকতা' আছে; সে নানাভাবে 'অবরোধ' করে। এটি 'দেশবন্ধ'। এ বন্ধ 'বন্ধু' বটে (যোগে, ধারণার লক্ষণে যেমন); কিন্তু, প্রায়শঃ প্রতিবন্ধকও হয়। 'দেশবন্ধু' যদি 'দ্বেষবন্ধু' হয়, তবে তো মুস্কিল! দেশজন্য

যে বাধা (অবরোধ), তাকে পরিহারের নিমিত্ত 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' এই ব্যাহৃতি হবনটি (মানসিকও বটে) একান্ত উপযোগী। নীচের শ্লোকে তাই বলা হইতেছে:—

প্রভাতরুক্মদূকুলাং প্রদোষরক্তগৈরিকাং
দিবাললাটহীরকাং ক্ষপালকেন্দুকান্তিকাম্।
(ক্ষপাখদীপমৌক্তিকাম্)
উদাত্তনাদনন্দিতাং বিরামমৌননিদ্রিতাং
ভজে সতারভূরতোঽনলপ্রিয়েতি মন্ত্রিতাম্॥ ১২২

অথবা—

প্রভাতকাঞ্চনাম্বরাং প্রদোষরক্তগৈরিকাং
দিবাসিতোজ্জ্বলাঞ্চলাং ক্ষপেন্দুকান্তিকুন্তলাম্।
বিচিত্রনাদনন্দিতাং মুদা সমাধিবিন্দুগাং
শ্রয়ে সতারভূরতোঽনলপ্রিয়েতি চাহুতাম্॥ ১২৩

ব্যহৃতিহবনে পৃথ্বীতত্ত্ব

নবপ্রভাতের অরুণরাগে যিনি সিন্ধুশৈল, বনানীপ্রান্তর, সর্বত্র হন সৌমোজ্জ্বল কনকদূকুলা; প্রদোষে আবার অস্তগামী তপনের রক্তরাগে যিনি হন রক্তগৈরিকবসনা; দিবাভাগে যিনি তাঁর প্রসাদনির্মল গগনললাটে ধারণ করেন ভাস্করের হীরকমণি, আর ক্ষপায়, পরেন তাঁর পেলবমলিনা তমসার অলকদামে ইন্দুকান্তি মণিমালিকা; প্রভাতে উদাত্তনাদবিচিত্র কলাবিতানে করে যাঁর প্রভাতী বন্দনা আর অভিনন্দন; নিশীথ রজনী বিশ্বমৌনের মাঝে পাতে যাঁর স্বপ্ন-সুষুপ্তির স্নিগ্ধ সুরভি শয়ন; সেই আমার চির-অপরূপা ধরিত্রী মাকে আমি 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' (তার=ওঁ; অনলপ্রিয়া=স্বাহা)—এই মন্ত্রে অন্তর্বহিঃ হবনে ভজনা করিতেছি। কিসের নিমিত্ত, তা আগে বলা হইয়াছে।

পরের শ্লোকে 'কাঞ্চনাম্বরা', 'সিতোজ্জ্বলাঞ্চলা', এবং 'ইন্দুকান্তিকুন্তলা'—এই বিশেষণগুলি সহজে বুঝিয়া লইবে। পূর্বশ্লোকে নাদের বিশেষণ 'উদাত্ত', এখানে,

'বিচিত্র'। এ দুটিকে সমাহারে গ্রহণ করিবে। কেননা, গূঢ়ব্যঞ্জনায়, নাদের 'কেবল' নাদ ও 'সকল' নাদ—দুই-ই অভীষ্ট বুঝিতে হইবে। পরের শ্লোকে 'সমাধিবিন্দুগা' সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'মুদা' এবং 'বিন্দুগা'—এ দুয়ে সানন্দ এবং সাস্মিত সমাধির ভাব রহিয়াছে। শেষের চরণে অন্তর্বহিঃ হবন (ওঁ ভূঃ স্বাহা—মন্ত্রে) 'চাহুতা' এই পদে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

লক্ষ্য কর যে, শ্লোক দুটি স্থূলভাবে আমাদের গোচরা এই ধরিত্রীর রূপ লেখাদির মত হইলেও, নিগূঢ়রহস্য ব্যঞ্জনায় তড়িদ্‌গর্ভা মেঘমালার মত; সুতরাং, অগ্নিগর্ভা শমী যেমন, তেমন এদের বাক্‌শৈলী বুঝিও।

যেমন—ওঙ্কারাদি জপে উদয়াচল=অর্দ্ধমাত্রার উদয়োন্মুখতারূপ সেতু, যেটি সমাশ্রয় করতঃ সবিতা স্বর সমুদিত হইতেছেন। 'রক্তগৈরিক' ধ্যানমৌনভাব, সুতরাং, জপাদিতে নাদের বিন্দুমুখীনতা সূচনা করে। 'সিতোজ্জ্বলাঞ্চলা'তে নাদশেখর বা উন্মেষচূড়া, এবং 'ক্ষপেন্দু' ইত্যাদিতে উহাতে রসজ্যোতিঃ অথবা রোচিষের 'সকল' রূপটি বলা হইয়াছে। আর, বিশেষ করিয়া, 'মুদা সমাধিবিন্দুগাং' পদে বিন্দুমেরু, যেখানে কলাকলিত না হইয়াও, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্রমাঃ তিন তত্ত্বেই পূর্ণতায় পরিনিষ্ঠিত—উপলক্ষিত। অপরাপর অনুবন্ধেও শ্লোক দুটিকে অনুরূপ ভাবনায় যোজনা করিবে। ভিতরে ভরা ভাবের 'পূর' না দিয়া জপসূত্রমে যে শুধু কথাই তো পরিবেশন হইতেছে না, অভাবনীয় মহাভাবময়ীর পরিভাবনায়। (পরি=সর্ব্বতঃ)।

'ওঁ ভূঃ স্বাহা' মন্ত্রে আদি ওঙ্কারে বিশেষতঃ উদয়নাদ (অগ্নি); 'ভূঃ' দ্বারা এতাবতীরূপে পরিপূর্ণনাদ-আকৃতি (সূর্য), এবং 'স্বাহা' দ্বারা নাদের বিন্দুলীনতা (সোম), উপলক্ষিত জানিবে।

পৃথিবী লক্ষণ—বিশদভাবে

ভাল, পৃথিবী এবম্বিধ অগ্নি-সূর্য-সোম সংস্থায় কোন অধিকারে আসিবেন? যে কোন আকৃতি বা সংস্থা (ভিতরে অথবা বাহিরে) যার দ্বারা যদাশ্রয়ে, আপন প্রকৃতি, ধর্ম এবং ছন্দে সংস্থিত রহে, সেই প্রকৃত্যাদিসংস্থাপিকা মিত্র-সোমপরিণয়রূপা কৌর্ম শক্তিকেই 'পৃথিবী' বলিয়া সূত্রিত করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইহা সার্বভূমিক। জপাদিতে উদাহৃত কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নয়।

ইহাও লক্ষ্য কর যে, যেমন 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' পৃথ্বীর, তদ্রূপ 'ওঁ ভুবঃ স্বাহা' অন্তরীক্ষের এবং 'ওঁ স্বঃ স্বাহা' দ্যৌঃ এর প্রসাদ পরিকল্পিত আহুতি মন্ত্র। আর সম্মিলিত ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা হবনে পৃথ্বী-অন্তরীক্ষ-দ্যৌঃ—এই ত্রিতয়েরই প্রসন্ন সন্নিবেশ-সমাপন। পৃথ্বী=What stabilizes and consolidates any 'given'; দ্যৌঃ = What contains and consummates, or completes; অন্তরীক্ষ = What controls the ratio of conservation and consummation or completion.

ভাবনার ভাবন

পূর্বোক্ত ভাবনা (সূর্য-সোম-অগ্নির এক স্থির সার্থক সংস্থান সম্মিলন) নীচের এই রহস্য শ্লোকে পুনশ্চ 'ভাবিত' কর:—

যদা হিরণ্যরেতসা হিরণ্ময়াপিধানতো
হিরণ্যনাভগর্ভিণীমপাবৃতাং বৃণীমহে।
তদা মৃগাঙ্কমূর্দ্ধনো কলার্দ্ধ-সোমবিন্দুভিঃ
সুহৃৎস্রুবেণ হব্যবাট্ স্বধামধন্য আত্মরাট্॥ ১২৪

সমস্ত সৃষ্টপদার্থে পাঁচটি তত্ত্ব কেন্দ্র, এবং তদূর্দ্ধে এক 'আজ্ঞা' কেন্দ্র বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহা ঔপাদানিক ('material') জাতিবিভাগ। এই ছয়ের মধ্যে মুখ্যাবৃত্তিতে কোন তিনটিকে গ্রহণ কর—যথা, আজ্ঞা, নাভি, মূল। আগে বলা হইয়াছে যে, হৃদয়কে (গভীর অর্থে) 'ধৃঃ'রূপে সকল প্রকার গ্রহণেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং, হইল চার।

ভাবনের তাৎপর্য

এখন, ওঙ্কারাদির দৈবত অগ্নি—চিদগ্নি বা ব্রহ্মাগ্নি। ইহা সূর্য, সোম, অগ্নি—এই ত্রিপুটীর সম্পর্কে তুরীয়। ইহা সেই 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'—ধ্যান-বিষয়রূপে। ইহাকেই আমরা বরণ করি (বৃণীমহে), কিন্তু শ্রুতির প্রসিদ্ধ মন্ত্রে শুনি, ইহা 'অপিহিত'—আবৃত। আদৌ রজস্তমঃ অপিধান দ্বারা। বৈখরী জপধ্যানাদিতে প্রথমে এই মলিনাবরণ ক্ষীণ হউক। তারপর, হিরণ্ময়-অপিধান—সত্ত্ববিশাল। —A thin veil of golden haze. এটির অপাবরণের নিমিত্ত হিরণ্যরেতসের উপাসনা কর। হিরণ্যরেতঃ নহিলে হিরণ্যের অবগুণ্ঠন সরিবে না। ইহা আদিত্য বা প্রাণব্রহ্মের উপাসনা। যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে, বিলয়ে প্রথমে স্থূলবাকের 'পতন', পরে স্থূল সঙ্কল্পী মনের; তখন, প্রাণই একমাত্র রহেন—হিরণ্যরেতারূপে। রহিয়া কি করেন? 'হিরণ্যনাভগর্ভিণী'—বিন্দুশয়ানা যে পরা এবং পরমা, তাঁরও অপাবরণ সাধন করেন। 'নাভ' শব্দে নাভি বা মণিপুরের দ্যোতনা আছে, কিন্তু সর্ববিধ কেন্দ্রীণতার যে পরাবস্থা (বিন্দু), তাহাই লক্ষ্য বুঝিবে। আচ্ছা, বিন্দুবাসিনী পরা এইভাবে অনবগুণ্ঠিতা হইলে কি হয়, তৎসহকারে? 'তদা' ইত্যাদি। 'মৃগাঙ্কমূর্দ্ধা' যে আজ্ঞাধাম, তথা হইতে সোমার্দ্ধকলাক্ষরিত অমৃতবিন্দু, মূলাধারে যে 'হব্যবাট্' (অগ্নি) আছেন, তাঁতে সবন হইয়া, সে অগ্নিকে 'স্বধাম্নি' এবং 'স্বধাম্নাধন্য' আত্মরাট্ করেন। 'মূল' এবং 'আজ্ঞার' পরিপূর্ণ অগ্নীষোমীয় মিলনটি অনুভবে মিলাও। জপে উদয়নাদকে যদি ভাব উদ্দীপ্ত অগ্নি, তবে তাকে 'স্বধামধন্য আত্মরাট্' না হওয়া পর্যন্ত সে নাদের স্বধাম্না বেগবাহিতা এবং স্বধাম্নি (মূলবিন্দুতে) শান্তশায়িতা ঘটে না। নাদ আত্মরাট্ও (আত্মনি রাজতে যঃ সঃ) হন না।

অনাত্মব্যাসঙ্গ পরিহার

আর সোমসবনকর্মটি করিবে—'হৃদয়স্রুবা'। শ্লোকে 'সুহৃৎ'=সোমমিত্রের 'মিত্র', ইহাও বুঝিয়া লইও। এবম্বিধ আত্মরাট্ হইতে গেলে চারিটি 'অনাত্ম-ব্যাসঙ্গ' পরিহার করিতে হয়—সেই অবরোধাদি চারি বাধা।

দৈশিকীং কালিকীং বাধাং বাস্তবীং ছান্দসীং জহি।
মহাব্যাহৃতিভি র্হোমৈর্বহিরন্তর্যথাক্রমম্॥ ১২৫

মহাব্যাহৃতি হোমের ক্রমান্বয়ে চারিটি মন্ত্র দ্বারা (ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইত্যাদি) দৈশিক, কালিকাদি চারিবাধা জয় করিতে যত্ন কর। কেবল বাহ্যহবনে নয়; পরন্তু আন্তরভাবনাযোগেও। বাধা স্বরূপে নাই; ইহা মনঃকল্পিত। কিন্তু, অনাদি-অবিদ্যা সংস্কার বাধাকে করিয়াছে বজ্রের দেউল। প্রতিপক্ষ ভাবনার সংস্কার যে পরিমাণে দৃঢ়

হইবে, সে পরিমাণে বজ্রের দেউল হইবে বালির বাঁধ। অবিদ্যার অপগমে সে বাঁধও চলিয়া যায় ভেল্কির বাঁধের মত। যেন একটা মৌন ঘন কোয়াসার পাহাড়!

বাধা প্রতিষেধক্রম

বাধা প্রতিষেধার্থ সমর্থ প্রতিপক্ষভাবন তাই একান্ত আবশ্যক। 'এ সবই অনৃতকল্পনামূলক, কাজেই, আসলে অমূলক'—ইহাই প্রতিপক্ষভাবনের মূল সূত্র। 'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্'—এই অববোধে যাহা 'জঘন্য', তাও 'হিরণ্য' হইবে, আর হিরণ্য হইবে পরম 'বরেণ্য'। কিন্তু গোড়ায় বাধাকে বলিতে হয়— 'আমিই তোমাকে বাঁধিব' (to isolate and confine), যেমন, তাগা বাঁধিয়া সাপের বিষ। 'ভূঃ'তে যে পৃথ্বীশক্তি, তদ্দ্বারা এই প্রাথমিক কর্ম, নিগ্রহ সমাধা কর। তারপর, বলিতে হয়— 'আমি তোমাকে সাধিব'। —(to treat so as to control)। তারপর, বাধাকে বলিতে হয়— 'তোমাকে আমি পাল্টাইব' (to transform 'sense' and energy)। এর ফলে বাধাও হয় আমার আত্মীয়, 'স্বজন'। অন্তে, এটিকে আত্মনীন এবং আত্মসাৎ (completely in tune, unison) করিতে পারিলে তবে চরিতার্থতা। বাধা সম্বন্ধে আদৌ নিগ্রহ, তারপর সংগ্রহ বা সংযম; তারপর, সংস্কার বা শুদ্ধিভাবন; অন্তে, সাত্মীকরণ। এই শেষেরটাকে সরাসরি স্বীকার বা অঙ্গীকার বুঝিও না।

আত্মাকে 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', 'সর্ব্বব্যাপী', 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'—এই তিনভাবে না বুঝিলে কোনও কিছুই বলিবে না— 'তুমি আমাকে তোমাতেই মিলাইয়া লও'। যেমন, তটিনী আর সাগর; শিশিরবিন্দু আর মেঘমালা।

বাধাকে সাধিবার এই চারিটি ভূমি মনে রাখিয়া পূর্ব্বের ঐ মহাব্যাহৃতি হবনটি অন্তর্বহিঃ অনুষ্ঠান করিবে।

ভূঃ এবং ভূ

আগে বলা হইয়াছে যে, 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতির 'অব্যয়' এবং রজাত বিসর্গান্ত ভাবটি না থাকিলে হয় 'ভূ'। ইহা পৃথিবীর এক নাম। 'ভূ' থেকে 'ভূত'। 'ভূঃ' থেকে এই যে পরিণামধারা, তাতে আদিম এক অব্যয় তৈজস সত্তা নিজেকে যেন গণ্ডীর পর গণ্ডীতে বাঁধিতেছেন। নহিলে যে ভূতভৌতিক সৃষ্টি অস্মদাদির ব্যবহারযোগ্য আকারে

হয় না। 'ভূঃ' এর 'র' নিজেকে 'রোধিকা' করে এই নিমিত্ত। ফলে, বাধার নিগূঢ় নিগড়রূপে জন্ম।

রোধিকা সাধনমিত্রা

রোধিকা বাধিকা আকার হইলেও, তাকে সুষম সৃষ্টি উদ্দেশ্যে মুখ্যতঃ 'সাধিকা' থাকিতে হয়। কোনও কিছু ভাল করিয়া সাধিবে বলিয়াই সে 'বাহ্য' সকলকে বাধা দেয়। সৃষ্টির সর্বত্র ইহা দেখ। পৃথিবী (ভূ) 'ভূঃ'তে যে রোধিকা, তার এবম্প্রকার সাধিকামিত্রা বাধিকারূপ। 'সোমমিত্র' শব্দটিও এই একইভাবে বুঝিয়া লইও। কিন্তু, বাধা যদি সাধনমিত্রা না হইয়া সাধনবৈরিণী হয়, তবে কি করিবে? তবে, দেশাদিজন্য ঐ বাধাচতুষ্টয় পরিহারের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় সমাশ্রয় করিবে। বাধা অপনয়নের প্রয়াস কতদূর অবধি, তা এইভাবে ভাবনা করিবেঃ—

বাহু আর হৃদয়ের বলে, খর স্রোতো-বাধা করি জয়,
তরণী তোমার যবে তট-সন্নিকট।
মৌন ঘন কোয়াসায় ঘেরা, কাম্যতটে ভাবি বহু দূর,
নিরুৎসাহ, তুলি দাঁড়, হারাইবে তট!
বার বার কেন চাও পৃষ্ঠপানে,
কিছু নাহি দেখ সাড়া নাহি পাও,
নীরব কুহেলি মাঝে
কেহ তো বলে না, "এই আমি"।
কেন ভুলে যাও মিছে অভরসায়,
অসহায়ের মত, হে তরীবাহক!
তব বক্ষ মুখ পানে চেয়ে বসে তরণীর স্বামী॥
যেবা তোমা তরী কর্ণধার, সেই তট দেখে পুরোভাগে,
গতিমুখে পৃষ্ঠ তব, তুমি কি দেখিবে?
'আর প্রয়াসেতে নাই প্রয়োজন'—
কর্ণধার মুখে শুনি বাণী,
তবে, তুমি ললাটের স্বেদটি মুছিবে॥

ও সম্বন্ধে শ্লোক—

স্রোতোবেগং প্রখরমধুনা বাহুবক্ষোবলেন
জিত্বা নীতা যদি তব তরী কূলসামীপ্যমেব।
মত্বা দূরং ত্বদভিলষিতং মৌনিভূমেঘমগ্নং
ভগ্নাশো মা ভব করগতাং ক্ষেপণীং মা জহাহি॥ ১২৬
(কর্ণধারঃ) নাবিকঃ পুরতঃ পশ্যেৎ ক্ষেপকঃ কিমু পৃষ্ঠতঃ।
প্রয়াসেনালমিত্যুক্তো ভবাস্বিন্নললাটকঃ॥ ১২৭

বাধা চতুষ্টয় পরিহারের "আন্তর" উপায় ঃ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ইত্যাদি স্মরণ জপকীর্তন এবং অনুধ্যান দ্বারাও বিশেষভাবে বাধা চতুষ্টয় পরিহার করিবে। যথা—

ভূভারং যঃ প্রলয়-সলিলে লীলয়াদ্রিঞ্চ ধত্তে
কালীয়ং যো বিততফণকং লাস্যমঞ্চং করোতি।
পাদাম্ভোজক্ষররসকণৈঃ স্বর্ধুনী স্যন্দমানা
শ্রীরঙ্কাঙ্ঘ্রিঃ করমুরলিকং তং স্মরন্ কেন বাধ্যঃ॥ ১২৮

প্রলয়-সলিলে মগ্না উর্বীভার, আর, গোকুলে গিরিগোবর্দ্ধনভার যিনি লীলায় ধারণ করেন, তাঁর নাম, লীলাগুণাদি স্মরণকারীকে দেশনিমিত্ত বাধা (অবরোধ) কিরূপে বাধ্য করিবে বল! যিনি আবার কালের অন্তকরূপ যে ফণী, সেই ফণীন্দ্র কালীয়ের বিতত শতফণাকে আপন মৃতসঞ্জীবন বিমোহন লাস্যের মঞ্চ করিলেন, তাঁর সে অপরূপ লাস্য-রসিককে কাল কি করিবে বল! স্বয়ং অন্তকেরও চরণ কিশলয়তলে যেখানে সম্মোহন, সেখানে কালের কোন ভ্রূকুটি-কুটিল শর আসিয়া আমার স্বচ্ছন্দা মধুমৃগবধূকে বিদ্ধ করিবে বল? তারপর আবার, যাঁর পাদাম্ভোজক্ষরিত অমৃতরসকণা সুরধুনীরূপে বিশ্বভুবনে স্যন্দমানা হইল, তাঁর পদোদ্ভবা সে বিমলধারায় নিষ্ণাতকে কোন মলিনবাসনা, কোন ক্রূর পাপ্মা বিদ্ধ করিবে বল? বস্তু বা সত্তায় আর বাধার বাসা বাঁধিবার ঠাঁই কোথায়? শেষকালে আবার, স্বয়ং শ্রী যাঁর অঙ্ঘ্রিযুগল অঙ্কে ধরিয়া আছেন, আর যিনি নিজে

হয় না। 'ভূঃ' এর 'র' নিজেকে 'রোধিকা' করে এই নিমিত্ত। ফলে, বাধার নিগূঢ় নিগড়রূপে জন্ম।

রোধিকা সাধনমিত্রা

রোধিকা বাধিকা আকার হইলেও, তাকে সুষম সৃষ্টি উদ্দেশ্যে মুখ্যতঃ 'সাধিকা' থাকিতে হয়। কোনও কিছু ভাল করিয়া সাধিবে বলিয়াই সে 'বাহ্য' সকলকে বাধা দেয়। সৃষ্টির সর্বত্র ইহা দেখ। পৃথিবী (ভূ) 'ভূঃ'তে যে রোধিকা, তার এবম্প্রকার সাধিকামিত্রা বাধিকারূপ। 'সোমমিত্র' শব্দটিও এই একইভাবে বুঝিয়া লইও। কিন্তু, বাধা যদি সাধনমিত্রা না হইয়া সাধনবৈরিণী হয়, তবে কি করিবে? তবে, দেশাদিজন্য ঐ বাধাচতুষ্টয় পরিহারের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় সমাশ্রয় করিবে। বাধা অপনয়নের প্রয়াস কতদূর অবধি, তা এইভাবে ভাবনা করিবেঃ—

বাহু আর হৃদয়ের বলে, খর স্রোতো-বাধা করি জয়,
তরণী তোমার যবে তট-সন্নিকট।
মৌন ঘন কোয়াসায় ঘেরা, কাম্যতটে ভাবি বহু দূর,
নিরুৎসাহ, তুলি দাঁড়, হারাইবে তট!
বার বার কেন চাও পৃষ্ঠপানে,
কিছু নাহি দেখ সাড়া নাহি পাও,
নীরব কুহেলি মাঝে
কেহ তো বলে না, "এই আমি"।
কেন ভুলে যাও মিছে অভরসায়,
অসহায়ের মত, হে তরীবাহক!
তব বক্ষ মুখ পানে চেয়ে বসে তরণীর স্বামী॥
যেবা তোমা তরী কর্ণধার, সেই তট দেখে পুরোভাগে,
গতিমুখে পৃষ্ঠ তব, তুমি কি দেখিবে?
'আর প্রয়াসেতে নাই প্রয়োজন'—
কর্ণধার মুখে শুনি বাণী,
তবে, তুমি ললাটের স্বেদটি মুছিবে॥

ও সম্বন্ধে শ্লোক—

স্রোতোবেগং প্রখরমধুনা বাহুবক্ষোবলেন
জিত্বা নীতা যদি তব তরী কূলসামীপ্যমেব।
মত্বা দূরং ত্বদভিলষিতং মৌনিভূমেঘমগ্নং
ভগ্নাশো মা ভব করগতাং ক্ষেপণীং মা জহাহি॥ ১২৬
(কর্ণধারঃ) নাবিকঃ পুরতঃ পশ্যেৎ ক্ষেপকঃ কিমু পৃষ্ঠতঃ।
প্রয়াসেনালমিত্যুক্তো ভবাম্বিন্নললাটকঃ॥ ১২৭

বাধা চতুষ্টয় পরিহারের "আন্তর" উপায় ঃ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ইত্যাদি স্মরণ জপকীর্তন এবং অনুধ্যান দ্বারাও বিশেষভাবে বাধা চতুষ্টয় পরিহার করিবে। যথা—

ভূভারং যঃ প্রলয়-সলিলে লীলয়াদ্রিঞ্চ ধত্তে
কালীয়ং যো বিততফণকং লাস্যমঞ্চং করোতি।
পাদাম্ভোজক্ষররসকণৈঃ স্বর্ধুনী স্যন্দমানা
শ্রীরঙ্কাঙ্ঘ্রিঃ করমুরলিকং তং স্বরন্ কেন বাধ্যঃ॥ ১২৮

প্রলয়-সলিলে মগ্না উর্বীভার, আর, গোকুলে গিরিগোবর্দ্ধনভার যিনি লীলায় ধারণ করেন, তাঁর নাম, লীলাগুণাদি স্মরণকারীকে দেশনিমিত্ত বাধা (অবরোধ) কিরূপে বাধ্য করিবে বল! যিনি আবার কালের অন্তকরূপ যে ফণী, সেই ফণীন্দ্র কালীয়ের বিতত শতফণাকে আপন মৃতসঞ্জীবন বিমোহন লাস্যের মঞ্চ করিলেন, তাঁর সে অপরূপ লাস্য-রসিককে কাল কি করিবে বল! স্বয়ং অন্তকেরও চরণ কিশলয়তলে যেখানে সম্মোহন, সেখানে কালের কোন ভ্রূকুটি-কুটিল শর আসিয়া আমার স্বচ্ছন্দা মধুমৃগবধূকে বিদ্ধ করিবে বল? তারপর আবার, যাঁর পাদাম্ভোজক্ষরিত অমৃতরসকণা সুরধুনীরূপে বিশ্বভুবনে স্যন্দমানা হইল, তাঁর পদোদ্ভবা সে বিমলধারায় নিষ্ণাতকে কোন মলিনবাসনা, কোন ক্রূর পাপ্মা বিদ্ধ করিবে বল? বস্তু বা সত্তায় আর বাধার বাসা বাঁধিবার ঠাঁই কোথায়? শেষকালে আবার, স্বয়ং শ্রী যাঁর অঙ্ঘ্রিযুগল অঙ্কে ধরিয়া আছেন, আর যিনি নিজে

বিশ্ববিমোহনী, সকল ছন্দঃপরিসীমা মুরলীকে করে ধরিয়াছেন, তাঁর স্মরণকারীকে কোন ছান্দস বাধা-বিরোধ-ব্যাকুল করিবে বল?

আবার দেখ—

উত্তালোর্ম্মির্বিপুলজলধিঃ সেতুবন্ধেন বদ্ধো
মৃত্যুশ্চাজ্ঞাবহশমনকো যেন নীতো দশাস্যঃ।
স্বর্ণং দারূপলতনুরহো যৎস্পৃশাভূদহল্যা
শ্রীরার্য্যাণামশিবশমনং জানকীনাথদাস্যম্॥ ১২৯

পুনশ্চ—

লিঙ্গাং যস্য ত্রিভুবনমতিক্রাম্যতি স্বেন ধাম্না
মৃত্যোর্ম্মুক্ত্যৈ মথিতগরলং কণ্ঠভূষাপি যস্য।
শূলং যস্য ত্রিপুরমরণং সাহিসোমার্দ্ধমৌলেঃ
কৈলাসেশস্মরণমশিবোন্মূলনং নট্টরাজঃ॥ ১৩০

শ্রীরাম এবং শ্রীশঙ্কর স্মরণজপেও অবরোধাদি বাধাচতুষ্টয় যে কিভাবে দূর করিবে, তা ঐ শ্লোক দুটিতে বলা হইল।

দেশবাধা তোমায় অবরোধ করিবে? কিন্তু উত্তাল তরঙ্গোদ্বেল বিপুল জলনিধিকেও সেতুবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন যিনি, সেই রাম নাম স্মরণ ও কীর্তন তবে রহিয়াছে কিসের জন্য? মনে রাখিও যে রামনামৈকনিষ্ঠ শ্রীমদ্ হনুমান্‌কে সমুদ্রতরণের নিমিত্ত সেতুও বাঁধিতে হয় নাই! তারপর কাল তোমার সংহারে উদ্যত? কিন্তু শমনকেও যে জন আপন আজ্ঞাবহ করিয়াছিল, সেই শমনদমন রাবণরাজাকেও শ্রীরাম পাঠাইলেন শমনালয়! তুমি আবার আপন সত্তাটিকে দীন কৃপণ-দৃষ্টিতে দেখিতেছ যেন 'কাঠ' বা 'পাথর'! কিন্তু যাঁর চরণস্পর্শমাত্রে, জীর্ণকাষ্ঠের তরী হইল কাঞ্চন; আর, মুনিশাপে উপলতনু অহল্যা হইলেন 'আর্য্যা', কিনা, পূজিতাদের মাঝে সাক্ষাৎ শ্রীরূপা—অনবদ্যা শুচিসুষমাপরিসীমা; সেই 'আপদামপহন্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং লোকাভিরামং শ্রীরামং' স্মরণ করিলে, তোমার সত্তায় দৈন্য, আর সম্বন্ধে ও ছন্দে কুণ্ঠাকার্পণ্য কেমন করিয়া রহে বল? সুতরাং, জানকীবল্লভে যে দাস্য, তাই সকল

অশিবশমন জানিও। আবার, উর্দ্ধজ্যোতির্লিঙ্গারূপী শিবশম্ভুকে ভাবনা কর। জান না কি যে, তাঁর সেই একলিঙ্গা মহোত্তর মহিমা এই গোচরভুবনত্রয় অতিক্রম করতঃ আপন শাশ্বতশুভ্র জ্যোতিতে বিরাজমান! কাজেই, কোন দেশবন্ধ তোমায় অবরোধ করিবে বল? আবার সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত যে হলাহল, তাকে তিনি আপন কণ্ঠভূষা করিলেন; কেন?

মৃত্যু থেকে বিমুক্তি দিবার নিমিত্ত—'মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাহমৃতাৎ'। কাজেই, কালের ভয় কর কেন? যাঁর ত্রিশূল হইল ত্রিপুরমরণ, সেই মহাহিফণালাঞ্ছিত সোমার্দ্ধমৌলির অনুস্মরণ কোন্ 'বাস্তব' বাধাকে রহিতে দিবে? (মহাহিফণা=নাদ; সোমার্দ্ধ=অর্দ্ধমাত্রা, নাদবিন্দু-সেতুরূপা।) শেষে, ছান্দস যে বাধা (বিরোধ), তাহা নটরাজ, বৃষভবাহন, কৈলাসপতিস্মরণমাত্রে সমূলে উন্মূলিত হয়, ইহা স্থির জানিও।

আবার সর্ববাধাপ্রশমনকল্পে মহামায়াকে এই ভাবে ভাবনা কর:—

অস্তাবীত্তাং যদি কমলজো যোগনিদ্রাং ভবায়
চানর্হুশ্চেন্ মহিষমথনীং দেবতাঃ স্বাত্মসারাম্।
অদ্রাক্ষীচ্চেদ্ যুধি চ ললিতাং শুম্ভ একান্ততত্ত্বাং
স্মারং স্মারং প্রশমনমিয়ুশ্চণ্ডিকাং বাধিতা যে॥ ১৩১ (সর্ব্ববাধাঃ)

পুনশ্চ শ্রীগণেশের উদ্দেশে—

উচ্চৈঃশুণ্ডঃ প্রভবতি পুরঃ সর্ব্বসম্ভাব্যসৃষ্ট্যৈ
শুণ্ডশ্চাধঃ প্রকৃতিবিলয়দ্যোতকাশ্চর্যলিঙ্গাম্।
ব্যাবৃত্তৌ দ্বাবধ উত ন বা সেতুসন্ধী চ শুণ্ডৌ
শ্বাসাবাখূ কুশলশরণস্তারমূর্ত্তির্গণেশঃ॥ ১৩২

সৃষ্টিযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া কমল-যোনি প্রজাপতি মধুকৈটভভয়ভীত, যোগনিদ্রারূপিণী অর্দ্ধমাত্রাকে স্তুতিতে যদ্যপি জাগরিতা করিয়াছিলেন, তবে, তুমিই বা কেন তোমার জপাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, দেশ-কালাদি বাধা নিরসনের নিমিত্ত সেটি করিবে না? 'মধু' বিশেষতঃ দেশ, আর, 'কৈটভ' কালজন্য, কারণে ও সূক্ষ্মে যে

বাধা, তার প্রতীক বুঝিও। মধ্যম মাহাত্ম্যে, দেবতারা নিজ নিজ আকৃতি, শক্তি, গুণের 'সমূহমূর্ত্তি' (স্বাত্মসারাং) মহিষমর্দিনী দুর্গাকে যদ্যপি স্তুতি করেন, তবে, 'মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ' সন্ত্রস্ত, নিরালম্ব তুমিই বা না কেন লম্বোদর জননীর করুণাশরণ মাগিবে না বল? এখানে বিশেষ করিয়া কালভয়। তারপর, অন্তিম-মাহাত্ম্যে, শুম্ভাসুর ললিতাদেবীকে তাঁর সর্ববিভূতি আত্মলীন করতঃ 'একান্তপরমতত্ত্বা' রূপে দেখিয়া যদি 'স্থির' হইতে পারিয়াছিল, তবে তুমিই বা কেন তোমার সত্তা সম্বন্ধের সকল বিভেদ-বিরোধ বিভ্রম কাটাইয়া, তোমার সাধন সমরের চরম 'ঘাঁটিতে' শান্ত হইয়া তদেকপ্রপন্ন তদেকলীন হইবে না? সুতরাং চণ্ডিকা মাকে বারবার স্মরণ কর; এবং তাঁতেই তোমার সর্ববাধাপ্রশমন হউক!

তারপর লম্বোদরের এই রহস্য ধ্যান—পুরতঃ সর্বসম্ভাবনাকে সৃষ্টিরূপে উদয়নের নিমিত্ত যাঁর শুণ্ড উর্দ্ধগ; আবার, নিখিল সর্গের বিসর্গ, কিনা, প্রকৃতি বিলয়ের দ্যোতক এক অত্যাশ্চর্য লিঙ্গারূপ যাঁর শুণ্ড হইল অধোগ; আর সর্গবিসর্গ উভয়স্থলেই অনির্বাচ্য যে সেতুসন্ধিদ্বয়, তাদের সূচনার নিমিত্ত যাঁর শুণ্ড 'দ্বিধা ব্যাবৃত্ত'; এবং নিখিল ভূতের অন্তর্বহিশ্চারী যে কালরূপী শ্বাসবায়ু, সে বায়ু হইবে (উপযুক্ত শিক্ষায়, দীক্ষায়) যাঁর বাহন 'আখু' (মূষিক), সেই নিত্য-ওঙ্কারমূর্তি শ্রীগণেশ ধ্যান এবং প্রণব জপ সর্ববাধাবিঘ্নবিনাশন-কল্পে অতীব কুশল জানিবে। চতুর্বিধ বাধাকে এই ধ্যানেও যথাযোগ্য মিলাইয়া লইও।

পুনশ্চ বাধা নিরসনে এইভাবে সূর্য ধ্যানঃ—

রুন্ধীরন্ কেঽনলবরুণয়োর্যোঽপি মিত্রস্য চক্ষুঃ
হিংসীরন্ যো নিখিলজগতস্তস্থূষঃ শ্রৌত আত্মা।
যদ্গায়ত্রী হ্যদুহদমৃতং ছন্দসামেকমাতা
ভূরাদীনাং ত্রয়মপি পরং বিদ্মহে বাধবাধম্॥ ১৩৩

শ্রীগুরু নাম ও ধ্যান

আর, মন্ত্র এবং মন্ত্রী, এতদুভয়ই যে পরম করুণাঘন শ্রীগুরুতত্ত্বে সম্মিলিত, সেই 'শ্রীগুরু' নাম স্মরণ ও ধ্যান যে সর্ববাধা প্রশমন, ইহা কখনও ভুলিতে নাই।

পাদস্পর্শোঽর্গলবিরহিতং কংসকারাকপাটং
বাহুস্পর্শঃ সুতরযমুনা-তুল্যকাং কালধারাম্।
বক্ষো বৃন্দাবিপিনমধুনশ্চাকরং হৃদ্ দধাতি
ভালো রোচিঃ শ্রবণমমৃতং শ্রীগুরুঃ কৃষ্ণসূনুঃ॥ ১৩৪

বেদমন্ত্র যে সূর্যনারায়ণকে বলিয়াছেন—মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির চক্ষুঃ, সুতরাং, কোনও স্থলেই 'দিবীব চক্ষুরাততং' তাঁর পরমপশ্যন্তী দৃষ্টির বাধা নাই, তাঁর সেই পশ্যন্তী দৃষ্টির ধ্যানকারীকে কারা অবরোধ করিবে বল? আবার, যিনি নিখিল চরাচরের 'আত্মা' রূপে শ্রুত এবং বিজ্ঞাত আছেন, তাঁর প্রপন্নজনকে কালাদি কারা হিংসা করিবে? কেননা, অখিলাত্মারূপে তিনিই সম্বৎসর আদি কালকে বিধারণ করেন। যাঁর গায়ত্রী মৃত্যুভয়ভীত অমরদিগের জন্যও অমৃত দোহন করেন, এবং যে গায়ত্রী সকল ছন্দের একমাতা, তাঁর সেই গায়ত্রী সমাশ্রয়ীর পক্ষে কোন্ বাস্তবী অথবা ছান্দসী বাধা বলবতী হইবে, বল? 'সেই 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই পরম রাহস্যিক ব্যাহৃতিত্রয় মূর্তি, অথচ, তদতীত, তুরীয় যে 'সবিতা', তাঁকে আমরা যে জানি, এবং এও জানি যে, তিনি বাধের বাধ স্বরূপ!

আর, শ্রীগুরু? তাঁকে—তাঁর পরম করুণাঘন রূপটি সেই জন্মাষ্টমীর তমসাঘোর নিশীথে হৃদিশায়িত-ব্রহ্ম-গোপাল শ্রীবসুদেবের মতই ভাবনা কর। গোপালকে তিনি বুকে ধরিয়া আছেন, তাই, তাঁর পাদস্পর্শেও এক অদ্ভুত যাদু দেখায় যে! কংসকারারই মত এই যে আমার সংসার কারা, তার সকল দুয়ারে আগল খুলিয়া দিল যে! আর তারে কে করিবে অবরোধ? আর, শ্রীগুরুরূপী বসুদেবের বাহুস্পর্শ কি যাদু দেখাইল বলত? উতল-অতল যে যমুনা, সে যমুনাও যে সুসুখতরণা করিল! যমুনাকে প্রথমে দেখি যেন দুস্তর, দুর্বার কালধারা, যাতে আমি ডুবিয়া ভাসিয়া যাই! পরে যখন বুকে শ্রীগুরুর নিবিড় পরশটি মিলে, তখন যমুনা হয় আর এক যমুনা। তাই বলা হইতেছে—বক্ষে যাঁর স্পর্শ পাইলে—যে বক্ষে তিনি নীলরতনকে ধরিয়া আছেন—এই অশ্মসার তুল্য হৃদয়ও হয় বৃন্দা বিপিনের যত না মধুমাধবীয় মাধুরী, তার 'আকর', তার যত না পরম মধুরস, তাতে ভরপূর! আর কেবলি কি মধু? সবই হয় মধুচ্ছন্দাঃ। শ্রীগুরুরূপী বসুদেব যদি ভালে স্পর্শটি দেন, তবে চিদ্‌গগন তাঁর পরম রোচিষে 'উজল' হইয়া ওঠে; শ্রবণে যদি

তাঁর বাণীপরশটি দেন, তবে অন্তরে ওর হীন অমিয়া উথলে যে! অতএব, গোপালকৃষ্ণ যাঁর বুকে-ধরা ঘুমন্ত শিশু, সেই 'কৃষ্ণসূনু' শ্রীগুরুকে সর্ববাধাবিমুক্ত পরমধন্য হবার নিমিত্ত ধ্যান ও কীর্তন করি।

দ্যৌঃ—মূলতঃ কি বস্তু?

২৪॥ বরুণাগ্নিসঙ্ঘাতাদ্ দ্যৌঃ॥

দ্যৌরিতি বেবিষাণস্য যাহঙ্কমানেন সংহতিঃ।
ব্রহ্মসুবরিতি জ্ঞেয়ং ব্রহ্মণি সূয়তে সনা॥ ১৩৫
অমৃতং দিবি সূক্তেন ত্রেধা নিদধ ইত্যতঃ।
অদিতির্দ্যৌরিতি শ্রুত্যা নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ॥ ১৩৬

বরুণ এবং অগ্নি—এতদুভয়ের সংহতিতে দ্যৌঃ॥

দ্যৌস্তত্ত্ব পূর্বে আলোচিত। সেখানে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টি সমস্ত কিছুকে মুক্ত, উদার, স্বচ্ছন্দ ঋচ্ছতিরূপটি দেওয়ার 'প্রতিশ্রুতি' এবং 'প্রতিজ্ঞা' দেয় যে তত্ত্ব, সেটি দ্যৌঃ। 'বেবিষাণ' বা বাধরহিত, নিরঙ্কুশ এক আধারপট অসীমবিতানে খুলিয়া মেলিয়া দেওয়া হইল। এই আধারপটেই সমস্ত কিছুই আপন স্থিতি-গতি-পরিণতির চিত্রলেখা 'অঙ্কন' করিয়া চলিয়াছে। সৃষ্ট কোন কিছুই অবশ্য ঐ বেবিষাণ আধারপটকে তদ্রূপে দেখে না; এবং তার অঙ্কনটাও খণ্ডশঃ ছাড়া পূর্ণ, সমগ্রভাবে পায় না। কিন্তু দেখে না বলিয়া, আধারপটটা সঙ্কুচিত হইয়া 'এতটুকু' (এতাবৎ) হয় না; অঙ্কনটাও সত্য সত্য 'এই রকমই, এতটাই' হয় না। অবচ্ছেদ, ব্যবচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ আদি, যাহা যথার্থ তাতে, অধ্যস্ত—তার অধিকারে রহিয়াও তাকেই যেন অধিকৃত করতঃ আক্ষিপ্ত; তাকে যেন বলে—'তোমাতেই আছি বটে, তবু তোমাকে আমোলে আনিব না!'

'তোমাতেই আছি'—এই যে তদধিকরণতা, এটা কুত্রাপি নাকচ হবার নয়। একটা এটম্, ধূলিরেণু, বীজকণা, একটা 'আমি বা তুমি বা সে'—কোথাও সত্য সত্য কোন কিছুই সমগ্র সত্তা-শক্তি-ছন্দকে ছেড়ে 'এতটুকু' হইয়া নেই; তার গতি-

পরিণতির নক্সাটাও মাত্র ‘এইটুকখানি বা এই অবধিই’ নয়। ধূলি, তারকা, বীজ, বনস্পতি—এসব স্থলে তাদের ‘নিজস্ব’ হিসাবের খবর আমরা পাইনি; তাদের হিসাব আমরা যতদূর লইতে পারিয়াছি (বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে), তাতে তাদের কেহই ‘এতটুকু’ বা ‘এই অবধিই’ হইয়া নেই, সত্তায়, শক্তিতে, সম্বন্ধে, ছন্দে। তোমাতে বা আমাতে—যেখানে ‘আধার’ এবং ‘লেখ’ দুয়েরি ছবিটা নিজস্ব চেতনায় বা বোধে কতক ফুটিয়াছে—‘ভান’ সমগ্রকে ছাড়িয়া হয় না দেখিয়াছি, যদিও ‘ভাসপঞ্চকে’ কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিতাদি হইয়া সে ভান হয় দেশ-কাল-সম্বন্ধে, সত্তায়-শক্তিতে ‘এই এতটুকু মাত্র’!

পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠার, এবং বিন্দু-নাদ-কলার সমগ্রতা আর সঙ্কোচের কথাগুলো আবারও ভাবিয়া লও। প্রণবাদি বীজমন্ত্রে এবং ত্রিকোণবৃত্তাদি যন্ত্রে এই সমগ্র ও সঙ্কোচ যুগলরূপকে পুনশ্চ ধ্যান করিয়া লও।

দ্যৌস্তত্ত্বে বরুণ-অগ্নি

এখন, দ্যৌস্তত্ত্বে বেবিষাণ রূপে বরুণ সব কিছুর উদার, অবাধ, সমগ্রতাকে কেবল যে আধারভাবে খুলিয়া মেলিয়া রাখেন, এমন নয়; ‘আপঃ’ রূপে সমস্ত কিছুর সাবলীল আপ্যায়নের ‘সামান্য’ উৎসটিও মুক্ত রাখেন। এর প্রসাদে একটা ধুলিরও নাভি বা মর্মকেন্দ্রে তার ‘অস্তিতা’ একান্ত ব্যূঢ় ও মূঢ় (in a stupor of smothered inertness) রহিতে নারাজ; সে কেন্দ্র তার ‘নির্দ্দিষ্ট’ অর-নেমি কেবলি প্রসারিত করিতে চায়—যার ফলে, অস্তিতা হইতে চায় ভাতিতা, ভাতিতা অস্মিতা। সে প্রতীক্ষা করে—যে কবে তোমার আমার মতোই বলিবে— ‘এই তো আমিও আছি; সমগ্র পরিপূর্ণের মাঝে এই ‘আপন’ সত্তায়, শক্তিতে, ছন্দে ও সম্বন্ধে আছি।’ একটা পুষ্পের বীজকণা অথবা একটা জীবের—এতে বরুণের এই বেবিষাণ-আপ্যায়ন যুগ্মরূপটি আরও ফুটিয়া আছে। মনের কোন সিসৃক্ষু ভাব বা পরিকল্পনায় এটি ততোধিক বিস্পষ্ট। এক কথায়, সত্তা-শক্তি-ছন্দঃ-সম্বন্ধ—সব কিছুরই এই চারিটি কলার সমগ্রতা ও সরসতার (Root Interest or Zest of Being and Becoming- এর) অবাধ ‘যোগান’টি দিয়া থাকেন বরুণ—দ্যৌস্তত্ত্বে সংহত ও অনুস্যূত রহিয়া।

‘প্রতিশ্রুতি’ সর্বসমক্ষে

আর, ‘অঙ্কমান’ যে অগ্নি, তিনি কি দেন? প্রতিটি পদার্থ মুক্ত সমগ্রের আধারে যে আপন ‘লেখ’টি অঙ্কন করিবে, সে অঙ্কনের নিমিত্ত শক্তি এবং ছন্দের এক ‘সামান্য’ পরিপূর্ণ ভাণ্ডার অবারিত রাখেন। বেবিষাণ-আপ্যায়ন বরুণের যেমনধারা সকলের পক্ষেই তাদের বর্তমানতা এবং বৃত্তিমত্তার আধার এবং ‘আলয়’টি পাতিয়া দিতে কার্পণ্যও নেই, পক্ষপাতও নেই, অগ্নিরও তেমনিধারা তাদের জন্য শক্তি এবং ছন্দের পরিপূর্ণ উৎসটি খুলিয়া রাখিতে কুণ্ঠা-পক্ষপাত নেই। বস্তুতঃ, একান্ত open, free field; unfettered zest of being and becoming; unlimited reserve of power to function in ‘harmony relations’ : এ ত্রিতয়ের promise and guarantee বরুণাগ্নি দুয়ে মিলিয়া সৃষ্টির একটা ‘নগণ্য’ ধূলিকেও দিতেছেন। কার্যতঃ, অর্থাৎ আভাসাদি প্রমাতৃ ব্যবহারে, তার নিজের পক্ষে, অথবা, তার হিসাব লইতে যাইয়া তোমার আমার পক্ষে, এই একান্ত-প্রতিশ্রুতিত্রিতয়ীর যে কতটুকু ‘যাচাই’ বা ‘আদায়’ হইতেছে না হইতেছে, সেটা অবশ্য আমাদের এই কারবারি হিসাবের বই-এরই কথা। হিসারের খাতাটাও আবার সব্বাইকার একরূপ নয়। কিন্তু তত্ত্বতঃ, বরুণাগ্নিসংহতিরূপে দ্যৌঃ, সমস্ত কিছুর পক্ষেই, উক্ত ঐকান্তিক ত্রিবিধভাবেই (as field, flow, function-fount) কার্পণ্য-বাধা-পক্ষপাত, এই ত্রিগ্রন্থিরহিত ‘মাতা’ এবং ‘পিতা’ একসঙ্গে হইয়া বহিরন্তঃ, অণুবিরাট্ প্রতিটি প্রসূত সন্তানকে আপন অকৃপণ, অপক্ষপাত অঙ্কে ধারণ করিতেছেন। ‘মাতা’ হইয়া সকলকেই পাতিয়া দেন মুক্ত, অবারিত অঙ্ক-অঞ্চল, আর, সকলের মুখেই ঢালিয়া দেন অযাচিত, অকৃপণ স্তন্যসুধা। আর, ‘পিতা’ হইয়া সকলকেই দেন তার বীর্য এবং তার বৈভব (ছন্দঃ)। মাতায় বরুণ, পিতায় অগ্নি বিশেষভাবে বর্তিয়াছেন।

অগ্নি, বিশেষভাবে, জড়ে হন তেজঃ, প্রাণে ওজঃ, মনে বর্চ্চঃ, অহমে অর্চ্চিঃ, এবং ধীতে ভর্গঃ অথবা জ্যোতিঃ। প্রত্যেক স্থলেই, অগ্নির আধান ও দীপনের ‘প্রতিজ্ঞা’টি পরিপূর্ণভাবেই দেওয়া আছে। আর, পরিপূর্ণ এবং পক্ষপাতরহিত-ভাবে বরুণাগ্নি দুয়েরি প্রতিজ্ঞা যাতে, যে তত্ত্বে, চির-প্রতিপালিত, চির-রক্ষিত, সেই তত্ত্বই দ্যৌঃ।

অতএব, দ্যৌঃকে কেবল আকাশ (পূর্ব লক্ষণ মত), অথবা কারণ-সলিল,

অথবা বৈশ্বানরাদি অগ্নি ভাবিলে হইবে না। বর্তমান প্রসঙ্গে পরিচিন্তিত বরুণাগ্নিসংহতিরূপটি (একাধারে মাতৃত্ব-পিতৃত্ব) ধ্যানে পাইতে হইবে।

দ্যৌঃ ও দেব

দ্যৌঃ হন দেব, দেবতা, দৈবত। দ্যৌঃ ব্যতীত দেবতার আধানও হয় না, দীপনও হয় না। দ্যৌঃ সেই মৌলিক সর্বসংশ্রয় তত্ত্ব, যাতে দেবতা পান তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং তাঁর অশেষ শক্তি-ছন্দোবৈভবময়ী অভিব্যক্তি। এইজন্য, দ্যৌঃকে 'তেত্রিশকোটি দেবতার' Matrix মনে ভাবিতে হইবে। Matrix এবং Radix দুই-ই। মন্ত্রের বা যন্ত্রের দেবতাস্থলেও তাই। যথা, এক ষট্‌কোণ যন্ত্র। এতে দ্যৌঃ, বরুণাগ্নিসংহতিরূপে কিভাবে বর্তমান, তা ভাবিয়া দেখ। অখণ্ড, 'অমাত্র' সমগ্র আধার (পরম নাদ) নিজেকে প্রথমে বিন্দুরূপে 'একমাত্র' ও 'ঘন' করিতেছেন; বিন্দু হইতেছেন রেখা, ত্রিকোণ ইত্যাদি। এ সবে বরুণ ও অগ্নিকে চিনিয়া লও।

দ্যৌঃ—যুগ্ম মাতা-পিতা

যে মন্ত্র 'লইতেছ', এবং তৎসহকারে যে ভাব-ভক্তি, যে ধ্যান-ধারণাদি 'চালাইতেছ' সে তো বাহ্যতঃ দেশে, কালে, শক্তিতে, সম্বন্ধে 'এই এতটুকু'—স্বল্প, খণ্ডিত, ব্যভিচারী। কিন্তু তার মহান্, অখণ্ড, ধ্রুব হবার শাশ্বত আশ্বাস, পরম ভরসাটি দেন কে?—ঐ যুগ্ম মাতা-পিতা দ্যৌঃ। সৃষ্টির সকল এতাবৎ, এতাবান্, এতাবতীকেই তিনিই ঐরূপ আশ্বাস ও ভরসাটি দিতে পারেন, যাঁকে এতাবত্তা, সত্তায় অথবা শক্তিতে অথবা ছন্দে, স্পর্শ করে না, সীমিত, অবচ্ছিন্ন করে না। তাই—'নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ'। জলে বা বায়ুতে বীচিবিতান কিরূপে হয়, ভাবিয়া দেখ। 'ততোভূয়ঃ' রূপে আগাইতে আগাইতে শেষ পর্যন্ত এমন এক 'ভূমি' পাওয়া চাই, যেখানে পূর্বোক্ত আপূরণী ত্রিতয়ী একান্ত মিলিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে, পূর্বোক্ত পক্ষপাতাদি বাধকগ্রন্থিত্রয়ও একান্ত অপগত হইয়াছে। আর, সেটি কেবল মুক্ত নিরপেক্ষ আধারপটই নয়, পরন্তু সেটি বিশ্বভুবনের অনাবিল, স্বচ্ছন্দ প্রাণরস এবং অকুণ্ঠ শক্তিসামগ্রীরও আলয় ও আধান।

এইজন্য, কারিকায় বলা হইল—'ব্রহ্মসুবঃ'। ব্রহ্মের শাশ্বতী 'প্রসূতি' রূপা এই

দ্যৌঃ। 'ব্রহ্মণি সূয়তে সনা'। ব্রহ্ম স্রষ্টুকাম হইয়া নিখিলের শাশ্বত মাতৃত্ব এবং পিতৃত্ব একসঙ্গেই বরণ করিতেছেন। নিখিলের ক্ষুদ্র এতাবত্তাটিকে আপন শাশ্বত নৈতাবত্তার অঙ্কেই ধারণ করিয়া আছেন, এবং তার সকল কারবারী কুণ্ঠা-কার্পণ্য ভাঙ্গিয়া তাকে সেই অঙ্কেই আবার টানিয়া লইতেছেন! স্বয়ং ব্রহ্মেরি আদিমা প্রতিজ্ঞারূপিণী এই মহাদেবতা দ্যৌঃ।

কারিকায় পরের শ্লোকে তিনটি শ্রুতিমন্ত্র উদ্দেশ করা হইয়াছে— 'অমৃতং' বা শাশ্বত জীবনরস; 'ত্রেধা নিদধে পদং'—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণে শক্তিসম্পাতের অব্যয় উৎস বা ভাণ্ডার; আর, 'অদিতি' স্বয়ং—অখণ্ড, পরিপূর্ণ, পক্ষপাতরহিত যে তত্ত্ব।

আশীর্বাদ—মূল উৎস

আশীঃ বা আশীর্বাদেরও মূল উৎস, প্রচোদয়িতা দ্যৌঃ। ঐ এক বিশ্বভুবন-কল্যাণদুঘা মহামহীয়সী আশিষের 'ব্যাঙ্কে' 'চেক্' কাটিয়া সকল দেব-দেবী, আর সন্তমহাজনদের সার্থক আশীর্বচনটি প্রয়োগ করিতেই হয়। দ্যৌঃ ঊর্দ্ধ অধঃ, পৃষ্ঠতঃ পুরস্তাৎ—সর্বব্যাপী। তথাপি নিত্য যুক্ত ঊর্দ্ধকরে তাঁর ব্যাপনী, পাবনী, আপ্যায়নী, দীপনী আশীর্ধারা যেন বরণ করি!

প্রণবাদি সকল বীজমন্ত্রের শীর্ষভাগে ইনি, নাদবিন্দুকলার সমগ্র ঋধ্যমানতা এবং অন্তে পরাপারীণতার আধান যে অর্দ্ধমাত্রা, তদ্রূপে রহিয়াছেন। ইহার ছন্দঃ প্রশাসনে, পীঠ এবং অধিরোহণী এতদুভয়রূপে, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষও রহেন।

লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় 'স্ত্রীলিঙ্গা' হইয়া ইনি লোকবিশ্রুতা 'মাতা'; আবার "মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগে ইহার পিতৃত্বও বহুধা শ্রুত। আর্যের অন্য অন্য শাখায় (যথা, গ্রীক ও রোমক এ) দ্যৌঃ Zeus and Jupiter ইত্যাদি হইয়া "দেবানাং দেবঃ" হইয়াছেন, দেখি।

দেবতার আবাহনাদি

দ্যৌঃ ব্যতীত দেবতার আবাহন ও বিসর্জন বা নিরঞ্জন নেই; মন্ত্রের উদ্ধার ও চৈতন্য নেই; যন্ত্রের সঙ্কলন বা নিষ্কলন নেই; তন্ত্রেরও তায়ন, আপূরণ-সম্পূরণ নেই। কথাগুলো পূর্ব পূর্ব আলোচনার দীপকে দেখিয়া লইতে হইবে। নচেৎ, শুধুই 'অন্ধেন

তমসা'। দ্যৌঃ একাধারে 'পিতরৌ'—মাতা চ পিতা চ। নিম্নের শ্লোকটি ভাবনা করঃ—

দ্যৌর্মাতাঽমৃতবর্ষিণী পরিহিতজ্যোতির্বিশালাম্বরা
মর্ত্ত্যার্ত্তাঃ সমুদারমুজ্জ্বলরসং স্তন্যং পিবামো বয়ম্।
আশীর্ষা পরমাঽপ্যমূর্ত্তমহসা দ্যৌরেব সা নঃ পিতা
ধাম্না ব্রহ্মণি স স্থিতিং প্রথয়তু স্বানন্দদীপোজ্জ্বলাম্॥ ১৩৭

বেদে শ্রুতা দ্যৌ অমৃতরূপিণী অমৃতবর্ষিণী,
আদিমা জননী পরিধান জ্যোতিবিশাল অম্বর।
মর্ত্য আর আর্ত যত বিশ্বপ্রাণী, করি যেন পান
শাশ্বত-ক্ষরিত উদার উজ্জ্বল স্তন্যসুধাধার॥
অমূর্ত, তবুও মহীয়সী যাঁর আশিষ পরমা,
আশিষস্বরূপা সেই মাতা, একাধারে পিতা।
সেই পিতঃ! স্বরূপের আনন্দ-দীপ-সমুজ্জ্বলা।
ব্রাহ্মী যে স্থিতি তায়, নিজ বীর্যে, কর পারমিতা॥

পৃথিবী—মূলতঃ কি বস্তু?

২৫॥ সোমমিত্রসঙ্ঘাতাৎ পৃথিবী॥

সোম এবং মিত্র—এতদুভয় সংহতিতে পৃথিবী॥

সোমকে বিন্দুরূপে (ইন্দুবিন্দবঃ) ভাবনা কর—যেরূপ বেদের রহস্যবারিধি-নিষ্ণাত ঋষিকুল করিয়াছেন। জপে নাদ অর্দ্ধমাত্রাসেতুসহকারে বিন্দু থেকে সমুদিত হন, এবং বিন্দুতেই পুনশ্চ বিলীন হন। এই উদয়-বিলয়ের স্থল 'সোম' বিন্দু। এখন, বিন্দু থেকে (কেবল জপে নয়, সমস্ত কিছুতেই) উদয়, উন্মেষ, বিতানের দিক্‌টাকে যদি বল 'ধন' তবে, নিখিল ভূতজাত যা থেকে এই 'ধনমুখী' স্থিতি ও বৃত্তিটি পায়, তাকে বল 'ধনী' বা 'উত্তমর্ণ', আর সেটি 'মিত্র'। বিলোমে—বিলয়ের অভিমুখে যে বৃত্তি, সেটিকে যদি 'ঋণ' এবং 'অবম' পর্যায়ে লও, তবে, বিপরীত অপর একটা 'কোটি' মিলিল—'ঋণী' বা 'অবমর্ণ'='অর্য্যমা'। 'উত্তম' এবং 'অবম' গণিতের

পরিভাষা মত দোষলেশরহিত ভাবিও। যেমন, বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে আবার বীজ। নাভির অরবিস্তারে চক্রনেমি; চক্রনেমির অরসঙ্কোচে নাভি। 'অধমর্ণ' না বলিয়া অর্য্যমাকে 'অবমর্ণ' বলা হইল। 'অবম' আর 'অউম' ভুল না করিও। সংখ্যাবিজ্ঞানে কোন সংখ্যাকে তার বর্গ, ঘন ইত্যাদি ক্রমে যেমন 'প্রসার' করা যায়, বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি ক্রমে তাকে 'সঙ্কোচে' ও আনা যায়। একটা 'মূল' বা বিন্দুর দিকে গতি-বৃত্তি; অপরটি, বিন্দু হইতে নাদের দিকে। ঋ=গতি হইলে, ঋ-এর মূল বা Root সূচক লিঙ্গ হইল অবমর্ণ। 'ব'-এর প্রসারণে 'উ'; 'উ' এর সঙ্কোচনে 'ব'। 'ঋ+ণ'—এই আকৃতিটিও পরীক্ষা করিও। 'ঋ' বলিতে মূর্দ্ধন্যধামাভিমুখী গতি; 'ণ' সেটিকে মূর্দ্ধন্যধামে রাখিয়াই 'অনুনাসিক' স্পর্শটি দিতেছে। অনুনাসিক=বিন্দুগোত্রীয়। কিন্তু সচরাচর, কোন মহাপ্রাণের 'মাধ্যম'টি মিলাইতে পারে না বলিয়া, সে স্পর্শ স্পর্শমাত্র রহিয়াই, হয় স্তব্ধ, নয়তো চ্যুত হয়। ধর, মহাপ্রাণ 'ষ' মাঝে আসিল—যেমন, "কৃষ্ণ" নামে। আর, অচ্যুতধাম থেকে চ্যুতির ভয় নেই।

ধন ও ঋণ—দৃষ্টান্ত

কোন ঠাঁই থেকে কিঞ্চিৎ লইতেছি, ফিরাইয়া দিব, এই অঙ্গীকারে। সাধারণ কথায়, এটি ঋণ। কিন্তু ফিরাইয়া দিতে গেলে নিজের আবার পুঁজিটি তো হওয়া চাই! নতুবা তো শুধুই ঋণ আর তস্য সুদের চক্রবৃদ্ধিতে দেউলিয়া! এখন, মূলধনী মহাজন 'মিত্র' বিশ্বের গণ্য নগণ্য সকল কারবারীকে আশ্বাস দিতেছেন— 'মূলের সঙ্গে বা মালিকের সঙ্গে 'যোগ' রাখিয়া কারবার চালাও, ধনের ভাবনা নেই, যত চাও পাবে।' আর মূল-ঋণী অর্য্যমা ভরসা দিয়া বলেন—'মূলের সাথে যোগে আছ তো, বিয়োগে যাওনি তো! তা হইলে ভাবনা কেন? ঋণের ভাবনা আমিই ভাবিব; যেখানকার বস্তু সেখানেই ঠিক কড়ারমত ফিরাইয়া দিব।'

যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে মূলটি হইল বিন্দু। মিত্র কি করিতেছেন? 'বরেণ্যম্' এর চূড়া অবধি তোমায় লইতেছেন, তোমার ভাব, তোমার ছন্দের যা কিছু আবশ্যক সম্বল, সেটি অকুণ্ঠায় যোগাইয়া। যোগাইতেছেন বিন্দুবাসিনী মায়ের আমার আপন-ভাণ্ডার থেকেই। তোমার এই 'বরেণ্যমে' যে 'মাতৃ-ঋণ', তার গরিমার, মহিমার অন্ত নেই! তবু এ ঋণ পূর্ণ পরিশোধই করিতে হইবে। 'ধীমহি'তে তার খতে স্বাক্ষরটি

করিলে, আর, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'-এ সেই স্বাক্ষরিত খৎ তাঁর চরণেই সঁপিয়া দিলে! আমার যেটি 'বরেণ্য', সে তো তোমারি 'বর' মাগো! এই শেষের কাজটি সমাধা যিনি করেন, তিনি মিত্রের 'প্রতিযোগী' অর্য্যমা। 'প্রতিযোগী' শব্দটাকে লড়াই-এর মোহরায় নামাইও না যেন। এ প্রতিযোগিতা সঙ্গাতিতে, সংবাদে—সঙ্গচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্। মিত্র-অর্য্যমায় বিবাদ নেই—দুয়ে মিলিয়াই 'শম্', যথা শান্তিমন্ত্রে। বিশ্বে যত না বৃত্ত, আবৃত্ত, সমাবৃত্ত গতি, সব তাতেই, ঐ মূল ধনী-ঋণী যুগল 'সংবাদে' রহিলেই সর্বসুসংবাদ! মিত্র 'ধনের' মর্যাদা যোগ বা দান করেন; অর্য্যমা সে মর্যাদা ক্ষেম বা রক্ষা করেন।

ধন-ঋণ মুখ্যতঃ 'মূল' থেকে 'দিক্'কে হিসাবে লইয়া। মূল—Origin, Root—থেকে 'বাহির' করিয়া নেবার দিক্ একটা; আর, তাতেই, মূলেই, 'ফিরাইয়া' দেবার দিক্ অপরটা। Out-going and in-going functions, 'জগদ্বীজাঙ্কুরাকৃতি' মূলটি এইভাবে প্রসরৎ-সঙ্কুচৎ হইতেছে। কিন্তু, ওর সাথে—ঐ বাহির হইয়া আসা, আবার তাতে ফিরিয়া যাওয়ার সাথে—অপর দুটি প্রশ্নও থাকে—কি এবং কতটা? যেমন, প্রণবে মূল=বিন্দু; তা থেকে প্রসৃত হইল নাদ; এবং, অ, উ, ম—এই তিনটি কলায় ও মাত্রায়। নাদ জ্ঞেয় ও ব্যক্ত; কলায় সে জ্ঞেয়-ব্যক্ত অভিব্যক্তমেয়ও হইতেছে। অন্তে, বিন্দুশায়নে পুনশ্চ অব্যক্ত-অমেয়তায় ফিরিতেছে।

মান কয় প্রকারে?

এইবার, মেয়তা বা মানকে পঞ্চবিধায় বলা হইল কারিকায়। শত্রু (শক্ধাতু)=সমর্থমান। এর 'অধীনে' বা তন্ত্রে উরু, পৃথু, গুরু, তনু, অণু—এই পাঁচটি মান। মান=Measure, ইন্দ্র দেবরাজ বল অথবা সহসের যেটি কাষ্ঠা (Critical Efficiency), তার প্রতিভূ। সহসের মান উরু করিয়া রাখেন বরুণ; গুরু করেন (দুইভাবে) বৃহস্পতি এবং শুক্র; পৃথু করেন পূষা। মিত্র এবং অর্য্যমার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছি। তন্ধাতুকে ধনমুখী বিততির দিকে লইলে মিত্র; গত্যর্থ অথবা প্রাণনার্থ অণ্ধাতুকে ঋণমুখী সূক্ষ্মতার দিকে লইলে অর্য্যমা। একটি নাদগোত্র, অন্যটি বিন্দুগোত্র। গানে যেমন তান ও লয়। 'তনু' এবং 'অণু' দুয়েতেই বেধমুখ্য 'উ' বর্ণ রহিয়া নাভি বা কেন্দ্র সম্বন্ধটি বিশেষতঃ সূচনা করিতেছে।

পৃথু করেন পূষা—'প' এ দীর্ঘ উকার। অন্‌ভাগান্তও বটে। পৃথু দুই রকমের অথবা পর্যায়ের—উরুগোত্র বা গুরুগোত্র। প্রথমটিকে বরুণ, দ্বিতীয়টিকে হয় বৃহস্পতি, নয়তো শুক্র অনুগ্রহ ও অঙ্গীকার করেন। একটি Energy as Radiation; অন্যটি Energy as Mass. একটিতে ব্যাপনী অপরটিতে ঘননী; একটিতে নাদ বা সূর্য, অন্যটিতে বিন্দু বা সোম মুখ্য। 'পূষন্' তাঁর দীর্ঘ স্বরটি সঙ্কুচিত, হ্রস্ব করিলেন; শেষের অন্ ভাগটিও ত্যাগ করিলেন। হইল 'পুষ্'। পোষণার্থ—'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।' সুতরাং, পৃথুর সোমমুখ্যা অভিব্যক্তিতে হইল পৃথিবী।

'তনু' ও 'তন্'

'তন্' ধাতুকে মিত্র ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি গো! আমার সঙ্গে বিতান-প্রসারের দিকে চলিবে তো? চলিবে? আচ্ছা, তাহা হইলে, তুমি হও 'পৃথু'। হইয়াছ? বেশ; এইবার বল, উরু হইতে চাও, না গুরু? ব্যাপনীতে সাধ, না ঘননীতে? নাদে বহমানা, না বিন্দুতে শয়ানা হওয়ায়? সবিতার সমন্তাৎ বিচ্ছুরিত 'ভর্গসে' লোভ, না সোমের স্নিগ্ধ ঘনায়মান্ 'রোচিষে'? যদি মুগ্ধা স্থিরা হইয়া সোমের সেই নিবিড় ঘনায়মানতায় বিভোর হইয়া থাকিতে চাও তো হও 'পৃথিবী'। আর, পৃথিবী হইয়া তুমি নাম ধর, 'ক্ষ্মা' এবং 'ওষধিজননী'।"

'এতাবৎ' আকৃতি

অতএব, পৃথিবীতে (১) সোম বিন্দুরূপে নাভি বা কেন্দ্রে রহিবেন; (২) মিত্র পূর্বব্যাখ্যাত 'উত্তমর্ণ' রূপে তনুতা এবং পৃথুতা বিধান করিবেন; (৩) এবং সেই পৃথুতা উরুগোত্রে না যাইয়া বিশেষতঃ গুরুগোত্রে যাইবে। আর, এই তিনটির ফলে (৪) পৃথিবী দ্যৌস্তত্ত্বের যে 'নৈতাবত্তা', সেটিকে 'এতাবতী' রূপে নিরূপিত করিবেন। অর্থাৎ, unmeasured হইবে measured. বিশ্বব্যাপী যে তেজঃ, ওজঃ, বর্চ্চঃ সেটি এইভাবে নাভিনিষ্ঠ, কেন্দ্রাশ্রয়ী হইয়া পৃথুতা-গুরুতা অঙ্গীকার পূর্বক 'এতাবৎ' আকৃতিতে না আসিলে তো জড়ের ক্ষেত্রে এটমাদি, প্রাণের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্ল্যাজম্ সেল্ ইত্যাদি, এবং মানসক্ষেত্রে 'অহম্' ইত্যাদি—এ-সবের 'এতাবৎ' আকৃতিতে

উদ্ভবই হয় না। কোন কিছুই 'জমাট' হয় না, 'স্থির' হয় না, 'প্রতিষ্ঠা' রূপটি পায় না। এই নিমিত্ত 'ব্রহ্মভূঃ'। দ্যৌঃ স্বয়ংও ইহা ব্যতীত দেব বা দেবতারূপে মূর্তবিগ্রহবতী হন না।

পূর্বে ব্যাখ্যাত কারিকা কয়টি এই:—

উরুঃ স্যাদ্‌বরুণো বিষ্ণুস্তনব ইন্দুবিন্দবঃ।
ইন্দ্রঃ শুক্রঃ পৃথুঃ পূষা গুরূ শুক্রবৃহস্পতী॥ ১৩৮
উত্তমর্ণো ভবেন্মিত্রশ্চাবমর্ণস্তু যোহর্য্যমা।
তনুর্ধনেন পৃথ্বী স্যাদৃণেন চাণুতা মতা।
এতাবতীতি বাচ্যা যা ব্রহ্মভূঃ ক্ষ্মৌষধীজনী॥ ১৩৯

মুখ্যের ব্যপদেশ

২৬। মুখ্যত্বেন ব্যপদেশঃ সর্ব্বত্র॥

(এই সঙ্ঘাতসূত্রগুলিতে) সর্বত্র (তত্ত্বসমূহের) মুখ্যত্ব বিচারেই ব্যপদেশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বতঃ সর্ব্বতত্ত্বানাং সন্নিবেশেঽপি মুখ্যতঃ।
প্রসজ্যতানুরোধেন প্রত্যেকং প্রতিযুজ্যতে॥ ১৪০

সর্বস্থলেই সর্বতত্ত্বেরই সন্নিবেশ থাকা সত্ত্বেও, মুখ্যভাবে কোন্‌টি অথবা কোন্ কোন্‌টি কোথায় বৃত্তিমৎ রহিয়াছে, সুতরাং, ইতর, অন্য সকল, তত্ত্বের অপেক্ষায়, প্রাসঙ্গিক হইয়াছে—এই প্রকার প্রসজ্যমানতা (relevancy in respect of the given context) অনুরোধেই দ্যৌঃ, পৃথিবী ইত্যাদি প্রত্যেক তত্ত্বের প্রতিযোজনা করা হইল, ইহা মনে রাখিতে হইবে। যেমন, পৃথিবীতত্ত্বের নিরূপণে বিশেষতঃ সোম এবং মিত্র সংহতিতে আসিয়াছেন বলিয়া, বরুণ অথবা অগ্নি তত্র অবকাশ পান নাই, এরূপ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি অসমগ্র এবং অযথার্থ দৃষ্টি। ব্যবহারানুরোধে তত্ত্ব বহুধা শ্রুত, কথিত, বিবেচিত হইলেও, তাহা কোন স্থলেই বস্তুতঃ অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদাদিতে খণ্ডিতাদি হয় না। তাই না বেদমন্ত্রে—'অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষম্' ইত্যাদি শ্রুত হইয়াছে! পৃথিবীও অদিতি, দ্যৌঃ অন্তরীক্ষও অদিতি। সুতরাং, দ্যৌস্তত্ত্বে যাহা আছে, পৃথিবীতত্ত্বে তাহা

পুরা নাই; দুয়ের সঙ্ঘাত একান্ত স্বতন্ত্র—এরূপ দর্শন দৈবদর্শন নয়, দৈত্যদর্শন। পৃথিবী কেনই বা দ্যৌঃ-এর ‘দুহিতা’, এবং তাঁর সঙ্গে গ্রথিতা, সমন্বিতা, তাও চিন্তা কর।

অন্তরীক্ষ মূলতঃ কি বস্তু ?

২৭। যতঃ সঙ্ঘাতেন স্থিতিস্তদন্তরীক্ষম্॥

যাহাতে, যেটি আশ্রয়করতঃ, সমস্ত কিছুরই ‘সঙ্ঘাতে’, সংহতভাবে, স্থিতি ঘটে, সেটি অন্তরীক্ষ॥

তনূরুপৃথুভাবেষু সর্ব্বেষু সংহতাকৃতিম্।
বুভূর্ষত্যন্তরীক্ষং যদ্ ব্রহ্মভুবর্হি নিষ্ঠিতম্॥ ১৪১
উকারঃ প্রণবস্যেদং বিশ্ববিষ্টপবিষ্টরঃ।
পর্য্যবস্থিতিমাধত্তে দেশে কালে চ বস্তুনি॥ ১৪২

তনু, উরু পৃথু প্রভৃতি সর্বভাবেই পদার্থনিচয়ের যে সংহতাকৃতি (congruent configuration; organism), সেটিকে ‘ভরণ’ করিতে ইচ্ছা করেন ‘অন্তরীক্ষ’ তত্ত্ব। ইনি ‘ব্রহ্মভুবঃ’। সব পদার্থের কেবল মাত্র ‘বাহ্য’ (extrinsic) সম্পর্কসমূহ (relations) আধান করিতেছেন, এমন নয়; ‘আন্তর’ (intrinsic) সম্পর্কগুলিও বটে; যথা—‘the intrinsic geometry of space’. এটম্, প্রাণিকোষ, অন্তঃকরণ, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, ইত্যাদি অণুবিরাট্, অন্তর্বহিঃ সকল সংস্থাতেই, অন্তরীক্ষকে ‘নিষ্ঠিত’ বুঝিতে হইবে। ধর, জপাদি কোন কর্ম। ফল প্রসব করিবে যে ‘অপূর্ব্ব’ দ্বারা, সেটিকে তিনভাগে বিশ্লেষণ করতঃ দেখিতে ও বুঝিতে হইবে। পূর্বকথিত দ্যৌঃ (ব্রহ্মসুবঃ), পৃথিবী (ব্রহ্মভূঃ), এবং এই অন্তরীক্ষ (ব্রহ্মভুবঃ)। মাঝেরটি “এই” রূপে কর্মকারিকা শক্তিসামগ্রীর (‘অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথক্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টাঃ) অবস্থানটি নিরূপণ করে। এটাকে বল—kinetic total. প্রথমটি (‘দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্’) “সেই” রূপে সত্তাশক্তির অব্যয় ভাণ্ডারটি তৎসম্পর্কে খুলিয়া দেয় (opens the Reservoir of Potential Energy)। দেয় বটে, কিন্তু শেষেরটিকে ‘মাধ্যমে’ রাখিয়াই। অর্থাৎ, অন্তরীক্ষই নিরূপিত করে

কতটা, কিভাবে "এই" আর "সেই" এর কার্যতঃ ব্যাপারবত্তা (interaction in effect) ঘটিবে।

এই নিমিত্ত অন্তরীক্ষকে পদার্থ মাত্রেরি দেশ, কাল এবং বস্তু—এ তিনের সম্পর্কেই, পরিস্থিতি এবং অবস্থিতি—এ দুই ভাবেই, সম্বন্ধ-সংস্থা-সংঘটক তত্ত্বরূপে দেখিবে। 'পরিস্থিতি' বলিতে, বিশেষভাবে, পরিবেশ বা পরিতঃ সংস্থান, আর, 'অবস্থিতি' বলিতে সন্নিবেশ বা আভ্যন্তরীণ সংস্থান সূচিত হইল। যথা, জড়ের ক্ষেত্রে Nuclear Physics বিশেষভাবে এটমের অবস্থিতির নিরূপণে নিযুক্ত; আর, সাধারণতঃ, Chemistry, Physics ইত্যাদি তার পরিস্থিতির, পরিবেশের হিসাব লইতে ব্যাপৃত। সাধারণ Psychology এবং, ব্যাপক অর্থে, Parapsychology র বস্তুভেদটিও ভাবনা কর।

শাক্তীতনু ও শক্তিলেখার আধান

সমস্ত কিছুর শাক্তী তনু (Dynamic Diagram) এবং শক্তিলেখা (Power Picture as Curve etc.) —স্থিতি এবং গতি উভয় স্থলেই (both at rest and in movement) আধান করেন অন্তরীক্ষ। বহিরন্তঃ—উভয়ত্র। সুতরাং, সব কিছুর 'মন্ত্র' যদি আধান করেন দ্যৌঃ, তা হইলে সব কিছুর 'যন্ত্র' আধান করেন অন্তরীক্ষ; আর, 'তন্ত্র' পৃথিবী (পৃথিবীর লক্ষণে তন্ ধাতুকে আবারও ধ্যান কর)। মন্ত্রেরও দেবতা এবং ঋষি দ্যৌঃ; অন্তরীক্ষ ছন্দঃ; বিনিয়োগ পৃথিবী। এইরূপে বহুধা ভাবনা করিবে।

প্রণবে ইনি 'উ' কার। এই বিশ্বরূপ পাদপের বিস্তার এবং অঙ্গসংস্থান বিধান প্রণবের এই বর্ণ দ্বারা।

দীর্ঘ-হ্রস্ব

২৮। তস্য স্থৌল্য-সৌক্ষ্ম্য-ব্যপদেশাদ্ দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বে॥

অন্তরীক্ষ কোন স্থলে দীর্ঘ ঈকার, কোন স্থলে বা হ্রস্ব ইকার হয় যথাক্রমে স্থৌল্য (patency) এবং সৌক্ষ্ম্য (latency) এর ব্যপদেশে॥ (স্থৌল্য = বৈরাজ = macrocosmic; সৌক্ষ্ম্য = আণব = microcosmic—এবম্প্রকার ব্যপদেশও হইয়া থাকে।)

তারাব্যূহেষু যৎ স্থৌল্যং সৌক্ষ্ম্যং তনুষু যদ্রহঃ।
বাহ্যং বান্তরমেবেতো দীর্ঘত্বেনান্যথা স্ফুটম্॥ ইতঃ=ইবর্ণস্য ১৪৩

তারাব্যূহ, নীহারিকা ইত্যাদি দৃষ্টান্তে স্থূলতা বৈরাজ, বিরাট্‌কে বিষয় করিয়া। এসব ক্ষেত্রে বস্তু (mass) বিরাট, তার গতিবেগাদি তদনুরূপ; এবং যে অন্তরীক্ষ তার স্বগত আধান এবং পরিবেশ, সে অন্তরীক্ষ ও বিরাট্। আলোকের গতিমানকে জড়ের ক্ষেত্রে চরমমান ধরিয়া, বিরাট অন্তরীক্ষের অবকাশবিশালতা ঐ চরমমান বর্ষ ('light year') দ্বারা পরিমেয় করিতে হয়। Astral Physics এই বিরাট্ অন্তরীক্ষকে এক মহাবিপুল বিস্ময়ের বস্তুরূপে আমাদের দেখাইতেছে। আমাদের ঐ ছায়াপথের অন্তর্বর্তী যে ব্রহ্মাণ্ড (Galactical System), সেটি তো অগণিত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জের একটিমাত্র। আর, এই সবগুলিকে জড়ো করিয়া যে মহাবিরাটকে পাই, তার নাম যদি দাও Physical Universe (স্থূল বিশ্ব), তবে সে বিশ্বও 'প্রসরৎ' (Expanding) , এবং সম্ভবতঃ, অন্যদিকে 'সঙ্কুচৎ' (Contracting) ও বটে। অর্থাৎ, আমাদের পূর্ব পরিচিত 'উত্তমর্ণ' (মিত্র) আর 'অববর্ণ' (অর্য্যমা) এই বিরাটের ক্ষেত্রেও স্বাধিকারে রহিয়াছেন।

নানাক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত

রাইম্যান জিওমেট্রির সিদ্ধান্তপ্রদীপে Space 'সান্ত' (limited) হইয়া নিজেকে এক বিপুল, অথচ পরিমেয় পরিমণ্ডল ('ব্রহ্মাণ্ড') রূপে দেখাইতেছে। এবং সে Space ও Time কে দোসর করিয়া, আপন স্বগত (intrinsic) শক্তিলেখটি বক্ষে অঙ্কিত করিয়া বিদ্যমান। একদম ফাঁকা—pure vacuum-এর অস্তিত্ব কই? প্রকৃতি নাকি ফাঁকায় থাকিতে বেজায় নারাজ; আর, ফাঁকার মাধ্যমে বস্তুসমূহের শক্তির কারবারই বা চলে কি প্রকারে? তাই ইথার আসিল। কিন্তু বর্তমানে Time-সহকৃত Space তার স্বগত জিওমেট্রি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবার অঙ্গীকার দিয়া কল্পনাগৌরবের কিছুটা লাঘব করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

সূক্ষ্মে—'তনুষু যদ্রহঃ'—নিগূঢ় যে Space, আর তাতে ক্রিয়মাণ যে শক্তি, তাও, বিশেষ করিয়া বর্তমান শতকের জড়বিদ্যায়, সূক্ষ্ম পরিমাণের হিসাবে আসিয়াছে।

Quantum এর দেশে যে মৌলিকমান (unit measure) সেই প্ল্যাঙ্কের সময় থেকে বিজ্ঞানবাজারে চলতি, সে মান (*h*) তো বড়ই 'অণোরণীয়ান্' মান! কিন্তু তাই বলিয়া আণবীশক্তি ভাণ্ডারটি পিপীলিকাভাণ্ডার নয়, আর, ঐ দেশে বামন বালখিল্যদের নটন গতিটিও শম্বুকগতি নয়!

মিত্র—অর্য্যমা বিনিয়োগ

মিত্র-অর্য্যমা তো আসলে আলাদা তত্ত্ব নন! একজন না হয় উত্তমর্ণের পার্টে নামিয়া 'তন'কে ধরিয়া পৃথ, গুরু, উরু ক্রমে 'মহতো মহীয়ানের' খোঁজে চলিলেন; অপর জন ঐ 'তন্' থেকেই সুরু করিয়া অবমর্ণের ভূমিকায় চলিলেন 'অণোরণীয়ানের' খোঁজে। কিন্তু খোঁজার বস্তুটি যখন এক (ব্রহ্ম), তখন এ যাত্রা, তো কোন বৃত্তের পরিধিতে কোন এক বিন্দু থেকে দুই দিকে যাত্রার মত। ব্যবধানটা গোড়ায় বাড়িয়া চলে, কিন্তু পরে? মিত্র (উত্তমর্ণরূপে) একই ব্রহ্মের (অথবা নাদবিন্দু) দেখাইলেন 'তনুষু যন মহঃ' রূপটি; আর, অর্য্যমা (অবমর্ণরূপে) দেখাইলেন 'তনুষু যদরহঃ' রূপ। যে তন বা তনুকে আদৌ ভূমি বা প্রতিষ্ঠা করিয়া (as 'Frame' or 'System of co-ordinates') দুই দিকে এইপ্রকার দ্বিবিধ মেয়তা-জ্ঞেয়তার অভিযানটি সুরু হয় অন্তে আবার মিলিবার জন্যই—সেটিকে অপর দুটি বিশেষণে বিশেষিত করিলে (পৃথু, গুরু) হয় পৃথিবী।

ধর, ত=যে কোন তল। ন=হসন্ত 'ন' বলিল—তোমাকে পূর্ণগ্রামে বা বর্গে আবৃত্তিমান করি। 'থ' 'দ' 'ধ' তে থামিয়া শেষ হইতে দিব না। 'ন'তেও থামিব না। অর্থাৎ, আবৃত্তিচক্র চলিবে। মিলিল—circular measure, সেই 'পাই'-গোত্র। তন এ 'উ' বর্ণ যুক্ত হইয়া বেধবৃত্তি (third, fourth ইত্যাদি dimensions) আনিল; ফলে, circle হইল, sphere, spiral ইত্যাদি। ব্যাপারটি আবৃত্ত (circular) ইত্যাদি আকৃতি না হইয়া ঋজুরৈখিক (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষটকোণ ইত্যাদি) আকৃতিতেও হইতে পারে। এই শেষের আকৃতিসমূহে "পাই"-গোত্র নয়, পরন্তু "সমকৌণিক" গোত্রের সবিশেষ সাবকাশতা। কিন্তু সকলগোত্রের মূল গোত্রটি হইল ব্রহ্মগোত্র। —বিন্দু-নাদ-কলা— এই ত্রয়ীরূপে যে গোত্রটি সৃষ্টির নিখিল মন্ত্রে যন্ত্রে এবং তন্ত্রে তার প্রবর পরিচয়টি দিতেছে। এই ত্রিতয়ের সম্পর্কে আবার দ্যৌঃকে বিশেষ করিয়া নিখিল

বস্তুজাতের 'মন্ত্রে', পৃথিবীকে 'তন্ত্রে', আর, অন্তরীক্ষকে 'যন্ত্রে' অধিষ্ঠিত হইতে দেখি—একথা আগে বলা হইয়াছে। সর্ববিধ (আণব অথবা বৈরাজ) সজ্ঘ এবং সংহতিকে 'যমন' এবং 'ভরণ' করেন অন্তরীক্ষ।

বেদের অন্তরীক্ষ বা অন্তরিক্ষ

বেদের বা আর্যপ্রজ্ঞানের যে অন্তরীক্ষ (অথবা অন্তরিক্ষ), সেটি বর্তমান বিজ্ঞানের স্বগত-সংস্থা-বিশেষিত Time-সহকৃত Space-এ উদাহৃত বটে, কিন্তু দুয়ের সরাসরি সমীকরণ করিলে চলিবে না। কেবল 'জড়ের' কেন, প্রাণ এবং মনেরও বরুণ-দৈবত বেবিষাণরূপটি (as continuum) স্মরণপথে রাখিতেই হইবে। নতুবা, 'মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতি।' বিজ্ঞানের জড়বস্তু এবং অন্তরীক্ষ, দুই-ই এক অখণ্ড সমগ্রের প্রত্যবচ্ছেদ (cross-sectioning)। প্রত্যবচ্ছেদের ফলে বস্তু এবং অন্তরীক্ষ তাদের প্রাণ এবং চেতনার আধার ও উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং 'মৃত' হইয়াছে। জপসূত্রমের আলোচনায় এ তথ্য সম্ভবতঃ কথঞ্চিৎ বিশদ হইয়া থাকিবে। 'অঙ্কক' অগ্নি অন্তর্বহিঃ বিশ্বে সব কিছুর স্থিতি-গতি লেখটি অঙ্কন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এবং সব কিছুকে অধ্বনীন (আপন অধ্বে ঠিক ঠিক বৃত্তিমান) হইতে দিতেছেন, এই অন্তরীক্ষ বা অন্তরিক্ষ রূপে। প্রাণস্পন্দ এবং চিত্তস্পন্দ অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে অবশ্যই অবান্তর নয়। স্বয়ং ব্রহ্মই 'ব্রহ্মভুবঃ' রূপে অন্তর্বহিঃ, অণুবিরাট্ সকল সংহতিরই সংস্থা-সংস্থাপক, শাক্তী তনু এবং শাক্তী লেখার বিধাতা, লেখক, অঙ্কক। প্রণবে 'উ'কার রূপে ইনি নিখিলকে নির্দেশ দেন— 'সঙ্গাচ্ছদ্ধম'। প্রণবের আদিম স্বরে (অকারে), তোমরা আর বিবাদে নেই, সংবাদে (সমস্বরে) আসিলে— 'সংবদধ্বম্'। এইবার সুসঙ্গাত, সুসংহত হও, পারম্যের অভিমুখে যাত্রার নিমিত্ত। এবং তার প্রসাদে— 'সমানা ব আকূতয়ঃ'। তোমাদের আকূতিসমূহও ('core aspirations') সমান হউক। এটি প্রণবের অন্তিম বর্ণ— 'ম' কার। সৃষ্টির অভিব্যক্তি-ধারাগুলি পরস্পর অসঙ্গাতি-বিবাদে না গিয়া পরমের পূর্ণতার অভিমুখেই হৌক্।

বৈরাজ ও আণব দৃষ্টি

অন্তরীক্ষের দীর্ঘত্ব বা হ্রস্বত্ব কেবলমাত্র পূর্বোক্ত বৈরাজ (macrocosmic) এবং 'আণব' (microcosmic) দৃষ্টিতে করিলেই হইবে না। 'স্ফোট' (patent) এবং

'অস্ফোট' (latent) দৃষ্টিতে প্রসঙ্গাতঃ করিতে হইবে। 'স্ফোট' এস্থলে পারিভাষিকভাবে লওয়া হইল না। এ ছাড়া, ক্রিয়মাণা শক্তি ব্যবধান (medium) -এর মাধ্যমে কিরূপ সম্বেগে (momentum-এ) আসিতেছে, এটাও বিবেচ্য হইতে পারে। এতদ্‌ব্যতীতও, ক আর খ এর মধ্যে শক্তি বিনিময় হইলে, যেটি মুখ্য (যথা, দীক্ষায় গুরু), তার অপেক্ষায় অন্তরীক্ষ একপ্রকার; যেটি গৌণ (যথা, শিষ্য), তার অপেক্ষায় অন্য প্রকার। কোন শক্তিভান্ডার হইতে শক্তি সংগ্রহ হইলেই, এই ভেদটি মনে রাখিতে হয়।

শক্তির স্বভাব-প্রবণতা

শক্তি যে কোন ভাণ্ডার থেকেই আসুক না কেন, সে স্বভাবতঃ খোঁজে সর্বাধিক ন্যূন অথবা ন্যূনতম বাধা সরাইতে হয় যে বর্ত্মে চলিলে, সেই বর্ত্মটি ('the line of least resistance', 'the shortest route')। অথবা, আরও গভীর, ব্যাপক করিয়া দেখিলে—সেই বর্ত্মরেখা, যেটিতে চলিলে তার কর্ম সব চাইতে ন্যূন এবং সহজ হয় ('Principle of Least Action')। এই দৃষ্টিতে দেখিলে সৃষ্টিতে শক্তিমাত্রেরি স্বভাবপ্রবণতা হইল 'অন্তরিক্ষ' (হ্রস্ব ইকার) সমাশ্রয়ে ক্রিয়া করায়। প্রকৃতি স্বভাবতই পরিমিতব্যয়িনী। জড়ের দেশে শক্তিকারবারের যে হিসাবটুকু আমরা লইতে পারিয়াছি, তাতে প্রকৃতিকে এবম্বিধ 'মাপাজোকা'র মধ্যেই তার আয়োজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে দেখি। প্রকৃতিতে এবম্বিধ কুণ্ঠা-কার্পণ্যই জড়তা। আমরাও যে পরিমাণে আমাদের 'অপরা'র পরাধীন, সে পরিমাণে 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব'।

প্রাণের ভূমি

জড়ের ক্ষেত্রে 'আণবনাভি' (Nucleas) কিন্তু সম্প্রতি (বর্তমান শতকে) চলতি মাপাজোকার হিসাবের বাইরে এক মহা বিপুল প্রাচুর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় তার পূর্বভাষটি যদিও ছিল। প্রাণের দেশ, বিশেষ করিয়া, প্রাচুর্যের দেশ। অণিষ্ঠ বীজকণিকাটিও অফুরন্ত ভাবে 'বহু' হইতে চায়, নিরবধি ভূয়সী, মহীয়সী হবার আকূতিটি পূরাইতে চায়। চেতনার দেশে মন তো এদৃষ্টিতে এক অভাবনীয় মহাশ্চর্য! প্রাণকে শাস্ত্র কোথাও 'অণু' বলিয়াছেন। কিন্তু এ অণু

ব্রহ্মাণু—ব্রহ্মে, ভূমায় অবসানটি না হওয়া পর্যন্ত এ অণুর আকৃতির অবধি, অন্ত নেই! মনকেও কেহ কেহ 'অণু' বলিয়াছেন। ঠিক তা যদিও বা না হয়, এ মন তো নিখিল সৃষ্টিটাকেই আপন অনুভবে, কল্পনায়, মননে, বিচারে, উপলব্ধিতে 'মনস্থ' করিবার প্রয়াসেই রহিয়াছে! সুতরাং, প্রাণ আর চেতনার রাজ্যে পূর্বোক্ত কার্পণ্যদোষ পরিহারের প্রয়াসটি স্বভাবতই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। অতএব, জড়ের দেশের তুলনায় এখানে 'অন্তরীক্ষ' দীর্ঘত্বই অঙ্গীকার করিতেছেন—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে। অর্থাৎ, প্রাণচেতনার ক্ষেত্রে অন্তরীক্ষ প্রতিটি কেন্দ্রকে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন—'তুমি প্রভূত সম্বেগসম্পন্ন হও, প্রচুর-প্রতুলকর্মা হও! তোমায় এতটুকু মাপাজোকায় পূরিয়া রাখিব না।'

ফলতঃ, অন্তরীক্ষের এই দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব বিচার কেবলমাত্র 'পারিভাষিক' ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলে হয় না। বিশ্বশক্তিমণ্ডলের যে কোনভাবে 'লেখ' ছকিতে গেলেই অন্তরীক্ষের এই দ্রাঘিমাদির প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া থাকে। জপেও অন্যথা নয়। যেমন, গায়ত্রীতে 'ধীমহি' তে 'ধী'র দীর্ঘত্ব কেন, পরে হ্রস্বত্বই বা কেন; আবার, 'ধিয়োয়োনঃ' তে 'ধি'র হ্রস্বত্ব কেন;—এ সব স্থলে অন্তরীক্ষতত্ত্ববিবেক একান্তই প্রাসঙ্গিক। যথা, 'ধীমহি' স্থলে 'ধী'র দীর্ঘত্ব বুদ্ধির ধ্যানপ্রয়াসভূয়িষ্ঠতা সূচনা করে; 'ধিয়ো...' স্থলে বুদ্ধির প্রপত্তিপ্রবণভাব, সুতরাং, স্বর দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক বিচারে মূল কাঠামো

এই সূত্রের আলোচনায় দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্ব বিচারের কতিপয় সঙ্কেত নির্দেশ করা হইল। সঙ্কেতগুলির ঠিক সন্ধান করিতে গেলে আদৌ প্রাসঙ্গিক বিচারের এক 'মূল কাঠামো' ঠিক করিয়া লইতে হয়। কোন এক প্রাসঙ্গিকতায় অথবা দৃষ্টিভঙ্গীতে যেটি 'দীর্ঘ', অন্যদিক্ থেকে সেটি 'হ্রস্ব'। যেমন ধর, বৈখরী থেকে পশ্যন্তীতে যাইতে মাঝে 'মধ্যমার সেতু' পার হইতে হয়। এটি 'অন্তরীক্ষ'। এখন, দুইদিকে দুই 'সন্ধি'। 'অবর' ও 'বর'। অবরের দিক থেকে অন্তরীক্ষকে কি ভাবিব? হ্রস্ব না দীর্ঘ? এর উত্তরের নিমিত্ত আদৌ নির্ণায়কসূত্রটি ঠিক করিয়া লইতে হয়। পশ্যন্তীকে যদি শক্তি-ভাণ্ডারের 'উত্তমর্ণ' মনে করি, আর বৈখরীকে 'অধমর্ণ', তা হইলে উত্তমর্ণস্থলে দীর্ঘ, আর অধমর্ণস্থলে হ্রস্ব মনে করা চলে; কিন্তু বৈখরী বিশেষভাবে

প্রয়াসবহুলতার ভূমি, পশ্যন্তী প্রপত্তিবিশালা—এরূপ দৃষ্টি করিলে, প্রথমস্থলে দীর্ঘ, দ্বিতীয়ে হ্রস্ব হইতে পারে। যেখানে শক্তি বাধানিমিত্ত রোধপরম্পরা চূর্ণ করিতে করিতে অগ্রসর, সেখানে 'দৈর্ঘ্য'ই সুসঙ্গত মনে হয়; যেমন, 'হ্রীঁ' আদি বীজে। আর, যেখানে সহজ, স্বচ্ছন্দ গতিবর্ত্মটি প্রপত্তি এবং কৃপার প্রসাদে খুলিয়া গেল, সেখানে 'হ্রস্বতা'। যথা, গতিবিজ্ঞানে 'ক' থেকে 'খ'এ গতি সরলরেখায় হইলে হয়। জড়ীয় সৃষ্টিপ্রপঞ্চে (এবং অপরার স্তরে) গতি সরলরেখাতেই হয় না।

উদাহরণ

পুনশ্চ, গায়ত্র্যাদি জপে স্পষ্টতঃ, এবং জপমাত্রেই নিগূঢ়তঃ, যে পাঁচটি 'অবান্তর' শূন্য এবং অন্তে এক 'অনুত্তর' মহাশূন্যের সন্ধান মিলাইতে হয় (যথা, গায়ত্রীতে পরাব্যক্ত বিন্দুলীনতা এবং পরাপারীণ ব্রহ্মসদ্‌ভাবে), তাদের মধ্যে অবান্তর স্থলগুলিতে 'স্পর্শ' (সুতরাং হ্রস্বত্ব) এবং শেষেরটিতে 'সংশ্রয়' (সুতরাং দীর্ঘত্ব) ব্যপদেশ অন্তরীক্ষের সম্বন্ধে করা চলিবে। ষষ্ঠ স্থলটি সাধ্যভূমিতে আদৌ সেতু বা দ্বার রূপে মিলাইতে হয়; তখন, গোড়ায় মহাশূন্যে 'সংস্পর্শ' ('ব্রহ্ম সংস্পর্শ'); ক্রমে কলা-নাদ উভয়েই অত্র (বিন্দুতে) 'নিষ্ঠিত' হইলে, পরাপারীণতার দ্বারটি 'খুলিয়া' যায়; তখন নাদবিন্দুকলাতীত পারম্যে 'পরিনিষ্ঠিত'। তখন আর সাধ্যসাধনা নেই। মহাসমন্বয়ের মহাসঙ্গীত পরমসমন্বয়ের পরমমৌনে আপন একান্ত লয়টিও মিলাইয়া লয়।

নাভি-অর-নেমিরূপে ব্যবস্থিতি

২৯। সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিতি নাভিনেম্যরত্বেন ব্যবস্থিতিঃ।।

(সৃষ্টিতে সর্বত্র) সূর্য এবং চন্দ্রমা—এইভাবে (দ্বিকোটিক) এবং নাভি-নেমি-অর—এভাবে (ত্রিকোটিক) 'ব্যবস্থিতি' (দেখিতে হইবে)॥

'সূতে ও দুগ্ধে'

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পূর্বে অতিবিস্তররূপেই আলোচনায় আসিয়াছেন। বর্তমান সূত্রে এই মূল আকৃতিটি লও—সূর্য=সূতে=যিনি সমস্ত কিছু প্রসব করেন; আর, চন্দ্রমা=যিনি সব

কিছু ‘রুচিপূর্বক’, সংস্কারানুরূপ (according to basic tendency and inclination) বাছিয়া লন। একটি Principle of production and supply; অপরটি Principle of selection and distribution. একের দ্বারা বিশ্বে সব কিছুর Output; অন্যের দ্বারা Intake. একটা জড়রেণু থেকে আরম্ভ করিয়া বিরাট মন পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে এই দ্বিকোটিক ব্যবস্থিতি (bi-polar constitution) পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কোনও কোনও সংস্থায় এবং বিধায় এতদুভয়ের মধ্যে একের মুখ্যতা দৃষ্ট হইলেও, উভয়ের অবিনাভাবে সহবর্তিতা এবং সহবৃত্ততা থাকেই।

‘কলা’ শব্দকে ‘কলিত’ বা ‘ফলিত’ (as evolved) অর্থে লইলে, নাদকে ‘সূর্য্য’ স্থানীয় এবং অ, উ, ম ইত্যাদি বর্ণকলাগুলিকে ‘চন্দ্রমাকলা’ মনে করা যায়। স্বয়ং চন্দ্রমাঃ নাদরূপ মহান উৎস হইতে উক্ত কলাগুলি ‘দোহন’ করিয়া লইতেছেন। চন্দ্রমা মন রূপে বিশ্বের মহাভাণ্ডার হইতে আপন সংস্কার রুচি সঙ্কল্প দ্বারা আপন ‘বিষয়’ বাছিয়া লইয়া আপন ‘সাঙ্কল্পিক’ বা মানস জগৎটি রচনা করিতেছেন। ব্যষ্টিমন থেকে সমষ্টি মন পর্যন্ত সর্বত্র এই দ্বিকোটিক ব্যবস্থাটি বাহাল রহিয়াছে। এই জন্য এটি চলিতেছেই (জগৎ)-এর আদিই বা কোথায় অন্তই বা কবে? অন্ত যদি একান্ত মিলাইতেই হয় তো সূর্য-চন্দ্রমা (নাদ-কলা)—দুটিকেই এমন এক ঠাঁই মিলাইতে হইবে, যত্র দুই-ই, এবং সমস্ত কিছুই, একসঙ্গে শূন্য এবং পূর্ণ। সেটি বিন্দু। এই নিমিত্ত সাধনমাত্রেই বিন্দুসাধন। এখানে উৎস বলিবে—‘আমি শূন্য’; দোগ্ধা বলিবে—‘আমি পূর্ণ’; উভয়ে বলিবে—‘আমরা দুয়ে মিলিয়াছি; আর দান-আদানের দ্বন্দ্ব নেই; দেনা-পাওনার হিসাব নেই।’ জপ করি তো এই নিমিত্তই। জ্যোতিঃ এবং রস দুই দিক্ থেকেই এই বিন্দুসংশ্রয়টিকে বুঝিয়া লইতে যত্ন হইয়াছে এই আলোচনায়। এখানে ‘চন্দ্রমাঃ’ সাধারণ আকৃতিতেই লওয়া হইল। চন্দ্রমাসূত্রে স্বগতভেদ দেখান হইয়াছে।

ব্যবস্থিতি ত্রিকোটিক আকৃতিতে নাভি-অর-নেমি রূপটি পরিগ্রহ করে সর্বত্র। এটিও বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়াছে পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে। দ্বিকোটিক আকৃতিদ্বয় পরস্পর ব্যাবর্তক ভাবিও না। দৃষ্টিভেদে, ব্যবহার প্রয়োজনে, একেরি আকৃতিভেদ। দ্বিকোটিক স্থলে অন্তরীক্ষ (মাধ্যমটি) রহিয়াও যেন অন্তরালে। যেমন, কোন ম্যাগনেটের দুটা পোল। মাঝের ব্যবধান বলিতেছে—‘আমি আছি, তবে, ধর, উদাসীন (neutral)।’

কিন্তু দুইটা ম্যাগ্‌নেট্, অথবা ম্যাগ্‌নেট্ আর লৌহে, যখন ব্যাপার, তখন মাঝের ব্যবধানটি আর উদাসীন নয়। প্রথম স্থলে 'অন্তরিক্ষ', দ্বিতীয় স্থলে 'অন্তরীক্ষ' বলিবে না কি?

অবস্থিতি ব্যবস্থিতি, পরিস্থিতি

'অবস্থিতি', 'ব্যবস্থিতি', 'পরিস্থিতি' শব্দগুলি বিবেচনপূর্বক বুঝিয়া লইবে। যে কোন পদার্থ তার মূল, নাভি, কেন্দ্র সম্পর্কে 'অবস্থান' করে। যেমন, কোন বৃত্ত তার কেন্দ্র, প্যারাবোলা তার ফোকাস এবং ডাইরেকট্রিকস; যে কোন জড় বস্তু তার ভারকেন্দ্র; জীব ও অন্তঃকরণ তার 'অহং'; ইত্যাদি। নাভি, অর নেমি—এ তিনই দেখাইয়া না দিলে তার 'ব্যবস্থান' ঠিক হয় না। আর পরিস্থিতিতে তার পরিমণ্ডল, পরিবেশটি মেলা চাই। গণিতের হিসাবে, নাভি=বেজিক ফরমূলা; অর=ইকোয়েশন; নেমি=এপ্লিকেশন। ব্যাপিকাদৃষ্টিতে, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনের কথা পুনশ্চ ভাবিয়া দেখ। বিন্দুতে 'অন্তরিক্ষ'কে 'শূন্য' ধরিলে, নাভিতে উহা সূক্ষ্মতাধর্মাবচ্ছিন্ন হইয়া ব্যাপ্রিয়মাণ; অরে উহা স্থূলভাবে 'বিবর্ত্তিষু' (বৃত্তিমান হইতে ইচ্ছুক) হইয়া ব্যাপ্রিয়মাণ; আর, নেমিতে স্থৌল্যধর্মাবচ্ছিন্ন হইয়া ব্যাপ্রিয়মাণ।

যথা, প্রণবাদি জপে উদয় বিন্দু অন্তরিক্ষের শূন্যস্থল; উদয়সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা 'নাভি'; এ স্থলে অন্তরিক্ষ আদৌ অতি সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্রিয়মাণ; উদিত নাদ অরমুখ্য বা 'অক্ষ'; অকার, উকারাদি 'কলা' 'গোচর অর'; নাদাক্ষ সমাশ্রয়ে কলাসমূহের পুনশ্চ বিলয়বিন্দুতে ছান্দস পরিক্রমা হইল 'নেমি'। এ পরিক্রমার অবসান বিন্দুলীনতায়, যথায় অন্তরিক্ষ 'শূন্য'। বিন্দুর উদয়-বিলয় উভয় দিকে, শূন্যস্থল থেকে এবং শূন্যাভিমুখে অন্তরিক্ষের ব্যাপ্রিয়মাণতা—'দীর্ঘ' এবং 'হ্রস্ব', এই দুইভাবে ভাবিত হইবে কিনা ভাবিয়া দেখ।

সংখ্যা

এ পর্যন্ত অন্তরিক্ষকে স্বগত (intrinsic) বলিতে পার। কিন্তু ধর, 'ওঁ ভূঃ' মন্ত্র। এখানে প্রণবের এক 'পরিমণ্ডল' বা 'পরিবেশ' 'ভূঃ' এই মন্ত্রাক্ষর দ্বারা 'নির্ম্মিত' হইল। প্রণবমণ্ডল এবং তার পরিমণ্ডল—দুয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষ (space-time-functional interval) আরও বিস্পষ্ট হইয়াছে; সেটি আর স্বগত নয়; কিন্তু তথাপি সজাতীয়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। বিজাতীয় হইলে 'সাহিত্য' বা সহগত্ব বাধিত হইবে। এখন দেখ, দুইটি সহগের প্রতিটিকে ত্রিকোটিক ধরিলে, এবং মাধ্যম অন্তরিক্ষকে এক সংখ্যায় লইলে, দুয়ে মিলিয়া সংখ্যা হইল ৭। এই সপ্তের সঙ্গে মৌলিক তিন অবিনাভাবে রহিবেই, যথা, 'ওঁ' এবং 'ভূঃ', এ দুয়েই মূল তিনটিকে (নাভি-অর-নেমি; বিন্দু-নাদ-কলা) ঠিক রাখিয়াই যাইতে হইবে। মণ্ডলকে 'খণ্ডন' করিয়া পরিমণ্ডল নয়। তবেই, ৩+৭=১০ সংখ্যা মিলিল। এই সংখ্যাটি, শুধু জপে কেন, বিশ্বব্যবহারেই মূল সংখ্যান-খ্যাপিকা সংখ্যা।

৭ এর সঙ্গে যোগ করার নিমিত্ত ৩; আবার, ৭কে গুণ করার নিমিত্ত আর দুটি—৩ ও ৫। ঐ সাতের প্রতিটিতে (বিশেষ করিয়া) অগ্নিমাত্রা, সোমমাত্রা, এবং দুয়ের অনুপাত (সম অথবা বিষম)—এই তিনটি বিশেষ ধর্ম থাকেই; কাজেই, ৩ × ৭ = ২১ সংখ্যাটি মিলিল। আবার, প্রতিটির পঞ্চ অবস্থান (যেমন, ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চীকৃত হইয়া)। সুতরাং, ৫ × ২১ = ১০৫ মিলিতেছে। এর সঙ্গে মৌলিক তিন মূল সংখ্যানবীজরূপে থাকিবেই। যেমন, ঐ দশ সংখ্যাটিতে। কাজেই, মিলিল, ১০৫ + ৩ = ১০৮, অষ্টোত্তর শত সংখ্যা। পূর্বে এ রহস্য সংখ্যাদ্বয় নানাপ্রসঙ্গে বিবেচিত হইয়াছে। এ স্থলে সর্ব সংস্থার নিরূপক সংখ্যানরূপে বিবেচিত হইল। বস্তুতঃ দশ অথবা অষ্টোত্তর শত, এই সংখ্যা দুটিকে আকৃতি-প্রকৃতি নিরূপক (basic constituent number) রূপে রাখিয়াই বিশ্বে সমস্ত কিছু তাদের 'সংস্থা', 'সংস্থান', 'সংস্থিতি' রূপটিতে বর্তিয়া আছে। কাজেই, 'জপ-সংস্থা' বিধানে এই সংখ্যাদ্বয় অবশ্য সমাশ্রয়ণীয়।

পুনশ্চ, প্রণবাদি আদিম বীজ পরীক্ষায় 'অষ্ট' এই সংখ্যাটিকে মূল আকৃতি বিন্যাসেই (basic pattern picture এ) পাই। যথা—পরাব্যক্ত বিন্দু; ব্যক্তাব্যক্ত উদয় নাদ (উদয়সেতু); ব্যক্ত উদয় নাদ; অ, উ, ম; ব্যক্তবিলয় নাদ; ব্যক্তাব্যক্ত বিলয় নাদ (বিলয়সেতু)। এখন, এই মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতি-নিরূপক অষ্ট সংখ্যাটিকে ঠিক রাখিয়া, ১০, এই সংখ্যার বর্গ (১০০), অথবা ঘন (১০০০) লইলে, ১০৮ এবং ১০০৮ সংখ্যাদ্বয় মিলে। জপাদিতে এই সংখ্যাদ্বয়ের সবিশেষ উপযোগ রহিয়াছে।

অবিস্থিতি, ব্যবস্থিতি, পরিস্থিতি এবং সংস্থিতির প্রসঙ্গ করা হইল। এই চতুর্বিধা স্থিতিতে দেশকালাদির 'নিষ্ঠিত' ভাব মুখ্য, কিন্তু 'উপস্থিতি'তে সেটি 'সম্ভাব্য' (possible) মাত্র। যেমন, কোন মহাত্মা বা বিগ্রহাদি সমীপে উপস্থিতি। দীক্ষাদিরূপে তত্তৎ-সামীপ্যে 'কৃপালাভ' ঘটিলে তবে 'সংস্থা' সংঘটিত হইল।

'সংস্থা' সংঘটন

জপাদিতে নাদ-জ্যোতিঃ, ভাব-পুলকাদি, অথবা শুক্ল-মলিন কোন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া 'উপস্থিত' হইলে, সেটি 'সংস্থায়' আসিবে কিনা, এই সম্ভাবনা দেখা দেয়। সংস্থায় আসিতে গেলে (ক) সজাতীয় বা congruent হওয়া চাই; (খ) যেটি আসিতে চায়, তার পৌনঃপুনিকত্ব বা নিয়তত্ব (invariably recurrent or persistent) থাকা চাই; (গ) এবং তার উপযুক্ত সম্বেগমান (intensity etc.) থাকা চাই। এগুলি মূলতঃ স্পন্দবিজ্ঞানের প্রশ্ন। "ভদ্রং কর্ণে ভিঃ শৃণুয়াম..." ইত্যাদি যে শান্তিপাঠ, তাতে আপন যে ভদ্রসংস্থা, তারি মত 'ভদ্র' হইয়া শব্দ, রূপাদি সব কিছু যেন আসে, সেই প্রার্থনা দেবতাদের কাছে করা হইতেছে। কেননা, সেরূপ না হইলে 'অঙ্গাসমূহ'ও 'স্থির' হইবে না, এবং তদদ্বারা 'দেবহিত' যে আয়ুঃ তাও লব্ধ হইবে না।

সংস্থিতি ও সংহতি

'সংস্থিতি' এবং 'সংহতি' শব্দ দুটিতেও ভাবনা দিও। দ্বিতীয়টি 'হ' বর্ণ আকাশ অথবা মূল যে শক্তি-ভাণ্ডার (Basic Power Plenum), তার সূচনা করে। সুতরাং, সংহতিতে সহগ শক্তিসমূহ (component forces) কেবলমাত্র যে 'কেন্দ্রীণ' হইয়া ('সং') 'স্থিরত্বমাপন্ন' ('স্থ') হইয়াছে, এমন নয়; পরন্তু সেগুলি তাদের মৌলিক আধারে যাইয়া 'অভিন্নমূল'ও হইয়াছে; কাজেই, কেবলমাত্র কাণ্ড-সংস্থা এবং শাখা-সংস্থা, এমন নয়; মূল সংস্থাও হইয়াছে। যারা এখন অবধি 'সজাতীয়' ছিল, তারা এইবার 'স্বগত' (intrinsic) হইল। 'সঙ্ঘাত' সূত্রগুলিতে এই মূলসূত্রে দৃষ্টি দিতে হইবে।

কারিকা

অবস্থিতং হি যৎকিঞ্চিৎ পরিস্থিতঞ্চ নিষ্ঠিতম্।
ইতরদ্বয়সাহিত্যে হ্যন্ত্যেন স্যাদ্ ব্যবস্থিতম্॥ ১৪৪
দ্বন্দ্বো ব্যবস্থিতে গর্ভে দ্বিকোটিকস্ত্রিকোটিকঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চাদ্যোঽপরো নাভ্যাদিরূপকঃ॥ ১৪৫

একটা চক্র অথবা বর্তুল লইয়া এই স্থিতিবিভেদ বুঝিতে যত্ন কর। কোন কিছু তার নেমিবৃত্তিতে, কিনা, পরিধি বা কক্ষে, রহিয়াছে বা আবর্তন করিতেছে; যথা—পৃথিবী বা ইলেকট্রন আপন কক্ষে; জপে, কোন একটি বর্ণকলা বা ভাবকলা সমগ্র 'জপমালার' আবর্তনে। এটি, সাধারণভাবে, 'অবস্থান'। যৎকিঞ্চিৎ অথবা যে 'সামগ্রী' (entire setting and surrounding) উক্ত অবস্থানকে সর্বতোভাবে (পরিতঃ) 'ঘিরিয়া, ধরিয়া' আছে, সেটিকে সাধারণভাবে বল 'পরিস্থিতি' (total context and environment)। কিন্তু নেমি বা কক্ষটি যদি 'ঠিক' না থাকে, অর্থাৎ, অবস্থিতি-পরিস্থিতির যে সংহতি-অনুপাত, সেটি যদি নির্দিষ্ট না থাকে, তবে কোন কিছুই তার নেমিবৃত্তিতে, সুতরাং ব্যাপারে-ব্যবহারে 'নিষ্ঠিত' হইল না। (এই প্রকার ব্যতিক্রম-ব্যভিচারের উদাহরণ জপাদি সর্বস্থলেই দেখিয়া লইও। যথা, নাদাক্ষ অতিক্রম বা খণ্ডিত করিয়া বিন্দু থেকে উদয় এবং বিন্দুবিলয় পূর্বক জপ চলিতেছে, কি না।)

ব্যবস্থিতির লক্ষণ

আচ্ছা, নেমি বা কক্ষটি নির্দিষ্ট (নিষ্ঠিত) হইবে কিরূপে? কোন curve তার equation দ্বারা নির্দিষ্ট-রূপটি পাইয়া থাকে। এস্থলে, কোন কেন্দ্র বা নাভি সম্পর্কে 'অর' সমূহকে নিরূপণে না পাইলে তো সেটি হয় না। যাহাতে কোন 'কেন্দ্র' সম্পর্কে (যথা, সূর্য, নিউক্লিয়াস্, বিন্দু) নেমি বা কক্ষে বৃত্তিমান্ কোন পদার্থের অর-নিরূপণটি হইয়া থাকে ("তুমি এই কক্ষে বা কোটিতে রহিয়াছ বা চলিতেছ, কিন্তু এই তোমার 'কেন্দ্র', আর, সে কেন্দ্র সম্পর্কে এই তোমার স্থিতি-গতির বিন্যাস-নিয়ামক 'সূত্র'")—তাকে বল 'ব্যবস্থিতি' বা 'ব্যবস্থা'। ব্যবস্থিতিতে জপাদি সমস্ত কিছুই

ছন্দোগত্ব লাভ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট আকৃতিমান্ হয়; বস্তুও বটে, ব্যাপারও বটে; স্পন্দীও (যেটি স্পন্দমান) বটে, স্পন্দও বটে। দ্বিকোটিকাদি ইহার ভেদ। কেবল অবস্থানে 'বিজাতীয়' (alien) দ্বৈধ-দ্বন্দ্বে বর্তমান ছিল; কিন্তু ব্যবস্থানে সেটি 'সজাতীয় (allied) হইতে চায় (যেমন, খাদ্য তার পরিপাকে)।

কিন্তু সব কিছুকে কেন্দ্রে আহৃত, সমর্পিত করিতে পারিলে ('অরা ইব নাভৌ সমর্পিতাঃ'), সজাতীয়টিও 'স্বগত' হইয়া যায়। তখন 'ভাব' হয় 'স্বভাব'। তখন আর ভাবের 'মার' নেই। কেননা, 'অর' যতক্ষণ, 'ডর' ততক্ষণ! অর বলিবে— 'আর না, কেন আর আমাকে মর্মকোরকের রসতম সত্তা থেকে সরাইয়া অক্ষে কক্ষে কেবলি পাক খাওয়াইতেছ! রক্ষে কর, বসিতে দাও, তদগত, তন্ময় হইতে দাও।' জপে বিন্দুলীন হবার জন্যই তো সাধন। বিন্দুলীন হইলে 'সংস্থিতি'।

দৃষ্টান্ত

ধর, গায়ত্রীজপে 'ভূঃ' একটা ধ্বনিকলা (phonetic element). জপে এটি ঠিক ('অব') রহিয়াছে=অবস্থান। মাত্রায় ও পাদে ছন্দোগ হইয়া আছে=ব্যবস্থান। কাষ্ঠায় (বিন্দুতে) সমাহৃত, সমর্পিত হইয়া আছে=সংস্থান। বাহ্য ব্যবহারেও সমস্ত কিছু লইয়া এগুলি পরীক্ষা করিও। যেমন কোন ঊর্মিকলা। শ্রীচণ্ডীতে যে অপূর্ব 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু...রূপেণ সংস্থিতা' স্তবটি আছে, সে স্তুতি এই সংস্থানরহস্যের পরমদীপিকা সর্বভাবেই জানিবে। তন্মধ্যে আবার 'ভ্রান্তিরূপেণ' সর্বভ্রান্তিনিরসনী।

৩০। এবঞ্চ সর্ব্বে জ্ঞেয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্বে।।

পূর্বে যে অবস্থান-ব্যবস্থান-সংস্থানাদির প্রসঙ্গ হইল, এবং তদনুষঙ্গে দ্বিকোটিক-ত্রিকোটিকাদির বিচার আসিল, উহা সর্ববিধ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা (এবং জ্ঞান) সম্বন্ধেই অভীষ্ট বুঝিবে॥

কারিকাঃ—

সূতে সূর্য্যশ্চিনোতীন্দুরোষধিশ্চ বনস্পতিঃ।
অয়ং দ্বিকোটিকো দ্বন্দ্বশ্চান্যত্রাপি হি দৃশ্যতে॥

ত্রিকোটিকস্য দৃষ্টান্তো যোঽপি জ্ঞেয়াদিনিষ্ঠিতঃ।
তললম্ববেধরূপশ্চ পশ্চাদ্ যঃ প্রতিপদ্যতে॥
চতুষ্কোটিত্বমোঙ্কারে মাণ্ডূক্যেন প্রদর্শিতম্।
বৈখরীসহিতা যাশ্চ পশ্যন্তীমধ্যমাপরাঃ॥
পঞ্চাদিকোটিকানান্তু বহবঃ সন্তি প্রত্যয়াঃ।
হৃল্লেখাদিষু বীজেষু তান্ বিশ্লিষ্য পশ্যত॥
একানেকপ্রসঙ্গো নিরবসরতয়া চেন্ ন গচ্ছেৎ পরস্তান্
নির্বক্তুং কেন শক্যং প্রমিতিপদমিয়াত্তর্হি কেনাপ্রমেয়ম্।
পাদাঃ কস্মাদপাদে জহদজহদপি বাঽমাত্রমাস্তে চ মাত্রাঃ
কস্মাত্তন্নিষ্কলে যত্তুসকলকলনং পারগা কীদৃশী ধীঃ॥ ১৪৬-১৫০

সূর্যেন্দু

সূর্য সবিতা, ভুবনের নাভিরূপে নিখিলসৃজনী শক্তির আধার ও উৎস। সৃষ্টির প্রসব এই নাভি বা মূলকেন্দ্র থেকেই অরবিতান-পূর্বক। এই সমগ্র কর্মটি 'সূতে'। কিন্তু সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে ঐ নাভি-সংস্থায় এবং অরবিন্যাস ব্যবস্থায় বিধৃত হইয়া আপন 'নেমি' অবস্থানটিও পাইতে হয়। এই কর্মটি আসলে নির্বাচন অথবা 'বাছিয়া লওয়ার' ব্যাপার। যেমন, কোন General Equation এ general terms গুলিকে (x, y ইত্যাদিকে) special, particular values তে assign করিয়া লওয়া। এই কর্মটি হইল 'চিনোতি' (assignment by selection)। যিনি, যে তত্ত্ব, এটি করেন, তাঁকে বলা হইয়াছে, 'ইন্দু'। এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ অগ্নি ও সোমকে স্মরণ কর। এই দুটি মিলিয়া প্রতিটি বস্তুর পূরা শক্তিলেখটি অঙ্কন ও রঞ্জন করিতেছে।

বনস্পতি ও ওষধি

বনস্পতি ও ওষধি, 'সূতে' এবং 'চিনোতি', এই দুটি কর্মের সূক্ষ্ম 'প্রতিভূ' এবং গোচর 'প্রতীক'। বনস্পতি (যথা, অশ্বত্থবৃক্ষ) এবং ওষধি (যথা, ধান্য, ব্রীহি) যে কিভাবে 'সূতে' এবং 'চিনোতি'র 'রূপায়ণ', তা ভাবিয়া দেখিও। Earth এর যে vital economy (production and distribution), সেদিক্ থেকেও। এ স্থলে সে প্রসঙ্গের অনুসরণ হইল না।

অতঃপর কারিকার শেষের শ্লোকটি।

প্রমাণ কতদূর অবধি?

প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, অথবা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই ব্যবহারভূমিকার আধারপটেই সব কিছুর 'নির্ব্বচন' সম্ভাবিত হইতেছে। কিন্তু, 'এক বা অনেক' ইত্যাদি সংখ্যা নির্বচনও যে অনির্বচনীয় পরমতত্ত্বে 'পারগ' হয় না, ('ন গচ্ছেৎ পরস্তাৎ'), সেখানে এমন কি আর নির্বচন আছে, বা থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা সেই তত্ত্বতঃ অপ্রমেয় বস্তু প্রমাণাদির বিষয়ীভূত হইবে ('প্রমিতিপদমিয়াৎ')?

পুনশ্চ, একান্ত 'অপাদ' যে পরমতত্ত্ব, তাহাতে 'ত্রিপাৎ', 'সহস্রপাৎ' ইত্যাদি পাদপ্রসঙ্গই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইল—তা কে বলিবে? আবার, মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে 'অমাত্র' পরম, সেটি কি স্বরূপে মাত্রা ত্যাগ করে অথবা করে না ('জহদজহদপি বা'), অর্থাৎ, তাহা 'সবিশেষ' অথবা একান্ত 'নির্বিশেষ',—তাই বা কে নিরূপণ করিবে? পাদ-মাত্রার প্রসজ্যমানতার দৃষ্টিতেই শুধু নয়, 'কলা' সম্পর্কেই বা সে পরম কি?—স্বরূপতঃ 'সকল' অথবা 'নিষ্কল'? যদি নিষ্কলই হয়, তবে সেটি সকল হয় কি প্রকারে? যদি বল, বস্তুতঃ হয় নাই, উহা 'আভাস' মাত্র, তবে বল—নিরঞ্জন, শুদ্ধ, নিরাবরণ পরমতত্ত্বে আভাস, অধ্যাস ইত্যাদিই বা কিরূপে? যদি বল, আভাসাদি তাতে নেই, 'আমাতে' আছে, তবে বল—এই 'আমি' বা 'আমাতে'ই বা কি বস্তু? যদি বল—পরমই আপন অনির্বাচ্যা, অচিন্ত্যা শক্তিতে 'আমি, তুমি, সে' হইয়া এই আশ্চর্য কৌতুক খেলাটি খেলিতেছে, তবে বল—সে পরম আর তার শক্তির সম্পর্কটি কি? যদি বল—অনিরুক্ত, অচিন্ত্য, তবে তার ঐ আশ্চর্য কৌতুকটি কেবল মানিয়াই লইলে, 'কেন', 'কোথা হইতে', 'কেমন করিয়া'—ইত্যাদিরূপে 'বোঝার' যে কৌতূহল সে কৌতূহল তো কৈ 'হালে পানি পাইল না!' তাই কারিকায় শেষে বলা হইতেছে— 'পারগা কীদৃশী ধীঃ'?

ধীর গতি কোন অবধি?

ধী বা বুদ্ধি তো এ বিশ্বমহাকুহেলীর পারে ('তমসঃ পরস্তাৎ') লইতে অপারগ। তবে, ধীকে কি সরাসরি বিদায় দেয়া যাবে? তা তো যাবে না, দিলে চলবেও না। ধী যদি

শ্রুতির কথামত 'অগ্র্যা' এবং গীতার ভাষায় 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'একা' হয়, তবে, একান্ত 'পারে' না হউক, 'দ্বারে' বা 'ঘাটে' ঠিক ঠিক উপনীত করার নিমিত্ত 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'—বুদ্ধিতেই পরমের শরণটি অন্বেষণ করিতে হইবে; এবং সেটি করিলে, 'দদামি বুদ্ধিযোগং তে'। বুদ্ধি যুঞ্জানা হউক প্রথমে, পরে 'যুক্তা', 'যুক্ততরা' ইত্যাদি। ব্যবহারতঃ কর্ম্ম, ভাব, জ্ঞান—সবই বহুমুখী, বিরুদ্ধধর্ম্মী—'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ'। এদের একমুখী করিয়া, প্রথমে আপেক্ষিক, ক্রমে নিরপেক্ষ, নির্ব্যূঢ়ের নিশ্চিত সরণিটি দেখাইতে যুঞ্জানা বুদ্ধিকে দিশারিণীরূপে সঙ্গে লইতেই হইবে। 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'-এর নিমিত্ত 'ধীমহি', কিন্তু, হে জ্যোতীরসের পরম আশ্রয় ও উৎস! তুমিই—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'! পরমের একান্ত-প্রান্তে লইয়া যাইয়া তবে বুদ্ধির ছুটি! গিরিকন্দর থেকে জন্ম যে তটিনীর, তাকে 'ঋজুকুটিল নানা' পথি-পরিস্থিতির মধ্য দিয়া উদ্বেল, বিপুল অসীমের বুকে সঁপিয়া দিয়া তবে সে খালাস! এ কর্ম্মটি সকল সাধনেই তাকে করিতে দাও।

ইতি জপসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্বাদিনিরূপণং নাম প্রথমঃ পাদঃ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

১। ক্ষরাভিব্যঞ্জকানাং যন্মূলত্বং তদক্ষরত্বম্॥

নিখিল ক্ষর অভিব্যঞ্জক যে মূলাশ্রয়ী, সে মূলকে অক্ষর জানিবে।

ক্ষর ও অক্ষর

এদেশে বৌদ্ধাদি দর্শন এবং পশ্চিমে প্রাচীন ও নবীন বহু দর্শনমত, ক্ষর (changing) ছাড়া অক্ষর (unchanging) কোন তত্ত্ব মানিতে নারাজ হইয়াছে। বর্তমান অক্ষরসূত্রে 'অক্ষর, অব্যয় বস্তু' প্রতিপাদিত হইতেছে।

ক্ষরং সর্ব্বং প্রতীতং যদ্ বৃত্তিঃ সূক্ষ্মেঽপি তাদৃশী।
দৃষ্টাদৃষ্টানুমেয়ঞ্চ ক্ষরত্বমপি কারণে॥
কিঞ্চিদ্ ব্যেতীতি যদ্‌জ্ঞানং তত্র ন ব্যেতি কিঞ্চন।
অন্যোন্যাপেক্ষিণৌ স্যাতাং সংপৃক্তৌ হি ব্যয়াব্যয়ৌ॥
যেন তদ্ ব্যক্তিমাপন্নং তদভিব্যঞ্জকং মতম্।
স্বরব্যঞ্জনসম্বন্ধি গীর্ষু চ তদুদাহৃতম্॥ ১৫১-১৫৩

স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে

যা কিছু প্রতীতিগোচর হইতেছে, তাহা তো ক্ষর—পরিণামী, অধ্রুব। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে দৃষ্টি দিলেও, বৃত্তি তদ্রূপই দেখিতে পাই। যেমন পূর্বশতকে বিজ্ঞান এটমে যাইয়া বস্তুর (mass) ধ্রুব সংস্থাটি পাইয়াছে মনে করিয়াছিল; এখন দেখিতেছে, এটমও, কেবল বহিঃ সম্পর্কে নয়, পরন্তু আপন অভ্যন্তরেও, ক্ষর— indivisible and immutable বস্তু নয়। বরং সূক্ষ্মে যাইয়া ক্ষরকে আরও যেন 'খর' এবং 'উগ্র' মূর্তিতেই দেখিতেছি।

আর কারণে? কারণকে সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান পর্যন্ত যদি লও তবে, সেখানেও গুণত্রয়ের 'সদৃশ পরিণাম', সুতরাং ক্ষরত্ব অনবকাশ নয়, যদিও সেটিকে 'পরিণামী' বিশেষণসহ 'অক্ষর' বলাও হয়। 'জগতের জন্মাদি যাঁহা হইতে', সেই ব্রহ্মকে যদি কারণ বল তবে, সে কারণব্রহ্ম কার্যব্রহ্ম হন কেমন করিয়া? এ জিজ্ঞাসা সেই বেদের নাসদীয়সূক্ত থেকে অদ্যাবধি না করিয়া তো উপায় নেই। 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ'? 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম'—তাঁতে এই বিচিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে কারণ-কার্যভাবরূপ পরিণাম, ক্ষরভাব আসে কি করিয়া? ইহা বস্তুতঃ নহে, আভাসিক—একথা বলিলেও এই বিচিত্র বিশ্ব ক্ষরভাবের মূল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই আদি কারণ পর্যন্তই যাইতে হয়। মূলবীজে (সেটি যাই ভাব না কেন), অক্ষরবস্তু 'আমি ক্ষর হইব, অথবা নিজেকে ক্ষর হইয়াছি এভাবে দেখাইব'— এই সঙ্কল্পন না করিলে তা থেকে 'বিশ্ববীজাঙ্কুরাকৃতি' ইত্যাদি ক্ষরভাবের সম্ভাবনা হয় না। অমাত্র পরমকে মাত্রামান অঙ্গীকার করিতে গেলে, পরমাক্ষরস্বরূপা অথচ নিখিলক্ষরমূলরূপা 'অর্দ্ধমাত্রা' সেতুসমাশ্রয় করিতে হয়। তাই ওঙ্কারাদি জপে এই মূলক্রমের অনুক্রম অনুলোম-বিলোমে করিতেই হয়। ক্ষর পরিসীমা যত্র অক্ষরপরিসীমায় (পূর্ণ এবং শূন্য) সম্মিলিত, সেই বিন্দু তাই নিখিল সৃষ্টিরহস্যের অপরমূলরহিত মূলরহস্যনিধান।

বিচারবিস্তরে না যাইয়া ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কারণেও ক্ষরভাব উপপন্ন। এবং সেটি 'দৃষ্টাদৃষ্টানুমেয়ং'—দৃষ্ট যে স্থূল এবং অদৃষ্ট যে সূক্ষ্ম, এতদুভয়ে ক্ষরত্ব থেকে উহা অনুমেয়। সাংখ্যাদির প্রকৃতিতে যেমন। অনুমানযুক্তি প্রদর্শিতও হয় সে সব শাস্ত্রে।

ধ্রুবধাম

আচ্ছা, ক্ষরকে যদি মূলকারণ পর্যন্তও লইতে হয়, তবে অক্ষর, অব্যয় যে ধ্রুবধাম, সেটি কোথায়? Relative বা আপেক্ষিকের বাহিরে তার কি ঠাঁই বা আছে? এও এক মহাদুর্গমগহন বিচারের স্থল। ক্ষরকেই Absolute বলিবে না কেন? 'ক্ষরং হি পরমংব্রহ্ম' বলিলে আপত্তি কি? কারিকায় অক্ষর, অব্যয় মানার অসংদিগ্ধ যে ভিত্তি—সাক্ষাৎপ্রতীতি—'ন ক্ষরতি, ন ব্যেতি' রূপে অপরোক্ষানুভূতি—সেইটিই বলা হইতেছে। যেখানেই কোন কিছু 'ব্যেতি'—স্থিরধ্রুব না রহিয়া চলিতেছে—জায়তে

অস্তি ইত্যাদিক্রমে ষট্‌পরিণাম পাইতেছে—সেখানেই তার আধার, প্রকাশ এবং সাক্ষী—অন্ততঃ এই তিনরূপে 'ন ব্যেতি', অব্যয় কেহ বা কিছু রহিয়াছে এবং থাকিবেই। সেটা আপেক্ষিক বলিলে, তারই বা আধারাদি কি—এভাবে সন্ধান করিতে করিতে 'অনবস্থায়' পড়িতে হইবে। তা ছাড়া, সে পরমাধার যে নির্ব্যূঢ় (Absolute), তা সাক্ষাৎ প্রতীতিই 'প্রতীত' করিয়া দেখাইয়া দেয়। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের আধাররূপে 'তুরীয়' মানি যে জন্য।

সাক্ষাৎ প্রতীতি

'ক' নামক কোন বস্তু বা ভাব নানা পরিণামে যাইতেছে; কিন্তু কে বা কি সে পরিণামগুলি দেখিয়া তাদের দেশকালাদি সম্পর্কে সাজাইতেছে? তারা নিজেরাই, অথবা, লহরীমালার যেটি শেষ (অর্থাৎ 'বর্তমান') লহরী, সেইটি? এদেশে এবং ওদেশে এই ক্ষরপরিণামধারার আধারটি কি, এবং তার 'ভান'ই বা কিভাবে হইতে পারে, তা লইয়া বিস্তর বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাতে নিশ্চয়াত্মিকা প্রমার প্রান্তেও তো কৈ আসিতে পারা যায় নাই! তথাপি একটা মূল কথা না মানিয়া চলিবে কি?—যে কোন সম্বন্ধের (পূর্বাপর, কার্যকারণ ইত্যাদি) ভান হইতে গেলে ভানসামগ্রী (the 'Fact' as distinguished from 'factsection') তত্তৎ সম্বন্ধের 'ব্যাপ্য' (conditioned and limited by) হইবে না। যেমন, 'ঐটি আমার জ্ঞেয়, আমি তার জ্ঞাতা'—এভাবে যে ভানটি হইল, সেটি (জ্ঞানসামগ্রী) নিজে জ্ঞেয়টিও নয়, জ্ঞাতাটিও নয়।

তিনটি

আধার, প্রকাশ এবং সাক্ষী—এই তিনরূপে সব কিছু প্রতীতিতেই ক্ষরের সাথে অক্ষর রহিয়াছে। যেটি 'ব্যেতি', সেটি 'ন ব্যেতি'কে ছাড়িয়া নেই, থাকে না। যে ভানসামগ্রী ('Fact' বা Experience as Whole) উপরে কথিত হইল, এবং আগেও হইয়াছে (বিশেষ করিয়া ভানসূত্রে), তাতেই আধার-প্রকাশ সাক্ষী—এ তিনভাবই 'দেওয়া' আছে। 'ভান' কে 'ভাস' রূপে পাইয়া তবে ঐ তিনকে তিন করিয়া জানি ও বলি। ভাস = Judging and Reviewing Fact, ইহা স্মরণ কর। ভানভূমি ভাসভূমিতে না

আসিলে ক্ষর-অক্ষর, ব্যয়-অব্যয় ইত্যাদি দ্বন্দ্বস্থতা (Polarity) স্বগতভাবে (intrinsically) রহিয়াও তদ্রূপে 'প্রতিভাসিত' হয় না। প্রতিভাস হইলে জানি যে, ক্ষরাক্ষর, ব্যয়াব্যয়—এরা অন্যোন্যের অপেক্ষাসহকারে 'সংপৃক্তৌ'—সম্পর্কিত। ভানে আধার, প্রকাশ—'আধারমানন্দমখণ্ডবোধং'—ভাবে অক্ষর, অব্যয়কে অপেক্ষারহিত নির্ব্যূঢ় ভাবেও জানিতে পারি। 'সাক্ষী' ভাবে 'কেবল' ভাব নিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু একান্ত পরিনিষ্ঠিত নয়; কেননা, এটি অনপেক্ষ-সাপেক্ষ, প্রপঞ্চোপশম এবং প্রপঞ্চোপগমের মাঝে সেতু বা সন্ধি। আধার (অস্তি) একান্ত অভেদেই প্রকাশ (ভাতি) এবং আনন্দ (প্রিয়ং)। এর মধ্যে 'সাক্ষী'টি 'উন্মুখ' হইয়া একান্ত অভেদের মাঝেও 'যেন' দৃষ্টিভেদ করিয়া দেখে; 'যেন' একবার দেখে 'এ-টিকে', আর একবার দেখে 'ও-টিকে'! এই দৃষ্টিভেদ—aspectual consciousness in the Absolute—ব্যতীত একান্ত অবাঙ্‌মনসগোচর বস্তু বাঙ্‌মনের নাগালে কোনক্রমেই আসে না। এটি ব্যতীত ব্রহ্ম কখনই বলেন না—'একোঽহং' ইত্যাদি; 'আমি ব্রহ্ম আর এই আমার শক্তি' ইত্যাদি। শুধু ব্রহ্ম কেন, কোন কিছুই আপন অখণ্ড পূর্ণতাকে এভাবে 'যেন' ভাঙ্গিয়া দেখাইতে পারে না। ঐ দৃষ্টিভঙ্গীভেদ ব্যতীত—যেমন, সূর্য আর তার প্রকাশ; অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; মন আর তার জ্ঞানেচ্ছাদি বৃত্তি।

ওঙ্কারে

ওঙ্কারে অকারকে যদি বল 'ভাতি', 'ম'কারকে 'প্রিয়ং', তবে মধ্যের এই অনির্বাচ্য সেতু বা সন্ধি ভাবটি হইল 'উ'কার। এই তিনটি (অ, উ, ম) 'কলা' (phases)। এক অবিভক্ত পূর্ণ ওঙ্কারেই এ তিন 'যেন' নিজেদের পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছে। এ তিন ব্যতীতও পরাব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্তভাবে অপর সূক্ষ্ম কলাও দৃষ্টিবিশ্লেষণে সাক্ষিভাস্য হইতে পারে। অথচ, পরমাধার এবং প্রকাশ হইল নাদবিন্দুকলাতীত অক্ষর, অব্যয় বস্তু। এটি সবিশেষ অভিব্যক্তির নিমিত্ত বিন্দু নাদ কলা—এই ত্রয়ীরূপটি ধরে। তার মধ্যে বিন্দু হইল অভিব্যঞ্জকমূল (স্বয়ং পরাব্যক্ত); নাদ (ব্যক্তাব্যক্ত এবং ব্যক্ত, দুইরূপে) অভিব্যঞ্জকমুখ্য অথবা কলাভিব্যঞ্জক (যথা, অপর প্রাণ সম্পর্কে মুখ্যপ্রাণ), এবং কলা হইল ফলাভিব্যঞ্জক (অ, উ ইত্যাদি বর্ণরূপে)। অক্ষর-ক্ষর যে তত্ত্ব, তাহা এই তিন অভিব্যঞ্জক সহকারেই 'ব্যক্তিমাপন্ন' হয়। বাকে (গীর্ষু) এই

অভিব্যঞ্জক স্বরব্যঞ্জনসম্বন্ধিরূপে উদাহৃত। অর্থাৎ, বাকে অক্ষর-ক্ষর এই যুগ্ম, স্বর-ব্যঞ্জনবর্ণ আকৃতিতে অভিব্যঞ্জক হইয়াছে। অক্ষর-ক্ষর—এই যুগ্মের সত্তাশক্তি নিজেতে পাইয়া স্বর-ব্যঞ্জন প্রতিটি বর্ণ হয় 'মাতৃকা'। অক্ষরের 'সর্ব্বস্য নিধানং বীজমব্যয়ং' ভাব, এবং ক্ষরের সেই সর্বকে সবিশেষ, সলক্ষণ করিয়া ফুটাইয়া লওয়ার ভাব—এ দুই-ই স্বরাদি মাতৃকায় আছে। পূর্ণ-শূন্যকে একত্র আপনাতে ধরিয়া বিন্দু যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে এক পরমবিস্ময়, অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণও তদ্রূপ। তবে বিন্দু আর বর্ণ একই 'স্তরের' বিস্ময় নয়। বিন্দুকে বল যদি 'মূল', তবে স্বরবর্ণকে বল 'মৌলিক', আর, ব্যঞ্জনকে তদপেক্ষায় 'যৌগিক'। মূলের সঙ্গে যোগটি অবাধিত, অনপিহিত থাকিলে, অর্থাৎ, অং, আং ইত্যাদি আকৃতিতে বর্ণের মাতৃকামানটি তার বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক মানের কার্পণ্যমুক্ত হইয়া থাকে। অনুস্বারে বিন্দুমুখ্যতা, আর বিসর্গে নাদমুখ্যতা—একথা বলা হইয়াছে। একটায় ঘননী, অপরটিতে ব্যাপনী বৃত্তি প্রধান। এ দুয়ের সেতু সন্ধিটি সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক, এবং সে কর্ম মিত্রঅর্য্যমার তদারকে। কেন তা আগে বলা হইয়াছে। যেমন, 'হংসঃ' এই অজপায় ঘননী (বিন্দু) এবং ব্যাপনী (নাদ) দুই-ই বৃত্তিমান বটে, কিন্তু তাদের সেতু-সন্ধিটি ঠিক সমতায় অথবা ছান্দসী বৃত্তিতে (in harmony relation এ) বিধৃত হইলে তবে হংসঃ হয় হংসযোগ। তা না হইলে যাহা 'মৃত্যবে', তাহা 'অমৃতত্বায়' হয় না।

মাতৃকা

প্রতিটি স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণে, পূর্বোক্ত কারণে, সর্বাভিব্যঞ্জিকা শক্তি রহিয়াছে। কেননা, অক্ষররূপ এবং ক্ষররূপ মূল-মৌলিক বস্তু তাতে আপন সর্বকলনী এবং সর্বফলনী শক্তিতে বিদ্যমান। এই মূল কথাটি মনে রাখিলে, প্রাচীন শব্দার্থ-বিজ্ঞানসম্মত জপসূত্রমের 'বর্ণরসায়ন' এবং 'প্রাণরসায়নে' কেহ আর কেবল কল্পনা কৌতুকবিলাসের ঘটাই দেখিবেন না। বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্থ আসে (শক্যতাকে অবচ্ছিন্ন করে) কি করিয়া, এটা অবশ্য শব্দবিজ্ঞানের এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র শাস্ত্রেরও অতীব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। যেমন, হ্রীঁ, ঐঁ ইত্যাদি বীজকে শক্তিসামগ্রীর বিশেষ আকৃতি (Basic Pattern) ভাবি কি জন্য? মূল আধার সত্তা-শক্তি সামগ্রী থেকে এক এক

পদার্থ (মন্ত্রাদি) এক এক বিশিষ্ট আকারে উদ্ভূত হইল কিরূপে—ইহা চিন্তনীয়। জপসূত্রমে সেরূপ চিন্তনের নিমিত্ত একটা যুক্তিযুক্ত প্রস্তুতি দেওয়ার প্রচেষ্টা হইতেছে মাত্র। কিন্তু সমগ্র ক্ষরাক্ষরতত্ত্ব স্বরব্যঞ্জনবর্ণে আহিত এবং উদাহৃত বলিয়া প্রস্তুতি মাত্রকে বিস্তৃতি-বিবৃতি-সমাপ্তির বৈঠকে এইক্ষণই হাজির করা যায় না! যেটি 'সুরু' তাকে 'সারা' হইতে গেলে কত না ঘাঁটি পার হইয়া, আর, প্রতিটি ঘাঁটিতে 'সাক্ষর' মঞ্জুরী লইয়া তবে চলিতে হয়!

২॥ সর্ব্বাভিব্যক্তিষু তন্মূলস্য প্রশাসনম্॥

(পূর্বসূত্রে যে অক্ষরমূলের কথা হইল) সে মূল সর্ববিধ অভিব্যক্তির (স্বরব্যঞ্জনাদিরও) প্রশাসয়িতৃ॥

অক্ষরং পরমং ব্রহ্মেত্যক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
স্মৃতিষু শ্রুতিষু হ্যেবং সর্ব্বস্য মূলমক্ষরম্॥
এতস্য প্রশাসনে গার্গীত্যত্র চাস্য প্রশাসনম্॥
অক্ষরং পরমং ত্বাদাবমূলং মূলমক্ষরম্।
অন্যচ্চাধ্যক্ষরং বিদ্ধীতি ত্রেধা নিদধে পদম্॥
আদিব্রহ্ম ততো প্রাণো যোঽচিন্ত্যশক্তিনির্জ্জরঃ॥
স এব হি নাদবিন্দূ যাভ্যাং সর্ব্বং প্রশিষ্যতে॥
অন্বক্ষরং হি সূত্রাত্মা বিরাট্ প্রত্যক্ষরং পুনঃ।
ঈশমধ্যক্ষরং বিদ্ধি স্ফোটং নিত্যং স্বরাদিতঃ॥ ১৫৪-১৫৮

পঞ্চপর্বমূল

নিখিল অভিব্যক্তিমূল যে অক্ষর, সেটি এখানে পঞ্চপর্বে প্রদর্শিত হইতেছে। স্মৃতি-শ্রুতি, তন্ত্র-পুরাণ যে সনাতনী আর্ষপ্রজ্ঞার বাণী বহন করিতেছেন, তাতেই এর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। প্রথম,—পরমব্রহ্মরূপ যে অক্ষরবস্তু, সেটি তদ্‌ভাবে 'অনিরুক্তমলক্ষণম্' (Alogical Absolute); সুতরাং, 'মূল', 'কারণ' ইত্যাদি কোন বৌদ্ধমানই (logical category) তথা সাবকাশ নয়। সেটিকে 'পরম' বলিয়াই 'রেহাই' দিতে হয়।

অলক্ষণবস্তুটিকে, যে ভাবেই হোক, বিশ্বব্যবহারে আসিয়া 'মান' মানিতে হইয়াছে; অপ্রমেয়কে প্রমেয় হইতে হইয়াছে। দ্বিতীয়,—সেই 'পরম' নিজেকে 'অমূলং মূলম্'—স্বয়ং মূলরহিত মূলরূপে দেখাইতেছে। এটিও অক্ষর, কিন্তু প্রতিযোগী যে ক্ষর, তার সম্বন্ধী হইয়া। বাহিরে আকাশ, ভিতরে কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য—ইত্যাদি লইয়া ক্ষরসম্বন্ধী এই অক্ষরটি বুঝিতে যত্ন কর। গীতায় সেই প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তমশ্লোকে এই অক্ষর হইতেও 'উত্তম' রূপে কথিত হইয়াছে ভগবত্তা। পূর্বোক্ত অলক্ষণ, অপ্রমেয়, অব্যবহার্য (মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতিকথিত) যে ব্রহ্ম, সেটিকে বলা হইল— 'পরম'। এই 'পরম' আর 'উত্তম' দুটিকে সেই মহামায়াসূত্রদীপে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে। এস্থলে, পরমে উপরম বা উপশমকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিবে; উত্তমে সর্ববিধ 'তম' বা কাষ্ঠার যেটি পরাকাষ্ঠা বা পরিসীমা, সেটিকে, অর্থাৎ, পূর্ণকে। উপশমকে যদি শূন্যকোটিতে (নেতিপর্বে) নাও, তবে, শূন্য ও পূর্ণ। পরমে ও উত্তমে, শূন্যে ও পূর্ণে ভেদদিদৃক্ষায় যেন বিবদমানা মোহকলিলগা বুদ্ধি ষড়যন্ত্র না করে, সে পক্ষে সাবধান রহিও। অর্থাৎ সে বুদ্ধিকুহক যেন পাইয়া না বসে, যে বলিবে—আমার ভগবান্ উত্তম; তোমার ঐ পরমে আমি প্রমাদ গণি—'প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ'! পরমকে তোমার উত্তমের 'তনুভাঃ' বলিয়া যদি ভাল লাগে তো লাগুক। তবে রসবস্তু কৈ ভাঃ বা জ্যোতিঃকে ছাড়িয়া তো থাকে না! থাকিলে সেটি রসবস্তুই হয় না যে! যাক্—এর জন্য আবার বেদান্তীর হাতখানা শক্ত করিয়া ধরিয়াই (ছাড়িয়া নয়) সেই মহামায়াদি সিদ্ধান্তদীপের 'কাজল' আঁখিতে ভাল করিয়া লাগাইয়া এস। 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি'।

অধ্যক্ষর

তৃতীয়,—অধ্যক্ষর। এই শব্দটি দুইভাবে লইয়া এই 'তার্তীয়' ভাবটি বুঝিবে। অধি=অধিকরণে; অধি=অধিকারে। আগে যে পরম ও উত্তমের প্রসঙ্গ হইল, সে 'দ্বয়ের' অদ্বয় অধিকরণে যে অক্ষরভাব, এবং যেটি তদ্ব্যাপ্য নিখিল ক্ষরাক্ষরভাবের 'অধিকারী' ('ঈশানো ভূতভব্যানাং') সেটিকে 'অধ্যক্ষর' জানিবে। এইভাবে অক্ষরবস্তু (Reality as Absolute Permanence)—ত্রিবিধ পাদবিন্যাস করিল। একদিকে শূন্যকাষ্ঠা, অন্যদিকে পূর্ণকাষ্ঠা; এই দুই পরিনিষ্ঠিত কাষ্ঠার 'অধিকরণে'

রহিয়া কেহ যেন বলিতেছে— 'ভূতভব্য সব কিছুকেই এই কাষ্ঠার অধিকারেই আমি ক্ষরিষ্ণু করিব, কিন্তু তাদের সত্তা শক্তি ছন্দের 'প্রশাসন' রূপে স্বয়ং অক্ষরই রহিব'। 'এতস্য প্রশাসনে' ইত্যাদি বলিয়া যে অক্ষরের নির্দেশ শ্রুতি করিতেছেন, সে অক্ষর ত্রিপাৎ অথবা পঞ্চপাৎ। তন্মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গের যে 'পরম', তার প্রশাসন নিব্যূঢ়-সর্বাধিকরণতারূপে বুঝিবে। পরেই অধিষ্ঠানসূত্র দেখ।

পরব্রহ্মের সত্তা (সৎ-চিৎ-আনন্দ), বিশ্বে সব কিছুরই অধিষ্ঠান বটে (যেমন বলা হয়, মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির), কিন্তু সে অক্ষরপরম আবার প্রশাসনমূর্তিতে দেখা দেন কি করিয়া—এ জিজ্ঞাসা রহিয়া যায়। সে প্রশাসন সৌম্যও বটে, ভীষণও বটে ('ভয়াৎ সূর্য্যস্তপতি' ইত্যাদি); সেটি শমও বটে, দমও বটে। রস বা রাগ এবং রোষ—এই যুগ্ম প্রগ্রহ দ্বারা অণুবিরাটে প্রতিটি 'অশ্ব' (ক্ষরবস্তু) নিজ নিজ অধিকারে, সামর্থ্যে, সরণীতে প্রশাসনে রহিয়াছে। প্রশাসন শক্তি এবং ছন্দঃ—এ দুটি সম্বন্ধে; অথবা, ভূতভৌতিকের যাহা গতিচক্র, তার অর এবং নেমি সম্পর্কে। নাভিতে স্বয়ং প্রশাসয়িতা অধিষ্ঠিত।

সাংখ্যের প্রকৃতিকেও 'অক্ষর' বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতি কি প্রশাসয়িত্রী? বিচারে নামিয়া কাজ নেই, তবে একা প্রকৃতি দ্বারা যে এই নিখিল প্রশাসন কর্মটি নির্বাহ হয় না (অন্ধের ঘাড়ে এক পঙ্গুকে বসাইতেও হয়) তা নৈষ্ঠিক সাংখ্যবাদীও বলিবেন না কি? আপন বাছুরটিকে দেখিয়া গাভীর বাঁটে দুধ আসে যেমন;—ইত্যাদি উপমার উপন্যাস করা ছাড়া বিশ্বপ্রশাসনের (শক্তিতে এবং ছন্দে) যে গম্ভীরাম্ভঃ, তার অথই জলে ডুব মারিল কে, আর কেই বা তথা হইতে অতলদিশারী, ধ্বান্তাপসারী দ্যুতির মাণিকটি 'এই যে' বলিয়া হাতে তুলিয়া দিল? বিজ্ঞান গত শতক অবধি ঐ সাংখ্যের 'প্রাকৃত' সরণিটি ধরিয়া বুক ফুলাইয়া চলিতেছিল; মূলে যে সম্ভাব্যের অমূলবীজটি নিহিত (Cosmic Destiny), তাই থেকেই প্রতিটি বাস্তববিকাশের খুঁটিনাটি সব কিছুই হিসাবের খাতায় ও নক্সায় কষিয়া ও ছকিয়া 'দেখান' যায়—এই না ছিল ও-যুগের বিজ্ঞানমঞ্চে জবরদস্ত জাঁদরেলি বুলি! কিন্তু আজ? এখন যে 'সম্ভূতি' এর জায়গায় 'সম্ভাবনী'! 'এইরূপে হইল দেখিতেছি বটে, এবং এই প্রকার ছন্দঃ তার প্রশাসনরূপে প্রতিভাত (apparent) বটে, কিন্তু তার আকৃতি, শক্তি এবং ছন্দের কোনটাই সমগ্র, এবং সম্ভবতঃ যথার্থভাবেও জানা গেল না; বরং যতই দৃষ্টি মূলের দিকে যাইতেছে,

ততই যেন মনে হইতেছে নিছক জড়তা ও বাধ্যতা নয়, পরন্তু সচেতন, স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দতাই সমস্ত কিছু অভিব্যক্তির মূলে—রসলিপ্সু, আনন্দভুক্‌রূপে বিদ্যমান'—এই রকমের কথাগুলোই কি আজকাল প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানবৃদ্ধদের মুখে, অনেক সমীহসত্ত্বেও, শোনা যাইতেছে না?

অধ্যক্ষতা

ফলকথা, প্রশাসনের নিমিত্ত (আকৃতি, শক্তি এবং ছন্দে) কেবল এক উদাসীন, নির্বিশেষ অক্ষরকে অধিষ্ঠানরূপে পাতিয়া রাখিলে চলিবে না, ব্রহ্মের বা ভগবত্তার অধ্যক্ষতাও একান্ত আবশ্যক হয়—'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'। ব্রহ্মের এবম্বিধ অধ্যক্ষতাও অবশ্য নির্বচনযোগ্য নয়। সৃষ্টিতে একটা ধূলিরেণুও নয়, একটি লহরভঙ্গী বা ভাবকটাক্ষও নয়। কেননা, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। তথাপি সচেতন কর্তৃত্ব বা অধ্যক্ষতায় নিজবোধের যে শীলমোহর, তার ছাপটি আছে; কল্পনা, অনুমানাদিকে বায়না না দিয়া সাক্ষাৎ স্বাধিকারেই আছে। 'পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে গাছ হইতে আতাফল বাধ্য হইয়া পড়িল'—এ কথাটি বলিলে নিজের ভিতরের ঐ শীলমোহরকরা সাক্ষাৎ অনুভবের দলিলখানা নাকচ করা হইল। ভিতরের ঐ দলিলখানা জাল—ভ্রম মাত্র, প্রমা নয়—এ অনুমানেরই বা প্রমাণ কোথায়? সমস্ত কিছুই হিসাবের গণাগাথায়, নিরূপণে নির্বাচনে আসে—এ কথা বলিলে যাথার্থ্যের এবং প্রামাণ্যের গণ্ডী টপ্‌কাইয়া অমূলক অপলপনে গেলে না কি?

তথাপি শাস্ত্র, যুক্তি উভয়থা অন্তর্বহিঃ, অণুবিরাট্ সমস্ত কিছুই 'যন্ত্র' রূপটিই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মপ্রসারিণী দৃষ্টিপ্রান্তে খুলিয়া মেলিয়া ধরিতেছে, নয় কি? আত্মপ্রত্যয়েও 'নাহংকর্ত্তা'। তবে তো উপরের ঐ স্বত্বসাব্যস্তের দলিলখানা ঝুটা বলিয়া ছিঁড়িয়াই ফেলিতে হয়! যন্ত্রে স্ব-স্বামিত্ব আরোপ করা যায় মাত্র। স্বতঃস্বচ্ছন্দতা তাতে নিষ্ঠিত নয়। কিন্তু, মনে রাখ যে, ভিতর বাহিরে সব কিছু বস্তুতঃ যন্ত্র নয়, 'যন্ত্রম্'—যেটি তার 'মন্ত্রম' আর 'তন্ত্রমের' সাথে অবিনাভাব সাহিত্য-সংহতিতে থাকে। মন্ত্রম্ সেটিকে 'মনন' করে, কাজেই জড়স্বভাব নয়; তন্ত্রম্ সেটিকে 'তায়ন' করে, কাজেই বন্ধপাশ নয়। 'পরম' অধিষ্ঠানরূপে আছেনই; 'উত্তম'ও স্বয়ং অধ্যক্ষরাদিরূপে অধিকারী, অধ্যক্ষ আছেন সর্বত্র। এইজন্য, রেণু-অটন থেকে

রেণু-রমণ পর্যন্ত সবটা 'কানুর গীত'ই শুনিতে হয়; রটন, রণন পর্যন্ত যাইয়া 'বাস্' করিলে তো চলে না। বাহির বিজ্ঞানের বড় বড় ইকোয়েশন্ও যন্ত্রের পাশে 'ম'কারটিকে বসাইবে কিনা ভাবিতেছে। গভীরস্তরের মনোবিজ্ঞানেও যন্ত্রটা আরও জবর এবং জটিল দেখাইতেছে বটে, কিন্তু ঐ 'ম'টি নইলে তো তার সকল পাকাগাঁথুনির তলায় হালকা মাটি!

যন্ত্র ও যন্ত্রম্

আভাষে যন্ত্র আর যন্ত্রমের ভেদটি বলা হইল। আসলে যন্ত্রমের 'ম'কার কি বস্তু? ওঙ্কারের 'ম'কার, উত্তম যে অধ্যক্ষর, তাঁর বাচক। সৃষ্ট সব তাতে প্রাণ এবং চেতনার নিগূঢ় নাভিনিষ্ঠ অধ্যক্ষতা আছে বলিয়াই, যেটি আভাসিক বা প্রত্যবভাসিক (cross-sectionally 'taken') যন্ত্র, সেটি আসলে এবং পূরাপূরি যন্ত্রম্। সুরসা রাক্ষসীর মত যন্ত্র যতই না সর্বগ্রাসী মুখব্যাদান করুক, শ্রীমদ্ হনুমান্ রামনামের ঐ 'ম'কার সহায়ে তার ভিতর থেকে 'গলিয়া' বাহির হইবেনই! ওঙ্কার, বীজাদির সহায়ে সাধন তো এই নিমিত্তই। অর্দ্ধমাত্রা তাঁর সেতুটি পাতিয়াছেন ঐ জন্যই। তবে হ্যাঁ, 'যন্ত্রেই নড়ন-চড়নহীন হ'য়ে প'ড়ে থাকব, যন্ত্রমের কোন সাড়াই আপনাতে পাব না, আর, মুখে মিথ্যে শুধু জাঁক, জারিজুরি করব'—এটা ছাড়তেই হবে। যিনি একেশ্বর, সর্বেশ্বর তিনি আমার পাশে এক হ'য়ে বসলেই তবে না আমি দশ! নইলে তো শূন্য! যন্ত্রেশ্বরী চিদানন্দরূপিণী কুণ্ডলিনী যতক্ষণ 'নিদ্রিতা', ততক্ষণ যন্ত্রই যেন সব কিছু, ভবের ও ভাবের কারবারে। তিনি 'জাগিলে' যন্ত্রম্।

ত্রিপুটী

প্রশাসয়িতা, প্রশাসিত, প্রশাসন—এই ত্রিপুটী মনে রাখিতে হইবে। প্রশাসিত আপনাকে 'এই, এতাবৎ মাত্র' রূপে যতক্ষণ দেখাইতেছে, ততক্ষণ সে 'ভূঃ' ব্যাহৃতির আমোলে রহিয়াছে। প্রশাসয়িতা 'স্বঃ' ব্যাহৃতিরূপে তাকে এক পরিপূর্ণ শক্তি-ছন্দঃ-আকৃতির 'আদর্শ' 'সেই' ('তৎ') বলিয়া দেখাইতেছেন। 'ভুবঃ' হইতেছেন প্রশাসন—যিনি মাধ্যমে রহিয়া 'এই'কে 'সেই'তে মিলাইবেন। এই প্রশাসন কর্মটি জপে অভ্যারোহ, হবনে সবন বা আহুতি। সৃষ্টির সর্বত্র এটি সেতু বা বিধৃতি।

প্রশাসনের সেতুরূপ

সৃষ্টির সর্বস্তরেই প্রশাসনমূর্তি 'কিছু' বা 'কেহ' তো প্রকট; কিন্তু প্রশাসনের পরিচয়পত্র লইয়া আবহমান কাল বিচারের অন্ত নেই। ক্ষুরের ধারের মত নিশিতা, দুরত্যয়া সে গহনা বিচারসরণি। সে সরণি অনুসরণে মোহকলিলে (সেই Serbonian Bog-এ) পতিত হবার আশঙ্কাই অধিক। সমস্ত কিছুর 'হৃল্লেখা' এবং 'আত্মা' পর্যন্ত গতি না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধির এ মোহকলিলপারীণা হবার সম্ভাবনাও নেই। আর, ঐ দুটি অন্তিকতম হইয়াও সে সুদূরতম! আপন ঘর, আর, আপন ঘরের ঘরণী! ফোটাফুল আপন মর্মকোরকের পরিমলেই আকুল ভ্রমরকে কাছে ডেকে আনে; কিন্তু, নিজেই সে জানে না কোরকের কোন্ নিরালা নিভৃত কোষে তার গোপন মরমমধু! আপন হৃল্লেখার কাছ থেকে এই যে অফুরান, অবুঝ ব্যবধান, এইটেই তো সৃষ্টিতে সব চাইতে মর্ম্মন্তুদ ব্যবধান! তাই, প্রশাসনকে সেতুরূপে প্রসন্ন কর।

প্রশাসন মানে ?

প্রশাসন মানে 'প্রকর্ষেণ' শাসন। এই 'প্র', বস্তুর হৃল্লেখানিষ্ঠ থাকিলে, এবং তদ্রূপেই বোধে এবং ব্যবহারে আসিলে, স্বধাম্না ও স্বে মহিম্নি সুস্থির থাকে; এবং সেটি যথার্থ অক্ষরপ্রশাসন সেতুসংস্থা হয়। বস্তুতঃ আছেও তাই। কিন্তু অস্মদাদির বোধে ও ব্যবহারে (in our conventional appreciation), প্রশাসনকে বৈরূপ্যে এবং বৈগুণ্যেও পাই। সৃষ্টিধারায় প্রথম পর্বে (First Emergence-এ) নয়, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে ঋজুর সঙ্গে বক্র মিলিয়াছে; কিন্তু বক্র সেথায় বঙ্কিম-সুন্দর। তৃতীয় পর্বে, বক্র হইয়াছে জিহ্ম; সুন্দর হইয়াছে ক্রূর। (এই পর্ব কয়টির সমাচার গ্রন্থের পরিশিষ্ট এক ইংরাজি প্রবন্ধে দেখ।) এর ফলে, প্রশাসনের 'প্র' যেন নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিল, এবং পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। একটি হইল 'উৎ' (উর্দ্ধগ), অপরটি 'অপ' (জিহ্মগ এবং নিম্নগ)। অর্থাৎ, উৎকর্ষ আর অপকর্ষ। সুর আর অ-সুর। এখন, এই 'অপের' পাল্লা কাটাই কিরূপে?—ইহাই তো সমস্যা। 'উৎ' কে (যেমন, ওঙ্কারে মধ্যে প্রশাসনরূপ 'উ' বর্ণ) পাকড়াও, তা হইলেই সব উদ্বেগ, উপদ্রব উত্রাইয়া যাইবে। নান্যঃ পন্থাঃ। 'উৎ' হইল উত্তম যে সুরচ্ছন্দঃ প্রশাসন, তারি 'উত্তোলিত অভয়বরদ হস্ত' (uplifting divine moment)।

অপ এবং আপঃ

'অপে'র অপনোদন, অপসারণ কর্মে 'আপঃ' প্রসন্ন হউন! আপোদৈবতের প্রসাদই প্রশাসন উত্তমকল্পে। 'অপ' (অকারান্ত) এবং 'অপ্' (স্ত্রী, বহুবচন) এক করিয়া গুলাইও না। স্বরের আদি (অ) যদি পঞ্চম স্পর্শের আদিতে ('প'এ) থমকিয়া যায়, তবেই তো দেবতা হন অপদেবতা, সুর হয় অসুর। যেমন, ওঙ্কার অথবা ঐঁ আদি বীজ জপে 'ম'তে যে পরশলেশটি মিলিল, তাতেই 'খতম' হইতে দিও না। ঐখানেই অক্ষর প্রশাসন অর্দ্ধমাত্রার সেতু লইয়া প্রতীক্ষায় আছেন যে! তুমি সে সেতুর সন্ধান করিবে, না, আচম্‌কা বিষম বিরতির গর্তে পড়িয়া তোমার জপকে জখম, আর, সঙ্গে সঙ্গে মনপ্রাণকে খামকা হয়রাণ করিবে? 'অপ্' বহুবচন হইয়া দেখান 'আপঃ'—পাও, মিলাও জ্যোতিকে, রসকে— 'মহেরণায় চক্ষসে'। গায়ত্রীতে এই কল্যাণী প্রশাসয়িত্রীর প্রশাসনই সেতু পাতিয়া ধ্যানগোচর করে—'সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ'। কাজেই সকল 'অপ' বা অপকর্ষের মার্জনকল্পে বিনিয়োগ হউক—আপোদেবতার। ইনি মন্যু, এনসাদি সকল ক্রূরজিহ্মকে আদৌ 'বিগলিত' করিবেন, পরে শোধন সংস্কৃত করতঃ বঙ্কিমসুন্দর এবং ঋজুপ্রশান্ত, দুই পর্বেই তুলিয়া (sublimate) লইবেন। সব কিছুর সঙ্করধাঁচে 'জট্ পাকানো' হইল, সাধারণ ভাবে, মন্যু, আর, 'জোট্ পাকানো' এনঃ। একটা 'morbid clot', অপরটা, 'malign pull', পূর্বে এদের প্রসঙ্গ হইয়াছে।

এইবার প্রশাসনের উত্তম ভূমিকায় ফিরে এস। লক্ষ্য কর, এখানে তিনটি কল্যাণী শঙ্করধারা। 'অধি', 'অনু' এবং 'প্রতি' (প্রাতিরূপ্যার্থে)—এই তিন ভূমিকায় পরমাক্ষর তত্ত্ব অবতরণ করিতেছেন। অর্থাৎ, তিনি প্রশাসনের অনুবন্ধে ও অনুরোধে, হইতেছেন—অধ্যক্ষর, অন্বক্ষর এবং প্রত্যক্ষর। ব্যষ্টি-চেতনায়, প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব; সমষ্টিতে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্;—ইত্যাদি ভাবে এই মহাশ্চর্য অবতরণটি বুঝিয়া লইও। সব কিছুতেই। যেমন, একটা বৃত্ত আঁকিবে? ঠিক বৃত্তটিই যদি চাও, প্রথমে তার কেন্দ্র এবং তৎসম্পর্কে বৃত্তসূত্র (the equation, মন্ত্র) স্থির কর। এটি অধ্যক্ষর। তারপর, তদন্বয়শাসিত 'তল' এবং 'ব্যাসমান' নিরূপণ কর। এটি অন্বক্ষর। শেষে, স্কেলাদির সহায়ে তার সুষ্ঠু রূপায়ণ হইল প্রত্যক্ষর—বৃত্তভাবের যথার্থ প্রতিরূপ।

অক্ষর-অবতরণিকা

সর্বস্থলেই পরম অক্ষর বস্তুর এই ক্ষর পরিণাম প্রবাহে অবতরণিকাশৈলী লক্ষ্য করিবে। বিশ্বব্যবহারে সর্বত্র এটি লক্ষ্য করিবে যে, কোন ক্ষরপরিণামই, তার আকৃতি, তার শক্তি, এবং তার ছন্দঃ—এ তিন সম্বন্ধে, তদপেক্ষায় অক্ষর কোন কিছুর প্রশাসন ব্যতীত হইতেছে না। এটমে ও প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াস্, সৌরজগতে সূর্য, ইত্যাদি এর উদাহরণ। অস্মদাদির মধ্যে ধী হইতেছে অক্ষরের প্রতিভূ। স্থিতধী হবার সাধন অক্ষরস্থিতির সাধন। জপকর্মে অক্ষর পরিচয়টি আরম্ভ হয়। সমাপন পর্যন্তই তাকে লইতে হয়। ব্যাহরণ এবং অনুধ্যান—এই দুইটি প্রগ্রহ তাকে অক্ষরসরণিতে উত্তমধাম এবং পরমধাম পর্যন্তই লইয়া থাকে। তবে, চলিতে চলিতে প্রগ্রহের আকৃতি-প্রকৃতি বদল হইতে থাকে। যথা, বৈখরীতে যেমন, মধ্যমায় তেমনটি নয়।

পরম ও উত্তম

পরমের ক্ষরভাবে 'নামিয়া' আসার একেবারে 'গোড়ার কর্মটি' অত্যদ্ভুত! একরস, নির্বিশেষ ভূমবস্তু 'যেন' নিজেকে নিজেই 'মন্থন' অথবা 'দোহন' করিতেছেন! যেটি শান্ত প্রপঞ্চোপশম, সেটি, যেন কোন অভাবনীয় যাদুতে, নিজেকে করেন 'প্রাণ' ('এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ')। সে প্রাণ 'অচিন্ত্যশক্তি-নির্জরঃ'। নির্জর=জরারহিত (Ever-renewing, Recreating)। আর, প্রাণ হইয়া তিনি কি 'তফাতে' সরিলেন? না, তিনি প্রাণকে আপন তাদাত্ম্যে লইয়া হইলেন—'প্রাণস্য প্রাণঃ'। 'পরম' হইলেন 'উত্তম'। কালে বা কার্যকারণে বিশ্লেষণ করিয়া 'পরম' 'উত্তম' বুঝিতে যেও না। ন্যূনতা বা আধিক্যও নেই। পুনশ্চ, সেই ভগবত্তার লক্ষণ স্মরণ কর। পরমে-উত্তমে এই যে একান্ত অনির্বাচ্য তাদাত্ম্যবিনিময় (unthinkable transfer of identity), সেইটি ক্ষরে অক্ষর-অবতরণিকার আদিমা ভূমিকা। তন্ত্রের ভাষায়, আদিকলা (First Evolvent)। এই আদিমা কলনীশক্তির একান্ত ঘনীভাবে বিন্দু; একান্ত বিতানে নাদ। বিন্দু পরম নিষ্কর্ষ; নাদ পরম প্রকর্ষ। আর, কলাকে বল পরম উৎকর্ষ। আদিমা কলনীর এই দুই পরিসীমায় ঋধ্যমানতা যদ্দ্বারা হয়, এবং পরমোত্তমে পারীণতার সেতুরূপাও যিনি হন, তাঁকে 'অর্দ্ধমাত্রা' বলা

হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্' দ্রষ্টব্য। অর্দ্ধমাত্রা=ঋদ্ধি-কলা এবং পারমিতা কলা, দুই-ই।

মাতৃকা ও অর্দ্ধমাত্রা

স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণ মাতৃকা। মাতৃকারও মাত্রা অর্দ্ধমাত্রা। 'মাতৃকা' শব্দে 'কা'টি উহারই নির্দেশ দেয়। বিন্দু-নাদ-কলা এবং কলাতীতে 'সেতু'=এই 'সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারা' কুণ্ডলিনী অর্দ্ধমাত্রা বাচ্য-বাচক সকলেতে প্রশাসয়িত্রীরূপে অধ্যক্ষতায় আছেন। ইনি অধ্যক্ষর। এঁর অধ্যক্ষতায় স্বরবর্ণও অক্ষর; ব্যঞ্জনবর্ণও অক্ষর। প্রথমটি অন্বক্ষর, দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষর। সুতরাং, স্বরব্যঞ্জন বর্ণাক্ষরও প্রশাসনব্রতনিরত। বাচ্যবিশ্বে সব কিছুর আকৃতি-শক্তি-ছন্দঃ—এ তিনেরি তাই বাঙ্ময় প্রশাসন। স্থূলবৈখরীতে, পূর্বোক্ত অপকর্ষ এবং তন্নিবন্ধন ক্রূরতা-জিহ্মতাপত্তিবশতঃ স্বর-ব্যঞ্জনের প্রশাসনটি উপমর্দিত। নাদবিন্দুকলা, অর্দ্ধমাত্রার সেতুটি, সাধারণ স্বরব্যঞ্জনাক্ষরে 'যেন' তুলিয়া রাখিয়াছেন! তাই বাক্, নামে অক্ষর হইয়াও, অক্ষর প্রশাসনের 'তটমিতা'ও হইতেছে না, 'পারমিতা' তো দূরের কথা। নাদবিন্দু সমাশ্রয়ে জপের সাধন সেই পারমিতারই সাধন।

'সামান্য' প্রশাসন এবং 'মৌলিক'

প্রশাসনসূত্রকারিকায় 'সূত্রাত্মা' এবং 'স্ফোট' এতদুভয়ের উল্লেখ আছে। অক্ষরব্রহ্ম অনন্তশক্তিনির্জ্জর প্রাণব্রহ্ম হইয়া অণুত্বও অঙ্গীকার করিলেন (অর্থাৎ, নিজেকে 'মহতো মহীয়ান্ অণোরণীয়ান্' করিয়া লইলেন) সৃষ্টি এবং তৎপ্রশাসন কর্মে। পরমাদ্ভুত যাদুকর একত্রই দুটি কাষ্ঠাকে মিলাইলেন। ফলে, বিন্দু। 'এক' বিন্দু আপনাকে 'বহু' করিল। বহুতে আসিয়া হৃল্লেখা, নাভি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বীজ বা কারণের আকৃতিটিও লইল। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ নাভিতে বা কেন্দ্রে পরম ব্রহ্মের অধিষ্ঠান রূপে, প্রাণব্রহ্মের অচিন্ত্য-অব্যয়-শক্তি-নির্জ্জররূপে, উত্তমের সর্বাধ্যক্ষতারূপে—এই তিন রূপে 'সামান্য' প্রশাসনটি থাকেই। এ তিনটি ছাড়া আরও এক মৌলিক প্রশাসনের আবশ্যকতা হয়। সৃষ্টির উন্মেষে বিশেষ বিশেষ নাভি, কেন্দ্র তো 'প্রত্যেক' (individualized) হইয়াছে। অথচ, প্রত্যেকেই

ব্রহ্মগোত্র, বিন্দুগোত্র। বহুত্বকে (manifold কে) একত্বে, বিশেষকে সামান্যে ফিরিয়া না পাইলে তো সৃষ্টিতে অন্যোন্য সম্পর্ক, ছন্দঃ, শৃঙ্খলা—ইত্যাদি কোন প্রকার ব্যবস্থান ও সংস্থানই সম্ভাবিত হয় না। সবই যে 'আলগ' হইয়া ছড়াইয়া থাকে, পরস্পরের সঙ্গে আকৃতি-শক্তি-ছন্দঃ-সম্বন্ধে 'গাঁথা' হয় না, যেমনটি তারা রহিয়াছে। শুধু প্রাণের একটা বিন্দু, অথবা চেতনার একটা ভাব বলিয়া নয়, একটা ধূলির রেণুও অসীম বিপুলের মাঝে একা নয়, নিঃসম্পর্ক নয়, বিধূত অবধূত নয়। তার বাহিরে সমস্ত কিছুর সাথে সে সর্বতোভাবে গাঁথা; আর, এ বিশ্বগাঁথুনির মূল গ্রন্থিটি সে আপন নাভিগ্রন্থিতেই রাখিয়াছে। সেই ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত। সেও যে আপনভোলা 'বিশ্বে দেবাঃ' এবং 'বিশ্বকর্মা'! তাতে যা আছে, অন্যত্রও তা আছে, তাতে যা নেই, কোথাও তা নেই। এই অদ্ভুত রেণুগ্রথনটি সম্ভাবিত হইয়াছে কিরূপে? প্রাণব্রহ্ম 'সূত্রাত্মা' রূপে সব কিছুকে গাঁথিবেন (সত্তায়, শক্তিতে, আকৃতিতে, ছন্দে)—এই সঙ্কল্পন করিয়াছেন বলিয়াই। অধিষ্ঠান-আধার রূপে তিনি আছেন; আমাতে, তোমাতে, তাতে প্রাণ, বিন্দু, অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী রূপে অনুপ্রবিষ্টও আছেন; কিন্তু, 'সূত্রে মণিগণা ইব' আমরা সবাই ভেদবিরোধাদিসত্ত্বেও, মহাসঙ্গতি-সমন্বয়ে গাঁথাই আছি কিসে? দেশে ও কালে অসীম বিশ্বে ঐ সুদূরের মহাভাস্বর তারা, আর এখানকার এই নগণ্য তৃণ—একই পরম বিস্ময় নৃত্যে ও সঙ্গীতে সমদরদী সুরে ও ছন্দে গাঁথা যে!

'সূত্রাত্মা' কেন?

'সূত্রাত্মা' বলা হইল এই জন্য যে সকল প্রিয়মের, প্রেষ্ঠতার আকরভূমি যে আত্মা, সেখান পর্যন্ত না সন্ধান করিলে, অর্থাৎ, আত্মরসে অপর সব কিছুকে একান্ত মরমীরূপে আপনাতে যুড়িতে না পারিলে, কারুর সাথে কারুর সম্পর্কই তার প্রাণের নাড়ীটি খুঁজিয়া পায় না। স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে একের সাথে অন্যের যে যোগসূত্র, মিলনসেতু, সেটিকে একেবারে এই একান্ত রসসন্দোহ ও রসনিষ্কর্ষ ভূমিতে না পাতা পর্যন্ত, সে সূত্র নিয়ত, নিশ্চিত, নিগূঢ়, নির্ব্যূঢ় হয় না। ব্রহ্ম স্বয়ংই এ 'সূতোর' টেকো ও তুলো; প্রাণরূপে টেকো ঘুরাইয়া যাইতেছেন; উত্তমরূপে হইতেছেন তন্তুবায় সূত্রকর; আর, সূত্রাত্মারূপে নিজেই হন সুতো। বেদের ঋষিরাই তো বয়নের উপমাটি

ভালবাসিতেন! এ সূতো তো যেমন তেমন নয়— 'সোণার সূতো'—হিরণ্যের, হিরণ্ময়। সূতো কাটার তো অন্ত নেই! সৃষ্টি বিশাল, তবু তো এতাবতী—'এতটুকু'! এটাকে গাঁথিতে কতটাই সূতো লাগে! তাই, এক পরমাশ্চর্য নৈতাবতীর রীলে বা নাটাই-এ অতীত-অনাগত সকল সূতোই জড়ান' থাকুক, আর, সে অদ্ভুত নাটাইকে ডেকে বলা হোক্—'তুমি সব সূতো আপন জিম্মায় রাখ, আর, তার যোগানের তদারকী কর'। এ তদারকী ভারটি দেন কে? সেই মূল অধ্যক্ষর—উত্তম পুরুষটি। সূত্রান্বয়ের ভাণ্ডার ভার এঁতে বর্তিল, আর, সূত্রও আবার হিরণ্যের, তাই এঁকে বল—হিরণ্যগর্ভ (অন্বক্ষর)। প্রাণ, সূত্রাত্মা এবং হিরণ্যগর্ভকে ঐ উপমার উপমানেই এখানে বুঝিয়া লও। বিশ্বে সূক্ষ্মের পরিসীমা পর্যন্ত যে 'অন্বয়' (হিরণ্যসূত্র), সেটি 'গর্ভিত' (implicated) কোথায়?—এই প্রশ্ন।

নাদ ও সূত্রাত্মা

প্রণবাদি জপে, বিন্দু প্রাণব্রহ্ম পরমঘনীভাবে; নাদ তাহাই পরমবিতানে; কলা তাই আবার পরমকলনে এবং কলিতফলনে। পূর্বের বাচনীতে বিন্দুকে বল প্রাণ, নাদকে সূত্রাত্মা, কলাকে হিরণ্যগর্ভ। এ কলা অবশ্য মাধ্যমী কলা। আদিমা কলনী কলা এবং অন্তিমা ফলনীকলার মধ্যে যেটি স্থিতা—Evolvent এবং Evolute -এর মাঝে Evolving; স্বঃ আর ভূঃর মাঝে ভুবঃ।

অক্ষরপ্রশাসনে পাদপরিচয়

স্ফোটের কথা পরে আসিতেছে। এইবার, পশ্চাৎ অক্ষরপ্রশাসন আপন বোধবিন্দুতে (কেন্দ্রীণ সাক্ষিত্বে) স্থিত হইয়া দেখিয়া লও। অক্ষরপরম থেকেই প্রশাসনের মহাপর্বারম্ভ। অস্তিতা, ভাতিতা, প্রিয়তার একান্ত অধিষ্ঠানরূপ আদিম প্রশাসন। তদধিষ্ঠানে প্রাণপ্রশাসন—যন্নিমিত্ত সবকিছুই তাদের সত্তায়, ছন্দে, আকৃতিতে অফুরান শক্তিমান এবং ঋচ্ছতি লেখটি পাইতেছে। প্রাণকে Will-to-be and Will-to-become— এই দুইরূপেই দেখিবে। পরব্রহ্মের 'অচিন্ত্যশক্তি নির্জরা' যে প্রাণভূমিকা, তাতে পরমঘননী, পরমব্যাপনী এবং পরমকলনী-ফলনী (বিন্দু, নাদ, কলা)—এই ভাবত্রয়ী 'উদিত' হইয়া একমাত্রা পূর্ণমাত্রা এবং সর্বমাত্রা—এই

পরম মানত্রয়ে আপনাকে 'দেখায়'; তখন ব্রহ্ম (পরম) (সকল বিশেষের সম্বন্ধে 'শূন্য' রহিয়াও) হন 'উত্তম'। এইবার ব্রহ্ম হইলেন—অধ্যক্ষ, অধীশ্বর—আর, অধিষ্ঠানপ্রশাসন, প্রাণের মাধ্যমে এবং বিন্দু-নাদ-কলা সাহিত্যে, হইল অধ্যক্ষ বা অধীশ্বর প্রশাসন। উত্তমপ্রশাসন, প্রাণের 'আধারে', বিন্দু-নাদ-কলা—এই মূল মহাভাবত্রয়কে আপনাতে সম্মিলিত করতঃ। কাজেই, উহা চতুষ্পাৎ—প্রাণপ্রশাসন, বিন্দুপ্রশাসন, নাদপ্রশাসন এবং কলা-প্রশাসন। প্রাণ-প্রশাসনরূপে তিনি 'সর্ব্বভূতাধিবাস', সর্বনিধান; বিন্দুপ্রশাসনরূপে 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', 'সর্ব্বভুতান্তরাত্মা', 'সর্ব্বান্তর্য্যামী'; নাদপ্রশাসনে 'সর্ব্বব্যাপী', 'ঈশানো-ভূতভব্যানাং'; কলাপ্রশাসনে, 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ' ইত্যাদি। বিন্দুরূপে সমস্ত কিছুর 'বীজমব্যয়ং', নাদরূপে বীজের কাণ্ডাদিরূপে পরিপূর্ণ বিতান; কলারূপে সেই বিতানের আধারে বিচিত্র অবয়বাদির কলন এবং ফলন; আর, প্রাণরূপে বীজাদিরও 'জীবন'—'নিধানম্'। এবম্বিধ যে উত্তমপ্রশাসন, তার স্বাভাবিক বাক্ হইল—'অউম' বা ওঁ। লক্ষ্য কর যে, উত্তমের 'ত্ত' ওঙ্কারে 'উ' হইয়াছে। আর 'উ' হইয়াছে 'অ'। অর্থাৎ, উত্তমে তাঁর সৃষ্টিতে 'অবতরণের' যে ভাবটি নিহিত আছে, তাঁর স্বাভাবিকী বাক্ যে ওঙ্কার, তাতে সে ভাব, 'উত্তরণ' ভাবটি লইয়াছে। 'আমি তো তোমাতে নেমে এসেছি; এইবার তুমি তোমা থেকে আমাতে উতরে এস—ধামে ফিরে এস।' উত্তমে, Divine Descent; অউমে, Divine Ascent. শব্দদুটি উচ্চারণ করেই দেখ। ওঙ্কারের প্রশাসনে, কেবল সর্ববিধ বাকের নয়, সর্ববিধ বাচ্যেরও বিলোমাবৃত্তিটি অপগত হইয়া অধ্যক্ষর এবং পরমাক্ষর অভিমুখীনা যে অনুলোমাবৃত্তি, সেই বৃত্তি প্রবর্তিত হয়। এইজন্য, কেবল এই দেহের নয়, পরন্তু সৃষ্টির সর্বসংস্থাতেই, 'আজ্ঞা' বা প্রশাসন কেন্দ্রে ওঙ্কার স্বে মহিম্নি অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরুশক্তি, ঐঁ বীজরূপে, প্রথমতঃ সব কিছুর 'মূলাধারে' মহাকুণ্ডলীকৃত প্রাণকে হ্রীঁ বীজদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ করেন, এবং পরে, ঐঁ শ্রীঁ বীজদ্বয়দ্বারা ঊর্দ্ধগ এবং ছন্দোগ করেন। আজ্ঞায় যে ওঙ্কার, তাঁর প্রশাসনেই এই ত্রিধারার সুষ্ঠু সম্মিলন (অগ্রগা, ঊর্দ্ধগা এবং ছন্দোগার) সাফল্যে আসিয়া থাকে। অন্তে, 'আজ্ঞা'র আজ্ঞা পাইয়াই 'সহস্রারে' ধামগাকেও মিলাইয়া থাকে (ক্রীঁ বা ক্লীঁ বীজে)। সকল সমর্থ নামেই এই 'আজ্ঞার' আজ্ঞা মিলাইতে হয়।

‘আজ্ঞা’ এবং ‘চক্র’ প্রশাসন

পূর্বে চতুষ্পাৎ যে উত্তমপ্রশাসনের প্রসঙ্গা হইল, তন্মধ্যে প্রাণপ্রশাসনকে আধারে রাখিয়া, অপর ত্রয়কে ঈশ্বরপ্রশাসন, সূত্রাত্মা-হিরণ্যগর্ভ প্রশাসন এবং বিরাট্ প্রশাসন—এই তিনভাবে ভাবিয়া দেখিবে। অধ্যক্ষর, অন্বক্ষর, প্রত্যক্ষর কথাগুলো আগে বলা ও বোঝা হইয়াছে। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্তই ‘আজ্ঞার’ প্রশাসনে থাকিয়া ‘নিম্নের’ চক্রগুলিতে আপন আপন অক্ষর প্রশাসনাধিকারে রহিয়াছে। প্রতিটি ‘চক্র’ বিশেষ করিয়া এক এক তত্ত্বের ভূমি; এবং প্রতি তত্ত্বের প্রশাসন বীজ (লং ইত্যাদি) আছে। অর্থাৎ, চক্র যন্ত্র নয়, যন্ত্রম্। কাজেই, তার স্বশক্তি-আকৃতি-ছন্দের উপযোগী ভাবে আপন মন্ত্রম্ এবং তন্ত্রম্‌ও পাইয়াছে। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে পরব্রহ্মের প্রাণপ্রশাসনকেন্দ্র। সহস্রারে তিনি ‘উত্তম’—নিখিল তরতমতার পরিসীমারূপে বিরাজমান। আজ্ঞায় তিনি প্রণব, গুরুশক্তি ইত্যাকাররূপে নিখিলস্থিতিসৃষ্টিলয়ধারার অধ্যক্ষতা করেন; অর্থাৎ এখান থেকেই সৃষ্ট্যাদির মূলীভূত মিথুনভাবকে একদিকে যেমন অনন্তবিচিত্র ভেদপ্রপঞ্চে সৌষ্ঠবে অবতরণ করান, তেমনি আবার অন্যদিকে সেটিকে অচিন্ত্যভেদাভেদের ‘সামরস্যে’ এবং পরম অভেদের ‘একরসে’ নিষ্ণাত করেন। মিথুনকে করেন ‘যুগল’, আর, যুগলকেও করেন ‘কেবল’ অথবা, কেবলাতীত অলখ নিরঞ্জন’। প্রতিটি চক্রের কোরকে হিরণ্যগর্ভ; দলে বিরাট্; কোরককেন্দ্রে সেই ‘উত্তম’! সুষুম্না সূত্রাত্মা—সকল চক্রকেই প্রাণরসে যুড়িয়া ‘হংসঃ’ এবং আত্মরসে ভরিয়া, ‘সোঽহম্’।

অন্যভাবে, এই প্রশাসন মহাপাদপের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম স্বয়ং। জীবনীশক্তি, মর্মরস প্রাণ। বীজমব্যয়ং—বিন্দু। এর পরিপূর্ণ বিতানী নাদ। এতে কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্পফলাদির অনন্তকলনী কলা। এর মঞ্জরী স্ফুট স্বর, ফলপুষ্প ব্যক্ত ব্যঞ্জন। বৈখরীবাকে ‘স্ফুটরূপে অক্ষরপ্রশাসন; মধ্যমায় স্ফোটরূপে; পশ্যন্তীতে পরিস্ফুট ভাতিরূপে; পরায় প্রস্ফুট প্রিয়ম্‌রূপে (স্বলসিত প্রোজ্জ্বলরসে)।

পরিপূর্ণ প্রশাসনমূর্তি

এই সমগ্র, পরিপূর্ণ অক্ষর প্রশাসন মূর্তি ধ্যানে রাখিয়া তবে ভূতভৌতিক সর্ব যন্ত্রকে যন্ত্রম্‌রূপে বোধে, ব্যবহারে, উপলব্ধিতে মিলাইতে হইবে। বিজ্ঞানে যন্ত্রই সবকিছু

ছিল, এখনও সে যন্ত্রমের পানে একটি পাদ বাড়াইতে পারিয়াছে মাত্র। এখনও ‘এই’ আর ‘সেই’-এর মধ্যে যে সেতু, যে বিধৃতি, তার সন্ধান সে পায় নাই। এতাবৎকে নৈতাবতে লইতেছে বটে (যথা, এটমের বিকিরণে), কিন্তু প্রাণের সাড়া নেই, এবং প্রাণের আজ্ঞাবহা যে সুষুম্না, তারও কোন সজাগ শিহরণ নেই। কাজেই, নৈতাবতী দিতিগর্ভেই, অদিতির গর্ভে জাত হইতেছে না। মহতী বিনষ্টির আতঙ্ক! প্রজ্ঞানে যন্ত্র ও-ভাবে নেই; যন্ত্রম্ আছে। তুমি, আমি নিছক যন্ত্র কেহই নই। তোমার আমার মাঝে যে আজ্ঞা, সে আজ্ঞা, অন্ধনিয়তির আজ্ঞা নয়; যে প্রশাসন, সে প্রশাসন পরম এবং উত্তমেরই প্রশাসন। এ প্রশাসনে ছন্দঃ আছে, লীলাও। শ্বেতাশ্বতরের মন্ত্রটি স্মরণ কর— “একো দেবো সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥”

৩। অনপেক্ষাক্ষরত্বমধিষ্ঠানত্বম্।।

অক্ষরবস্তু (সর্বতোভাবে) অপেক্ষারহিত স্থিতিতে অধিষ্ঠান।

সৃষ্টিতে কামাদি চতুষ্টয়

সৃষ্টি এবং তৎপ্রশাসাদিকল্পে অক্ষরপরম ‘কাম’, ‘তপঃ’, ‘সঙ্কল্পন’ এবং ‘ঈক্ষণ’,—প্রধানতঃ এই চারিটি ভাবে নিজেকে ‘দেখান’। বাকে ওঙ্কাররূপ হইয়া বিন্দুতে হন কাম; নাদে ঈক্ষণ; কলায় সঙ্কল্পন; অর্দ্ধমাত্রায় তপঃ। এ চতুষ্টয়ে ঈক্ষাকে (নাদকে) বিশেষভাবে লও, কেননা, নাদ ও ঈক্ষণরূপেই সবকিছুই ‘ব্যক্তিমাপন্নং’ হয়, অভিব্যক্তিতে আসে। ঈক্ষণই ‘দেখে’ এবং ‘দেখায়’। এটি ব্যতীত সবই যেন নেপথ্যে। ওঙ্কারাদি জপে পরাব্যক্ত বিন্দু (পরমকাম) থেকে নাদই ‘উদিত’ হন, এবং কলাবিতান ছন্দোগ পাদে এবং মাত্রায় করিয়া, পুনশ্চ বিন্দুতেই ‘বিলীন’ হন। উদয় এবং বিলয় সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা (তপঃ)।

ঈক্ষণে ‘অপ’

এখন, ঈক্ষা বা ঈক্ষণ হইলেই তাতে ‘অপ’, এবং ‘উপ’ ইত্যাদি ভাবসমূহও বীজ থেকে অঙ্কুরাদির মত ফুটিয়া ওঠে। ঈক্ষণ হইল, কিন্তু কে করিল এবং কি বা

কাকেই বা করিল? চণকের বীজে দুইটি দানার মত কে এবং কি পরস্পরকে জড়াইয়া থাকিলেও, তাদের ব্যবধানবীজটি (অন্তরিক্ষ) নিহিত থাকে। পরস্পরের আলিঙ্গান মুক্ত হইয়া 'কে' যখন 'কি' কে আপনা থেকে যেন পৃথক্ 'আর কেউ' করিয়া দেখিল, তখন ঈক্ষা হইল 'অপেক্ষা' (relation, relatedness)। বিন্দুতে নাদ-কলা দুই-ই সম্মিলিত ছিল (in unthinkable coalescence)। অর্দ্ধমাত্রা ঋধ্যমানা হইয়া (অর্থাৎ তপঃ) নাদকলাকে বলিলেন— 'তোমরা দুটিতে অপেত হও, নিজেদের আলাদা করিয়া ফোটাইয়া লও'। অর্দ্ধমাত্রাই বিন্দু কেন্দ্রের দুদিকে দুই সেতু পাতিলেন; একটি 'অপ' (উদয়ে), অন্যটি 'উপ' (বিলয়ে; উপনীত হও)। বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে 'অপেত'; কিন্তু ফলে আবার বীজ, সুতরাং, 'উপেত'। অন্তর্বহিঃ সমস্ত কিছুতেই এই মৌলিক অপেত-উপেত ভাবটি বুঝিয়া লইবে। ব্রহ্মের যে ঋচ্ছতিরূপ, সেটি এই মূল দ্বন্দ্বকে লইয়া প্রবৃত্ত হয়। বিন্দুব্রহ্মে একত্র শূন্য পূর্ণ রহিলেও, জগৎ-প্রতীতিতে বিন্দুর শূন্যের পিঠটাই (পরাব্যক্ত ভাবটাই) দেখি; পূর্ণের দিক্‌টা অপিহিত; নৈষ্কল্যের দিক্‌টাই যেন এদিকে ফেরান'। আবার সেই বীজ লইয়া বোঝ। বটের বীজ ভাঙ্গিয়া ওতে কৈ বটের কিছু দেখিলে না!

চারিটি অবস্থান

যখনই যেখানে কোন কেন্দ্রবিন্দু থেকে (from 'origin') ব্যাপারপ্রবৃত্তি সুষমভাবে হইতেছে (যেমন, জপব্যাহরণে), ব্যাপারের চারিটি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, বিন্দু থেকে 'অপেত'; দ্বিতীয়, 'সমেত', কিনা, সম, সুষমভাবে 'ইত'; তৃতীয়; 'উপেত' (বিন্দু প্রত্যাবর্তনে); চতুর্থ, বিন্দুস্থিত বা 'সমবেত'। এখন, যা কিছু বিন্দু থেকে অপেত, সমেত এবং বিন্দুতে পুনঃ উপেত, সে সবই বিন্দুগর্ভে সমবেত রহিয়া একান্ত শূন্য অবশ্যই হয় না; বস্তু এবং বৃত্তি দুই-ই এখানে আসিয়া বলে— 'আমরা এখানে পূরা হইয়াছি, অপেতাদি তিনটি-ভাব আর আমাদের নেই।' এই যে সমবেতভাব, তাকে বলা হোক 'সাকল্যশূন্যতা'। অর্থাৎ সাকল্য এবং সাফল্য দুই-ই পূরা হওয়ায় অপেতাদিভাবত্রয়ের যে অনবকাশ ও অবসান, তাই। কিন্তু যেহেতু বিন্দু ব্রহ্মকামের পরমঘনীভাব, ব্রহ্মের ঈক্ষণ, সঙ্কলন এবং

তপঃ—এই ভাবত্রয়ের অপেক্ষাবীজটি বিন্দুতে নিহিত থাকে। ব্রহ্ম প্রাণপর্বে না আসিলে তো তাঁতে ঘননী, ব্যাপনী, তায়নী প্রভৃতি কোন ঋচ্ছতিরূপই আসে না। কাজেই, বিন্দু, নাদ, কলা, শুদ্ধ অনিরুক্ত, অলক্ষণ, অপ্রমেয়, অব্যবহার্য যে ব্রহ্মস্বরূপতা, তার 'সম্পর্কে' নেই; প্রাণব্রহ্মের, কিনা, ব্রহ্মের প্রাণরূপতায় আছে। পরমতত্ত্ব তাই বিন্দুনাদকলাতীত। সম্পর্ক বা সম্বন্ধ 'অপেক্ষা' ব্যতীত হয় না। যেটি শুদ্ধ অবাঙ্মনসগোচর, তা থেকে 'অপেত' (যেন সরিয়া) যে ঈক্ষা, সেইটি হইল অপেক্ষা। 'ততে' পরমমগ্নতায় এটি রহে না। পুনশ্চ সেই ভান এবং ভাস পরীক্ষা কর।

অপেক্ষার অপসর্পণ (elimination)

এখন, অপেতভাব, কিনা অপেক্ষাকে, এক এক সংস্থায় শূন্যে আন, অবশ্য সেই পরমাব্যক্তেরই (Absolute এর) তল্লাসে। বিন্দু,কিনা, পরাব্যক্ত থেকে ব্যক্তাব্যক্ত সেতু সহায়ে নাদ উদিত হন ওঙ্কারাদি জপে। এই উদয়ে 'অপেত-ভাব'টি ঘটিল; কাজেই; 'অপেক্ষা' আসিল। বিলয়ে এই অপেতভাব এবং অপেক্ষাকে যথাসম্ভব শূন্যে লইতে হয়, অথবা পাইতে হয়। লওয়া বা পাওয়াটি পুরা হইলে, যেটি বিন্দু থেকে অপেত, সুতরাং সাপেক্ষ হইয়াছিল, সেটি বিন্দুতে, বিন্দুস্থিতি সম্পর্কে, অনপেত, অনপেক্ষ হইল। কিন্তু এতে, কিনা শূন্য-পূর্ণে সমবেতস্থিতিতে, পরম অনপায় এবং একান্ত অনপেক্ষাটি সংসাধিত হইল না। সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা অপেত-উপেতের (+, -) দিক্ থেকে তাঁর 'মুখ'টি ঘুরাইয়া পরাব্যক্ত বিন্দুস্থিতি থেকে পরমাব্যক্ত ব্রাহ্মীস্থিতিতে নেবার চরমা বা পরমা (তুরীয়া) সেতুটি হইবেন, তবে না একান্ত অনপায়, অনপেক্ষ 'ধাম' অধিগত হইবে!

অপেক্ষার পর্বপরম্পরা

সুতরাং, অপেত এবং অপেক্ষার পর্বপরম্পরা রহিয়াছে। শ্রুতির সেই 'ব্রহ্মলিঙ্গা' এবং 'ব্রহ্মস্বরূপ' আকাশকে যেরূপ 'ততো জ্যায়ান্' ক্রমে 'পরোবরীয়ান্' ভাবে অধিগমের পন্থাঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, অনপায়-অনপেক্ষধাম সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিবে। ক্ষিতি থেকে সুরু করিয়া বায়ু পর্যন্ত সকল 'সাপেক্ষ' সম্বন্ধে যেমন আকাশ

অনপায়-অনপেক্ষ, সুতরাং অধিষ্ঠান, তেমনি, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, সমষ্টি-ব্যষ্টি নিখিলের অধিষ্ঠান কি বা কোথায়—যেটি না মেলা পর্যন্ত এই ক্ষরাক্ষর প্রবাহে একান্ত সুস্থির অধিষ্ঠানটি মিলিল না। জড়ের ক্ষেত্র, প্রাণ এবং মানসের ক্ষেত্র—সকল ক্ষেত্র থেকেই ধ্রুবৈক-অধিষ্ঠান-অন্বেষণ সুরু হইয়াছে, অগ্রসরও কিয়দ্দূর হইয়াছে; কিন্তু সরণীসমূহ এখনও ‘বহুশাখাঃ’—একমুখী হয় নাই। তবে সকল সরণীযাত্রীই বুদ্ধিযোগে আরুরুক্ষু—এইটাই ভরসার কথা। কেননা, ঐটি আসিলে তবে যুঞ্জান, যুক্ত প্রভৃতি। কিন্তু যোগের লক্ষণ এবং লক্ষ্যই হইল—যৎকিঞ্চিৎ ব্যস্ত-ব্যগ্র (prone in divergence), সেটিকে সমস্ত-সমগ্র করিয়া লওয়া। এই নিমিত্ত, যাহা ‘সরণ্য’ বা সরণীয় (end to be aimed at and pursued), এবং তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত ‘সরণী’ (ways and means), তাদের মধ্যে ‘অপেত’ ভাবটি ক্রমে গৌণ ও হ্রস্ব করিয়া সরণ্যকে শরণ্য এবং বরেণ্যরূপে মিলাইতে হয়; এবং সরণীও হইতে থাকিবে ঋজু ঋতস্য পন্থাঃ। জপাদি যে সাধনই করি, লক্ষ্য এবং উপায় হইল—সরণিশোধন (শরণ্যম্) এবং বরেণ্য-বোধন (বরেণ্যম্)। ওঙ্কারে আদিস্বর অকার কি করে? নিখিল সৃষ্টিতে এবং সাধনে ঋজু যে ঋতস্য পন্থাঃ (সরণি), তার অনুক্রম ও অনুবৃত্তি ঘটায়। উকার দ্বারা এবং মকার দ্বারা যেটির ঋজু-ঋতভাবে অনুসরণ হইতেছে, সেটি শ্রেয়ের সাক্ষাৎ প্রশাসনে আসিয়া হয় ‘শরণ্যম্’, এবং নিঃশ্রেয়সের স্বাধিকরণ বরণে আসিয়া হয় ‘বরেণ্যম্’। ‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’। সমস্ত কিছুতে (বাহ্য স্পর্শাদিতে) অনাত্মভাস পরিহার করতঃ আত্মৈকবুদ্ধি না আসা পর্যন্ত, শরণ্যম্-বরেণ্যম্ দ্বয়ের দ্বার সম্পূর্ণ অবারিত হয় না। এই নিমিত্ত অকারে অধ্বন্বী (অধ্ববান্), উকারে মনস্বী এবং মকারে এবং অর্দ্ধমাত্রায় আত্মন্বী, ধামন্বী হইতে হইবে।

ধ্রুবৈক অভিক্রমণ

এ সমস্ত পর্বটাই হইল ধ্রুবৈক-অধিষ্ঠানের পানে অভিক্রমণ। কিন্তু আগে বলা হইয়াছে যে, অনপেত-অনপেক্ষ যে অক্ষরধাম (সুতরাং লক্ষণমত পরম অধিষ্ঠান), সেটি এই আকাশের মত ‘ততো জ্যায়ান’ ভাবে মিলাইতে হয়। ‘নেতি নেতি’ দ্বারা, যাহা কিছু অপেত-সাপেক্ষতায় আসিয়াছে তাদের, সকল অপায়-

অপেক্ষা পরমে উপশমে না আনা পর্যন্ত, আত্মাই যে সর্বের অধিষ্ঠান, ইহা অনুভবে আসে না।

কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ?

সৃষ্টির যে কোন 'তল' থেকেই এই যাত্রা সুরু হইতে পারে। বিজ্ঞানাদিতে হইতেছেও। Space-Time Continuum অধিষ্ঠান-অন্বেষণের কোন পর্ব পর্যন্ত লইয়া গেল? প্রাণে ও মানসেই বা বিজ্ঞানের গতি কি অবধি? 'পরায়ণ' তো এখনও শুধু মনন নয়, কল্পনারও পারে! সাধনের ক্ষেত্রে এটি অন্তরঙ্গা প্রশ্ন—চ'লেছি তো, কিন্তু কোথা শেষ দাঁড়াবার ঠাঁই? এমন কোন ঠাঁই কি আছে, যেখানে গেলে আর ঠিক্‌রে ফিরে আসতে হবে না (অচ্যুত পদ)? জপে কলিত-ফলিত কলাবিতান (অ, উ, ম ইত্যাদি) ঊর্মির মত কোন্ আধারে উঠিতেছে পড়িতেছে, তা অগ্রে জান। সে আধার ব্যক্তনাদ। সে ব্যক্তনাদ অপেত এবং উপেত হয় পরাব্যক্ত বিন্দু থেকে এবং বিন্দুতেই সেতু সহায়ে। সেতু তৎসম্পর্কে বিধৃতি, আশ্রয়। বিন্দু তৎসম্পর্কে বীজ এবং আলয়। প্রাণব্রহ্ম নাদবিন্দুকলা সম্পর্কে আধান এবং নিধান। আধানরূপে বিস্তার, এবং নিধানে ঘনীভাব। যিনি অধ্যক্ষর, তিনি 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'! এবং শেষে, পরমাক্ষর ব্রহ্ম বা আত্মাই অধিষ্ঠান। এখানে অপেত-অপেক্ষার ঐকান্তিক অবসান। বিন্দুতে ব্রহ্মের সাকল্য-শূন্যতা; অধিষ্ঠানে নৈষ্কল্য-শূন্যতা। অধিষ্ঠানে নির্দোষসমতাস্থিতি। এরূপ নির্দোষ নির্ব্যূঢ় সমতায় না আসিলে কোন কিছুই ঐকান্তিক অনপেত, অনপেক্ষ হয় না। এই যে অধিষ্ঠানে স্থিত হবার অধিরোহিণী কথিত হইল, তাতে এমন মনে হয় না যেন যে—অধিষ্ঠানে পৌঁছিলেই অধিরোহণীটি (সিঁড়ি) অনাবশ্যক, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ফেলিয়াই দিতে হইবে। অর্থাৎ, 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' যে ভগবত্তা, তাতেই বা তার তখন কি কাজ? এ প্রশ্নের মর্ম প্রণিধানের নিমিত্ত সেই মহামায়াসূত্রটি আবার ধ্যান কর। নিষ্কল পরমশিব ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বে পরম অধিষ্ঠানরূপে আছেনই; কিন্তু শক্তি, শিবশক্তিসামরস্য, সদাশিবাখ্যাদি তত্ত্ব, অধিষ্ঠানের পরম শূন্যতাকে পরমপূর্ণতায় দেখাইয়াছেন। পরমবিন্দুরূপে শূন্যতা এবং পূর্ণতাকে মিলাইবার 'স্থল'টি পরমাধিষ্ঠানেই নিষ্ঠিত রহিয়াছে। কারিকা—

অপায়াদীক্ষয়াপেক্ষা নির্দ্দোষসমতাস্থিতেঃ।
তদৈক্ষতেতি যান্নাতা খ্যাতীনাং যোনিরেব সা॥
যা প্রমাপ্রময়োস্তুল্যা ব্যোমেক্ষণাদ্ যথানিলঃ।
শুক্তীক্ষণাত্তথা রৌপ্যং ভেদস্ত্বাপেক্ষকৈঃ কৃতঃ।
প্রপঞ্চোপশমঃ শান্তঃ শবসাক্ষিসদাশিবঃ॥ ১৫৯-১৬১

নৈষ্কল্য শূন্যতা এবং ‘খ্যাতি’

নির্দোষসমতাস্থিতিরূপ যে নৈষ্কল্যাধিষ্ঠান, তা থেকে ‘অপেত’ হইয়া যে ‘ঈক্ষণ’ বা ঈক্ষা, তা থেকেই ‘অপেক্ষা’। শ্রুতি সৃষ্টিকল্পে ‘তদৈক্ষত’ ইত্যাদি বলিয়াছেন—এই অপেক্ষাকে উদ্দেশ করতঃ। সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অনির্বচনীয় খ্যাতি ইত্যাদি যে সব খ্যাতিবাদ আছে (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্তে), সে সব খ্যাতিরও ‘যোনি’ এই অপেক্ষা। ব্যোম বা আকাশের ঈক্ষণে মরুৎ (অনিল) হইল। শ্রুতিকথিত এই ঈক্ষণ ‘প্রমা’ (ব্যবহারিক যথার্থজ্ঞান) রূপে গণ্য; কিন্তু শুক্তির ঈক্ষণে রৌপ্য—এটি অপ্রমা (প্রাতিভাসিক); কিন্তু প্রমা-অপ্রমা উভয় স্থলেই যেটি পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বাধিষ্ঠান, তা থেকে ‘অপেত’ হইয়াই ঈক্ষণ (‘seeing’ the Given-in-itself and as such) ঘটিতেছে। প্রমা আর অপ্রমার মধ্যে যে ভেদ, সে ভেদ অপেক্ষামাত্র দ্বারা হয় না। অর্থাৎ, এমন নয় যে, প্রমায় অপেক্ষা (অপেত হইয়া ঈক্ষণ) নেই; অপ্রমাতেই সেটি আছে। ভেদ অপেক্ষা নিমিত্তক নয়; পরন্তু আপেক্ষিক নিমিত্তক—অর্থাৎ, অপেক্ষার সঙ্গে অন্য অন্য যে সব হেতু থাকে, তাদের জন্যই। অস্মদাদির অসম্পূর্ণ-খ্যাতিতে তত্ত্বসামগ্রী এবং তদধিষ্ঠানসম্পর্কে জ্ঞান তো ব্যবহারেও ঠিক প্রমা নয়। বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে তার অহরহঃ শোধন-সম্পূরণ চলিতেছে। পূর্ণজ্ঞানেও যে ঈক্ষণ, সেটিও ‘অপেত’। কেননা সেখানেও পূর্ণপ্রমাতা তাঁর পূর্ণপ্রমেয়কে ‘এই’ রূপে দেখিতেছেন। সুতরাং, সেখানেও অপ্রমেয়, অব্যবহার্য, অনিরুক্ত, অলক্ষণ তত্ত্বসামগ্রী এবং তদধিষ্ঠান আর সেরূপটিতে নেই; Alogical Absolute Perfect Logical হইয়াছে। ফলতঃ, ঈক্ষণ-এর গোড়ার কথাই এই অপেতভাব—Emergence of Relatedness out of the Absolute. অপ্রমার বেলা এই সামান্যাধারে অন্য অন্য হেতুও আপতিত

হয়। আর, এই সামান্যাধারেরও অধিষ্ঠানরূপে কি নিত্য থাকেই? অস্তিতা, ভাতিতা এবং আনন্দ। সে অধিষ্ঠান 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং'। এই একান্ত ধ্রুব এবং 'অনপেক্ষাক্ষর' অধিষ্ঠান না পাইলে তো কিছুই একান্ত অপেক্ষারহিত ভাবে স্থির ও শান্ত হয় না। 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—যেটি সূরিরা ঈক্ষণ করেন, সে ঈক্ষণেও 'পরমপদ' (the Absolute as such) অপেক্ষায় নামিয়া আসেন। বাগাদিরূপে অপেক্ষায় অবতরণই হইল গঙ্গাদির অবতরণ—আগে বলা হইয়াছে। জপাদি সাধনের লক্ষ্য হইল সেই অধিরোহণীধারা সমাশ্রয়ে অধিষ্ঠানভূমি পর্যন্ত—পরমপদে—প্রত্যাবর্তন। ভগবত্তা-প্রসাদ-প্রপত্তি ব্যতীত এটি যে হবার নয়, তাও বারংবার বলা হইয়াছে। ওঙ্কার, মহানাম, মহাবাক্যাদি প্রপত্তি ভগবৎপ্রপত্তিই। তবে যে পথেই হোক, অনপেক্ষাক্ষরভূমি বা অধিষ্ঠান পর্যন্ত অগ্রসর হইতেই হইবে। নচেৎ, সাপেক্ষ। লীলাসাপেক্ষ পক্ষও এতে বিপক্ষ গণিবেন কি?

সাক্ষিত্ব

কারিকার শেষে আছে—'শবসাক্ষি-সদাশিবঃ'। আবার সেই কালীরূপের ধ্যানে যাও। মায়ের পদতলে 'শবশিব' এবং 'সাক্ষিশিব'—এই দুটি ভাবই দেখি। প্রথমটিতে, ঈক্ষণব্যাপার নেই; পরমশিবরূপে শুদ্ধ অধিষ্ঠান। দ্বিতীয়টিতে, ঈক্ষণ আছে, সাক্ষিত্ব আছে; কাজেই পরমাধিষ্ঠান থেকে 'একটুখানি' অপেতভাব—শিব মাথা তুলিয়া দক্ষিণবাহুতে ন্যস্ত করিয়া মাকে আমার দেখিতেছেন! এঁকে সদাশিব বলিবে? নিত্যকালী আর সদাশিব—কাল-কলনের ঊর্দ্ধেই এখনও। 'বৌদ্ধ পরিণাম' (logical process) আর কাল পরিণাম (temporal process)—এ দুয়ের ভেদ মনে আছে তো? একটা বৃত্তের ধর্মগুলি পরপর 'বাহির' করিয়া 'দেখিতে' হয়; কিন্তু তারা সবই একসঙ্গেই আছে।

শবশিব ও সতীশব

আগে কালিকাষোড়শীর শেষের শ্লোকে অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠিত তত্ত্বটি সমবলোকিত হইয়াছে। 'কৈবল্যং বিদধাতি নির্গুণতয়া দ্বৈতং মরীমৃজ্যতে'—নিখিলদ্বৈতের মার্জনপূর্বক কালিকা (একাধারে গুণময়ী, গুণাশ্রয়া এবং গুণাতীতা) কৈবল্য-

বিধায়িনী। কিন্তু এইসঙ্গো সতী দাক্ষায়ণীকেও ধ্যান কর। দক্ষ প্রজাপতি শিবহীন যজ্ঞে (সৃষ্টিকর্মে) প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে, সতীর প্রাণত্যাগ। শিবের স্কন্ধে সতীশব। আগের চিত্রে শবশিব; অত্র সতীশব। আগে শিব শুদ্ধ অধিষ্ঠানমাত্র অথবা সাক্ষিত্ববিশেষিত অধিষ্ঠান। এখানে তিনিই তাণ্ডবনৃত্যপর। সৃষ্টি প্রলয়োন্মুখ। বিষ্ণু (পাতা) তাঁর 'সুদর্শনে' সতী-অঙ্গা খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাতে সৃষ্টির রক্ষা ও পালন হইল। সতী-অঙ্গাসমূহে হইল একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ। একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণসংখ্যা জানা আছে। কিন্তু এটি এক রহস্যসংখ্যা। ৫×১০+১=৫১; ২×২৫+১=৫১; ৩×১৭=৫১; ইত্যাদিরূপে সংখ্যাটি মেলে। এ সংখ্যাগুলি সৃষ্টি-স্থিত্যাদি প্রকরণের অনুবন্ধে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। পাঁচে পঞ্চ মহাভূত; দশে দশধা অভিব্যক্ত প্রাণ; এবং মূলে অক্ষর বস্তু এক। পাঁচটি ভূতসূক্ষ্ম (তন্মাত্র), দশ প্রাণ (অথবা ইন্দ্রিয়), মন এবং বুদ্ধি (অথবা অহঙ্কার ও বুদ্ধি)—এইগুলি মিলিয়া ১৭। ইত্যাদি।

বাক্—দৃষ্টান্ত; সমনী, উন্মনী

এখানে বাক্, সুতরাং মন্ত্রের, অনুবন্ধে রহস্যসংখ্যাটি গ্রহণ কর। 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং' যে অক্ষরাধিষ্ঠান, তার কোন বাগবীজ অবশ্য নেই। সেটিকে যদি বল পরমশিব, তবে সে পরমশিবও কোন বীজবাচ্য নন। এইবার সাক্ষিত্বাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমবস্তু বাগবিশেষণ-বিশেষিতও হইলেন। ধর, তাঁর বীজ হইল 'হৌং'। মাতৃকার শেষবর্ণে, হকারে, শক্তির অখণ্ডত্ব এবং সমগ্রত্ব সন্নিবেশিত। এই অখণ্ড-অনন্ত-শক্তিমান্ রূপে হইলেন হ+ওম্=হৌং। নিখিল শক্তিবিন্দু এবং শক্তিধারার (all centres and lines of power manifestation) এই মহাসিন্ধুতেই পরিসমাপ্তি, পর্যবসান। পরমশিবে যদি ভাব স্বারস্য, তবে এ স্থলে কি? শিবশক্তি সামরস্য? বটে; সামরস্য এ স্থলে নৈষ্কল্য এবং 'উন্মনী' প্রবণতা; যেমন, ওঙ্কারাদি জপে বিলয়ের সেতুতে। উদয়ে সাকল্য এবং 'সমনী' প্রবণতা। সামরস্যটি ঠিক স্বচ্ছন্দ-সমতায় থাকিবে কোন্ বীজে? সে বীজ আমাদের সেই পূর্বালোচিত হৌংসঃ বীজ। উমা হৈমবতী, কালিকা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বীজ, এবং রাম, কৃষ্ণাদি মহানাম এই পরম 'সামান্য'

আকৃতিতে আসেন। এ বিচারে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি ভেদ নেই জানিবে। এখন, ঐ যে সামরস্য-সাম্য, ওটিকে কোন রকমে ভাঙ্গিতে দাও (যেরূপ দক্ষযজ্ঞে)। 'হৌং' সমস্ত কিছুকে অবশ্য 'নৈষ্কল্য-উন্মনীতে টানিয়া লইবেন; 'সঃ' (শক্তির স্বতঃ-সর্বতঃ বিক্ষেপ) তাঁকে বলেন—'টানিবে টানো; তবে, সাকল্য-সমনীকেও উদিত, বিকশিত হইতে দাও; সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-এ তিনই চলুক, স্বচ্ছন্দে চলুক।' কিন্তু, 'সঃ' যদি 'স্থাণু' হন, 'স' মাত্র হন, কাজেই, হৌংকে আর সৃষ্টিস্থিত্যাদির আধার-ভূত স্বচ্ছন্দ সামরস্যে না রাখেন, তবে কি হয়? শিবের স্কন্ধে ঐ সতীশব। 'সতী' নামে 'সৎ' (অস্তি) এবং 'ঈ' (উর্জ্জিতরূপে ভাতি)—এ দুয়ের ব্যঞ্জনা এ প্রসঙ্গে ধ্যানে লইও। এই 'সতী' শব (static, inoperative, alien) হইলে সমতাটি রক্ষিত হয় না। 'হৌং'-এর একান্তকেন্দ্রীণা বৃত্তি 'সঃ' এর প্রসারিণীবৃত্তির সাহিত্য থেকে বঞ্চিত হয়; 'প্রিয়ম্' অস্তি-ভাতির পক্ষপুটদুটি মেলিতে যেন অসমর্থ হয়।

'হ' এবং 'স' এর সামরস্য

'হ' এবং 'স' এর সামরস্য বৈরস্যে আসিলে তো নিসর্গের রক্ষা এবং পালন হয় না। হৌংতে শিবশক্তি in coalescence; অনুস্বারের, সুতরাং তদধিষ্ঠিত বিন্দুর, সমস্ত কিছুকে আত্মনিপুটিত করার 'ঝোঁক'। নিসর্গরক্ষা হইতে গেলে শুধু 'স' নয়, বিসর্গেরও আবশ্যকতা, অর্থাৎ, সঃ। এটি হইবে কি উপায়ে? যিনি পাতা, তাঁর সুদর্শন দ্বারা। সতী শবরূপে স্তব্ধসমাধিতে সংবৃতা ও অব্যক্তা। তাঁকে স্বরব্যঞ্জনমাতৃকারূপে বিবৃতা ও ব্যক্তা না পাইলে ওঙ্কারপ্রমুখ কোন বীজই সৃষ্ট্যাদিতে সংপ্রবৃত্ত হন না। যথা, স্থূলে rest energy কে moving energy (radiation) রূপে না পাইলে ভৌতিক সৃষ্টিটাই একান্ত অচল। হৌং নিখিল প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করিতে উদ্যত। নিসর্গের বিরূপ বিলোমাগতিকে পুনশ্চ সরূপ অনুলোমে পাইতে হইলে, অন্তিম যে 'হ' বর্ণ, সেটিকে প্রথমতঃ আদিবর্ণে, অকারে ফিরিতে হয়। ফলে, হৌং হইল ওম্। (অবশ্য একটুখানি বর্ণরসায়ন অঙ্গীকার করতঃ)। এই ওঙ্কারের অ, উ, ম, নাদ, কলা, বিন্দু—এঁদের 'আজ্ঞায়' লং, বং ইত্যাদি ভূতবীজ, এবং অপর সকল বীজ (আপন আপন চক্রাদি যন্ত্র ও তন্ত্র সহ) আবির্ভূত। যেমন ধর, গায়ত্রীরূপে বিন্দু

থেকে নাদ উদিত হইলেন। ভূরাদি কলা তাঁর 'স্কন্ধে' আহিত আছেন বটে, কিন্তু কলা যদি স্তব্ধ রহিয়া বলেন—'আমি মাতৃকাবর্ণের কলনী হইব না'—তবে? তবে ছন্দোমাতা গায়ত্রীই আবির্ভূতা হইলেন না; নাদ হৌং আকৃতিতে সব সম্বরণ করিয়াই লইলেন। এমন কি, 'সোঽহম্', 'হংসঃ'ও সম্ভাবিত হইলেন না। এইভাবেও শিবস্কন্ধে 'শবসতী' দেখিবে।

পরিশিষ্ট (ক)

“জপযজ্ঞ”

অনির্বাণ

জপ একটি সুপ্রাচীন এবং সর্বজনীন সাধনা। এর মূল রয়েছে বেদে। বেদসংহিতা মন্ত্রময়। জপের সাধনা মন্ত্রের সাধনা। বেদ হতে তন্ত্র পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই সাধনার বিস্তার।

যাস্ক বলেন, ‘মন্ত্রো মননাৎ’। অর্থাৎ মনন হতে মন্ত্রের আবির্ভাব। মনন মনের ধর্ম। কিন্তু এখানে যে-মনের কথা বলা হচ্ছে, তা দার্শনিকের ইন্দ্রিয় নয়। ঋগ্বেদের ভাষায় তা ‘বোধিন্মনা’র মন।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহরিত জ্ঞানকে ভিত্তি করে কাজ করে প্রাকৃত মন। বোধির আলো তার উপরেও এসে পড়ে, নইলে সামান্য-ভাবনা সম্ভব হত না। সামান্য-ভাবনায় বস্তুর খণ্ডরূপের পিছনে আমরা আবিষ্কার করি অখণ্ড ভাবকে। ইন্দ্রিয় বিশেষদর্শী, প্রত্যেকবার সে একটি বিশেষ বস্তুকে অত্যন্ত বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তার ভূয়োদর্শনকে সামান্য রূপ দেয় মনের একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তি। বারবার ‘মানুষ’ দেখে আমাদের মনে ‘মনুষ্যত্বে’র ধারণা জন্মায়। মনুষ্যত্বের কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নাই,—তা বস্তু নয়, ভাব। প্রাকৃত মানুষেরও মনন এই ভাব ছাড়া চলতে পারে না। বলা যেতে পারে, এইখানে মন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেই অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে পা বাড়িয়েছে।

মনের মাঝে এই অতীন্দ্রিয়ের অনুভব জাগ্রত করে যে-বৃত্তি তার নাম বোধি। প্রাকৃত মনে বোধি ইন্দ্রিয়ের অবলম্বন একেবারে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। ভাব আর বস্তুর মাঝে তখন একটা দোটানা চলতে থাকে। বস্তু হতে ভাবের দিকে বোধি যখন মনকে ঘুরিয়ে দিল, তখন তার ঝোঁক গেল ভিতরপানে। ঐ মানুষের উদাহরণ নিয়েই বলা যেতে পারে, চোখের দেখা মানুষ আছে ইন্দ্রিয়ের জগতে, তাকে আশ্রয় করেই

মনুষ্যত্বের বোধ আছে অতীন্দ্রিয় সামান্য-ভাবনার জগতে। কিন্তু আমার মনের মানুষটি আছে আরও গভীরে, আমার অন্তশ্চেতনার সঙ্গে একাকার হয়ে।

এই যে মনের অন্তরাবৃত্তির ফলে বাইরের বস্তুকে ভিতরের ভাবে রূপান্তরিত করা, মৃন্ময়কে চিন্ময় করার, বিষয়কে বিষয়ীর সঙ্গে একাত্ম করা—এইটি হল বোধির কাজ। ইন্দ্রিয় যেমন বাইরের প্রত্যক্ষের সাধন, বোধি তেমনি অন্তরের প্রত্যক্ষের সাধন। ইন্দ্রিয় রূপ দেখে, বোধি দেখে অরূপকে; ইন্দ্রিয় শব্দ শোনে, বোধি শোনে অশব্দকে।

এমনি করে এক অন্তর্যামীর আকর্ষণে অন্তরাবৃত্ত চিত্ত যখন লোকোত্তর ভূমিতে অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের নৈশ্চিত্য নিয়ে জেগে ওঠে, তখন তা হয় বোধিন্মনার মন।

উপনিষদ্ এই মনকে বলেছেন যজমান বা সাধক। বলেছেন, এই মন অনন্ত, এই মন ব্রহ্ম, এই মন দৈবচক্ষু। অর্থাৎ এই মন যোগীর মন। ইন্দ্রিয়ের সান্ত দর্শনের গভীরে প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে সে আবিষ্কার করে অর্থের আনন্ত্যকে, অল্পের মাঝে দেখে ভূমাকে।

এই মনের মননই মন্ত্র। যিনি মন্ত্রকৃৎ, বেদ তাঁকে বলেছেন ঋষি, মনীষী বা কবি। তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেছে। সেই দুয়ার দিয়ে উৎসর্গের অবিচ্ছেদ সাধনায় তিনি পৌঁছেছেন সমস্ত সত্তার মর্মমূলে অব্যক্তের গহনে। সেইখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বাক্‌কে। এই বাক্‌ই মন্ত্রশক্তি। বেদে তাঁর মহিমার অন্ত নাই।

সম্প্রদায়ক্রমে যে-মন্ত্র আমরা পাই, তা বাকের চতুর্থপাদ বা বৈখরীমূর্তি মাত্র। ঋগ্বেদ বলেন, তাঁর আর তিনটি পাদ গুহায় নিহিত। বাইরে তাদের প্রকাশ নাই, একমাত্র ব্রহ্মবিৎ মনীষীরাই তাদের রহস্য জানেন। সে রহস্যের অভিব্যঞ্জনা দিতে গিয়ে তান্ত্রিক বললেন, শুদ্ধ-স্ত্রীত্বের স্বরণরূপী ঈঙ্কারে ছন্দিতা এই বাক্‌ই বহুশোভমানা হৈমবতী উমা, ঐন্দ্রীচেতনার সংবেগে মহাশূন্যের কুহরে যাঁর প্রত্যক্ষ হয়। ইনিই ত্রিপুরসুন্দরী, চিদাকাশে ষোড়শীর নিত্যকলা, পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমার নিগূঢ় স্পন্দনে তনুর সুতন্ত্রে আরোহ-অবরোহক্রমে নিত্য স্পন্দিতা।

তাঁর এই গুহাহিত স্বরূপকে আবিষ্কার করাই আমাদের পুরুষার্থ। সে-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তাঁরই প্রসাদে। সে প্রসাদ আকস্মিক নয়, অমূলক নয়,—সত্তার গভীরে তা ফল্গুবাহিনী সুষুম্নার উজানধারা। আমাদের অস্ফুট চাওয়ার স্ফুটরূপই তাঁর চাওয়া,

তাঁর কামনা। তাঁর কামনাই সাধককে করে ব্রহ্মবিৎ সুমেধা এবং ঋষি। যাঁকে তিনি বরণ করেন, সুবেশা উতলা জায়ার মত নিজেকে মেলে ধরেন তাঁর কাছে। আধারে তখন আগুন জ্বলে ওঠে। তার তাপে হৃদয় বিস্ফারিত হয়, টলমল করে ওঠে আকাশের মত, সমুদ্রের মত। হার্দজ্যোতির সেই বৃহত্ত্ব বা অনিবাধ বৈপুল্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আকাশের মত নিথর, আবার সমুদ্রের মত টলমল। একটি তাঁর প্রজ্ঞারূপ, আরেকটি শক্তিরূপ। এই শক্তিই বাক্ বা ব্যাহৃতি। 'যাবৎ ব্রহ্মের স্থিতি তাবৎ বাকেরও স্থিতি'—ব্রহ্ম আর বাক্ অবিনাভূত যুগনদ্ধ তত্ত্ব। এ সবই হল ঋগ্বেদের কথা।

ব্রহ্ম আর বাকের দিব্যমিথুনকেই আবার ঔপনিষদ ভাবনায় পাই আকাশ-প্রাণের দিব্যমিথুনরূপে। উপনিষদে আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ; সেই আকাশের নিত্য সহচরিত যে-প্রাণস্পন্দ তাই তাহলে বাক্। এইজন্য দর্শনে দেখি, আকাশের গুণ শব্দ। অবশ্যই এ-শব্দ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর নয়। এ-শব্দ সৃষ্টির প্রাণস্পন্দ। যোগীর নিস্পন্দ চেতনায় অনাহতের গুঞ্জরণে তার প্রত্যক্ষ হতে পারে। ঋগ্বেদ তাকেই বলেছেন 'অক্ষিতং শ্রবঃ' বা ক্ষয়হীন শ্রুতি।

এই প্রত্যক্ষ অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়। আকাশের ভাবনায় অন্তর্মুখ চেতনা নিস্তরঙ্গ হয়, প্রাকৃত চেতনায় যে গুরুভার ও সঙ্কোচের বোধ থাকে তা কেটে গিয়ে আলোর মত তা ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিব্যাপ্ত চেতনায় অখণ্ড আত্মসত্তার অনুভব হয়। প্রাকৃত চেতনা খণ্ডিত, পরিকীর্ণ, নানা সংঘাতে সঙ্কুল, অতএব অস্বস্তিময়। আকাশের মাঝে চেতনার মুক্তিতে এই অস্বস্তি দূর হয়, তার মাঝে ফোটে স্বপ্রকাশের আনন্দ। আনন্দ একাধারে সত্তার স্বরূপ এবং শক্তি দুই-ই। 'আমি আছি, আমিই আছি'—এই স্বপ্রতিষ্ঠ নিরুপাধিক অনুভবের যে-ছটা, তাই আনন্দ। আনন্দ তখন আত্মবিচ্ছুরণ। যদি ভাবের দৃষ্টিতে দেখি, তা হলে এই আত্মবিচ্ছুরণকেই বলি বাক্।

প্রাকৃত জগতেও এই বাকের পরিচয় আমরা পাই, কবির কাব্যসৃষ্টিতে। কাব্য কবির সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভাব স্পন্দিত হয়ে সেখানে রূপ নিচ্ছে। এই রূপায়ণের চারিটি পর্ব। আদিতে ভাব আর রূপ একাকার, কাব্য তখন কবির স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দের মাঝে নিমেষিত। সেই নিমেষের উন্মেষ ঘটল এক দিব্য সংক্ষোভে, কবির চিদাকাশে প্রেরণার বিদ্যুৎঝলক খেলে গেল। সেই ভাবের বিদ্যুৎ তারপর ঝরে পড়ল বিচিত্র

মননের ফুলঝুরিতে। অবশেষে বৈখরীবাকের উদ্দীপনায় তার কিছুটা রূপ নিল কাব্যের আকারে।

এমনি করে সৃষ্টি হয়,—ভাব হতে রূপ ফোটে, ব্রহ্মের আনন্দ উচ্ছলিত হয় বাকে। সেই বাকের নিগূঢ় বীর্যই মন্ত্র। বেদ বা জ্ঞান মন্ত্রময়। তা স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনার নিত্য বিচ্ছুরণ।

বৈদিক সাধনা বাকেরই সাধনা। ষড়ঙ্গ দিয়ে বেদ অধিগত করতে হয়। এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে কল্প আর জ্যোতিষকে বাদ দিলে আর চারিটিই মুখ্যতঃ বাকের সাধনা। শিক্ষায় বায়ুর সহায়ে বাকের উচ্চারণ অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখে পরিচালন, ব্যাকরণে বিলোমক্রমে বৈখরীবাকের গভীরে স্ফোটের আবিষ্কার, ছন্দে দেহের সপ্তধাতুর সঙ্গে বাক্‌স্পন্দের সৌষম্যসাধন, নিরুক্তে মনের সঙ্গে বাকের মিথুনী-ভাবনা। এই সব কটিই বাকের অধ্যাত্মসাধনা। কল্পে তারই অধিভূত রূপ, জ্যোতিষে অধিদৈবত রূপ। সব নিয়ে বেদের ষড়ঙ্গে বাকেরই সাধনা। এই সাধনার অনুবৃত্তি চলছে তন্ত্রের জপরহস্যে।

অনুবৃত্তির ধারাটা এই। অন্তর্গূঢ় বাকের একটি স্ফূর্তি 'নামে'। ঋগ্বেদে দেবতার চারু নামের মননের কথা আছে। এইখানে আমরা পরোক্ষভাবে জপের উদ্দেশ পাই। 'জপ' শব্দটি ঋগ্বেদে নাই, কিন্তু তার জায়গায় আছে 'উক্‌থ'। যেমন 'বিদথ' বিদ্যার বা জ্ঞানের সাধনা, তেমনি 'উক্‌থ' বাকের সাধনা (তুলনীয়, বৌদ্ধশাস্ত্রে 'শমথ' বা প্রশমের সাধনা)। যিনি এই বাকের সাধনা করেন তিনি 'উক্‌থিন্', 'উক্‌থশস' বা 'উক্‌থশংসিন্'।

ব্রাহ্মণসমূহে জপের সুস্পষ্ট বিধান আছে অনেক জায়গায়। 'জপ' সেখানে একটি সংজ্ঞা শব্দ। যজ্ঞে সূক্তজপের বিধান থাকবে, এটি স্বাভাবিক। কিন্তু রহস্যজ্ঞেরা জানতেন, সূক্ত বাকের চতুর্থী ভূমি মাত্র। তার মর্ম জান্‌তে হলে অগ্র্যা-ধীর সহায়ে আরও তিনটি ভূমি উজিয়ে যেতে হয়—সূক্তের মূলে আবিষ্কার করতে হয় নিবিৎকে, নিবিতের মূলে নামকে এবং নামের মূলে বীজকে। অনুরূপ বিধান তন্ত্রেও পাই। গোড়ায় ইষ্টের স্তব পাঠই হল স্বাধ্যায়। ক্ষিপ্ত চিত্তকে তারই স্বভাবের অনুকূলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইষ্টের ভাবনায় নিয়ে আসবার জন্য এই কৌশল। লীলাকীর্তনও এমনিতর সাধনা। নামকীর্তনের কথা ঋগ্বেদেও আছে। তারপর বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের সাধনা হল ইষ্টের গায়ত্রী বা মালামন্ত্রের জপ। বেদের নিবিৎ এই মালামন্ত্রের মত

সূক্তমন্ত্রের সার। তারপর একাগ্রভূমিক চিত্রের জন্য নামজপ, বেদে বা নামের মনন। একাগ্রচিত্ত শূন্যে লয় হয়ে যায়। তারই জন্য বীজের সাধনা। নামে অর্থের সঙ্কেত আছে, রূপের ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু বীজ বিশুদ্ধ শব্দ মাত্র, তার অভিব্যঞ্জনা অরূপের দিকে, চিত্তের একতানতার বিন্দুতে লয়ে। অর্থভাবনাসহ যে বাকের সাধনা বা জপযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, এইখানে তা পর্যবসিত হল অবাঙ্মানসগোচরের ভাবনায়।

এই বীজ ঋগ্বেদে 'একপদী বাক্'। ঋগ্বেদে কয়েকটি বীজের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তার মধ্যে 'শম্' এবং 'যোঃ' দুটি অতি প্রাচীন এবং বহুপ্রযুক্ত বীজ। গভীর রহস্যপূর্ণ এই দুটি বীজকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে শিবশক্তির সামরস্যের দ্যোতক। সূক্তবাক এবং শংযোর্বাক দুইই যজ্ঞাঙ্গ। শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন, তার মধ্যে শংযোর্বাকই হল প্রতিষ্ঠা। শম্ বীজের এক অপরূপ উল্লাস পাওয়া যায় ঋগ্বেদের বসিষ্ঠমণ্ডলের একটি সূক্তে। ঋষি সেটিকে বিশ্বদেবের উদ্দেশে ক্রিয়মাণ 'নবীয়ো ব্রহ্ম' বলে ঘোষণা করেছেন। চিদগ্নির চিত্রশিখা বিশ্বচেতনায় সংহত এবং পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রপঞ্চোপশম মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে এই হল তার ব্যঞ্জনা। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রামায়ণে বসিষ্ঠকে 'জপতাং বরঃ' বা জাপকশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্ত্রে বসিষ্ঠ একটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতির প্রবর্তকরূপে পরিগণিত।

উপনিষদে সর্ববাদিসম্মত একপদী বাক্ বা বীজ হল 'ওম্' বা অলিঙ্গ অসঙ্কেতিত নিত্যশব্দ। ওম্ সর্বসাধারণ প্রাণনের অনাহত স্পন্দ। আকাশের মত প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত প্রোজ্জ্বল চেতনা যখন শুদ্ধ-সন্মাত্রের সংবেদনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই আকাশে আপনা হতে ওঙ্কারের ঝঙ্কার ওঠে, আর তার অনুরণন শোনা যায় চরাচরব্যাপী সকল সত্ত্বের গুহায়-গুহায়। 'যস্য সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ'—সর্বাত্মভাবের এই যে পরমা সিদ্ধি, তার বাহন ঐ স্বভাবজ ওঙ্কারের স্ফূর্তি। 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা'—যা নিত্যসিদ্ধ তাকে হৃদয়ে প্রকট করবার জন্য সাধনার ব্যবস্থা। তাই অসঙ্কেতিত অনাহত সিদ্ধ ওঙ্কারকে দেওয়া হয় সাধ্য প্রণবের রূপ। প্রণব হয় ঈশ্বরের বাচক, ব্রহ্মবীজরূপে সব দেবতার সব বীজের চরম আশ্রয়।

শাব্দিকেরা বলেন, এই বাচক 'ওম্'-এর মূলে আছে অব্ ধাতু। তাহতে ঋগ্বেদে পাই দেববাচী পুংলিঙ্গ 'ওমঃ' শব্দ। তার সগোত্র আর দুটি শব্দ আছে,—ক্লীবলিঙ্গ 'অবঃ' এবং স্ত্রীলিঙ্গ 'উতিঃ'। মূল ধাতুটির উপাদান দুটি মাতৃকা—তারা বাক্স্পন্দের

স্বরিত আদি এবং অব্যঞ্জন অবসান বোঝায়। কণ্ঠ হতে উচ্চারিত স্বরের মূর্চ্ছনা বাক্‌পথের সব ধাপ পার হয়ে ওষ্ঠে এসে কাঁপতে থাকে, ব্যঞ্জনের সম্পুটের মাঝেও তোলে অনবসিত স্বরের গুঞ্জন। অব্যক্ত হতে সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়েও তা যেন ফুরিয়ে যেতে চায় না। এই আশ্চর্য ধাতুতে গড়া তিনটি শব্দে শাব্দিকের চেতনায় অবাক্ অনুত্তরের দ্বিদলে আত্মোন্মেষের এক অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে।

মন্ত্রশাস্ত্রের মূলে যে বিপুল প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, এ-আলোচনা তার অতি সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে জপযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলে বর্ণনা করেছেন, তার ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী। বস্তুতঃ মন্ত্রবিদ্যা আর্যসাধনার একটি মৌল বিভাব। ঋষিপন্থী এবং মুনিপন্থী উভয়েই তাকে সমান আদরে গ্রহণ করেছেন। যোগ এবং তন্ত্র—আমাদের এ-দুটি মুখ্য সাধনশাস্ত্রেই জপ অপরিহার্য সাধনা রূপে স্বীকৃত হয়েছে। তন্ত্র এ-বিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রাণবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এই প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো এ-যুগের সাধনমনীষার একটি দায়।

পরিশিষ্ট (খ)

অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

পরব্রহ্মণ্যমাত্রেঽপি পরমাব্যক্ততত্ত্বকে।
স্বাদ্যকলনমেকোঽহমিত্যৈকমাত্রতা পরা॥ ১
বিন্দুরূপা পরাব্যক্তা জগদ্-বীজমবীজকম্।
একত্র শূন্যপূর্ণত্বং যথা বীজে মহীরুহঃ॥ ২
শূন্যাদৃণং ধনঞ্চাপ্যুদয়-বিলয়য়োঃ ক্রমঃ।
অভিব্যক্তৌ তথা পূর্ণাদংশকলাদিসম্ভবঃ॥ ৩
একস্মাদৃধ্যমানত্বং ত্রিভির্জঙ্গাম্যতে জগৎ।
যথাঙ্কুরাদিরূপেণ বীজচক্রং পুনঃপুনঃ॥ ৪
নাদব্যক্তিঃ পরাব্যক্তাৎ কলাব্যক্তিশ্চ নাদতঃ।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তৌ যন্ নিবৃত্তৌ তৎ সমাপ্যতে॥ ৫
পরাব্যক্তস্য সেতূ দ্বে নাদাদেরুদয়ে লয়ে।
শূন্যদ্বারেণ পূর্ণোংশশ্চৈক ঋধ্যতি লীয়তে॥ ৬
শূন্যস্য চোভয়ৌ সন্ধী সেতুভ্যাং দধতী সনাৎ।
ধূর্ব্যক্তাব্যক্তচক্রস্যার্দ্ধমাত্রা পরমা পরা॥ ৭
ঋদ্ধার্দ্ধা চ সমৃদ্ধা সা নিত্যাপি কল্প্যতে স্বয়া।
সর্ব্বোদয়লয়স্থানে সা হন্যান্ (বৃণ্বীত) মধুকৈটভৌ॥
পরা পারায় শান্তোঽত্র তজ্জলানীত্যুপাস্যতাম্॥ ৮

পরমাব্যক্ত তত্ত্ব যে পরম ব্রহ্ম, তাহা অবাঙ্মনসগোচর, সুতরাং তাতে 'এক, দুই' ইত্যাদি সংখ্যা, অহং ইদং ইত্যাদি গ্রহীতৃ-গ্রহণাদি সম্পর্ক, কার্যকারণ ইত্যাদি

সম্বন্ধ—এসব স্বরূপাবধি যায় না। এই নিমিত্ত সেটিকে বলা হয় পরমাব্যক্ত। তবে এই সব ব্যক্ত-বিশ্ব কি একান্ত অহেতুক, আকস্মিক? এ সবের মূল কি এবং কোথায়? তাই পরম অব্যক্তের (এলজিক্যাল অ্যাবসোল্যুট-এর) এক আদ্যা স্বকলন শক্তি (আদ্যাকলা) মানিতে হয়। যার ফলে একান্ত অমাত্র যে পরম ব্রহ্ম, সেটি হন 'একোঽহম্', 'একৈবাহম্', ইত্যাদি রূপে 'একমাত্র', এবং সেইরূপ হইয়া, (অর্থাৎ, এক, অহং এবং সর্ববীজ হইয়া) পরমাব্যক্ত তত্ত্ব হন পরাব্যক্ত।।

এই পরাব্যক্ত বিন্দুরূপ। এ তত্ত্বও স্বয়ং লজিক্যাল নয়, তবে এর মাধ্যমেই এলজিক্যাল এবসোল্যুট হয় পারফেক্ট লজিক্যাল। ইহার নিজের বীজ নাই, অথচ ইহা নিখিল অভিব্যক্তির বীজ। ইহা একমাত্র হইলেও, ইহাতে (বিন্দুতে) শূন্য এবং পূর্ণ মাত্রাদ্বয় একত্র বিদ্যমান; যেমন (স্থূলে দেখিলে) বটবীজ-কণিকায় বট মহীরুহ। 'ভিন্ধি'—ভাঙ্গা, কি দেখিলে? বটের কিছুই তো না। এভাবে শূন্য। কিন্তু তা থেকেই বটমহীরুহ পূর্ণরূপেই হইবে; অতএব পূর্ণ।

'তাহা' সৃষ্টি করতঃ 'তাতে' ব্রহ্ম অনুপ্রবেশ করিলেন। 'তাহা' কি পদার্থ? এই বিন্দু। ব্রহ্ম হইলেন বিন্দু-ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্ম-বিন্দু; ব্রহ্মের ভগবত্তা যে মহামায়া, তিনি হইলেন বিন্দুবাসিনী। ব্রহ্মের এই প্রকার 'স্বকলন' যদি পরাবাক্ উদ্দেশ্যে বলা যায়—'কল্' বা 'কর্', এবং আত্মকলনী শক্তিকে 'ঈ' এই স্বর দ্বারা বলা যায়, তবে বিন্দুব্রহ্ম নাদব্রহ্মকে আপন অভিব্যক্তি বা বিতানরূপ করিয়া 'ক্লীঁ' বা 'ক্রীঁ' এই মহাবীজ আকৃতি পরিগ্রহ করেন। কেন? 'এক' হইয়া বহুরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিব এই কামনায়। সুতরাং, আদ্যাকলা বা আদ্যাকালী বীজ কামবীজও বটে। সৃষ্টির যেটি হৃল্লেখা বা মূলযন্ত্র রূপ, তার দিক থেকেও বিন্দু তদ্রূপে রহিয়াও, ঋজুবক্রাদি রেখা, ত্রিকোণ বৃত্তাদি আকার, অক্ষতলাদি সংস্থা পরিগ্রহ করেন। আত্মকলনের ফলে যাহা আকারিত হইল (যথা, ত্রিকোণ), তাকে যদি বল—কলা, তবে উদয়ে বিন্দু নাদ-কলা, বিলয়ে কলা-নাদ-বিন্দু—এইভাবে স্বয়ং তার-চক্র, এবং তদুদ্ভব নিখিল ভুবনচক্র (স্থূল-সূক্ষ্ম) আবর্তিত হইতেছে জানিবে। ত্রিকোণের বেলায় বিন্দুর নিজ বিতানে (নাদে) হইল তিনরেখা। তাতে বিন্দু তিন কৌণিক রূপে স্ফুটতঃ বিদ্যমান। ফলিত ত্রিকোণটি হইল কলা। এখন, এই ত্রিকোণাকারে উদিত বা ফলিত কলাকে আবার বিন্দুতে আনিতে হইলে কি করিতে হয়? উদয়ের বিলোমে ত্রিকোণের রেখাত্রয়

(নাদ বিতান) সঙ্কোচনপূর্বক তাদের শূন্যস্থলে পর্যবসিত করিতে হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে পুনশ্চ বীজ—এইরূপে সর্বত্র বহিরন্তঃ দৃষ্টিপরিক্রমা করিয়া বুঝিয়া লও।

জঙ্গাম্যমান এই যে অভিব্যক্ত জগৎ—অণু-বিরাটে, স্থূলে-সূক্ষ্মে, সে জগতে তিনটি মূল গতিবৃত্তি (প্রোসেস প্যাটার্ণ) দেখিতেছি। সমস্ত কিছুতে উদয় এবং বিলয় ক্রমটি লক্ষিত হয়, এবং সে ক্রমেরও মূলে দেখা যায়—ধন ও ঋণ, এই 'দিগ্‌দ্বন্দ্ব' (অপোজিসন অব সেন্স অথবা পোলারিটি)। এ দ্বন্দ্ব কাহাকে সমাশ্রয় করিয়া?—বিন্দুর শূন্যত্ব। আবার, সব কিছুতে অংশ, কলা, পাদ, মাত্রা দেখা যায়; এ সব বিন্দুর পূর্ণত্বকে সমাশ্রয় করতঃ। শেষকালে আবার সব কিছুতে দেখা যায়—ঊর্মি ইত্যাদি আকৃতিতে ঋধ্যমানতা (প্রোগ্রেসন, সিরিয়ালিটি) এবং তাতে অবম ও চরম কাষ্ঠাভিমুখীন প্রবণতা। এটি সমাশ্রয় করে বিন্দুর যে একত্ব, তাহাই। সুতরাং বিন্দুর পূর্ণত্ব এবং শূন্যত্ব এবং একত্ব জঙ্গাম্যমান বিশ্বের ঐ তিন মূল ঋত বা গতিরূপ প্রশাসন এবং নির্বহণ করিতেছে।

এখন 'অ'কার দ্বারা যদি বুঝায় শূন্য মাত্রায় নিউট্রাল পয়েন্ট সম্পর্কে ধনে ঋণে উদয় বিলয় ক্রম (যথা প্রণবে আদি 'অ' এবং অন্ত্য 'অ'), এক আধারে ঋধ্যমান হওয়াকে যদি বলা যায়, 'ই' বা 'ঈ', তবে মিলিল, দুয়ে মিলিয়া, শক্তিলেখের এক স্বাভাবিক স্বরলিপি 'এ'। এটি কলার 'ফলায়মান' (প্রোডিউসিং) আকৃতি। এর প্রকারভেদ 'ও'। প্রথমটিতে তলবৃত্তিতায় প্রবণতা; পরেরটিতে চূড়াবৃত্তিতায়। অর্থাৎ 'এ' তলকে পাইতে যায়, 'ও' চূড়া বা ক্রেস্ট।

এইবার 'এ' কে কোন লম্বগা শক্তির দ্বারা এরূপভাবে 'দীর্ঘ' (অভীন্ধ) কর, যাতে সেটি (পরে কথিত অর্দ্ধমাত্রা সেতুতে লইয়া) নাদবিন্দুর পূর্ণ-কাষ্ঠায় তুলিয়া লইতে পারে। পাইলাম 'ঐঁ' মহাবীজ। 'ওঁ' এবং—'ঔঁ' এই দুইটি স্বরাকৃতিও এই রীতিতে পরীক্ষা করিও। ফলতঃ বিন্দুব্রহ্ম হইতেই পরাবাক্ মাধ্যমে স্বরব্যঞ্জনাদি নিখিল মাতৃকা এবং বীজমন্ত্রাদির আবির্ভাব। পুনশ্চ তাহা হইতেই হৃল্লেখ মাধ্যমে নিখিল ঋজুবক্রাদি লেখা এবং যন্ত্রের সমুদ্ভব। মন্ত্রযন্ত্রের এবম্বিধ আবির্ভাবের (তায়নের) যেটি ঋতচ্ছন্দঃ, তাহাই হইল তন্ত্র। আবির্ভাব বলিতে (বিলোমে) তিরোভাবও (স্ব স্ব বীজে) বুঝিতে হইবে। এ সমস্তই সার্বভূমিক সত্য—কেবল,

মন্ত্রাদি সাধনের গুহ্যকথা নয়। এই নিমিত্ত বলা হইল—বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে আবার বীজ—এইভাবে সৃষ্টিতে বীজ-চক্র আবর্তিত হইতেছে। এ থেকে মুক্তির উপায়—বিশ্ববীজচক্রের যেটি নাভি, হৃল্লেখা এবং বিন্দু, তাতেই যত্নপূর্বক সমাশ্রিত হও।

কিন্তু অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত (আবিঃ) এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত (তিরঃ বা রাত্রি), বিশেষ করিয়া এই দুই স্থলে সেতু রহিয়াছে, যেটি উভয়ের অপেক্ষায় 'ব্যক্তাব্যক্ত'। বিন্দুতে ব্রহ্মের যে একমাত্রা, পূর্ণমাত্রা এবং শূন্যমাত্রা, তাহাই সৃষ্টিতে আসিয়া আবার ফিরিবার নিমিত্ত ঐ সেতু হইয়াছে। একমাত্রাদি রূপ বিন্দুব্রহ্মের উভয়তঃ (আবিঃ এবং তিরঃ) সেতুরূপা হইলেন—'অর্দ্ধমাত্রা'। বিন্দুতে যে এক-পূর্ণ-শূন্য—এইরূপ পরাব্যক্ত মাত্রা, সেটিকে সৃষ্টির সর্বত্র (সুতরাং মন্ত্র যন্ত্রাদিতেও) উদয়-বিলয়ে, ধনে-ঋণে, অংশকলায়, এবং ক্রমিকতা ঋধ্যমানতায় পাইবার, এবং অন্তে মিলাইবার নিমিত্ত, 'এক' আপন উভয় দিকে সেতুরূপ এবং 'অর্দ্ধ' হইয়াছেন। এটি সমাশ্রয় ব্যতীত পরাব্যক্তে, সুতরাং পরমাব্যক্তেও, যাওয়া যায় না।

যেমন, প্রণবের 'অ উ ম' এ তিন মাত্রার অন্তে এই 'অর্দ্ধমাত্রা' সেতুটি না মিলিলে কলা-নাদ-বিন্দুর একত্রাবস্থানরূপ পরা তুরীয় ভূমিতে এবং তদন্তে পরমাব্যক্ত তুরীয়াতীতে যাওয়া হয় না। ষট্‌কোণ যন্ত্রটিকে মূল বিন্দুতে আবির্ভূত এবং তাতেই আবার তিরোভূত করিতে গেলে এই অর্দ্ধকে পাওয়া চাই। অসীম অণুত্বের পরাকাষ্ঠা যে বিন্দু [লিমিট অব ইন্‌ফিনিট কন্‌সেন্‌ট্রেশন] সেটিকে যে কোন সসীম [ফাইনাইট] মানে পাইতে গেলে, মধ্যে চাই— 'ইনফিনিটেসিম্যাল'। সূক্ষ্ম উচ্চ গণিতের গোড়ায় এই অদ্ভূত মাত্রাতত্ত্ব—যেটি অব্যক্তকে 'ব্যক্তিমাপন্নং' করে, আবার বিপরীতটিও করে। সূক্ষ্ম উচ্চ গণিত ব্যবহারে ডি, ওয়াই—ডি, এক্স ইত্যাদি দুর্গসমস্যাপাটন বজ্রায়ুধসমূহ এই অর্দ্ধমাত্রা গোষ্ঠীসম্ভবারই গর্ভসম্ভূত। সান্ত সসীম শব্দরূপাদিকে অনন্ত অসীম অব্যক্তের কুক্ষি থেকে প্রসবে কে হয় ধাত্রী, এবং আবার তাদের স্বনিলয়ে প্রত্যাবর্তনে কে হয় তাদের সমাপয়িত্রী, সেটি বেশ করিয়া ভাবিয়া অর্দ্ধমাত্রাকে ধ্যান করিও।

পরাব্যক্ত যে বিন্দু (এক, পূর্ণ, শূন্য) তা থেকে নাদাভিব্যক্তি; নাদ হইতে কলাভিব্যক্তি—এইভাবে বাগর্থপ্রত্যয় জগতে যে 'প্রবৃত্তি' আবর্তিত ও লক্ষিত

হইতেছে, 'নিবৃত্তি'তে সেটি বিলোমে 'সমাপ্ত' (সম্যক্‌রূপে স্বনিলয় বিন্দুব্রহ্মে সংগৃহীত) হইতেছে। এস্থলে আদ্যাকলা এবং পরনাদ অবশ্য বিবক্ষিত নয়। ওঙ্কার, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে বিশেষ করিয়া, আর জাগতিক সর্ববিধ স্থূল-সূক্ষ্ম ব্যাপারে সামান্যভাবে, এই মূল্য 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' বুঝিয়া লইও।

পরাব্যক্ত থেকে নিখিল অভিব্যক্তির এই যে প্রবৃত্ত-নিবৃত্তি [আবিঃ এবং তিরঃ], তাতে দুটি সেতু রহিয়াছে—এই রহস্য, বিচারে এবং অনুভবে মিলাইতে যত্ন কর। কেননা এই 'যতন'ই সেই সাধন, যায় মিলে পরম 'রতন'। সামান্য অভিব্যক্তির সাধারণ নাম যদি দাও 'নাদ', আর, সেই সামান্যের বিশেষকে যদি বল, 'কলা', তবে পরাব্যক্ত রূপ বিন্দুব্রহ্ম থেকে নাদকলার উদয় বিলয়ে এই সেতুদ্বয়। সর্ব উদাহরণ স্থলেই [যথা বীজ থেকে অঙ্কুরাদি, এবং শেষে আবার বীজ; জাগ্রৎ থেকে সুষুপ্তি, তা থেকে আবার জাগ্রৎ ইত্যাদি] এই সেতুদ্বয় অনুসন্ধান করিও। 'সেতু' না ধরিলে 'পার' নেই। ধ্যান করিয়া দেখ যে—বিন্দুব্রহ্মের যে শূন্যত্ব, সেই শূন্যত্বকে দ্বার করিয়াই, পর উদাসীন তত্ত্ব আসিয়া থাকে ধন-ঋণাদি (+, -) দিঙ্‌মানে (অপোজিশন অ্যান্ড পোলারিটি অব সেন্স); সেই পর সংস্থায় যে পূর্ণত্ব, সেটি সাপেক্ষতায় [ফীল্ড অব রিলেটিভিটি] আসিয়া হয় অংশ-কলাপাদাদিতে বিভাজ্যতা; এবং একত্ব কি হয়? —'ঋধ্যতি লীয়তে' [প্রোগ্রেশন এন্ড পিরিওডিসিটি অথবা সাইক্লিসিটি]।

এখন, শূন্যপূর্ণৈক যে 'স্থল', তার উভয় সন্ধি সেতুরূপা হইয়া যেটি নিত্য (সনাৎ) বিধারণ করে, এবং তদ্‌দ্বারা নিখিল অভিব্যক্তির উদয় বিলয় নিয়মন করে, সেটি অর্দ্ধমাত্রা। অপর তত্ত্ব হইতে পরে এবং পর হইতে পরমে লইবার অর্দ্ধমাত্রাই সেতু, সুতরাং অর্দ্ধমাত্রা একাধারে পরা এবং পরমা। অন্য ভাবও আছে। যাই হোক, প্রসন্না অর্দ্ধমাত্রার সেতুদ্বয়সমাশ্রয়ে রজস্তম বিধূত হওয়া আবশ্যক। এবং তৎ+জ+ল+আ+নি যে বিন্দুব্রহ্ম স্থল, সেথায় যদি 'শান্ত' (ধূতকল্মষ) হইয়া উপাসীন হইতে পার তো, কেবল পরা কেন, পরারও পারে পরমে তুমি অভিনিষ্পন্ন হইবে।

সর্বশেষে অর্দ্ধমাত্রা শব্দে ঋধ্‌ ধাতুটিকে প্রাণরসায়ন রীতিতে পরীক্ষা করিয়া লইও। মূর্দ্ধন্য যে ধাম (পরম এবং পর), তাতে স্বকলনী যে প্রথমাগতি, তাকে

বল—'ঋ' স্বর। ঋ থেকে 'ঋচ্ছতি'। আর ত বর্গের মহাপ্রাণ যে চতুর্থ বর্ণ ধ, তাতে কি বুঝিবে? কোন নির্দ্দিষ্ট তলে (উইথ রেসপেক্ট টু এ গিভ্‌ন প্লেন) এমন কোন সংস্থা (পজিসন্‌, সিচুয়েশন) যেটি পূর্বোক্ত মূর্দ্ধন্যধাম প্রচোদিতা গতিকে, উক্ত তল সম্বন্ধে (যথা গায়ত্রী মন্ত্রে ধিয়োয়োনঃ) সর্বাতিশয় এবং সাধিষ্ঠ-ভাবে 'আধান' ও 'ধারণ' করে। 'আধান', 'ধারণ', 'ধূনন'—এই তিন—'ধ'য়ের মুখ্যাবৃত্তি। প্রথম দুইটি 'ধনে' (পজেটিভ), তৃতীয়টি 'ঋণে' (নেগেটিভ); ধূনন— (এলিমিনেশন)। ধূমাবতীতে 'ধুং' বীজ এবং ধ্যানে শূর্প তদীয় করে স্মরণ কর। প্রথম দুটিতে 'ধ্যে' (ধীমহি), 'ধী' এবং 'ধূর্' (ধূঃ) আকৃতি এবং ভাব চিন্তা কর। ধূননের নিমিত্ত সেই বৈদিক অভ্যারোহ মন্ত্র—'অসতো মা' ইত্যাদি। 'ঋ' এবং 'ধ' এর এই মূলাবৃত্তিগুলি ধ্যান করিয়া তবে অর্দ্ধমাত্রাতে প্রপন্ন হইও। প্রসঙ্গাত, 'ধন' ও 'ঋণ' শব্দ দুটিও ভাবিও। উচ্চারণেও এ দুয়ের বৃত্তি-বৈপরীত্য বুঝিবে। দ্বিতীয়ে বিকিরণ বৃত্তির (রেডিয়েশন-এর) আধিক্য বিস্পষ্ট; প্রথমে সঞ্চয়ন বৃত্তি (মাসিং, ষ্টোরিং)।

ঋণ কে অপবাদসূচক, ভাবিও না। সবিতার 'ঘৃণি' নাম এবং আকৃতিতে 'ঋ' এবং 'ণ' রহিয়াছে; 'কৃষ্ণ' নামটিও স্মরণ কর। 'বরেণ্যম্' ও তৎ সম্পর্কে সবিশেষ নৈকটিক। পক্ষান্তরে, 'ধীমহি' এবং 'ধিয়ো য়ো নঃ' ধনমুখ্য। 'ঋ' 'ণ' এই দুই বর্ণে বা অর্ণে এমন স্বরাদি অর্ণসংহতি (ফোনোটিক কনগ্রূয়েন্‌স) থাকা চাই, যাতে বিকিরণে বিক্ষেপ (স্ক্যাটারিং মোমেণ্টা) ত্যক্ত হয়, সঙ্কিরণ (ইনটারফিয়ারিং ফ্যাকটরস)ও নিবারিত হয়। উৎকিরণ, অবকিরণও পরিহার্য (একসেস অর ডিফিসিয়েন্সি ফ্যাক্‌টরস)।

নাদো নদেৎ পরার্দ্ধেনাপরেণ কলয়েৎ কলা।
সমাবর্ত্তেত সাম্যেন ব্যাবৃত্তির্বিষমেণ চ।
স্বমতীত্য তুরীয়ত্বং পরৈতি পরমেণ চ॥

অর্দ্ধমাত্রায় যে 'অর্দ্ধ', সেটিকে এইরূপ পঞ্চধা ভাবনা করিবে:—পরার্দ্ধের দ্বারা নাদ নাদত্ব পাইয়া থাকে; অপরার্দ্ধ দ্বারা ব্যক্ত কলাসমূহ ফলিত হইয়া থাকে; সমার্দ্ধ (সাম্যেন) দ্বারা বিন্দুতে কলানাদের সমাবৃত্তি সাধিত হয়; বিষমার্দ্ধ হইলে

ব্যাবৃত্তি। আর, এই চারি অর্দ্ধের অতীত এক অর্দ্ধ আছে, তাকে বল—পরমার্দ্ধ। এর দ্বারা তুরীয়া যে পরা, সে পরাও আপন তুরীয়, শান্ত ইত্যাদি পরাব্যক্ত যে ভাব, তার অতীত হইয়া পরমাব্যক্ত যে 'পার', সেই পরমাব্যক্ত প্রাপ্ত হয় (পরৈতি)। সৃষ্টিতে এবং সাধনে স্বচ্ছন্দ বিপুল নাদবাহিতা হয় না, যদি না অর্দ্ধমাত্রা আপন পরাভিমুখীন 'অর্দ্ধ' দ্বারা সেটি সম্ভাবিত করেন। ব্যক্ত কলা (অ উ ম ইত্যাদি) কলনের নিমিত্ত তৎসহ 'অপরার্দ্ধ'ও আবশ্যক হয়। এ দুয়ে, 'অর্দ্ধ' সমতায় না আসিলে বিন্দুলীনতায় যে সমাবৃত্তি সেটি হয় না। আর পরমে গতির নিমিত্তও অর্দ্ধমাত্রাকে 'পরমার্দ্ধ' অথবা পরমে অভিসম্পন্ন অর্দ্ধরূপে পাইতে হয়।

অর্দ্ধমাত্রা নিত্যা এবং বিকল্পাদি-রহিতা হইয়াও 'স্বয়া', কিনা, আত্মশক্তিতে আপনাকে ঋন্ধা, অর্দ্ধা ও সমৃন্ধা, বিশেষতঃ এই তিন আকৃতিতে প্রদর্শন করেন। [যথা প্রণবে—অ = অর্দ্ধ, উ = ঋন্ধ, ম = সমৃন্ধ হইয়া আবার 'ম'এর পরে অর্দ্ধমাত্রা = সেতু হইয়া কলাকে নাদে এবং নাদকে বিন্দুতে লইয়া 'পরা' হন; এবং পরা পার করাইয়াও পরমে লইয়া যান]; ষট্-কোণ যন্ত্রে, আদৌ ত্রিকোণ হইয়া অর্দ্ধা। কিন্তু পূর্ব শ্লোকে কথিত— 'ধূর্ব্যক্তাব্যক্তচক্রস্য'—এইবার স্মরণ কর। অর্দ্ধমাত্রা ব্যক্তাব্যক্তচক্রের (সাইক্লিসিটি অব পোটেন্সি এণ্ড লেটেন্সি ফাঙ্কশনস্)—ধূঃ স্থানীয়া। (প্রাইমারী অ্যাক্সিস অব অল কসমিক প্রোসেশন।) দেখিয়াছি যে বাক্ চতুষ্টয়ীতে অর্দ্ধমাত্রা সকল বাকের ধূ স্থানীয়া হইয়াছেন মধ্যমারূপে। ইনিই হন কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়া। বিন্দু-নাদ-কলা এই ত্রয়ীর 'সমতালিকতায়' (হোমোপোলারিটিতে) স্থিতা যে সংস্থা, তাকে বল—'যোগনিদ্রা', যাঁর স্তব প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির উপক্রমে করিয়া নিরুপদ্রব হইতেছেন। যোগনিদ্রার 'প্রবোধ', অথবা নিখিল ধূ রূপা অর্দ্ধমাত্রার সমাবর্তন ঘটে ঋজু, সুষম, বিষম এই তিন ভাবে। শেষেরটিও সৃষ্টিতে আছে এবং চাই। ঋন্ধ, সমৃন্ধ এবং অর্দ্ধ (ফ্র্যাক্শন্যাল ইত্যাদি)—এ তিনের সঙ্গে উক্ত তিনটি সম্বন্ধ। এগুলি বিশেষ সমাচার—যন্ত্র সম্বন্ধীয় অন্য এক পরিশিষ্টে বিস্তারিত হইয়াছে। এ তিনের যে কোন ভাবেই হোক্ সর্বোদয়-বিলয় স্থানে (সন্ধিতে) সেতুরূপা অর্দ্ধামাত্রা জাগ্রতা এবং প্রসন্না হইয়া মধুকৈটভ দৈত্য যুগলকে হনন করুন, নচেৎ কোন প্রকার সৃষ্টি কর্মই সমারব্ধ এবং নিরুপদ্রবে সুসম্পন্ন হইবে না। উদয়ে তমঃ=মধু; বিলয় স্থলে রজঃ=কৈটভ।

ব্রহ্মবিন্দাবদঃ পূর্ণং নাদে পূর্ণমিদঞ্চ তৎ।
নাদ উদচ্যতে বিন্দোঃ সকলঃ কেবলোঽপি বা॥
পূর্ণতো নাদমাদায় বিন্দুরেবাবশিষ্যতে।
উদচ্যতে তথাদায়েতি সেতূ দ্বেঽর্দ্ধমাত্রয়া।
শূন্যাৎ পূর্ণং তথা পূর্ণাচ্ছূন্যমিত্যপি ভাবয়॥
বিন্দুমাতুর্ভুজৌ তৌ দ্বাবর্দ্ধমাত্রাপ্রসারিতৌ।
প্রেরয়িতুং স্বতোনাদমবাপ্তুঞ্চ স্ববক্ষসি॥

প্রসিদ্ধ পরম রাহস্যিক 'ওঁ পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রকে ওঙ্কার, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে এইভাবে ভাবনায় মিলাইয়া চরিতার্থ হও:—

বিন্দুব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণ, কিন্তু পরাব্যক্ত, সুতরাং, 'পূর্ণমদঃ' ('এই' ভাবে নয়, পরন্তু 'ঐ' ভাবে জাপকের জপারম্ভ এবং বিলয়—এ দুয়েরি ধ্রুব কেন্দ্ররূপে বিরাজিত)। আর, সমুদিত নাদব্রহ্ম 'পূর্ণমিদং'। ইহা আবির্ভূত, সুতরাং, 'ইদং'। পূর্ণ বিন্দুব্রহ্ম থেকে নাদব্রহ্ম পূর্ণই আবির্ভূত হইতেছে—কলাবিতান সহ অথবা কেবলই (ইহা জপে এবং গানাদিতে সবিশেষ বুঝিয়া লও)। আধারের পূর্ণতা বজায় রহিয়া এই প্রকার আবির্ভাবের পূর্ণতা হইল— 'উদচ্যতে'। আবার, ওঁ, গায়ত্রী ইত্যাদি জপ বিলয়স্থলে নাদের (কলাবিতান সহ) পূর্ণাবির্ভাবকে পূর্ণরূপেই (পূর্ণতঃ) আপনাতে লইয়াই (আহৃত করিয়াই), বিন্দুব্রহ্ম নাদ-বিন্দুকলা—এই ত্রয়ের অভেদপূর্ণতারূপে পর্যবসিত হয়—অর্থাৎ বিন্দুব্রহ্ম আপনাতে কলাসহ নাদকে পূর্ণভাবেই আত্মসাৎকরতঃ স্বয়ং পরাব্যক্ত পূর্ণ রহে। এখন, 'উদচ্যতে' (পূর্ণাবির্ভাব) এবং 'আদায়' (পূর্ণ তিরোভাব)—এই দুটিকে অর্দ্ধমাত্রা সেতুদ্বয়রূপে পাতিয়া দিয়াছেন, জানিও।

যেহেতু, বিন্দুব্রহ্ম শূন্যপূর্ণের একত্রাবস্থান, উক্ত 'উদচ্যতে' এবং 'আদায়' রহস্যব্যাপার দুটিকে পূর্ণ শূন্যের দিক্ দিয়াও জপসাধনে ভাবিও। পূর্ণ-শূন্য বিন্দু থেকে পূর্ণনাদকে 'যেন' তুলিয়া লইয়া বিন্দুকে 'শূন্য'ই করিলে; আবার, নাদকে তথায় মিলাইয়া সেটিকে 'পূর্ণ' করিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার এই পরম কল্যাণী ভাবনাটি ধর:—

বিন্দুপীঠা মহামায়া যেন চতুর্ভুজা মহেশ্বরী। তিনি মাতার মত আপন অঙ্ক এবং

আলিঙ্গান থেকে নাদকে নামাইয়া যেন বলেন—'তুমি পূর্ণ জ্যোতীরসের উল্লাস-বিলাসে আপনাকে প্রকাশ কর' (যথা, গায়ত্রীতে 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি'); দুটি 'বাহু' দিয়া নাদকে পাঠান এবম্প্রকার প্রকাশনে এবং আস্বাদনে। তদন্তে তাকে আবার অপরদুটি বাহু দিয়া আপন বক্ষেই টানিয়া লন। উল্লসিত-বিলসিতের অন্তে স্বলসিত; সকল প্রকাশের চূড়ান্তে পর ও পরম এই 'অব্যক্ত' প্রকাশ। বিন্দুব্রহ্মময়ী মায়ের দুই দিকে দুই ভাবে প্রসারিত বাহু দুটিকে 'অর্দ্ধমাত্রা' ভাবনা করতঃ পরম ভাবরসে নিষ্ণাত-ধন্য হইবে। মা-ই আমার তাঁর দুটি বাহু দিয়া তাঁর কোল থেকে নামাইয়া আমার জপটি নাদে, কলায়, জ্যোতীরসে বিস্তার করিতেছেন; তিনিই আবার সেটিকে আপন বুকে টানিয়া লইবার নিমিত্ত হাত দুটি বাড়াইয়াছেন—এই হইল ভাব। আত্মসাধনযোগে (যথা, 'ধীমহি' পর্যন্ত) সমারম্ভ; আত্মসমর্পণ যোগে (যথা, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' প্রভৃতি) সমাপন। প্রথম স্থলে তমঃ থাকিলে হবে না; দ্বিতীয় স্থলে, রজঃ—বিশেষ করিয়া 'অহং কর্ত্তা' আদি অভিমান। বিলয়ে প্রথমে স্থূলাবাক্, পরে সঙ্কল্পী মনের 'পতন' চাই; তখন, প্রাণই একা যাত্রী। অর্দ্ধমাত্রাকে সেতু ইত্যাদি ভাবিয়া 'তটস্থ' হইয়াছ; এইবার, মায়ের দুই দিকে দুটি দুটি প্রসারিত বাহু ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও পুলকিত হও। ঐ বাহুদুটি এইভাবে পরাবাক্ রূপিণী মহামায়ার বুঝিও—

মধ্যমা বৈখরী বাহু পশ্যন্তীং নয়তঃ স্বতঃ।
স্বালয়ং নয়তো বাহু পশ্যন্ত্যা মধ্যমা পরা॥

মধ্যমাকে ধ্রুঃ বা অক্ষ করিয়া পরাবাকের পশ্যন্তীতে আবির্ভাব এবং তথা হইতে পুনশ্চ আপনাতে (স্বালয়ং) বিলয়ে দ্বিবিধা বৃত্তি ও গতি ভাবনা করিও। অনুলোম, বিলোম উভয় স্থলেই মধ্যমা-মাধ্যম গতি হইয়া থাকে। প্রথমটি পূর্ণা পশ্যন্তী-মুখীনা। দ্বিতীয়টি, পূর্ণা পরামুখীনা। আগেরটিতে মধ্যমার সঙ্গে নাদের প্রাকট্য বা ব্যক্ততা (যেটি লক্ষণায় বৈখরী) আসিয়া থাকে; পরেরটিতে মধ্যমা নাদের অপ্রাকট্য বা অব্যক্ততা (যেটি লক্ষণায় পরা) ঘটায়। এ স্থলে, 'বৈখরী' ও 'পরা' শব্দদ্বয়ে লক্ষণায় ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাব বুঝিবে।

পরিশিষ্ট (গ)

সিন্ধৌ বিন্দুদশকম্

শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

সমুদ্রতটে ওঙ্কারাদি জপধ্যানের উপযোগ

মহাম্ভোধিঃ সান্দ্রং স্বমুরজরবং মূর্চ্ছয়তি য-
মুদাত্তং শশ্বচ্চোদয়বিলয়মেরুদ্বয়মিতম্।
তরঙ্গোচ্ছ্বাসৈরূর্জিতমবিরতং ব্যোমপুলকং
জগৎস্বামী বেণুস্বরসমর্পি তং নঃ প্রথয়তু॥ ১॥

ওগো মহাম্বুধি!
স্বমুরজমন্দ্রে সান্দ্র ছন্দঘনধ্বনি
উদাত্ত বিরামহীন করিছ বাদন;
তবু সে শাশ্বত ছন্দোবাণী বারংবার
উদয়ে বিলয়ে কেন মেরুতে মিলাও,
মহাছন্দকলাবৎ! সাধিয়া মূর্চ্ছনা!
মূর্চ্ছনায় মহাব্যোম পুলকমূর্চ্ছিত;
সে অসীম মহিমার মূর্চ্ছনা আধারে
ওগো, বল, শুনাবে কি নাদ-বিনোদিয়া
জগন্নাথস্বামি-করে বেণু মোহনিয়া! ১॥

অরূপং যং ক্ষৌণী শবলনিজরূপং গময়িতুং
বগাহ্যাব্ধিং ধত্তে কনকরুচিরস্বাঞ্চলতটম্।
অবর্ণং দ্যৌর্ধত্তে ঘনগগনদীপদ্যুতিচয়ং
যমস্পর্শং বাতো নয়তি চিরদোলং স পুরতঃ॥ ২॥

যে রূপে ক্ষৌণী নিজ বিচিত্র বর্ণালি
অপরূপ রূপরাশি সঁপিবার তরে,
নামি সিন্ধুস্নানে, কনকসৈকতবেলা
ছলে, পাতিয়াছে উদ্বেল অরূপ-প্রান্তে
তাপসীর শেষ রূপ রাগলেশ—নিজ
গৈরিক অঞ্চল! (হেমসিকতা অঞ্চল!)
অবর্ণ যাহায় দ্যৌ আঁকে মেঘমালা ছবি,
রবি-শশি-তারা জ্বালে বিচিত্র দীপালি;
অস্পর্শ যাহারে, ভঙ্গহীন অগাধ সমাধি গাঢ়তায়
দিয়ে যায় বাত বীচিভঙ্গে চিরদোল;—
সে বিপুল, সে আদি অদ্ভুত—পুরোভাগে! ২॥

স রূপারূপাদি-দ্বয়কলনকৃৎ সর্বত ইহ
স্বয়ং ধত্তে সিন্ধুর্জনিবিলয়সন্ধিং সুশয়িতঃ।
স ওঙ্কারস্ফোটঃ স্ফুটয়তি গিরাং বীচিনিচয়ং
স বৈ দারুব্রহ্মাপ্সু নিজতনুতত্ত্বং গময়তি॥৩॥

রূপ অরূপের, চিত্র বর্ণ অবর্ণের,
স্পর্শ-অস্পর্শের, গাঢ় মৌন মুখরের—
যেথায় উদ্ভব, যেথা মিলন, বিলয়,
সেই সন্ধি রহস্যের অগাধ সন্ধানী
সিন্ধু! তুমি সুশয়ান কালের কলনে।
যুগ, বর্ষ, দিবস-যামিনী, সন্ধিক্ষণে!
অতল রহসি মৌন, তাই কি ওঁকার?
সে শাশ্বত ওঁকারে, চিরোদ্বেল বীচি-
ভঙ্গে, বিশ্বে দাও চিত্র, ভাষা, ছন্দ, সুর!
এই তব মূর্ত প্রহেলিকা চিরন্তনী
আপন তনুতে তুমি, রূপেরে অরূপে
ঢালি, জগন্নাথস্বামী হ'লে দারুব্রহ্মরূপ! ৩॥

জগন্নাথোঽরূপোঽপি চ নিখিলরূপাঢ্যপরমঃ
স কিং গম্ভীরান্তঃ প্রভবতি ন বা স্বাকৃতিকৃতৌ।
অবর্ণং বর্ণং বা সচলমচলং বাঽখিলখিলে
অপায়ায়ানাভ্যাং কৃততটলবং ব্রহ্মসলিলম্॥ ৪ ॥

পরম অরূপ তুমি জগন্নাথস্বামী,
তবুও বিশ্বের আবীরূপটি পরম,
বেদসূক্তে উদীরিত-গম্ভীরান্তঃ রূপ
রাখি পুরোভাগে, কহিলে কি মগ্নোচ্ছ্বাসে—
বিশ্বকর্মা আমি, নিজ আকৃতি-কলনে
অকৃতী কুশলী! বর্ণমাঝে অবর্ণের,
সচলের অচল দিশারি; যাহা খিল,
তায় অখিল মেলনী; আগম অপায়ী—
তায় নিত্য অনপায় ধামের সন্ধানী;
হে ব্রহ্মসলিল! তুমি তটলব ছলে
অনিরুক্ত স্বরূপেরে 'তটস্থে' আনিলে,
সতট সরণি নিতে অতট পরমে! ৪ ॥

মহাকালো ব্যোম হ্যুপরি তনুতে নীলিমচয়ং
মহাকালী নীচৈস্তরলঘনরাশিং প্রথয়তি।
অনন্তং শয্যাং সোঽকুরুত সলিলে শ্যামসরিতো
ঽধুনা রাধারোধস্যভিসরণগা মাধবলুভা॥ ৫ ॥

বিপ্রতীপা মহাকালী—উর্দ্ধে মহাব্যোম
নীলিম মহান্, প্রশান্ত ভাস্বর, ধ্রুব
মহাকাল? আর নিম্নে মহামেঘদ্রব,
জলধিদুকূলা তড়িজ্জ্বলদচিকুরা,
মহানৃত্যকালী? অনন্তেরে শয্যা করি,
তুমি কি আবার পাতিলে শয়ন, বল,

মূল মহাস্পন্দঘন কারণ সলিলে?
কভু কি আবার সেই শ্যামলা সরিৎ
আপনারে কালিন্দী কল্পিয়া, নিরালায়
তাহারি পুলিনে, প্রেষ্ঠবিরহবিধুরা
তুমিই চলিলে রাধা উতল বল্লভে
অভিসার মিলন-ব্যাকুলা? ৫॥

নিরুদ্বেলঃ স্বান্তো রচিতনিজবেলো বীচিনিচয়ং
স ফেনাম্বুস্ফোটং চপলমতিলোলং বিকিরতি।
নিধত্তে মাণিক্যং গহননিজকুক্ষৌ দ্যুতিঘনং
বিকীর্ণং বেলায়াং শবলমুপলং বালললনম্॥৬॥

নিত্য নিরুদ্বেল স্বীয় অসীম সত্তায়
কেমনে রচিবে বল বেলা আপনার?
আর সেই চিরপিয়াসী বেলায়, বল,
হে চির উদাসী! শান্তিহীন, তৃপ্তিহীন
আকুল উচ্ছ্বাসে, বীচিভঙ্গে ভাঙ্গি' পড়,
অতিলোল, একান্ত চপল, ফেন আর
জলবিম্বরাশিরূপে ছড়ায়ে আপনা!
গহন গভীর কুক্ষিতলে ধর তুমি
দ্যুতিঘন অমূল্যরতন; তবু কেন
(বিশ্বম্ভর) আত্মপূর্ণ রত্নের ভাণ্ডারী! বেলাভূমে
বিকীর্ণ উপলখণ্ড-চয়ন-লোলুপ,
মূল্যহীন চিত্ররঙ্গিমায়, সাজিয়াছ
ভিখারী বালক!৬॥

খদীপৈর্ব্যোমেমং প্রথমভবদেবো বিবরিষুঃ
সদা ধত্তে বাতৈর্হিমকণকরৈশ্চামরবরম্।

তরঙ্গৈরুদ্বেলৈঃ প্রণবপুটসামস্বরমপাং
ভুবা গন্ধোৎসর্গং হ্যু দধিজঠরেজ্যং হুতভুজা ॥ ৭ ॥

ভুবনের আদিদেব তুমি মহীয়ান্!
তোমারে বরিবে বলে খদীপ আরতি
নিত্যরত অতন্দ্রিত মহাব্যোম; হিম-
কণ সুশীতল চির চামর বীজনে
অনলস তার দিগন্ত পবন কর;
আপ আচমনে অভিষেকে তরপণে,
হে চির-নিষ্ণাত, চিরতৃপ্ত, অভিষিক্ত!
সেই মূলবাণী শাশ্বত ওঙ্কারনাদ—
সামস্বনে লহরে লহরে লীলায়ন!
কত না নির্ঝর সরিৎ তোমা অভিমুখে
বহি হে সরিন্নাথ! হে আপদেবতা!
ধরিত্রীর সুরভিত গন্ধডালি, করে
তোমা নিবেদন! তব কুক্ষিবেদী'পরে
অনির্বাণ হুতাশন জ্বালি, হোমরত
রাখ কোন শাশ্বত ঋত্বিকে! ৭ ॥

নিষণ্ণো বেলায়াং বহুচপলচিন্তাং বিজহত
ধনং গেহং মিত্রং জহত জলবিম্বাদিবিলয়ে।
যদোঙ্কারং নাদং শৃণুত ধুতলাপা মহিমনি
নিজাত্মানং তস্মিন্ নয়ত লয়সন্ধিং খজলয়োঃ ॥ ৮ ॥

ভিত্তিহীন বালুকায় হে শ্রান্ত পথিক!
ত্যজ শ্রান্তি নিষণ্ন বেলায়, চিত্ত হতে
নামাইয়া ভাবনার ভার—বহুলতা
ভঙ্গুরতা মিলে গড়া মৈনাকের গুরু-
ভার! সিন্ধুবেলায় নিষণ্ন নিশ্চিন্ত,

সে মৈনাকের ভার সিন্ধু গরিমায়
কর নিমজ্জন। বিত্ত, মিত্র, দেহ, গেহ
মমত্ববন্ধন বন্ধ-বান্ধব বন্ধন—
তাহারে প্রশান্তচিত্ত! দাও জলাঞ্জলি
যে মহাপ্রশান্তিমাঝে ঐ বিচিত্র বুদ্‌বুদ
বীচিভঙ্গে ভাঙ্গি গেল নিরঞ্জন! ধৃত
মিছে আলাপন, মহামহিমের বীণে
শোনো সমাহিত সদ্য নাদব্রহ্ম ওম্।
আকাশ সলিলে ঐ সন্ধি সীমানায়
অসীম যুগলে মৌন গাঢ় আলিঙ্গনে,
লহ আপন আত্মায়—ভাব 'তত্ত্বমসি'
বেলা লগ্ন দৃষ্টি হোক্ দিগন্ত মগন!৮॥

মহাব্ধের্বক্ষস্যূর্জিতসিতরুচিত্র্যম্বকহৃদি
স্বপাদাব্জজ্যোতিঃ পটলপরিসীমা কিমসিতা।
কদা কিং কালিন্দীপুলিনসলিলদ্যোতনকরীং
তরঙ্গোঽনঙ্গোশো ঘননিবিড়ভাসং বিতনুতে॥ ৯ ॥

যদি হে রূপরসিক! রূপে সাধ তব
সিন্ধুশীকর অঞ্জনে উন্মেষিত আঁখি,
হেরিবে কি কভু সিত সমুজ্জ্বল রুচি
সিন্ধুশিবহৃদি, নিজ পাদাম্ভোজজ্যোতি-
পটল-পরিসীমা, মাতৃশক্তি অসিতারে?
সিত বক্ষে অসিতায় সিত শান্ত চিত্ত?
আবার হেরিবে কভু আন আঁখি ভরি
কালিন্দী সলিল নভ পুলিন উজলা
তরঙ্গের লোল আলিঙ্গনে কেলিপর
অনঙ্গনাথের অঙ্গদ্যুতি রসতম,

নবনীরদনিবিড়? কালো জলে বিশ্ব-
মোহন উজলা, এ কালোয় মজিলে কি? ৯ ॥

উমোমেশেত্যোং বৈ শৃণুয়ুরনিশং সিন্ধুরটনং
কলানাদৌ চ বিন্দুং ত্রিতয়মতিগং তুর্য্যমপি চ।
জগন্নাথস্বামীতি জয় জয় সীতেতি রমণং
সদা রাধেশ্যামেতি হরহরি ওঁ নাম পরমম্॥ ১০॥

যদি হে সুর-উদাসী! সুরে সাধা কান,
সিন্ধুর উদাত্ত নাদ মন্দ্রিত পরাণী
ওই শোনো নিরন্তর সিন্ধুকণ্ঠ হ'তে
'উমা উমেশ ওঁ' রাগ ভৈরব আলাপ!
যেবা আলাপনে নাদবিন্দুকলাপারে
তুর্য্যগ বিতান! ধ্রুব বাণীর আধারে
'জগন্নাথ স্বামী' 'জয় জয় সীয়ারাম'
'জয় রাধেশ্যাম' 'হর হর হরি ওঁ' নাম,
নাদ হতে তুর্য্যগপরমে মুরছিয়া—
সিন্ধু উদ্‌গানে, শোনো, উন্মনা উদাসী! ১০॥

নমস্তে নীলাশ্মদ্যুতিসঞ্চয়ায়
নমস্তে বীচীনাং ধ্বনিগম্ভীরায়।
নমস্তে ক্ষ্মাতেজোঽনিলসংগ্রহায়
খমূর্ত্তায়াঽপাং মূর্ত্তিমতে নমস্তে॥
হ্যমূর্ত্তায়াঽপাং মূর্ত্তিমতে নমস্তে॥ ১১ ॥

নমো নীলকান্তদ্যুতি সঞ্চয়নঘন,
নমো ঊর্মিনাদব্রহ্ম-গম্ভীরামগন,
নমো পৃথ্বীতেজবায়ু সারসন্দোহন,
নমো ব্যোমরূপ অপ্‌রূপী সুশয়ান,
নমো অমূর্তরূপ, নমো অখিলমূর্তিমান্! ১১॥

পরিশিষ্ট (ঘ)

শ্রীগুরুতত্ত্বে শ্রীভগবানের সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চধারা (পঞ্চগঙ্গা)

একাধারে সম্মিলিত

করুণাম্বুধি-সন্নিধিম্

শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

চঞ্চলং মে মনো মূঢ়ং ক্বচিত্তনাবতিষ্ঠতে
অয়স্কান্তেন হে কান্ত! ত্বয়ায় ইব গৃহ্যতে॥
সংগৃহ্যমাণমেবং মাং প্রতিগৃহ্ণাসি পুত্রবৎ।
ত্বমেব পিতরৌ বন্ধুঃ সখা সর্ব্বং (ইতি) ভবেন্ মম॥
বিগ্রহবানসি বা ধ্যানে প্রত্যক্ষং বা নরাকৃতিঃ।
লোকোত্তরাং তনুং দিব্যাং বিভ্রদিতি মতির্মম (ভবতু)॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারমিত্যাদিভি র্নমাম্যহম্।
মন্যমানো মহাত্মেতি দৃষ্টি-মতি-রতিপ্রদঃ॥
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
ইত্যাদিষু স্বয়ং পূর্ণাবতারঃ পরিগৃহ্যতে॥
শ্রীগুরুঃ যঃ স্বরূপেণ করুণাবরুণালয়ঃ।
চাতকার্ত্তি-প্রশান্ত্যৈ হি তস্যৈব বারিদোদয়ঃ॥
যথা শ্রীগুরু-কারুণ্য-সরিন্নাথস্য সন্নিধিম্।
গচ্ছেন্ মনঃসরিন্নিত্যং বুদ্ধিযোগং তথা কুরু॥

কোনতায় স্থির নাহি হয়
মন মোর চঞ্চল একান্ত।
লৌহে যথা অয়স্কান্ত মণি,
আকর্ষিলে হে আমার কান্ত॥

টানি লয়ে নিজ অঙ্ক পাশে
ক’রে নিলে আপন সন্তান
পিতা মাতা বন্ধু সখা তুমি
‘সর্ব্ব’ বলি দাও মোরে জ্ঞান॥
ধ্যানে কিম্বা নয়ন গোচরে,
এলে তুমি নরাকৃতি ধরি।
ও বিগ্রহ দিব্য লোকোত্তর—
এই বোধ যেন না পাশরি॥
‘অখণ্ডমণ্ডল’ আর ‘অজ্ঞান তিমির’
মন্ত্রে তুমি ভাব-দৃষ্টি-দাতা।
যোগী, জ্ঞানি-গুরু, ভাগবত—
এই বোধে হও স্থাপয়িতা॥
গুরু ব্রহ্ম সাক্ষাৎ পরম
মম গুরু জগতের গুরু।
মোর নাথ জগতের নাথ,
অববোধে পূর্ণ ব্রহ্ম গুরু॥
নিত্য অবতীর্ণ স্বরূপে তোমার,
বিশ্বজীবে করুণা সাগর।
চাতকের তৃষা শান্তি তরে,
সমুদিত স্নেহ জলধর॥
করুণা-সাগর সন্নিধানে
চলে যেন মানস তটিনী।
পথে কত শৈল, কত মরু
বাধা অতিক্রমি॥
দ্বন্দ্বদ্বিধাহীন চিরপূর্ণ মিলনের তরে, শুদ্ধি বুদ্ধিযোগ,
দাও হে বাঞ্ছিত! হে শরণ! হে একান্ত স্বামী!

পরিশিষ্ট (ঙ)

YANTRAM—WHAT IT MEANS ?

YANTRAM, in ordinary use, means a mechanism or organ for doing work in an effective, systematised manner with a view to achieving a definite end. Such work, evidently, implies *three* things : the *End,* setting the principle or rule of action; the *Means,* setting the combination and co-ordination of the forces doing the work; and the *Method,* setting the necessary conditions and practical lines of such action. In scientific analysis, the first gives *formula and equation;* the second, *diagram and design;* the third, *function* according to plan, and with respect to given or assigned conditions. Basically speaking, these three are *Mantram, Yantram* and *Tantram* respectively. One may call them *Rule, Ruler* and *Ruling;* or Principles of Law, Code and Procedure; and so on. With respect to anything that is or becomes, they answer the three root questions; *Why* is it so? *What* makes it so? and, *How* is it so? Obviously, the three are inter-related.

In the word YANTRAM, one should seize upon the root *Yam* [pronounced as यम् (*Iyam*) and not as *Jam*], note what that root means and implies, and correlate it with the root principle वीजम् (*Vijam*) of वायु (*Vāyu*), which is also यम् (*Yam*). वायु (*Vāyu*) is Cosmic प्राण (*Prāna*) or *Elan Vital.* It is the cosmic Fund of both potential and kinetic power as a whole, that is, without abstraction and limitation as material, vital or mental. When this Power as whole operates as a system of Control ('Yam'), as a 'Ruler', with respect to a given end or objective, it is यन्त्रम् (*Yantram*). It is essentially, therefore, a Power disposition and design, not a mere model representation, picture or graph.

It is superficial thinking to look upon the Mystic Yantram as symbolic or pictorial. It is dynamic— शक्ति-लेखा (*Shakti lekhā*). But in the understanding and appreciation thereof it is more suitable to begin with the sketch-drawing, graph, and so on. But the initial approach should be such as to open up newer and fuller vistas of complete dynamic import and significance.

The Means यन्त्रम् (*Yantram*) will signify nothing unless we can show it in the context of the entire movement from beginning to end; unless the picture of the event can be exhibited in its entire dynamic set-up. A boat on the river pulled by two ropes in directions making an angle gives no intelligible meaning of its actual movement unless we are able to resolve the resultant effect into its constituent parallelogram. This instance is typical. Examine an organism, a crystal, a molecule, an atom. Inspect any planned structure in human or natural scheme. The structural design is laid upon a functional plan, and that, again, upon a dynamic scheme or power-pattern. It is the last that controls—यम् (*Yam*)—and rules. What is *this* behind any situation that presents itself, any event that takes place? That is the be-all and end-all question. And Power, as we have noted, is only abstractedly and segmentally 'physical'.

Nevertheless, it is the analysis of physical science and mathematics that sets the first model and draws the first sketch suggesting the fuller and more basic pictures. We are in quest of fundamental 'ground plan'—the heart and core-picture of Power. In other words, of हृल्लेखा (*Hṛllekhā*).

In this vital quest, it is possible that one can catch or miss the 'direct home line'. Even systematised, scientific pursuit has oftner than not strayed off the right track and missed the correct orientation. It has been said that intelligence is a toolmaking organ. So there has been no lack of tools, instruments, appliances. They serve a variety of ends and purposes. But of what positive lasting, fulfilling and harmonising value have been most of these? Are they in affiliation to the 'far-off divine event to which all creation moves?' Do they even suggest that there may be, all appearance to the contrary notwithstanding, 'a divine purpose and end' at all inspiring the basic scheme of creation?

The question cannot, particularly at this critical world juncture, be evaded or postponed. Without boldly facing this, we cannot quit the fatal quicksands of maladaptation and vicious circle, both subjective and objective, in which we have been caught.

Hence Power शक्ति (*Shakti*) as whole has to be understood and appreciated with its appropriate मन्त्रम् (*Mantram*), यन्त्रम् (*Yantram*) and तन्त्रम् (*Tantram*) in the senses above noted.

We imagine, for instance, that we are now near, if not actually at, the core-picture of at least material being and behaviour. Our equations have, at any rate, a reassuring look of thorough and compact reasonableness. Deceptive is not that look.

But the equations have, in practical application, ominously equivocated and not helpfully equated the basic queries and discrepancies in the appreciation of creation and existence. So, possibly, only a side-door to an antechamber of what Reality resides in has been opened.

यन्त्रम् (*Yantram*), in its fullest context and co-ordination, must evolve from the First Principles of Creation.

The potency of यन्त्रम् (*Yantram*) or Power Diagram, in all relevant dimensions, varies in geometrical ratio (so to say) according to the refinement and purity of the power-field composition. Hence what controls the intra-atomic field of energy is enormously more powerful than mechanical, chemical or molecular systems of control.

If by प्राण (*Prāna*) is meant not simply vitality or biological entity, but an all-pervasive cosmic principle of renewing and creative activity, then प्राणिक (*Prānik*) control ought to be more powerful than atomic. Modern science and modern methods must now essay to make that प्राणिक (*Prānik*) control available in an increasingly helpful measure. For, in such availability lies all hope of harmonised, creative progress. The consummation of such progress can be reached only by opening हृल्लेखा (*Hṛllekhā*) of things by Yoga where the Spirit reigns as Perfect Power and Perfect Harmony.

Therefore, यन्त्रम् (*Yantram*) must be traced from the Magnum Matrix [Perfect Power positing itself as the Perfect बिन्दु (*Bindu*)], down to our appreciated planes of Magnitude, Number and Space-time. यन्त्रम् (*Yantram*) should affiliate all our known and appreciated matrices to the Magnum Matrix. And this affiliation necessarily bears the character of a logicomathematical descent.

The drawing on the cover looks, apart from the internal scheme of the interlaced triangle, like a flower in partial bloom, with *six* symmetrical (say, parabolic) petals joined at the stem axis by two others, one at each side of the axis, which are still 'hidden' and enfolded. The two 'hidden' stem-buds are marked with *plus* and *minus* signs.

Basically this means the six-phase functioning that becomes patent (or manifest) in the analysis of any creational entity or event (as pointed out in these Notes); and the two hidden axis buds are or represent, the Mystic अर्घ-मात्रा (*Ardha-mātrā*), on either side of the विन्दु (*Bindu*) and its axis of self-projection; they link up, both in the sense of evolution and of involution, what is patent and manifest with what is radically there as the potent and un-manifest. The entire scheme is supervised by *Om* at the core or हृल्लेखा (*Hṛllekhā*). ओम् (*Om*) itself in its 'rise' shows this eight-phase pattern in dynamic creation.

There, for instance, represent the eight-phase pattern : पराव्यक्त–विन्दु (*Parāvyakta—bindu*), व्यक्ताव्यक्त–सेतु (*Vyaktāvyakta-setu*), व्यक्त–उदित-नाद—(*Udita—nāda*) अ, उ, म, (A, U. M), व्यक्त (विलय-नाद—*Vilaya—nāda*), व्यक्ताव्यक्त-सेतु (*Vyaktāvyakta—setu*).

Ponder also over the relation of this diagram to the famous mystic mantram:

ॐ पुर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातू पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

"*This* is Full, *That* is Full: Full evolves from Full:
Full taken from Full remains Full."

In this मंत्रम् (*Mantram*), the two mystic words, *viz,*. उदच्यते (*Udacyate*) and आदाय (*Ādaya*) (taken out and taken in) stand respectively for positive and negative *Stem-buds* or अर्घ-मात्रा (*Ardha-mātrā*).

SOME SALIENT POINTS

1. Power is Consciousness; in which Power as Matter, Power as Life and Power as Mind are grounded without intrinsic or exter-

nal limitation. Consciousness is Being, and the Basic Bliss of Being (*Sat-Cit-Ānanda*).

2. It wills to *become.*

3. For this, It posits itself as *Bindu*—the Perfect Power-Point. It is, as such, the Perfect Cosmic 'Seed' or 'Origin'.

4. It is the Mystery Point that negotiates between the Alogical Transcendent and the Logical Immanent (the Cosmic as Reason rendered).

5. It is at once One (Eka), Full (Pūrna) and Nil (Shūnya).

6. From It proceeds a 3-Phase evolution (creation) : *Ṛju* (straight), *Sushama* (symmetrical), and *Vishama* (apparently eccentric).

7. The three are connected by 'leading links' (Setu), but creation is not in time relation except at, and after, the third *Setu.* 3 aspects are, therefore, called 'emergences'.

8. Number and Magnitude relations (starting with opposition of sense, direction, etc.) evolve from *Bindu* which is the Magnum Matrix.

9. In all emergences starting with Ṛju, a fundamental or basic 'frame-work' is first posited, logically and mathematically. Thus *Bindu* posits itself as the original Axis of Homoplanarity with its opposition of sense and direction; 'homo' differentiates itself as 'somo' and 'mono' evolving Magnitude and Number.

10. The Basic Evolvent of Number relations (*e.g.* wave frequency, atomic number, chromosome number, etc.) is *Mantram;* that of Magnitude relations (*e.g.* wavelength, all forms and patterns) is *Yantram;* and what correlates the one system of relations (*e.g.* formulae and equations) with the other is *Tantram.*

11. The first is fundamentally represented by the trinity—Bindu, Nāda, Kalā; the second, especially, by rectilinear sama (right) konic, and circular (conic); the third by origin (point), co-ordinates, and process or movement (curvature).

12. The Matrix of Mantram, especially, is *Bindu;* of Yantram, *Kaḷā;* of Tantram, *Nāda* (note the roots *Kal* and *Tan*).

13. Mantram as perfect (omnipotent) is *Om;* Yantram as such (omnipresent) is the Δ and O; Tantram as such (omnivalent) is the positing

in fact of the Mystic *Ardha.* (The mystery 'link' that connects the potential and actual).

14. The above is Nature's own basic scheme of Being and Becoming.

15. Nature evolves through a system of 'Makes' and 'Brakes'– starting with Bindu as the supreme Make and Brake Principle.

16. At our level, in matter, life and mind, this natural ratio $M : B$ sets the norm of Nature's economy. Examine, for instance, the ratio as rest energy and moving energy in the units of matter.

17. Science, at present, examines and explores this energy segmentally, cross-sectionally and by 'capture' and 'rupture' technique. The outcome is not reassuring on the whole, so far.

18. That ratio taken as an evolving whole, and in the direct 'home line' with Bindu Brahman is *Kundalinī.* The direct home line from Kundalinī to the highest level of Perfect Realization and Fulfilment, is the mystic path of Sushumnā—Power's natural line of Ascent and Descent in Creative Evolution. That path, therefore, is a cosmic principle which is illustrated in and not confined to the human or any other body.

Lam, Oam, and so on—the *five Radices* of the five Cosmic Principles (Tattvas) and five 'Centres' (Cakras) presided over by *Om* at the higher Sixth 'Directive' (Ājnā)—are to be brought into concerted operation along the Sushumnā. *Oam, Lam,* etc, are, thus, the Matrices of both macrocosmic and microcosmic harmony function patterns in Power's evolution and involution processes. For example, the six Rāgas of Indian Classical music evolve out of them. The Rāga *Dipaka,* for instance, evolves from *Om Ram, Megha* from *Om Oam.*

19. To 'rouse' Kundalinī, therefore, is to get into that 'home line' leading to the Mine and Centre of Creative Power working in perfect freedom and harmony.

20. And here alone Perfected Power is consorted with Perfect Light and Bliss.

21. So, with this blessed end in view, let all science and all undertaking unite in the spirit of communion and fellowship—as the closing hymn in Ṛgveda has it—'Samgacchadhvam . . . etc'.

SOME BASIC CONCEPTS

1. Brahman is Reality as the Alogical Absolute. *Alogical* means—what is immanent in, but transcends what is logically thinkable and predicable.

2. The same as Power Divine to be and become all, logically thinkable or not, is *Bhagavattā* (*Mahāmāya* or *Maheshwara*).

3. Power is *Shakti* : Its essence is *Sat* (Being), *Cit* (Consciousness), and *Ānanda* (Basic Bliss of Existence and Becoming).

4. Its Will to be and become is *Kalā* in the fundamental sense.

5. It posits itself, for this end, as the Perfect 'Origin' and also 'End'. This is *Bindu.*

6. *Bindu* is Perfect Potency; this as Perfect Patency is *Nāda.*

7. Creative Process relates to, and is determined by, these two Perfect Limits. The relating and determining Function is also *Kalā* (in the 'deriving' sense).

8. What results or is produced is *Kalā* also (in the 'derived' sense).

9. So *Kalā* is the Evolvent, the Evolving and the Evolute.

10. As the first, *Kalā* is the Whole : as the second, Phase or Aspect : as the third, Partial or Component.

11. What links up and correlates what is 'given', or 'going to be' to its postulate, premise or pre-condition is *Setu.*

12. Brahman manifesting as One, Undivided, Omnipotent 'Measure' (*Mātrā*) is *Ekamātrā.*

13. The Measure as *Brahman* evolves (with the 'help' of *Setu* or the Principle of Basic Correlativity) as, and in, different aspects, of which one is *Homo* (Sarūpa), differentiating as *Somo* (Sama) and *Mono* (One) : Ownness, Evenness (Uniformity) and Oneness (Unity).

14. Another is : *Pāda* (Range or Sphere), *Kalā* (Gradation), and *Kāshthā* (Limit or Culmination).

15. Still another is *Ṛju* (Straight), *Sushama* (Symmetrical) and *Vishama* (Eccentric).

16. The Evolvent Principle, both as *Mātrā* and as *Setu* in all these is *Ardha-Mātrā.*

17. *Ardha-Mātrā* is, also, the *Setu* of withdrawal (upashama) from the creative *ensemble (prapanca)*.

18. Besides as *Aspect,* A.M. also operates as *Function :* hence, *Mantram, Yantram* and *Tantram* (see Preface for explanation).

19. What co-ordinates (*i.e.* brings to a common 'point of reference') components and lines (axes) of Power-manifestation is Vyāhriti (*e.g.* a system of co-ordinate axes with reference to a 'origin' in *Yantram*).

20. This is, basically, threefold : 'This' (*Bhūr*); 'That' (*Svar*), and their correlating and interacting (not therefore 'void') 'Interval' (*Bhuvar,* neither 'This' nor 'That').

21. Creation is 'original', being the free manifestation of Ānanda (Basic Bliss and Joy); yet it looks like, and is analysable as, a 'pre-established' picture (of harmony and otherwise). It is so in the final emergences to logico-mathematical appreciation.

22. In these *Desha, Kāla,* and *Dik* descend into the realms of cosmic relativity analysis as space-time-direction.

23. The relativity analysis pictures point to a 'basic scheme' or, 'heart-throbbing' of things and relations; to *Hṛllekhā* and, foundationally, to *Bindu.*

24. To open up the 'direct home line' to this is *Sādhanā.*

25. There is an unlimited Reserve Bank Power given in everything evolved, which is *Kundalinī.*

26. The 'direct home line' of Power's ascent and descent between unlimited potentiality and limitless availability is the 'mystic path' *Sushumnā.*

27. The ascending and descending control and co-ordinating Centres, corresponding to different orders of Power planes and dimensions, are the *Cakras.*

Note that all these are Cosmic Principles illustrated in various fields of experience.

পরিশিষ্ট (চ)

নামের কৃপা

(ঁনামরসিকের ডায়েরির কয়েকটি ছিন্নপত্র)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

১৪ই অগস্ট—প্রত্যূষ ৩টা

নাম নিতে নিতে একটা বড় সুখময় স্পর্শ অনুভব হ'তে লাগ্‌ল—হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে, রক্তের প্রতি উচ্ছ্বসনে, স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতি সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে, প্রতি ধ্বনিতে যেন সুরের কি এক অপূর্ব মধুর লহর ছুটিতে লাগিল, চক্ষু বহিয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিল, সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। তারপর নাভির তলে, কখনো বক্ষে, কখনো কণ্ঠে যেন সুর পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। শেষ, মৃদু গুঞ্জনে কণ্ঠ হইতে নাসারন্ধ্রের মূল পর্যন্ত যেন গতাগতি করিতে লাগিল।

রাত্র ৪টার সময়—তখন পিঙ্গলা চলিতেছে, নামের সুর লাগিয়া আছে, সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া নাম নিতে নিতে বেশ resonance হ'তে লাগল, কিন্তু Continuous নহে, Spasmodic, উদয়-লয়, উদয়-লয় হইতে লাগিল। তখন Continuityর চেষ্টা না করিয়া নাম করিয়া চলিতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল যে যখনই resonance উদয় হয়, তখনই left ventricle টা যেন কি এক গম্ভীর নাদে ভরিয়া যায়। আলজিবের পাশ দিয়া বাম কর্ণপটহ স্পর্শ করিয়া যেন নাদ গিয়া বাম ventricle এ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সে স্থানটা যেন hollowed cave এর মত শূন্য ও নাদপূর্ণ অনুভব হ'তে লাগল। এক একবার দুই তিন second করিয়া এই নাদের continuous flow থাকিতে লাগিল ও স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্কে বড় একটা soothing effect হতে লাগল। তারপর পূজার ঘরে আসিতেই ইড়া খুলিয়া গেল। পূর্বে এই resonance উদয় হইলে একটু জোর দিয়া তাহাকে স্থায়ী ও দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু তাহাতে সময় সময় resonance টা দীর্ঘ হইলেও কেমন যেন artificial হইত

এবং সেইজন্য আনন্দস্তর যেন ঠিক খুলিত না। আজ কিন্তু জোর না দিয়া তাহার স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় একটা বেশী আরাম মনে হইতে লাগিল।

* * *

১৫।৮—আজ প্রথমে সুর লাগিতেছিল না; তাহার পর নাম লইতে লইতে যখন একটু মিষ্ট লাগিতে লাগিল, তখন পিঙ্গালা হইতে ইড়ায় বদলাইয়া গেল। পরে সিঁড়িতে গান গাহিতে গাহিতে অনেকক্ষণ পরে একবার resonance উদয় হইল। আজ কিন্তু খাদে সুর নামানোর সময় এটা আসিতে লাগিল, চড়ানোতে আসিল না। তারপর মনে হতে লাগল যেন pelvis এর দুই ধার হইতে সুর আসিয়া মূলে মিলিত হইতেছে, আর অমনি গম গম করিয়া উঠিতেছে। ঐ স্থানটাতেই প্রথম একটা vibratory sensation হইতে লাগিল, তারপর erect হইয়া মূলবন্ধ করিয়া দাঁড়াইতেই কণ্ঠে আসিয়া অতি সহজ স্বাভাবিকভাবে নাদ উত্থিত হইতে লাগিল এবং মনে হইতে লাগিল যেন মস্তিষ্কের ঠিক মধ্যভাগেই অবকাশ মধ্যে নাদ পাকাইয়া উঠিতেছে।

* * *

১৬।৮—রাত্র ৩টা হইতে ৩।২৫ মিনিট—পিঙ্গালা চলিতেছিল, যখন নাম প্রথম নিতে আরম্ভ করিলাম, সুর লাগিল না। পরে হঠাৎ লাগিয়া গেল—কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া নাসিকামূলে যেন ঐ গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গত হইতে লাগিল। ধ্বনির যেন কণ্ঠের বহিরভিমুখে একটা ঝোঁক দেখা গেল এবং সেই point হইতে এত ease এর সঙ্গে উঠিতে লাগিল যেন মনে হইতে লাগিল অতি সহজ স্বাভাবিক, যেন কোনো চেষ্টা বা effort লাগিতেছে না। একটু আওয়াজ দিলেই মৃদঙ্গের বাঁওয়ার গম্ভীর আওয়াজের মত গমগম করিয়া উঠিতেছে ও steam whistle যেমন একবার কেন্দ্রীভূত হয় আবার বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তেমনি অতি সহজে একবার করিয়া কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল ও আবার যেন বৃত্তাভিমুখে গিয়া faint হইয়া যাইতে লাগিল ও ঠিক যেন personal self impersonal self এ প্রবেশ করিতেছে—এইরূপ মনে হইতে লাগিল। রেশটাও অধিক অধিকক্ষণ থাকিতে লাগিল। এই সময় শ্বাস পিঙ্গালা হইতে ইড়ায় বদলাইয়া গেল ও নাসামূলের নিকট যে গুরু গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিলিতেছিল, তাহা যেন ক্ষীণ হইল।

* * *

১৭।৮—আজ পিঙ্গলা চলিতেছিল। বসিয়া বসিয়াই আজ নাদ উত্থিত হইতে লাগিল। আজ বাম কি দক্ষিণ ventricle এ কোনো ক্রিয়া অনুভূত হইল না—আজ entire brain টাই যেন একটা uplift feel করিতে লাগিল এবং নূতন নূতন ভাব ফুটিতে লাগিল।

* * *

১৮।৮—আজও পিঙ্গলা চলিতেছিল। আজ নাদ বিশেষ করিয়া যেন ভ্রূমধ্য স্থানেই উত্থিত হইতে লাগিল। উপর হইতে যেন এক একবার নাদের onrush অনুভব হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম যেন শ্বাসটা শীঘ্র ফুরাইয়া যাইতে লাগিল, দম ফুরাইয়া যাওয়ার মত ফস্ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু যেই resonance টা ঘনীভূত হইতে লাগিল,অমনি সে-ভাবটা কাটিয়া একটা দমের পূর্ণতা অনুভব হইতে লাগিল। এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন মেরুর outer extremity স্পর্শ করিয়া নাদশক্তি আসিয়া নাসিকামূলে ঠিক যেন একটা funnel এর মুখ হইতে নির্গত গুরুগম্ভীর ধ্বনিরূপে পরিণত হইতে লাগিল। আজ আর একটা অনুভব হইল—Consciousness এর side হইতে যেমন particular consciousness ক্রমশ উঠিতে উঠিতে একটা general consciousness এ আসে এবং সেখান হইতে আরও general, আরও general স্তরে উঠিতে উঠিতে যেন universal -এ আসিয়া দাঁড়ায়, বীজের দিক হইতে যেমন স্থূল concentrated ভাব, তার উপর জলীয় concentrated ভাব, তার উপর আগ্নেয় (শুধু উত্তাপ মাত্র) ঘনীভাব, তার উপর বায়বীয় ঘনীভাব, তার উপর আকাশীয় ঘনীভাব, তার উপর শক্তিমাত্রের ঘনীভাব, তার উপর আত্মিক ঘনীভাব—নাদও যেন এইরূপ particularity ছাড়িয়া ক্রমশ ক্রমশ উচ্চ উচ্চতর ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, higher synthesis reach করে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে একটা অপূর্ব শান্তি আসে।

* * *

২০।৮—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ দেখিলাম খাদে সুর লাগিল না, চড়াতেও না, মধ্যতেই সুর লাগিল।

* * *

২৩।৮—আজ পিঙ্গলা চলিতেছিল। আজ যেন উপর হইতে সুর নীচে নামিতে লাগিল।

২৫।৮—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ দেখিলাম সুরের সঙ্গে শরীর ঊর্ধ্বঅধোভাবে ঈষৎ আন্দোলিত করিতে করিতে একেবারে মূল হইতে শির পর্যন্ত যেন সুরের একতান চলিল, শরীরও বেশ হালকা ও well-strung বোধ হইতে লাগিল।

* * *

২৬।৮—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ গুরুধ্বনি হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া medulla বা মেরুর ভিতর দিয়া ঠিক skull এর নীচেটা ভরিয়া লইতে লাগিল ও একটানা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

* * *

৩।৯—আজ ইড়া চলিতেছিল। অন্যদিন যেমন point of resonance medullaর ঠিক উপরেই মনে হইত, আজ যেন ঠিক বাম স্তনের নীচে মনে হইতে লাগিল এবং মেরুর মধ্য দিয়া অন্যদিন যেমন মূলের দিকে স্বরের প্রচার মনে হইত, আজ মেরুর বাহিরে বাম পাঁজরের দিক দিয়া যেন নামিতে লাগিল।

* * *

৮।১১—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ নাম নিতেই মেরুর ভিতর resonance না হইয়া মুখবিবর হইতে inclined একটা line ধরিয়া যেন বাহিরে বাহিরে মেরুর মূল অভিমুখে resonance চলিতে লাগিল।

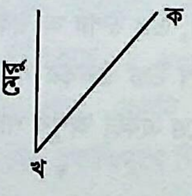

এই চিত্রের 'ক' হইতে যেন 'খ'এর দিকে বড় সুখপ্রদ, বড় আরামপ্রদ গুঞ্জনের মত নাদধারা ছুটিতে লাগিল, এবং কখনো নাভিদেশে, কখনো হৃদয়ে এবং কখনো কণ্ঠে যেন অধিক ঘন হইতে লাগিল। মস্তিষ্কের মধ্যে resonance টা একবারও উঠিল না। এইরূপ কিছুক্ষণ চলার পর পেটটা যেন বেশ খালি বোধ হইতে লাগিল এবং

সর্বশরীরে যেন একটা বলের সঞ্চার অনুভূত হইল। শুধু মাথায় হইলে যেমন কান ভোঁ ভোঁ করে ইহাতে সে sensation টা মোটেই হয় না। সেইজন্য প্রথম অবস্থায় নাদকে মস্তিষ্ক হইতে না উঠাইয়া মূল হইতে বা মূলের বাহির হইতে উত্থিত করিলে অধিক আনন্দ, অধিক সাধন সাহায্য মিলে।

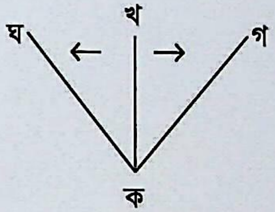

কখ রেখা হইল line of central concentrated vibration, আর খগ, খঘ হইল line of receding vibration, নাদ alternately এই কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসর্পী গতিতে চলে। কেন্দ্র স্পর্শ করিয়া তাহা বলশালী হয় এবং বলশালী হইলেই আবার ব্যাপ্তিতে ছোটে, আবার হৃতবল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে আসে। এই কেন্দ্রাভিমুখে আসিলে, এই কেন্দ্র স্পর্শ হইলেই ইহার শক্তি, সামর্থ্য, আনন্দ ও প্রকাশ উভয়ই বৃদ্ধি পায়, আর অপসর্পী হইলে ক্রমশ ক্ষীণ হয়। এই expenditure and imbursement ক্রমাগত জগতে চলিয়াছে। ইহাই সৃষ্টি ও লয়ক্রম—এইটিই বুদ্ধির বা মায়ার লীলাবিলাস। আত্মস্বরূপ কিন্তু এই উভয় বিলক্ষণ। এই সর্ববিলক্ষণ আত্মা সর্ববিলক্ষণ হইয়াও সর্বসম্বন্ধযুক্ত—ইহাই তাহার আশ্চর্য রহস্য, ইহাই তাহার বিচিত্রতা। বুদ্ধি এই সম্বন্ধ ধরিয়াই উঠে এবং পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায়, পূর্ণ শুদ্ধাবস্থায় নিঃসম্পর্ক হয়। কিরূপে সেই সর্বসম্বন্ধ বিবর্জিত এই সর্বসম্বন্ধের মধ্যে আসে, সকল সম্বন্ধকে প্রকাশ করে—ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। তাই ইহা অনির্বাচ্য, তাই এটা তার মায়া, তাই এটা তা'র লীলা, এটা তা'র খেলা। তাই এই শেষ ভূমিতে আসিয়া একটা axiom, একটা মহাসত্য মানিয়া লওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। তবে কেহ যদি বলেন যে যদি শেষে এই এক অচিন্ত্য শক্তি, অচিন্ত্য প্রভাব মানিতেই হইল তবে গোড়াতে মানিলেই তো সকল লেঠা চুকিয়া যাইত? না, তাহা হইত না—গোড়াতে

মানিয়া লইলে বুদ্ধি পরিচালনের আর অবসর থাকিত না, আর বুদ্ধি পরিচালনা না হইলে পরিশুদ্ধ হইত না, পরিশুদ্ধ না হইলে এই স্ফুট বোধকে প্রাপ্তি করিতে পারিত না। তাই গোড়ায় না মানিয়া ইহার তত্ত্বান্বেষণ যতদূর পারা যায় করা আবশ্যক এবং ইহার ফলে বুদ্ধি চরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইলে ‘তবে জন্মে নিজ বোধ’—সে বোধটাই যথার্থ বোধ, আর সব আংশিক বোধ।

* * *

শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭ আগস্ট, বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত চান্ডুলি গ্রামে। পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল প্রমথনাথ। নিজেই বিরজা হোম করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। শৈশবেই অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। যখন সন্ন্যাসী হলেন, তখন তিনি বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি মন্থন করে সারস্বত সাধনার শিখরে আসীন।

দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে ভরতি হন প্রাচ্যের দর্শনশাস্ত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্ম ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র অন্বেষণে সচেষ্ট ছিলেন। রিপন কলেজে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে অধ্যাপনার কাজ করেন কিছু দিন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। স্বদেশী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার ফলে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরাগভাজন হয়ে তাঁকে জেলেও যেতে হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শুরু হয় তাঁর পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন। সর্বদা একান্ত নির্জনে ওঙ্কারের অনাহত নাদের ঝংকার শ্রবণে মগ্ন থাকতেন। শান্ত পরিবেশ খুঁজতে শেষ জীবনে গড়িয়ায় থিতু হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ২০ অক্টোবর কলকাতায় এক ভক্তের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। তিনি লিখেছেন: *India: Her Cult and Education, Metaphysics of Physics, Science and Sadhana* (6 Vols.), *বেদ ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অভিব্যক্তি* প্রভৃতি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর লেখা বিশাল বই ছয় খণ্ডের *জপসূত্রম*।

CC0. In Public Domain, Digitization by eGangotri

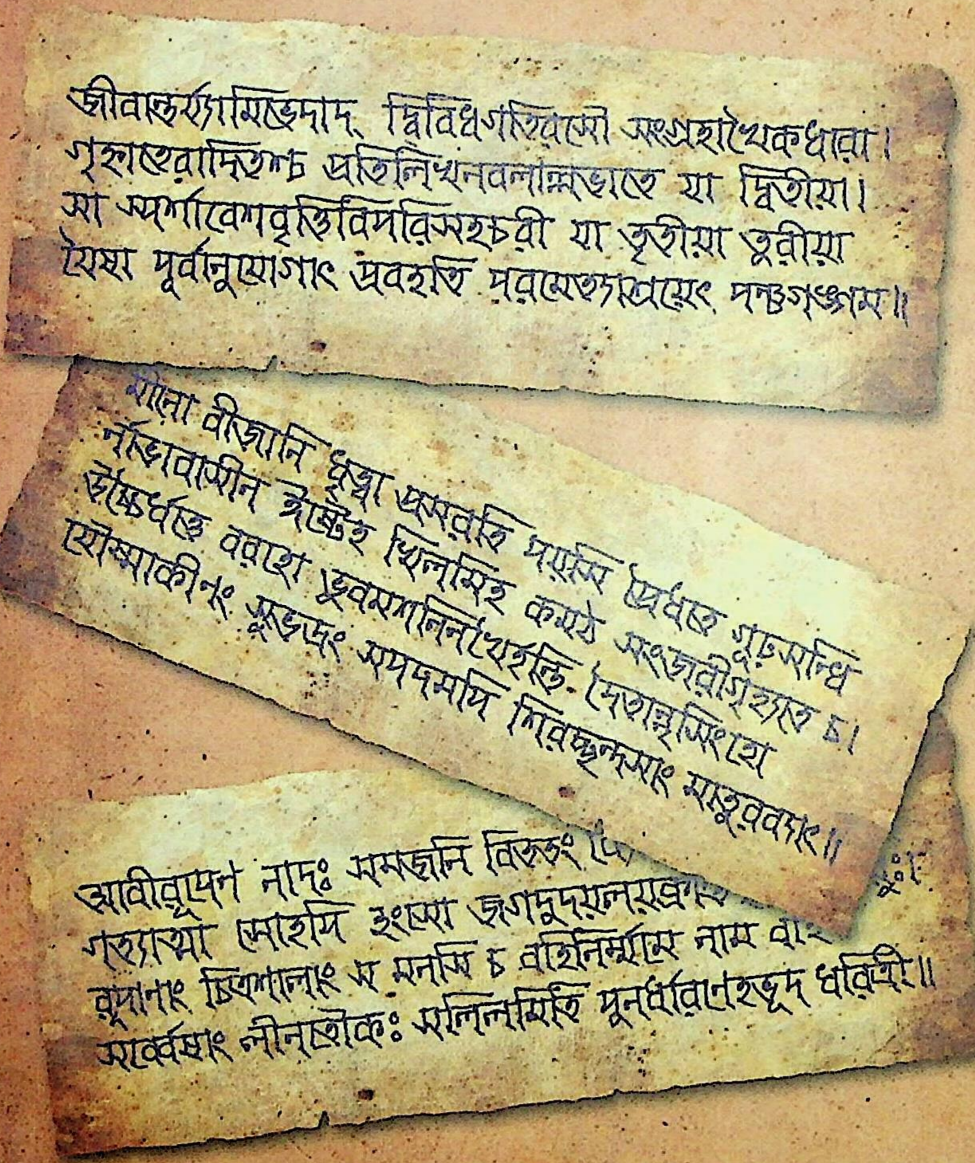

জীবান্তর্যামিভেদাদ্ দ্বিবিধগতিরসৌ সংগ্রহাখ্যৈকধারা।
গৃহ্যান্তরাদিতশ্চ প্রতিলিখনবলাল্লভ্যতে যা দ্বিতীয়া।
সা স্পর্শাবেশবৃত্তিবিপরিসহচরী যা তৃতীয়া তুরীয়া
যৈষা পূর্বানুযোগাৎ প্রবহতি পরমেত্যপ্রয়োং পঞ্চগঙ্গাম॥

নানা বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রধত্তে গূঢ়সন্ধি
র্গর্ভাবাসীন ইষ্টৈর্ইহ খিলমিহ কণ্ঠে সংজরীগৃহ্যতে চ।
ঊর্ধ্বোর্ধ্বস্তু বরস্থো ভুবনমানিনির্যেহন্তি- সেতান্নসিংহো
যোস্মাকীনং সুভদ্রং সপদমপি নিরচ্ছন্দসাং মাতুরবক্ষং॥

আবীবূপেন নাদঃ সমজনি বিভুং
গহ্যাত্মা সোহসি হংসো জগদুদয়লয়গ্রাস
রূপানাং চিত্রজালাং স মনসি চ বহির্নির্মমে নাম বা-
সর্বেষাং লীনশোকঃ সলিলমিহি পুনর্ধারানহভূদ ধরিত্রী॥

সাহিত্য
সংসদ
₹ 450.00

ISBN 978-81-7955-203-2
9 788179 552032